বার্ট্রান্ড রাসেল

রচনাসমগ্র

১

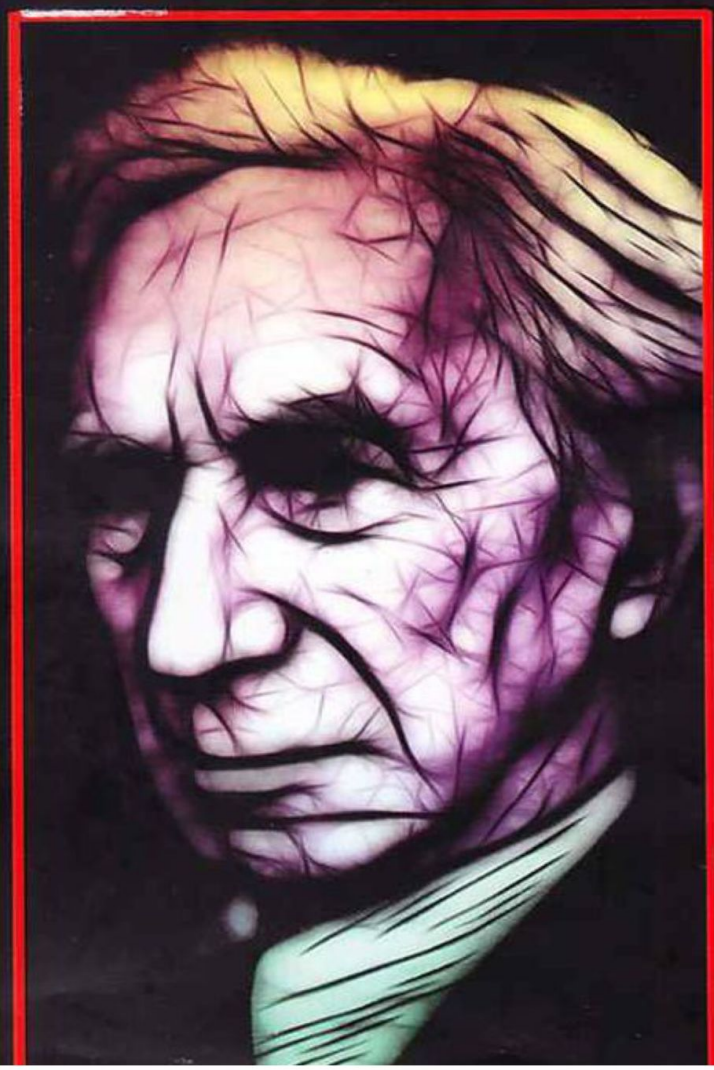

বার্ট্রান্ড রাসেল
রচনা সমগ্র-১

অনুবাদ : আতা-ই-রাব্বি

রাবেয়া বুকস্

দ্বিতীয় মুদ্রণ ❑ জুলাই ২০১৩

প্রকাশকাল ❑ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

প্রকাশক ❑ রাবেয়া খাতুন
রাবেয়া বুকস্ ৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
বর্ণবিন্যাস ❑ রাহুল
৩১/৩২ পি কে রায় রোড বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ ❑ আল কাদের অফসেট প্রিন্টার্স ৫৭ হৃষিকেশ দাস রোড, ঢাকা-১১০০
প্রচ্ছদ ❑ আব্বাস খান

মূল্য : ৬০০ টাকা

ISBN : 984-70164-0025-4

Published by Rabeya Khatun, Rabeya Books
38/4 Banglabazar, Dhaka-1100
Date of Publication : February-2013

একমাত্র পরিবেশক : আফসার ব্রাদার্স

সূচিপত্র

কেন আমি ধর্মবিশ্বাসী নই ৭

সুখের সন্ধানে ২১৩

অপেক্ষবাদের অ. আ. ক. খ. ৩৭৩

ধর্ম ও বিজ্ঞান ৫০৩

কর্তৃত্ব ও ব্যক্তিসত্তা ৬৪৫

কেন আমি ধর্মবিশ্বাসী নই

বার্ট্রান্ড রাসেল

বার্ট্রান্ড রাসেল আধুনিক যুগের এক আশ্চর্য কর্মঠ চিন্তাবিদ। ১৯১৪ সাল, রাসেল তখন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সেই সময় তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন জ্ঞানতত্ত্ব বিষয়ে। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর কোমল মনের এই শান্তিপ্রিয় দার্শনিক সভ্য দেশগুলির বর্বরতায় সব থেকে বেশি আঘাত পেয়েছিলেন। সেইসময় তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন এক দূরবর্তী বিষয় সম্পর্কে— 'বহির্বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান'। কেননা তিনি জানতেন এটি এমন একটি বিষয় যা পরিণত হয়েছিল অত্যন্ত কদাকার বস্তুতে, তাই তিনি চাইতেন বিষয়টি যেন বাস্তব থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকে। দশবছর পরে, তখন তিনি বাহান্ন, সেই সময় তাঁর পূর্বতন সহকর্মীরা তাঁকে আবিষ্কার করে খুশী হয়েছিলেন কেননা পূর্বের রাসেল আর বর্তমান রাসেল সম্পূর্ণ অন্য মানুষ— সবল, হাসিখুশী, সদা প্রফুল্ল এবং একগুঁয়ে। এই দশটি বছর একটি মধ্যবর্তী দশক হলেও তা তাঁর সমস্ত আশা ও বন্ধুত্বকে শেষ করে দিয়েছিল, এবং একদা যে আভিজাত্যপূর্ণ জীবনধারণে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন ধ্বংস করেছিল তাকেও।

বার্ট্রান্ড ছিলেন রাসেল পরিবারভুক্ত। এই পরিবার ইংল্যান্ডের তথা প্রাচীনতম পরিবারগুলির মধ্যে অন্যতম। ইংল্যান্ডের রাজনীতিতে বেশ কয়েক পুরুষ ধরে এই পরিবার সক্রিয় অংশগ্রহণ করে আসছিল। বার্ট্রান্ডের ঠাকুর্দা 'লর্ড জন রাসেল' ছিলেন একজন মহান ও উদার প্রধানমন্ত্রী। যিনি মুক্ত বাণিজ্য, সার্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষা, ইহুদীদের বন্ধনমোচন ইত্যাদি যাবতীয় ক্ষেত্রে স্বাধীনতার জন্য একরোখা লড়াই চালিয়ে এসেছেন। তাঁর বাবা 'ভাইকাউন্ট অ্যামবারলে' ছিলেন একজন মুক্ত চিন্তক। তিনি কখনওই চাননি তাঁর পুত্র বংশানুক্রমিক পশ্চিমী ধর্মতত্ত্বের দ্বারা ভারাক্রান্ত হ'ক। বার্ট্রান্ড তখন দ্বিতীয় আর্ল রাসেলের প্রমাণহীন উত্তরাধিকারী— সেইসময় তিনি তাঁর উত্তরাধিকারলব্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বর্জন করেন এবং সগর্বে নিজস্ব আয় থেকেই নিজস্ব খরচ খরচা নির্বাহ করতে থাকেন।

কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর বিশ্বজনীন শান্তিবাদের জন্য তাঁকে চাকরী থেকে অব্যাহতি দিলে তিনি সমগ্র বিশ্বকে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করেন এবং নিজে পরিণত হন এক ভ্রাম্যমান কূট তার্কিকে যাকে সমগ্র বিশ্ব সাদরে গ্রহণ করে।

যুদ্ধ-পূর্ব বার্ট্রান্ড রাসেল ছিলেন ভিন্ন সত্তার অধিকারী— গাণিতিক নৈয়ায়িক। সেই গাণিতিক নৈয়ায়িকের ভস্ম থেকে উঠে আসেন যুদ্ধোত্তর রাসেল— একজন রহস্যময় কম্যুউনিষ্ট-এর জন্ম হয়। তাঁর মধ্যে হয়তো এক মৃদু অতীন্দ্রিয় চাপ কাজ করত যার প্রথম প্রকাশ ঘটে এক পর্বতপ্রমাণ বীজগাণিতীয় সূত্রের দ্বারা— এবং তখন সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে বিকৃত ব্যাখ্যা জন্ম দিল এক নতুন ধর্মের— অথবা বলা যায় এক দর্শনের। তাঁর লেখা বইগুলোর মধ্যে সবচাইতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিরোনাম হল— 'Mysticism & Logic' বা 'অতীন্দ্রিয়বাদ এবং তর্কবিদ্যা'। এটি অতীন্দ্রিয়তার প্রতি এক নির্দয় আক্রমণ। অতীন্দ্রিয়তার বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত প্রশস্তিকে অনুসরণ করে এটা লেখা। রাসেল উত্তরাধিকারসূত্রে ইংরেজ প্রত্যক্ষবাদী ঐতিহ্য লাভ করেছিলেন এবং কৃতসংকল্প ছিলেন শক্ত মানসিকতার জন্য কেননা তিনি জানতেন তিনি তা পারেন না।

সম্ভবত এটি ছিল এক অতিরিক্ত মূল্যায়ন, যে জন্য তিনি জোর দিয়েছিলেন ধর্মের যৌক্তিতার উপর এবং প্রস্তুত করেছিলেন এক গাণিতিক দেবত্বকে। তিনি বলেছিলেন 'বার্গসঁ'-এর 'সিনেমাটোগ্রাফিক অ্যানালজি ফর দ্য ইনটেলেক্ট' বইটি পড়ার আগে অবধি তিনি কোন সিনেমা দেখেননি, আর বইটি পড়ার পর তিনি নিজেকে একটি উপস্থাপনার সাথে যুক্ত করেন যা ছিল মূলত দর্শনের একটি অধ্যায়। বার্গসঁ-এর সময় ও বেগ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা ছিল। তাঁর মতে, 'সমস্ত বস্তুই আবশ্যকীয় তৎপরতা সহ জীবিত।' কিন্তু এই বোধ রাসেলের মনে কোন দাগ কাটেনি। তাঁর কাছে এটি একটি সুন্দর কবিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা গণিত ভিন্ন তাঁর কাছে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বই নেই। তাঁর কাছে ক্লাসিকেরও কোন স্থান ছিল না। তিনি স্পষ্ট ভাষায় সতেজ যুক্তিতে তর্ক করতেন শিক্ষায় বিজ্ঞানের আরো প্রবেশ ঘটানোর জন্য, তিনি অনুভব করতেন পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখের মূল কারণ অতীন্দ্রিয়তা এবং চিন্তার নিন্দনীয় দুর্বোধ্যতা। তাঁর মতে নৈতিকতার প্রথম সূত্র হওয়া উচিত— 'সহজ সরল চিন্তা।' একজন মানুষের মিথ্যা বিশ্বাসের চেয়ে বরং ভালো পৃথিবীর অকাল ক্ষয়। এটাই হচ্ছে আমাদের চিন্তার ধর্মীয়তা, যার লেলিহান শিখাই একদিন বিশ্বের সব ময়লাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে।

তাঁর ভাবাবেগের নির্মলতাই তাঁকে অনিবার্যভাবে চালিত করে গণিতের দিকে। তিনি প্রায়ই শিহরিত হতেন এই অভিজাত বিজ্ঞানের প্রশান্ত যথার্থতার

কথা ভেবে। তাঁর কাছে 'গণিত শুধুমাত্র সত্য নয়, সর্বশেষ সৌন্দর্য— শীতল, কঠোর, সাধাসিধে এক ভাস্কর্যের ন্যায়, যা আমাদের দুর্বল প্রকৃতির উপর কোন সাড়া না ফেলেই, চিত্রকলা অথবা সুরের চোখ ধাঁধানো ফাঁদ অতিক্রম না করেই— তা শুদ্ধ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পের ন্যায় কঠিন যথার্থতা দেখানোর যোগ্য।' তাঁর বিশ্বাস ছিল গণিতের উন্নতি ঊনবিংশ শতাব্দীর সুন্দরতম বৈশিষ্ট্য। গাণিতিক অসীমকে ঘিরে থাকা জটিলতার সমাধান সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি যার জন্য আমাদের শতক গর্ব করতে পারে। প্রায় দুই হাজার বছর ধরে আগলে রাখা পুরাতন জ্যামিতি প্রথম শতাব্দীতে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং পৃথিবীর প্রাচীনতম ইউক্লিডীয় পাঠ্যগ্রন্থ অবশেষে অপসারিত হয়। এটা একটা বদনাম ভিন্ন কিছুই নয়।

সম্ভবত আধুনিক গণিতে অধিকাংশ উদ্ভাবনের উৎপত্তিগত স্বতঃসিদ্ধ সত্যকে বাতিল করে। রাসেল সেইসব মানুষদের উপর খুশী হন যারা স্বতঃপ্রত্যক্ষ সত্যকেই চ্যালেঞ্জ জানান এবং যা অনিবার্য তার সম্পর্কেই নিজেকে প্ররোচিত করেন। তিনি এটা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন যে দুটি সমান্তরাল রেখা এক জায়গায় মিলিত হতে পারে এবং সমগ্রের থেকে অংশ কখনই হতে পারে না।

তিনি সরল পাঠকদের স্তম্ভিত করে দিতে ভালবাসতেন, যেমন—যুগ্ম সংখ্যাগুলি হল সমস্ত সংখ্যার অর্ধসংখ্যা এবং সমস্ত সংখ্যাগুলির মতোই এই যুগ্ম সংখ্যাগুলিকেও পাওয়া যায়, যদিও প্রত্যেক সংখ্যার যুগ্ম সংখ্যাটি হচ্ছে তার দ্বিগুণ, বাস্তবিক এটাই হচ্ছে তাঁর সমগ্র বা মূল বিন্দু যে বিন্দু পর্যন্ত বস্তু অমীমাংসিত থাকে।

রাসেল গণিত বলতে পুনরায় প্রমাণ করতে চাইলেন তার কঠোর নৈর্ব্যক্তিকতা এবং বস্তুময়তাকে। সনাতন সত্য, পরম জ্ঞান— যা প্লেটোর ধারণার এক অবরোহী প্রণালী, স্পিনোজার সনাতন ধারা— মূলকথা, যা তাঁর কাছে বিশ্বের সার কথা। তাঁর মতে দর্শনের লক্ষ্য হওয়া উচিত অভিজ্ঞতার নিরিখে সত্য গঠন করা ও তার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখে গণিতের সমতুল্য হওয়া। এই অত্যাশ্চর্য প্রত্যক্ষবাদী আরো মনে করতেন—'দার্শনিক প্রতিজ্ঞাগুলি নিশ্চিতভাবেই পূর্বতসিদ্ধ। এই প্রস্তাব বা প্রতিজ্ঞাগুলি কোন বস্তুর প্রতি দিকনির্দেশ করে না— করে সম্পর্কের প্রতি, অথবা বলা চলে বিশ্বজনীন সম্পর্কের প্রতি। এগুলি কোন নির্দিষ্ট বিষয় বা ঘটনার অপেক্ষা রাখে না। যদি বিশ্বের সমস্ত নির্দিষ্ট বস্তুগুলি পরিবর্তিত হয়ে যায়, তথাপি এই অনুপাত সত্যই থাকবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'যদি সমস্ত A হয় B এবং X হয় A, তবে X হবে B', A যাই হোক না কেন। মরণশীলতা সম্পর্কে সক্রেটিসের পূর্বতন সার্বিক ন্যায় বা সিদ্ধান্তকে এটা সংকুচিত করে— তথাপি এই সিদ্ধান্ত সত্যই হত যদি সেখানে কোন সক্রেটিস, বা

কোন মানুষ তা না-ও প্রমাণ করত। প্লেটো এবং স্পিনোজা ছিলেন সঠিক। তাঁদের মতে 'এই বিশ্ব যা যা দিয়ে তৈরি তা দিয়েই তার সার্বিকতা ব্যাখ্যা করা যায়। এই বিশ্ব যা-কিছু দিয়ে প্রস্তুত সেই সব কিছুই অপরিবর্তনীয়, কঠোর এবং সঠিক, এবং একজন গণিতবিদ নৈয়ায়িক জাতীয় মানুষরা হচ্ছেন সেইসব মানুষ যাঁরা পূর্ণতাকে জীবনের চেয়ে বেশি ভালবাসেন এবং তাঁদের কাছে তা অত্যন্ত আনন্দদায়ক। পিথাগোরাস-এর উচ্চাশা ছিল দর্শনকে তার সমস্ত বিষয়সহ সঙ্কুচিত করে গণিতের আকারে নিয়ে আসা।

এই বর্ণনা হয়তো গাণিতিক দর্শনের প্রতি কোন মহান অবিচার সূচিত (যদি কেউ নিজস্ব মতামত দিয়ে এই ব্যাখ্যায় অশিষ্ট উপায়ে বাধা দান করে) করবে না। এটা যারা পছন্দ করে তাদের কাছে এক চমৎকার খেলা— দাবার মতন এই খেলায় খুব দ্রুত সময় কেটে যায়। এটি নির্জন বা একক খেলার এক নতুন রূপ এবং এটি খেলা উচিত বস্তুর স্পর্শে কলুষিত হবার থেকে যতটা সম্ভব দূরে থেকে। এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর যে Moonshine-এর বহু খণ্ড রচনার পর বার্ট্রান্ড রাসেল নিজেকে এই পৃথিবীতে নামিয়ে আনলেন এবং অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে যুদ্ধ, সরকার, সমাজতত্ত্ব, বিপ্লব প্রভৃতির কারণ অনুসন্ধানে ব্রতী হলেন— অথচ একবারও নিজের Principia Mathematica-র Pelion, upon Ossa-য় ব্যবহৃত নিখুঁত সূত্রগুলি ব্যবহার করলেন না, অথবা অন্য কেউও তা লক্ষ্য করে ব্যবহার করল না। প্রয়োজনীয়তা বোঝার জন্য বস্তু সম্পর্কে বিচারশক্তি জোয়ারের মতন এবং তা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে উৎখাত ও একঘরে করা সত্ত্বেও স্তব্ধ হল না, ঠিক যেন লন্ডনের ছোট্ট পরিসরে অন্য এক গ্যালিলিও। যারা তাঁর বিজ্ঞতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করত, তারাও তাঁর আন্তরিকতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিল। কিন্তু তারাও তাঁর এই বিশাল রূপান্তর দেখে অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিল এবং কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও এক অত্যন্ত অ-ইংরেজমূলক অসহিষ্ণুতায় ভুল করে ফেলেছিল।

এই প্রত্যক্ষ বিরোধিতার পিছনে সমস্ত নোংরা দ্বন্দ্বের এক তীব্র ঘৃণা ছিল। বার্ট্রান্ড রাসেল, যিনি চেষ্টা করেছিলেন বস্তুনিরপেক্ষ এক বুদ্ধি হতে, সত্যসত্যই ছিলেন বোধের এক ধারাস্বরূপ এবং জওয়ানদের জীবনের মূল্যের বিনিময়ে সাম্রাজ্যের আকাঙ্ক্ষা কখনই তাঁর মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করত না— তিনি দেখতেন জওয়ানরা গর্বিত ভাবে যাচ্ছে এবং নিজেরাই মৃত্যুবরণ করছে। তিনি ঠিক করেছিলেন এই সামগ্রিক হত্যাকাণ্ড বা এই সম্পূর্ণ বিনাশকারী শক্তির উপর আলোকপাত করবেন এবং নিশ্চিত ছিলেন যে সমাজতত্ত্বের মধ্যে এক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণের দ্বারা তিনি তা খুঁজে পাবেন যা অবিলম্বে ব্যাধির উৎসমুখ খুলে দিয়ে সুস্থতার প্রতি দিকনির্দেশ করবে।

তিনি সূক্ষ্মতার সঙ্গে নির্ধারণ করেছিলেন যে সমস্ত সম্পত্তির উৎস হল উৎপাড়ন নতুবা চুরি।। কিম্বারলী-র হীরক-খনি এবং র‍্যান্ড-এর স্বর্ণখনির ডাকাতি থেকে সম্পত্তিতে রূপান্তরের ঘটনাটি ঘটেছিল সমস্ত বিশ্বের নাকের উপর দিয়ে। পাণ্ড-মালিকানাধীন জমি থেকে প্রাপ্ত ফলাফল, তা যে ধরনেরই হোক না কেন, কখনই ভাল হতে পারে না।

যদিও ব্যক্তিগত সম্পত্তি যা রাষ্ট্র কর্তৃক সংরক্ষিত এবং ডাকাতি যা সম্পত্তি তৈরি করে তা প্রণীত আইনসমূহ দ্বারা অনুমোদিত এবং যুদ্ধ দ্বারা কার্যকরী— অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে রাষ্ট্র এক অন্যায্য সংস্থা। বরঞ্চ যদি অধিকাংশ কার্যপ্রণালী সমবেতভাবে এবং নির্মাতাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা হত তবে তা হত দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক। আমাদের ব্যক্তিত্ব এবং স্বাতন্ত্র্য সমাজ কর্তৃক সাদৃশ্যপূর্ণ কাজের মধ্য দিয়ে পুনঃপুনঃ নিষ্পেষিত হচ্ছে, এই পরিস্থিতিতে বৃহত্তর নিরাপত্তা এবং আধুনিক জীবনের নৈমিত্তিকতাই পুনরায় দেশের সাথে আমাদের সম্পর্ক স্থাপন করাতে পারে।

স্বাধীনতা হচ্ছে উৎকৃষ্টতম বিষয় আর ব্যক্তিত্ব ব্যতিরেকে তা একেবারেই অসম্ভব। একমাত্র মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে ভুলভ্রান্তি পেরিয়ে, পূর্ব সংস্কার অতিক্রম করেই সেই সম্পূর্ণ সত্যকে পেতে পারি। ধরা যাক, মনুষ্যকুল এবং শিক্ষককুলের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে এবং তারা সেই বিষয়ে বিতর্কেও অংশ নেয়। তাদের এই অসম মতামত থেকেই এক সুবিদিত আপেক্ষিকতা বেরিয়ে আসে, যা অবশ্যই নিরপেক্ষ অবস্থায় নেই, তথাপি এইসব স্থিরীকৃত ধারণা অথবা সামাণিক আস্থার মধ্য দিয়েই ঘৃণিত যুদ্ধ আসে।

আমরা যতদূর পর্যন্ত চিন্তা করতে পারি ততদূর পর্যন্ত শিক্ষিত না হওয়ার কারণেই বলা যায় আমরা বিদ্যালয়প্রাপ্ত শিক্ষার বিরাট পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূচনামাত্র। আমরা যন্ত্রপাতি তৈরি করলেও পদ্ধতি বা টেকনিকের ব্যাপারে এখনও প্রাচীনপন্থী। আমাদের ধারণায় শিক্ষা হচ্ছে একটা শরীরের মধ্যে কিছু নির্ধারিত জ্ঞান চালনা করা যখন কিনা এবং প্রতি পদক্ষেপে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলা অত্যন্ত জরুরী। বিমূর্ততার ব্যবহার তাদের কাছে সারাংশ রূপে থাকে, কিন্তু বুদ্ধিপ্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজন চলমান অভিজ্ঞতার ধারাবিবরণী। আমরা যখন পাণ্ডিত্যকে সঙ্গে নিয়ে বিপদের মধ্যে অবস্থান করছি, সেই পরিস্থিতিতে মধ্যযুগীয় দর্শন প্রয়োগিক চিন্তনের মডেল হতে পারে।

এইরকম ভাবে শুরু করে বার্ট্রান্ড রাসেল দৈবনির্দিষ্ট অজ্ঞেয়বাদ অতিক্রম করলেন। তিনি দেখলেন খ্রীষ্টীয়বাদের মধ্যে এমন অনেক কিছু রয়েছে যাকে পাণ্ডিত্যের শব্দগুচ্ছ দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তাই তিনি বাধ্য হলেন 'নৈতিক

সংকেত' ব্যতিরেকে সব কিছু পরিত্যাগ করতে। তিনি অত্যন্ত অবজ্ঞার সাথে এটাও জানালেন যে সভ্যতা যা কিনা খ্রীষ্টীয়বাদকেও মানে না তা মানুষকে নির্যাতিতই করছে, তাই যারা এর পৃষ্ঠপোষক তাদের কারারুদ্ধ করার পক্ষে সমর্থন জানালেন তিনি। এই পরস্পর বিরোধী অসংগত বিশ্বে তিনি কোন ঈশ্বর খুঁজে পাননি। তিনি তাঁর দর্শনের মধ্য দিয়ে স্পেনসারকে অনুসরণ করেন এবং ব্যক্তি ও জাতির সর্বশেষে পরাজয় সম্পর্কে স্টোয়িকদের সহিষ্ণুতা বর্ণনা করার জন্য জেগে ওঠেন। আমরা সাধারণত অভিযোজন এবং উন্নতি নিয়ে কথা বলি, এর মধ্যে উন্নতি এক দাম্ভিক শব্দ এবং অভিযোজন যার অর্ধেক হচ্ছে ঘটনাসমূহের এক অনৈতিক চক্র, তার পরিসমাপ্তি ঘটে তরলীকরণ অথবা মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে। জৈব জীবন যে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে— প্রোটোজোয়া থেকে দার্শনিক— এইভাবেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে এবং সন্দেহাতীত ভাবেই এই উন্নতি আমাদের অগ্রিম পাওনা। দুর্ভাগ্যবশত এই আশ্বাস একজন দার্শনিকের, একটি প্রোটোজোয়ার নয়। একজন মুক্ত মানুষ কখনওই শিশুবৎ আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ঈশ্বরে আরোপিত মনুষ্যত্বের মাঝে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারে না। তাকে নিজেই নিজের প্রেরণাকে ধরে রাখতে হয় এবং সাহসী হতে বাধ্য হতে হয় এটা মেনে নিয়েই যে একদিন তাঁর মৃত্যু ঘটবে, বস্তুত যা সমস্ত কিছুরই নিয়তি। তথাপি সে আত্মসমর্পণ করে না, যদি সে জিততে না-ও পারে তবুও সে অন্তত লড়াইটাকে উপভোগ করতে পারে। আপন জ্ঞানের দ্বারা পূর্বেই সে জানতে পারে অন্ধ শক্তি গুলি অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সেই শক্তিই তাকে ধ্বংস করবে। তাঁর পুজো বা শ্রদ্ধা কখনই এই বর্বর শক্তিগুলোর দিকে যাবে না যদি না লক্ষ্যহীন অধ্যবসায় তাঁকে জয় করে নেয়, ধ্বংস করে সমস্ত ঘরবাড়ি ও সভ্যতা আর সৃষ্টিশীল শক্তিগুলি সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও লড়াই চালিয়ে যায় এবং কয়েক শতাব্দীর জন্য জেগে ওঠে ক্ষোদিত ও চিত্রিত বস্তুগুলির দুর্বল সৌন্দর্য ও পার্থেনন-এর গরিমাময় ধ্বংস বুকে নিয়ে।

এটাই ছিল যুদ্ধের প্রতি বার্ট্রান্ড রাসেলের দর্শন।

বার্ট্রান্ড রাসেল যিনি সব কিছু ভুলে ছিলেন তর্কবিদ্যা, গণিত ও জ্ঞানবিদ্যার ভারে, হঠাৎই এক মুক্ত শিখার মতন জেগে উঠলেন এবং সমগ্র বিশ্ব চমকিত হয়ে দেখল এই রোগ-ফ্যাকাশে অধ্যাপক একজন অসীম সাহসী মানুষ এবং প্রগাঢ় মানবতাপ্রেমী। তাঁর নিজের সূত্রের অবকাশের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হলেন এই মেধাবী মানুষটি। প্রকাশিত হলেন তাঁর দেশের মর্যাদাপূর্ণ রাজনীতিজ্ঞ গোষ্ঠীর মধ্যে এক বাদানুবাদপূর্ণ আলোচনা তা হওয়া উচিত মনের বিজ্ঞানসম্মত উন্নতিসাধন। অজ্ঞানী লোকের সঙ্গে জ্ঞানী লোকের পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্যটি হল

না। চঠকারিতা এবং নিজের মতামতকে একদম সঠিক ভাবা, অপরপক্ষে একজন শিক্ষানবীশ অনেকবার ভাবনাচিন্তার পর তবেই কোন কিছু গ্রহণ (বিশ্বাস) করে এবং পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পরই কোন কিছু সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করে। শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির ব্যাপকতর ব্যবহার আমাদের সেই শিক্ষাসংক্রান্ত বিবেককেই বিস্তৃতি প্রদান করে এবং তা তাকেই বিশ্বোস করে যার প্রমাণ আমাদের নাগালের মধ্যেই রয়েছে এবং সবসময় প্রস্তুত থাকে এটা মেনে নিতে, যে-কোন মুহূর্তে তা ভুল প্রমাণিত হতে পারে। এই পদ্ধতিগুলির মধ্য দিয়েই শিক্ষা প্রমাণ করতে পারে যে তা আমাদের অসুস্থতাগুলি সারাতে সক্ষম এবং আরো পারে আমাদের সন্তানসন্ততিদের পরবর্তী প্রজন্মকে নতুন মানব-মানবীতে পরিণত করে নতুন বিশ্বের সামনে নিয়ে আসতে পারে। "আমাদের চরিত্রের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যটি হল তা অত্যন্ত নমনীয়— এটা বিশ্বাসের দ্বারা, পার্থিব পরিস্থিতি, সামাজিক পরিস্থিতি এবং প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা পরিবর্তিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষা মতামতকে পরিবর্তিত করে উচ্চ ধারণায়, শিল্পকে স্থান দেয় সম্পদের উপরে, ঠিক রেনেসাঁসের দিনগুলোর মতোই—'যা কিছু প্রাণবন্ত তার উন্নতিসাধন এবং আবেগ যা আমাদের অধিকারবোধকে কেন্দ্র করে রয়েছে তাকে প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে ও সংকল্পের দ্বারা তাকে পরিচালিত করে।' এটা হচ্ছে সৃষ্টির সূত্র, যার ভাবী অনুসিদ্ধান্তগুলি একটি নতুন ও প্রাকৃতিক নৈতিকতার দুটি মহান অনুশাসন। যার প্রথমটি হচ্ছে ভক্তি বা মর্যাদার সূত্র— এটা হচ্ছে 'ব্যক্তি ও সমষ্টির যতদূর সম্ভব উন্নতিসাধন' এবং দ্বিতীয়টি (পরধর্ম) সহিষ্ণুতার সূত্র— 'একজন ব্যক্তি বা একটি সমষ্টির উন্নতি অন্যের সাপেক্ষে অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি বিষয়।' প্রণীত আইনসমূহ হচ্ছে অর্থনৈতিক লোভ এবং বিশ্বজনীন নির্দয়তা থেকে পরিত্রাণের একটা উপায়। মানুষ জীবনের অন্য সকল ধারণাগুলির উপর কর্তৃত্ব কায়েম করতে সমর্থ হয়েছে। তখনই সে তা ব্যবহার করেছে বুদ্ধিমানের মতন এবং শিখতে পেরেছে কিভাবে সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ এবং সংরক্ষণ করবে। আমাদের স্কুলগুলি হচ্ছে সুখ-রাজ্য খোলার গুপ্ত মন্ত্র বিশেষ। এই সমস্ত কিছুই নিশ্চিতভাবে আশাব্যঞ্জক এক ধারণা। রাসেল তাঁর সামাজিক দর্শনের মধ্যে অতীন্দ্রিয়তা এবং আবেগকে স্থান দিয়েছিলেন যা সম্পর্কে তিনি দৃঢ় মনোভাব পোষণ করতেন এবং এইভাবেই অধিবিদ্যা এবং ধর্মের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি তাঁর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বে গণিত এবং তর্কবিদ্যাকে ব্যবহার করেননি। পূর্বতসিদ্ধ প্রণালীর (A priori) প্রতি তাঁর প্রবণতা, 'পূর্ণতা জীবনের চেয়ে মূল্যবান' এই ধারণার প্রতি ভালবাসা তাঁকে এক সুন্দর ধারণার দিকে নিয়ে যায় যা এই গদ্যময় পৃথিবীকে তার সমস্যাসঙ্কুল জীবনের সাধ্যমত পথপ্রদর্শনের

চেয়ে বরং একটুকরো কবিত্ব প্রদান করে। এটা অত্যন্ত আনন্দজনক বিষয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি সমাজ যেখানে শিল্প সম্পদের তুলনায় বেশি মূল্যবান, তার মূল্যায়ন করাটা রাষ্ট্রের উত্থান-পতনের ন্যায় দীর্ঘ বিষয়। শিল্প হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা সম্পদের মধ্যে থেকে উৎপন্ন হতে পারে, কিন্তু কখনই সম্পদের প্রতিভূ হতে পারে না। যেমন—প্রথমে মেদিচি এবং পরে মাইকেল-অ্যাঞ্জেলো।

কিন্তু রাসেলের মেধাবী দর্শন থেকে কিছু দোষ ত্রুটি খুঁজে বের করে আনাটা কোন জরুরী বিষয় নয়, যখন কিনা তাঁর নিজের অভিজ্ঞতাই ছিল তাঁর অন্যতম কঠোর সমালোচক। রাশিয়াতে তিনি অনুভব করেছিলেন একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করার প্রয়াস। তিনি এটা আবিষ্কার করে অত্যন্ত নিরাশ হয়েছিলেন যে রাশিয়ার সরকার গণতন্ত্রের পরিমাপের ক্ষেত্রে কোন ঝুঁকি নিতে পারবে না, যা তাঁর কাছে ছিল মুক্ত দর্পণের স্বতঃসিদ্ধ সত্য স্বরূপ। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন মানুষের বক্তব্য ও সংবাদ-মাধ্যমের প্রতি আরোপিত নিষেধাজ্ঞায় এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একচেটিয়া কারবারের প্রচারের সকল পথগুলির যথযথ ব্যবহার লক্ষ্য করে। তিনি এটা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন যে নিরক্ষরতার এই তিমিরে, ভর্তুকিপ্রাপ্ত সংবাদপত্রের যুগে, সত্যলাভের প্রতিবন্ধকতার এই ক্ষেত্রে রাশিয়ার জনগণ পড়তে সক্ষম। জমির জাতীয়করণের ফলে ব্যক্তিমালিকদের অধিকার খর্ব হওয়ায় তিনি অত্যন্ত আহত হয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে আজকের মানুষও যথাযথ কার্য করছে না কারণ সে সম্পূর্ণ ক্ষেত্রগুলির উপর কর্তৃত্ব কায়েম করতে পারেনি। রাসেলের মতে, 'রাশিয়া ধীরে ধীরে এক বৃহত্তর ফ্রান্সে পরিবর্তিত হচ্ছে যা ক্ষুদ্র কৃষক সম্বলিত এক বৃহৎ দেশ যেখানে প্রাচীন সামন্তপ্রথা উধাও।'

তিনি যখন একবছরের জন্য চীনে গিয়েছিলেন অধ্যাপনা করতে, তখন সম্ভবত অধিকাংশ সময় তিনি ঘরেই কাটাতেন। সেখানে তখন যান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যবহার কম, অপেক্ষাকৃত মন্দ ছন্দ। একজন যখন ধীরেসুস্থে কোন কারণ অনুসন্ধানে রত থাকত তখন সেই কার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার জীবন একটা জায়গায় স্থির হয়ে থাকত।। তিনি অনুভব করলেন ইউরোপ হচ্ছে এক বৃহত্তর মহাদেশের প্রাচীনতর প্রতিভূ এবং সম্ভবত প্রগাঢ়তর সংস্কৃতি। এইসব তত্ত্ব এবং অনুসিদ্ধান্তগুলি এক বিনীত আপেক্ষিকতায় দ্রবীভূত হয়ে দেশের সম্মুখে আনীত হয় একসময় দেখা গেল তাঁর লেখা থেকে তাঁর System বা ব্যবস্থা পৃথক হয়ে পড়ছে। এটা অবশ্যই কঠিন বিষয়— একজন ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকা, সেখান থেকে ভারত হয়ে চীনে গেল অথচ তার সামাজিক দর্শন অপরিবর্তিত থেকে গেল। এই বিশ্ব তাঁকে বোঝাতে সমর্থ হয়েছিল যে বিশ্ব তাঁর সূত্রের পক্ষে বেশ বড় এবং তাঁর হৃদয়ের ইচ্ছানুসারে পরিবর্তনের জন্য অত্যন্ত বৃহৎ এবং ভারী।

আরো এই পৃথিবীতে রয়েছে আরো অনেক অনেক হৃদয় এবং তাদের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা-সকল। এখন একজন তাঁকে দেখলে দেখতে পাবে যে রাসেল একজন বয়স্ক জ্ঞানী মানুষ যিনি কালস্রোতে শান্ত, স্নিগ্ধ, মৌন।

রাসেল ছিলেন কোমলীয় মনের মানুষ, সুগভীরতম অধিবিদ্যা এবং অতি সূক্ষ্ম গাণিতিক ব্যাখ্যা নিরূপণে সক্ষম, এতদসত্ত্বেও কথা বলেন অত্যন্ত সহজ সরল স্পষ্ট ভাষায় যা কিনা তাদের ক্ষেত্রেই সম্ভব যারা অকপট। চিন্তার প্রতি তিনি এমন আকৃষ্ট যা স্বাভাবিকভাবেই অনুভবের স্রোতকে শুকিয়ে ফেলে। তিনি উষ্ণতা ও সহানুভূতির দ্বারা আলোকিত এবং মানবতার পক্ষে অতীন্দ্রিয় কোমলতায় পরিপূর্ণ একজন মানুষ। তিনি কখনই একজন রাজসভাসদ বা তোষামুদে ছিলেন না, ছিলেন একজন জ্ঞানী মেধাবী ভদ্রলোক এবং অন্য অনেকের চেয়ে একজন উন্নততর খ্রীষ্টান যিনি সত্য বলতেন। আনন্দের সাথে এটা বলা যায়— তিনি একজন হৃদয়বান বলিষ্ঠ মানুষ, জীবনের শিখা যাঁর মধ্যে উজ্জ্বলভাবে দীপ্যমান। তিনি জানেন পরবর্তী শতাব্দী তাঁকে দেখবে বিজ্ঞতার রাজ্যে মোহ মুক্তিকরণ থেকে উদ্ভূত একজন মানুষ হিসাবে এবং তাঁর নাম লেখা থাকবে শান্ত নির্মল ভ্রাতৃত্বের সর্বোচ্চ শিখরে।

GRONTHO.COM

১
ধার্মিক বুর্জোয়া এবং অধার্মিক সর্বহারা

১৯২৭ সালের মার্চ মাসের ৬ তারিখে জাতীয় ধর্ম-নিরপেক্ষ সমাজের দক্ষিণ লন্ডন শাখার দ্বারা আয়োজিত ব্যারোমা টাউন হলে উক্ত বিষয়ে এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে বার্ট্রান্ড রাসেলের দ্বারা প্রদত্ত ভাষণ।

এতক্ষণ আপনাদের সামনে শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় যে বিষয়ে তাঁর বক্তব্য রাখলেন উক্ত বিষয় প্রসঙ্গে এই মনোজ্ঞ রাতে আমি আমার বক্তব্য পেশ করতে চলেছি। বিষয়টি হল, 'কেন আমি ধর্মবিশ্বাসী নই। এই বিষয়টি বুঝতে হলে আমাদের প্রথমেই ভালো করে বুঝতে হবে যে একজন ব্যক্তি ধর্মবিশ্বাসী বা খ্রীস্টান বলতে ঠিক কী বোঝে। বর্তমানে বহু মানুষ এই শব্দটিকে খুবই হাল্কা অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। কিছু কিছু মানুষ এই শব্দটির দ্বারা সেই সব মানুষদের বোঝেন যারা তাদের জীবনকে সৎ, সুন্দর ও মঙ্গলজনক পথে পরিচালিত করতে চায়। যদি খ্রীস্টান শব্দটির অর্থ এই হয়, তবে আমি বলব সমস্ত জাতি ধর্মে যারাই সৎ, সুন্দর ও মঙ্গলজনক পথে নিজেদের পরিচালিত করেছেন তারাই খ্রীস্টান। তাত্ত্বিক অর্থের দিক থেকে খ্রীস্টান শব্দটিই যে কেবল সৎ সুন্দর মঙ্গলজনক জীবনের অর্থ বহন করে তা আমি মনে করি না, কেননা যারা খ্রীস্টান নন অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, কনফুসীয় ধর্মাবলম্বী কিংবা মহম্মদীয় ধর্মাবলম্বী বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী, তারা যেহেতু খ্রীস্টান নন, তাই তারা সৎ, সুন্দর ও মঙ্গলজনক জীবন পরিচালিত করবার চেষ্টা করছেন না। আমি খ্রীস্টান অর্থে সেই সব মানুষদের কথাও বলছি না, যারা নিজেদের আলোয় সুন্দরভাবে জীবনকে চালাবার চেষ্টা করেন। আমি কেবল মনে করি, নিজেকে একজন খ্রীস্টান বলে মনে করার অধিকার পেতে গেলে আপনাকে অবশ্যই সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ বিশ্বাসের অধিকারী হতে হবে, যে বিশ্বাসের দ্বারা আপনি নিজেকে একজন খ্রীস্টান বলতে পারবেন। একটা কথা আপনাদের মনে রাখতেই হবে যে খ্রীস্টান শব্দটি সেন্ট অগস্টাইন এবং সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাসের সময় যে পূর্ণ অর্থ বা প্রাণ-পূর্ণ রক্তিম অর্থে ব্যবহার হত সেই অর্থে শব্দটিকে বর্তমানে ব্যবহার করা হয় না। অর্থাৎ ব্যাপারটি অনেকটা এইরকম, যেমন—আপনি পৃথিবীর সমস্ত ধর্মমতকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করলেন, যে ধর্মমতগুলি যথার্থরূপে নিজের নিজের ক্ষেত্রে বিকশিত এবং সেইসব ধর্মমতের প্রতিটি অক্ষরকে আপনি বিশ্বাস করেন আপনার দৃঢ় বিশ্বাসের পূর্ণ শক্তিতে।

ঈশ্বর বিশ্বাস বলতে কী বোঝায়?

বর্তমানে ঈশ্বর বিশ্বাস ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ নয়। খ্রীস্টান শব্দটির অর্থ আমরা ক্রমশই অস্পষ্টরূপে বুঝতে বাধ্য হচ্ছি। কেননা, আমি মনে করি যে, দুটি স্বতন্ত্র বিষয় সেই ব্যক্তির জন্য একান্ত অপরিহার্য যে ব্যক্তি নিজেকে একজন খ্রীস্টান বলতে চায়। বিষয়টি হল নিশ্চিতভাবে কথিত কিন্তু প্রমাণহীন— অর্থাৎ আপনাকে অবশ্যই ঈশ্বর ও তার অমরত্বের উপর বিশ্বাসপরায়ণ হতে হবে। যদি এই দুটি বিষয়ে আপনি বিশ্বাসী না হন, তবে আমার মনে হয় না যে আপনি নিজেকে একজন যাথার্থ ঈশ্বরবিশ্বাসী বলতে পারেন। এরপরেও, আর কিছুটা এগিয়ে বলা যায়, ধর্মটি যার নামে নামাঙ্কিত, সেই খ্রীস্টের উপর আপনার এক ধরনের বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, মহম্মদীয় ধর্মাবলম্বীরাও ঈশ্বর ও তার অমরত্বের উপর বিশ্বাসপরায়ণ অথচ তারা নিজেদের খ্রীস্টান বলে মনে করে না। আমি মনে করি, কিছু না হলেও খ্রীস্টের উপর আপনার এই বিশ্বাস অবশ্যই আছে যে তিনি যদি স্বর্গীয় না-ও হন, অন্তত তিনি সমস্ত মানুষের চেয়ে উত্তম ও জ্ঞানী মানুষ। যদি আপনি খ্রীস্টের উপর বেশিরভাগ বিশ্বাসটি না করে উঠতে পারেন, তা হলে আমি মনে করি না যে আপনার নিজেকে একজন খ্রীস্টান বলে ডাকার অধিকার আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে হুইটেকারের পঞ্জিকা থেকে আপনারা আর একরকম পথের সন্ধান পেয়েছেন এবং ভূগোলের বইগুলি থেকে আপনারা জানতে পেরেছেন যে পৃথিবীর সমগ্র জনগণকে খ্রীস্টীয়, মহম্মদীয়, বৌদ্ধ ও কৃষ্ণ্ণতাসম্পন্ন উপাসক সম্প্রদায় এবং আরও বহু ধরনের সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা হয়েছে, কিন্তু এরকম ভাবে ধরলে আমরা সবাই খ্রীস্টান। ভূগোলের বইগুলিতে আমরা সবাই নিজেদের জাতি সম্প্রদায়ের নামে তালিকাভুক্ত, কিন্তু তা কেবলমাত্র জ্ঞানের দাবিতেই, অন্য কিছু নয়। বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে এই প্রসঙ্গটিকে আমরা পাশ কাটিয়ে যেতে পারি। এইজন্য উক্ত বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে যখন আমি আপনাদের বলে থাকি যে— আমি কেন খ্রীস্টান নই, তখন আমি আপনাদের দুটি বিভিন্ন বিষয় বলতে বাধ্য হই, প্রথমত, কেন আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না এবং বিশ্বাস করি না তার অমরত্বে এবং দ্বিতীয়ত, কেন আমি মনে করি না যে যীশু খ্রীস্ট সমগ্র মানুষের থেকে জ্ঞানী ও উত্তম মানুষ, যদিও আমি তাঁর মঙ্গলময় নৈতিকতা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করে থাকি।

কিন্তু অতীতে ঈশ্বর-অবিশ্বাসীদের সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমি ঈশ্বরবিশ্বাস সম্পর্কে তাদের মতো স্থিতিস্থাপক কোন ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করে নিতে পারিনি আমি আগেই বলেছি যে প্রাচীন কালে এই শব্দটিকে পূর্ণ রক্তিম চেতনার সঙ্গে ব্যবহার করা হত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, শব্দটির নিষ্পত্তি ঘটে নরক

বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে। শাশ্বত নরকের বিশ্বাসে খ্রীস্টানদের কাছে কিছুদিন আগে পর্যন্ত আগুন একটি অনিবার্য উপাদান ছিল। আপনারা জানেন, এই দেশে প্রিভি কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের ফলে অনিবার্য উপাদান হিসেবে আগুনকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্যান্টারবারির আর্কবিশপ ও ইয়র্কের আর্কবিশপের মধ্যে মতভেদও হয়েছে, কিন্তু এই দেশে, আমাদের ধর্ম পার্লামেন্টের অ্যাক্ট্ বা সংসদীয় আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ফলে প্রিভি কাউন্সিল এই জঘন্য ধারণাকে পদদলিত করবার সামর্থ্য অর্জন করতে পেরেছে এবং খ্রীস্টানদের কাছে নরকের প্রয়োজনীয়তা আর বেশি দিন থাকতে পারেনি। ফলস্বরূপ আমিও কোন খ্রীস্টানকে নরকে বিশ্বাসী হবার জন্য উৎসাহিত করব না।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব

ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রশ্নে আসতে গেলে, প্রশ্নটি যেমন বড় হবে তেমনই তা ভারগম্ভীর হবে। যদি আমার পক্ষে এই ধরনের প্রশ্ন ঠিক করা সম্ভব হত তবে আমি ঈশ্বরের রাজত্ব আসার আগে পর্যন্ত আপনাদের এখানেই ধরে রাখতাম, যাতে আপনারা আমাকে ক্ষমা করতে পারতেন প্রশ্নটি অপেক্ষাকৃত জোর করে করার জন্য। আপনারা জানেন যে ক্যাথলিক চার্চ ঈশ্বরের অস্তিত্বের সম্পর্কে এই মতো পোষণ করে থাকে যে ঈশ্বরকে প্রমাণ করা যেতে পারে অসহযোগিতামূলক বিচার শক্তি (unaided reason) দ্বারা। এই ধরনের মতবাদ কিছুটা কৌতূহলোদ্দীপক হলেও তাদের অনেকগুলি মতবাদের মধ্যে এটাও একটি। এই ধরনের মতবাদ তারা প্রচার করেছিল এই কারণে যে কোন একটি সময় মুক্তচিন্তাবিদরা প্রায়শই সেইসব বিভিন্ন যুক্তি-তর্ক উত্থাপন করে দেখাতেন যেগুলি ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিপক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু সেইসব মুক্তচিন্তাবিদরা জানতেন যে তাদের বিশ্বাসের দিক থেকে ঈশ্বর অবশ্যই বিদ্যমান। এই বিষয়ে যুক্তিপ্রদর্শন ও তর্কবিতর্ক এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেল যে, ক্যাথলিক চার্চ অনুভব করল, তাদের অবশ্যই থাকার প্রয়োজন আছে। এইজন্যই তারা এই ধরনের মতবাদ প্রচার করল যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যেতে পারে অসহযোগিতামূলক বিচারশক্তির দ্বারা এবং তারা সেই ধরনের তর্কবিতর্কগুলিকেই সামনে রেখেছে যেগুলি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের স্বপক্ষে যেতে পারে। এই ধরনের অনেকগুলি যুক্তি আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকটিকে নিয়েই আমরা আলোচনা করব।

প্রথম-কারণের উপর বিতর্ক

প্রথম কারণের ওপর আলোচনাটি বোঝাবুঝির দিক থেকে সব থেকে সরল ও সোজা। আমাদের আগেই বুঝে রাখা দরকার যে জগতের যা কিছু আমরা

দেখতে পাই, সবকিছুর একটি কারণ আছে। এই কারণকে প্রশ্ন করতে করতে আপনি পেছনের দিকে এগিয়ে গিয়ে অবশ্যই প্রথম কারণের (First cause) সম্মুখীন হবেন, এবং এই প্রথম কারণকেই আপনি ঈশ্বর বলে অভিহিত করেন।] আমি মনে করি উক্ত বিতর্কটি বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ, প্রথমত যে কারণটিকে ব্যবহার করা হবে সেটি সম্পূর্ণ নয়। দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা উক্ত কারণের উপর কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন, যে কারণটি মোটেই তেমন প্রাণবন্ত নয় যেমনভাবে অতীতে তাকে প্রাণবন্ত করে দেখানো হত। কিন্তু এতদ্ব্যতিরিক্ত আপনি একটি যুক্তি দেখাতে পারেন যে প্রথম কারণ বলে একটি কারণ অবশ্যই আছে যার কোন বৈধতা নেই। যখন আমি যুবক ছিলাম তখন এই প্রশ্নগুলি নিয়ে নিজের মনেই ভাবগম্ভীর তর্ক-বিতর্ক চালিয়েছিলাম। প্রথম কারণের উপর বিতর্ক আমি বহুদিন ধরে গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু একদিন, যখন আমার বয়স আঠারো, আমি জন স্টুয়ার্ট মিলের আত্মজীবনী পড়লাম, এবং সেখানে এই বাক্যটি দেখলাম : 'আমার বাবা আমাকে এই প্রশ্নগুলি শেখালেন, 'কে আমাকে তৈরি করেছে?' আমার দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি কিন্তু এই ধরনের প্রশ্ন আমাকে সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন করার পথে নিয়ে গেল, সেটি হল, কে ঈশ্বরকে তৈরি করেছে?' আমি এখনও মনে করি এই সরল বাক্যটি প্রথম কারণ সম্পর্কিত যুক্তির দোষটি সেই প্রথম আমাকে দেখালো। যদি প্রতিটি জিনিসের একটি কারণ থাকে তবে ঈশ্বরেরও কারণ আছে (If everything mrust have cause, then god must have a cause)। যদি কারণ ছাড়াই কোন কিছু থাকতে পারে তবে তা ঈশ্বরের জগৎ সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং যুক্তি-তর্কের আর কোন মূল্যই থাকে না। এই ব্যাপারটি অনেকটা হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গির মতো, যেমন জগৎ একটি হাতির উপর অবস্থান করছে এবং হাতিটি একটি কচ্ছপের উপর অবস্থান করছে এবং যখন কেউ প্রশ্ন করে কচ্ছপটি কার উপর অবস্থিত? তখন ভারতীয়রা বলে থাকে 'মনে হয় আমরা বিষয়টিকে পরিবর্তন করছি'। সত্যি করে বলতে গেলে এর থেকে ভালো যুক্তি আর নেই। কোনরকম কারণ ছাড়াই জগৎ বর্তমান অস্তিত্বে আসতে পেরেছে এরকম ভাবার যেমন কোন কারণ নেই, অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, এরকম কি কোন কারণ থাকতে পারে যে কেন জগতের সর্বদাই বিদ্যমান থাকা উচিত হয়নি। এরকম ভাবারও কোন কারণ নেই যে পৃথিবীর একটি শুরু ছিলো। আমাদের কল্পনার অভাবেই আমাদের এরকম ভাবতে হয় যে, বস্তুসমূহের অবশ্যই একটি শুরু ছিল। এই জন্য আমি প্রথম কারণের যুক্তির উপর অযথা সময় নষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি না।

প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কিত যুক্তি

প্রাকৃতিক আইন থেকে একটি অতি সাধারণ যুক্তি পাওয়া যেতে পারে, যে যুক্তিটি সমগ্র অষ্টাদশ শতক ধরে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, বিশেষত, স্যার আইজ্যাক্ নিউটন ও তাঁর বিশ্বতত্ত্বের প্রভাবের ফলে। মাধ্যাকর্ষণের সূত্র অনুযায়ী সাধারণ মানুষ এই সত্যটি জানলো যে সমস্ত গ্রহগুলি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং তারা মনে করল যে ঈশ্বর এসমস্ত গ্রহগুলিকে এই বিশেষভাবে ঘোরার আদেশ দিয়েছিলেন বলেই তারা ওই ভাবে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। তাদের এই ভাবনাটি এত সরল ও সোজা ছিলো যে তার ফলে তাদের মাধ্যাকর্ষণের সূত্রটিকে আরও এগিয়ে দেখার সমস্যাকে গ্রহণ করতে হয়নি। কিন্তু আইনস্টাইনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই মাধ্যাকর্ষণের সূত্রটির ব্যাখ্যা আমাদের কাছে কিছুটা জটিল হয়ে পড়ল। নিউটনীয় ব্যবস্থায় যে ব্যাখ্যাটি অতি দ্রুত দেওয়া যেত, এখন থেকে তা আর হল না, কেননা যে ভাবেই হোক ব্যাখ্যাটি সময়সাপেক্ষ হয়ে পড়ল। আইনস্টাইন কিভাবে মাধ্যাকর্ষণের সূত্রটিকে ব্যাখ্যা করেছেন সে সম্পর্কে আমি কোন ভাষণ দিতে চাই না, কারণ তা কিছুটা সময় নিয়ে নেবে, তবে সেই নিউটনীয় ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক আইনটিকে আপনারা আর বেশিদিন ধরে থাকতে পারলেন না, যেখানে, কোন কারণবশত কেউ বুঝে উঠতে পারেনি, কেন প্রকৃতি সমরূপ ধরনের (Uniform fashion) আচরণ করে থাকে। এবার আমরা বুঝতে পারলাম অনেক কিছু, যাদেরকে আমরা প্রাকৃতিক আইন বলে মনে করতাম সেগুলো বাস্তবে বিভিন্ন মানবিক প্রথা (Human connection)। আপনারা জানেন যে বহুদূরবর্তী তারকামণ্ডিত অনন্তেও তিন গজে এক ফুট হয়। এটা নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কিন্তু আপনি এই ব্যাপারটি প্রাকৃতিক আইন বলে ভাবতে পারেন না এবং এইরকম বহু জিনিস যাকে আমরা প্রাকৃতিক আইন ভেবে থাকি, আসলে সেগুলো উক্ত ঘটনাটির মতো। অন্যদিকে, পরমাণুগুলো কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কিত বিষয় যদি আপনি জানেন তবে দেখবেন যে সেগুলো ঠিক সেমনভাবে প্রাকৃতিক আইন মেনে কাজ করে না যেমনভাবে সাধারণ মানুষ ভাবে। আপনি যে-সব প্রাকৃতিক আইনগুলি সম্পর্কে জানেন সেগুলো পরিসংখ্যানগত গড় হিসেবে আকস্মিক ঘটনা থেকে উদ্ভূত। এরকম একটি ঘটনার কথা বলা যেতে পারে যা বলতে গেলে আমরা সবাই জানি। পাশাখেলার ক্ষেত্রে দেখা যায় ছত্রিশবার দান ফেললে আপনি একবার হঠাৎ দুটি ছয়ের দান ফেলতে পারেন, এর জন্য আপনি এরকম মনে করতে পারেন না যে আপনার দানের পেছনে এই রকম ঘটনা কোন একটা নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। অন্যভাবে বলা যায় যে প্রতি ছত্রিশবারে যদি একবার দুটো ছক্কা পড়ে তবে বলা যেতে পারে যে

ব্যাপারটি একটা নিয়মে চলছে। প্রাকৃতিক আইনগুলি বহু ক্ষেত্রেই অনেকটা এইরকম। পরিসংখ্যানগত গড় হিসেবের দিক থেকে তারা প্রায় সবাই আকস্মিকতার আইন (Laws of chance) থেকে উদ্ভূত এবং এই ধরনের ঘটনার ফলে পূর্বের তুলনায় বর্তমানে প্রাকৃতিক আইনগুলিকে অনেক কম মর্মস্পর্শী বলে মনে হয়। এর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে বলা যেতে পারে যে উপযুক্ত আইনগুলি বিজ্ঞানের ক্ষণিক পরিস্থিতির (Momentary state of science) প্রতিনিধিত্ব করলেও কাল সেগুলো বদলে যেতে পারে। প্রাকৃতিক আইনই মূলত আইন-প্রণেতা এই ধরনের সমগ্র ধারণাটি প্রাকৃতিক আইন ও মানবিক আইনের মধ্যে একটা বিভ্রান্তির ফলেই ঘটেছে। মানবিক আইনগুলো এমন কতকগুলি আদেশ যা কোন একটি নির্দিষ্ট পথে আপনার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে, যে পথে আপনি আচরণ করতেও পারেন, আবার না-ও করতে পারেন— সেটা আপনার পছন্দের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু প্রাকৃতিক আইন হল বস্তুর বাস্তব আচরণের বর্ণনা এবং প্রাকৃতিক আইনগুলো বস্তুর বাস্তব আচরণের বর্ণনা বলেই আপনি কখনও এই ধরনের তর্ক উত্থাপন করতে পারেন না যে, কেউ বস্তুগুলোকে ঠিক ওই ধরনের আচরণ করতে আদেশ দিয়েছে, কেননা যদি আপনি এই ধরনের কথা বলেন তবে প্রশ্ন উঠবে, 'কেন ঈশ্বর অন্য কিছু না করে ঠিক এমন ধরনের প্রাকৃতিক আইন তৈরি করলেন?' তখন যদি আপনি বলেন যে তিনি তাঁর আনন্দের জন্যেই এই ধরনের প্রাকৃতিক আইন তৈরি করেছেন এবং যার কোন কারণ নেই, তখন আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে এখানে এমন কিছু একটা আছে যা আইনের বিষয়বস্তু নয় এবং সেখানেই আপনার প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কিত ধারণা বিঘ্নিত হবে। যদি আপনি গোঁড়া ধর্মবেত্তাদের মতো অনুসরণ করে এই কথা বলেন যে ঈশ্বর সর্বোত্তম বিশ্ব সৃষ্টি করবার জন্যেই কেবল এই ধরনের আইনের সৃষ্টি করেছেন, অন্য আর কোন কারণ নেই, তবে যেভাবে ব্যাপারটিকে আপনি কখনই ভেবে দেখেননি, সে ভাবেই বলতে হয়, যে যদি প্রাকৃতিক আইনগুলি ঈশ্বরেরই রচনা এইরূপ কারণ থাকে তবে ঈশ্বর নিজেও উক্ত আইনের বশবর্তী এবং এই কারণেই ঈশ্বরকে মধ্যস্থ কোন সত্তা বলে পরিচিত করানোর মধ্যে কোন লাভ নেই। আপনার স্বর্গীয় আদেশের বাইরে ও সম্মুখে সত্যই একটি আইন আছে এবং ঈশ্বর আপনার উদ্দেশ্যকে কখনই সফল করে তুলতে পারবেন না, কেননা তিনি কখনই কোন আইন-প্রণেতা নন। সংক্ষেপে, প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কে সমগ্র যুক্তি আগে যে শক্তির সঙ্গে ব্যবহৃত হত এখন তা আর রইল না। বিষয়গুলি সম্পর্কে সমালোচনা করার জন্য আমি ঠিক সময়েই এগিয়ে চলেছি। বিষয়টি হল ঈশ্বরের অস্তিত্বকে নিয়ে যা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এই

ধারণাগুলি প্রথমে ছিল যথেষ্ট কঠিন ও বুদ্ধিদীপ্ত, কিন্তু অবশ্যই ভ্রমাত্মক ছিল। আমরা আধুনিক যুগে প্রবেশ করা মাত্রই তারা বুদ্ধিগত দিক দিয়ে কম সম্মানিত হয়ে পড়ল এবং ক্রমশ এক ধরনের নৈতিক অস্পষ্টতার দ্বারা আক্রান্ত হল।

অভিসন্ধিজাত আলোচনা

পরবর্তী পদক্ষেপ আমাদের অভিসন্ধিজাত আলোচনায় (Argument from design) নিয়ে আসে। অভিসন্ধিজাত আলোচনা সম্পর্কে আপনারা সবাই জানেন: জগতের সবকিছুই এমনভাবে তৈরি হয়েছে যাতে জগতে আমরা বেঁচে থাকার উপায় পেতে পারি এবং যদি এই জগৎ একটুখানি অন্যরকম হত তবে আমরা এখানে বেঁচে থাকার উপায় পেতাম না। এটাই অভিসন্ধিজাত বিষয়। বিষয়টি কখনও কখনও কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে ওঠে, উদাহরণস্বরূপ, এই বলে যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে গুলি করার সুবিধার জন্যই খরগোসের সাদা লেজ। আমি জানি না কিভাবে একটি খরগোস এই ধরনের ব্যাপারটি দেখবে। এটা একটি গদ্য-কাব্যের সহজ বিষয়। আপনারা সবাই ভলতেয়ারের সেই জনপ্রিয় উক্তিটির কথা জানেন যে নাকটি এমনভাবে গঠিত হয়েছে যাতে সেখানে চশমাটি ঠিক মতো বসে। অষ্টাদশ শতকে এই ধরনের ব্যঙ্গোক্তি সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে খুব একটা অসংগতিকর কথা হয়ে উঠতে পারেনি কেননা ডারউইনের সময় থেকে আমরা অনেকটা বুঝে গিয়েছিলাম যে কেন জীবন্ত সৃষ্টি তাদের পরিবেশের সঙ্গে নিজেদেরকে অভিযোজিত করে নেয়। এটা নয় যে তার পরিবেশটিকে নিজেদের মতো করে সাজিয়ে নেয় যেখানে তারা মানাতে পারবে, বরঞ্চ তারাই পরিবেশটির সঙ্গে মানানসই হয়ে ওঠে এবং এটাকেই অভিযোজনের ভিত্তি বলা হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে অভিসন্ধির কোন প্রমাণ নেই। আপনি যখন নকসা বা অভিসন্ধিটিকে খতিয়ে দেখতে চাইবেন, তখন একটা আশ্চর্যজনক জিনিস আপনি দেখতে পাবেন যে মানুষ বিশ্বাস করে এই জগৎ ও তার অভ্যন্তরে সমগ্র বস্তু তাদের অপূর্ণতা সত্ত্বেও অবশ্যই এক অসাধারণ সৃষ্টি বা সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। আমি বস্তুতই ব্যাপারটিকে বিশ্বাস করতে পারি না। আপনি কি এটা ভেবে দেখেছেন যে যদি আপনাকে সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ করে দেওয়া হয় এবং লক্ষ লক্ষ বছরের মধ্যে আপনাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় জগৎকে নিখুঁত পূর্ণতার সঙ্গে গঠন করার, তবে আপনি কু-ক্লুক্স-ক্ল্যান বা ফ্যাসিস্তদের থেকে ভালো কিছু তৈরি করে উঠতে পারবেন না? এছাড়াও, যদি আপনি বিজ্ঞানের সাধারণ সূত্রগুলি গ্রহণ করেন তবে আপনাকে অবশ্যই ধরে নিতে হবে যে এই গ্রহটির উপর মানবজীবন ও সাধারণ জীবন একটি নির্দিষ্ট সময়ে অবশ্যই শেষ

হয়ে যাবে। সৌর-ব্যবস্থার ক্ষয়জাত এটি একটি বিশেষ পর্যায় মাত্র, উক্ত ব্যবস্থার ক্ষয়ের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে আপনি উষ্ণতাকে একটি বিশেষ অবস্থায় পেলেন এবং যে উষ্ণতায় প্রোটোপ্লাজম সৃষ্টি সম্ভব হয়ে উঠল এবং সমগ্র সৌর-ব্যবস্থার আয়ুর উপর নির্ভর করে এখানে কিছুদিনের জন্য জীবনলীলার সূচনা হল (There is life for a short time in the life of the whole solar system)। আপনারা চাঁদে এমন কিছু দেখেন যা পৃথিবীতে হতে চলেছে, অর্থাৎ— কিছুটা মৃত, ঠাণ্ডা এবং জীবনহীন।

আমাকে বলা হল যে এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বিষণ্ণতামূলক এবং মানুষ আপনাদের বলবে যে যদি তারা এই ধরনের বিশ্বাস করে তবে তারা পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সামর্থ্য জোগাড় করে উঠতে পারবে না। এটা বিশ্বাস করবেন না, এটা একেবারেই বাজে কথা। এখন থেকে লক্ষ লক্ষ বছর পরে কি ঘটবে তা নিয়ে কেউ উদ্বিগ্ন নয়। এমনকি যদি তারা ভাবে যে তারা সত্যই ব্যাপারটাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন তবে তারা নিজেদেরকে বঞ্চিত করছে। তারা এমন কিছু নিয়ে উদ্বিগ্ন যা অনেকটা পরিমাণ পার্থিব অথবা ব্যাপারটি তাদের বদহজম হয়েছে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ বছর পরে পৃথিবীতে কি ঘটতে যাচ্ছে তা ভেবে অবশ্যই কেউ দুঃখকে উৎপাদন করবে না। যদিও এটা একটা বিষণ্ণতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি যে পৃথিবীতে জীবনলীলা একদিন শেষ হবে. অন্তত আমরা যেন এই সত্যটা বুঝতে পারি। যদিও কখনও কখনও মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে যে-সব জিনিসগুলি করে থাকে তা নিয়ে আমার অনুশোচনা হয় কেননা এগুলো কেবলমাত্র এক প্রকার সান্ত্বনা ছাড়া আর কিছুই নয়, তবে এই সান্ত্বনাগুলো আর যাই হ'ক জীবনলীলাকে অন্তত দুর্বিসহ করে তোলে না।

পরমেশ্বরের স্বপক্ষে নৈতিক যুক্তি

এখন আমরা আর একটা স্তর এগিয়ে এলাম যে স্তরটিকে আমরা বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত অবতরণ (Intellectual descent) বলব, অর্থাৎ যে পথে ঈশ্বরবিশ্বাসী বা আস্তিকেরা তাদের যুক্তি প্রয়োগ করেছেন এবং আমরা এখন সেই বিষয়টিকে নিয়ে আলোচনা করব যাকে বলা হয়ে থাকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে তিনটি বিচারবুদ্ধি-সংক্রান্ত যুক্তি ছিল, যার সবগুলোই ইমানুয়েল কান্ট তাঁর "Critique for Pure Rason" গ্রন্থে গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু যেই তিনি এই তিনটি যুক্তি গ্রহণ করলেন সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি নতুন যুক্তি আবিষ্কার করে ফেললেন এবং সেই যুক্তিটি ছিল একটি নৈতিক যুক্তি যা তাঁকে সহজেই প্রভাবিত করে ফেলেছিল। তিনি সাধারণ আর সব মানুষদের মতোই ছিলেন। কিন্তু বুদ্ধি-সংক্রান্ত ব্যাপারে

।।।। ।।লেন সন্দেহবাদী, তবে নৈতিক বিষয় তিনি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতেন ।। ।।।। মাতৃচরণে পূর্ণভাবে সমর্পিত। এই ধরনের মনোভাব সম্পর্কে মন-।।।।।।।।।।রা যা জোর দিয়ে বলে থাকেন তা হল কিশোর বয়সে আমরা যে ।।।।।।।।।। (Association) বড় হই তা আমাদের জীবনে একটি গভীর প্রভাব ।।।।। যা পরিণত বয়সের পরিবেশ ফেলতে পারে না।

আমার মতে কান্ট ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটি নতুন নৈতিক যুক্তি ।।।।।।।। করলেন যেটি বিভিন্নভাবে উনবিংশ শতকে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই ।।।।টি বিভিন্ন ধরনের আকারবিশিষ্ট, এদের মধ্যে একটি হল ঈশ্বরের অস্তিত্ব না ।।।।।। জগতে ভালো-মন্দ বলে কিছুই থাকত না। জগতে ভালো-মন্দের মধ্যে ।।।।।। কোন স্বতন্ত্রতা আছে কিনা, সে বিষয়ে এখনই কোন আলোচনা করতে ।।।। আগ্রহী নই। বর্তমানে আমি যে বিষয়টিকে নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী ।। হল, যদি আপনি ভালো-মন্দের স্বতন্ত্রতা স্বীকার করে নিতে চান তবে যে ।।।।র সম্মুখীন আপনি হবেন তা হল, ঈশ্বরের আদেশেই কি এই স্বতন্ত্রতা, নাকি ।। ।।।? যদি এটা ঈশ্বরের আদেশ হয়ে থাকে তবে স্বীকার করে নিতে হয় যে ।।।।রের নিজের কাছে ভালো বা মন্দের মধ্যে কোনরকম স্বতন্ত্রতা নেই। তাই ।।।।র মঙ্গলময় এই কথাটির আর কোন অর্থই হয় না। এর পরেও যদি ।।।।।।াদের মতো আপনি বলতে চান যে ঈশ্বর মঙ্গলময় তবে আপনি এ কথা ।।।।তে চাইছেন যে ভালো-মন্দের এমন একটি অর্থ আছে যা ঈশ্বরের আদেশের ।।পর নির্ভর করে না, কেননা ঈশ্বরের আদেশ সর্বদাই ভালো, তা কখনই নিজের ।।।।ে মন্দ হতে পারে না। এরপরে যদি আপনি একথা বলতে চান যে ভালো-মন্দ ।।।।।টি এই ঈশ্বরের থেকে আসেনি কেননা ভালো-মন্দ ব্যাপারটি ঈশ্বরের ।।।।।। হওয়ায় যুক্তিগত দিক দিয়ে তা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে না। এবার উক্ত ।।।।র উপর নির্ভর করে আপনি অবশ্যই বলতে পারেন যে এই ঈশ্বরের পূর্ববর্তী ।।।। এক পরম ঈশ্বর আছেন যিনি এই জগতে প্রকৃত খ্রীস্টান— অথবা এই ।।।।।।য় কোন পরম ঈশ্বরকে না বসিয়ে কোন শয়তানকেও বসাতে পারেন। ।।।।।।ক্ত ঘটনাটিকে আমি অনেকটা বেশি বাস্তব বলে মনে করি। বস্তুত আমাদের ।।।।।।ত এই জগৎটি কোন এক মুহূর্তে শয়তানের দ্বারা তৈরি যে মুহূর্তে ঈশ্বর ।।।।ই দেখছিলেন না। এতক্ষণে এই ব্যাপারটির সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট ।।।।।।ভাবে বুঝেছি এবং যা বুঝেছি তা অবশ্যই আমার দ্বারা খণ্ডিত হবে না।

অন্যায় প্রতিকারার্থে যুক্তি

শেষমেশ আমরা নৈতিক যুক্তি সম্পর্কে একটি কৌতূহলপূর্ণ দিক খুঁজে পাই, সেটা হল, তারা বলে থাকেন যে জগতে মঙ্গল প্রতিষ্ঠার জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব একান্তভাবে প্রয়োজন। আমরা জানি যে বিশ্বের এই অংশে অন্যায়ের রাজত্ব এবং প্রায়শই কঠিন সংগ্রাম ও কখনও শয়তানের অগ্রগতি। কেউ এটা ঠিক বুঝতে পারে না এর মধ্যে কোনটা বেশি বিরক্তিকর। কিন্তু যদি আপনারা এই বিশ্বে ন্যায় বস্তুটিকে লাভ করতে চান তবে ব্যাপারটি এমন দাঁড়াবে যে আপনারা বস্তুত আপনাদের ভবিষ্যৎ জীবনে পৃথিবীর ভারসাম্যমূলক উপশম চাইছেন। এই জন্যে ঈশ্বর বিশ্বাসীরা বলে থাকেন অবশ্যই ঈশ্বর আছেন। ভবিষ্যতে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যেই পৃথিবীতে স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্ব একান্ত প্রয়োজন। এই যুক্তিটি বেশ কৌতূহলপূর্ণ। যদি ব্যাপারটিকে আপনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেন তবে আপনি অবশ্যই বলতে বাধ্য হবেন, আমি কেবলমাত্র এই জগৎকেই চিনি, বিশ্বের অন্যান্য অংশ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। সম্ভাব্যতার তত্ত্বের উপর নির্ভর করে যতটা সম্ভব যুক্তি প্রদর্শন করে একজন একথা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হবেন যে এই জগৎটি একটি সুন্দর নিদর্শন, যদি এখানে অন্যায় থাকে তবে বিশ্বের সর্বত্রই অন্যায়কে দেখা যাবে। ব্যাপারটি অনেকটা এইরকম, যেমন ধরুন আপনি একটি কমলালেবুর বাক্স আনলেন, যার ঢাকনাটা খুলে আপনি দেখলেন যে উপরিভাগের কমলালেবুর সবগুলিই খারাপ, তখন আপনি এরকম যুক্তি দেখিয়ে বলতে পারেন না যে 'ভারসাম্যের নিয়মানুযায়ী নীচে অবশ্যই ভালো কমলালেবু আছে।' আপনার বলা দরকার, 'সম্ভবত এই বাক্সের সব লেবুগুলিই খারাপ এবং একজন বৈজ্ঞানিক ব্যক্তি সমগ্র বিশ্ব সম্পর্কে এই ধরনের যুক্তি পোষণ করবেন। তিনি সম্ভবত বলবেন, 'এই জগতেই আমরা এত বেশি পরিমাণ অন্যায় দেখি যে তা দেখে মনে হয় না বিশ্বের কোন জায়গায় ন্যায় শাসন চলতে পারে এবং এই যুক্তিই যে নৈতিক যুক্তির উত্থাপন করে তা ভগবান বা অন্য ওইরকম কারুর অস্তিত্বকে স্বীকার করে না। তবে এই ধরনের বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তিগুলি, যেগুলি নিয়ে আমি এতক্ষণ আলোচনা করেছি, সেগুলি জনসাধারণকে খুব একটা প্রভাবিত করে না। যা মানুষকে ঈশ্বরের বিশ্বাসের দিকে পরিচালিত করে তা অবশ্যই এই সব বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তিগুলি নয়। বেশিরভাগ মানুষ ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে এই জন্য যে তারা শিশু বয়স থেকে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে শেখে এবং এটাই হল প্রধান কারণ।

আমি মনে করি বাঁচবার ইচ্ছাটাই সব থেকে শক্তিশালী কারণ। এটা এমন এক ধরনের অনুভব যা মানুষকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতো রক্ষণাবেক্ষণ করে। এই ধরনের অনুভবই মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে এমন মৌলিকভাবে প্রভাবিত করেছে যাতে সে ঈশ্বর বিশ্বাসী হতে বাধ্য হয়েছে।

খ্রীষ্টের চরিত্র

এখন আমি এমন একটি বিষয়ের উপর কথা বলতে চাই যে বিষয়টিকে নিয়ে খ্রীষ্টবাদীরা ঠিক মতো আলোচনা করেন না বলে আমার প্রায়ই মনে হয় এবং তা হল খ্রীষ্ট মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানী কিনা। এটা সাধারণত আগেই মেনে নেওয়া হয় যে আমরা ব্যাপারটিকে মেনে নেব কেননা ব্যাপারটা ওইরকম। কিন্তু ব্যাপারটিকে আমি নিজে এরকমভাবে মেনে নিই না। আমি মনে করি এমন অনেক বিষয় আছে যেখানে আমি খ্রীষ্টের সঙ্গে যতটা একমত হতে পারব ততটা একমত পেশাদার খ্রীষ্টানরাও হতে পারবে না। আমি জানি না খ্রীষ্টের সঙ্গে আমি সমগ্র পথটা হাঁটতে পারব কিনা, কিন্তু যে-কোন পেশাদার খ্রীষ্টানের থেকে অনেক বেশি পথ আমি তাঁর সঙ্গে যেতে পারব। আপনারা মনে রাখবেন যে তিনি বলেছিলেন, 'অশুভকে প্রতিরোধ কোর না, কেউ যদি তোমার গালে আঘাত করে, বাঁ গালটাও পেতে দিও।' এটা কোন নতুন আদর্শ বা ধারণা নয়। খ্রীষ্টের জন্মের পাঁচ ছ'শ বছর আগে লাওৎসে এবং বুদ্ধ এই ধরনের আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই ধরণের আদর্শ বস্তুত কোন খ্রীষ্টানই গ্রহণ করেন না। উদাহরণ হিসেবে আমি বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর (স্ট্যান্‌লি বালডুইন) কথা বলতে পারি যিনি নিঃসন্দেহে একজন নৈতিক খ্রীষ্টান, কিন্তু তাই বলে আমি আপনাদের কারুকে এই উপদেশ দেব না যে যান, গিয়ে তাঁর একটি গালে আঘাত করে আসুন। আমি মনে করি আপনি দেখতে পারেন যে মন্ত্রীমহাশয় এই ব্যাপারটিকে দৈহিক আঘাতরূপে ধরে নেবেন।

এখানে আর একটি দিক আছে যে দিকটিকে আমি দারুণ বলে মনে করি। আপনি মনে রাখবেন যে খ্রীষ্ট বলেছেন 'নিজেকে বিচার না করে অপরকে বিচার করতে যেও না'। আমি মনে করি না এই ধরনের আদর্শ খ্রীষ্টান দেশগুলোর আইন আদালতে জনপ্রিয়রূপে দেখতে পাবেন। আমার সময়ে আমি অনেক বিচারকদের চিনতাম যারা গোঁড়া খ্রীষ্টান ছিলেন এবং তারা এটাই জানেন না যে তারা যে কাজ করতেন তা খ্রীষ্টীয় আদর্শের ঠিক বিপরীত। খ্রীষ্ট আরও বলেন, 'তাকে তাই দাও যা সে তোমার কাছে চাইছে এবং তাকে যা ধার দিয়েছো তা তার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিও না।' এটা একটা সুন্দর আদর্শ।

আপনাদের সভাপতি মহাশয় আপনাদের একথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে এখানে কোনরকমভাবে রাজনৈতিক কথা চলবে না, কিন্তু আমাকে শেষ সাধারণ নির্বাচনের কথা বলতেই হচ্ছে। এই নির্বাচনটি সংঘটিত হয়েছিল এই আশায় যে এই নির্বাচনে আপনারা তাদের যে ধার দিয়েছিলেন তা তারা ফিরিয়ে দেবে। তাহলেই দেখুন আপনাদের সংরক্ষণশীল দল (Conservative party) ও

উদারনৈতিক দল (Liberal Party) এমন কিছু মানুষদের নিয়ে তৈরি যারা খ্রীষ্টীয় হয়েও খ্রীষ্টের শিক্ষাকে মানেন না, কেননা নির্বাচনের ফলাফলের মধ্যে দিয়েই তারা যা দিয়েছিল তার সবটাই জোর করেই ফিরিয়ে নিয়েছে।

খ্রীষ্টের আর একটি উপদেশের কথা আমি জানি যেটি আমার মতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আমার কিছু খ্রীষ্টান বন্ধুদের মধ্যে তাকে জনপ্রিয় রূপে দেখেনি। এই উপদেশে তিনি বলেছেন, 'যদি তুমি সঠিক হতে পার, তবে তোমার যা আছে তা নিয়ে যাও ও বিক্রি কর এবং দরিদ্রকে দাও।' এটা সত্যই একটা সুন্দর নীতি কিন্তু এই নীতিটিকে খুব একটা অনুসরণ কেউ করে না। আমি মনে করি, এই সব নীতিগুলি নিঃসন্দেহে মঙ্গলজনক, যদিও এগুলি অনুসরণ করে জীবনে বাঁচা ব্যাপারটি খুব কষ্টকর। বেঁচে থাকবার জন্য আমি নিজের জীবনেও এই নীতিগুলি অনুসরণ করি না, কিন্তু এটা অবশ্যই বলব যে আমার ব্যাপারটা ঠিক খ্রীষ্টানদের মতন নয়।

খ্রীষ্টের শিক্ষার ভ্রান্তিসমূহ

এই নীতিগুলোকে অতি উত্তম বলে স্বীকার করে নিলেও, আমি এ কথা বিশ্বাস করতে পারি না যে একজন মানুষকে চরম জ্ঞানী বলা যেতে পারে কিংবা খ্রীষ্টের ঈশ্বরতত্ত্বকে চরম রূপে দেখানো যেতে পারে, যেরকমভাবে দেখানো হয়েছে গস্‌পেলে।

যদিও এখানে কে ঐতিহাসিক প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত তা দেখানো আমার কাজ নয়, তবুও এ কথা বলতেই হয় যে ঐতিহাসিক দিক দিয়ে খ্রীষ্টের অস্তিত্ব কোনদিন ছিল কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে এবং তিনি থেকে থাকলেও তাঁর সম্বন্ধে কোন কিছুই জানি না, অতএব আমি এই ধরনের ঐতিহাসিক প্রশ্নের ধারে-কাছেও যেতে চাই না যা যথেষ্ট দুঃসাধ্য। আমি শুধু সেই খ্রীষ্ট সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই যাকে গস্‌পেলে বর্ণনা করা হয়েছে। গস্‌পেলের বর্ণনাগুলিকে যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করে কেউ একথা বলতে পারবে না যে সেখানে যা পাওয়া যায় সেগুলো খুব জ্ঞানদীপ্ত। একটা জায়গায় অবশ্য সে ভাববে যে সেই সময় জীবিত সব মানুষদের মরবার আগে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আবির্ভাব ওইসব মানুষদের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে এক গৌরবের মেঘমালার সৃষ্টি করেছিল। আমরা প্রচুর গ্রন্থ থেকে এই ঘটনার প্রমাণ পাই। উদাহরণস্বরূপ, তিনি বলেন, 'তোমরা ইজরায়েলের নগরীগুলোতে ততদিন পর্যন্ত যেতে পারনি যতদিন মানবের সন্তান না এসেছে।' তারপর তিনি আরও বলেন, 'সেখানে এমন একটি অবস্থা দাঁড়ালো, যে-অবস্থা ততদিন পর্যন্ত মৃত্যুর স্বাদ নিতে পারেনি যতক্ষণ না মানবের সন্তান তাঁর নিজের

ফিরে এসেছেন।' এইরকম উদাহরণ পাওয়া যায় যেখানে পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে তিনি বিশ্বাস করতেন যে সেই সময়ের জীবিত মানুষদের জীবদ্দশাতেই তিনি দ্বিতীয়বার ফিরে আসবেন। খ্রীষ্টের তৎকালীন অনুগামীদের এই বিশ্বাসই ছিল এবং তাঁর নৈতিক শিক্ষার এটাই ছিল মূলভিত্তি। যখন তিনি বলেন, 'পরের দিনের জন্য কোন চিন্তা রেখো না' এইরকম আরও কয়েকটি উদাহরণকে সামনে রেখে আমরা বলতে পারি, যে খ্রীষ্ট এই ধরনের কথাগুলো বলতে পেরেছিলেন এই কারণে, যে তিনি জানতেন তাঁর দ্বিতীয় আবির্ভাব খুব তাড়াতাড়ি ঘটতে চলেছে এবং এই কারণেই পার্থিব সব কারণগুলিকে অগ্রাহ্য করা যেতে পারে। বস্তুত, আমি কিছু খ্রীষ্টানদের চিনি যারা বিশ্বাস করে যে দ্বিতীয় আবির্ভাব আসন্ন ছিল। আমি এমন একজন ব্যক্তিকে চিনি যিনি তাঁর ধর্মসভাকে এই বলে শাসিয়ে ছিলেন যে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আবির্ভাব আসন্ন, কিন্তু সেই ধর্মসভায় উপস্থিত ব্যক্তিরা তাঁকে তাঁর বাগানে বৃক্ষরোপণ করতে দেখে যথেষ্ট সান্ত্বনা পেয়েছিল। সেই যুগের খ্রীষ্টানরা এই ব্যাপারটিকে যথার্থই বিশ্বাস করত এবং তার ফলে তারা তাদের বাগানে বৃক্ষেরোপণ থেকে বিরত থাকত, কেননা তারা খ্রীষ্টের কাছ থেকে এই বিশ্বাস গ্রহণ করতে পেরেছিল যে তাঁর দ্বিতীয় আবির্ভাব আসন্ন। উক্ত প্রসঙ্গে এ কথা পরিষ্কার করে বলা যেতে পারে যে অন্যান্য মানুষদের মতোই তিনি সর্বজ্ঞানী ছিলেন না এবং তিনি কখনই পরম জ্ঞানী ছিলেন না।

নৈতিক সমস্যা

এবার আপনি নৈতিক প্রশ্নে আসুন। খ্রীষ্টের নৈতিক চরিত্রকে নিয়ে আমার মনে একটি গভীর সন্দেহ আছে এবং সেটি হল যে তিনি নরকে বিশ্বাস করতেন। আমি নিজে এই ব্যাপারটিকে কিছুতেই মেনে উঠতে পারি না যে খ্রীষ্টের মতো একজন পূর্ণমানব এইরকম চিরশাস্তিকে বিশ্বাস করতে পারেন। সুসমাচারগুলোতে খ্রীষ্টের এমন অনেক ছবি আঁকা হয়েছে যেখানে তাঁকে চিরশাস্তিতে বিশ্বাসীরূপে দেখা যাচ্ছে এবং যে-কেউ এই ব্যাপারটি দেখতে পাবেন যে যারা খ্রীষ্টের বাণী প্রচারে কান দিচ্ছে না তাদের বিরুদ্ধে তাঁর সমর্থনকারীদের উন্মত্ততা। বাণী-প্রচারকদের কাছে এই রকম ঘটনা কোন নতুন ঘটনা নয়, কিন্তু এই ধরনের ঘটনা তাদের গুরুগিরির গুরুত্বকে বেশ কিছুটা হ্রাস করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে আপনি সক্রেটিসের আচরণ লক্ষ্য করেননি। যে-সব মানুষ সক্রেটিসের কথা শুনতো না তাদের কাছে তিনি ছিলেন অতিশয় নম্র ও ভদ্র। আমার মত অনুযায়ী এই ধরনের আচরণই একজন সাধু ব্যক্তির পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত আচরণ। উপরোক্ত প্রচারক গুরুদের কর্কশ আচরণ কখনই উপযুক্ত আচরণ হতে

পারে না। সম্ভবত আপনারা সবাই মনে রেখেছেন সেইসব কথাগুলোকে যা সক্রেটস তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে বলেছিলেন এবং সেই কথাগুলোও নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে যে কথাগুলো তিনি তাদের বলতেন যারা তাঁর কথা শুনতো না।

আপনারা দেখতে পাবেন যে তিনি তাঁর সুসমাচারগুলোতে বলেছেন, 'ওরে শয়তানগ্রস্ত, ওরে বিষধর সর্পের বংশধর, তোরা কি নরকের করাল গ্রাস থেকে কোনভাবে উদ্ধার পাবি?' এই ধরনের কথা তাদের বিরুদ্ধেই বলা হয়েছে যারা তাঁর প্রচারে কান দেয়নি। এই ধরনের কথাগুলিকে আমার মন কিছুতেই উত্তম বলে মেনে নিতে পারেনি। নরক সম্পর্কে এ ধরনের অনেক উদাহরণ আপনি সুসমাচারগুলোতে দেখতে পাবেন। পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে পাপ সম্পর্কিত জনপ্রিয় একটি গ্রন্থের কথা আমরা জানি, যেখানে বলা হয়েছে, 'যারা পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কোন কথা বলবে তারা এ-জগতেও যেমন স্থান পাবে না, তেমনি আগত জগতেও কোন স্থান পাবে না।' এই জনপ্রিয় গ্রন্থটিতে সেইসব মানুষদের জন্য এই জগতে অব্যক্ত সব নিদারুণ যন্ত্রণার উল্লেখ করা হয়েছে যারা কল্পনাতেও পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কোনরকম পাপ করে ফেলেছে এবং এটা চিন্তা করা হয়ে থাকে যে তারা ইহজগৎ বা পরজগৎ কোন জায়গাতেই ক্ষমা পাবে না। আমি সত্যই একথা চিন্তাও করতে পারি না যে চরিত্রের দিক থেকে খ্রীষ্টের মতো এমন একজন কোমল হৃদয়সম্পন্ন মানুষের পক্ষে জগতে এইরকম ভয় এবং প্রচণ্ড ভীতির সঞ্চার সম্ভব হয়ে থাকতে পারে।

এখানেই খ্রীষ্ট থেমে থাকলেন না। তিনি আরও বললেন, 'মানবের সন্তান তাঁর দেবদূত পাঠাবেন এবং তারা তাঁর রাজত্বে যা কিছু বিরক্তিকর সেইসব কিছুকে বার করে এক জায়গায় একত্রিত করবে, এবং শুধু তাদেরই নয়, যারা পাপ করেছে তাদেরও তারা এক জায়গায় করবে। তারপর তাদের জ্বলন্ত আগুনের চুল্লীতে নিক্ষেপ করবে। সেখানে শোনা যাবে দাঁত কিড়মিড় ও আর্তনাদের শব্দ। তিনি সেই আর্তনাদ ও দাঁত কিড়মিড়ের দিকেই এগিয়ে চলেছেন।' তাঁর সুসমাচারগুলোতে এই ধরনের কথা বার বারই এসেছে। এটা পাঠকদের কাছে স্পষ্ট যে এই ধরনের দাঁত কিড়মিড় ও আর্তনাদের সম্পর্কে অনুতাপ করে এক ধরনের সুখ লাভ করা যায়। এই ধরনের অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যেমন আপনাদের অবশ্যই মনে আছে সেই ভেড়া ও ছাগলের উপাখ্যানের কথা। ভেড়া ও ছাগলদের দ্বিতীয়বার ভাগ করতে এসে তিনি ছাগলদের বলেন, 'ওরে অভিশপ্তের দল, দূর হ' আমার সামনে থেকে, এবং অনন্ত আগুনে পুড়ে মর।' এরপর তিনি আরও বলেন, 'যদি তোমার হাত তোমাকে বিরক্ত করে তবে তাকে

...ল যেখানে, দু'হাত থেকে যদি সেই নরকে যেতে হয় যে নরকের আগুন কখনও ...ক না, উষ্ণতা কখনও হ্রাস পায় না তপ্ততা কখনও ঠাণ্ডা হয় না, তার থেকে ...নক ভালো দু'হাত কেটে অঙ্গহীনতার জীবন কাটানো, বার বার তিনি এই কথা ...লছেন। আমি অবশ্যই বলব যে এই ধরনের নীতি, যা পাপ করার জন্য নারকীয় ...কনের শাস্তি দেয়, তা নিষ্ঠুর নীতি। এই ধরনের নীতি জগতে নিষ্ঠুরতাকে বৃদ্ধি ...রেছে এবং যুগের পর যুগ ধরে নিষ্ঠুর অত্যাচারের রাজত্ব চালিয়েছে। ...ত্যাচারের খ্রীষ্টকে যদি আপনারা তাঁর যুগের সময় থেকে পর্যবেক্ষণ করেন তবে ...খবেন যে তিনি এরজন্য আংশিক হলেও দায়ী।

এধরনের আরও অন্যরকম গল্প পাওয়া যায় যেগুলো অপেক্ষাকৃত কম ...ত্বপূর্ণ। গাদারেনের শূকরের উপাখ্যান আর একটি দৃষ্টান্ত। সেখানে ছোট ...করদের মধ্যে শয়তানকে স্থাপন করে তাদের পাহাড় থেকে ছুটিয়ে নামিয়ে ...দের দিকে নিয়ে যাওয়াটা মোটেই কোন সহৃদয়তার পরিচয় নয়। আপনারা ...শ্যই মনে রাখবেন যে তিনি সর্বশক্তিমান এবং তিনি ইচ্ছে করলে শয়তানকে ...ড়িয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা না করে ছোট্ট শূকরদের মধ্যে শয়তানকে ...ঠালেন। এছাড়াও ডুমুরগাছ নিয়েও একটি কৌতূহলোদ্দীপক গল্প আছে, যে ...টা আমাকে সর্বদাই বিমূঢ় করে রাখে : 'সে ছিল ক্ষুধার্ত এবং দূরে পাতায় ভরা ...কটি ডুমুরগাছ দেখে খুশী হয়ে সেখানে এলো এই আশায় যদি সেখানে কিছু ...য়া যায়। গাছের কাছে এসে সে দেখলো গাছের পাতা ছাড়া আর কিছুই নেই, ...কেননা সেই সময়টা ডুমুর ফলার সময় ছিল না। এই জন্য যীশু ডুমুরগাছকে ...শাপ দিয়ে বললেন, "কোন মানুষ এবার থেকে তোমার ফল খাবে না ...খনও।"... পিটার তাঁকে বললেন, "প্রভু দেখুন, ঐ যে ডুমুরগাছ, তোমাদের ...ধ্যে যারা অভিশপ্ত তারা দূর হও।" এই গল্পটি সত্যই একটি কৌতূহলোদ্দীপক ...ল্প, কেননা বছরের সেই সময় ডুমুর ফলার সময় ছিল না, এই কারণে ...কোনভাবেই আপনারা ডুমুরগাছকে দোষারোপ করতে পারেন না। আমি নিজে ...বতে পারি না যে যীশু ইতিহাসে পরিচিত তিনি কিছু মানুষের থেকে জ্ঞানে ...থবা ধর্মে সবচেয়ে বড় ছিলেন। আমি মনে করি বুদ্ধ ও সক্রেটস এই ব্যাপারে ...র চেয়ে অনেক বড় ছিলেন।

আবেগের কারণ

আমি আগেই বলেছি, মানুষ কেন ধর্মকে গ্রহণ করে তার প্রকৃত কোন কারণ ...া থাকার ফলে যুক্তি-তর্কের দ্বারা কিছু করা যাবে বলে আমি মনে করি না। তারা ...নমাত্র আবেগের বশবর্তী হয়ে ধর্মকে গ্রহণ করে। কোন একজনকে প্রায়ই ...লা হত যে ধর্মকে আক্রমণ করাটা একটা বিরাট ভুল, কেননা ধর্ম মানুষকে

পুণ্যবান করে তোলে। এরকমই আমাকে বলা হয়, কেননা আমি ধর্মকে লক্ষ্যই করি না। আপনারা অবশ্যই জানেন, উক্ত বিষয়ের উপর যুক্তিকে নিয়ে ব্যঙ্গকাব্যে রচিত স্যামুয়েল বাটলারের গ্রন্থ এরিউহন রিভিজিটেড-এর কথা। আপনারা মনে রাখবেন যে এরিউহনে (Erewhon) হিগ্‌স নামে একটি চরিত্র আছে যে একটি দূরবর্তী দেশে পৌঁছলো। সেখানে কিছুদিন কাটাবার পর সে সেই দেশ থেকে বেলুনে চড়ে পালালো। কুড়ি বছর পর সে সেই দেশে ফিরে এলো এবং একটি নতুন ধর্মকে দেখলো, যে ধর্মে সেই পূজিত হচ্ছে সূর্যপুত্রের নামে এবং এই প্রবাদবাক্য সেখানে প্রচলিত ছিল যে সে স্বর্গে আরোহণ করেছে। সে দেখলো তার সেই আরোহণের দিনটিকে সেখানে উৎসব হিসাবে পালিত হতে। সে শুনলো দুজন অধ্যাপক হ্যাঙ্কি ও প্যাঙ্কি বলছে যে তারা মানুষ হিগ্‌সের উপর কখনও তাদের চোখ রাখতে পারে না এবং কোনদিন পারবেও না বলে তারা আশা করে। কিন্তু সূর্যপুত্রের ধর্মে তারাই ছিলেন উচ্চ পুরোহিত। এতে হিগস্ খুব রেগে গেল। সে তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আমি তোমাদের সমস্ত প্রবঞ্চনার কথা জানাতে যাচ্ছি এবং এরিউহনের সব মানুষদের আমি বলে দেব যে দেখ আমাকে, আমি সেই মানুষ হিগ্‌স এবং আমি বেলুনে চড়ে চলে গিয়েছিলাম।' তখন তাকে বলা হল, 'তুমি এরকম কাজ অবশ্যই কোর না। এদেশের সব নৈতিক আদর্শগুলো এই পৌরাণিক গাথার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। একবার যদি তারা জানে যে তুমি স্বর্গে আরোহণ করনি তবে তারা বদমাস হয়ে যাবে।' সে তাদের সেই কথা শুনলো এবং শান্তভাবে চলে গেল।

এটাই হল ব্যাপার যে আমরা যদি খ্রীষ্টান ধর্মকে আঁকড়ে না ধরি তবে আমরা সবাই খারাপ হয়ে যাবো। আমার কাছে মনে হয়, যে মানুষেরা এই ধর্মটাকে আঁকড়ে ধরেছে তাদের বেশিরভাগই ভীষণ বদমাস। আপনারা একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা দেখতে পাবেন, যে কোন যুগে ধর্ম যত তীব্র হয়েছে এবং ধর্মশাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস মানুষের যত দৃঢ় হয়েছে, ততই সেখানে নিষ্ঠুরতা বেড়েছে এবং সামাজিক সম্পর্ক ও দৈনন্দিন জীবনের অবস্থা ততই খারাপ হয়ে উঠেছে। বিশ্বাসের সেই সব যুগগুলোতে, যখন মানুষ সত্যই খ্রীষ্টধর্মকে উক্ত ধর্মের সব কিছু সমেত বিশ্বাস করত, তখন সেই প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধ মতো দমনের জন্য স্থাপিত বিচারালয় যেমন ছিল, তেমন ছিল তার অত্যাচার। সেই সময় বহু হতভাগী মহিলাদের ডাইনি সন্দেহে আগুনে পুড়ে মরতে হয়েছিল। ধর্মের নামে মানুষের উপর সমস্ত রকমের অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করা হয়েছিল।

জগতের দিকে তাকিয়ে দেখলে আপনারা দেখতে পাবেন, যখনই মানুষের অনুভবে যৎকিঞ্চিত অগ্রগতি ঘটেছে, অপরাধের আইনে যখনই কোন উন্নতি

যখনই যুদ্ধ হ্রাস করার কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, বা যখনই বর্ণ-বৈষম্যকে দূর করার কোন চেষ্টা করা হয়েছে, যখনই দাসত্বকে হ্রাস করবার চেষ্টা করা হয়েছে বা জগতে প্রতিটি নৈতিক অগ্রগতি যখনই ঘটেছে, তখনই জগতের সবচেয়ে সংগঠিত গীর্জা সর্বদা তার বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছে। আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই কথাই বলব যে খ্রীষ্টধর্ম, যা তার গীর্জাগুলোকে ভিত্তি করে সংগঠিত, তা সর্বদা এখনো পর্যন্ত জগতের নৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রধান শত্রু।

কেমনভাবে গীর্জাগুলো অগ্রগতিকে বাধা দিয়েছে

আপনারা হয়ত ভাবছেন যে এখনো গীর্জাগুলো অগ্রগতিকে বাধা দিয়ে যাচ্ছে বলে আমি খুব বাড়াবাড়ি করছি। কিন্তু খুব বাড়াবাড়ি করছি বলে আমি মনে করি না। আচ্ছা, একটা ঘটনার কথা বলা যাক। যদি আমি ঘটনাটার কথা উল্লেখ করি তবে আপনারা আমার সঙ্গে অবশ্যই তা সহ্য করবেন, কেননা ঘটনাটা খুব আনন্দদায়ক নয়। গীর্জা কোন একজনকে সত্য বলতে বাধ্য করেছিল যেটা খুব একটা আনন্দদায়ক ছিল না। ধরুন আজকের যে জগতে আমরা বাস করছি সেখানে একটি অভিজ্ঞ মেয়ে একজন সিফিলিটিক (যৌনরোগাক্রান্ত) মানুষকে বিয়ে করেছিল। এই ঘটনায় ক্যাথলিক গীর্জা বলেছিল, এটা খ্রীষ্টধর্মের একটা অনবদ্য আদর্শ। তোমাদের অবশ্যই সারা জীবনের জন্য একসঙ্গে থাকতে হবে। এই মহিলাকে একটি সিফিলিটিক শিশুকে জন্ম দেওয়ার থেকে বিরত হবার জন্য কোনরকম ব্যবস্থা নিতে দেওয়া হয়নি। এই ঘটনাটা ঘটেছিল গীর্জার ঐ কথার জন্যই। আমি মনে করি এই ঘটনাটা ছিল জঘন্য নিষ্ঠুরতা এবং যাদের প্রাকৃতিক অন্তর্দৃষ্টি শাস্ত্রের নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ নয়, সমস্ত দুঃখ-কষ্টের প্রতি যাদের মানবিক চরিত্র একেবারেই মরে যায়নি, তারা এই ধরনের ঘটনাকে সঠিক ও যথার্থ বলে চলতে দেওয়া উচিত বলে মনে করবে না।

এটা কেবলমাত্র একটি উদাহরণ। এখনো, বর্তমানে অনেক পথেই গীর্জাগুলো মানবিক আদর্শের নামে সমস্ত রকমের মানুষকে নানারকম অনুচিত ও অপ্রয়োজনীয় কাজের দিকে ঠেলে দেয়। এ বিষয়ে আরও বলতে গেলে, আমাদের পূর্বের আলোচনাকে টেনে এনে আবার বলতে হয়, যে-কোন পথের অগ্রগতি এবং উন্নতি যা জগতের দুঃখ-কষ্টকে হ্রাস করতে পারে, তারই বিরুদ্ধাচরণ করে আসছে এই গীর্জাগুলো। কারণ এরা তাদের ইচ্ছামত কিছু নৈতিক আদর্শকে গড়ে তুলেছে। এই আদর্শগুলোকে তারা তাদের সংকীর্ণ শাসনের দ্বারা পরিচালিত করে থাকে, যা কোনভাবেই মানুষকে সুখী করে তুলতে পারে না। যখন আপনারা বলে থাকেন এটা বা ওটা অবশ্যই করা উচিত, কেননা তা মানুষের সুখের জন্যই বলা

হয়েছে, তখন তারা মনে করে যে সেগুলো করে কোন লাভই নেই। নীতিকথার সঙ্গে মানুষের সুখের সম্পর্কটা কী? নীতিকথার বিষয়গুলি মানুষকে কখনই সুখী করতে পারে না।

ধর্মের ভিত্তিকে ভয় করুন

আমি মনে করি প্রাথমিকভাবে ধর্ম প্রধানত ভয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এটা আংশিকভাবে অজানার ভয় এবং আংশিকভাবে আপনার সেই অনুভব-প্রবণতা যার দ্বারা আপনি এমন ভাবেন যে আপনার কিছু দরদী ভাই আছে যারা আপনার যে কোন বিপদে ও সমস্যায় আপনার পেছনে দাঁড়াবে। ভয়টাই হল আসল ভিত্তি- রহস্যের ভয়, পরাজয়ের ভয়, মৃত্যুর ভয়। ভয় হল নিষ্ঠুরতার জনক-জননী। এই জন্যেই এটা বললে খুব একটা আশ্চর্য শোনাবে না যে ধর্ম এবং নিষ্ঠুরতা পরস্পরের হাত ধরে চলে। এটার কারণ, ভয়ই হল নিষ্ঠুরতা ও ধর্ম এই দুই বস্তুর আসল ভিত্তি। এই জগতের বস্তুকে বুঝতে আমরা এখন অল্প চেষ্টা করতে পারি, এবং সেই বিজ্ঞানের সাহায্যে উক্ত বস্তুর উপর অল্প-স্বল্প প্রভুত্বও করতে পারি, যে বিজ্ঞান খ্রীষ্টধর্ম, গীর্জা ও সব পুরোনো ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে প্রতি পদক্ষেপে লড়াই করে এগিয়ে এসেছে। বিজ্ঞান এই অতি নীচ ভীতি থেকে মনুষ্যজাতিকে উদ্ধার করে আমাদের সাহায্য করতে পারে যে ভীতির অধীনে সে যুগের পর যুগ ধরে বেঁচে এসেছে। বিজ্ঞান আমাদের শিক্ষা দিতে পারে এবং আমি মনে করি, আমাদের হৃদয়ও আমাদের এই শিক্ষা দিতে পারে, যাতে আমরা আর বেশি দিন কাল্পনিক সহযোগিতার আশায় বসে না থাকি, যাতে আর আমরা আকাশে কানাগলি খুঁজে না মরি, বরং আমরা আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা দিয়ে জগৎকে বাসযোগ্য করে তুলবো সেই জায়গার পরিবর্তে যে জায়গায় গীর্জাগুলো শত শত বছর ধরে জগৎকে পৌঁছে দিয়েছে।

আমাদের অবশ্যই কী করা উচিত

আমাদের অবশ্যই নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে এবং জগৎকে খোলা চোখে দেখতে হবে। খোলা চোখে দেখতে হবে জগতের ভালো দিক, মন্দ দিক, জগতের সৌন্দর্য এবং কুৎসিত দিকসমূহ। জগৎকে জগতের মতোই দেখতে হবে এবং তার জন্য ভয় পেলে চলবে না। বুদ্ধির দ্বারা জগৎকে জয় করতে হবে। জগৎ থেকে উঠে আসা ভয়গুলোর দৌরাত্ম্যে দাসত্বকে মেনে নিলে আর চলবে না। ঈশ্বর সম্পর্কে সমগ্র ধারণাটি জগৎজোড়া প্রাচীন স্বৈরাচারী কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। মুক্ত মানুষের ক্ষেত্রে এই ধরনের কল্পনা নিছক বাতুলতা মাত্র। যখন আপনারা

... যে মানুষ গীর্জায় গিয়ে নিজেদের শোচনীয় পাপী বলে ছোট করে, বা এ ... ধরনের কাজ শুধু নিন্দনীয়ই নয়, তা মানুষের মতো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ... পক্ষে উপযুক্তও নয়। আমাদের উঠে দাঁড়ানো উচিত এবং সম্মুখ জগৎকে ... ভাবে দেখা উচিত। জগতের ভালো সম্পর্কে আমরা যতটা করতে পারি ... আমাদের করা উচিত। যদি যতটা ভালো চাইলাম ততটা ভালো না-ও ... যুগের পর যুগ ধরে ওরা যা করে এসেছে তার থেকে অপেক্ষাকৃত ... করে বলে আশা করা যায়। একটি মঙ্গলময় জগৎ সৃষ্টি করতে চাই জ্ঞান, ... সাহস। ঘৃণ্য অতীতের ধ্বজা আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকলে আর চলবে না, ... যুগ আগের অজ্ঞ মানুষদের মুক্তবুদ্ধি প্রসূত কথার জালে আটকে ... চলবে না। এর জন্য প্রয়োজন ভয়হীন দৃষ্টিভঙ্গি এবং মুক্তবুদ্ধি। এর জন্য ... ভবিষ্যৎ গঠনের আশা, যে অতীত মৃত তার দিকে মুখ করে বসে থাকলে ... চলবে না, যে অতীতকে আমরা বিশ্বাস করি তাকে অতিক্রম করে চলে যাবে ... কেননা আমাদের বুদ্ধি সৃষ্টি করতে পারে।

২

সভ্যতায় ধর্মের কি কোন কার্যকরী অবদান আছে?

ধর্ম সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি লুক্রেতিউসের মতো। আমি মনে করি এটা এমন একটা রোগ যা ভয় থেকে জন্মগ্রহণ করে থাকে এবং যা মানবজাতির শোচনীয় দুর্দশার উৎস। যদিও, আমি একথা অস্বীকার করতে পারি না যে মানবসভ্যতায় এর কিছু অবদান আছে। প্রাচীন যুগে একটি ক্যালেন্ডার তৈরিতে সাহায্য করেছে। এটি ইজিপ্সীয় পুরোহিতকে এমন সযত্নে সূর্যগ্রহণের সময় নির্ধারণ করতে শিখিয়েছিল যাতে তারা তার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম হয়। এর এই দুটি অবদানের কথা জানাতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত, কিন্তু অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আমি বেশি কিছু জানি না।

ধর্ম শব্দটি বর্তমানে খুব হাল্কা অর্থে ব্যবহৃত হয়। চরম প্রোটেস্টান্টবাদের প্রভাবে কিছু মানুষ ধর্ম শব্দটিকে খুব ব্যক্তিগত দৃঢ়বিশ্বাস, যেমন নৈতিক আদর্শ প্রভৃতি অর্থে ব্যবহার করে থাকে অথবা তারা ধর্ম বলতে মহাবিশ্বের প্রকৃতিকে বোঝে। শব্দটির এই ধরনের ব্যবহার সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। প্রাথমিকভাবে ধর্ম হল একটি সামাজিক ঘটনা। বহু আচার্যের নিজ নিজ দৃঢ়বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই গীর্জাগুলির উদ্ভব ঘটেছে, কিন্তু যে-সব আচার্য এই গীর্জাগুলিকে প্রতিষ্ঠা করেছিল, তারা কদাচিৎ গীর্জাগুলির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। অথচ যে মনুষ্য-গোষ্ঠীগুলোর উপর গীর্জাগুলি বেড়ে ওঠে সেখানে তাদের প্রভাব অপরিসীম। পাশ্চাত্য সভ্যতার সদস্যদের ব্যাপারে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা বলা যাক। সুসমাচারে খ্রীষ্টের যে উপদেশগুলো দেখা যায় তা সেখানকার খ্রীষ্টীয় নীতিশিক্ষার থেকে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই স্বতন্ত্র। খ্রীষ্টীয়বাদের যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেটি হল, সামাজিক ও ঐতিহাসিক দিক দিয়ে খ্রীষ্টীয়বাদ খ্রীষ্টের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে গীর্জার উপর এবং যদি আমরা সামাজিক শক্তি হিসাবে খ্রীষ্টীয় শক্তি বা ধর্মকে বিচার করবার চেষ্টা করি তবে তার উপাদান খুঁজতে আমরা কখনই সুসমাচারের দ্বারস্থ হব না। খ্রীষ্ট শিক্ষা দিয়েছেন যে আপনার উচিত আপনার সম্পদ গরীবকে দেওয়া, এর জন্য আপনাকে যুদ্ধ করতে হবে না। আপনাকে গীর্জার দ্বারস্থ হতে হবে না এবং ভেজাল বস্তু বিক্রয়ের জন্য কাউকে আপনাকে শাস্তিও দিতে হবে না। কিন্তু এই ব্যাপারে প্রোটেস্টান্ট বা ক্যাথলিক কোন সম্প্রদায়ই খ্রীষ্টের উপদেশ অনুসরণ করার কোন ইচ্ছাই পোষণ করে না। এটা সত্য যে কিছু ফ্রানসিসকীয় সদস্যরা খ্রীষ্টের বারজন শিষ্যের আদর্শমণ্ডিত ও কষ্টসহিষ্ণু জীবনের নীতি দর্শিয়ে মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা

করেছে, কিন্তু পোপ এই ধরনের নীতি প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধ-আদর্শ বলে নিন্দা করেছেন। আমরা যদি খ্রীষ্টের এই উপদেশটিকে নিয়ে পর্যালোচনা করি, যেমন, 'একজনকে বিচার না করে অপরকে বিচার করতে যেও না' তাহলে আপনারা নিজেদেরকেই জিজ্ঞাসা করুন যে এই উপদেশটি অনুসরণ করলে প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধ-মতো দমনের জন্য ঐ বিচারালয়ের কি অবস্থা হবে এবং কু-ক্লাক্স ক্লান (Ku-Klux-klan)-এর কি পরিণতি দাঁড়াবে।

খ্রীষ্টধর্মের বেলায় যে ব্যাপারটি সত্য তা বৌদ্ধধর্মের বেলাতেও একইভাবে প্রযোজ্য। বুদ্ধ ছিলেন অমায়িক ও আলোকিত। মৃত্যুশয্যায় বুদ্ধকে শুয়ে থাকতে দেখে তাঁর শিষ্য তাঁকে অমর ভাবাতে তিনি তার দিকে তাকিয়ে হেসেছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধ পৌরোহিত্য, এখন যা বিদ্যমান, উদাহরণস্বরূপ তিব্বতের কথাই ধরা যাক সেখানে অজ্ঞেয়বাদীদের স্বৈরাচার ও নিষ্ঠুরতা এক চরম আকার ধারণ করেছে।

গীর্জা ও তার স্থপতির মধ্যে এই স্বতন্ত্রতা কোন দৈবাৎ ঘটনা নয়। যখন কোন মানুষ পরম সত্য সম্পর্কে কিছু বলে, তখন কিছু পারদর্শী মানুষ তা ব্যাখ্যা করতে পারে এবং অব্যর্থ ভাবে তারা অর্জন করে ক্ষমতা, কেননা তারা সত্যের চাবিকাঠি সম্পর্কে জানে। সমাজের যে-কোন কুলীন জাতের মতোই তারা তাদের স্বার্থে সেই ক্ষমতা ব্যবহার করে। কিন্তু এক্ষেত্রে তারা কুলীন জাতের থেকেও একটি বিষয়ে এগিয়ে থাকে, আর তা হল অপরিবর্তনীয় সত্যের ব্যাখ্যা করার ব্যবসা করা। তারা যা প্রকাশ করে তা সবার ক্ষেত্রে ও সব কিছুর ক্ষেত্রে যথার্থ ধরা হয়। ফলে, অনিবার্যরূপে তা সমস্ত বুদ্ধিদীপ্ত ও নৈতিক অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। গীর্জা গ্যালিলিও ও ডারউইনের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, আমাদের যুগে ফ্রয়েডের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যে সময়টাতে গীর্জা তার চরম ক্ষমতায় আসীন ছিল সেই সময়টাতে সে সমস্ত বুদ্ধিদীপ্ত জীবনের বিরুদ্ধাচরণ করবার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌঁছেছিল। পোপ গ্রেগরী দ্য গ্রেট কোন এক বিশপকে একটি চিঠি লেখেন, যে চিঠিটি তিন শুরু করেন এই ভাবে যে 'আমাদের কাছে এমন একটি সংবাদ এসে পৌঁছেছে যে সম্বন্ধে কথা বলতে গেলে লজ্জায় লাল হয়ে উঠতে হয়। আর তা হল, আপনি আপনার কিছু বন্ধুর কাছে ব্যাকরণের ব্যাখ্যা করেছেন।' এই বিশপকে প্রধান ধর্মগুরুর কর্তৃত্বের ফলে ঐ রকম নীচ শ্রম থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হতে হয়েছিল, ফলস্বরূপ নবজাগরণের আগে পর্যন্ত ল্যাটিন সাহিত্যের উদ্ধার সম্ভব হয়ে ওঠেনি। শুধুমাত্র বুদ্ধিগত বিষয়ের জন্যই নয়, দৈনিক বিষয়ের জন্যও ধর্ম অনিষ্টকর (it is not only intellectuallly, but also normally, that religion is permicious)। আমি বলতে চাইছি যে, ধর্ম যে নৈতিক

শিক্ষার তালিকা প্রদান করে থাকে তাকে অনুসরণ করে মানুষ কখনই সুখী হতে পারে না। কিছু বছর আগে, যখন জার্মানীর রাজ-পরিবার তাদের ব্যক্তিগত জমিকে আগের মতোই ব্যবহার করতে পারবে কিনা সেই মতের উপর নির্বাচন করা হয়েছিল, তখন সেখানকার গীর্জা এই মর্মে ঘোষণা করেছিল যে এই ধরনের ব্যবস্থা যার দ্বারা রাজ-পরিবার বঞ্চিত হবে তা খ্রীষ্টীয় শিক্ষার বিরোধী। এ'কথা সবাই জানে যে যখন তারা দাসত্ব প্রথা বিলোপ করতে চেয়েছিল তখন গীর্জাগুলো তার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং বর্তমানে কিছু কিছু বহুল বিজ্ঞাপিত ব্যতিক্রম ছাড়া গীর্জাগুলো অর্থনৈতিক সুবিচারের প্রতিটি পদক্ষেপে বিরুদ্ধাচরণ করে আসছে। পোপ সর্বতোভাবে সমাজতন্ত্রের নিন্দা করেছেন।

খ্রীষ্টীয়বাদ ও যৌনতা

খ্রীষ্টানধর্মের সব থেকে জঘন্য বৈশিষ্ট্যটি হল, যৌনতার প্রতি এর আচরণ এতই ব্যাধিগ্রস্ত ও অপ্রাকৃতিক যে তা একমাত্র রোম সাম্রাজ্যের পতনের সময় সভ্য জগতের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছিল তার সঙ্গে তুলনীয়। সেই সময়ের আঙ্গিকে উক্ত আচরণকে বিচার করলে তবেই তার স্বরূপ বোঝা যাবে। আমরা অনেক সময় শুনে থাকি বা বলে থাকি যে খ্রীষ্টীয়বাদ মহিলাদের মর্যাদাকে উন্নত করেছে। কিন্তু এর থেকে স্থূল ঐতিহাসিক বিকৃতি আর কখনও সম্ভব হয়েছে বলে মনে হয় না। আমাদের সমাজে মহিলারা কখনও একটা সহনীয় অবস্থা ভোগ করতে পারে না। তাদের ক্ষেত্রে এটাকে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ধরা হয়ে থাকে যে কঠোর নৈতিক আদর্শগুলো কখনই মহিলাদের লঙ্ঘন করা উচিত নয়। মঠের সাধুদের কাছে প্রাথমিকভাবে মহিলারা চিরকালই প্রলোভনের যন্ত্র হিসাবে পরিগণিত। তারা মহিলাদের প্রধানত অশুদ্ধ লালসার প্রেরণা বলে ভাবে। গীর্জার শিক্ষানুযায়ী এখনো কৌমার্য উত্তম বলে বিবেচিত, কিন্তু যারা এই অবস্থাটাকে অসম্ভব বলে মনে করবে তাদের জন্য বিবাহকে অনুমোদন করা হয়েছে। 'জ্বলে-পুড়ে মরার থেকে বিবাহ করা ভাল,' সেন্ট পল নিষ্ঠুরভাবে কথাটি বলেছেন। বিবাহ-নীতিকে তাচ্ছিল্য করে, এবং বেছে বেছে সৌন্দর্য ও কলা বিষয়ক সমস্তরকম জ্ঞানকে বাদ দিয়ে, গীর্জাগুলো যেটুকু যৌনাচারকে বিবাহিত জীবনের জন্য নিশ্চিত করে অনুমোদন দিয়েছে তাতে আনন্দ যৎকিঞ্চিৎ কিন্তু যন্ত্রণা অধিক। এই একই ধরনের অত্যাচার দেখা যায় জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধিতার ক্ষেত্রে। বছরের পর বছর শিশুর জন্ম দিয়ে শুকিয়ে না মরলে ধরে নেওয়া হয়ে থাকে যে সে তার বিবাহিত জীবনে খুব বেশি আনন্দ লাভ করতে পারেনি। এই কারণেই জন্মনিয়ন্ত্রণকে কোনভাবেই উৎসাহ দেওয়া হয়নি।

খ্রীষ্টীয়বাদের সঙ্গে পাপের যে ধারণা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত তা অস্বাভাবিক ক্ষতি করে থাকে, যেহেতু এই ধারণা অন্য দিক দিয়ে তাকে সেই মর্ষকামী হতে বাধ্য করে যে মর্ষকামকে তারা আইনত, এমনকি মহান বলে মনে করে। উদাহরণস্বরূপ, সিফিলিস প্রতিরোধের প্রশ্নকেই নেওয়া যাক। এই রোগের বিরুদ্ধে আগের থেকে কোন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিয়ে এই ছোঁয়াচে রোগের প্রতিকারকে কোন আমলই দেওয়া হয়নি। যদিও এই ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে খ্রীষ্টীয়রা তাদের ব্যাপ্ত জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে ঘটনাটিকে মঙ্গলময় বলে থাকে এই কারণে যে তারা মনে করে পাপীর শাস্তি পাওয়া উচিত। এই ব্যাপারটিকে মঙ্গলময় মনে করে তারা এই ইচ্ছাও পোষণ করে থাকে যে এই শাস্তিটি পাপীর স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যেও যেন বিস্তৃত হয়। বর্তমান পৃথিবীতে এই মুহূর্তে বহু শিশু এই ছোঁয়াচে মারাত্মক সিফিলিস রোগে প্রাণ-মরণ লড়াই করে চলেছে, কিন্তু তাদের এমনভাবে জন্মানোর কথা ছিল না যদি না খ্রীষ্টীয়রা পাপীদের শাস্তি দিতে চাইত। আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না যে পাপীয় নীতি এই ধরনের শয়তানি নিষ্ঠুরতার দিকে মানুষকে ঠেলে দেয় তা নৈতিক আচরণের উপর কোনরকম শুভ প্রভাব ফেলতে পারে।

এই বিষয়টি কেবলমাত্র যৌন আচরণের ক্ষেত্রেই সত্য নয়, যৌন বিষয়ের ক্ষেত্রেও একইভাবে সত্য। এর ফলে, এ'কথা বলা যেতে পারে যে খ্রীষ্টীয়দের আচরণ মানবকল্যাণের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক। নিরপেক্ষভাবে যখনই কেউ এই বিষয়টি ভাবতে চায় তখন তাকে এই দেখে কষ্ট পেতে হয় যে যৌন বিষয়ের উপর গোটা নির্বুদ্ধিতা যা গোঁড়া খ্রীষ্টীয়দের পরিচালিত করে ও যুবক-যুবতীদের শিক্ষার ব্যাপারে তা তাদের শারীরিক ও মানসিক দু-দিকের জন্যই মারাত্মক বিপজ্জনক এবং এই ক্ষতি তাদের উপরও বর্তায় যারা উক্ত বিষয়ের উপর তাদের অযথার্থ (improper) আলোচনা শুনে জ্ঞান অর্জন করে থাকে। যেমন শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি প্রায়শই ঘটে, এর ফলে তারা যৌনতাকে কুৎসিত ও হাস্যাস্পদ বলে মনে করে। জ্ঞান চির-অনাকাঙ্ক্ষিত— এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে কোন পরিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে বলে আমি মনে করি না। জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা আমি পছন্দ করি না, তা যে-কোন মানুষের ক্ষেত্রেই হ'ক। বিশেষত যৌন জ্ঞানের বিষয়ের স্বপক্ষে বহু ওজনদার যুক্তি পাওয়া যাবে যা অন্যান্য জ্ঞানের ক্ষেত্রের চেয়েও বেশি। কোন বিষয়ের উপর অনুশীলনকারী ব্যক্তি যতটা বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে ততটা কোন অনুশীলনহীন নিরোধ ব্যক্তির দ্বারা সম্ভব নয়। তাই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে পাপের ধারণা গড়ে তোলাটা একটা হাস্যাস্পদ ব্যাপার কেননা যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত কৌতূহল থাকবেই।

প্রত্যেক বালকই ট্রেনের ব্যাপারে আগ্রহান্বিত। ধরা যাক আমরা তাকে বললাম ট্রেনের ব্যাপারে আগ্রহ থাকাটা একধরনের পাপ। মনে করা যাক, ট্রেনে থাকাকালীন আমরা তার চোখ কাপড় দিয়ে বেঁধে দিলাম, অথবা যখন সে কোন রেল স্টেশনে তখন ঐ একই কাজ করলাম। মনে করা যাক, তার উপস্থিতিতে আমরা কখনও 'ট্রেন' শব্দটি তার সামনে উচ্চারণ করলাম না এবং সেটি কিভাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয় সে বিষয়ে আমরা তার কাছে এক অভেদ্য রহস্য বজায় রাখলাম। এর ফলে এই দাঁড়াবে না যে সে ট্রেনের ব্যাপারে তার আগ্রহকে কমিয়ে দেবে, উপরন্তু দেখা যাবে ট্রেনের ব্যাপারে আগের তুলনায় তার আগ্রহ আরও বেড়ে যাবে, কিন্তু এক বিষণ্ন পাপের চেতনায় সে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে। কেননা এই ধরনের আগ্রহকে অন্যায় বলে তার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে। সক্রিয়ভাবে বুদ্ধিমান যে-কোন বালক এই কারণেই কমবেশি স্নায়ুরোগের শিকার হয়ে পড়ে। সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে, যৌনতা সম্বন্ধে এই ধরনের ঘটনাই ঘটে এবং যেহেতু যৌনতা ট্রেনের থেকেও অনেক বেশি আগ্রহোদ্দীপক তাই ফল আরও অনেক খারাপ হয়। এর ফলেই খ্রীষ্টীয় গোষ্ঠীতে বহু মানুষই স্নায়ুরোগের শিকার। এর কারণ ছোট বয়সে তাদের যৌন জ্ঞানের উপর ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা। এই পাপবোধ যা কৃত্রিমভাবে তাদের উপর আরোপ করা হয়েছিল তা পরবর্তীকালে তাদের ভীরু, নিষ্ঠুর, নির্বোধ করে তোলে। ছোট বয়সে বালক-বালিকারা যা জানতে চায় তাকে তা না জানানোটা কোন যুক্তিসংগত ব্যাপার নয়— সেটা যৌন সংক্রান্ত জিজ্ঞাসাও হতে পারে অথবা অন্য কিছু। আমরা যতক্ষণ প্রাথমিক পড়াশুনোর সময়টাতে ছেলেমেয়েদের এই বিষয়ে জানাতে না পারবো ততদিন পর্যন্ত আমরা সুস্থ জনসাধারণ সৃষ্টি করতে পারবো না। যতদিন গীর্জাগুলোর হাতে শিক্ষাগত রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত এটা সম্ভব হবে বলে আমার মনে হয় না।

যদি এই সব আপত্তির সঙ্গে তুলনীয় বর্ণনাগুলোকে পাশে সরিয়ে রাখি, তবে এটা পরিষ্কার যে খ্রীষ্টীয়বাদের মৌল শাস্ত্রীয় নীতিগুলিকে মেনে নেওয়ার আগেই তা লোকের মনে এক ধরনের নৈতিক বিকৃতির দাবি করে থাকে। আমাদের বলা হয়ে থাকে যে এই জগৎ সেই ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট যিনি একাধারে মঙ্গলময় ও সর্বশক্তিমান। জগৎ সৃষ্টি করার আগেই তিনি তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে সেই সব যন্ত্রণা ও কৃপণতাকে আগেই দেখতে পেয়েছিলেন যার দ্বারা জগৎ পূর্ণ হবে। তাই এই সমস্ত [illegible]র জন্য তিনিই দায়ী। এই তর্ক করাটা একেবারেই অনর্থক, যে পাপের জন্যেই জগতে এত যন্ত্রণা। প্রথমেই বলতে হয় যে এটা সত্য নয়। নদীতে বন্যা আসার ফলে কূল উপচে পড়া বা আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ অবশ্যই কোন পাপের

ফলে ঘটে না। কিন্তু যদিও তা সত্য হত, তাতে কোন কিছু যেত-আসত না। যদি আমি জেনেশুনে এমন একটি শিশুর জন্ম দিতাম যার মাথায় অবশ্যই ভ্রাতৃহত্যার পাপলাঞ্ছনা আছে তবে সেই অপরাধের জন্য আমিই দায়ী হতাম। যদি ঈশ্বর আগেভাগেই সেই পাপের কথা জানতেন যে পাপের ফলে সে দোষী হবে, তবে এই সমস্ত পাপের ঘটনার জন্য তখন থেকে তিনিই পরিষ্কারভাবে দায়ী যখন থেকে তিনি মানুষ সৃষ্টি করবার পরিকল্পনা করেছিলেন। খ্রীষ্টীয়দের যুক্তিতে জগৎকে পাপ থেকে মুক্ত করে তাকে শুদ্ধ করতেই এই ধরনের দুঃখ-কষ্ট। এই জন্য দুঃখ-কষ্ট-যাতনা মঙ্গলময়। মর্ষকামকে সংগতিকর করে তোলার জন্য এ এক ভালো যুক্তি, কিন্তু সর্বতোভাবে এই যুক্তি খুবই দুর্বল। আমি যে-কোন খ্রীষ্টীয়কে হাসপাতালের শিশু-বিভাগে আমার সঙ্গে ঘুরে আসার আমন্ত্রণ জানাই তাদের এটি দেখাতে যে সেখানে কি পরিমাণ কষ্ট সহ্য করা হচ্ছে। তা দেখার পর তাদেরকে ভাবতে বলব যে সেই সব শিশুরা নৈতিকভাবে পরিত্যক্ত এবং তারা যে যন্ত্রণা পাচ্ছে, তারা তার যোগ্য। এই অনুভব জাগাতেই তাকে এই জায়গায় নিয়ে আসা যে, মানুষ তার অন্তরেই সমস্ত দয়া-মায়া-করুণার অনুভূতিকে অবশ্যই ধ্বংস করে। যে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে সেই ঈশ্বরের মতোই সে নিজেকে নিষ্ঠুর করে তোলে। যেসব মানুষ বিশ্বাস করে যে এই যন্ত্রণাকাতর জগতের সবকিছুই উত্তম তারা তাদের নৈতিক মূল্যকে অবিকৃত রাখতে পারে না, কেননা তারা সর্বদাই সমস্ত দুঃখ-কষ্টের পেছনে ওজর খুঁজে বার করে।

ধর্ম সম্পর্কে আপত্তি

ধর্ম সম্পর্কে দু'ধরণের আপত্তি দেখা যায়—বৌদ্ধিক এবং নৈতিক। বৌদ্ধিক আপত্তি অনুসারে বলা যায় যে কোন ধর্মকেই সত্য বলে মেনে নেওয়ার কোন কারণ নেই এবং নৈতিক আপত্তি অনুসারে বলা যায় ধর্মের উপদেশগুলি এমন এক সময় থেকে উঠে এসেছিল যখন মানুষ বর্তমান যুগের থেকেও অনেক বেশি নিষ্ঠুর ছিল। ফলে দেখা যাচ্ছে যে এই উপদেশগুলি অমানবিকতাকে চিরন্তন করবার জন্যই তৈরি এবং যদি এমন না হত তবে মানুষের নৈতিক বিবেকবোধ বর্তমানে আরো অনেক উন্নত হত।

প্রথমে বৌদ্ধিক আপত্তির কথাই ধরা যাক। বর্তমান বাস্তব যুগে এই প্রবণতাটি দেখা যায় যে ধর্ম সত্য না অসত্য তা নিয়ে কারুর কোন মাথাব্যথা নেই, কেননা ধর্ম সম্পর্কে যে প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল ধর্ম কার্যকরী কি না। একটি বিষয়ের উপর প্রশ্ন অন্য বিষয়ের উত্তর হতে পারে না। যদি আমরা খ্রীষ্টধর্মকে বিশ্বাস করি তা হলে আমাদের উদ্দেশ্য হবে তার মধ্যে মঙ্গলময় কি আছে তা দেখা। আর যদি আমরা বিশ্বাস করব না এই রকম ভাবি তবে প্রশ্নটা হবে সেই

মঙ্গলময় দিকগুলো কতটা মঙ্গলময় হয়ে দাঁড়াবে তার উপর ফলে, এই দু'ক্ষেত্রের প্রেক্ষাপট অবশ্যই স্বতন্ত্র। খ্রীষ্টীয়দের কাছে খ্রীষ্টধর্ম ভালো মনে হতেই পারে, যখন অবিশ্বাসীদের কাছে তা মন্দ বলে বিবেচিত। অধিকন্তু ঐ ব্যাপারে প্রত্যেকের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র সব সিদ্ধান্ত থাকে এবং তাদের প্রশ্নগুলি তাদের প্রমাণের স্বপক্ষে তৈরি হয়ে থাকে। এর ফলে প্রকৃত প্রমাণের বিপক্ষে শত্রুতার সৃষ্টি হয় এবং ঘটনার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আমরা মনকে সেই বিষয়ে আর খাটাতে চাই না। কেননা পক্ষপাতশূন্য অবস্থায় আমাদের মন খাটতে অভ্যস্ত নয়।

একটি সরল বা পক্ষপাতশূন্য বৈজ্ঞানিক ভাবনা আছে যা গুণগত দিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং এই সরল বৈজ্ঞানিক ভাবনা কদাচিৎ কোন মানুষের মধ্যে দেখা যায়, যে জগতের সমস্ত বস্তুগুলোকে বিশ্বাস করাটা তার কর্তব্য। এইজন্য ধর্ম প্রকৃতপক্ষে সত্য কিনা সে সম্পর্কে কোন রকম অনুসন্ধান না করে আমরা এই সিদ্ধান্তে বাস্তবপক্ষে পৌঁছাতে পারি না যে ধর্ম যা করে তা মঙ্গলের জন্যই করে। মহম্মদীয় ধর্ম এবং ইহুদি ধর্ম প্রভৃতি প্রতিটি ধর্মের সত্য সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্নটি জড়িয়ে আছে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সঙ্গে। সেই সব যুগগুলোতে যখন ধর্ম বলতে যে শব্দটির জয়ঢাক বাজতো তা ঈশ্বর এবং যথার্থভাবে তার একটি নির্দিষ্ট অর্থ থাকত। কিন্তু যুক্তিবাদীদের কঠোর আক্রমণে তা ক্রমশই ম্লান হয়ে এসেছে। এই ব্যাপারটা বোঝা ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পক্ষে সহজ হবে না যতক্ষণ আমরা বুঝতে না পারবো যে বর্তমানে যখন মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এমন কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলে ঠিক কি বোঝাতে চাইছে, তা না বুঝলে। এ বিষয়ে ম্যাথিউ আর্নল্ড প্রদত্ত সংজ্ঞার যুক্তিপ্রসূত উদ্দেশ্যকে ধরা যাক, 'আমাদের মধ্যে এমন কোন ক্ষমতা নেই যা আমাদের পুণ্যবান করে তোলে।' আমরা এই ব্যাপারটাকে আগের থেকেও অনেক বেশি অস্পষ্ট করে তুলি এবং নিজেদের কাছে বারবার এই প্রশ্ন করি যে এই পৃথিবী নামক গ্রহের পৃষ্ঠে জীবিত সত্তার উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য আছে এমন প্রমাণ আমাদের হাতে আছে কি না।

এই বিষয়ে ধার্মিক মানুষদের সচরাচর যে যুক্তি হয় তা মোটামুটি এই রকম, 'ধরুন, আমি এবং আমার বন্ধু দুজনেই অসাধারণ বুদ্ধি ও নৈতিক উৎকর্ষের অধিকারী। কিন্তু এটা ভেবে নেওয়া খুব কঠিন যে অতি বুদ্ধিমান ও অতি পুণ্যবান হঠাৎই আসতে পারে। এইজন্য বলা যেতে পারে যে এখানে আমাদের মতো জীবন্ত অন্তত এমন একজন কেউ অবশ্যই থাকবে যে অতি বুদ্ধিমান ও নৈতিক উৎকর্ষের অধিকারী এবং যে তার অতি জাগতিক যন্ত্র ঘোরাতে শুরু করেছে আমাদের উৎপাদনের জন্য।' আমি এ কথা বলতে দুঃখবোধ করছি যে যারা এই ধরণের যুক্তিকে খুব হৃদয়গ্রাহী বলে মনে করে তাদের মতো করে আমি মানতে

পারি না। বিশ্বটা বিরাট, অতএব যদি আমরা এডিংটনকে বিশ্বাস করি, দেখবো যে এই বিরাট বিশ্বের কোন জায়গাতেই মানুষের মতো বুদ্ধিমান কেউ নেই। সেই তুলনায় বুদ্ধিমান প্রাণীর শরীর গঠন করতে কতটা বস্তু খরচ হয়েছে তা যদি মেপে দেখেন তবে বুঝতে পারবেন পূর্বের তুলনার পর। যদি আপনি জগতের সমুদয় বস্তুকে আপনার বিবেচনার অধীনে নিয়ে আসেন এবং সেই তুলনায় বুদ্ধিমান প্রাণীর শরীর গঠনের পরিমাপটি লক্ষ্য করতে চান তবে দেখবেন আগে যা ছিল তার অনন্ত গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলস্বরূপ, এটাও যদি অসম্ভব বলে মনে হয় যে আকস্মিকতার আইন তৈরি করবে জীবন্ত প্রাণী যারা বহু পরমাণুর সাধারণ নির্বাচনের ফলে বুদ্ধিমান হবে, তবে এটাও সম্ভব নয় যে এই বিশ্বে আমাদের মতো অতি অল্প পরিমাণ বুদ্ধিমান প্রাণী থাকবে যা বাস্তবে আমরা দেখতে পাই। এই ব্যাপারে আমাদের আবার বলতে হয় যে এই বিশদ পদ্ধতিটিকে নাটকের চরম দৃশ্যের মতো বিবেচনা করলে, আমরা দেখতে পাব যে আমরা প্রকৃতপক্ষে কোন অতি অদ্ভুত সুন্দর জিনিস মনে করিনি। যদিও আমি এ বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ যে এমন বহু স্বর্গীয় জিনিস আছে যা আমার থেকেও অদ্ভুত সুন্দর। এই কারণে আমার যোগ্যতা যত দূরেই সমাধিস্থ হ'ক না কেন আমি তাকে খুব একটা যোগ্য বলে মনে করি না। অধিকন্তু আমার মস্তিষ্ক থেকে সাড়া পেলেও আমি একথা চিন্তা করতে পারি না। সমগ্র অনন্তের সর্বময় ঈশ্বর সর্বত্র এমনভাবে কাজ করতে পারেন যা, অপেক্ষাকৃত উত্তম বলে বিবেচিত হতে পারে। অবশ্য এ সম্পর্কে আমাদের মস্তিষ্কের হঠাৎ ঝলকে-ওঠা সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করতে হবে। পৃথিবী সর্বদাই ব্যবহারযোগ্য থাকবে না। মানবজাতি অবলুপ্ত হবে। যদি মহাজাগতিক পদ্ধতিটি নিজেকেই নিজে মূল্যায়ন করে থাকে তাহলে তা আমাদের এই গ্রহকে ছেড়ে অন্য কোনো জায়গায় অবশ্যই কিছু কাজ করতে বাধ্য হবে। তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী বিশ্ব ক্রমশ ফুরিয়ে যাচ্ছে এ কথাটা একপ্রকার অসম্ভব এবং বিশ্বের কোন জায়গার পরিপ্রেক্ষিতেই এই ধরনের সামান্য আগ্রহ বজায় রাখাও একেবারেই অসম্ভব। যদিও আমরা এই ধরনের কথা শুনে অভ্যস্ত যে যখন সময় আসবে তখন ঈশ্বর তাঁর চাকা, ঘোরাবেন। কিন্তু যদি আমরা এই ধারণের কথা বলি তাহলে আমাদের নিশ্চয়তাকে কেবলমাত্র বিশ্বাসের উপর নির্ভর করাতে হবে, তা কখনই একটুকরো বৈজ্ঞানিক প্রমাণের উপর নির্ভর করবে না। বৈজ্ঞানিক প্রমাণের উপর নির্ভর করে যতদূর বলা যায় তাতে খুব ধীরগতিতে বিশ্ব এমনভাবে এগোচ্ছে যা পৃথিবীর উপর এক করুণ অবস্থার সৃষ্টি করবে, এবং এটি ক্রমশ ধীরগতিতে দৃঢ়ভাবে চিরন্তন মৃত্যুগত কারণের আরও করুণ পর্যায়ে পৌঁছাবে। যদি বিশ্বের গতিপ্রকৃতির প্রমাণ হিসাবে এই ধারণাকে নেওয়া হয়,

তাহলে আমি শুধুমাত্র এই বলতে পারি যে বিশ্বের এই ধরনের গতিপ্রকৃতি আমার কাছে কোন আবেদন রাখতে পারে না। এই জন্যে আমি পরিষ্কারভাবে মনে করি যে, ঈশ্বর বিশ্বাসের কোনরকম কারণ নেই, সেই বিশ্বাস যতই অস্পষ্ট হোক এবং যতই সূক্ষ্ম হোক। আমি পুরোনো অধিবিদ্যাগত যুক্তিগুলিকে একপাশে ফেলে রাখলাম যেহেতু ধর্মীয় আত্মপক্ষ-সমর্থনকারীরা নিজেদেরকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে।

আত্মা এবং অমরত্ব

খ্রীষ্টীয় ধর্মাবলম্বীরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলে থাকেন যে, খ্রীষ্টীয় গোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্রে ব্যক্তি আত্মার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বর্তমান। এই ধরণের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা মৌলিকভাবে স্টোয়িকদের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে। যা গোষ্ঠীগুলির মধ্যে তাদের কার্যকলাপের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল এবং তার ফলে গোষ্ঠীগুলির মধ্যে রাজনৈতিক অধিকার প্রাপ্তির আশা একেবারেই বিলীন হয়ে গিয়েছিল। একজন অসাধারণ সুন্দর চরিত্রের মহান ব্যক্তি যে মঙ্গলময় কাজ করবেন সে সম্পর্কে একটি স্বাভাবিক ভাবনা আমাদের মধ্যে কাজ করে, কিন্তু, যদি সেই ব্যক্তিটিকে সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং সেই ধরণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয় যে সুযোগগুলি ঘটনাসমূহকে প্রভাবিত করে, তবে অবশ্যই সেই ব্যক্তি তাঁর স্বাভাবিক গতি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বেন। ব্যক্তির স্বাভাবিক গতি থেকে এই ধরনের বিচ্যুতিকেই মঙ্গলময় হয়ে ওঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হয়। পূর্বের খ্রীষ্টীয় ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে এই ধরণের ঘটনাই ঘটত। এই ধারণা এমন একটি ব্যক্তিগত পবিত্রতার দিকে তাদের চালিত করত যা সম্পূর্ণভাবে তাদের স্বনির্ভর শুভকার্যের উপর নির্ভর করত, যেহেতু পবিত্রতা এমন একটি বস্তু যে বস্তুটি সেই সব মানুষরাই অর্জন করতে পারে যারা যে কোন কাজে একেবারেই নপুংসক (..... holyness had to be something that could be achieved by people who were impotent in action.)। এই কারণেই সামাজিক ধর্মগুলি খ্রীষ্টীয় নৈতিক আদর্শের বহির্ভূত। এমনকি আজকের দিনেও সাধারণ খ্রীষ্টীয় ভক্তরা এই কথা ভাবেন যে, একজন ঘুষখোর রাজনৈতিক নেতার চেয়ে অনেক বেশি বদমাশ একজন ব্যভিচারী ব্যক্তি। যদিও ঘুষখোর রাজনৈতিক ব্যক্তি সম্ভবত ব্যভিচারী ব্যক্তির চেয়ে সহস্রগুণে ক্ষতিকারক। ধর্ম ও নৈতিক উৎকর্ষতা সম্পর্কে মধ্যযুগীয় কল্পনা যা তৎকালীন সাধুসন্তদের ছবিগুলির মধ্যে দেখা যায় তা হল তাদের দেখতে অনেকটা জ্ঞান-ধোয়া মুখসম্পন্ন, দুর্বল এবং অভিমানী। সব থেকে নৈতিক উৎকর্ষের অধিকারী মানুষ সেই ধরণের মানুষ যে জগৎ থেকে অবসর গ্রহণ করেছে। সক্রিয় মানুষ কেবলমাত্র তাদের বলা হয় যারা সাধুসন্ত নামে সাধারণত

[illegible] এই ধরণের মানুষ সর্বদাই তাদের জীবনটাকে বাজে খরচা করে এবং [illegible] তুর্ক-এর বিরুদ্ধে আমরণযুদ্ধে অংশগ্রহণ করাটাকেই তাদের [illegible] সত্য মনে করে। গীর্জাগুলো কখনই সাধুসন্তদের সম্মান প্রদর্শন [illegible] তারা আর্থিক বিষয়গুলিতে অথবা অপরাধীর জন্য নির্মিত [illegible] অথবা বিচার-ব্যবস্থাকে সংস্কার করে থাকেন। এই ধরনের [illegible] অবদানকে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে দেখা হয়নি। আমি [illegible] না মানব-ইতিহাসে এমন কোন একজন সাধু আছেন যাঁর সাধুত্ব [illegible] উপযোগিতার জন্য গড়ে উঠেছিল। সামাজিক এবং নৈতিক ব্যক্তির [illegible] এই ধরণের বিচ্ছেদের ফলেই আত্মা এবং শরীরের মধ্যে বিচ্ছেদ ক্রমশই [illegible] এবং এই বিচ্ছেদের প্রমাণ আমরা খ্রীষ্টীয় অধিবিদ্যায় দেখতে পাই [illegible] সমস্ত ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে দেখতে পাই যে ব্যবস্থাগুলো দেকার্তের দর্শন [illegible] নিয়ন্ত্রিত। খুব খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে একজন একথা বলতেই পারে [illegible] শরীর মানুষের সামাজিক এবং তার জাতিগত দিকের প্রতিনিধিত্ব [illegible] সেখানে আত্মা তার ব্যক্তিগত দিকের প্রতিনিধিত্ব করে। আত্মার উপর [illegible] গুরুত্ব প্রদান করে খ্রীষ্টীয় নীতিবিদ্যা নিজেকে পূর্ণভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক [illegible] তুলেছে। আমি মনে করি, এটা একেবারেই পরিষ্কার যে শত শত বছরের [illegible] মতবাদের মোট ফলাফল মানুষকে অধিক অহংকারী করে তুলতে সমর্থ [illegible] এবং প্রকৃতি তাদের যতটা আবদ্ধ করে থাকে তার তুলনায় তারা নিজেদের [illegible] অনেক বেশি আবদ্ধ। যে ধরণের সক্রিয় অনুভূতি মানুষকে তার অহংকারের [illegible] বাইরে নিয়ে যেতে পারে তা হল তার যৌনতা, তার পিতৃত্ব মাতৃত্ব এবং [illegible] অথবা তার ইতর প্রবৃত্তি। যৌনতাকে দোষারোপ করতে এবং তাকে [illegible] করতে গীর্জা সব ধরণের কাজ করেছে। খ্রীষ্ট নিজেই পারিবারিক স্নেহ-[illegible] নিন্দা করেছেন এবং তাঁর বেশিরভাগ অনুগামীরা এমনই মনে করে [illegible] এবং রোম সাম্রাজ্যের জনগণের মধ্যে স্বাদেশিকতা কোন স্থানই পায়নি। [illegible] এ বর্ণিত পারিবারিক বিষয়গুলির বিরুদ্ধে পোলেমীয় ধারণা যতটা [illegible] আকর্ষণ করতে পারত ততটা করতে অক্ষম হয়েছে। গীর্জা খ্রীষ্টের [illegible] যথেষ্টই সম্মান প্রদর্শন করে কিন্তু যীশু নিজে সে ব্যাপারে খুব সামান্য [illegible] প্রদর্শন করেছেন। 'নারী, আমি তোমার সঙ্গে কি-ই বা করব?' (জন, [illegible]) তাঁর মায়ের সঙ্গে কথা বলার ধরন এরকমই ছিল। তিনি এ-ও বলেছেন [illegible] এসেছেন তাঁর বাবার বিপক্ষে একজন মানুষকে প্রতিষ্ঠা করতে এবং [illegible] বিপক্ষে কন্যাকে প্রতিষ্ঠা করতে এবং শাশুড়ির বিপক্ষে শ্যালিকাকে প্রতিষ্ঠা [illegible] এবং যে তাঁর চেয়ে তার নিজের বাবা-মাকে বেশি ভালবাসে তাঁর কাছে

সে যোগ্য নয় (ম্যাথু, X, 35-7)। এই সমস্ত কিছুর অর্থ হল শাস্ত্রীয় নীতির জন্য পরিবারগুলির মধ্যে জৈবিক বন্ধনকে নষ্ট করে ফেলা জগতে বেশিরভাগ অসহিষ্ণুতার সৃষ্টি করছে এবং খ্রীষ্টীয়ধর্মের বৃদ্ধির সঙ্গে তা চারদিকে বিস্তৃতি লাভ করেছে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ তার চরমত্ব লাভ করেছে ব্যক্তি আত্মা অমরত্ব প্রসূত শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার মধ্যে, যা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনন্ত আনন্দ অথবা অনন্ত দুঃখ ভোগ করে থাকে। এই গুরুত্বপূর্ণ স্বতন্ত্রতা যে ঘটনার উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে তা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। উদাহরণস্বরূপ, পুরোহিত নিজের মনে বিড়বিড় করে মন্ত্র বলতে বলতে ঠিক যখন আপনার উপর জল ছেটাচ্ছে তখনি যদি আপনি মারা যান তবে আনন্দের উত্তরাধিকারী হবেন, অন্যথায় জুতোর গোড়ালি ভেঙে যাবার জন্য যখন বিরক্তির চোটে আপনি বাজে ভাষা ব্যবহার করছেন ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ বজ্রপাতে আপনার মৃত্যু হল, আর সঙ্গে সঙ্গে আপনি অনন্ত নরকের অধিকারী হলেন। আমি এমন কথা বলি না যে, আধুনিক প্রোটেস্টান্ট খ্রীষ্টীয়রা বিশ্বাস করেন, অথবা আধুনিক ক্যাথলিক খ্রীষ্টীয়রা এই ঘটনাকে যারা শাস্ত্রীয় তত্ত্বের দ্বারা খুব বেশি প্রভাবিত নয় তারা এ ঘটনা বিশ্বাস করে না, কিন্তু আমি অবশ্যই বলব যে এই ঘটনাটি এমন গোঁড়া শাস্ত্রীয় নীতির মধ্যে পড়ে যা এখনো পর্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করা হয়। মেক্সিকো ও পেরুর স্পেনীয়রা ইন্ডিয়ান শিশুদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করে সঙ্গে সঙ্গে তাদের মগজ-ধোলাই করত এবং এইভাবেই তারা এইসব শিশুদের স্বর্গে যাবার পথকে নিশ্চিত করে থাকত। তাদের এই ধরণের কাজকে নিন্দা করবার জন্য গোঁড়া খ্রীষ্টীয়রা কোন যৌক্তিক কারণ খুঁজে বার করতে পারে না, যদিও বর্তমানে সকলেই এরকম করে থাকে। বহু উপায়েই খ্রীষ্টীয় ধরণের ব্যক্তিগত অনৈতিকতার নীতি নৈতিকতার উপর ধ্বংসাত্মক প্রভাব সৃষ্টি করে, এবং আত্মা ও শরীরের উপর অধিবিদ্যাগত বিচ্ছেদ দর্শনের উপর বিপজ্জনক প্রভাব ফেলে থাকে।

অসহিষ্ণুতার উৎসসমূহ

খ্রীষ্টীয়ধর্মের এটাই সব থেকে কৌতূহলোদ্দীপক বৈশিষ্ট্য যে এই ধর্মের সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই অসহিষ্ণুতা সারা জগতে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমি মনে করি ইহুদিদের ঈশ্বরের ন্যায্যতা এবং অতিবাস্তবতার উপর বিশ্বাসের কারণেই এই ধরণের ঘটনা ঘটেছিল। এই ধরণের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ইহুদিদের মধ্যে কেন গড়ে উঠেছিল সে সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। সম্ভবত তাদের এই ধরণের মনোভাব গড়ে উঠেছিল তাদের বন্দীদশার প্রতিক্রিয়ার সময়টাতে যখন ইহুদিদের বিদেশ

[illegible] সঙ্গে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল। যদিও এটাও হতে পারে [illegible] বহু পয়গম্বররা ব্যক্তিগত নৈতিক উৎকর্ষতার উপর জোর দেওয়ার [illegible] আবিষ্কার করেছিল এবং সেই ধরনের ধারণা আবিষ্কার করতে সক্ষম [illegible] যে ধারণার ফলে মনে করা হত যে, একটি ধর্ম ছাড়া অন্যান্য যে কোন [illegible] প্রতি সহিষ্ণুতা এক ধরণের পাপ। এই দুই ধারণা পাশ্চাত্য ইতিহাসে [illegible] ধ্বংসাত্মক প্রভাবের সৃষ্টি করেছে। কনষ্টেনটাইনের যুগের আগেই গীর্জা [illegible] রাষ্ট্রের দৌলতে খ্রীষ্টীয়দের যথেষ্ট হয়রান করেছিল। যদিও এই হয়রানি [illegible] অল্প, এবং অন্তর্বর্তীকালীন এবং সবৈভাবে রাজনৈতিক। কনষ্টেনটাইনের যুগ [illegible] সপ্তদশ শতকের শেষ পর্যন্ত সর্বদা খ্রীষ্টীয়রা অন্যান্য খ্রীষ্টীয়দের দ্বারা [illegible] ভাবে হয়রান হয়েছিল, যে হয়রানি রোম সম্রাটের দ্বারা তারা কখনও [illegible]। খ্রীষ্টীয়ধর্মের উত্থানের আগে এই ধরণের হয়রানিকর আচরণ কেবলমাত্র [illegible] মধ্যে ছাড়া প্রাচীন জগতে আর কোথাও জ্ঞাত ছিল না। উদাহরণস্বরূপ [illegible] যদি হেরোডোটাস পড়েন, তাহলে দেখতে পাবেন যে বিদেশী রাজ্যগুলিতে [illegible] ভ্রমণ করেছিলেন, তারা সবাই ছিল স্নিগ্ধ এবং সহিষ্ণু আচরণসম্পন্ন। তবে [illegible] সত্য কখনও কখনও তাদের অদ্ভুত বর্বরোচিত প্রথা তাঁর মনে আঘাত [illegible], কিন্তু সাধারণভাবে তিনি বিদেশী প্রথাগুলি এবং দেবতাদের কাছ থেকে [illegible] ব্যবহার পেয়েছেন। তিনি উদ্বিগ্নতার সঙ্গে এটি প্রমাণ করেননি [illegible] যে সব মানুষদের ইহুদি বলে আখ্যায়িত করা হত তারা যদি অন্য কোন [illegible] নামে অ্যাখ্যায়িত হত তবে অনন্ত শাস্তি ভোগ করত এবং তাদের শাস্তি [illegible] দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত। এই ধরণের আচরণ [illegible] কেবলমাত্র খ্রীষ্টানদের জন্যই সংরক্ষিত ছিল। এটা সত্য যে আধুনিক খ্রীষ্টীয়রা এই [illegible] অনেক কম বলবান, কিন্তু এর জন্য খ্রীষ্টীয় ধর্মকে কোন ধন্যবাদ দেওয়ার [illegible] নেই, ধন্যবাদ দিতে হবে সেই সব মুক্ত চিন্তাবিদদের যারা নবজাগরণ [illegible] বর্তমান দিন পর্যন্ত খ্রীষ্টীয়দের ঐতিহ্যবাহী বিশ্বাসকে যথেষ্ট পরিমাণ লজ্জিত [illegible] পেরেছে। বর্তমান খ্রীষ্টীয়দের মুখে এই ধরনের কথা শুনে খুব আনন্দ [illegible] যে, খ্রীষ্টীয়ধর্ম বাস্তবে খুব নমনীয় এবং যুক্তিসংগত। কিন্তু যাঁরা একথা [illegible] তাঁরা এই ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এই ধর্মের সমগ্র নমনীয়তা ও [illegible]তা সেইসব মানুষদের শিক্ষা প্রদানের ফলে সম্ভব হয়েছিল যারা প্রত্যেকে [illegible] নিজেদের সময়ে গোঁড়া খ্রীষ্টীয়দের দ্বারা হয়রান হয়েছিল। বর্তমানে কেউই [illegible] বিশ্বাস করে না যে, এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছিল ৪০০৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে, কিন্তু [illegible] বেশি দিন আগে নয় যখন এই বিষয় সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করাটা ছিল এক [illegible] অপরাধ। আমার প্রপিতামহ, এতনা-র (etna) ঢালে লাভার গভীরতা

পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, গোঁড়া খ্রীষ্টীয়রা জগৎকে যত পুরোনো বলে মনে করে তার থেকেও জগৎ অনেক বেশি পুরানো এবং তাঁর এ মতামত তিনি একটি বইতে প্রকাশ করেন। এই অপরাধের ফলে তাঁকে সেখানকার কাউন্টির দ্বারা নিগৃহীত হতে হয়েছিল এবং অবশেষে সমাজ থেকে নির্বাসিত হতে হয়েছিল। যদি তিনি বাজে পরিস্থিতিসম্পন্ন মানুষ হতেন তাহলে নিঃসন্দেহে তাঁর শাস্তি আরও গুরুতর হয়ে উঠত। সুতরাং গোঁড়া খ্রীষ্টীয়দের কাছে এটা বলা খুব একটা কৃতিত্বের নয় যে, তারা এখন সেই সমস্ত অসংগতিগুলোকে বিশ্বাস করে না যেগুলোকে তারা ১৫০ বছর আগে বিশ্বাস করত। প্রচণ্ড প্রতিরোধকে প্রতিহত করেই ক্রমশ এই সমস্ত খ্রীষ্টীয় মতবাদগুলিকে দুর্বল করা হচ্ছে এবং তা সম্ভব হয়েছে মুক্ত চিন্তাবিদদের প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে।

স্বাধীন-ইচ্ছার মতবাদ

প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কিত বিষয়ের উপর খ্রীষ্টীয়দের আচরণ কৌতূহলোদ্দীপকভাবে দ্বিধাগ্রস্ত ও অনিশ্চিত। একদিকে ছিল স্বাধীন-ইচ্ছার মতবাদ, যে মতবাদ বেশিরভাগ খ্রীষ্টীয়রা বিশ্বাস করত। এই মতবাদ অনুযায়ী মনে করা হত যে অন্তত মানবজাতির কর্মসমূহ প্রাকৃতিক আইনের বিষয় হওয়া উচিত নয়। অন্যদিকে, বিশেষত অষ্টাদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে, এই বিশ্বাস গড়ে ওঠে যে ঈশ্বর হলেন আইন-প্রণেতা। স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রধান প্রমাণ হিসাবে প্রাকৃতিক আইনের প্রতি বিশ্বাস গড়ে ওঠে। অধুনা স্বাধীন-ইচ্ছার খাতিরেই আইনের রাজত্বের বিরুদ্ধে আপত্তি গড়ে উঠেছে। পূর্বের আইন-প্রণেতা হিসেবে ঈশ্বরের অস্তিত্বজ্ঞাপক প্রাকৃতিক আইনকে বিশ্বাস করার চেয়ে সেই আপত্তিকে অনেক দৃঢ়তার সঙ্গে বোঝাবার চেষ্টা শুরু করা হয়েছে। বস্তুবাদীরা পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্রগুলির দ্বারা দেখাতে চেয়েছেন, বা দেখাবার চেষ্টা করেছেন, যে মানবশরীরের গতিপ্রকৃতি যান্ত্রিকভাবে নির্ধারিত। ফলস্বরূপ সেই সব বস্তু যাদের সম্পর্কে আমরা আলোচনা করি এবং প্রতিটি অবস্থার পরিবর্তন যাকে আমরা প্রভাবিত করে থাকি, তা সম্ভাব্য স্বাধীন ইচ্ছার পরিধির বাইরেই ঘটে। যদি এরকমই হয়, তবে আমাদের শৃঙ্খলমুক্ত ইচ্ছার মূল্য নিতান্তই কম। যদি একটি মানুষের কবিতা রচনা ও খুন করার ক্ষেত্রে তার দৈহিক সঞ্চালন তার সেই ধরনের কার্য নিযুক্তি থেকে নিষ্পন্ন হয় যা কেবলমাত্র পদার্থগত কারণনির্ভর, তবে তাকে একদিকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিয়ে আর একদিকে তার মর্মর মূর্তি নির্মাণ করাটা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। অধিবিদ্যার কোন ব্যবস্থায় মুক্ত চিন্তার রাজত্ব থাকলেও থাকতে পারে যেখানে ইচ্ছাগুলো স্বাধীন হবে। কিন্তু যেহেতু এই

[illegible] অন্যান্যদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে থাকে কেবলমাত্র দৈহিক [illegible] মাধ্যমে, তাই সেখানকার স্বাধীনতার রাজত্ব ঠিক সেই ধরনের কিছু [illegible] উঠবে যা কখনও সংযোগের বিষয় হয়ে উঠতে পারবে না এবং কখনও [illegible] লাভ করতে পারবে না।

এই প্রসঙ্গে বলতে গেলে আবার বলতে হয়, যে-সব খ্রীষ্টীয়রা এই মতবাদকে [illegible] তাদের উপর ক্রমবিবর্তন উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। তারা এটা [illegible] বিবর্তন কেবলমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই পরিবর্তন দাবি করেনি, মানুষের [illegible] একেবারে স্বতন্ত্র প্রাণীদের গঠনেও সে পরিবর্তন এনেছিল। এই জন্য, [illegible] মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছাকে বাঁচিয়ে রাখতে তারা জীবন্ত বস্তুর আচরণ সম্পর্কে [illegible] রসায়নতগত প্রক্রিয়ার ব্যাপারে যতবার নতুন নতুনভাবে ব্যাখ্যা [illegible] হয়েছে ততবার বাধা দিয়েছে। সমস্তরকম নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীকে [illegible] হিসাবে মনে করার জন্য দেকার্তের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছিল তা হল [illegible] ধর্মশাস্ত্রবিদদের সমর্থন হারিয়েছিলেন। নিরবচ্ছিন্নতার মতবাদ তাদের [illegible] অনেক দূর নিয়ে গিয়েছিল এবং এখনো তাদের এই ধারণায় ভাবিত করে [illegible] মৃত বস্তু বলে সেই সব বস্তু অপরিবর্তনীয় আইনের দ্বারা তাদের [illegible] দিক দিয়ে দৃঢ়ভাবে পরিচালিত হয় না। তারা ঘটনাটি এড়িয়ে চলে, [illegible] যদি আপনি আইনের শাসনকে বিলুপ্ত করে দেন তবে ভোজবাজির [illegible] আপনাকে বিলুপ্ত করতে হবে, যেহেতু ভোজবাজি ঈশ্বরের কার্য যা [illegible] আইনের বিপরীত এবং যা সাধারণ ঘটনাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। যদিও [illegible] যে আধুনিক উদার ধর্মতত্ত্ববিদরা সুগভীরতার ভাব দেখিয়ে প্রমাণ [illegible] যে সমস্ত সৃষ্টিই এক আশ্চর্যজনক ঘটনা। সুতরাং তারা কোন একটি [illegible] ঘটনাকে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের প্রমাণ বলে প্রচার করতে চায় না।

[illegible] আইনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার এই প্রভাবে, কোন কোন খ্রীষ্টীয় [illegible] সমর্থনকারী পরমাণু সম্পর্কিত সাম্প্রতিক মতবাদকে আক্রমণ করে [illegible] তারা এটা দেখতে চাইল যে এতদিন পর্যন্ত যে-সব পদার্থগত আইনগুলো [illegible] বিশ্বাস করে এসেছি তা বহুসংখ্যক পরমাণু সম্পর্কে গড়ে আপাত সত্য [illegible] একটি স্বতন্ত্র ইলেকট্রন তার ইচ্ছা অনুসারেই আচরণ করে থাকে। আমার [illegible] বিশ্বাস যে এটা একটা অস্থায়ী অবস্থা। পদার্থবিজ্ঞানীরা অবশ্যই ঠিক [illegible] মুহূর্ত-ঘটনাগুলি (Minute phenomena) কেমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তার [illegible] আবিষ্কার করে ফেলবেন, যদিও সেই সব সূত্রগুলি ঐতিহ্যবাহী পদার্থবিজ্ঞানের [illegible] হতে পারে। যদিও, এটাও ঘটতে পারে যে, দেখা গেল আধুনিক [illegible], যেমন মুহূর্ত-ঘটনাগুলির সম্পর্কে যে মতবাদগুলি আছে, সেগুলি যোগ্য

হওয়া সত্ত্বেও কোন কিছুকে প্রভাবিত করার অসমর্থতার দরুন কোন রকম বাস্তব গুরুত্বসম্পন্ন হয়ে উঠবে না। যে কোন বস্তুর নিজ নিজ গতির ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার মতোই পরমাণুগুলি নিজ নিজ গতির ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র হওয়ার ফলে খুব সহজে তারা পুরানো সূত্রগুলির পরিধির সঙ্গে সংগতিকর হয়ে উঠল। আমাদের পূর্বে আলোচনাকে টেনে এনে আমরা আবার বলতে পারি যে, একটা কবিতা লিখতে বা একটা খুন করতে বেশ কিছু কালির পরমাণুকে অথবা সীসার পরমাণুকে গতিসম্পন্ন করে তুলতে হয়। যে-সব ইলেকট্রনগুলি দিয়ে কালিটা তৈরি সেই ইলেকট্রনগুলি অবশ্যই পেনের ডগায় নিজের খেয়ালে নাচতে পারে এবং এই পেনের ডগাটি পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী গতিশীল, এবং এটাই একমাত্র সেই গতি যা কবি এবং প্রকাশকের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই কারণে বলা যায় যে, আধুনিক মতবাদগুলি মানবিক আগ্রহের সেই সমস্ত সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায় না, যে সমস্যাগুলির সঙ্গে ধর্মতত্ত্ববিদরা সম্পর্কিত।

ফলস্বরূপ স্বাধীন ইচ্ছা ঠিক যেখানে ছিল সেখানেই থেকে গেল। অধিবিদ্যার চরম বিষয় হিসাবে যা কিছুই এর সম্পর্কে চিন্তা করা হোক না কেন, বাস্তবে কেউই এই মতবাদে বিশ্বাসী নয়। প্রত্যেকেই সর্বদা এটা বিশ্বাস করেছে যে, একটি চরিত্রকে বিশেষরূপে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। প্রত্যেকে এটাও বিশ্বাস করেছে যে আফিম অথবা মদ আচরণের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলে। স্বাধীন ইচ্ছার বাণী এই মতামত পোষণ করে থাকে যে, মানুষ তার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে মদের নেশা এড়াতে পারে, কিন্তু তারা এই মতবাদ পোষণ করে না যখন একটি লোক নেশাগ্রস্ত হয় তখন সে ছিঁচকাঁদুনি কাঁদার মতোই পরিষ্কার করে 'ব্রিটিশ সংবিধান' কেও বলে যেতে পারে। যারা শিশুদের সম্পর্কে এসেছেন তারা প্রত্যেকেই এই কথা জানেন যে দুনিয়ার যে কোন বিরাট বাগ্মিতাপূর্ণ ধর্মপ্রচারের থেকে শিশুকে অনেক বেশি পুণ্যবান করে তোলে সুস্বাস্থ্যকর খাদ্য। স্বাধীন ইচ্ছার মতবাদগুলিকে অভ্যাস করলে যে ফল লাভ হয় তা হল এই মতবাদ সাধারণ জ্ঞান থেকে মানুষকে সরিয়ে নিয়ে এসে তাকে যৌক্তিক সিদ্ধান্তের অধিকারী করে না। যখন কোন মানুষ সেই পথে কাজ করে যা আমাদের কাছে বিরক্তিকর তখন তাকে আমরা দুষ্ট বলে ভাবি। কিন্তু এটা করে আমরা আসল ঘটনাকে এড়িয়ে যাই যে তার বিরক্তিকর আচরণগুলো সেইসব পূর্ববর্তী কারণের ফল, যে কারণগুলিকে আপনি ভাল করে দেখলে দেখতে পাবেন যে, সেগুলি সেই বিরক্তিকর আচরণকারী ব্যক্তির জন্মমুহূর্তের আগে আপনাকে নিয়ে যাবে এবং সেই সব কারণের পিছনে যেসব ঘটনাগুলো আপনাকে দেখাবে, তাতে আপনি দেখতে পাবেন যে, সেইসব ঘটনাগুলির জন্য সেই ব্যক্তি কোনভাবেই দায়ী নয় বা তাকে দায়ী করা কল্পনাতেও সম্ভব নয়।

... একজন মানুষের সঙ্গে যে রকম আচরণ করে ভুলক্রমেও একটি ... সঙ্গে সেরকম আচরণ করবে না। যখন একটি গাড়ি চলে না, তখন ... এই বিরক্তিকর আচরণকে সে পাপ বলে ভাবে না, এবং সে বলে ... একটা দুষ্টু মোটরগাড়ি, যতক্ষণ না তুমি চলবে ততক্ষণ আমি তোমায় ... না।' সে চেষ্টা করবে মোটরগাড়িটা কোন্ জায়গায় খারাপ হয়েছে তা ... এবং তা ঠিক করতে। কিন্তু এই সাদৃশ্যমূলক ঘটনা যখন মানবশিশুর ... হয় তখন তা পবিত্র ধর্মপ্রসূত সূত্রের বিপরীত হয়ে ওঠে এবং এই ... ধর্ম ছোট শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়। অনেক ছোট শিশুরই ... অভ্যাস থাকে কিন্তু সেই অভ্যাসগুলিকে চিরন্তন করে তোলা হয় ... দ্বারা। কিন্তু তাদের বদ অভ্যাসগুলিকে লক্ষ্য না করলে তার মধ্যে ঐ বাজে ... চিরন্তন করে তোলার ঘটনাটিকে পাশ কাটানো যাবে। যে-সব ... শিশুদের সেবা করে তারা কদাচিৎ শাস্তি ব্যাপারটাকে বেঠিক বলে মনে ... এই রকম শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে তারা শিশুর মানসিক রোগের কারণ ... নিয়ে থাকে। যখনই মানসিক রোগ ঘটে যায় বিচারালয়গুলিতে তাকে ... দিক থেকে ক্ষতিকারক বলে প্রমাণ করা হয়, কিন্তু অতীতের শাস্তির ... হিসাবে দেখা হয় না। (আমেরিকার নিউইয়র্ক রাজ্যে) মানসিক রোগগ্রস্ত ... উপর সাম্প্রতিক ফৌজদারী মোকদ্দমা সংক্রান্ত বিষয়ক আলোচনাকে ... এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছি।

... সব দুর্বল মানসিকতাসম্পন্ন ও স্নায়ুরোগগ্রস্ত শিশুদের পর্যবেক্ষণ করেই ... ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সংস্কার সংঘটিত হয়েছে। এর কারণ ছিল এই সব শিশুরা ... ব্যর্থতার জন্য নৈতিক ভাবে দায়ী ছিল না। ফলস্বরূপ যে-কোন সুস্থ শিশুর ... এই সব শিশুদের জন্য অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রদানের প্রয়োজন ... কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই নিয়ম বলবৎ ছিল যে, যদি কোন শিশু তার পড়া ... মতো করতে না পারে, তবে তার জন্য সঠিক পন্থা ছিল তাকে বেত্রাঘাত ... কিন্তু এই ধরনের শাস্তি অপরাধমূলক আইনে দেখা যায়। এটা সত্য যে ... প্রবণতাসম্পন্ন মানুষকে অবশ্যই থামানো উচিত, কিন্তু যে মানুষ ... রোগ হওয়ার ফলে লোক দেখলেই কামড়াতে আসছে, আমার মনে হয় ... কেউ নৈতিকভাবে দায়ী মনে করবে না। যে মানুষটি প্লেগ রোগাক্রান্ত তাকে ... তার রোগ আরোগ্য পর্যন্ত একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বন্দী করে রাখতে হবে, ... এর জন্য তাকে কেউ বদমাস বলে ভাববে না। এই একই রকম আচরণ করা ... সেইসব মানুষের সঙ্গে যারা দলিল কিংবা নোট জাল করার অপরাধমূলক ... করেছে। অপরাধ অপরাধই, তাই কোন অপরাধকে খুব বড় কিংবা ছোট

বলে ভাবা উচিত নয়। কিন্তু এই ধরনের সাধারণ জ্ঞানগুলোকে খ্রীষ্টীয় নীতি-বিদ্যায় ও অধিবিদ্যায় অস্বীকার করা হয়।

কোন গোষ্ঠীর উপর যে-কোন প্রতিষ্ঠানের নৈতিক প্রভাবকে বিচার করে দেখতে গেলে, আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে সেই সব ধরনের আবেগগুলোকে যে আবেগগুলো এই প্রতিষ্ঠানের ভিতর মূর্ততা লাভ করেছে, এবং যে মাত্রায় এই প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি পেয়েছে এই আবেগ ততটাই ভিত গাড়তে পেরেছে সেই গোষ্ঠীটির বুকে। কখনও কখনও এই ধরনের আবেগগুলিকে স্পষ্ট রূপে বোঝা যায়, আবার কখনও কখনও তা একেবারেই গুপ্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, আলপাইন ক্লাবের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ধরনের মূর্ত আবেগ তার সদস্যদের দুঃসাহসিক অভিযানের দিকে উৎসাহিত করে, অন্যদিকে জ্ঞানীগুণী সমাজের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা আবেগ সদস্যদের জ্ঞানের দিকে তাড়িত করে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানরূপে পরিবারগুলোতে যে আবেগ গড়ে ওঠে তা হিংসা ও বাবা-মার অনুভবগত। একটি ফুটবল ক্লাব ও একটি রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা আবেগ সর্বদা তার সদস্যদের প্রতিযোগিতামূলক খেলায় অনুপ্রাণিত করে, কিন্তু দুটি বৃহৎ সামাজিক প্রতিষ্ঠান— যেমন গীর্জা ও রাষ্ট্র— তাদের মনস্তাত্ত্বিক গতিপ্রকৃতির দিক থেকে অনেক বেশি জটিল। কোন রাষ্ট্রের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল অভ্যন্তরীণ অপরাধী ও বহিঃশত্রুদের বিরুদ্ধে নিশ্চয়তার বন্দোবস্ত করা। শিশুদের মানসিক প্রবণতায় এই ভাব শিকড় গেড়ে থাকে যে যখন তারা কোন কিছুতে ভয় পায় তখন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে এবং একটি বড়োসড়ো মানুষকে খোঁজে যে মানুষটি তাদের ভেতরে নিশ্চয়তার চেতনা সৃষ্টি করবে। গীর্জাগুলোর উৎস অনেক বেশি জটিল। নিঃসন্দে ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ উৎসটি হ'ল ভয়। বর্তমানেও ব্যাপারটি দেখা যায় যে যখনই মানুষ কোন কিছুকে ভয় পায় তখনই তাদের চিন্তাভাবনা ঈশ্বরের দিকে ঘোরে। যুদ্ধক্ষেত্র, মহামারী, ধ্বংস, এই সমস্ত কিছু মানুষকে ধার্মিক করে তোলে। যদিও ভয়াবহ দিকগুলো ছাড়াও ধর্মের অন্যান্য আবেদন আছে। আমাদের মানবিক আত্ম-মূল্যায়নের দিকে ধর্মের আবেদন উল্লেখযোগ্য। যদি খ্রীষ্টীয়বাদ সত্য হয়, তবে মনুষ্যজাতি নিজেকে যতটা দুর্দশাগ্রস্ত কৃমিকীট মনে করে ততটা তারা নয়। তারা বিশ্ব-স্রষ্টা ঈশ্বরের স্বার্থের বিষয়, যে ঈশ্বর তাদের সাথে আনন্দে থাকতে গিয়ে সমস্যাকে গ্রহণ করেন, যখন তারা তাঁর সাথে ভাল আচরণ করে তখন তিনি আনন্দিত হন কিন্তু যখন তারা তার সঙ্গে খারাপ আচরণ করে তখন নিরানন্দিত হন। এটা সত্যই একটি মহান প্রশংসাসূচক ঘটনা। একটি পিঁপড়ের বাসা পর্যবেক্ষণ করে আমাদের এই চিন্তা করা উচিত নয় যে আমাদের খুঁজে বার করতে হবে সেই ধরনের পিঁপড়েদের যারা নিজেদের ধরনের কর্তব্য

... ...ছে। এছাড়াও আমাদের এই ধরনের চিন্তাও করা উচিত নয় যে পিঁপড়ে ... নিজেদের ধরনের কর্ম থেকে বিরত তাদের বেছে বেছে তুলে আগুনে ... ...তে হবে। যদি ঈশ্বর আমাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের কাজ করেন তবে ... আমাদের গুরুত্বের দিক থেকে প্রশংসাসূচক হবে। এটা আরও আনন্দময় ... ...ক ব্যাপার হবে যদি ঈশ্বর আমাদের মধ্যে যারা ভাল তাদের চির-স্বর্গের ... উপহার হিসেবে প্রদান করেন। এছাড়াও তুলনামূলক আধুনিক একটি ... ...তে পারি যে ধারণা অনুসারে বলা যেতে পারে জাগতিক বিবর্তন ... ...ভাবে পরিকল্পিত হয়েছে যে তার ফলে যা কিছু ঘটে তাকেই আমরা মঙ্গল ... ...ক এর অর্থ হল, বিবর্তনের ফলে যা কিছু ঘটে তা আমাদের মনে এক ... ...ভাবনার সৃষ্টি করে থাকে। তাই আবার বলতে হয় যে এটা মনে করাটা ... ...তুলতায় দাঁড়াবে যে এই বিশ্বটি নিয়ন্ত্রিত হয় এমন একটি সত্তার দ্বারা ... আমাদের রুচি এবং সংস্কারের সঙ্গে সমান অংশগ্রহণ করে থাকেন।

ধার্মিকতার ধারণা

... ...যাত, যে মনস্তাত্ত্বিক তাড়নাকে ধর্মের মধ্যে মূর্ত হতে দেখা যায় তা ... ...ন কল্পনা গড়ে তোলে। আমি এই বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন যে বহু মুক্ত-... ...ভাবনা এই কল্পনা বা ধারণাকে মহান শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন। গোঁড়া ... ...মতবাদের পরেও তারা মনে করেন এই ধরণের ধারণাকে সংরক্ষণ করা ... ...। কিন্তু আমি এই বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে একমত নই। ধার্মিকতার ধারণার ... ...ক বিশ্লেষণ করলে আমার মনে হয় এই ধারণার শিকড় অনাকাঙ্ক্ষিত ... ...বা যৌনপ্রেমের মধ্যে নিহিত এবং যাকে যুক্তির অনুমোদন দিয়ে আরও ... ...শালী করা উচিত নয়। ধার্মিকতা এবং অধার্মিকতা দুটোকে এক সাথেই ... ...করা আবশ্যক এবং একটিকে গুরুত্ব না দিয়ে আর একটিকে গুরুত্ব ... ...অসম্ভব। এখন আমাদের বুঝতে হবে, অধার্মিকতা বলতে বাস্তবে কি ... ...বাস্তবে এটি এমন একটি ধরনের আচরণ যা সাধারণ মানুষ অপছন্দ করে ... ...ও ধরনের আচরণকে অধার্মিকতা বলে উল্লেখ করে এবং এই ধারণার ... ...বিশদ নৈতিক ব্যবস্থাকে সাজিয়ে তুলে জনতা তাদের আপন অপছন্দের ... ...লোর প্রতিশোধমূলক শাস্তি প্রদান করে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে। ... অনুযায়ী সাধারণ জনতা ধার্মিক। তারা তাদের আত্ম-মূল্যায়নকে বর্ধিত ... ...ঠিক তখন যখন তারা তাড়নার বশে নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে পৌঁছায়। এটা ... ...নৈতিক হত্যামূলক মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা এবং এক অন্য পথের ... ...অবস্থা যে পথের আশ্রয় নিয়ে অপরাধীদের শাস্তি প্রদান করা হয়ে

থাকে। এইজন্য ধার্মিকতার ধারণার সারবস্তুটি হল বিচারের নামে নিষ্ঠুরতার বোরখা পরা ধর্ষকামের বহির্গমন (The essence of the conception of righteousness, therefore, is to afford an outlet for sadism by Cloaking cruelty as justice.)।

কিন্তু, আমরা বলতে পারি, ধার্মিকতার ব্যাপারে আপনারা যে ধারণা পোষণ করে থাকেন তা আপনাদের ধারণা অনুযায়ী সেইসব হিব্রু পয়গম্বরদের আবিষ্কার যা সর্বৈবভাবে তাদের নিজেদের কাছেই অবাস্তব। এই সত্য পরিলক্ষিত। হিব্রু পয়গম্বরদের মুখে ধার্মিকতার অর্থ ছিল তাই যা তাদের ও ইয়াহবে-র দ্বারা অনুমোদিত ছিল। যে-কেউ দেখতে পারেন যে খ্রীষ্টের দ্বাদশ শিষ্যের দ্বারা রচিত সংহিতায় এই ধরনের আচরণ প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে এই শব্দগুলি উচ্চারণ করে তাঁরা ঘোষণা করছেন : 'কারণ ইহা পবিত্র আত্মা ও আমাদের কাছে মঙ্গলময় বলে মনে করা হয়' (অ্যাক্ট xv. 28)। ঈশ্বরের রুচি ও মতামতের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা এই ধরনের ব্যক্তিকেন্দ্রিক নিশ্চয়তা কখনও কোন প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি হতে পারে না। এই ধরনের ধারণা সর্বদাই সমস্যাজনক হয়ে উঠেছে এবং প্রোটেস্টান্টবাদ এই ধরনের সমস্যাজনক ধারণাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। একজন নতুন পয়গম্বর সর্বদাই এই কথা বলে এসেছে যে তার মতবাদ তাঁর পূর্বসূরীদের অপেক্ষা অনেক বেশি প্রমাণসিদ্ধ ও খাঁটি। প্রোটেস্টান্টবাদে এই রকম কাউকে পাওয়া যায় না যে এই দাবিকে অযোগ্য বলে প্রমাণ করতে সাহসী হয়ে উঠবে। ফলস্বরূপ, প্রোটেস্টান্টবাদ বহু সম্প্রদায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং তারা পরস্পরকে দুর্বল করে তুলেছে। এই কারণেই মনে করা যেতে পারে যে এখন থেকে একশ বছর পরে ক্যাথলিকবাদ খ্রীষ্টধর্মের একমাত্র প্রতিনিধি হয়ে উঠবে। ক্যাথলিক গীর্জাগুলোতে এই অনুপ্রেরণা দেখা যায় যে পয়গম্বররা তাঁদের নিজেদের নিজেদের স্থানকে অক্ষুণ্ন রাখতে পেরেছেন। কিন্তু সেখানে তারা খাঁটি স্বর্গীয় অনুপ্রেরণা বজায় রাখতে গিয়ে যে ধরনের ঘটনাগুলো ঘটায় বা যে ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি করে তাতে মনে হয় যে, সেইসব অনুপ্রেরণা শয়তানের অনুপ্রেরণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে। কোনটা খাঁটি কোনটা নকল পার্থক্য করাটাই গীর্জার ব্যবসা হয়ে ওঠে, ঠিক যেমন ভাবে একজন শিল্পকলা-বিক্রেতার মূল ব্যবসা হল লিওনার্দোর ছবিটি খাঁটি না জাল তা ধরা। এইভাবেই একই সময় মতবাদগুলি প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে ওঠে। গীর্জা যাকে ধার্মিকতা বলে অনুমোদন দেয় তা ধার্মিক এবং যাকে অধার্মিকতা বলে অনুমোদন দেয় না তা অধার্মিক। এই জন্য বলা যেতে পারে যে ধার্মিকতার কার্যকরী ধারণাটি হল জনসাধারণের বিতৃষ্ণাপ্রসূত বিচার।

[illegible], বলা যেতে পারে যে, মানুষের তিনটি তাড়না বা আবেগ যা আমরা [illegible] মধ্যে মূর্ত হতে দেখি, সেগুলি হল— ভয়, আত্মশ্লাঘা বা অহমিকা এবং বিদ্বেষ। [illegible] এখন এ কথা বলতে পারে যে, ধর্মের উদ্দেশ্য হল এই ধরনের ভাবাবেগের [illegible] শঙ্কাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা, যাতে এই সব ভাবাবেগগুলো তাদের নির্দিষ্ট পথে [illegible] পারে। এর কারণ হল, সব্বেভাবে এই ভাবাবেগগুলো মানুষের দুর্দশার জন্য [illegible] হয়েছে। ধর্ম হল অশুভ শক্তির বল, কেননা তা মানুষের এই ভাবাবেগগুলোকে [illegible] দেবার অনুমোদন দিয়ে থাকে তাকে রোধ করবার পরিবর্তে। কিন্তু, এটা সত্য, [illegible] তারা এ ধরণের ভাবাবেগগুলোর অনুমোদন দিতে পেরেছিল, তখন অন্তত কিছুটা [illegible] তারা তাদের নিয়ন্ত্রিত করতেও পারত।

[illegible] বিষয়ে আপত্তির স্বরূপ রিট (writ) সম্পর্কে আমি চিন্তা করতে পারি, যে [illegible] সম্পর্কে গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসীরা সম্ভবত যেমন আগ্রহ বোধ করতে পারেনি, [illegible] সেই আপত্তিটিকে পরীক্ষা করার জন্য যোগ্য বলেও ভাবতে পারেনি। বিদ্বেষ [illegible] ভয়, বলা যেতে পারে এই দুটো মানবজাতির অতিপ্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য। মানব [illegible] এ দুটিকে সর্বদাই অনুভব করেছে এবং আহ্বান জানিয়েছে। আমাকে এটা বলা [illegible] পারে যে, এই দুটো বিষয় সম্পর্কে আপনি যে কাজ করতে পারেন তা হল [illegible] এমন পথে পরিচালনা করা যে পথে গেলে তারা যতটা ক্ষতিকারক হয়ে উঠত [illegible] থেকে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকারক হয়ে উঠবে। একজন খ্রীষ্টীয় ধর্মবেত্তা এ কথা [illegible] পারেন যে গীর্জা এই দুটি বিষয়কে এমনভাবে পরিচালিত করে থাকে যা তাদের [illegible] বিষয়ক আবেগ পরিচালনার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত, অর্থাৎ তাদের বিলাপের পর্যায়ে [illegible] যাওয়া। বিবাহের চৌহদ্দির মধ্যে উদগ্র লালসাকে আবদ্ধ করে তারা তাকে [illegible] প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে, যদি মানবজাতি [illegible] বিদ্বেষ অনুভব করে, তাহলে এটা ভালো হবে যদি তাদের সেই [illegible] তারা তাদেরই বিরুদ্ধে পরিচালিত করে যারা সত্যই ক্ষতিকারক। সংক্ষেপে [illegible] ধার্মিকতার ধারণার দ্বারা গীর্জা ক্ষতিকারক কার্যই করে থাকে।

[illegible] বিষয়ে দুটি প্রত্যুত্তর দেওয়া যায়— একটি তুলনামূলকভাবে ভাসা-ভাসা [illegible] অন্যটির ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে সেটি বিষয়ের উৎস সম্পর্কিত। ভাসা-ভাসা [illegible] হল, ধার্মিকতার সম্পর্কে গীর্জার ধারণা কখনও পরিষ্কার হয়ে ওঠে না [illegible] মৌলিক প্রত্যুত্তরটি হল বিদ্বেষ ও ভয়। আমাদের বর্তমান মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান [illegible] আমাদের বর্তমান শিল্প-প্রযুক্তিগত জ্ঞানের দ্বারা মনুষ্যজাতির জীবন থেকে [illegible] সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

প্রথমেই আমাদের প্রথম বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা দরকার। ধার্মিকতার [illegible] গীর্জার ধারণা সামাজিকতার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্নভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত—

প্রথম ও সর্ব-প্রধান কারণ হল, বিষয়টি বুদ্ধিগত ও বিজ্ঞানগত দিক দিয়ে নিন্দনীয়। এই ধরনের দোষ সুসমাচারগুলোর থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। যীশু আমাদের একটি ছোট শিশুর মতো হতে বলেছেন, কিন্তু ছোট্ট শিশু ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস বুঝতে পারে না, অথবা কারেন্সির আদর্শকে বুঝতে পারে না, কিংবা সে রোগের প্রতিকারার্থে আধুনিক পদার্থগুলিকে বুঝতে পারে না। এই ধরনের জ্ঞান অর্জন করাটা আমাদের কর্তব্যবোধের কোন অংশ নয়, যেরকম গীর্জাগুলো উপদেশ দিয়ে থাকে। গীর্জাগুলো বেশিদিন এই ধরনের মত পোষণ করেনি যে জ্ঞান নিজেই একটি পাপগত বিষয়, কিন্তু পুরোনো যুগে তারা এমনই ধারণা পোষণ করত। জ্ঞান অর্জন ব্যাপারটা পাপগত না হলেও ভয়ঙ্কর অবশ্যই, কেননা এটি বুদ্ধিমানের অহংকারে পরিণত হয়। ফলে, খ্রীষ্টীয় গোঁড়া ধর্মাদর্শ সম্পর্কে সে প্রশ্ন তুলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, দুটি মানুষকে নেওয়া যাক, তাদের মধ্যে একজন কোন গ্রীষ্মপ্রধান বিরাট অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে ন্যাবারোগে আক্রান্ত রোগীকে খুঁজে বার করল, কিন্তু যখন সে এই কাজটি করছিল তখন তার সঙ্গে ঘটনাক্রমে এক মহিলার সম্পর্ক ঘটেছিল যাকে সে বিয়ে করেনি। অন্য মানুষটি ছিল কুঁড়ে এবং জড় প্রকৃতির। যতদিন পর্যন্ত তার স্ত্রী দেহের দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে ফুরিয়ে গিয়ে মরে না গেল ততদিন পর্যন্ত বছরের পর বছর তার জন্য সন্তান প্রসব করল। সেই মানুষটি সেই সব শিশুদের এত কম নজর রাখলো যার জন্য তাদের অর্ধেক কেবলমাত্র দেখাশোনার অভাবে মরে গেল। কিন্তু সেই মানুষটি কখনও নিজেকে অবৈধ যৌনসঙ্গমে প্রশ্রয় দেয়নি। প্রতিটি সৎ খ্রীষ্টীয় ধর্মাবলম্বী অবশ্যই এই মত পোষণ করবে যে দ্বিতীয় ধরণের মানুষটি প্রথম ধরণের মানুষটির থেকে অনেক বেশি ধার্মিক। এই ধরনের আচরণ অবশ্যই কুসংস্কার এবং যুক্তির পরিপন্থী। এই ধরণের অসঙ্গতি থেকে অনিবার্যভাবে যে সিদ্ধান্তটি বেরিয়ে আসে তা হল— কোন ধনাত্মক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বিষয়কে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে কেবলমাত্র পাপকে অগ্রাহ্য করা এবং যতদিন পর্যন্ত ব্যবহারযোগ্য জীবনের জন্য জ্ঞানকে গুরুত্ব দেওয়া না হবে ততদিন পর্যন্ত সেই জ্ঞানকে স্বীকৃতি না দেওয়া।

দ্বিতীয় মৌলিক আপত্তিটি হল বিদ্বেষ ও ভয় যাকে এতদিন পর্যন্ত গীর্জাগুলো ব্যবহার করে এবং বর্তমানে এমন একটি পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে এইসব আবেগগুলো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত সংস্কারের ফলে মানুষের প্রকৃতি থেকে একেবারেই ছেঁটে দেওয়া যেতে পারে। শিক্ষাগত সংস্কারকে ভিত্তিরূপে নেওয়া আবশ্যক। কেননা যে মানুষ ঘৃণা ও ভয় অনুভব করে তারাই আবার তাদের প্রশংসাও করে এবং তাদেরকে চিরন্তন করে তোলবার চেষ্টা করে থাকে।

[illegible] প্রশংসা ও ইচ্ছা সম্ভবত অবচেতন মনের ব্যাপার, যা সাধারণ খ্রীষ্টীয় [illegible] মধ্যে থাকে। যে ধরণের শিক্ষা ভয় দূর করতে পারে, সেই ধরণের [illegible] সৃষ্টি করা খুব একটা শক্ত নয়। এর জন্য প্রয়োজন শিশুকে [illegible] শিক্ষা দেওয়া। তাকে এমন একটি পরিবেশের মধ্যে রাখা যেখানে সে [illegible] আপাতিক ফলাফল ছাড়াই পড়াশুনা চালাতে পারবে। তাকে বাঁচাতে হবে [illegible] বয়স্কদের হাত থেকে যারা অযৌক্তিক ভয়ঙ্কর ভীতির দ্বারা ভোগে। [illegible] ইঁদুরে ভীতি, অন্ধকার-ভীতি কিংবা সামাজিক বিপ্লব-ভীতিও হতে [illegible] একটি শিশু অবশ্যই কঠিন শাস্তি, চোখ রাঙানি, গাম্ভীর্য প্রদর্শন এবং অসম্ভব [illegible] নিয়া হতে পারে না। শিশুকে বিদ্বেষ থেকে রক্ষা করাটা সত্যই একটা [illegible] কাজ। যে অবস্থাগুলো হিংসা, স্পর্শকাতরতার জন্ম দেয় সেগুলোকে [illegible] সহকারে এড়িয়ে যাওয়া দরকার। বিভিন্ন ধরণের শিশুর মানসিকতা [illegible] সূক্ষ্মতা ও সঠিক বিচারের সঙ্গে তা এড়িয়ে যেতে হবে। একটি শিশু [illegible] স্নেহের পাত্র বলে অনুভব করবে সেই বয়স্ক মানুষটির কাছে যে [illegible] সঙ্গে সে থাকবে এবং যার কাছে পড়াশুনো করবে। শিশুটিকে অবশ্যই [illegible] কাজ ও কৌতূহল থেকে জোর করে সরিয়ে রাখা হবে না, যদি না [illegible] স্বাস্থ্য ও জীবনের পক্ষে মারাত্মক হয়। সঠিক ভাবে বলতে গেলে বলতে [illegible] জ্ঞানের ব্যাপারে কোন রকম কুসংস্কার থাকবে না, এবং সেই সব [illegible] থাকলে হবে না যেগুলিকে প্রথাগতভাবে সাধারণ মানুষ বেঠিক [illegible] করে। যদি প্রথম থেকেই এই ধারণা দিয়ে শুরু করা যায় তবে শিশু [illegible] গুরুত্বপূর্ণ হবে।

[illegible] জীবনে প্রবেশ করেই, উক্ত ধরণের শিক্ষিত যুবক ও যুবতী নিজেকে [illegible] একটি জগতের মধ্যে দেখতে পাবে যে জগৎটি পূর্ণ অবিচার, [illegible] প্রতিবন্ধকতামূলক দুর্দশায় পর্যবসিত। এই নিষ্ঠুরতা, অবিচার,দুর্দশা [illegible] আধুনিক জগতে বিদ্যমান তা অতীত থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া এবং [illegible] মূল উৎস হল অর্থনীতি। যেহেতু পূর্বের যুগগুলো থেকেই অস্তিত্ব বজায় [illegible] জীবন মৃত্যুর প্রতিযোগিতা অনিবার্য। কিন্তু আমাদের যুগে তা অনিবার্য [illegible] আমাদের বর্তমান শিল্পগত কৌশলের দ্বারা, যদি আমরা ইচ্ছা করি, তবে [illegible] প্রত্যেকের জন্য সহনীয় অস্তিত্বমূলক জীবনের বন্দোবস্ত করতে পারি। [illegible] নিশ্চিত করে বলতে পারি যে পৃথিবীর জনসংখ্যার বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাবে যদি [illegible] গীর্জার রাজনীতির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হই যে গীর্জা যুদ্ধ, মহামারী [illegible] সমর্থন করে এবং গর্ভনিরোধের বিপক্ষে জেহাদ ঘোষণা করে। জ্ঞান হল সেই [illegible] যার দ্বারা চিরন্তন সুখকে নিশ্চিত করা যেতে পারে, কিন্তু সেই উদ্দেশ্যে তাকে

ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সব থেকে বড় প্রতিবন্ধক হল ধর্মীয় শিক্ষা। ধর্ম আমাদের শিশুদের যৌক্তিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে। ধর্ম আমাদের বাধা দেয় যুদ্ধের মৌলিক কারণগুলোকে দূর করবার ক্ষেত্রে। ধর্ম আমাদের বাধা দেয় পাপ ও শাস্তি সম্পর্কে পুরোনো হিংসাত্মক মতবাদগুলোকে দূর করে তার পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক সহযোগিতাকে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে। এটা সম্ভবত সত্য যে মনুষ্য-জাতি স্বর্ণযুগের দোরগোড়ায়, কিন্তু যদি এটা সত্যই হয়, তবে প্রথম প্রয়োজন সেই ড্রাগনটিকে কেটে হত্যা করা যে দোরগোড়ায় পাহারা দিয়ে বসে আছে এবং এই ড্রাগনটি হল ধর্ম।

৩

আমি কী বিশ্বাস করি

'আমি কী বিশ্বাস করি' প্রবন্ধটি ১৯২৫ সালে একটি ছোট্ট গ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের ভূমিকায় রাসেল লেখেন, 'আমি বলবার চেষ্টা করেছি বিশ্বে মানুষের স্থান সম্পর্কে এবং সুখময় জীবন অর্জনের জন্য তার সম্ভাবনাগুলোর সম্পর্কে আমি কী ভাবি... মানবিক আশাগুলোর দিকে তাকিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে এমন কিছু শক্তি আছে যেগুলো সুখকে তৈরি করে এবং অন্য আর এক রকম কিছু শক্তি আছে যেগুলো দুর্দশাকে তৈরি করে। আমরা জানি না কোনটা জয়লাভ করবে, কিন্তু ঠিক মতো বিচার করে আমাদের এই দুটি বিষয় সম্পর্কে সজাগ হওয়া আবশ্যক।' ১৯৪৮ সালে নিউইয়র্ক কোর্টের মামলায় বলা হয়, 'আমি কী বিশ্বাস করি' প্রবন্ধটি অনেকগুলো প্রবন্ধের মধ্যে একটি যাকে সামনে রেখে এই মত প্রকাশ করা যায় যে বার্ট্রান্ড রাসেল কলেজে অধ্যাপনা করার ক্ষেত্রে অযোগ্য। সংবাদপত্রগুলি প্রবন্ধটির থেকে এমন কিছু বাক্য বেছে বেছে তুলে প্রকাশ করে যাতে রাসেলের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে মিথ্যা ধারণার সৃষ্টি হয়।)

(১) প্রকৃতি ও মানুষ

মানুষ প্রকৃতির একটি অংশ, প্রকৃতি বিরুদ্ধ কোন কিছু নয়। তার চিন্তা, তার শারীরিক গতিপ্রকৃতি সেই একই আইনের বশবর্তী যে আইনের বশবর্তী হয়ে অক্ষাংশ ও পরমাণুগুলো পরিচালিত হয়ে থাকে। বস্তুগত পৃথিবী মানুষের সঙ্গে একটাই তুল্য যে, দাস্তের সময় প্রকৃতিকে মানুষের সঙ্গে যতটা তুলনা করা হত তার থেকেও বেশি, কিন্তু এতটাও বেশি ছিল না যা আজ থেকে একশ বছর আগে ভাবা হত। উচ্চের দিকেই হ'ক বা নিম্নের দিকেই হ'ক, কিংবা বৃহৎ বা ক্ষুদ্রের দিকেই হ'ক, উভয় ক্ষেত্রেই মনে হয় বিজ্ঞান কতকগুলি সীমার দিকে পৌঁছেছে। মনে করা হয় বিশ্ব অনন্তের সীমিত বিস্তারিত ফল। এইজন্যই আলো বিশ্বের চারদিকে কয়েক লক্ষ বছর পরিভ্রমণ করতে পারে। বস্তু ইলেকট্রন ও প্রোটনের দ্বারা তৈরি, যেগুলোর একটি সীমিত আকার আছে এবং জগতে তাদের সংখ্যা সীমিত। সাধারণত মনে করা হত যে সম্ভবত তাদের পরিবর্তন নিরবচ্ছিন্ন নয়, কিন্তু তাদের পরিবর্তনগুলো ঘটে থাকে কতকগুলি ধাক্কার (Jerks) ফলে, যে ধাক্কাগুলো ক্ষুদ্র যে-কোন ধাক্কার থেকে কখনই খুব ক্ষুদ্র নয়। পরিবর্তনের এইসব নিয়মগুলোকে স্পষ্টতই যে-কোন সাধারণ গাণিতিক পদ্ধতির দ্বারা যোগ করে এক জায়গায় করা যেতে পারে এবং যখনই জগতের কোন ক্ষুদ্র অংশের ইতিহাসকে জানা যাবে তখন এই সমস্ত যোগফলের সমষ্টি সামনে রেখে জগতের অতীত ও ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা যাবে।

পদার্থবিজ্ঞান এই ভাবেই সেই স্তরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যেখানে পৌঁছে সে একদিন শেষ হয়ে যাবে। এই কারণেই তা আগ্রহোদ্দীপক নয়। সেই সমস্ত নিয়মগুলো আবিষ্কার করা হল যেগুলো— ইলেকট্রন ও প্রোটনের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করে থাকে— এবার পড়ে থাকলো ভূগোলের দিকটি— যে বিষয়টি বিশেষরূপে সেই সমস্ত ঘটনার সংগ্রহ যা জগতেরই ইতিহাসে কিছু কিছু অংশে কিভাবে তারা বন্টিত হল তার কথা বলে। জগতের ইতিহাস জানতে ভূগোলের যে সমগ্র ঘটনাগুলির সংখ্যা সমষ্টির প্রয়োজন তাও সম্ভবত সীমিত। তত্ত্বগতভাবে তাদের সবগুলোকে সমারসেট হাউসের বৃহৎ গ্রন্থে লিখে রাখা যেতে পারে এবং তার সঙ্গে রাখা যেতে পারে একটি গণক যন্ত্র, যার হাতল ঘোরালেই কোন জিজ্ঞাসু সেই সব ঘটনাগুলোর সম্পর্কে জানতে পারবে সেই সময়, যে সময়টা ঘটনা গুলোর ঘটার নথিভুক্ত সময় থেকে অন্য। কোনোকিছু কম আগ্রহোদ্দীপক বস্তু সম্পর্কে কল্পনা করাটা শক্ত ব্যাপার অথবা এভাবেও বলা যেতে পারে, কোনো অসম্পূর্ণ আবিষ্কারজাত আবেগপ্রবণ আনন্দের থেকে তা স্বতন্ত্র। এটা অনেকটা খুব উচ্চ পাহাড়ে ওঠার মতো, যেখানে গিয়ে দেখা গেল যে, একেবারে শীর্ষদেশে একটা রেস্তোরাঁ ছাড়া কিছুই নেই এবং সেই রেস্তোরাঁয় তারা আদা থেকে তৈরি বীয়ার বিক্রি করছে এবং যে স্থানটি সম্পূর্ণ কুয়াশায় ঘেরা কিন্তু স্থানটি বেতার-তরঙ্গের দ্বারা সজ্জিত। অ্যাহ্‌মস-এর (Ahmes) সময়ে ধারাপাতটি ছিল খুব উত্তেজক।

বস্তুগত জগৎ সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে, সে নিজে অনাগ্রহোদ্দীপক এবং মানুষ হল তার একটা অংশ, তার শরীরটা অন্যান্য বস্তুর মতোই ইলেকট্রন ও প্রোটন সমষ্টি দ্বারা তৈরি, যতদূর আমরা জানি, যা একই ধরণের নিয়ম বা আইনকে অনুসরণ করে যেগুলি জীবজন্তু ও গাছপালার ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা গ্রহণ করে না। এমন কিছু ব্যক্তিকে পাওয়া যায় যারা বলে থাকেন শারীরবিদ্যা কখনই পদার্থবিজ্ঞানের স্তরে নেমে আসতে পারে না, কিন্তু তাদের এই ধরণের যুক্তি খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং এটা ভাবাটাও এক ধরনের গর্বের ব্যাপার হয়ে যাবে যে তারা ভুল করে থাকে। যখন আমরা এরকম বলে থাকি যে, সড়কপথ এবং রেলপথের উপর নির্ভর করে আমর যেমন ভ্রমণ করে থাকি, কিছুটা একই ভাবে আমাদের চিন্তাভাবনাগুলি মস্তিষ্কের বহু পথ (Tracks) ভ্রমণ করে থাকে। চিন্তা করার জন্য যে শক্তি ব্যবহার করা হয় সেগুলোর উৎস মূলত রসায়ন এমনই ভাবা হয়। উদাহরণস্বরূপ, আয়োডিনের অভাবে একটি চালাক মানুষ বোকা মানুষে পরিণত হয়। মানসিক ঘটনাগুলি সম্পর্কে মনে করা হয় যে, এগুলি বস্তুগত কাঠামোর সঙ্গে আবদ্ধ। যদি তাই হয়, আমরা এটা মনে করতে

[illegible] যে, একটি সঙ্গ-বিবর্জিত ইলেকট্রন অথবা প্রোটন 'চিন্তা' করতে পারে, [illegible] আমরা চিন্তা করতে পারি না একজন সঙ্গ-বিবর্জিত ব্যক্তি বা সঙ্গহীন [illegible] ফুটবল ম্যাচ খেলতে পারে। আমরা এটাও মনে করতে পারি না যে, [illegible] মৃত্যুর পর একজন ব্যক্তির চিন্তা বেঁচে থাকতে পারে, যেহেতু মৃত্যু [illegible] সংগঠনকে ধ্বংস করে এবং সেই শক্তিকে নষ্ট করে ফেলে যে শক্তি [illegible] পথগুলিকে ব্যবহার করে থাকে।

[illegible] এবং অমরত্ব, যা খ্রীষ্টীয় ধর্মের কেন্দ্রীয় নীতি, তা বিজ্ঞানের কোনো [illegible] পায় না। এটা বলা যেতে পারে না যে, যেহেতু বুদ্ধবাদে কিছুই পাওয়া [illegible] সেহেতু ধর্মের জন্য অন্য আরেকটি মতবাদ একান্তই প্রয়োজন। [illegible] পরিপ্রেক্ষিতে এই কথা মনে রাখতে হবে যে, অনুপযুক্ত আকারে এই [illegible] বিবৃতি ভুলপথে চালিত করতে পারে, কিন্তু শেষ বিশ্লেষণে সেটার [illegible] বোঝা যাবে।) কিন্তু আমরা যারা পশ্চিমা দেশের লোক তারা প্রাচ্য [illegible] লোকেদের সম্পর্কে ভাবি যে তারা অটুট ঈশ্বরীয় বিদ্যার অধিকারী। [illegible] সেখানকার লোকেরা এই ধরণের বিশ্বাসকে বজায় রাখবে, কারণ এতে [illegible] আনন্দিত হয়। ব্যাপারটা অনেকটা এই রকম যেমন আমরা নিজেদেরকে [illegible] এবং শত্রুকে বদমাস ভাবতে ভালোবাসি। কিন্তু আমার দিক থেকে আমি [illegible] দিকেই কোন ভিত্তি দেখতে পাই না। আমি এই রকম কোনো ভান করতে [illegible] যার দ্বারা বোঝাবে যে আমার প্রমাণ করবার সামর্থ্য আছে যে ঈশ্বর বলে [illegible]। একই ভাবে আমি এটাও প্রমাণ করতে পারব না যে শয়তান মানেই [illegible] কাল্পিত কাহিনী। খ্রীষ্টীয় ঈশ্বর থাকতেই পারে এবং ঠিক একইভাবে [illegible] ঈশ্বর, অথবা প্রাচীন ইজিপ্টের ঈশ্বর অথবা ব্যাবিলনের ঈশ্বর [illegible] পারে। কিন্তু এদের মধ্যে কোন প্রকল্পই (hypothesis) একে অন্যের [illegible] অধিক সম্ভাব্য নয় এমন কি এই সমস্ত প্রকল্পগুলি বা অনুমানগুলি সম্ভাব্য [illegible] মণ্ডলের বাইরে অবস্থান করে থাকে। এই জন্যেই তাদের কোনটাকেই [illegible] করে দেখার কোন কারণ নেই। এই প্রশ্নের উপর আমার বক্তব্যকে আমি [illegible] বিস্তৃত করতে চাই না, কেননা এই প্রশ্নের উপর আলোচনা আমি অন্য [illegible] করেছি (আমার 'লাইনিজের দর্শন' গ্রন্থটি দেখুন, পরিচ্ছেদ ১৫)।

ব্যক্তিগত অমরত্বের প্রশ্নটি যার উপর দাঁড়িয়ে আছে তার ভিত্তি কিছুটা [illegible]। দুভাবেই এর প্রমাণ দেওয়া সম্ভব। ব্যক্তিসকল প্রতিদিনের জগতের [illegible] অংশ এবং যে জগতের সঙ্গে বিজ্ঞান অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, এবং যে অবস্থা [illegible] অস্তিত্বকে নির্ধারণ করে থাকে তা আবিষ্কারযোগ্য। একটি জলের বিন্দু [illegible], কেননা এটিকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে ভাগ করা যেতে পারে

এইজন্য একবিন্দু জলের ক্ষেত্রে এইরকম ধারণা করা হয় যে এইরূপ বিভক্ত করার পরও যদি তার জলত্বের গুণটি বজায় থাকে তাহলে আমরা অবশ্য সন্দেহ করব একই ভাবে আমরা জানি যে মস্তিষ্ক অমর নয় এবং জীবিত শরীরের সংগঠিত শক্তি মৃত্যুতে নিঃসাড় হয়ে পরে, এইজন্য সে আর সমষ্টিগত ক্রিয়ায় যোগদান করতে পারে না। এই সমস্ত প্রমাণগুলি আমাদের এই সত্য প্রদর্শন করে থাকে যে যেটাকে আমরা আমাদের স্বাভাবিক জীবন বলে থাকি তা আসলে মস্তিষ্কের কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত এবং তা সংগঠিত শারীরিক শক্তি। এইজন্য এটা মনে করা যুক্তিযুক্ত যে মানসিক জীবন বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক জীবনও বন্ধ হয়ে যায়। যুক্তিটি কেবল-মাত্র সম্ভাবতা সম্পর্কিত, কিন্তু এটি এতটাই জোরালো যে যার উপর নির্ভর করে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলো গড়ে উঠেছে।

এখানে এমন অনেক পথ আছে যে পথে এই সিদ্ধান্তটিকে আক্রমণ করা যেতে পারে। মানসিক গবেষণা এই রকম শিক্ষা দিয়ে থাকে যার দ্বারা বেঁচে থাকার প্রকৃত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে এবং নিঃসন্দেহে এর পদ্ধতিটি আদর্শগত দিক দিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক। এই ধরনের প্রমাণগুলিই এমন প্রচণ্ড হয়ে থাকে যে কোন বৈজ্ঞানিক মানসিকতাসম্পন্ন মানুষই তাকে পরিহার করতে পারে না। প্রমাণের উপর যে ওজনটি যোগ করতে হবে তা অবশ্যই বেঁচে থাকার পূর্ববর্তী সম্ভাব্য অনুমানের উপর নির্ভরশীল হবে। যে-কোন ঘটনাগুচ্ছকে সর্বদা বিভিন্ন পথে স্বতন্ত্রভাবে মূল্যায়ন করা যায় এবং এদের মধ্যে আমরা একটিকে পছন্দ করে নিতে পারি যা পূর্ববর্তীমূলক ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে খুব কম অসম্ভাব্য। যারা ঠিক এইরকম ভাবেই ভেবে নিয়েছে যে মৃত্যুর পরেও আমরা বেঁচে থাকতে পারি তারা অবশ্যই প্রস্তুত থাকবে এইরকম ভাবে দেখতে যে এই তত্ত্বটি মানস সম্বন্ধীয় ঘটনার সম্পর্কে সব থেকে উত্তম ব্যাখ্যা প্রদান করে। অন্যদিকে যারা এই তত্ত্বটিকে অসত্য বলে ভাবে তারা অন্য ধরণের ব্যাখ্যা খুঁজবে। আমার দিক থেকে বলতে গেলে আমি মনে করি যে মানস সম্বন্ধীয় গবেষণা যতটা প্রমাণ উদাহরণস্বরূপ দিতে পারে তার থেকে অনেক বেশি প্রমাণ দিতে পারে শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণা। কিন্তু আমি এ কথা হলফ করে বলতে পারি যে কোন সময় এই তত্ত্বটি জোরালো হয়ে উঠতে পারে এবং যদি এরকম ঘটে তখন বেঁচে থাকার ব্যাপারটিকে অবিশ্বাস করাটা অবৈজ্ঞানিক হয়ে দাঁড়াবে।

শারীরিক মৃত্যুর পর বেঁচে থাকার ঘটনাটি যদিও অমরত্বের থেকে একটি স্বতন্ত্র ঘটনা। এই ধরণের ঘটনা কেবল এই অর্থ বহন করে যে মানসিক মৃত্যু হয়নি বা তা রহিত হয়ে গেছে। আর এটাকেই লোকে অমরত্ব বলে ভাবতে চায়। অমরত্বে বিশ্বাসী লোক কেবলমাত্র শারীরবিদ্যামূলক যুক্তির উপর নির্ভর করে

আমি এ বিষয়ে আগেই বলেছি, যে আত্মা এবং শরীর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এবং বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্য দিয়ে আত্মার বিকাশের যে অভিজ্ঞতা আমাদের আছে তার থেকে সে সম্পূর্ণভাবে আলাদা। আমি বিশ্বাস করি যে এটা আধিবিদ্যাগত কুসংস্কার। কিছু কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে মন এবং বস্তু অনেকটা একই অর্থ বহন করে থাকে, কিন্তু সেই সব ক্ষেত্রগুলো চরম বাস্তব নয়। আত্মার ইলেকট্রন ও প্রোটন কণার সমষ্টি, এক ধরণের যৌক্তিক কল্পকাহিনী, একটি বাস্তব ইতিহাস ও একগুচ্ছ ঘটনাবলী কিন্তু কোনটারই আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই। আত্মার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়, তা হল ঘটনাবলী থেকে আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ স্পষ্ট। এমন কে আছে যে ভাবতে পারে, কল্পনায় হ'ক 'গর্ভে থাকাকালীন অবস্থায় হ'ক' কিংবা শৈশবেই হ'ক, সে না বিশ্বাস করে উঠতে পারে না যে আত্মা অবিভক্ত কিছু একটা, যা উক্ত অবস্থাগুলোর মধ্যে দিয়ে চলার সময় যথার্থ ও সম্পূর্ণ থাকে। এটা প্রমাণ করা যায় যে আত্মা শরীরের মতোই বেড়ে ওঠে, এর উদ্ভব শুক্রাণু ও ডিম্বাণু থেকে, এর ফলে কখনো বিলুপ্ত হতে পারে না। এটা কোন বস্তুবাদ নয়, এটা কেবলমাত্র একটা উপলব্ধি যে প্রতিটি আগ্রহোদ্দীপক বস্তু মাত্রই সংগঠনমূলক সত্ত্বার বিষয়, কখনই একাকীত্ব সারসত্ত্বামূলক বিষয় নয়।

আধিবিদ্যাবিদরা আত্মা যে অবশ্যই অমর তা প্রমাণ করতে বহু যুক্তি প্রদান করে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। একটি সরল পরীক্ষার দ্বারা এই সমস্ত যুক্তি অকার্যকর করা যেতে পারে। সমস্ত অধিবিদ্যাবিদরা সমানভাবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে আত্মা সমগ্র অনন্ত জুড়ে ব্যাপ্ত রয়েছে। অনেক দিন বেঁচে থাকার জন্য যেমন মোটা হতে হবে এমন কোন আগ্রহ থাকে না, সেই রকমই কোন আধিবিদ্যাবিদরা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে তাদের যুক্তিগুলোকে প্রয়োগ করার দিকে মনস্থ করেন। এটা অন্ধ হয়ে থাকার আকাঙ্ক্ষার এক আশ্চর্য ক্ষমতা যা অতি সমর্থ মানুষকে ভুল যুক্তির পথে পরিচালিত করে থাকে যেটা না হলে সবকিছুই সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে যেতো। যদি আমরা মৃত্যুকে ভয় না পেতাম, তাহলে আমি বিশ্বাস করি না যে কখনও অমরত্বের ধারণা গড়ে উঠতে পারত।

আমার মতের ভিত্তি হল ভয়, যা মানবজীবনে রাজত্ব করে চলেছে। মানব মনের মধ্যে ভয় বস্তুটি, সে ব্যক্তিগত হ'ক কিংবা সমষ্টিগত হ'ক, আমাদের সামাজিক জীবনের উপর বেশি প্রভুত্ব করে থাকে। মন ও জড় বস্তুর মধ্যে বৈষম্য (dualism) কম বা বেশি ভ্রমাত্মক। কিন্তু আর একটি বৈষম্য দেখা যায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তা হল বস্তুদ্বয়ের মধ্যে যে অন্য ধরণের বৈষম্য আমরা দেখি তা আমাদের আকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্রভাবিত এবং কিছু বস্তুর ক্ষেত্রে এই

বৈষম্য আমাদের আকাঙ্ক্ষার দ্বারা ততটা প্রভাবিত নয়। এই দুই বস্তুর মধ্যে রেখাচিত্রটি আঁকা যায় তা যেমন স্পষ্টও নয় তেমনি অপরিবর্তনীয়ও নয়। বিজ্ঞান যত এগিয়েছে, ততই বহু বহু বস্তু মানুষের নিয়ন্ত্রণে এসেছে। অধিকন্তু এখনও অনেক বস্তুই অনিবার্যভাবে অন্যদিকে রয়ে গেছে। এই বস্তুগুলোর মধ্যে আমাদের জগতের সব থেকে বড় বড় ঘটনাগুলো রয়ে গেছে। এই ধরণের বড় বড় ঘটনাগুলো জ্যোতির্বিজ্ঞানের দ্বারাই ঘটেছে। পৃথিবীর উপরিপৃষ্ঠে বা পৃথিবীর নিকটে ঘটে যাওয়া এই সব ঘটনাগুলো, অন্তত কিছুটা দূর অবধি, আমাদের আকাঙ্ক্ষাগুলোকে দমিয়ে মানানসই করে তুলতে পারে। আমরা জানি যে পৃথিবীর উপরিপৃষ্ঠে আমাদের ক্ষমতা খুবই সীমিত। সর্বোপরি, আমরা মৃত্যুকে থামাতে পারি না, যদিও মৃত হওয়ার দিক থেকে কিছুটা বিলম্ব ঘটাতে পারি।

ধর্ম এই ধরণের বৈষম্যকে অতিক্রম করবার চেষ্টা করছে। যদি জগৎ ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ঈশ্বরকে যদি প্রার্থনা দ্বারা চালিত করতে পারা যায়, তাহলে আমরা সর্বময়তা অর্জন করব। পূর্বের দিনগুলোতে, প্রার্থনার উত্তরে দৈব ঘটনা ঘটে যেত। ক্যাথলিক চার্চে এখনো এই ধরণের ঘটনা ঘটে। কিন্তু প্রোটেস্টান্ট চার্চগুলো এই ধরণের ক্ষমতা হারিয়েছে। যদিও, দৈব ঘটনাগুলোকে ত্যাগ করে কাজ চালান সম্ভব, যেহেতু বিধাতা এই বিধান জারি করেছেন যে প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের কার্য সম্ভাব্য উত্তম ফল উৎপাদন করতে পারে। যেমন ঈশ্বরে বিশ্বাস এখনও পর্যন্ত প্রাকৃতিক জগৎকে মানবীয় করে রাখে, এবং মানুষকে এই অনুভব করায় যে পদার্থগত শক্তি বাস্তবে তাদের বন্ধু। একইভাবে অমরত্ব মৃত্যু থেকে মৃত্যুর ভয়াবহতাকে মুছে দেয়। যে-সব লোক এই বিশ্বাস করে যে যখন তারা মরবে তখন তারা উত্তরাধিকারসূত্রে অনন্ত আশীর্বাদের বা আনন্দের ধারক হবে তারা এটাও আশা করতে পারে যে, তাদের মৃত্যু হবে মৃত্যুর ভয়াবহতার অনুভব ছাড়াই, যদিও, সৌভাগ্যক্রমে চিকিৎসাবিদরা এই ধরণের ঘটনা কখনই ঘটতে পারে না বলে মনে করেন। যদিও, এটা মানুষের ভয়কে কিছুটা পরিমাণ কমিয়ে দেয়, কিন্তু এত করেও মানুষের ভেতরে উক্ত ভয়কে একেবারে উপশম করতে পারে না।

ভয়াবহতাই ধর্মের মূল উৎস। সে কিছু কিছু ধরণের ভীতিকে মর্যাদা প্রদান করেছে এবং মানুষকে তাদের সম্পর্কে অশ্রদ্ধা করতে কখনও শেখায়নি। এই পথেই সে মানুষের জন্য সব থেকে বড় অকাজটি করেছে। সমস্ত রকম ভীতিই খারাপ (all fear is bad)। আমি বিশ্বাস করি, যখন আমি মরব তখন আমি পচব এবং আমার কোন রকম অহঙ্কারই বেঁচে থাকবে না। আমি যুবক নই, এবং আমি জীবনকে ভালবাসি। কিন্তু মহাপ্রলয়ের ভয়াবহতার কথা চিন্তা করে ভয়

[illegible] আমার অবশ্যই ঘৃণা করা উচিত। সুখ বস্তুটি কোন সত্য সুখের থেকে [illegible] নয়। কারণ তার অবশ্যই একটা শেষ আছে। কিন্তু এরকম ভাবে ভাবা [illegible]। প্রেম তার মূল্য হারাচ্ছে, কারণ তাও চিরস্থায়ী নয়। অনেক মানুষ আছে [illegible] নিজেদেরকে মাচার উপর বহন করতে ভালবাসে। অবশ্য এই একই ধরণের [illegible] আমাদের মানুষের স্থান সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করতে শেখায়। প্রথমে [illegible] অন্দরমহলের ঐতিহ্যবাহী উষ্ণ মানবীয় পুরাণের পরিবেশে বিজ্ঞানের [illegible] খুলে দিলে ঠান্ডা বাতাস আমাদের কাঁপিয়ে দেয়, কিন্তু পরিশেষে সেই [illegible] বাতাস বয়ে নিয়ে আসে উৎসাহ এবং জানালা দিয়ে দেখা যায় অসীম [illegible] যা আপন মহিমায় দীপ্ত।

প্রকৃতির দর্শন এক, বস্তুমূল্যের দর্শন একেবারেই ভিন্ন। এই দুই দর্শনের [illegible] বিচ্ছেদতার সৃষ্টি করাটা একটা বিরাট ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা যা [illegible] পারি, আমরা যা পছন্দ করি, তা সেই বস্তুটির প্রকৃত স্বরূপের উপর নির্ভর [illegible] না, যে স্বরূপটি প্রকৃতির দর্শনের প্রশ্ন। অন্যদিকে, অমানবিক জগৎ [illegible] মূল্য দেয়নি তার উপর নির্ভর করে মূল্য প্রদানের ক্ষেত্রে এটা না ওটা [illegible] কোন ভুল করতে পারি না আমরা, না আমরা বাধ্য কোন কিছুকে প্রশংসা [illegible] ভিত্তির উপর যে সেটি প্রাকৃতিক নিয়ম। নিঃসন্দেহে আমরা প্রকৃতির [illegible] যা আমাদের মধ্যে বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা উৎপাদন করেছে। উৎপাদন করেছে [illegible] ভীতিসমূহ এবং সেই সব নিয়মসমূহ অনুযায়ী নিয়মগুলোকে পদার্থবিদরা [illegible] আবিষ্কার করতে শুরু করেছেন। এই অর্থে আমরা প্রকৃতির বশবর্তী, [illegible] নিয়মজাত ফলস্বরূপ এবং অনেক পরে এই সব নিয়মের কাছেই বলি [illegible] ..... we are part of nature, we are subordinated to nature, the [illegible] of natural laws, and their victims in the long run.)।

প্রকৃতির দর্শন অবশ্য অনুচিতভাবে পার্থিব নয়, কেননা, পৃথিবী ছায়াপথের [illegible] ক্ষুদ্র নক্ষত্রমালার মধ্যে একটি ছোট্ট গ্রহ। তাই এই অকিঞ্চিৎকর গ্রহের ক্ষুদ্র [illegible] বাসীদের আনন্দের খাতিরে প্রকৃতির দর্শনকে মুছে ফেলাটা একটা হাস্যাস্পদ [illegible] হবে। প্রাণবাদ (vitalism) এবং বির্বতনবাদ এই প্রসঙ্গে যে সত্যটা [illegible] কাছে তুলে ধরে তা হল, এগুলো সামঞ্জস্যমূলক চেতনাহীন এবং [illegible] সঙ্গতিহীন। এইসব মতবাদগুলি সেই সমস্ত ঘটনাগুলোকে সমাদর করে [illegible] যে ঘটনাগুলি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের কাছে আগ্রহোদ্দীপক, কেননা [illegible] একটা জাগতিক তাৎপর্য আছে বলে, তাদের পার্থিব তাৎপর্যের জন্য নয়। [illegible] দর্শন হিসাবে, আশাবাদ ও দুঃখবাদ সেই একই সরল মানবতাবাদকে [illegible] করে থাকে। এই জগৎ বিশাল, প্রকৃতির দর্শন থেকে যতদূর পর্যন্ত আমরা

এই বিশাল জগৎ জেনেছি তা না মঙ্গলময় না অমঙ্গলময়, এবং তা আমাদের সুখী বা অসুখী করবার সঙ্গেও সম্পর্কিত নয়। এই ধরণের সমস্ত দর্শনগুলো আত্ম গুরুত্ব থেকে নির্গত এবং তাদের আরও শুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে নক্ষত্র বিজ্ঞানের উপর এক ছটাক জ্ঞানের দ্বারা।

কিন্তু মূল্যের দর্শনের ক্ষেত্রে অবস্থাটা একেবারেই উল্টো। আমরা যতটা কল্পনা করতে পারি প্রকৃতি তারই একটা অংশ। বাস্তব বা কল্পিত প্রতিটি বস্তুই আমাদের দ্বারা প্রশংসিত হতে পারে, এবং এখানে এমন কোন বহির্মূল্যায়ন (out side standard) নেই যার দ্বারা দেখানো যেতে পারে যে আমাদের মূল্যায়ন ভুল। আমরা নিজেরাই সেখনে চরম এবং মূল্য প্রদানের ক্ষেত্রে অখণ্ডনীয় মধ্যস্থতাকারী এবং মূল্যের জগতে প্রকৃতি একটি অংশ মাত্র। এইভাবেই এই জগতে আমরা প্রকৃতির থেকে অনেক বড়। মূল্যের জগতে প্রকৃতি নিজেই নিরপেক্ষ। সে ভাল নয়, খারাপও নয়, সে প্রশংসারও যোগ্য নয়, নিন্দারও যোগ্য নয়। আমরাই মূল্য সৃষ্টি করি এবং সেই ধরণের আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করি যা মূল্য প্রদান করে থেকে এই রাজত্বে আমরা রাজা এবং আমরা তখন আমাদের রাজত্বকে নিকৃষ্ট করে তুলি যখন আমরা প্রকৃতির কাছে অবনত হই। আমাদের জন্যই মঙ্গলময় জীবনকে নির্ধারণ করতে হবে, প্রকৃতির জন্য নয়— এমনকি সেই প্রকৃতির জন্যও নয় যাকে আমরা ঈশ্বরে পরিণত করেছি।

(২) মঙ্গলময় জীবন

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানুষদের মধ্যে মঙ্গলময় জীবন সম্পর্কে ধারণা বিভিন্ন রকম। এই বিভিন্নতাই বিভিন্ন যুক্তির জন্য কিছুটা পরিমাণে দায়ী। এই ঘটনা তখনই ঘটেছে যখন মানুষ তাদের নিজের নিজের ধারণা অনুযায়ী উক্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে বিভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে। কেউ কেউ মনে করেছে কারাগার হল সেই মঙ্গলময় পথ যে পথে অপরাধকে আটকানো যেতে পারে। অন্যজনে এই ধারণা পোষণ করে থাকে যে শিক্ষাই উক্ত পথের থেকে অনেক বেশি মঙ্গলময়। এই ধরণের বিভিন্নতাগুলোকে যথেষ্ট প্রমাণ দর্শিয়ে সিদ্ধান্তের আঙিনায় নিয়ে আসা যায়। তলস্তয় সমস্ত রকম যুদ্ধকেই নিন্দা করেছেন। অন্যরা যোদ্ধার জীবনকে গ্রহণ করে সঠিককে মহান করবার জন্য যুদ্ধ করে। এক্ষেত্রে বাস্তব পার্থক্য জড়িত এবং লক্ষ্যগুলির মধ্যে পাথক্য দ্রষ্টব্য। যারা যোদ্ধাকে প্রশংসা করে থাকে তারা সাধারণত পাপীর শাস্তিকে মঙ্গলজনক পথ বলে মনে করে। তলস্তয় কিন্তু এরকম চিন্তা করেননি। এ ব্যাপারে কোনরকম যুক্তি প্রদর্শন অসম্ভব। এইজন্যই, আমি প্রমাণ করে বলতে পারি না যে মঙ্গলজনক জীবন সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গী সঠিক।

[illegible] আমার দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলতে পারি এবং আশা করতে পারি যে [illegible] তা সমর্থিত হবে। এই ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভঙ্গি হল :

মঙ্গলময় জীবন হল সেই জীবন যা প্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত' (The good life is one inspired by love and guided by knowledge)।

জ্ঞান এবং প্রেম উভয়ই অনির্দিষ্টভাবে প্রসারণক্ষম। এইজন্য একটি জীবন যতই মঙ্গলময় হ'ক না কেন, তার থেকেও অনেক বেশি উন্নত জীবন কল্পনা করা যায়। জ্ঞান ব্যতীত প্রেম, বা প্রেম ব্যতীত জ্ঞান, কোনটাই মঙ্গলময় জীবন সৃষ্টি করতে পারে না। মধ্য যুগগুলোতে, যখন কোন দেশে মহামারী উপস্থিত হত তখন ধর্ম যাজকেরা জনগণকে গীর্জায় সমবেত হয়ে উদ্ধার পাবার জন্য প্রার্থনা করতে আদেশ দিতেন। এর ফল দাঁড়াত এই যে বিনীতভাবে প্রার্থনাকারী মানুষের ভিড়ে আরো দ্রুত রোগটি ছড়িয়ে পড়ত। জ্ঞানহীন প্রেমের নজির এই ধরণের ঘটনা এবং এরকমটি প্রেমহীন জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই, ফল হত বিরাট আকারে মৃত্যু।

যদিও প্রেম এবং জ্ঞান উভয়ই প্রয়োজন। এর মধ্যে প্রেম হল সব থেকে জরুরী, যেহেতু এটি বুদ্ধিমান মানুষকে জ্ঞান অন্বেষণে প্রবৃত্ত করে সে যাদের ভালবাসে তাদের কিসে ভাল হয় তার জন্য। কিন্তু যদি জনগণ বুদ্ধিমান না হয়, তবে তাদের যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে তা শুনেই তারা সন্তুষ্ট থাকে, ভালো করার থেকে ক্ষতি করে বেশি। আমি যা বলতে চাইছি সে ব্যাপারে চিকিৎসাবিদ্যা খুব ভালো উদাহরণ। একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু অপেক্ষা একজন দক্ষ চিকিৎসাবিদ অনেক বেশি কার্যকরী। চিকিৎসাবিদ্যার জ্ঞানের অগ্রগতি মনুষ্যগোষ্ঠীর সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য একজন অজ্ঞানী মানবদরদী অপেক্ষা অনেক বেশি কাজ করতে পারে। অধিকন্তু, যদি ধনিক শ্রেণী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়ে তার থেকে লাভ সংগ্রহ করতে চায় তা হলেও ভালো, কেননা যে-কোন রকম ভাবে আবিষ্কারের ইচ্ছাটাই প্রয়োজনীয়।

প্রেম এমন একটি শব্দ যা বহু বিচিত্র অনুভবকে ঢেকে রাখে। আমি উদ্দেশ্য সহকারেই ভাবেই এই শব্দটি ব্যবহার করেছি সেই সব বিচিত্র অনুভবগুলো ধরতে পারার জন্য। আবেগ হিসেবে প্রেম— আমি যা বলতে চাইছি তা হল, প্রেমের জন্য কোন আদর্শ আমার কাছে খাঁটি মনে হয় না— এটি দুটি মেরুর মধ্যে চলাচল করে থাকে। একটি দিকে প্রশান্তিমূলক শুদ্ধ আনন্দ এবং অন্যদিকে শুদ্ধ সহানুভূতি বা উপকার করবার ইচ্ছা। যেখানে প্রাণহীন বস্তু সম্পর্কিত, সেখানে কেবল আনন্দ প্রবেশ করতে পারে। আমরা ছবিতে কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী

দেখে বা সোনাটা (SONATA) শুনে বদান্যতা অনুভব করতে পারি না। স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে যে এই ধরণের আনন্দই শিল্পকলার উৎস। নিয়ম অনুযায়ী এই ধরণের আনন্দ পূর্ণবয়স্ক শিশু অপেক্ষা কমবয়সের শিশুর মধ্যে বেশি থাকে, যারা উপযোগিতামূলক অনুপ্রেরণায় কোন বস্তুকে দেখতে সমর্থ। মানব জাতির অভিমুখে আমাদের এই ধরনের অনুভব খুব বড় কাজ করে। কেউ কেউ মুগ্ধতা অনুভব করে, আবার কেউ কেউ যখন কেবলমাত্র সৌন্দর্যতত্ত্বমূলক সন্তুষ্টির বস্তু হিসেবে তাকে দেখে তখন সে উল্টো অনুভব করে।

প্রেমের বিপরীত মেরুটি হল শুদ্ধ বদান্যতা। কুষ্ঠরোগীদের সাহায্য করতে গিয়ে বহু মানুষ তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে। এই ধরণের ঘটনায় যে ধরনের প্রেম তারা অনুভব করেছে তা সৌন্দর্যতত্ত্বমূলক কোন আনন্দ থেকে নয়। বাৎসল্য, নিয়ম অনুযায়ী, শিশুর উপস্থিতিজাত আনন্দ থেকে উদ্ভূত। কিন্তু এই স্নেহ আরও বেড়ে যায় যখন উপকরণটি সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত থাকে। অসুস্থ শিশু সন্তানের প্রতি মায়ের আগ্রহকেই বদান্যতা বলাটা বিষম হয়ে দাঁড়াবে, কারণ নয় ছয় পনের মার্কা প্রবঞ্চনাকর ধূসর আবেগকে আমরা এই ধরণের শব্দে চিহ্নিত করতে অভ্যস্ত। কিন্তু অন্য ব্যক্তির মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষাকে অন্য কোন শব্দে বর্ণনা করা দুরূহ। বাস্তবে পিতৃমাতৃ অনুভবের ক্ষেত্রে এই ধরনের আকাঙ্ক্ষা শক্তির যে-কোন মাত্রায় পৌঁছতে পারে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে সেটা অনেক কম তীব্র, বরঞ্চ এটা মনে করাটা অনেক সহজসাধ্য হবে যে, সব ধরণের পরোপকারের ধারণা মূলত পিতৃমাতৃমূলক অনুভবের প্রবাহ, অথবা কখনও তা এই ধরণের অনুভবের মঙ্গলজনক পথে পরিচালন বোঝায়। অপেক্ষাকৃত ভাল শব্দের চাহিদায়, আমি এই আবেগকে বদান্যতা বলে অভিহিত করব। কিন্তু এটা পরিষ্কার করে দিতে চাই যে, আমি একটি আবেগ সম্পর্কে কথা বলছি, কোন আদর্শ সম্পর্কে নয়, এবং তার ফলে আমি এই শব্দের সঙ্গে জড়িত কোন মহানতার অনুভবকে অন্তর্ভুক্ত করিনি। সমবেদনা (sympathy) শব্দটিকে আমি যা বুঝি তা তার কিছুটা অংশ। শব্দটির থেকে যে-সব কার্যকরী অংশ বাদ দেওয়া হয় আমি সেই অংশগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে চাই।

প্রেম (Love) শব্দটি চরম অর্থে দুটি উপকরণের অদ্রবীভূত মিশ্রণ, আনন্দ এবং শুভ-ইচ্ছা। সুন্দর ও সার্থক শিশুর পিতামাতার আনন্দের ক্ষেত্রে এই দুই ধরণের উপকরণ কাজ করে। যৌন প্রেমের ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব ঐ একই ঘটনা ঘটে। কিন্তু যৌন প্রেমের ক্ষেত্রে বদান্যতা ব্যাপারটি তখনি দেখা যায় যখন অধিকারের নিশ্চয়তা দেখা যায়, তা না হলে হিংসা তাকে ধ্বংস করে থাকে, যখন সম্ভবত প্রশান্তিজাত আনন্দ বাড়তে থাকে। শুভ-ইচ্ছা ব্যতীত আনন্দ নিষ্ঠুরতায় পর্যবসিত হতে পারে। আনন্দ ব্যতীত শুভ-ইচ্ছা শীতল ও একটু বেশি শ্রেষ্ঠতার

[illegible] পড়ে। একজন ব্যক্তি যে প্রেম চায় সে আসলে প্রেমের সেই বিষয় [illegible] সেখানে এই দুটি উপকরণই থাকবে, একমাত্র প্রবল দুর্বলতা ছাড়া, [illegible] এবং মারাত্মক অসুস্থতার বেলায় বদান্যতাকেই বেশি করে আকাঙ্ক্ষা [illegible]। বিপরীতভাবে, প্রবল শক্তির ক্ষেত্রে, বদান্যতার চেয়ে প্রশংসা অনেক [illegible]। এই ধরণের মানসিক অবস্থা দেখা যায় প্রসিদ্ধ রাজা বা সম্রাট [illegible] সুন্দরীদের ক্ষেত্রে। এই অনুভব করে আমরা মানুষের মঙ্গলময়-ইচ্ছা [illegible] পরিমাণেই চেয়ে থাকি যতটা পরিমাণ সাহায্যের প্রয়োজনে ও বিপদের [illegible] আমরা নিজেরা তাদের কাছে চাই। ব্যাপারটিকে অন্তত অবস্থার [illegible] জীববিদ্যাগত যুক্তি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে এই [illegible] সম্পূর্ণ সত্য নয়। আমরা স্নেহ আকাঙ্ক্ষা করে থাকি একাকিত্বের অনুভব [illegible] পেতে, যে ব্যাপারটি আমাদের কাছে 'উহ্য' থাকে। সমবেদনার [illegible]) এটাই হল বিষয় যে তা কেবলমাত্র বদান্যতা নয়। যে ব্যক্তির স্নেহ [illegible] কাছে সন্তুষ্টিমূলক জায়গায় পৌঁছতে পারে, সেই স্নেহ কেবলমাত্র [illegible] মঙ্গল কামনাই করে না সে জানে ঠিক কোথায় আমাদের সুখ লুকিয়ে [illegible]। কিন্তু এই ধরণের অনুভব মঙ্গলময় জীবনের অন্য আর একটি অনুভব, [illegible] আমরা জ্ঞান বলতে পারি।

[illegible]টি সঠিক জগতে প্রতিটি সচেতন সত্ত্বা প্রতিটি সত্ত্বার জন্য পূর্ণ প্রেমের [illegible] এই প্রেম আনন্দ, বদান্যতা ও বোঝাপড়ার সমাধানযোগ্য মিশ্রণ। তা বলে [illegible] বোঝায় না যে, এই বাস্তব জগতে, যে সব মানুষের সঙ্গে লড়াই করে [illegible] তাদের প্রতি আমাদের এই ধরণের অনুভব অর্জন করা উচিত। এমন [illegible] মানুষ আছে যাদের ব্যাপারে আমরা আনন্দ অনুভব করি না, কারণ তারা [illegible]। যদি আমরা এই ধরণের মানুষের ভেতরে সৌন্দর্য দেখবার চেষ্টা [illegible] নিয়ে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটাতাম তবে আমরা স্বাভাবিকভাবে যেসব বস্তুকে [illegible] তাদের সেইভাবে দেখবার সংবেদনশীলতাকে ভোঁতা করে ফেলতাম। [illegible] ধরণের মানুষের প্রসঙ্গে মানবজাতির কথা উল্লেখ করবেন না, কেননা তারা [illegible] তারপোকা এবং উকুনের মতো। এই ধরণের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে [illegible] করবার আগে আমাদের এন্‌সিয়েন্ট মেরিনার মতো দৃঢ়ভাবে রস [illegible] ক্ষমতা সম্পন্ন হতে হবে। এটা সত্য যে কিছু সাধু মানুষ এদেরকে [illegible] বলে ডেকে থাকেন, কিন্তু এই কথা বলে সেই সাধু মানুষরা যে [illegible] পেয়ে থাকেন তা তাঁদের নিজেদের গুণের প্রদর্শন মাত্র।

[illegible]কারকে সহজেই ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করা যায়, কিন্তু তার একটি সীমা [illegible]। যদি কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক হয় এবং সে যদি

দেখে যে অন্য আর একজন ব্যক্তিও সেই মহিলাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক, ... আমাদের এইরকম ভাবা উচিত হবে না যে তার পক্ষে নিজেকে প্রত্যাহার ... নেওয়াটাই ভালো হবে। এই ব্যাপারটিকে আমরা তখন ধরে নেব প্রতিযোগি... উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে। এক্ষেত্রে বিরুদ্ধ পক্ষের উপর তার অনুভব পূর্ণরূপে পরোপকারমূলক হতে পারে না। আমি মনে করি যে পৃথিবীর উপর মঙ্গলময় জীবনের সব রকমের বর্ণনাতে কোন-না-কোন জান্তব প্রাণবন্ততা ও প্রবৃত্তির ভিত্তিরূপে আমরা অবশ্যই অনুধাবন করতে পারি। এ ছাড়া, জীবন অবদমিত ... অনাগ্রহোদ্দীপক হয়ে ওঠে। সভ্যতা অবশ্যই এর সঙ্গে সংযুক্ত কিছু একটা... অবশ্যই তা এই ব্যাপারটির উল্টো কিছু নয়। এই জন্যেই কৃচ্ছ্রতাসম্পন্ন সন্ন্যাস... ও বিচ্ছিন্ন সাধু পূর্ণ মানব হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থ। মুষ্টিমেয় সংখ্যায় তারা কোন... গোষ্ঠীকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে, কিন্তু যে জগৎ তাদের নিয়েই রচিত সেই জগৎ অবশ্যই নৈরাশ্যে মরবে।

এই সমস্ত বিবেচনাগুলি উত্তম প্রেমের উপাদান হিসেবে আনন্দের উপকরণের উপর বিশেষ জোর দেওয়ার দিকে পরিচালিত হয়। আনন্দ, এই বাস্তব জগতে অবশ্যম্ভাবী রূপে নির্যাতনমূলক এবং যা আমাদের বাধা দিয়ে থাকে সমগ্র মনুষ্য জাতির প্রতি একই রকম অনুভব পোষণ করার ক্ষেত্রে। যখন আনন্দ ও বদান্যতার মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়, নিয়ম অনুযায়ী, তখন বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে একটা সিদ্ধান্তে অবশ্যই আসতে হয়, কিন্তু কখনই যে-কোন দুটির একটিকে পূর্ণ সমর্পণ করার দ্বারা তা হয় না। প্রবৃত্তির নিজস্ব কিছু অধিকার আছে কিন্তু সীমার বাইরে গিয়ে যদি আমরা তার প্রতি হিংসা প্রদর্শন করে থাকি তবে তা সূক্ষ্ম পথে তার প্রতিশোধ নিয়ে নেবে। এইজন্য মঙ্গলময় জীবনের লক্ষ্যে মানবিক সম্ভাব্যতার সীমা মনে অবশ্যই জন্ম নেবে। আবার বলতে হয়, যদিও, জ্ঞানের প্রয়োজনে আমাদের ফিরে আসতে হয়।

যখন আমি মঙ্গলময় জীবনের উপাদান হিসেবে জ্ঞানের কথা বলে থাকি, তখন আমি নৈতিক জ্ঞানের কথা ভাবি না, বরং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও বিশেষ ঘটনাগুলি সম্পর্কিত জ্ঞানের কথা ভাবি। সত্য করে বলতে গেলে আমি মনে করি না যে নৈতিক জ্ঞান বলে কোন কিছু আছে। আমরা যদি কোন লক্ষ্য অর্জন করতে চাই, জ্ঞান আমাদের দেখাতে পারে তার উপায়গুলি এবং এই জ্ঞান হাল্কাভাবে নৈতিক জ্ঞান হিসেবে আমাদের সামনে দিয়ে বয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে সেই নৈতিক জ্ঞানগুলির সম্ভাব্য ফল প্রদর্শন ছাড়াই আমরা তাদের মধ্যে কোনটা ঠিক বা ভুল তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারি। একটি লক্ষ্যকে অর্জন করবার জন্য দেওয়া হ'ক, দেখা যাবে যে কিভাবে তা অর্জন করা যায়

...বিষ্কারের জন্য সেটি বিজ্ঞানের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের কামনাপ্রসূত ...ক্ষাগুলিকে ঠিক মতো অনুধাবন করবার ক্ষমতা আছে কিনা তা পরীক্ষা করার ...মাদের আমরা সমস্ত নৈতিক সূত্রগুলির যোগ্যতা প্রমাণ করে নিতে পারি। আমি ...ই লক্ষ্যগুলির প্রসঙ্গে বলেছি যেগুলি আমরা কামনা করে থাকি, কিন্তু সেই সব ...ক্ষ্যগুলির কথা বলিনি যেগুলি আমাদের কামনা করা উচিত। কামনা করার ...ারণ যা আমাদের 'উচিত' বলে বিবেচিত সেই সব কামনাগুলি অপর কারুর ...ালোচ্য। সাধারণত এগুলি এরকমই যা কর্তৃপক্ষ আমাদের কামনা করতে ...খান— বাবা-মা, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, পুলিশ এবং বিচার করা। যদি আপনি ...মাকে বলেন, 'আপনার উচিত এটা কি সেটা করা', তবে আপনার মন্তব্যের ...লক শক্তি আপনার অনুমোদনের দিকে আমার কামনাকে চালিত করবে— তা ...া সকার সম্ভাব্য অনুমোদনের দিকে চালিত হতে পারে এবং তা আপনার ...নুমোদন ও অননুমোদন সাপেক্ষে পুরস্কারমূলক বা শাস্তিমূলক হতে পারে। ...ই সমস্ত রকমের আচরণ কামনা থেকেই উদ্ভূত, সুতরাং এটা পরিষ্কার যে ...ক্তি মতো কখনই কোন গুরুত্ব নিতে পারে না যতক্ষণ না তারা কামনাকে ...ভাবিত করতে পারে। অনুমোদনের কামনা এবং অননুমোদনের ভীতির ...ধ্যমেই তারা তাদের এই কাজ করতে পারে। এইগুলি ক্ষমতাসম্পন্ন সামাজিক ...ল। আমাদের সাপেক্ষে আমরা সেগুলি সাধারণভাবে জয় করবার চেষ্টা করি ...খনই, যখন আমরা কোন সামাজিক উদ্দেশ্যকে মেটাতে ইচ্ছা করে থাকি। যখন ...মি বলে থাকি যে নির্দেশিত আচরণের নৈতিকতাকে বিচার করে নিতে হবে তার ...ভাব্য ফলের দ্বারা, তখন আমি এই বলতে চাই যে সামাজিক উদ্দেশ্য পূরণার্থে ...রণীয় আচরণগুলির অনুমোদন আমি দেখার কামনা করি এবং বিপরীত ...াচরণের ক্ষেত্রে অননুমোদন দেখার কামনা করে থাকি। বর্তমানে এটি ঘটে না। ...খানে এমন কিছু ঐতিহ্যবাহী নিয়ম আছে যে নিয়মগুলি অনুযায়ী ফলসমূহকে ...াচাই করেই অনুমোদন এবং অননুমোদন করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই বিষয়টির ...পর আলোচনা আমরা পরবর্তী ভাগে করব।

সাধারণ ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক নৈতিকতার আধিক্য স্পষ্ট। উদাহরণ ...রূপ মনে করা যাক, আপনার শিশুটি অসুস্থ। আপনার প্রেম আপনাকে শিশুটিকে ...ারিয়ে তুলতে ইচ্ছা করাবে এবং বিজ্ঞান বলবে কেমন ভাবে আপনি শিশুটিকে ...ারিয়ে তুলতে পারেন। নৈতিক তত্ত্বের মধ্যে এমন কোন মধ্যবর্তী স্থান নেই ...খানে দাঁড়িয়ে একথা বলা যেতে পারে যে আপনার শিশুটিকে আরও ভালোভাবে ...ারিয়ে তোলা যেত। একটি লক্ষ্য পূরণের আকাঙ্ক্ষা থেকে আপনার কার্যটি ...াসারি উঠে আসে বিভিন্ন রকম উপায়ের জ্ঞানকে সঙ্গে নিয়ে। সব কার্যের

ক্ষেত্রেই এটা সমান সত্য, সে কার্য ভালো মন্দ যাই হ'ক না কেন। লক্ষ্যগুলি পরস্পর স্বতন্ত্র এবং কিছু কিছু লক্ষ্যের ক্ষেত্রে জ্ঞান অপর্যাপ্ত হতে পারে আবার কিছুর ক্ষেত্রে নাও হতে পারে। কিন্তু মানুষ যে কাজ করতে ইচ্ছুক নয় তাকে সেই কাজ করাবার জন্য কোন বোধগম উপায় নেই। যেটা সম্ভব সেটা হল পুরস্কার এবং শাস্তির ব্যবস্থার দ্বারা তাদের কামনাকে পরিবর্তিত করা। এক্ষেত্রে সামাজিক অনুমোদন এবং অননুমোদন খুব একটা কম বলশালী নয়। এই কারণেই বিধান সম্বন্ধীয় নীতিবিদদের জন্য যে প্রশ্নটি জাগে তা হল, কিভাবে এই পুরস্কার ও শাস্তিসমূহের ব্যবস্থাকে সাজালে বিধান সম্বন্ধীয় কর্তৃত্বদের কামনার সব থেকে বেশি সন্তুষ্টি নিশ্চিত করা যায়? যদি আমি এমন বলি যে, বিধান সম্বন্ধীয় কর্তৃত্বদের কামনাগুলি ভালো নয়, তখন আমি কেবলমাত্র এই কথাই বলতে চাই যে তাদের কামনা বা ইচ্ছাগুলি গোষ্ঠীর কিছু কিছু অংশের সঙ্গে দ্বন্দ্বরত থাকে যে অংশগুলিতে আমি বা আমার মতো লোকজন জড়িত থাকে। মানবিক কামনা বাসনার বাইরে কোনরকম নৈতিক মান নেই (outside human desire there is no moral standard.)

তাই বলা যেতে পারে যা নীতিবিদ্যার থেকে বিজ্ঞানকে স্বতন্ত্র করেছে তা কোন বিশেষ ধরণের জ্ঞান নয়, তা হল কামনা বা আকাঙ্ক্ষা। যে-কোন ক্ষেত্রে যেভাবে জ্ঞান অর্জন করা হয়ে থাকে সেরকমই নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে ঘটে। যে ঘটনাটা অদ্ভুত তা হল কিছু লক্ষ্যকে কামনা করা হয়ে থাকে এবং সেইসব লক্ষ্যের সহায়ক আচরণকে যথার্থ বলে ধরা হয়। সুতরাং বলা যায়, যদি ব্যাখ্যাটি যথার্থ আচরণ সম্পর্কীয় হয়ে থাকে তা হলে তার আবেদনের পরিধিও ব্যাপক। মনুষ্যজাতির বেশিরভাগ অংশের কামনা বাসনার উপরই লক্ষ্যগুলি গড়ে ওঠে : যথার্থ আচরণগুলিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করলে আমার অর্থ উপার্জন ভালো হবে, পাঠক তা কোনভাবেই মেনে নেবে না। যে কোন কার্যকরী নৈতিক যুক্তি তার বৈজ্ঞানিক অংশে নিহিত থাকে, তা হল, অন্যান্য কিছু আচরণের চেয়ে বিশেষ এক ধরণের আচরণ যা সেই লক্ষ্য পূরণের উপায় যে লক্ষ্য ব্যাপকভাবে আকাঙ্ক্ষিত। যদিও আমি নৈতিক যুক্তি এবং নৈতিক শিক্ষাকে স্বতন্ত্রভাবে দেখি। নৈতিক শিক্ষা কিছু আকাঙ্ক্ষাকে শক্তিশালী করে তোলে এবং তা করতে গিয়ে সে কিছু আকাঙ্ক্ষাকে দুর্বল করে তোলে। এটা সম্পূর্ণভাবে একটি ভিন্ন ধরণের পদ্ধতি, যা শেষের দিকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হবে।

এখন আমরা সেই মঙ্গলময় জীবনের সংজ্ঞার তাৎপর্য আরও ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি যে বিষয়টি নিয়ে এই পরিচ্ছেদটি শুরু হয়েছিল। যখন আমি বলেছিলাম যে মঙ্গলময় জীবন প্রেমের দ্বারা গঠিত এবং জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত,

[illegible] কামনা আমাকে এই কথা বলতে তৎপর করেছিল তা ছিল যতদূর সম্ভব [illegible] একটা জীবন বাঁচার কামনা এবং অন্যকে তার জীবনে এই রকম ভাবে [illegible] দেখার কামনা। এই বিবৃতির অন্তর্নিহিত যুক্তিটি হল যে, একটি গোষ্ঠীতে [illegible] মানুষ এইভাবে বসবাস করে, সেখানে কামনাগুলির অনেক বেশি সন্তুষ্টি [illegible] হয়ে থাকে তাদের চেয়ে যারা অপেক্ষাকৃত কম প্রেম ও জ্ঞানের পরিবেশে [illegible] করে। আমি এই অর্থ করছি না যে এই ধরনের জীবন 'পুণ্যবান' অথবা [illegible] বিপরীতটি হল 'পাপময়,' কেননা এই রকম কল্পনা আমার কাছে কোন [illegible] গ্রাহ্যতা রাখে না।

(৩) নৈতিক নিয়মসমূহ

[illegible]নৈতিক উপদেশগুলির বাস্তব প্রয়োজনীয়তা কামনার দ্বন্দ্ব থেকে উঠে আসে [illegible] এই দ্বন্দ্ব ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মধ্যে হতে পারে অথবা ভিন্ন সময়ে একই মানুষের [illegible] হতে পারে, এমনকি একই সময়ে একই মানুষের মধ্যেও হতে পারে। [illegible] মানুষ মদ্যপানের আকাঙ্ক্ষা করতে পারে এবং পরের দিন সকালে তার [illegible] করবার জন্য সে সুস্থ থাকার আকাঙ্ক্ষাও করতে পারে। আমরা তখনই [illegible] অনৈতিক বলব যদি সে বেছে নেয় সেই রাস্তা যে পথ তার সমগ্র আকাঙ্ক্ষার [illegible] সামান্যই পূরণ করতে পারে। আমরা সেইসব মানুষ সম্পর্কে বাজে ভাবি [illegible] অতিরঞ্জিত ও বেপরোয়া। এমনকি যারা নিজের ক্ষতি ছাড়া অন্যের ক্ষতি [illegible] না তাদের সম্বন্ধেও ওই একই কথা ভাবা হয়। বেন্থাম মনে করতেন যে [illegible] আত্ম-স্বার্থ' থেকেই নৈতিকতার সবকিছুর জন্ম' এবং একজন ব্যক্তি [illegible] সর্বদা তার নিজের সর্বাধিক সন্তুষ্টির দিকে নজর রেখে কাজ করে, পরবর্তীকালে [illegible] কাজ করে তাই সর্বদা সঠিক হয়। আমি এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারি [illegible]। স্বৈরাচারীরা তাদের মধ্যেই বিদ্যমান যারা শাস্তিপ্রসূত অত্যাচার পর্যবেক্ষণ [illegible] তীব্র আনন্দ পেয়ে থাকে। আমি সেই ধরণের মানুষকে কখনই প্রশংসা [illegible] পারি না যারা মিতব্যয়িতার সঙ্গে তাদের কাছে বলিস্বরূপ প্রদত্ত মানুষদের [illegible] স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেয় এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে তারা অন্য কোন দিন আরও [illegible] আচারিত হবে। অন্যান্য বস্তু বা দিকগুলি সমান হলে, মিতব্যয়িতা মঙ্গলময় [illegible] একটি অংশ। এমনকি রবিনসন ক্রুশোকেও প্রাসঙ্গিক কারণে পরিশ্রম, [illegible] সংযম এবং দূরদর্শিতার সাধনাকে গ্রহণ করতে হয়েছিল যাকে অবশ্যই [illegible] গুণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, কেননা তারা বিপরীত ভারসাম্যকে বজায় [illegible] গিয়ে অপরকে কোনরকম আঘাত না করে তাদের সমষ্টিগত পরিতৃপ্তিকে [illegible] পেরেছিল। নৈতিক গাথাগুলির এই অংশ সেই সব কিশোর বয়স্ক

ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে খুব বড় ভূমিকা পালন করে, যাদের ভবিষ্যৎ চিন্তার দিকে ঝোঁক আছে। যদি পরবর্তীকালে জীবনে এগুলোকে খুব বেশি সাধন করা যেত তবে জগৎটা খুব তাড়াতাড়ি স্বর্গ হয়ে যেত, কারণ তা সেই যুদ্ধগুলিকে বন্ধ করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হত, যে যুদ্ধগুলি ভাবাবেগ জাতীয় কাম নয়। তথাপি, মিতব্যয়িতার গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও নৈতিক গাথাগুলিতে এটি খুব আগ্রহোদ্দীপক অংশ নয়। এটি এমনও কোন অংশ হয়ে উঠতে পারেনি যা বৌদ্ধিক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে, সেহেতু এটি আত্মকেন্দ্রিক উদ্দেশ্যের বাইরে কোন আবেদন রাখতে পারে না।

নৈতিকতার যে অংশ পরিণাম দর্শিতা বা মিতব্যয়িতার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রকৃতপক্ষে আইনসদৃশ অথবা মুগুরের শাসন। একটি গোষ্ঠীতে একসঙ্গে থাকতে সমর্থ করে তোলে এই সম্ভাবনা সত্ত্বেও যে সেখানে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা গুলি পরস্পর-বিবাদী হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এখানে দুটি ভিন্ন ধরণের পদ্ধতি সম্ভব। একটি হল অপরাধমূলক আইনের পদ্ধতি, যে আইনের লক্ষ্য সেই সমস্ত কার্যরত বিরক্তিকর ঘটনা গুলিকে যোগ করে কেবলমাত্র বাহ্যিক সংগতি রক্ষা করা যে ঘটনাগুলি অন্যান্য মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কোন-না-কোন ভাবে আঘাত করে। এটাকে সামাজিক নিন্দার পদ্ধতিও বলা যায়। কেউ তার নিজের সমাজের দ্বারা বাজে ভাবে চিহ্নিত বা ভাবিত হলেও তা এক ধরণের শাস্তি। নিজেদের সংবিধান লঙ্ঘন করছে জেনেও বেশির ভাগ মানুষ এই ধরণের শাস্তিগুলোকে অগ্রাহ্য করে। কিন্তু এখানে আরও একটি পদ্ধতি আছে, যা আরও বেশি মৌলিক এবং অনেক বেশি সন্তুষ্টিজনক যখন এটি সফল হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিটি হল মানুষের চরিত্র ও কামনা গুলিকে সেই পথে পরিবর্তিত করা যে পথে একটি মানুষের কামনা গুলিকে অন্যান্য মানুষের কামনার সঙ্গে সঙ্গতিকর করে তুলে বিবাদের উপলক্ষ গুলিকে কমিয়ে দেওয়া যায়। এই জন্য ঘৃণার থেকে প্রেম ভালো, কেননা উল্লেখিত ব্যক্তির কামনাগুলিতে প্রেম বিবাদের পরিবর্তে সঙ্গতি নিয়ে আসে (That is why, love is better than hate, because it brings harmony instead of conflict into the desire of the person concerned)। দুটি মানুষ, যাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম আছে, তারা উভয়ে সমানভাবে সফল বা ব্যর্থ হয়। কিন্তু যখন দুটি মানুষ পরস্পরকে ঘৃণা করে, তখন সফল একজন হয় আর অন্যজন বিফল হয়।

যদি আমরা এ কথা বলে ঠিক কাজ করি যে মঙ্গলময় জীবন প্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহলে এটা পরিষ্কার যে, কোন গোষ্ঠীর সংহিতা কখনই চরম এবং যথেষ্ট নয়। কিন্তু তাকে এই দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা

... তবে অবশ্যই দেখতে হবে যে সেখানে কোন প্রজ্ঞা এবং বদান্যতাকে রায় ... করা হয়েছে কিনা। নৈতিক সংহিতা সর্বদা দোষমুক্ত নয়। সূর্যের ... কমে যাবে এই ভয়ে মানুষের মাংস খেয়ে অ্যাজটেক জাতিরা মনে করে যে ... তাদের একটা যন্ত্রণাদায়ক কর্তব্য। তারা ভুল করে থাকে তাদের বিজ্ঞান বোধে ... যদি তারা প্রদত্ত বলিকে ভালবাসতে পারত তবে তারা অবশ্যই বৈজ্ঞানিক ... অনুভব করতে পারত। কোন কোন উপজাতি ১০ থেকে ১৭ বছর বয়স্ক ... অন্ধকারে কয়েদ করে রাখে। তারা এই কাজ করে এই ভয়ে যে, সূর্যরশ্মির ... গর্ভবতী হয়ে যেতে পারে। কিন্তু অবশ্যই আমাদের আধুনিক নৈতিক ... এইরকম আইনের সদৃশ কোন আইন পাওয়া যাবে না যে আইনগুলি ... জাতিরা ব্যবহার করে থাকে। নিশ্চয়ই আমরা শুধুমাত্র সেই সব আইনকে ... করব যারা সত্যই ক্ষতিকারক, অথবা এতটাই জঘন্য যা কোন সুন্দর মানুষ ... করতে পারে না? আমি অবশ্য এ ব্যাপারে খুব একটা নিশ্চিত নই।

... নৈতিকতা উপযোগবাদ ও কুসংস্কারের অদ্ভুত মিশ্রণ কিন্তু কুসংস্কারের ... শক্তিশালী। এটাই স্বাভাবিক, যেহেতু কুসংস্কার নৈতিক শাসনের উৎস ... superstition is the origin of moral rules.)। প্রকৃতপক্ষে কোন কোন ... এমন কার্যরূপে ভাবা হয়েছিল যা ভগবানের কাছে নিরানন্দজনক এবং ... কাজকে আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ করা হল কারণ স্বর্গীয় ক্রোধ কেবলমাত্র ... ব্যক্তিদের জন্যই নামবে না, তা সমগ্র গোষ্ঠীর উপরই নেমে আসবে। ... থেকেই পাপের ধারণার উন্মেষ এবং পাপ ভগবানের কাছে নিরানন্দজনক। ... যুক্তিকে স্থির করা যায়নি যে কেন কোন কোন বিশেষ কার্য এরকম ... হবে। উদাহরণস্বরূপ, এটা বলা খুব সত্যি যে কেন ছাগল-মায়ের ... ছাগলছানাকে ফোটানোটা নিরানন্দজনক। কিন্তু বাইবেলের শেষ গ্রন্থে ... ধরণের ঘটনার কথাই বলা হয়েছে। কখনও কখনও স্বর্গীয় আদেশসমূহকে ... ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, শনিবার আমাদের কাজ না ... বলা হয়েছে এবং প্রোটেস্টান্টরা তার অর্থ করে নিলো যে রবিবারগুলোতে ... খেলা করা উচিত নয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও পুরোনো নিষেধাজ্ঞার মতোই ... একই মহান কর্তৃত্ব নব্য নিষেধাজ্ঞায় অর্পিত হল।

... করা যায় যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন একজন ব্যক্তি শাস্ত্রের উপদেশ ... চার্চের শিক্ষাকে ভয় পেয়ে চলবার অনুমতি নিজেকে প্রদান করে ন। সে ... কথা বলে প্রশান্তি লাভ করে না যে, 'এই-এই ধরণের কাজ পাপমূলক ... মৃত্যুকে ডেকে আনবে।' সে খোঁজ করবে আদৌ এই ধরণের কাজ কোন ... করবে কিনা' অথবা, একটু ঘুরিয়ে বলতে গেলে বলা যায়, সে খোঁজ চালাবে

যেটিকে পাপ বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে সেটি আদৌই ক্ষতিকারক কিনা। সে দেখায় যে, বিশেষত যে-সব বিশ্বাসগুলি যৌনতার সঙ্গে জড়িত, সেগুলি আমাদের বর্তমান নৈতিকতার বেশিরভাগ স্থান জুড়ে রয়েছে এবং তার বেশিরভাগ অংশের উৎসই হল পুরোপুরি ভাবে কুসংস্কার। সে এ-ও দেখতে পাবে যে অ্যাজটেকদের কুসংস্কারের মতো যে-সব কুসংস্কার অপ্রয়োজনীয় নিষ্ঠুরতায় পর্যবসিত হয় সেগুলোকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা যায় যদি জনসাধারণ তাদের প্রতিবেশীদের প্রতি দয়ার্দ্র অনুভূতির দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু ঐতিহ্যমূলক নৈতিকতা রক্ষা করা কদাচিৎ উষ্ণ হৃদয়সম্পন্ন মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়, যার প্রমাণ গীর্জার উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সৈন্যবাদের প্রদর্শনের প্রতি ভালোবাসা। একজন এটা ভেবে উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে যে তারা নৈতিক নিয়মগুলোকে মূল্য দেয় এই কারণে যে তা যন্ত্রণাকে আরোপ করার জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষার বাইরে বেরিয়ে আসার বৈধ উপায়। পাপী-পাপী খেলাটা বড় সুন্দর যাকে সহ্যশক্তির দ্বারা ধরে রাখা যায়।

আসুন কবরের কল্পনা থেকে সাধারণ মানুষের জীবনকে আমরা বোঝায় চেষ্টা করি। আমরা লক্ষ্য রাখবো সেইসব দিকগুলোতে যেখানে কুসংস্কারাচ্ছন্ন নৈতিক নিয়মগুলো প্রতিকারমূলক যন্ত্রণাকে আরো করে। যে কারণে আমি কল্পনা দিয়ে শুরু করেছি তা হল, এখানে কুসংস্কারের প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যদি বাবা-মা বিবাহিত না হয় তবে তা শিশুর কলঙ্ক, এ ধরণের মনোভাব সম্পূর্ণ অমূলক। যদি বাবা বা মায়ের যে-কোন কারুর যৌন রোগ থাকে, তাহলে শিশুর মধ্যেও সেই রোগের সম্ভাবনা থেকে যায়। যদি তাদের বহু সন্তান থাকে তবে সেখানে অনাহার, দারিদ্র্য, অতিজনসংখ্যাজনিত ভার এবং সেই অনুযায়ী অজাচার থাকবে। অতএব বেশির ভাগ নীতিবাদীরাই এই মত সমর্থন করে থাকেন যে বাবা-মায়েদের যা জানাই ভালো কিভাবে প্রতিকারমূলক কল্পনার দ্বারা এই শোচনীয় অবস্থাকে প্রতিরোধ করা যায় (এটা সৌভাগ্যক্রমে বেশিদিন সত্য থাকেনি। প্রোটেস্টান্ট এবং ইহুদিদের বেশিরভাগ নেতারা এখন জন্মনিয়ন্ত্রণে আপত্তি করে না। ১৯২৫ সালে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাসেলের বিবৃতি যথার্থভাবে নিখুঁত বর্ণনা। এটা অবশ্যই তাৎপর্যমূলক যে, একটি কিংবা দুটি ব্যতিক্রম ছাড়া, জন্মনিয়ন্ত্রণের বেশিরভাগ প্রধান প্রচারকরা, যেমন— ফ্রান্সিস প্লেস, রিচার্ড কারলাইল, চার্লস নলটোন, চার্লস ব্র্যাডলাফ এবং মারগারেট স্যাঙ্গার— এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন স্বাধীন চিন্তাবিদ— সম্পাদকীয় টীকা)। এইসব নীতিবিদদের খুশী করতে গিয়ে অত্যাচারিত জীবনে সংগ্রাম লক্ষ লক্ষ মানবের উপর আরোপিত হয়েছে যাদের কখনও বেঁচে থাকা উচিত নয়, শুধুমাত্র এই কারণে যে সন্তানের আকাঙ্ক্ষা ছাড়া যে-কোন রকম যৌন সঙ্গম একটা পাপ। কিন্তু সেই সব

আমাদের হতভাগ্য বানাবার জন্য যে যৌন আকাঙ্ক্ষা বর্তমানে নির্বিচারে চলছে তা পাপের নয়। কারুকে হঠাৎ খুন করো এবং তারপর খাও, যা অ্যাজটেকদের বলি প্রদত্ত ব্যক্তির ভাগ্য ঘটে, তা সেই শিশুর উপর আরোপিত অত্যাচারের থেকে অনেক কম যে শিশুটি এই শোচনীয় পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছে এবং যৌন পাপের দ্বারা কলঙ্কিত হয়েছে। অতএব নৈতিকতার নামে রাজনীতিবিদ ও বিশপদের দ্বারা আরোপিত অনবরত অত্যাচার আরও ভয়ঙ্কর। যদি শিশুদের জন্য তাদের ভেতরে এতটুকুও প্রেমের বিচ্ছুরণ থাকত, থাকত করুণা, তবে তাঁরা এই সব নৈতিক আইনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পারতেন না, যে আইনগুলো জঘন্য নিষ্ঠুরতার সঙ্গে যুক্ত।

জন্মের সময় এবং শৈশবে, গড়ে সব শিশুই কুসংস্কারের চেয়ে অর্থনৈতিক কষ্টে বেশি ভোগে। যখন সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাদের সন্তান হয়, তখন থেকে তাদের জন্য থাকে অনেক ভালো ডাক্তার, ভালো নার্স, ভালো পথ্য, ভালো বিশ্রাম এবং ভালো আরাম। কিন্তু শ্রমজীবী মহিলারা এই ধরণের সুযোগ-সুবিধা পায় না এবং তাদের শিশুরা মারা যায় ওই সব সুযোগ-সুবিধার অভাবে। জনগণের কর্তৃপক্ষ মায়েদের যত্ন নেবার ক্ষেত্রে খুবই কম কাজ করে এবং যাও বা করে তা নিতান্তই ক্রোধান্বিত হয়েই করে। একই সময়ে খরচ কমাতে যখন তারা মায়েদের সেবার জন্য বরাদ্দ দুধের যোগান বন্ধ করে দেয়, তখন কম গাড়ি ঘোড়ার ভীড়সম্পন্ন স্থানে বিলাসবহুল বাড়িতে থাকবার জন্য তারা বিরাট পরিমাণ টাকা খরচ করে থাকে। এটা তারা ভালোভাবেই জানে যে এই ধরণের সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে তারা শ্রমজীবী শ্রেণীর বেশকিছু শিশুকে দারিদ্র্যের অপরাধের নামে মৃত্যুদণ্ডে অভিযুক্ত করে থাকে। এই ক্ষেত্রেই আমরা দেখি শাসক দল প্রচুর পরিমাণ ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের দ্বারা সমর্থিত হয়ে থাকে, যারা তাদের মাথার উপর পোপকে রেখে সামাজিক অবিচারকে সমর্থন করতে পোপের সমস্ত কুসংস্কারের বিরাট ক্ষমতার পক্ষে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে।

শিক্ষার সমস্ত স্তরেই কুসংস্কারের প্রভাব ধ্বংসাত্মক। কিছু শতাংশ শিশুর ব্যাপারে চিন্তা করা। শিক্ষার অনেকগুলি লক্ষ্যের মধ্যে একটি লক্ষ্য হল তাদেরকে এই ধরণের চিন্তার রোগ থেকে সারিয়ে তোলা। অসুবিধাজনক প্রশ্ন তাদের 'চুপ' করে কিংবা শাস্তি পেয়ে করতে হয়। সমষ্টিগত আবেগকে ধীরে ধীরে এক বিশেষ ধরণের বিশ্বাসে পরিণত করার কাজে লাগানো হয়, বেশি কাজে লাগানো হয় জাতীয়তা ধরণের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে। শিক্ষাক্ষেত্রের পুঁজিপতি, সেনাবাদী ও ধর্মযাজক পুরোহিতরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে সমবায় গড়ে তুলেছে। তাদের ক্ষমতার জন্য এদের সবাই আবেগবাদের ব্যাপকতা ও চুলচেরা বিচারের অক্ষমতার উপর নির্ভর করে থাকে। মানবিক প্রকৃতির সাহায্যে, সাধারণ

মানুষের মধ্যে এই ধরণের প্রবণতাকে বাড়িয়ে তোলা ও তাদেরকে তীব্র করে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষা সফলতা পেয়ে থাকে।

অন্য যে পথে কুসংস্কার শিক্ষার ক্ষতি করে থাকে সেটা হল শিক্ষক নির্বাচনের উপর এদের প্রভাব। অর্থনৈতিক কারণের জন্য একজন মহিলা-শিক্ষক অবশ্যই বিবাহিত হবেন না এবং নৈতিক কারণের জন্য তাঁর বিবাহিত জীবনের বাইরে কোন অতিরিক্ত যৌন সম্পর্ক গড়ে অবশ্যই উঠবে না। এইজন্য যাঁরা বিষণ্ন তার মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করার কষ্ট স্বীকার করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই জানেন, নিয়ম হিসেবে একটি দীর্ঘকুমারীত্ব একজন মহিলার পক্ষে মাত্রাতিরিক্ত ক্ষতিকর এবং এটা এতটাই ক্ষতিকর যে কোন সুস্থ সমাজে শিক্ষকদের এই ব্যাপারে বারবার নিরুৎসাহিত করা হয়ে থাকে। শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ যত বেশি হয়ে ওঠে ততই উদ্যোগী ও প্রাণবন্ত মহিলারা শিক্ষকের পেশায় ঢুকতে অস্বীকার করে। এটা ঘটে থাকে কেবলমাত্র কুসংস্কারাচ্ছন্ন কৃচ্ছ্রতাবাদের বিরক্তিজনক প্রভাবে।

মধ্য এবং উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিতে ব্যাপারটি আরও বাজে আকার ধারণ করে। সেখানে দেখা যায় ভজনালয়ের কার্য এবং যাজক শ্রেণীর হাতে নৈতিক চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখার ক্ষমতা। নৈতিকতার শিক্ষকদের মতোই যাজক শ্রেণীও প্রায় অবশ্যম্ভাবীরূপে এই দুই দিক থেকেই ব্যর্থ হয়ে থাকে। তারা সেইসব কাজকে নিন্দা করে যে কাজগুলো কোন ক্ষতি করে না এবং তারা সেইসব কাজকে ক্ষমা করে থাকে যে কাজগুলো বিরাট ক্ষতি করে। তারা সবাই সেইসব অবিবাহিত মানুষের মধ্যে যৌন সম্পর্ককে নিন্দা করে থাকে যারা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত কিন্তু এমন নিশ্চিত নয় যে তারা সারা জীবন পরস্পর একসঙ্গে থাকতে চাইবে। তাদের বেশিরভাগ অংশই জন্মনিয়ন্ত্রণকে নিন্দা করে থাকে। কিন্তু তাদের কেউই সেই স্বামীর পশুত্বকে নিন্দা করে না যে তার স্ত্রীকে বারবার গর্ভবতী করে তার মৃত্যুর কারণ হয়। আমি বাতিকগ্রস্ত একজন যাজককে চিনতাম যার স্ত্রীর ন'বছরে নটি সন্তান হয়েছিল। ডাক্তাররা তাকে বলেছিল যদি তার আর একটি সন্তান হয় তবে সে মারা যাবে। পরের বছর তার আর একটি সন্তান হল এবং সে মারা গেল। কারুর কোন নিন্দা হল না এবং সেই যাজক তার বৃত্তিতে রয়ে গেল এবং আবার বিয়ে করল। যতদিন এই ধরণের যাজকরা নিষ্ঠুরতাকে ক্ষমা প্রদর্শন করবে এবং নিষ্পাপ আনন্দকে করবে নিন্দা, ততদিন তারা যুবজনতার নৈতিকতার অভিভাবক হিসেবে কেবল ক্ষতিই করতে পারবে।

শিক্ষার উপর কুসংস্কারের অন্য আর একটি মন্দ প্রভাব হল যৌন ঘটনা সম্পর্কে নির্দেশের অনুপস্থিতি। বয়ঃসন্ধি আসার আগে যখন তারা উত্তেজিত অবস্থায় থাকে না তখন এ বিষয়ে তাদের সহজ ও স্বাভাবিকভাবে প্রদান

...ঘটনাগুলোকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। বয়ঃসন্ধিকালে, কুসংস্কারমুক্ত ...নৈতিকতার উপকরণ গুলিকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। ছেলেমেয়েদের এই ...শিক্ষা দেওয়া উচিত যে যদি পরস্পরের বন্ধুত্বমূলক আগ্রহ না থাকে তবে ...কোনোরকম যৌন সঙ্গমকে সুবিচার বলা যেতে পারে না। এই ধরণের চিন্তা ...আগেকার শিক্ষার বিপরীত। তারা এই মত পোষণ করে যে, যদি দুজন ...বিবাহিত হয় এবং পুরুষমানুষটি যদি অন্য আরও একটি সন্তান চায়, তবে স্ত্রীর ...অনিচ্ছা সত্ত্বেও যৌন সঙ্গম বৈধ। ছেলেমেয়েদের অবশ্যই পরস্পরের ...ব্যক্তিগত সম্পর্কে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাদের অবশ্য এই অনুভব ...করার সমর্থ করে তোলা উচিত যে হিংসা ও সংকীর্ণ অধিকারবোধ প্রেমকে হত্যা ...করে। শিক্ষা দেওয়া উচিত যে, অপর একটি মানুষকে পৃথিবীতে নিয়ে আসাটা ...একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং তখনি তাকে নিয়ে আসার কথা ভাবা যেতে ...পারে যখন শিশুটির জন্য যৌক্তিক ভবিষ্যৎ, সুস্থ পরিবেশ এবং বাবা-মায়ের তাকে ...লালন করার ক্ষমতা থাকবে। কিন্তু তাদের জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি সম্পর্কেও শিক্ষা ...দেওয়া উচিত এটা নিশ্চিত করতে যে শিশু কেবলমাত্র তখনি আসবে যখন তারা ...আকাঙ্ক্ষিত হবে। পরিশেষে, তাদেরকে যৌন রোগ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া উচিত ...এবং সেই সঙ্গে তার প্রতিকার ও আরোগ্যের পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া উচিত। ...এই ভাবে যৌন শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানবিক সুখকে বাড়িয়ে তোলার সম্ভাবনা প্রচুর।

...যেখানে শিশু জন্ম নেবে না এই রকম বিষয়ে বা পরিস্থিতিতে যৌন সম্পর্ককে ...একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক বলে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত, যা রাষ্ট্র কিংবা প্রতিবেশী ...কারোরই ভাববার বিষয় নয়। এমন কিছু যৌন ক্রিয়াকলাপ আছে যেগুলো কখনই ...শিশুর জন্ম দেয় না, সেগুলো বর্তমানে অপরাধের আইনের দ্বারা দণ্ডিত। এই ...ধরণের ঘটনা সম্পূর্ণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন। কেননা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দু'জন মানুষ ছাড়া ...ব্যাপারটা কারুকেই প্রভাবিত করে না। যে ক্ষেত্রে শিশুরা থাকে, সেখানে এটা ...ভাবা করাটা ভুল হবে যে তাদেরই প্রয়োজনে বিবাহ-বিচ্ছেদ করাটাকে প্রয়োজনীয় ...ভাবা খুবই কষ্টকর। আচরণগত অন্ধকার, নিষ্ঠুরতা, পাগলামি প্রভৃতির উপর ...নির্ভর করে শিশুদের জন্যেই স্বামী কিংবা স্ত্রী উভয়ের ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদ ...অত্যাবশ্যকীয় হয়ে ওঠে। এ'ব্যাপারে ব্যভিচারের উপর যে অদ্ভুত ধরণের গুরুত্ব ...আরোপ করা হয়ে থাকে তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এটা পরিষ্কার যে বিবাহিত ...জীবনের সুখ সম্পর্কে যে-কোন ধরণের অন্যায় আচরণ সাধারণ ছোটখাট ...ব্যভিচারের থেকে বিরাটভাবে ক্ষতিকর। বছরে একটি করে শিশুর জন্ম দেওয়ার ...জন্য পুরুষের জোর খাটানো প্রথাগত ভাবে অন্যায় আচরণ নয় কিংবা নিষ্ঠুরতা ...নয় কিন্তু সব থেকে বড় ক্ষতিকারক।

নৈতিক নিয়মগুলো এমন হওয়া উচিত নয় যেখানে প্রবৃত্তিমূলক সুখ অসম্ভব হয়ে ওঠে। যেমন—যে গোষ্ঠীতে একবিবাহ নীতির প্রভাব দৃঢ়ভাবে আছে সেখানে দুটি যৌন সম্পর্ক খুবই অসমানুপাতিক। যদিও এই পরিবেশের অধীনে নৈতিক নিয়মগুলো লঙ্ঘিত হয়ে থাকে। কিন্তু নিয়মগুলি এমনি যে তারা কেবল মান্যতা লাভ করতে পারে গোষ্ঠীর অবনতিসম্পন্ন সুখের থেকে এবং যখন তাদেরকে মেনে চলার থেকে লঙ্ঘন করাটাই শুভ হয়ে থাকে তখন বুঝে নিতে হবে যে এটাই নিশ্চিতভাবে সেই সময় যখন নিয়মগুলোর পরিবর্তন ঘটে গেছে। যদি এটা না ঘটে, তবে এটা বুঝতে হবে বহু মানুষ যারা জনগণের আগ্রহের বিপরীত পথে তাদের কাজ চালাচ্ছেন তারা ভণ্ডামি বা তেরছা পথের বিকল্প স্বরূপ অযৌক্তিক পথের সম্মুখীন হচ্ছেন। ভণ্ডামিকে গীর্জা কিছু মনে করে না, কেননা তা গীর্জার ক্ষমতার সমীপে ছিনাল অঞ্জলি। কিন্তু অন্যান্য জায়গায় এটাকে অশুভ বলে প্রতিপন্ন করা হয় যাকে হাল্কাভাবে ধরা উচিত নয়।

ঈশ্বরভিত্তিক কুসংস্কারগুলির চাইতেও জাতীয়তা ভিত্তিক কুসংস্কারগুলি আরও বেশি ক্ষতিকর। এই কুসংস্কারগুলি এ'রকম কথা বলে থাকে, যে কর্তব্য কেবল নিজের দেশের জন্যই কর, অন্য কোন দেশের জন্য কর না। কিন্তু একজনের স্বাদেশিকতার সীমার বাইরে আঙুল তুলে আমি এই আলোচনা করার প্রস্তাব করব না যে স্বাদেশিকতা প্রেমের আদর্শের ঠিক বিপরীত, যে আদর্শকে আমরা মঙ্গলময় জীবন গঠনের জন্য স্বীকার করে নিয়েছি। যদিও এটা আলোকিত আত্ম-স্বার্থের বিপরীত, যেহেতু একটিও গোঁড়া জাতীয়তাবাদ বিজয়ী জাতিগুলিকেও ছাড়ে না।

অন্য আর একটি দিকে যেখানে আমাদের সমাজ 'পাপ'-এর শাস্ত্রীয় ধারণার দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে থাকে সেটি হল অপরাধীর প্রতি আচরণ। অপরাধীরা 'দুষ্ট' এবং শাস্তির 'যোগ্য'। এটা এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে না যাকে যৌক্তিক নৈতিকতা সমর্থন করতে পারে। নিঃসন্দেহে কিছু পরিমাণ মানুষ সেই সমস্ত কাজ করে থাকে যে কাজগুলোকে সমাজ বাধা দিতে চায় এবং সমাজ তাদের যতদূর সম্ভব বাধা দিয়ে সঠিক কাজই করে। সহজ উদাহরণস্বরূপ আমরা কোন খুনের ঘটনাকে নিতে পারি। স্পষ্টতই যদি একটি গোষ্ঠী পরস্পরের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে এবং যদি সেই বন্ধনযুক্ত আবদ্ধিত গোষ্ঠী থেকে আমাদের আনন্দ ও সুযোগ সুবিধা নিতে হয় তবে আমরা পরস্পরকে খুন করার অনুমতি জনগণকে দিতে পারি না, কিন্তু তারা এই ধরণের কাজ করবার তাড়নাই অনুভব করে থাকে। কিন্তু এই ধরণের সমস্যাকে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক চেতনার দ্বারা দেখা উচিত। সহজভাবে আমাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত : খুন বন্ধ করবার সব থেকে উত্তম পদ্ধতিটি কী? দুটি পদ্ধতির মধ্যে দুটিই খুন বন্ধ করার ক্ষেত্রে সমান ফলপ্রসূ। এদের মধ্যে যেটি

[illegible] খুব কম ক্ষতিকারক সেটিকে বেছে নিতে হবে। খুনীর ক্ষতি করাটা [illegible] প্রসূত যন্ত্রণার মতোই সম্পূর্ণভাবে দুঃখজনক। তা দু'ক্ষেত্রেই সম্ভবত [illegible] প্রয়োজনীয় হলেও এটা কোন আনন্দের বিষয় নয়। যে নিষ্ঠুর [illegible] 'নৈতিক অবিচারজনিত রাগ' বলা হয় তা শুধুমাত্র এক প্রকার [illegible] কেবলমাত্র নিষ্ঠুর শাস্তির দ্বারাই অপরাধীকে কষ্ট দেওয়াটা কখনও কোন [illegible] হতে পারে না। যদি শিক্ষা কোমলতার সঙ্গে মেশে তবে তা সমানভাবে [illegible] এবং এটাকেই বাঞ্ছনীয় বলা যায়। এটা যদি আরও কার্যকরী হয়ে ওঠে [illegible] তা আরও বেশি বাঞ্ছনীয় হয়ে উঠবে। যদিও অপরাধের প্রতিকার ও [illegible] শাস্তি দুটি ভিন্ন ধরণের প্রশ্ন। অপরাধীকে যন্ত্রণা প্রদানের কারণ [illegible] সাপেক্ষে প্রতিকারমূলক। যদি কয়েদখানাকে এতটাই মানবিকীকরণ করে [illegible] যেত যে সেখানে কয়েদিরা শুধুই শুভ শিক্ষা পেত তবে মানুষ সেই [illegible] প্রবেশাধিকার পাওয়ার জন্যই কেবল অন্যায় করত। নিঃসন্দেহে [illegible] চেয়ে কয়েদখানা অবশ্যই নিরানন্দজনক। কিন্তু ফলাফলকে নিশ্চিত [illegible] জন্য সব থেকে উত্তম পথটি হল স্বাধীনতাকে আরও বেশি আনন্দজনক [illegible] তোলা সেই স্বাধীনতার চেয়ে যে স্বাধীনতা বর্তমানে কখনও কখনও মেলে। [illegible] আইনের সংস্কার সাধন বিষয়ে আমি আমার জাহাজ ভেড়াতে চাই না। [illegible] এই উপদেশ দিতে চাই যে আমরা প্লেগ রোগে আক্রান্ত রুগিকে যেমন [illegible] তেমন ভাবেই একজন অপরাধীকে আমাদের দেখা উচিত। এরা [illegible] জনগণের পক্ষে বিপজ্জনক এবং যতদিন পর্যন্ত বিপজ্জনক থাকবে [illegible] পর্যন্ত তাদের স্বাধীনতাকে অবশ্যই খর্ব করে রাখা দরকার। কিন্তু যে [illegible] প্লেগ রোগে আক্রান্ত সে সহানুভূতি ও অনুকম্পার বিষয় এবং সেখানে [illegible] অভিশাপের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এটা হয়ে থাকে আচরণগত বিভেদের [illegible] যেখানে আমাদের কয়েদখানা গুলো অপরাধীদের প্রবণতাকে সারিয়ে [illegible] ব্যর্থ সেখানে আমাদের হাসপাতাল রোগকে সারিয়ে তুলছে।

(৪) মুক্তি : ব্যক্তিগত ও সামাজিক

[illegible] ঐতিহ্যবাহী ধর্মের অনেকগুলি ত্রুটির মধ্যে একটি হল তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, [illegible] ধর্মের সঙ্গে যুক্ত নৈতিকতার সঙ্গে এই ত্রুটি যুক্ত। ঐতিহ্যবাহিকতার দিক [illegible] ধার্মিক জীবন পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী, আত্মা ও ঈশ্বরের কথোপকথন ছিল। [illegible] ইচ্ছা মেনে চলাটাই ছিল পুণ্যের এবং গোষ্ঠীর অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ [illegible] ব্যক্তির পক্ষেই এটা সম্ভবপর ছিল। প্রোটেস্টান্ট গোষ্ঠী মুক্তির উপায়-এর [illegible] বিকাশ ঘটিয়েছিল কিন্তু খ্রীষ্টীয় শিক্ষায় এই ব্যাপারটি সর্বদাই বিদ্যমান

ছিল। স্বতন্ত্র আত্মার এই ধরণের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ইতিহাসের বিশেষ স্তবগুলোতে মূল্য পেয়েছিল কিন্তু আধুনিক জগতে আমাদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক মঙ্গলের ধারণা থেকে সামাজিক মঙ্গলের ধারণা করা অনেক বেশি প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আমি এই বিবেচনা করে দেখাতে চাই যে কিভাবে এই বিষয়টি মঙ্গলময় জীবন সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে প্রভাবিত করে থাকে।

রোম সাম্রাজ্যে সেই সমস্ত জনগণের মধ্যে খ্রীষ্টীয়বাদ জেগে ওঠে যারা তাদের সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে বসেছিল, যাদের জাতীয় রাষ্ট্র সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং এক বিরাট ব্যক্তিত্বহীন সমষ্টিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল। খ্রীষ্টীয় যুগে প্রথম তিন শতাব্দী ধরে যে-সব ব্যক্তি খ্রীষ্টীয়বাদকে গ্রহণ করেছিল তারা তৎকালীন যে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বাস করত, সেইসব রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ফুটোফাটাগুলোকে পরিবর্তন করতে পারেনি, যদিও তারা তাদের বাজে দিকটির সম্পর্কে মৌলিকভাবে স্বীকার করে গেছে। এই পরিবেশ গুলোতে এটা খুবই স্বাভাবিক যে তারা এই ধরণের বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে ছিল যে একটি অযথার্থ জগতে একজন ব্যক্তি যথার্থ হয়ে উঠতে পারে এবং এই জন্যেই একটি মঙ্গলময় জীবনের এই জগতের সঙ্গে কোন কাজ থাকতে পারে না। যা আমি বলতে চাইছি তা প্লেটোর 'রিপাব্লিক' গ্রন্থের তুলনায় সরল। যখন প্লেটো মঙ্গলময় জীবনের বর্ণনা করতে চেয়েছেন তখন তিনি সমগ্র গোষ্ঠীকে বর্ণনা করেছেন, কখনই একজন ব্যক্তিকে বর্ণনা করেননি। তিনি এটা করেছিলেন ন্যায় বিচারকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। তিনি প্রজাতন্ত্রের নাগরিকত্বে অভ্যস্ত ছিলেন এবং নাগরিক হিসেবে রাজনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণকে সমর্থেন করেছিলেন গ্রীস স্বাধীনতা হারাবার সঙ্গে সঙ্গে স্টোয়িকবাদের উন্মেষ হয় যেটা অনেকটা খ্রীষ্টীয়বাদের মতোই এবং প্লেটোর আদর্শের সঙ্গে যার মিল নেই, কেননা তারা মঙ্গলময় জীবন সম্পর্কে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতামূলক ধারণা গ্রহণ করেছিল।

আমরা যারা বিরাট গণতন্ত্রগুলোতে বসবাস করি তাদের দেখা উচিত যে স্বেচ্ছাচারী সাম্রাজ্যবাদী রোমের তুলনায় স্বাধীন এথেন্সে অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত নৈতিকতা ছিল। ভারতবর্ষে, যেখানে রাজনৈতিক পরিবেশ খ্রীষ্টের সময় জুডিয়ার দেশগুলোর মতো সমানুপাতিক ছিল, সেখানে আমরা দেখবো গান্ধী খ্রীষ্টের নৈতিকতার মতোই সমনৈতিকতা প্রচার করছেন এবং এইজন্য তাঁকে পন্টিয়াস পাইলেটের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত উত্তরাধিকারদের হাতে শাস্তি পেতে হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের উগ্র জাতীয়তাবাদীরা ব্যক্তির মুক্তিতেই সন্তুষ্ট ছিল না, তারা চেয়েছিল জাতীয় মুক্তি, এর জন্য তারা পাশ্চাত্যের স্বাধীন গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ

...ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি এই পরামর্শ দিতে চাই যে এইসব ক্ষেত্রগুলোতে ...ই পাশ্চাত্য খ্রীষ্টীয়বাদের প্রভাবে এখনো আত্ম-সচেতন ও সাহসী হয়ে উঠতে ...পারে, এবং এখনো তা ব্যক্তির মুক্তিতে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য বিঘ্নিত হচ্ছে।

...মঙ্গলময় জীবন সম্পর্কে আমরা যেমন ধারণা করি, তা বহু সামাজিক অবস্থার ...উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে এবং এগুলো ছাড়া এই ধারণাকে বুঝে ওঠা যায় না। ...আগেই বলেছি যে মঙ্গলময় জীবন প্রেম ও জ্ঞানের দ্বারা অনুপ্রাণিত। ...জ্ঞান সেখানেই বিদ্যমান থাকতে পারে যেখানে সরকার ও কোটিপতিরা ...ধারণার আবিষ্কার ও তার সম্প্রসারণের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করে। ...স্বরূপ, ক্যান্সারের প্রসারণ আশঙ্কাজনক— আমাদের এ সম্পর্কে কি করা ...এক মুহূর্তে কেউ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না কেবলমাত্র জ্ঞানের ...। বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে গবেষণা ছাড়া এই জ্ঞানের উন্মেষ সম্ভব নয়। ...সেইসব মানুষ যারা এর উত্তর চাইছে তাদের বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য ...কথা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন। এরজন্য জনগণের কর্তৃপক্ষসমূহের ...বিন্যাসের প্রয়োজন। কেবলমাত্র ধর্মীয় কথোপকথনের দ্বারা অর্জনের বিষয় ...। এছাড়াও বিদেশ ব্যবসা আছে যেটা ছাড়া গ্রেট ব্রিটেনের অর্ধসংখ্যক ...অনাহারে থাকবে এবং যদি আমরা অনাহারে থাকি তবে আমাদের মধ্যে ...মানুষ মঙ্গলময় জীবন কাটাতে পারবে। উদাহরণ হিসেবে আরও অনেক ...অপ্রয়োজনীয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল যে, সমস্ত ক্ষেত্রে যা মঙ্গলময় ...মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করে, সেখানে সমগ্র জগৎ একটি ঐক্যরূপ লাভ করে। ...সেই মানুষ যে স্বাধীন জীবনের ভান করে ঘুরে বেড়ায় সে সচেতন অথবা ...পরজীবী ছাড়া আর কিছুই নয়।

...মুক্তির ধারণা, যাকে সঙ্গে নিয়ে পুরাতন খ্রীষ্টীয়বাদীরা তাদের ...পরাধীনতার জন্য নিজেদের সান্ত্বনা দিয়ে রাখতো, তা সত্বর অসম্ভব ...উঠলো যেই আমরা মঙ্গলময় জীবন সম্পর্কে খুব সংকীর্ণ ধারণা থেকে উঠে ...পারলাম। গোঁড়া খ্রীষ্টীয় ধারণা অনুযায়ী মঙ্গলময় জীবন হল পুণ্যবান ...। পুণ্য নির্ভর করে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে মেনে চলার উপর এবং প্রতিটি ব্যক্তির ...ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যক্ত হয়ে থাকে তাদের বিবেকের কণ্ঠস্বরের দ্বারা। মানুষ ...এই ধরণের ধারণা একটি বিদেশী স্বৈরাচারবাদের বিষয়ে। একটি ...জীবন ধর্ম ছাড়াও অন্যান্য অনেক বিষয়ের সঙ্গে বেশি যুক্ত— ...স্বরূপ, বুদ্ধি। বিবেক সব থেকে বেশি ভ্রান্ত পথনির্দেশক, যেহেতু এটি ...বয়সের শোনা উপদেশগুলির অস্পষ্ট স্মরণ, অতএব বিবেক কখনই ...কারিণী মা বা ধাত্রীর জ্ঞানের থেকে বড় নয়। সঠিকভাবে একটি মঙ্গলময়

জীবন কাটাতে গেলে মানুষের অবশ্যই ভালো শিক্ষা থাকা আবশ্যক, বন্ধুবান্ধব, প্রেম, সন্তানাদি (যদি সে তাদের আকাঙ্ক্ষা করে) আবশ্যক। চাহিদা ও গভীর উদ্বেগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চাই যথেষ্ট উপার্জন, উন্নত স্বাস্থ্য এবং কর্ম। এই সমস্ত জিনিস, বিভিন্ন মাত্রায় গোষ্ঠীর উপর নির্ভর করে এবং রাজনৈতিক ঘটনার দ্বারা বাধা পায় কিংবা সাহায্য পায়। একটি মঙ্গলময় জীবন একটি মঙ্গলময় সমাজেই কাটানো যায়, অন্যথায় আর অন্য কোন জায়গায় সম্ভব নয়।

সম্ভ্রান্তশ্রেণীর আদর্শে এটাই একটা মৌলিক ত্রুটি। কিছু কিছু মঙ্গলময় বস্তু, যেমন কলা বিজ্ঞান এবং বন্ধুত্ব সম্ভ্রান্ত সমাজে খুব ভালোভাবে সমৃদ্ধ হতে পারে। দাসত্বের উপর ভিত্তি করে সম্ভ্রান্ত শ্রেণী গ্রীসে বিদ্যমান ছিল, শোষণের উপর নির্ভর করে তারা আমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে। কিন্তু প্রেম, সহানুভূতির আকারে, অথবা বদান্যতার আকারে, সম্ভ্রান্ত সমাজে বেঁচে থাকতে পারে না। সম্ভ্রান্তরা নিজেদেরকে এই বলে প্ররোচিত করে যে দাস অথবা সর্বহারা অথবা কালা আদমিরা কাদামাটির দ্বারা তৈরি, তাদের দুঃখ-কষ্ট কোন ব্যাপারই নয়। বর্তমান মুহূর্তে, সম্ভ্রান্ত ইংরেজ ভদ্রলোকরা আফ্রিকানদের এতবার চাবুক মারে যে তারা অব্যক্ত মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণায় কয়েক ঘন্টার পরেই মারা যায়। এমনকি যদি এই ভদ্রলোকেরা উচ্চশিক্ষিতও হয়ে থাকে, কিংবা তারা শিল্পীসুলভ এবং প্রশংসনীয় বাগ্মীও হয়, তা হলেও আমি এটা স্বীকার করে নিতে পারি না যে তারা কোন মঙ্গলময় জীবন অতিবাহিত করছে। মানবিক প্রকৃতি সহানুভূতির ক্ষেত্রে কিছু সীমা আরোপ করেছে, কিন্তু সংকুচিত করেনি। গণতান্ত্রিক মানসিকতাসম্পন্ন সমাজে, কেবলমাত্র পাগলই এইভাবে আচরণ করতে পারে। সম্ভ্রান্তদের আদর্শে সহানুভূতির যে সীমাটি দেখা যায় সেটি হল দণ্ড। মুক্তি সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর একটি আদর্শ, কেননা এটি একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধারণা। এই কারণে ব্যক্তিগত মুক্তির ধারণা, যাকে যতই ব্যাখ্যা করা হ'ক কিংবা প্রসারিত করা হ'ক না কেন, কখনও মঙ্গলময় জীবনের কোন ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারে না।

মুক্তির অন্য বৈশিষ্ট্যটি হল যে এটি সাধু পলের কথোপকথনের মতোই মহা আকস্মিক পরিবর্তনে পর্যবসিত হয়। শেলীর কবিতাগুলোতে সমাজের উপর আরোপিত এই রকম ধারণার ছবি পাওয়া যায়— সময় যখন এসেছিল তখন প্রত্যেকেই পরিবর্তিত হয়ে পড়েছিল ও 'নৈরাশ্য' ছেয়ে ফেলেছিল চারদিক এবং 'জগতের সেই বিরাট যুগ নতুন হতে শুরু করেছিল'। বলা যেতেই পারে যে একজন কবি গুরুত্বহীন মানুষ এবং যার ধারণাগুলো কোন ঘটনাই নয়। কিন্তু আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে বৈপ্লবিক নেতাদের একটি বিরাট অংশ শেলীর মতোই ধারণা পোষণ করতেন। তাঁরা মনে করতেন যে স্বৈরাচারী, পুরোহিত

...পুঁজিপতি অথবা জার্মানরা যতরকম নিষ্ঠুরতা, যাতনা এবং হীনতা প্রাপ্তির ...ায়ী ছিল। এই কারণে এইসব দুষ্ট প্রভাবের উৎসগুলোকে যদি ছুঁড়ে ফেলে ...যায় তবে হৃদয়ের একটি সাধারণ পরিবর্তন হবে এবং আমরা সবাই সুখে-...বাস করতে পারব। এই বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে তাঁরা যুদ্ধের দ্বারা ...শেষ করার ইচ্ছা পোষণ করে এসেছিলেন। তুলনামূলকভাবে তাঁরাই ...যারা পরাজয় বা মৃত্যুকে বরণ করে নিতে পেরেছিলেন এবং তাঁরাই ...ছিলেন যাঁরা জয়ের তিলক কপালে পরার পর বৈরাগী হয়ে পড়েছিলেন ...তাঁদের সমস্ত উজ্জ্বল আশাকে হারিয়ে হতাশার শিকার হয়েছিলেন। এই ...আশা গুলির উৎস ছিল খ্রীষ্টীয় মুক্তির পথ হিসেবে আকস্মিক মহা ...রূপান্তরের তত্ত্ব।

আমি এই পরামর্শ দিতে ইচ্ছা করি না যে বিপ্লব গুলি আর কখনই প্রয়োজনীয় ...। কিন্তু আমি অবশ্যই এই পরামর্শ দেব যে সহস্রাব্দের মধ্যে বিপ্লবগুলি ঘটানো ...হবে না। মঙ্গলময় জীবন কোন সোজা পথ নয়, তা ব্যক্তিগত বা সামাজিক ...হোক না কেন। মঙ্গলময় জীবন গড়তে গেলে, আমাদের অবশ্যই বুদ্ধিকে গড়ে ...হবে, গড়ে তুলতে হবে আত্ম-সংযম ও সহানুভূতিকে। এটা একটা ...বিষয় এবং একটি ক্রম-উন্নতির বিষয়, শৈশব শিক্ষার বিষয় এবং ...ক্ষেত্রে গবেষণার বিষয়। কেবলমাত্র অধৈর্যই হঠাৎ উন্নতির সম্ভাবনার প্রতি ...দ্রুত বাড়িয়ে তোলে। ক্রম-উন্নতি সম্ভব এবং যে পদ্ধতির দ্বারা এটি ...করা সম্ভব তা ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানের বিষয়। এ সম্পর্কে যা বলা যেতে পারে ...আমি একদম শেষে আলোচনা করবার চেষ্টা করব।

(৫) বিজ্ঞান এবং সুখ

...নীতিবিদদের উদ্দেশ্য হল মানুষের স্বভাবের উন্নতি ঘটানো। এটা একটি ...প্রশংসনীয় উচ্চাশা, যেহেতু তাদের স্বভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শোচনীয়। কিন্তু ...আমি নীতিবিদদের কোন দিক থেকেই প্রশংসা করতে পারি না, সে তিনি একটি ...উন্নতিই চান কিংবা সেই বিশেষ উন্নতি অর্জন করবার জন্য যেসব পদ্ধতি ...গ্রহণ করেছেন তার জন্য। তাঁদের কৃত্রিম পদ্ধতি হল নৈতিক উপদেশ। ...বাস্তব পদ্ধতি (যদি তিনি গোঁড়া ধর্মাবলম্বী হন) একটি অর্থনৈতিক পুরস্কার ...শাস্তির ব্যবস্থা। পূর্বেরটি স্থায়ী বা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সৃষ্টি করে না। সাভোনারোলা ...আজ পর্যন্ত পুনরুত্থানবাদীদের প্রভাব সর্বদাই ক্ষণস্থায়ী হয়ে এসেছে। কিন্তু ...অর্থাৎ পুরস্কার ও শাস্তি—উল্লেখযোগ্য প্রভাব সৃষ্টি করতে পেরেছে। ...স্বরূপ, এই ব্যবস্থা একটি মানুষকে অর্ধস্থায়ী গৃহকর্ত্রী অপেক্ষা পতিতাকে

বেশি পছন্দ করতে বাধ্য করেছে, কারণ এমন একটি পদ্ধতিকে গ্রহণ করাই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে যে পদ্ধতিকে অতি সহজেই লুকিয়ে ফেলা যায়। এইভাবেই তারা বহুসংখ্যক সাংঘাতিক পেশা গ্রহণ করেছে এবং যৌন রোগের ব্যাপকতাকে নিশ্চিত করেছে। নীতিবিদরা অবশ্যই এই ধরণের ঘটনা ঘটুক তা আশা করেননি। কিন্তু তাঁরা ঘটনাটিকে পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণ অবৈজ্ঞানিক. কেননা উক্ত ঘটনাগুলি হল তাই যা সে বাস্তবে অর্জন করেছে।

ধর্ম প্রচার ও উৎকোচ গ্রহণের বৈজ্ঞানিক মিশ্রণের কোন প্রতিভূ আছে কি? আমি মনে করি আছে।

অজ্ঞতা বা মন্দ কামনাগুলি থেকেই মানুষের কর্মগুলি মন্দ হয়। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যখন আমরা 'মন্দ' কামনাগুলির কথা বলি, তখন সেই কামনাগুলিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে সেগুলো অপরের কামনাগুলোকে বাধা দিতে চায় অথবা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, মন্দ কামনা বলতে সেই কামনাগুলিকে বোঝায় যেগুলো অনেক কামনাকে সাহায্য করার পরিবর্তে বাধা দিয়ে থাকে। অজ্ঞতা থেকে যে অনিষ্টকারী প্রভাবের সৃষ্টি হয় তাকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। এখন এ'কথা বলতে হয় যে জ্ঞানের সমৃদ্ধিই হল একমাত্র প্রয়োজনীয়। অতএব আরও বেশি শিক্ষা ও গবেষণার মধ্যেই উন্নতির রাস্তা নিহিত আছে। কিন্তু অনিষ্টকারী প্রভাব যা মন্দ কামনাগুলির থেকে উত্থিত হয় তা বেশ দুরবগাহ বিষয়।

সাধারণ নারী ও পুরুষের মধ্যে কিছু পরিমাণ সক্রিয় অপকার করবার ইচ্ছা থাকে। উভয়ের বিশেষ ধরণের অশুভ ইচ্ছা নির্দিষ্ট শত্রুদের দিকে পরিচালিত হয় এবং অপরের দুর্ভাগ্যকে দেখে তাদের সাধারণ নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ বোধ হয়। সুন্দর সুন্দর শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে এই ঘটনাগুলিকে ঢেকে রাখাটা প্রচলিত প্রথা। প্রথাগত নৈতিকতার অর্ধেকটাই উক্ত ঘটনাগুলিকে ঢেকে রাখার বোরখা। যদি নীতিবিদদের লক্ষ্য অনুযায়ী আমাদের আচরণকে উন্নত করে তাকে বাস্তবায়িক করতে চাই তবে আমাদের সমস্যার সম্মুখীন হতেই হবে। এগুলোকে ছোট এবং বড় হাজার পথে দেখানো যেতে পারে। মানুষ বারবার কুৎসা রটাতে কিংবা তাকে বিশ্বাস করতে এক রকম আনন্দ পায়। অপরাধীর সঙ্গে ভালো আচরণ করে তাকে দ্রুত ফিরিয়ে আনা যায় এটা জানা সত্ত্বেও তার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়। সাদা চামড়ার জাতেরা নিগ্রোদের প্রতি অবিশ্বাস্য বর্বরতা সুলভ আচরণ করে থাকে। যেমন মহান আনন্দের সঙ্গে প্রজা, বৃদ্ধ, মহিলা এবং পুরোহিতরা যুদ্ধের সময় যুব জনতার সামরিক কর্তব্য কি হবে তা নির্দেশ করে। এমনকি শিশুরাও স্বৈরাচারী নিষ্ঠুরতার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। ডেভিড কপারফিল্ড এবং অলিভার টুইস্ট

কোনভাবেই কাল্পনিক নয়। এরকম সক্রিয় অনিষ্ট করার ইচ্ছা মানবিক চরিত্রের আমাদের বৈশিষ্ট্য এবং জগৎকে যদি সত্যই সুখী করে তুলতে হয় তবে মানুষের এই আমাদের বৈশিষ্ট্যকে অবশ্যই পরিবর্তন করা প্রয়োজন। সম্ভবত যুদ্ধের এটাই বড় কারণ। সমস্ত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণগুলোকে এক সঙ্গে করলেও এত বড় কারণ হবে না।

অনিষ্ট করবার ইচ্ছাকে বাধা দেওয়ার সমস্যা তো দেখানো গেল এখন আমরা কিভাবে এর সঙ্গে আচরণ করব? প্রথমে এর কারণগুলিকে আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করতে হবে। আমি মনে করি এগুলি হল আংশিকভাবে সামাজিক ও আংশিকভাবে শারীরবিদ্যা সম্বন্ধীয়। জগৎ আগের মতো এখনও জীবন-রণ নীতিযোগিতার উপর নির্ভর করে আছে। যুদ্ধের সময় যে প্রশ্নটি উঠেছিল সেটি হল অভাব ও উপবাসের হাতে মরবার জন্য কোন শিশুদের ছেড়ে দেওয়া উচিত—আমাদের শিশুদের না মিত্রপক্ষের শিশুদের? (অনিষ্টের পেছনে দুপক্ষই সমান অথচ নিরাপদ থাকার সময় দুপক্ষের সমান অধিকার থাকবে না কেন তার কোন যুক্তি নেই।) বেশিরভাগ মানুষের মনের পেছনে ধ্বংসের ভীষণ ভীতি তাড়া করে ফেরে এবং এই ভয় সেই সব মানুষদের সব থেকে বেশি হয় যাদের বাচ্চাকাচ্চা থাকে। নারীরা ভয় পায় যে বলশেভিকরা তাদের বিনিয়োগকে বাজেয়াপ্ত করে নেবে। বৃদ্ধ মানুষের ভয় যে তারা তাদের কর্ম হারাবে অথবা তাদের স্বাস্থ্য যাবে। প্রত্যেকেই 'নিশ্চয়তার' পেছনে পাগলের মতো ঘুরে বেড়িয়ে ভেবে নেয় যে প্রচ্ছন্ন শত্রুকে পদানত করে রাখলেই সমস্যার সমাধান হয়। আতঙ্কের মুহূর্তগুলোতে নিষ্ঠুরতা এবং বর্বরতা সব থেকে বেশি বিস্তৃত হয়ে পড়ে। যে-কোন জায়গায় শান্তি বিরোধী ব্যক্তিরা ভীতিকে উস্কে দেয়। ইংল্যান্ডে বলশেভিকবাদকে ভয় করা, ফ্রান্সে জার্মানিকে ভয় করা, জার্মানিতে ফ্রান্সকে ভয় করা। তাদের এই সবগুলোর ভীতির ফলে তারা যার বিরুদ্ধে নিজেদেরকে রক্ষা করতে চায় সেই বিপদটাই আরও বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

এই জন্য বৈজ্ঞানিক নীতিবিদদের প্রধান বিষয় হওয়া উচিত, কিভাবে এই ভীতিকে রোধ করা যায়। এটি দুটো পথে সম্ভব। একটি হল নিশ্চয়তাকে ক্রমশ বাড়িয়ে এবং অপরটি হল সাহসকে বাড়িয়ে তুলে। আমি সেই ভীতির কথা বলছি যেটি একটি অযৌক্তিক ভাবাবেগ, কিন্তু কখনো একটি সম্ভাব্য দুর্ভাগ্যের যুক্তিপূর্ণ জ্ঞান সম্পর্কে কথা বলছি না। যখন কোন থিয়েটারে আগুন লাগে তখন একজন আতঙ্কগ্রস্ত মানুষের মতো এক পূর্ণ যৌক্তিক মানুষ ধ্বংসকে আরো বেশি খুঁচিয়ে তোলে, কিন্তু সে একই সঙ্গে ধ্বংসলীলাকে কমিয়ে আনার পদ্ধতিগুলি আয়ত্ত করে। কিন্তু সেখানে শুধুমাত্র একজন আতাঙ্কগ্রস্ত মানুষ আতঙ্ককে আরও বাড়িয়ে দেয়।

১৯১৪ সালে ইউরোপে একটি নাট্যমঞ্চে আগুন ধরলে দর্শকমণ্ডলী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ওঠে কিন্তু তখন প্রয়োজন ছিল শান্ত থাকার। কর্তৃপক্ষের চেষ্টা ছিল কিভাবে দর্শকমণ্ডলী একে অপরকে পদদলিত করে পিষে না দিয়ে পরস্পর উদ্ধার পেতে পারে। ভিক্টোরিয়ার যুগে, হাজার বঞ্চনা সত্ত্বেও, মানুষ খুব দ্রুত অগ্রগতির দিকে পৌঁছেছিল। এর কারণ ছিল মানুষ তখন ভীতির থেকে আশার দ্বারা বেশি পরিচালিত হয়েছিল। যদি আমরা আবার সেই ধরণের অগ্রগতি ফিরে পেতে চাই তবে আবার আমাদের আশার দ্বারা পরিচালিত হতে হবে।

যা কিছু সাধারণ নিশ্চয়তাকে বাড়িয়ে তোলে তা-ই নিষ্ঠুরতাকে হ্রাস করে। যুদ্ধ প্রতিরোধের বেলাতেও ওই একই কথা খাটে, সে সম্মিলিত জাতিসংঘের মধ্যস্থতার দ্বারাই হ'ক, অথবা অভাব-দারিদ্র্য মুছে ফেলার চেষ্টার মধ্য দিয়েই হ'ক। ওষুধপত্রের উন্নতির মধ্য দিয়ে সুপরিবেশের সৃষ্টি করে,স্বাস্থ্যকর স্থান সৃষ্টির দ্বারা আরও সুস্থ স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা তৈরি করার মধ্যে দিয়েও তা হতে পারে। এছাড়াও অন্যান্য সেই সব ধরণের পদ্ধতির দ্বারাও মানুষের মনের অতল গভীরে লুকিয়ে থাকা ভীতি, যা যখন তারা ঘুমোতে যায় তখন দুঃস্বপ্ন হয়ে তাদের কাছে উঠে আসে, তা হ্রাসপ্রাপ্ত হতে পারে। কিন্তু মনুষ্যজাতির একটি অংশ অপর অংশকে শোষণ করে যেভাবে নিশ্চয়তা পেয়ে থাকে তার থেকে বড় নিশ্চয়তা পাবার চেষ্টা আর কিছুই হতে পারে না। যেমন—জার্মানদের খরচে ফরাসী মানুষের চলে। মজদুরদের খরচে পুঁজিপতিরা চলে। 'হলুদ' মানুষদের খরচের উপর সাদা মানুষেরা চলে। এরকম আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। পদদলিত গোষ্ঠীর কাছে এই রকম পদ্ধতি কেবল আতঙ্কের সৃষ্টি করে। পাছে পদদলিত গোষ্ঠী বিদ্রোহ করে উঠতে না পারে তার জন্য তাদেরকে আতঙ্কের মধ্যে রাখতেই হয়। কেবলমাত্র 'ন্যায়বিচার' নিশ্চয়তা দিতে পারে। কেবল 'ন্যায়বিচার' দ্বারাই, আমি মনে করি, মানবজাতির জন্য সমদাবী স্বীকৃত হতে পারে।

আরও বলা যেতে পারে, যে সামাজিক পরিবর্তনগুলিতে নিশ্চয়তা আনার চেষ্টা করা হয় সেখানে ভীতিকে সরাসরি হ্রাস করার জন্য সাহসকে বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। যুদ্ধে সাহসের গুরুত্বকে অনুধাবন করতে পেরে, প্রাচীন যুগে মানুষ শিক্ষা ও ভালো খাদ্যের বন্দোবস্তের মাধ্যমে সাহসকে বাড়িয়ে তোলার পদ্ধতি আবিষ্কার করে থাকে— উদাহরণস্বরূপ মানুষের মাংস খাওয়াকে এই ব্যাপারে কার্যকরী ভাবা হত। সামরিক সাহসকে শাসক শ্রেণীর এক বিশেষ অধিকার বলে ভাবা হয়ে থাকে। হেলট্‌দের থেকে স্পার্টানরা বেশি সাহসী ছিল। ভারতীয় রাজাদের সেনাদের থেকে ব্রিটিশ অফিসাররা বেশি সাহসী ছিল। নারীর থেকে পুরুষেরা বেশি সাহসী এবং এরকম আরও অনেক আছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সাহসকে অভিজাতদের বিশেষ অধিকার বলে ভাবা হত। শাসক

শাসকের সাহসের প্রতিটি বৃদ্ধি প্রধানত পদদলিত জাতির উপর বোঝার বৃদ্ধি হিসাবে ব্যবহার করা হত। এই জন্যই শাসক শ্রেণীর ব্যবহারের জন্য আতঙ্কের সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হল এবং একই কারণে সেখানে নিষ্ঠুরতার কারণগুলিকে না সরিয়ে সেগুলোকে উস্কে দেওয়া হল। মানুষকে মানবিক করে তুলতে পারার আগেই সাহসের গণতন্ত্রীকরণ করে তোলা আবশ্যক।

বিশদ করে বলতে গেলে, সাহস এখনি সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোর দ্বারা গণতান্ত্রিক হয়ে পড়েছে। ভোটাধিকারের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে তারা অতি বীর সাধুদের মতো সাহসী হয়ে উঠেছে। ভোটে জেতার জন্য তাদের এই ধরণের সাহসের প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধে একজন সাধারণ যোদ্ধার ক্যাপ্টেন বা লেফটেন্যান্টের মতোই সাহসের প্রয়োজন হয়। জেনারেলের থেকে অনেক বেশি সাহসের প্রয়োজন হয় সাধারণ যোদ্ধাদের। সৈন্যদল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তাদের দাসত্বহীন মনোভাব অনেক কিছুই করতে পারে। বলশেভিক, যারা নিজেদেরকে সর্বহারাদের চ্যাম্পিয়ন বলে ঘোষণা করে, তাদের সাহসের অভাব নেই, সে তাদের সম্বন্ধে যা খুশি বলা হ'ক না কেন। কেননা বিপ্লব-পূর্ব সময়ের সাহিত্যপত্রের দ্বারাই তাদের সাহসের প্রমাণ মেলে। জাপানে সামুরাইরা সামরিক শিক্ষানবীশীর একচেটিয়া অধিকারী ছিল কিন্তু বাধ্যতামূলকভাবে স্থল- সন্য বা নৌ-বাহিনীদলে নাম লেখানোর জন্য সেখানে সমগ্র পুরুষ জনতার মধ্যে সাহসের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এই ভাবেই সব শক্তিশালী দেশগুলোতে গত অর্ধ শতাব্দী ধরে সাহসকে অভিজাত শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকারে আর বেশি দিন রাখা হয়নি। যদি এটা না ঘটত তবে গণতন্ত্রের পক্ষে তা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠত। যুদ্ধে সাহস একমাত্র বিষয় নয়। কিন্তু যুদ্ধে সাহস সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও নয়। দারিদ্র্যের মোকাবিলা করার জন্য সাহসের প্রয়োজন। বিদ্রূপের মোকাবিলা করার জন্য সাহসের প্রয়োজন। নিজের সম্প্রদায়ের শত্রুতার মোকাবিলা করার জন্য সাহসের প্রয়োজন। এই সব ব্যাপারে কখনও কখনও অতি বীর যোদ্ধাও শোচনীয় ভাবে অসমর্থ হয়। সর্বোপরি বিপদের মোকাবিলা করার জন্য শান্তভাবে ও যৌক্তিকভাবে চিন্তা করার মধ্যেও একটা সাহস লুকিয়ে থাকে। উৎকণ্ঠাজনিত ভয় বা রাগের ভাবাবেগকে সংযত করার মধ্যেও সাহস থাকে। এগুলো নিশ্চিতভাবে সেইসব বিষয় যে বিষয়গুলোর উপর শিক্ষা মানুষকে কিছু দিতে সাহায্য করতে পারে। সুন্দর স্বাস্থ্য, সুগঠিত দেহ, পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টি এবং মানসিক প্রাণোচ্ছল ভাবাবেগের স্বাধীন প্রবাহের দ্বারা যে-কোন ধরনের সাহসের শিক্ষা ভালোভাবে সম্পাদিত হতে পারে। সম্ভবত সাহসের শারীরবিদ্যামূলক উৎস আবিষ্কার করা যেতে পারে ইঁদুরের রক্তের সঙ্গে বিড়ালের রক্তের তুলনা করলে। আর কিছুর মতোই সাহসকে বাড়িয়ে তুলতে বিজ্ঞান যা কিছু করতে পারে তা

অসীম। উদাহরণস্বরূপ, বিপদের অভিজ্ঞতা, একটি বলিষ্ঠ জীবন এবং পুষ্টিজনক খাদ্য। এই সমস্ত জিনিসগুলো আমাদের উচ্চ শ্রেণীর বালকেরা সাধারণভাবে ভোগ করে থাকে। তার কারণ, তারা সম্পদের বিশেষ অধিকারী। মনুষ্য গোষ্ঠীর গরীব মানুষের মধ্যে সাহস উৎসাহিত করে শৃঙ্খলার অধীনস্থ সাহসকে। কিন্তু সেই ধরণের সাহসকে কখনই উৎসাহিত করে না যা নেতৃত্ব ও প্রথম প্রয়াসের বিষয়ের সঙ্গে জড়িত থাকে। যখন সেই সব গুণসমূহ যা সঙ্গে সঙ্গে নেতৃত্ব প্রদান করতে পারে তা সার্বজনীন হয়ে উঠবে, তখন আর কোন নেতা বা অনুসরণকারীর প্রয়োজন হবে না এবং তখনই গণতন্ত্রকে উপলব্ধি করা যাবে।

ভীতিই অনিষ্টের একমাত্র উৎস নয়। হিংসা এবং অসন্তোষও তার উৎসের অংশ হিসেবে গণ্য। অনিষ্টের মহা উৎস হিসেবে প্রবাদ বাক্যের রূপ নিয়েছে। তাদের চেয়ে অন্যান্যদের দুর্ভাগ্য একই ফল প্রদান করে। একজন পুরুষ বা নারী, যে যৌনতার ক্ষেত্রে আঘাত পেয়েছে, সে হিংসায় পূর্ণ হবার যোগ্য। এই ব্যাপারে অতি সৌভাগ্য-বানদের কপালেই নৈতিক দোষারোপ জোটে। বিপ্লবের সময় থেকে বেশি চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে ধনিক শ্রেণীর হিংসা। ঈর্ষা হিংসার একটি বিশেষ ধরন—প্রেমের হিংসা। বৃদ্ধরা যুবকদের প্রায়শই হিংসা করে থাকে। যখন তারা সুযোগ পায়, তখন তারা তাদের উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করার যোগ্যতা দেখিয়ে ছাড়ে।

যতদূর আমি জানি হিংসুটে মানুষকে সুখী ও পূর্ণ করে তোলা ছাড়া হিংসার সঙ্গে এঁটে ওঠার আর কোন পদ্ধতি নেই। যুবকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার চেয়ে সম্মিলিত উদ্যোগের ধারণা গড়ে তোলার থেকে ভালো কোন পদ্ধতি নেই। হিংসার সব থেকে বাজে প্রকাশ দেখা যায় তাদের মধ্যে যারা তাদের বিবাহিত জীবনে, বা ছেলেমেয়েদের নিয়ে কিংবা তাদের কর্মজীবনে পূর্ণ হতে পারেনি। এই ধরণের দুর্ভাগ্যকে বেশিরভাগ সব ক্ষেত্রে ভালোভাবে দূর করা যেতে পারে অপেক্ষাকৃত উত্তম সামাজিক প্রথাসমূহের মধ্য দিয়ে। এটা আমাদের স্বীকার করে নিতেই হবে যে হিংসার আবেশটি প্রায়শই থেকে যায়। ইতিহাসে এমন অনেক নজির আছে যেখানে দেখা যায় যে কোন সর্বাধিনায়ক অপর কোন সর্বাধিনায়ককে এতটাই হিংসা করত যে তারা একে অপরের খ্যাতির বৃদ্ধি যাতে না হয় তার জন্য ইচ্ছে করে হেরে যাওয়াটাই পছন্দ করত। একই দলের দুজন রাজনীতিবিদ, কিংবা একই ঘরানার দুজন শিল্পী অবশ্যই একে অপরের উপর ঈর্ষান্বিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব এমন ব্যবস্থা করা যেতে পারে যাতে প্রতিটি প্রতিযোগী একে অপরের ক্ষতি করতে সক্ষম না হয়। তারা যেন কেবলমাত্র তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী জয়লাভ করে। সাধারণত একজন শিল্পীর তার শত্রুর প্রতি ঈর্ষা খুব কমই ক্ষতি করতে পারে। কারণ সেই শিল্পী তার ঈর্ষাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে এই কারণে যে সে তার শত্রুর অপেক্ষা আরও ভালো ছবি আঁকবে বলে। কেননা তার শত্রুর ছবিগুলোকে ধ্বংস করে ফেলার পথ তার কাছে উন্মুক্ত নয়। যেখানে

[illegible] কোন ভাবে এড়িয়ে চলা সম্ভব নয় সেখানে তাকে একে অপরের জন্য [illegible] হিসেবে ব্যবহার করা চলে, কিন্তু কখনই শত্রুর প্রচেষ্টাকে আঘাত করে নয়।

মানুষের সুখকে বৃদ্ধি করার জন্য বিজ্ঞানের সম্ভাবনাগুলি মানুষের প্রকৃতির [illegible] দিকগুলোকে কিছুতেই হ্রাস করতে পারে না যে প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত [illegible] তারা পরস্পর বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে স্বেচ্ছায় হারে এবং যে প্রকৃতিটিকে আমরা অবশ্যই 'মন্দ' বলে আখ্যায়িত করতে পারি। ধনাত্মক যোগ্যতা বৃদ্ধিতে বিজ্ঞান যা করতে পারে তার কোন সীমা নেই। স্বাস্থ্য এখনই অনেক উন্নত হতে পারেছে। অতীতের আদেশ গ্রহণকারীদের বিলোপ সত্ত্বেও আমরা আজ আগের থেকে অনেক বেশিদিন বাঁচি। অষ্টাদশ শতকের যে-কোন শ্রেণী বা জাতির থেকে আমরা অনেক কম অসুস্থতায় ভুগি। আমরা যে জ্ঞান এখনই অর্জন করেছি সেই জ্ঞানের একটু বেশি প্রয়োগ করলে এখন আমরা যেমন আছি তার থেকেও অনেক বেশি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে থাকতে পারবো এবং ভবিষ্যতে যে আবিষ্কারগুলো করে তা দিয়ে উন্নতির পদ্ধতি আরও বেশি দ্রুত হয়ে উঠবে।

পদার্থবিজ্ঞান আমাদের জীবনে উপর যথেষ্ট প্রভাব সৃষ্টি করতে পেরেছে, কিন্তু ভবিষ্যতে মনস্তত্ত্ব এবং শারীরবিদ্যা আরও বেশি ফলদায়ক হয়ে উঠবে। যখন যখনি আমরা আবিষ্কার করতে পেরেছি কিভাবে চরিত্র শারীরবিদ্যার উপর নির্ভর করে, তখন আমরা যদি চাই তবে আমরা ভবিষ্যতে সেই রকম অনেক মানুষ তৈরি করতে সক্ষম হব যে মানুষদের আমরা প্রশংসা করে থাকি। বুদ্ধি, শৈল্পিক অন্তর্দর্শিতা, বদান্যতা —এই সমস্ত জিনিসগুলি বিজ্ঞানের দ্বারা আরও বৃদ্ধি করা যাবে। যদি আমরা বিজ্ঞানকে বুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহার করি তবে মঙ্গলময় জগৎ তৈরি করতে যা করা যাবে তার কোন সীমা পরিসীমা থাকবে না। কিন্তু আমি কোন এক জায়গায় এই অভিমত প্রকাশ করেছিলাম যে মানুষ সম্ভবত সেই ক্ষমতাকে ঠিক মতো ব্যবহার করতে পারবে না যে ক্ষমতা সে বিজ্ঞান থেকে অর্জন করতে পেরেছে (ইকারুস দেখুন)। বর্তমানে আমি সেই মঙ্গলের সম্পর্কে কথা বলছি যে মঙ্গল মানুষই করতে পারে যদি তারা চায়, আমি কোন বিষয় সম্পর্কে কথা বলছি না যেখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে তারা মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গল করাটা বেশি পছন্দ করবে কিনা।

মানবজীবনের উপর বিজ্ঞানের একটি বিশেষ আচরণ দেখা যায় যে সম্পর্কে আমার একটা সহানুভূতি আছে, যদিও শেষ বিশ্লেষণে আমি তার সঙ্গে একমত হইনি। এই আচরণটি তাদের যারা যা কিছু 'অপ্রাকৃতিক' তাকেই ভয় পায়। রুশো, ইউরোপে এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান নায়ক। এশিয়াতে, লাওৎসে এই দৃষ্টিভঙ্গিটি এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন যে তা বিশ্বাস উৎপাদন করতে সক্ষম। কিন্তু ইতিমধ্যে ২৪০০ বছর খুব তাড়াতাড়ি গড়িয়ে গেছে। আমি মনে করি

'প্রকৃতি'কে প্রশংসা করার ক্ষেত্রে সত্য এবং মিথ্যা মিশ্রভাবে মিশে আছে, যার জট খোলাটা গুরুত্বপূর্ণ। শুরু করতে হবে 'প্রাকৃতিক' বলতে কি বোঝায় সেই প্রশ্ন দিয়েই। মোটামুটিভাবে বলা যায় প্রাকৃতিক বলতে সেই সমস্ত বস্তুকে বোঝায় যে বস্তুগুলির সঙ্গে বক্তা শিশুর মতোই যুক্ত হতে অভ্যস্ত। লাওৎসে রাজপথ এবং যানবাহন ও নৌকার সম্পর্কে আপত্তি করেছেন যেগুলো সম্ভবত তিনি যে গ্রামে জন্মান সেখানে অপরিচিত ছিল। রুশো এই সমস্ত জিনিসগুলো ব্যবহার করতে পেরেছিলেন, তাই তিনি সেগুলোকে প্রকৃতি বিরুদ্ধ বলেননি। কিন্তু নিঃসন্দেহে তিনি বেঁচে থাকতে যদি রেলপথ দেখতেন তবে কেটে পড়তেন। পোশাক পরা এবং রান্না করাটা বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রকৃতির ধর্মপ্রচারকদের বেশির ভাগের দ্বারা প্রকাশ্যে নিন্দিত হয়ে এসেছে, যদিও তারা সবাই যে-কোন নতুন ধরনকে নিন্দা করতে অভ্যস্ত। যারা কৌমার্যের যন্ত্রণা সহ্য করেছিল তারা জন্মনিয়ন্ত্রণকে শয়তানের ইচ্ছা বলে মনে করত, কারণ জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়টি প্রকৃতিকে নতুনভাবে এক অস্বীকার ছিল এবং সৌন্দর্যের যন্ত্রণা সহ্য করাটা ছিল প্রকৃতিকে অস্বীকার করার প্রাচীনতম প্রথা। এইসব পথ দিয়ে যারা 'প্রকৃতিকে' প্রচার করেছে তারা অসঙ্গতিকর ছিল এবং কেউ কেউ যারা তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করতে উগ্র হয়ে উঠেছিল তারা ছিল রক্ষণশীল।

অধিকন্তু, তাদের পক্ষে কিছু বলা যেতে পারে। ভিটামিনের উদাহরণটি নেওয়া যাক, যার আবিষ্কার 'প্রাকৃতিক' খাদ্যের সমর্থনে একটি বিরাট পরিবর্তন এনেছিল। তবে মনে করা হয়েছিল যে ভিটামিনগুলি সরবরাহ করা যেতে পারে কডলিভার অয়েল এবং বৈদ্যুতিক আলোর দ্বারা, যা নিশ্চিতভাবেই মানষের জন্য প্রাকৃতিক খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এই ঘটনা এই ব্যাখ্যাই করে যে, জ্ঞানের অনুপস্থিতিতে, প্রকৃতি থেকে কোন নতুনভাবে অপসরণ আশাতীত ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু যখন ক্ষতিটিকে বুঝতে পারা যায় তখন নতুন কোন কৃত্রিমতা দিয়ে তাকে সাধারণত সারাবার চেষ্টা হয়ে থাকে। আমাদের ভৌতিক পরিবেশ ও আমাদের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্য ভৌতিক উপাদানগুলি সম্পর্কে বলতে গেলে, আমি মনে করি না যে 'প্রকৃতি' মতবাদটি নতুন কোন সুবিধা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে গবেষণামূলক সাবধানতা নেওয়া ছাড়া আর কিছু করতে পেরেছে। উদাহরণস্বরূপ জামা কাপড়ের কথাই ধরা যাক, যেটি প্রকৃতি বিরোধী এবং যেটাকে পূরণ করবার চেষ্টা হয়েছে অপ্রাকৃতিক কার্যাবলীর দ্বারা, অর্থাৎ জামাকাপড় ধোয়ার মাধ্যমে, কেন না নোংরা জামাকাপড় রোগ ডেকে আনবে। কিন্তু দুটি কাজ যা বর্বর মানুষদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছিল তা আজ মানুষকে আগের চেয়ে অনেক বেশি স্বাস্থ্যবান করে তুলেছে।

মানুষের আকাঙ্ক্ষার রাজত্বে 'প্রকৃতি' সম্পর্কে অনেক কথাই বলা যাবে। পুরুষ নারী ও শিশুর শক্তিশালী ভাবাবেগকে ধাক্কা মেরে তার উপর কোন

প্রকৃতিকে বলপূর্বক চাপিয়ে দিলে তা যেমন নিষ্ঠুর হয়ে উঠবে তেমনি ভয়ঙ্করও হবে। এই অর্থে 'প্রকৃতি' অনুযায়ী একটি জীবন কোন স্থিরীকৃত শর্তসমূহের প্রতি সমর্পিত। ভূগর্ভস্থ বৈদ্যুতিক রেলপথের চেয়ে আর কোন কিছুই ততটা কৃত্রিম নয়, কিন্তু সে যখন কোন শিশুকে নিয়ে যাত্রা করে তখন সে শিশুটির প্রকৃতিকে মোটেই অসম্মান করে না। বিপরীতভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে এই অভিজ্ঞতাটি সব শিশুই আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে থাকে। অন্যান্য জিনিসগুলি সমানুপাতিক হলে যে কৃত্রিমতা সাধারণ মানুষের কামনাকে পরিতৃপ্ত করে তা মঙ্গলজনক। কিন্তু জীবনের যে পথসমূহকে কৃত্রিম বলা যায় তা অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা কর্তৃত্বের দ্বারা নির্মিত, তাই সেই সব পথ সম্পর্কে কিছুই বলার নেই। জীবনের এই ধরণের পথ, নিঃসন্দেহে, কিছুদূর পর্যন্ত এখন প্রয়োজনীয়। সাগরে যাত্রা করাটা একটা সমস্যাহ ব্যাপার হয়ে উঠবে যদি স্টিমারের অগ্নিকুণ্ডে কয়লা ঠেলে দেওয়ার কেউ না থাকে। এই ধরণের প্রয়োজনীয়তাগুলো দুঃখজনক এবং তাদের এড়িয়ে চলবার পথ আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কর্ম করা অনুযোগের বিষয় নয়, বরঞ্চ দশের মধ্যে নটি ঘটনাতেই সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় জীবন কাটানোর থেকে কর্মই মানুষকে বেশি সুখী করে। বর্তমানে মানুষ যে ধরণের কার্য যে পরিমাণ করতে বাধ্য হয় তা গভীরভাবে অশুভ। বিশেষত নিত্যকর্মের দাসত্বের বাঁধা জীবন মন্দ। জীবন কখনই কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত নয় অথবা তা অতিরিক্ত প্রণালীসংগত হওয়াও উচিত নয়। আমাদের ভাবাবেগগুলো যদি গঠনাত্মকভাবে ধ্বংসাত্মক না হয়, কিংবা তা অপরের ক্ষতিকারক না হয়, তবে সেগুলো চলে তাকে স্বাধীনভাবে চলতে দেওয়া উচিত এবং দুঃসাহসিক কাজের জন্য প্রশ্রয় দেওয়া উচিত। মানবিক প্রকৃতিকে আমাদের সম্মান করা উচিত, কারণ আমাদের ভাবাবেগগুলো এবং কামনাগুলো সেই মোড়কের ভেতর থেকে বার হয়ে আসে যেখানে আমাদের সুখ তৈরি করা যায়। মানুষকে এমন কিছু দেওয়া অনর্থক যাকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে মঙ্গলময় ধরে নিতে হবে। আমাদের মানুষকে আকাঙ্ক্ষিত এবং প্রয়োজনীয় এমন কিছু দেওয়া অবশ্য দরকার যা মানুষের সুখের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে। বিজ্ঞান এই শিক্ষা ঠিক সময় মতো অর্জন করে আমাদের কামনাগুলোকে সেই পথে ঘোরাতে পারে যাতে আজকের মতো তা অপর মানুষের সঙ্গে বিবাদের কারণ হয়ে উঠবে না এবং তখনই আমরা আমাদের কামনাগুলোর বেশিরভাগ অংশটিকে আজকের চেয়ে অনেক বেশি পরিতৃপ্ত করতে পারব। কেবলমাত্র সেই অর্থেই, তখন আমাদের কামনাগুলো 'মঙ্গলতর' হয়ে উঠবে। একটি কামনার না থাকে মঙ্গলময় দিক, না থাকে মন্দের দিক। তাকে অন্যান্যদের থেকে অনেক বেশি বিচ্ছিন্ন একাকী হয়ে থাকতে হয়। কিন্তু একটি কামনাপুঞ্জ অন্য কামনা থেকে মঙ্গলদায়ক যদি প্রথম পুঞ্জটির সবাই একই সঙ্গে পরিতৃপ্ত হতে

পারে তখন দ্বিতীয় পুঞ্জটির অনেকেই অন্যান্যদের থেকে অসঙ্গতিকর হয়ে থাকে। এই জন্যই প্রেম বিদ্বেষের চেয়ে মঙ্গলজনক।

ভৌতিক প্রকৃতিকে সম্মান করাটা বোকামি। ভৌতিক প্রকৃতিকে অধ্যয়ন করা উচিত যতদূর সম্ভব মানুষের লক্ষ্যকে প্রবল করার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, নৈতিকভাবে প্রকৃতির ভাল বা মন্দ কোনটাই নেই। যখন ভৌত প্রকৃতি ও মানবিক প্রকৃতি পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে, বিশেষত জনসংখ্যার প্রশ্নের দিক দিয়ে, তখন পূজার ভঙ্গিতে দু'হাত জোড় করে বসে বুদ্ধকে মেনে নিলে চলবে না। মহামারী ও দুর্ভিক্ষের একটি সম্ভাব্য যোগসূত্র আছে। স্বর্গ বলে : এটা মহা পাপ। যদি তাই হয় তবে সমস্যার কেবল ভৌতিক দিকটিতেই বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করা হ'ক। আমরা অবশ্যই (তারা বলে থাকে) মানবিক দিকে নৈতিকতাগুলো প্রয়োগ করব এবং সংযম পালন করব। ঘটনা স্বরূপ প্রত্যেকেই, এমনকি স্বর্গের অনুগামীরাও জানে যে তাদের উপদেশগুলোকে মেনে নেওয়া হবে না। গর্ভধারণের প্রতিকার স্বরূপ ভৌত উপায়কে গ্রহণ করে জনসংখ্যার প্রশ্নটিকে সমাধান করাটা কেন পাপের হবে? একমাত্র সেকেলে ধর্মমত ছাড়া আর কোন জায়গা থেকে কোন উত্তর সামনে উঠে আসবে না। পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে প্রকৃতিকে খণ্ডন করার ব্যাপারে স্বর্গের যে উপদেশগুলি আছে তা অন্তত জন্মনিয়ন্ত্রণের সঙ্গে জড়িত উপদেশগুলির মতোই মহান। স্বর্গ মানবিক প্রকৃতির লঙ্ঘনকেই পছন্দ করে। সেই লঙ্ঘনকে সফলভাবে সান করার ক্ষেত্রে অসুখ, হিংসা, নির্যাতন প্রবণতা এবং প্রায়শই পাগলামি জড়িত। আমি ভৌত প্রকৃতির 'লঙ্ঘন' পছন্দ করি যা একইভাবে স্টিম ইঞ্জিনের সঙ্গে অথবা ছাতা ব্যবহারের সঙ্গেও জড়িত। এই উদাহরণে দেখা যায় যে সেই আদর্শের প্রয়োগ কতটা দ্ব্যর্থক ও অনিশ্চিত যাকে আমরা 'প্রকৃতি' বলে অনুসরণ করে থাকি।

প্রকৃতি ও মানবিক প্রকৃতি পরম স্বীকৃত বিষয়সমূহ থেকে ক্রমশই বেশি করে ক্ষান্ত হয়ে আসছে। বৈজ্ঞানিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে তাকে যত সুবিধাজনক জায়গায় আনা হচ্ছে ততই সে বেশি করে ক্ষান্ত হয়ে পড়ছে। যদি বিজ্ঞান চায়, তবে আমাদের প্রপৌত্রদের মঙ্গলময় জীবন কাটাতে সমর্থ করে তুলবে, তাদেরকে জ্ঞান প্রদান করে, আত্ম-সংযমী করে এবং বিবাদ উৎপাদনকারী চরিত্রের বদলে সংগতি উৎপাদনকারী চরিত্র প্রদান করে। বর্তমানে আমাদের শিশুদের পরস্পরকে হত্যা করবার শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। কেননা বিজ্ঞানের বহু মানুষই মানুষের ভবিষ্যৎকে তাদের নিজেদের মুহূর্তের সমৃদ্ধির দিকে তাকিয়ে বলি দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু এই সময় অতিক্রান্ত হবে তখন যখন মানুষ যে ভাবে বাহ্যিক জগতের ভৌত বলের উপর প্রভুত্ব করতে পেরেছে ঠিক তেমনি সে তার নিজের ভাবাবেগের উপর প্রভুত্ব করতে পারবে। আর তখনই শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের নিজেদের স্বাধীনতা অর্জন করতে পারব।

৪

আমরা কি মৃত্যুর পরেও জীবিত থাকি?

(এ প্রবন্ধটি ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত 'জীবন ও মৃত্যুর রহস্য,' নামক গ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত হয়। বিশপ ... দ্বারা রচিত একটি প্রবন্ধ যেটির কথা রাসেল উল্লেখ করেন তা এই একই গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।)

মৃত্যুর পর আমরা জীবিত থাকবো কিনা তার আলোচনা ভালোভাবে করার আগে আমাদের এ সম্পর্কে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া ভালো যে আজকের মানুষটি কাল যখন ছিল সে আজও সেই একই মানুষ আছে কিনা। দার্শনিকরা চিন্তা করতে অভ্যস্ত ছিলেন যে নির্দিষ্ট সারসত্ত্বাগুলো আছে। আত্মা এবং শরীর এমন কিছু যা জন্মের পর দিন থেকে থাকে। একবার যে আত্মা সৃষ্টি হয়েছে তা সমগ্র ভবিষ্যৎ সময় ধরে থেকে যায় এবং সাময়িকভাবে শরীর মৃত্যুর পর নষ্ট হয়ে যায় ততদিন পর্যন্ত যতদিন না শরীরের আবার পুনর্জাগরণ হয়।

বর্তমান জীবন সম্পর্কে ধর্মমতের যে অংশ যুক্ত তা নিশ্চিতভাবে অসত্য। শরীরের সাধন ও অপচয়ের পদ্ধতির মাধ্যমে পরিবর্তিত পদার্থবিজ্ঞানের পরমাণু নিরবচ্ছিন্নভাবে কখনই বিদ্যমান থাকতে পারত না বলেই মনে হয়। তাই কোন অর্থেই বলা যায় না যে এই পরমাণুটি সেই পরমাণুর মতো একই যা কিছু মিনিট আগে বিদ্যমান ছিল। মানবশরীরের নিরবচ্ছিন্নতা অভ্যাস ও আচরণের বিষয়, কোনও সারসত্ত্বার বিষয় নয়।

এই একই জিনিস মনের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। আমরা চিন্তা করি, অনুভব করি এবং কাজ করি। কিন্তু চিন্তা অনুভব এবং কার্য ব্যতিরিক্ত কোন অতিরিক্ত অস্তিত্ব নেই। মন অথবা আত্মা সেই বস্তু, যাকে এই ঘটনাগুলোকে বহন করতে হয়। একজন ব্যক্তির মানসিক ধারাবাহিকতা তার অভ্যাস ও স্মৃতির ধারাবাহিকতা। কাল একজন মানুষের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল যার অনুভব আমি মনে করতে পারি, কিন্তু বস্তুত কালকে আমি নিজেই কতকগুলি মানসিক ঘটনা যেগুলো বর্তমানে স্মরণ করা হয় এবং যে ঘটনাগুলো সেই ব্যক্তির রূপকরূপে গণ্য করা হয়ে থাকে যে ব্যক্তি ঘটনাগুলো স্মরণ করে। এই সমস্ত জিনিসগুলো একজন মানুষকে একটি ধারাবাহিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন করে গঠন করে এ অভিজ্ঞতাগুলি স্মৃতির দ্বারা যুক্ত এবং ওই একই ধরণের বস্তুর দ্বারা যুক্ত যাকে আমরা অভ্যাস বা আচরণ বলে থাকি।

এই জন্য যদি আমাদের বিশ্বাস করতে হয় যে একজন ব্যক্তি মৃত্যুর পরও জীবিত থাকে, তবে আমাদের এই বিশ্বাস করতে হবে যে সমস্ত স্মৃতি ও অভ্যাসসমূহ ব্যক্তিকে গঠন করে তাকে একটি নতুন ঘটনাসমূহের প্রস্থে প্রদর্শিত করা হবে।

কেউ এটা প্রমাণ করতে পারে না যে এমনটা ঘটবে না। কিন্তু এটা দেখা খুবই সোজা যে এই ব্যাপারটি খুবই অসঙ্গতিকর। মস্তিষ্কের কাঠামোর সাথে আমাদের স্মৃতিসমূহ ও অভ্যাসসমূহ জড়িত। জড়িত এমন ভাবে যেমন ভাবে একটি নদী নদীগর্ভের সাথে জড়িত থাকে। একটি নদীর জল সর্বদাই পরিবর্তনশীল। কিন্তু সে তার ধারা সর্বদাই বজায় রাখে কারণ পূর্বের বৃষ্টিধারা জলনালীকে ক্ষয় করে দিয়েছে। এই একইভাবে, পূর্ব ঘটনাসমূহ মস্তিষ্কের নালীকে ক্ষয় করে এবং আমাদের চিন্তা সেই নদীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। এটাই হল স্মৃতিশক্তি ও মানসিক অভ্যাসসমূহের কারণ। কিন্তু কাঠামো হিসেবে মস্তিষ্ক মৃত্যুর পর ধ্বংস হয়ে যায়। এইজন্য আশা করা যায় মস্তিষ্কও মৃত্যুর পর ধ্বংস হয়ে যাবে। এই আশা করা ছাড়া অন্য কোনভাবে চিন্তা করার উপায় নেই যে একটি নদী ভূমিকম্প হবার পর তার পুরানো ধারায় টিকে থাকবে কারণ ভূমিকম্প উপত্যকা ছিল এমন একটি জায়গায় একটি পর্বতমালা সৃষ্টি করে দেয়।

এইজন্য একজন বলতেই পারে যে সমস্ত স্মৃতি, সমস্ত মনসমূহ একটি সম্পদের উপরে নির্ভর করে এবং যা যে-কোন বিশেষ ধরণের বস্তুগত কাঠামোসমূহে লক্ষ্য করা যায়। তবে অন্যান্য ধরণের বস্তুসমূহে অতি অল্প পরিমাণই বিদ্যমান থাকে। এই সম্পদটি হল অভ্যাস সমূহ বা একই ধরণের ঘটনা সমূহ বারবার ঘটার ফলে যা গঠিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, উজ্জ্বল আলো চোখের তারাকে সংকুচিত করে এবং যদি আপনি কোন মানুষের চোখে বারবার আলোর ঝলক ফেলেন এবং একই সঙ্গে তার কানের সামনে পেটাঘড়ি বাজান, তাহলে দেখা যাবে শেষে কেবলমাত্র পেটাঘড়ির শব্দেই তার চোখটি সংকুচিত হচ্ছে। মস্তিষ্ক ও স্নায়ু ব্যবস্থা সম্পর্কেও ওই একই ঘটনা ঘটে। বিষয়বস্তুগত কাঠামো সম্পর্কেও ঐ একই কথা বলতে হয়। এটা দেখা যাবে যে একদম একই ধরণের ঘটনা সমূহ যা ব্যাখ্যা করতে পারে ভাষার প্রতি আমাদের সাড়া দেওয়াটাকে এবং তাকে আমাদের ব্যবহার করাটাকে, তারা কি ভাবে আমাদের স্মৃতিসমূহ ও আবেগসমূহকে জাগিয়ে তোলে তাকে এবং আমাদের অভ্যাসের ফলে গড়ে ওঠা নৈতিক ও অনৈতিক আচরণসমূহকে, বলতে গেলে সেই সব কিছুকে যা আমাদের মানসিক ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলে, একমাত্র সেই অংশটি ছাড়া যেটি আমাদের বংশধর দ্বারা গড়ে ওঠে। যে অংশটি বংশগতির দ্বারা নির্ধারিত হয় তাকে আমরা আমাদের পরবর্তী বংশধরদের দিয়ে যেতে পারি কেবলমাত্র জীবিত ব্যক্তিতে, কিন্তু তা কখনও জীবিত থাকতে পারে না যার শরীরটি মৃত্যুর পর টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেছে। তাই আমাদের অভিজ্ঞতা যতদূর পৌঁছেছে তার উপর নির্ভর করে বলতে গেলে বলতে হয় যে ব্যক্তিত্বের অর্জিত অংশ এবং বংশগতির দ্বারা নির্মিত অংশ উভয়ই বিশেষ শারীরিক কাঠামোসমূহের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আবদ্ধ

আমরা সবাই জানি যে মস্তিষ্কে আঘাত লাগলে স্মৃতি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। একজন ধার্মিক মানুষ এনসেফালাইটিস লেথারজিকার কবলে পড়ে লম্পট মানুষে পরিণত হতে পারে এবং আয়োডিনের অভাবে একটি বুদ্ধিমান বালক বোকায় পরিণত হতে পারে। এই ধরণের অতিপরিচিত ঘটনাগুলির উপর চোখ রেখে এটা অসম্ভব বলে মনে হয় যে মৃত্যুর পর মস্তিষ্ক কাঠামোর সম্পূর্ণ ধ্বংসের পরও মন বেঁচে থাকে।

এটা কোন যৌক্তিক বির্তক নয়, কিন্তু সেই আবেগসমূহ, যা ভবিষ্যৎ জীবনে বিশ্বাসকে ডেকে আনবে।

এইসব আবেগসমূহের মধ্যে মৃত্যুভীতিটাই গুরুত্বপূর্ণ, যা প্রবৃত্তিগত এবং ভূবিদ্যার দিক দিয়ে কার্যকর। যদি আমরা মৃত্যুর পর জীবনের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসপরায়ণ হয়ে থাকি তবে আমাদের মৃত্যুভীতিপরায়ণতাকে একেবারে মুছে ফেলা উচিত। তখন ব্যাপারটি কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে উঠবে এবং সেটা এমন করা দাঁড়াবে যে আমরা অনুশোচনা করতে বাধ্য হব। কিন্তু আমাদের মানবজাতি এবং অমানবজাতির পূর্বপুরুষরা ভূবিদ্যাগত যুগগুলোতে আমাদের শত্রুদের সাথে লড়েছে ও তাদের নির্মূল করে ছেড়েছে এবং তারা তাদের সাহসের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। এইজন্য ঘটনাচক্রে স্বাভাবিক মৃত্যু-ভীতিকে অতিক্রম করতে সাফল্যলাভ করবার জন্য জীবনযুদ্ধে বিজয়ীদের কাছে এটা ছিল একটা বড় সুবিধা। আজও এবং বর্বরদের মধ্যে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাদের যুদ্ধপ্রিয়তাই যথেষ্ট। কিন্তু উন্নতির একটি বিশেষ পর্যায়ে এসে, মহম্মদীয়রা প্রথম প্রমাণ করতে আরম্ভ করল যে স্বর্গে বিশ্বাস ব্যাপারটাতে যথেষ্ট পরিমাণ সামরিক মূল্য আছে যা কেবলমাত্র যুদ্ধপ্রিয়তাকে প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়েই সম্ভব। এইজন্য আমাদের স্বীকার করে নেওয়া উচিত যে অমরত্বে বিশ্বাসপরায়ণ হতে উৎসাহী করার জন্য ভূবিদরা যথেষ্ট জ্ঞানী এবং সর্বদা তারা মনে করায় যে এই জগৎ সম্পর্কে অজ্ঞানতাকে তৈরি করতে না পারলে এই বিশ্বাস কখনই গভীর হয়ে উঠবে না।

মনে হয় যে আবেগ মানুষের মৃত্যুর পর জীবিত থাকার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করে থাকে তা মানুষের মহানত্বকে প্রশংসা করার মধ্যে দিয়ে করে। যেমন ডারহামের বিশপ বলেছেন, তার মন অন্য যে-কোন কিছুর চেয়ে অনেক বেশি সূক্ষ্ম যন্ত্র যা সবার আগে তার মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিল— সে জানে কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক। সে ওয়েস্টমিনিষ্টার অ্যাবে নির্মাণ করতে পারে। সে ডেডোআহাজ তৈরি করতে। সে সূর্যের দূরত্বকে হিসেবে করে বার করতে পারে। তাই মানুষ কি মৃত্যুর পর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হবে? সেই অতুলনীয় যন্ত্র, যা, যখন জীবন স্তব্ধ হয়ে যাবে, তখন উধাও হয়ে যেতে পারে কি?

বিশপ তাঁর যুক্তি প্রদর্শনে এই ভাবে এগিয়েছেন যে একটি বৌদ্ধিক উদ্দেশ্যের দ্বারা এই বিশ্ব আকৃতিসম্পন্ন হয়েছে এবং শাসিত হচ্ছে। তাই মানুষকে তৈরি করে তাকে ধ্বংস হতে দেওয়াটা খুবই বুদ্ধিহীন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

এই বিতর্কে অনেকগুলি উত্তর দেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, প্রকৃতির সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে দেখা যায় নীতিবিদ্যা অথবা সৌন্দর্যবিজ্ঞানমূলক মূল্যবোধের অনুপ্রবেশে আবিষ্কারের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আগে মনে করা হত যে স্বর্গীয় শরীরগুলো একটি বৃত্তে অবশ্যই ঘোরে। বৃত্তই একমাত্র যথার্থ বক্ররেখা (Curve) এবং ঐ প্রজাতিগুলি অবশ্যই অপরিবর্তনীয়। কেননা ঈশ্বর কেবলমাত্র তাই সৃষ্টি করেন যা যথার্থ এবং যাদের কোন রকম উন্নয়নের প্রয়োজন নেই। এই কারণে কেবলমাত্র অনুশোচনা ছাড়া মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করাটা একটা অনর্থক ব্যাপার। কারণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে তাদের পাঠানো হয়েছে এবং এই রকম আরও অনেক কিছু। যদিও এটা দেখা গেছে যে যতদূর পর্যন্ত আমরা আবিষ্কার করতে পারি ততদূর পর্যন্ত আমরা দেখি যে প্রকৃতি আমাদের দ্বারা প্রদেয় মূল্যগুলির প্রতি উদাসীন থাকে। প্রকৃতিকে কেবলমাত্র জানা যেতে পারে আমাদের ভালো-মন্দ বিচারকে অবজ্ঞার দ্বারা। বিশ্বের একটি উদ্দেশ্য থাকতে পারে, কিন্তু তা আমাদের জানার মধ্যে কখনই পড়ে না, যদি তাই হত তবে সেই উদ্দেশ্য আমাদের মতোই সমগোত্রীয় হত।

এখানে চমৎকৃত হবার মতো কিছুই নেই। ড. বারনেস আমাদের বলেছেন যে মানুষ 'কোনটা ভালো কোনটা মন্দ তা জানে'। কিন্তু, বস্তুত নৃতত্ত্ববিদ্যা অনুযায়ী ভালো-মন্দের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এতই পরিবর্তনশীল যে তার মধ্যে কোন একটাও কখনও স্থায়ী হয়নি। এইজন্য আমরা বলতে পারি না যে মানুষ জানে কোনটা ভালো এবং কোনটা মন্দ, তবে কেবলমাত্র কিছু মানুষ তা পারে। সেইসব মানুষগুলি কেমন? নিৎসে একটি নীতিশাস্ত্রের স্বপক্ষে তাঁর যুক্তি দেখিয়েছেন যা মৌলিকভাবে খ্রীষ্টীয়দের নীতিশাস্ত্রের থেকে স্বতন্ত্র এবং কিছু শক্তিশালী সরকার তাঁর সেই শিক্ষাকে গ্রহণও করেছে। যদি ভালো-মন্দের জ্ঞানটাই অমরত্বের একটি যুক্তি হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের প্রথমেই ঠিক করে নিতে হবে আমরা নিৎসে না খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করব। তারপর আমরা দেখাবো যে খ্রীষ্টরা অমর কিন্তু হিটলার এবং মুসোলিনি অমর নয় অথবা উল্টোটা। সিদ্ধান্তটি অবশ্যই যুদ্ধক্ষেত্রে নিতে হবে, কেবলমাত্র করে নিলে হবে না। যাদের হাতে সব থেকে বিষাক্ত গ্যাস আছে তাদের হাতে নীতি শাস্ত্র আছে এইজন্য তারাই হবে অমর।

আমাদের চারপাশের সব কিছুর মতোই অর্থাৎ প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির মতো ভালো ও মন্দের বিষয়ের উপর আমাদের অনুভব এবং বিশ্বাস বেড়ে উঠে

আমাদের অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। এছাড়া তাদের কোন স্বর্গীয় বা অতিপ্রাকৃতিক উৎস নেই। ঈশপের একটি গল্পে আছে, একটি সিংহকে একটি ছবি দেখানো হল যে ছবিটিতে অনেকগুলি শিকারী অনেকগুলি সিংহকে মারছে এবং তাই বলে মন্তব্য করা হল যে, যদি সিংহটি এই ছবিগুলি আঁকত তবে দেখা যেত যে সিংহরা শিকারীদের ধরছে। ড. বারনেস বলেছেন, মানুষ একটি খুব উত্তম প্রাণী কেননা সে উড়োজাহাজ বানাতে পারে। কিছুক্ষণ আগেই যে খ্রীষ্টানরা সিলিংয়ের উপর ঘুরে বেড়ায় তাদের চালাকি নিয়ে একটি সম্মিলিত বাহবা গাওয়া হচ্ছিল : 'এটা কি লয়েড জর্জ করতে পারেন? এটা কি. মিঃ বালফুর করতে পারেন? এটা কি রামসে ম্যাক করতে পারেন? না' এর উপর ভিত্তি করে একমাত্র ঈশ্বরবিশ্বাসী মানসিকতাসম্পন্ন মাছিই এই সশব্দ যুক্তি প্রদর্শন করতে পারে এবং নিঃসন্দেহে অন্যান্য মাছিগুলি তাতে বিশ্বাস করার মতো অনেক কিছু খুঁজে পাবে।

অধিকন্তু, এটা তখনি ঘটে থাকে যখন আমরা অবাস্তবভাবে মানুষের সম্পর্কে এই ধরণের উচ্চ মতামত পোষণ করে থাকি। খুব সঠিক ভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, মানুষ সম্পর্কে আমাদের মধ্যে বেশির ভাগ মানুষ খুবই মন্দ চিন্তা ভাবনা করে থাকে। সভ্য দেশগুলি তাদের বেশির ভাগ শুল্ক ব্যবস্থা থেকে প্রাপ্ত অর্থ পরস্পরের নাগরিকদের হত্যা করবার জন্য ব্যয় করে থাকে। নৈতিক সমর্থনে যে সমস্ত কার্যকলাপ ঘটেছে তার দীর্ঘ ইতিহাসকে বিবেচনা করা যাক। নরবলি, বিরোধিতা ধর্মমত অনুযায়ী বিরোধীদের হত্যা, ডাইনি শিকার, সংঘবদ্ধ হত্যাকাণ্ড ও বিষাক্ত গ্যাসের দ্বারা হাজার হাজার মানুষের হত্যাকাণ্ড নির্বিচারে পরিচালনা, আমাদের অন্তত একটাকেও ড. বারনেসের বিশপ-সম্প্রদায় সমর্থন করার দরকার নেই তা, যেহেতু তিনি একজন অ-খ্রীষ্টীয় হতে নারাজ কিংবা বিরোধের বেলায় অতি শান্তিকামী। এই সমস্ত অমঙ্গল এবং শাস্ত্রীয় মতবাদ যাদের দ্বারা ওই ভয়ংকরজনক কার্য ত্বরান্বিত হয়েছে সেগুলো কি সত্যই একজন বুদ্ধিমান স্রষ্টার ধারণা? এবং আমরা কি সত্যই এই ইচ্ছা করতে পারি যে মানুষগুলি এইসব কাজ করবার জন্য চিরদিনের জন্য বেঁচে থাকা উচিত? যে জগতে আমরা বাস করি তাকে কুসংস্কার ও দুর্ঘটনার ফলরূপে আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু যদি এটা কোন পরিকল্পনোদিত অভিপ্রায়ের ফলরূপে নির্গত হত, তবে সেই অভিপ্রায়টি কোন ভালোর অভিপ্রায়ই হত। আমার দিক দিয়ে বলতে গেলে, আমি মনে করি নাস্তিক্যবাদ অনেক কম যন্ত্রণাদায়ক এবং অনেক সত্যবৎ প্রতীয়মান কল্পনা।

৫

শ্রীমতী, আপনি কি এটাই মনে করেন? না, এটা তা নয়

(এই প্রবন্ধটি ১৮৯৯ সালে লিখিত হলেও তা পূর্বে ছাপা হয়নি। এই প্রবন্ধটির ঐতিহাসিক মূল্যের জন্যই প্রধানত এটি ছাপা হয়েছে। যেহেতু এই প্রবন্ধটির মধ্য দিয়েই হেগেলের দর্শনের বিরুদ্ধে রাসেলের প্রথম বিদ্রোহ যার প্রতি তিনি অনুরক্ত ছিলেন কেমব্রিজে পড়াশুনোর সময় থেকে। যদিও সেই সময় তিনি ধর্মের প্রতি ততটা বিরুদ্ধ ছিলেন না যতটা তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে হয়েছিলেন। তাঁর কিছু সমালোচনা এই একই ঘটনার উপর নির্ভর করে রচিত হয়েছিল।)

দর্শন তার সমৃদ্ধির সময়গুলোতে, তার কাজ করার শপথ অনুযায়ী. বহু বিচিত্র পথে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পাদন করেছিল বলে দাবী করেছিল। বহু বাধার মধ্যেও দর্শন তাদের স্বস্তিকর আশ্রয় দিতে পেরেছিল। বৌদ্ধিক সংকটে সে ব্যাখ্যা প্রদান করে সেই সংকটকে দূর করত এবং নৈতিক বিহ্বলতায় পথ প্রদর্শনের কাজ করত।

যখন দর্শনের ব্যবহারের দৃষ্টান্ত একজন যুবককে বোঝানো হত তখন সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতার যুবোচিত উচ্ছ্বাসে আশ্চর্য হবার কিছু নেই;

স্বর্গীয় দর্শন সুন্দর কত!
নয় সে কটু নয় সে কড়া
ভাবে যেমন বোকার মরা
সে যে অ্যাপোলোর বাঁশির মতো
সঙ্গীতময় মনোহরা।

কিন্তু সেই সব সুন্দর দিনগুলো আজ আর নেই। একের পর এক চরম ভন্ডামীগুলোকে দর্শন তার নিজের উত্তরাধিকারীদের ধীরগতিতে বিজয়ের ফলে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। বেশির ভাগ জায়গায়, বৌদ্ধিক সংকটগুলো সমাধিত হয়েছে বিজ্ঞানের দ্বারা— বিশেষ কিছু অসাধারণ প্রশ্নের উপর দর্শনের ব্যগ্র দাবী. যে প্রশ্নগুলির উত্তর আজও দেবার প্রচেষ্টা হচ্ছে। যে প্রশ্নগুলি সম্পর্কে বেশিরভাগ মানুষ মনে করে যে সেগুলি অন্ধকার যুগগুলির অবশিষ্ট এবং যেগুলো তাদের সমস্ত দ্রুতি নিয়ে মি. এফ ডব্লু মেয়ারের কঠিন বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। নৈতিক বিহ্বলতাগুলি— যেগুলিকে আজও পর্যন্ত দার্শনিকরা দ্বিধাহীনভাবে তাঁদের রাজত্ব মনে করে থাকেন এবং যেগুলিকে ম্যাক ট্যাগার্ট এবং মি. ব্র্যাডলে পরিত্যাগ করেছেন সংখ্যাতত্ত্ব ও সাধারণ জ্ঞানের খামখেয়ালীপনা হিসেবে। কিন্তু আশ্বাস এবং সান্ত্বনা দেবার ক্ষমতা যা ক্ষমতাহীনের কাছে শেষ ক্ষমতা— ম্যাক ট্যাগার্ট মনে করেন তা হল দর্শন। আজকের রাত্রে এটাই হল সেই শেষ অধিকার যার

... আমি আমাদের আধুনিক দেবতাদের জীর্ণশীর্ণ জনক-জননীকে ডাকাতি করে ... ইচ্ছুক।

কেবলমাত্র দর্শনের ক্ষেত্রে এটা মনে হতে পারে যে, প্রশ্নটি খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে ... করা যেতে পারে। 'আমি জানি যে দর্শন আরাম দিতে পারে', ম্যাক ট্যাগার্ট ... পারেন, 'কারণ এটা অবশ্যই আমাদের আরাম দেয়'। যদিও, আমি প্রমাণ ... চেষ্টা করব যে যে-সব সিদ্ধান্ত তাকে আশ্বাস দেয়, সেই সিদ্ধান্তগুলো হল ... না তার সাধারণ অবস্থান থেকে তাকে অনুসরণ করে না— বরং সেগুলো ... ভাবে তাকে অনুসরণ না করে কেবল পড়ে থাকে। এটা হয় কেবল সেগুলো ... আশ্বাস দেয় বলেই। দর্শনের আবেগী মূল্য ছাড়া তার সত্য সম্পর্কে আমি ... করতে ইচ্ছুক নই। আমি এটা ধরে নেব অধিবিদ্যা অবভাস (Appear-...) ও সত্তার (Reality) মধ্যে যে স্বতন্ত্রতা আছে তার উপর নির্ভর করে ও ... যথার্থ বলে মেনে নেয়। এই ধরণের যে-কোন অধিবিদ্যাগত আদর্শকে খুব ... করে বলা যায়। 'ঈশ্বরীয় যা কিছু সবই তাঁর স্বর্গের, সবার যা কিছু মন্দ তা ...' এটাই এর শেষ কথা। কিন্তু এটা মেনে নিতে গেলে মনে হয় যে, ... তিনি তাঁর স্বর্গেই বিরাজ করেন এবং সর্বদাই তিনি সেখানে থাকেন, তাই ... এটা আশা করেও নিতে পারি যে তিনি কোন-না-কোন দিন পৃথিবীতে নেমে ... সজীব ও মৃতকে বিচার করতে না আসলেও, অন্তত দার্শনিকদের ... পুরস্কৃত করতে তিনি আসবেনই। যদিও বিশুদ্ধ স্বর্গীয় সত্ত্বার কাছে তার ... আত্মসমর্পণ পার্থিব ব্যাপারগুলোকে বিবেচনা করে স্টোয়িকবাদকে গ্রহণ ... প্রস্তাব দেয়, যার উপর নির্ভর করে যদি আমরা আমাদের আশাগুলোকে ... করতে চাই, তবে তা একপ্রকার হঠকারিতা হয়ে যাবে।

কিন্তু আন্তরিকতার সঙ্গে বলতে গেলে, বৈচিত্র্যের মধ্যে সান্ত্বনা হিসেবে ... মতবাদগুলির আবেগী মূল্য তার ভবিষ্যতের ভবিষ্যদ্বাণী করার উপর নির্ভর ... আবির্ভূত হয়। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আবেগী কথাবার্তা একটি অতীত যা ... থেকেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। 'যার শেষ ভালো, তার সব ভালো ... একটি সর্বসম্মত সাধারণ জ্ঞান সঞ্জাত। 'অনেকগুলি বিষণ্ন সকাল একটি সুন্দর ... পরিণত হয়'। যেখানে দুঃখবাদ বলে :

অনেক দেখেছি আমি উজ্জ্বল দিন।
সার্বভৌম চোখের সাথে
দেখেছি গিরিচূড়াদের—
ছিনাল মেলামেশা।
দেখেছি আমি সবুজ তৃণভূমি আছে যত,
তারা স্বর্ণ-মুখে চুম্বনরত।

দেখেছি ধূসর ছোট নদীদের সেই উজ্জ্বলতা
স্বর্গ-মদিরা পান করে তারা পেয়েছে মাদকতা।
শীঘ্র কর, অনুমতি দাও
উড়ুক হীন মেঘমালা,
তার স্বর্গ-মুখে ঢেলে দিক তার
পুঞ্জীভূত কালো জ্বালা।
লুকিয়ে সে নেবে মুখ
জগতের থেকে,
অদৃশ্যকে রাখবে সে
পশ্চিমে ঢেকে
এই অপমান মেখে,
ভাই, এই অপমান মেখে।

এই জন্যই বলতে হয়, বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের আবেগমূলক দিক থেকে ভালো বা মন্দ যে দৃষ্টিভঙ্গিই থাকুক না কেন তা নির্ভর করে ভবিষ্যতের উপর, যার উপর এটা থাকবে। আমরা সর্বদাই কালের পরিপ্রেক্ষিতে অবভাসসমূহকে (Appearances) বিবেচনা করে থাকি এবং যতক্ষণ না আমরা এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারি যে আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের বর্তমানের চেয়ে উত্তম হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোথায় আমরা সান্ত্বনা পাব তা দেখাটা সত্যই শক্ত।

ভবিষ্যৎ এত বিপুল পরিমাণে আশাবাদের সঙ্গে আবদ্ধ যে ম্যাক ট্যাগার্টের সমস্ত আশাবাদ কালকে অস্বীকার করার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠলেও তিনি বাধ্য হন বস্তুসমূহের ভবিষ্যৎ অবস্থাস্বরূপ সেই কালকে প্রতিনিধিত্ব করতে যা পরম 'একটি সঙ্গতি যে অবশ্য কোন-না-কোন দিন প্রকাশিত হবে'। এই স্ববিরোধকে উত্তেজিত করে তোলাটা নির্দয়তা হবে। ম্যাক ট্যাগার্ট নিজেই আমাকে এ সম্পর্কে সজাগ করে দিয়েছেন। কিন্তু আমি যে ধারণাটিকে উত্তেজিত করে তুলতে ইচ্ছুক তা হল, যে-কোন আশ্বাস যা ধর্মীয়শাস্ত্র থেকে উৎসারিত হতে পারে এবং যে সত্তা হল কালহীন ও চিরন্তনভাবে মঙ্গ তা এই স্ববিরোধ থেকে একমাত্র এবং সম্পূর্ণরূপে উৎসারিত হয়েছে। একটি কালহীন সত্তা অতীতের চেয়ে ভবিষ্যতের সঙ্গে কখনও অন্তরঙ্গ যোগ রাখতে পারে না। যদি এটার যথার্থতা এখনো এসে উপস্থিত না হয় তা হলে কোন কারণে মনে করা ঠিক হবে না যে এটা কোনদিন উপস্থিত হবে— এরকম প্রতিটি জায়গায় বলা হয় যে ঈশ্বর তাঁর স্বর্গে থাকবেন। আমরা সমানুপাতিক ন্যায্যতার সঙ্গে একটি সঙ্গতি সম্পর্কে বলতে পারি যা অবশ্যই কোন-না-কোন দিন প্রকাশিত হয়েছে। এটা হতে পারে যে, 'আমার দুঃখ রয়েছে পেছনে'— এবং এটা একেবারেই স্পষ্ট যে কত কম আশ্বাস এটা আমাদের দিতে পারে।

আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতা কালের সঙ্গে বাঁধা এবং কালহীন অভিজ্ঞতাকে কল্পনা করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। কিন্তু যদি তা সম্ভবও হত, স্ববিরোধিতা ছাড়া আমরা কখনই মনে করতে পারতাম না যে আমরা কখনও এ ধরণের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারব। এইজন্য, সমস্ত অভিজ্ঞতা যতটা দর্শনের দেখানো উচিত তা আমাদের জানা অভিজ্ঞতার অনুরূপ— যদি আমাদের কাছে এটাকে মন্দ ভাবা হয় তবে অবভাস থেকে স্বতন্ত্র সত্তা সম্পর্কে কোন মতবাদ আমাদের কোন আশাই জাগাতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে, আমরা একটি দ্বৈতবাদের মধ্যে পড়েছি। একদিকে আমাদের জানা জগৎ যা তার সমস্ত রকম ঘটনাসমূহ, আনন্দদায়ক বা নিরানন্দদায়ক, মৃত্যু, ব্যর্থতা, বিপর্যয় প্রভৃতি নিয়ে আছে, অন্যদিকে কাল্পনিক জগৎ যে-জগৎটিকে আমরা সত্তার জগৎ বলে নাম দিয়েছি। সত্তার বৃহত্ত্বের দ্বারা এবং এইরকম জগৎ সত্যই আছে কিনা তার কোন চিহ্ন না দেখতে পাওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছি। এখন সত্তার জগতের জন্য আমাদের একটাই জায়গা আছে, তা হল, সত্তাকে তাই হতে হবে যাতে আমরা তাকে বুঝতে পারি। কিন্তু যদি আমাদের শুদ্ধ আদর্শ নির্মাণের ফল হিসেবে আমরা যে জগৎকে জানি তার উল্টো হয়ে দেখা দেয়— অর্থাৎ বাস্তব জগৎ থেকে তা ভিন্ন হয়, তবে সেই বিশেষ নির্মাণের থেকে যে ফল বেরিয়ে আসবে তা দিয়ে আমরা তথাকথিত সত্তার জগৎ (World of reality) সম্পর্কে কখনই কোন অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারব না। তবে একমাত্র সেই বিষয়ের কথাই বলছি যে বিষয়ে আমরা কোন অভিজ্ঞতাই অর্জন করতে পারিনি— তাই আমি এমন কোন কিছুকে দেখতে পাই না যেটাকে বর্তমান জটিলতার থেকে মুক্তি পাবার সেই আশ্বাস বলা যেতে পারে যা আমরা আমাদের সমস্ত অধিবিদ্যার মধ্যে দিয়ে লাভ করেছি। অমরত্বের প্রশ্নটিকে উদাহরণস্বরূপ নেওয়া যাক। মানুষ অমরত্ব কামনা করেছে এই জগতের অবিচারের প্রতিকার করবার জন্য, অথবা সেই উদ্দেশ্যে যে উদ্দেশ্যটিকে আমরা শ্রেয় বলতে পারি, তা হল মৃত্যুর পর মিলনের একটা সম্ভাবনা তৈরি করা যাতে তারা যাদের ভালোবাসত তাদের সঙ্গে মিলতে পারে। দ্বিতীয় কামনাটি এমন যা আমরা সবাই অনুভব করতে পারি এবং যাদের সন্তুষ্টির জন্য দর্শন যদি কিছু করতে পারে তবে তার কাছে আমাদের প্রচুর পরিমাণে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু দর্শন, তার ক্ষমতা অনুযায়ী, আমাদের কেবল নিশ্চিত করতে পারে যে আত্মা হল কালহীন সত্তা। যদি এমন কোন কাল থাকে তবে তার উপস্থিতি একদিন ঘটবেই, এবং তা এই কালহীন কালের ধারণার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে অসঙ্গতিকর। মৃত্যুর পর অস্তিত্বের মতবাদ থেকে কোনরকম আইনসিদ্ধ অনুমান পাওয়া যায় না। কীটস্ একদা সখেদে বলতে পারেন :

তবে আমি চাইবো না গো তোমার পানে
অনেক বেশি করে,
চাইনে কখনও সুখী হতে সেই প্রেম ধনে
ভীতির ক্ষমতা ধরে—
যে অবাস্তব ভালোবাসা
বাঁধে তার বাসা।

এটা তাঁকে কুব একটা সান্ত্বনা দিতে পারেনি এই বলে যে 'এক ঘন্টার সুন্দর সৃষ্টি,' অধিবিদ্যাগত সঠিক শব্দগুচ্ছ (Phrase) নয়। এটা এখনও সত্য যে 'কাল এসে নিয়ে যাবে মোর সকল ভালোবাসা' 'এই চিন্তা মৃতের মতো, যাকে বেছে নেওয়া যেতে পারে না' তাই শুধু হারাবার ভয়ে বসে বসে কাঁদতে হয়। তাই কালহীনভাবে যথার্থ সত্তার মতবাদসমূহের প্রতিটি অংশই এরকমই। যা কিছু এখন অমঙ্গলকর মনে হয়— এবং এটা অমঙ্গলের পক্ষে দুঃখজনক বিশেষ অধিকার যে এরকম ভাবলে এরকমই হবে— যা কিছু অমঙ্গল বলে মনে হয় তা সব থাকতে পারে এবং আমরা জানি যেগুলোকে সম্বল করে সমগ্র কাল ধরে আমরা আমাদের সাম্প্রতিক উত্তরাধিকারীদের তীব্র যন্ত্রণা দেব। আমার মনের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে এই ধরনের মতবাদে আশ্বাস অথবা সান্ত্বনার কোন চিহ্নই নেই।

এটা সত্য যে খ্রীষ্টীয় মতবাদ এবং পূর্বের সমস্ত আশাবাদসমূহ, জগৎকে দয়ালু বিধাতার চিরন্তন শাসিত স্থান হিসেবে দেখিয়েছে এবং তা অধিবিদ্যাগতভাবে মঙ্গলজনক বলে আখ্যায়িত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এটা কেবলমাত্র একটা কৌশল হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে এসেছে যার দ্বারা জগতের ভবিষ্যতের মহানত্ব প্রমাণ করা যাবে— উদাহরণস্বরূপ, এই প্রমাণ করতে, যে ভালো মানুষেরা মৃত্যুর পর সুখী হবে। এটা সর্বদাই এই রকম সিদ্ধান্তই হয়ে এসেছে— যদিও সিদ্ধান্তটি অবৈধভাবে গঠিত তবুও তা আমাদের আশ্বাস দিতে পেরেছে। 'সে ভালো মানুষ এবং সবটাই ভালো হবে।'

প্রকৃতপক্ষে বলা যেতে পারে যে কেবলমাত্র বস্তু-নিরপেক্ষ মতবাদেই এই আশ্বাস থাকতে পারে যে সত্তা মঙ্গলজনক। আমি নিজে এই মতবাদের প্রমাণকে স্বীকার করি না। এমনকি এটা যদি সত্যিও হয় তবু আমি এটা দেখতে পাব না যে কেন এটা আশ্বাসমূলক হওয়া উচিত। কেননা আমার তর্কের উপাদান সেই সত্তা, যা অধিবিদ্যার দ্বারা নির্মিত এবং অভিজ্ঞতার জগতের সঙ্গে যার কোন রকম সম্পর্ক নেই বললেই চলে। এটা একটা সারগর্ভহীন বস্তু-নিরপেক্ষ বিষয়, যার থেকে অবভাসের জগতে কোন একটা মাত্র বৈধ অনুমানও গঠন করা যাবে না,

[illegible], যে জগতে আমাদের সব স্বার্থসমূহ নিহিত। এমনকি সেই বিশুদ্ধ আত্মিক-[illegible] থেকে অধিবিদ্যার উত্থান। সেই স্বার্থ আসলে অবভাসের জগৎকে ব্যাখ্যা করার স্বার্থ। কিন্তু এই বাস্তব স্পষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে ব্যাখ্যা করার বদলে [illegible]বিদ্যা নির্মাণ করেছে অন্য আর একটি মৌলিকভাবে স্বতন্ত্র জগৎ এবং তা [illegible] স্বতন্ত্র, এতটাই বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে অসংযুক্ত যে নিত্যনৈমিত্তিক [illegible]নের জগৎ সম্পূর্ণভাবে এর দ্বারা অপ্রভাবিত রয়ে গেছে এবং এমনভাবে তার [illegible] পথে চলেছে যেন সত্তার জগৎ বলে কোনরকম জগৎই নেই। এমনকি যদি [illegible] সত্তার জগৎকে 'অন্য জগৎ' হিসেবে, বা আকাশে বিরাজিত স্বর্গীয় নগররূপে [illegible] করার অনুমতিও পেত, তাহলে নিঃসন্দেহে অন্তত চিন্তার এই আশ্বাস [illegible] যেত যে অন্যদের একটি যথার্থ অভিজ্ঞতা আছে যা আমাদের নেই। কিন্তু বলতে গেলে, আমাদের অভিজ্ঞতা, যেমনভাবে আমরা তাকে জানি, তা একটি [illegible] অভিজ্ঞতা এবং তা অবশ্যই আমাদের ঠান্ডা করে ছাড়ে, যেহেতু এটা প্রমাণ করতে পারে না যে আমাদের অভিজ্ঞতা অন্য রকম অভিজ্ঞতার চেয়ে উত্তম হতে পারে। অন্যদিকে, একথা বলতে হয় যে আমাদের প্রকৃত অভিজ্ঞতা দর্শনের দ্বারা [illegible] যথার্থ অভিজ্ঞতার মতো নয়। আমাদের প্রকৃত অভিজ্ঞতা সেই ধরণের [illegible]ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে যে অস্তিত্ব দার্শনিক বাস্তবতার থাকতে পারে— [illegible] ঈশ্বর তাঁর স্বর্গে একজন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হিসেবে কখনই নিজেকে সংরক্ষণ করতে পারেন না। হয় আমাদের অভিজ্ঞতা যথার্থ— যা একটি সারগর্ভহীন [illegible] মাত্র, যে শব্দগুচ্ছটি আগেরগুলোর থেকে কোন অংশে উত্তম না হওয়ায় [illegible] ছেড়ে দেওয়াই ভালো— অথবা যথার্থ অভিজ্ঞতা বলেই কিছু নেই এবং [illegible] সত্তার জগৎ সম্পর্কে কারুর কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় সেই জগৎ [illegible]মাত্র অধিবিদ্যার বইগুলোতেই রয়ে গেছে। এই উভয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে [illegible] মনে হয় যে ধর্মের সান্ত্বনাসমূহকে আমরা দর্শনে দেখতে পাই না। যদিও [illegible] কতকগুলি বোধ আছে যেগুলোর ক্ষেত্রে এটা অস্বীকার করা অসম্ভব হয়ে [illegible] যে দর্শন আমাদের আশ্বাস দিলেও দিতে পারে। আমাদের সকালগুলোকে [illegible] করে কাটাবার উপায়কে আমরা দার্শনিকীকরণ করতেই পারি এই অর্থে। [illegible] সন্ধ্যাগুলোকে সুন্দর করে কাটাবার উপায় হিসেবে মদ্যপানকে [illegible] উৎসরূপে তুলনা করা যেতে পারে। আবার আমরা দর্শনকে [illegible]বিদ্যাগতভাবে নিতে পারি। সম্ভবত আমাদের মধ্যে অনেকেই স্পিনোজাকে [illegible] পারি। আমরা অধিবিদ্যাকে ব্যবহার করতে পারি মেজাজ তৈরি করবার [illegible] উপায় হিসেবে, যখন কবিতা ও সঙ্গীত, যা বিশ্ব সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও [illegible] সম্পর্কে বিশেষ আচরণ প্রদানের উপায় হিসেবে কাজ করে... মনের

পরিমাণবাচক অবস্থা ঠিক সেই অনুপাতে মূল্য পায় যে অনুপাতে কাব্যিক আবেগের মাত্রা উন্মেষিত হয়। কিন্তু তা বিশ্বাসসমূহের সভ্যতার উপর নির্ভর করে হয় না। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের পরিতৃপ্তি, এই ধরণের ভাবের পরিপ্রেক্ষিতে, মনে হয় অধিবিদ্যাবিদদের পেশার ঠিক বিপরীত। এটা বাস্তব জগৎ ও তার অমঙ্গলজনক দিকগুলোকে ভুলে যাবার একটা সন্তুষ্টি। কয়েক মুহূর্তের জন্য, আমরা নিজেরা যে বাস্তব জগৎ সৃষ্টি করেছি তাকে ভুলে যাবার জন্য আমরা নিজেরাই নিজেদের প্ররোচিত করে থাকি। মনে হয় এরই পরিপ্রেক্ষিতে ব্র্যাডলে অধিবিদ্যাসমূহকে বিচার করেছেন। তিনি বলেন, 'যখন কাব্য, কলা এবং ধর্ম কোনরকম উৎসাহ জাগাতে পারে না, অথবা যখন চরম সমস্যাগুলোর সঙ্গে লড়াই করবার কোন প্রবণতা তারা আর দেখায় না এবং সেইসব সমস্যাগুলোর সাথে একটা বোঝাপড়ায় আসে, যখন রহস্য-চেতনা ও জাদুমন্ত্র উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়াবার জন্য মনকে আর আকর্ষণ করে না এবং প্রেম জানে না কাকে সে ভালোবাসবে, সংক্ষেপে, যখন গোধূলির মুগ্ধ করার ক্ষমতা থাকে না— তখন অধিবিদ্যাসমূহ নিরর্থক হয়ে পড়ে।' এইভাবে অধিবিদ্যা আমাদের জন্য যে কাজ করে সেই একই প্রয়োজনে 'দ্য টেম্পেস্ট' আমাদের জন্য সেই কাজ করে— কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তার মূল্য তার সত্যের থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন। প্রসপেরোর জাদু আমাদের প্রেত আত্মাদের জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে বলে আমরা 'দ্য টেম্পেস্ট'-কে মূল্য দিই তা নয়, সৌন্দর্যবিদ্যাগত ভাবে আমরা তাকে মূল্য দিয়ে থাকি। কিন্তু আমরা অধিবিদ্যাসমূহকে মূল্য দিই না এই কারণে যে তা আমাদের প্রেত আত্মাদের জগতের সম্পর্কে খোঁজ দেয়। এর ফলে ধার্মিক আশ্বাস ও সৌন্দর্য-বিজ্ঞানগত সন্তুষ্টির মধ্যে একটা অনিবার্য স্বতন্ত্রতার সৃষ্টি হয়, যে ব্যাপারটাকে আমি স্বীকার করে নিই, কিন্তু দর্শনের ক্ষেত্রে তাকে আমি অস্বীকার করি। সৌন্দর্য-বিজ্ঞানজাত সন্তুষ্টির জন্য বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন দৃঢ়বিশ্বাস থাকা একান্ত প্রয়োজন। যখন আমরা এই সন্তুষ্টি খুঁজে থাকি তখন অধিবিদ্যাকে বেছে নিতে পারি যা এই বিষয়ে আমাদের অনেকটা সন্তুষ্টি দিয়ে থাকে। অন্যদিকে, ধর্মীয় আশ্বাসের ক্ষেত্রে বিশ্বাস ব্যাপারটি একান্ত প্রয়োজন। আমি এই ব্যাপারে তর্কের অবতারণা করছি যে আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী আমরা অধিবিদ্যা থেকে কখনই ধর্মীয় আশ্বাস পাই না।

যদিও সৌন্দর্য-বিজ্ঞানগত আবেগের রহস্যময় তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে বিতর্ককে পরিশুদ্ধ করে নেওয়া সম্ভব। এই বিষয়ে তর্কে অবতীর্ণ হওয়া যায় যে যদিও আমরা অভিজ্ঞতা পুরোপুরি লাভ করি না, তবুও কিছু কিছু অভিজ্ঞতা এর খুব কাছাকাছি যায় এবং এই ধরণের অভিজ্ঞতাগুলি, বলা যেতে পারে, কলা ও

দর্শনের থেকে পাওয়া যায়। এই অভিজ্ঞতাজাত প্রভাব যা দর্শন ও কলা মাধ্যমধ্যে আমাদের দিয়ে থাকে, তা গ্রহণ করা সোজা হয়ে দাঁড়ায়। আবেগজাগত তীব্র ভাবাবেগ সম্ভবত মানুষকে আবেগের দিক থেকে এতটাই সমৃদ্ধ বা সুন্দর করে তোলে যা সম্পূর্ণভাবে তাদের কাছে আকাঙ্ক্ষিত এবং মঙ্গলময় সুন্দর দৃষ্টির দ্বারা পরিবর্তিত জগৎ সম্পর্কে রহস্যময় এই চেতনা দর্শন কখনও কখনও দিয়ে থাকে। ব্র্যাডলে যেমন বলেছেন, 'কেউ কেউ এই পথে, তো কেউ কেউ অন্য আর এক পথে, কিন্তু দৃষ্ট জগতের ওপারে আমরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে থাকি।' বিভিন্ন ভাবে আমরা উচ্চ কিছুকে দেখে থাকি, যা আমাদের সমর্থনেও করে আবার ছোট করেও রেখে দেয়, যা আমাদের নির্দোষ করে তোলে আবার আমাদের সেই নির্দোষিতাকে সমর্থনও করে। কিছু বিশেষ মানুষদের ক্ষেত্রে বিশ্বকে বোঝবার জন্য পরমেশ্বর সম্পর্কে এইরকম অভিজ্ঞতা একমাত্র পথ হয়ে দাঁড়ায়..... এবং এইভাবে পরম সত্যকে জানবার জন্য এই ঘটনাটি আর একটি কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু সমভাবে এই আশা করবার কোন কারণ নেই যে এইসব মানুষগুলো পরম সত্যকে দেখতে পাবে কিনা? যদি পরম সত্যে অবভাস ও সত্তার মতবাদের কোন সাদৃশ্য থাকে তবে তা থাকুক। আমি আবেগের মূল্য অস্বীকার করি না, কিন্তু আমি এটা অস্বীকার করি যে, এটা কোন অদ্ভুত ধরণের কৃপামূলক দৃষ্টি, অথবা দেবতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা। এক অর্থে, সমস্ত অভিজ্ঞতা পরমেশ্বর সম্পর্কে অভিজ্ঞতা, কিন্তু অন্য আর একটি অর্থে, যেহেতু সব অভিজ্ঞতা সমভাবে একই কালে অবস্থিত, তাই তা পরমেশ্বর সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা নয়—'যেমনভাবে' পাণ্ডিত্যের অভিমান আমাকে কথা বলালো। অবভাস ও সত্তার মধ্যে অনতিক্রমণীয় ব্যবধান এতটাই সুগভীর যে, যতদূর আমি দেখতে পাই, কোন অভিজ্ঞতাকেই সত্তার অভিজ্ঞতার কাছাকাছি ভাবার কোন রকম উপায় নেই। এইজন্যই প্রশ্নের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাগুলির মূল্য সম্পূর্ণভাবে আবেগের গুণের উপর হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ব্র্যাডলের নির্দেশ অনুযায়ী সত্যের কোনচরম মানকে তাদের সঙ্গে যুক্ত করে নয়। যদি তাই হয়, সেগুলো কেবলমাত্র সান্ত্বনীকরণের সান্ত্বনা হয়ে দাঁড়াবে, দর্শনের সান্ত্বনা হয়ে দাঁড়াবে না। তারা পরম সত্যকে প্রবর্তন করবার যুক্তি নির্মাণ করবে। কেননা সমস্ত ধরনের ফুল যারা যাবার সাথে এক জায়গায় জড়ো হয়ে থাকে কিন্তু তারা তাদের এই প্রাপ্তির জন্য কোন সুরক্ষার নির্মাণ করে না, যেহেতু এই সমস্ত ফুল রাজপথের প্রথমেই কেবলমাত্র বেড়ে ওঠে এবং আমরা আমাদের যাত্রা শেষ করার অনেক আগেই তারা মিলিয়ে যায় ঠিক একভাবে যেমনভাবে আবির্ভূত সব কিছু আমাদের যাত্রা শেষে পৌঁছবার আগেই মিলিয়ে যায়।

যে দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে আমি বললাম তা নিঃসন্দেহে প্রেরণাদায়ক কিছু নয়। যদি সাধারণভাবে তা গ্রহণীয়ও হয়ে থাকে তবু তা দর্শন অধ্যয়নে কোন রকম উন্নতি ঘটাবে না বলেই মনে হয়। আমি আমার গবেষণাকে বিচার করে দেখতে পারি এবং যদি সত্যই আমি তাই করি তবে এই নীতি অনুযায়ী করব যে, 'সেখানে সব কিছুই পচে গেছে, যেখানে মানুষের কাজ দুর্গন্ধময় মাছের জন্য কান্না ছাড়া আর কিছুই নয়।' কিন্তু আমি এই বিষয়ে নির্দেশ দিতে আগ্রহী যে অধিবিদ্যা যখন ধর্মের স্থানকে যোগান দেবার রাস্তা খোঁজে তখনি সব থেকে বড় ভুলটি করে। আমি স্বীকার করি যে অধিবিদ্যা তা যোগান দিতে পারে। শুধু তাই নয় সে যোগান দিয়েও থাকে, কিন্তু আমি অবশ্যই বলব যে, তা সে করে থাকে নিজেকে অধিবিদ্যায় পরিবর্তিত করে। কোন অধিবিদ্যাকে বিজ্ঞানের মতো করে স্বীকার করে নেওয়া হয় না যা বুদ্ধিবিদ্যাগত কৌতূহলের দ্বারা বিচার্য এবং যার একমাত্র বুদ্ধিবিদ্যাগত কৌতূহলের দ্বারাই পরিচালিত হওয়া উচিত। আমাদের সবাইকে এ'কথা স্বীকার করে নিতে হবে যে অধিবিদ্যার মধ্যে আশ্বাসকে পাওয়ার কামনা প্রচুর পরিমাণে ভ্রমপূর্ণ যুক্তি এবং বুদ্ধিবিদ্যাগত অসততা তৈরি করেছে। যে-কোন ভাবেই হ'ক, ধর্ম পরিত্যাগ এর থেকে আমাদের উদ্ধার করে থাকে। যেহেতু বুদ্ধিবিদ্যাগত কৌতূহলের কিছু কিছু মানুষের বিদ্যমান থাকে, সেহেতু এখনও বিশেষভাবে বিভ্রান্তিগুলির হাত থেকে তাদের মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ব্র্যাডলেকে উদ্ধৃত করে আরও একবার বলা যেতে পারে, মানুষের প্রকৃতি এমন ধরণের যে একমাত্র একটি পথে তার প্রধান কামনা পূর্ণতায় পৌঁছাবে এবং সেই পথেই তাকে পাবার চেষ্টা করবে, সে যাই হ ক এবং জগৎ সে সম্পর্কে যা খুশীই ভাবুক না কেন। যদি সে তা না করে, তাহলে সে অতি নীচ।

৬

ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যান্ট সন্দেহবাদ প্রসঙ্গে

(১৯২৮ সালে লিখিত)

যদি কোন ব্যক্তি বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন জাতির মুক্ত-চিন্তাসম্পন্ন মানুষের সাথে বেশি যোগাযোগ রাখে তবে সে ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্মের উৎস দুটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করবে। যদিও তারা অনেকটা কল্পনা করে নিতে পারে যে তারা সেই ধর্মতত্ত্বকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে যা যুবক বয়সে তাদের শেখানো হয়েছিল। প্রোটেষ্ট্যান্টও ক্যাথলিকদের মধ্যে পার্থক্যটা ঠিক সেই রকম বা রকম পার্থক্য মুক্ত-চিন্তাবিদ ও বিশ্বাসীদের মধ্যে হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, আলোচনীয় পার্থক্যটি আবিষ্কার করা হয়ত সোজা, যেহেতু ধর্মমত থেকে সরে আসার সুস্পষ্ট প্রবণতার পেছনে তাদের লুকিয়ে রাখা হয় না। এ'সম্পর্কে একটা অসুবিধা আছে, আর তা হল, বেশিরভাগ প্রোটেষ্ট্যান্ট নাস্তিক ইংরেজ অথবা আমেরিকান, যখন বেশির ভাগ ক্যাথলিক হল ফরাসী। গিবনের মতো যে-সব ইংরেজ নাস্তিক আছেন তাঁরা ফরাসী চিন্তাভাবনার সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগাযোগের ফলে প্রোটেষ্ট্যান্ট ধরণের রীতির বদলে ক্যাথলিক মুক্ত-চিন্তাবিদদের চারিত্রিক গুণাগুণ লক্ষ্য করেন। অধিকন্তু যে বড় ধরণের পার্থক্যটি পড়ে থাকে তা ঠিক কোথায় আছে তা খুঁজে বার করবার প্রচেষ্টাটি আনন্দজনক হতে পারে।

যে কেউ সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যমূলক প্রোটেষ্ট্যান্ট চিন্তাবিদ হিসেবে জেমস মিলকে নিতে পারে। যিনি তাঁর পুত্রের দ্বারা রচিত 'আমার পিতা' নামক আত্মজীবনীমূলক বইতে যেভাবে আবির্ভূত হয়েছেন, সে সম্পর্কে জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছেন, 'আমার পিতা স্কচ প্রেসবাইটারিয়ানবাদ (একটি বিশেষ ধরণের গীর্জা যা প্রেসবাইটারদের দ্বারা পরিচালিত হত এবং যে গীর্জাগুলো স্কটল্যান্ড গীর্জাগুলোর থেকে স্বাধীন ছিল। যেখানে স্বাধীন-চিন্তাকে কোনরকম বাধা দেওয়া হত না— অনুবাদক) দ্বারা কর্মকাণ্ডের দ্বারা শিক্ষিত ছিলেন। তিনি তাঁর নিজের অধ্যয়নপ্রসূত মননের দ্বারা আগেই যে বাইবেলের শেষ গ্রন্থে বা প্রত্যাদেশে বর্ণিত বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তা নয়, যাকে সাধারণভাবে প্রাকৃতিক ধর্ম বলা হয়ে থাকে তাকেও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আমার পিতা সেই সমস্ত কিছুকেই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যাকে ধর্মীয় বিশ্বাস বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সবাই যা মনে করতে পারে এটা তেমন ছিল না। এই প্রত্যাখ্যান প্রাথমিকভাবে যুক্তি-তর্ক-প্রমাণ প্রভৃতির উপর ভর করে বেড়ে ওঠেনি। তার ভিত্তি ছিল নৈতিকতা, যা এখনও বিদ্যাবুদ্ধির চেয়ে বেশি। তিনি এই ব্যাপারটা বিশ্বাস করা অসম্ভব বলে মনে করেছেন, যে

জগৎ এত অশুভ শক্তিতে পূর্ণ সেই জগৎ একজন অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন মঙ্গলময় ও ন্যায়পরায়ণ স্রষ্টার দ্বারা রচিত... ধর্মের প্রতি তাঁর এই অনীহা, অর্থাৎ ধর্ম বলতে সাধারণত যা বোঝান হয়ে থাকে তার প্রতি অনীহা, লুক্রেতিউসের মতোই ছিল। তিনি এই অনুভব নিয়ে ব্যাপারটিকে দেখতেন যে এটা শুধু মানসিকভাবে প্রবঞ্চনাকরই নয়, এটা বিরাট ধরণের নৈতিক বিপদ। আমার পিতার কর্তব্যের আদর্শের সঙ্গে ধর্ম ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অসঙ্গতিকর ছিল। তিনি আমাকে ধর্ম সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস সমূহ ও অনুভূতির বিরোধ মতো পোষণ করার অনুমতি দিতেন। প্রথম থেকেই এই বলে আমার মনে দাগ কেটে দিয়েছিলেন যে, কিভাবে জগতের আবির্ভাব হয়েছিল সে বিষয়টি সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। তথাপি জেমস্ মিল নিঃসন্দেহে একজন প্রোটেষ্ট্যান্ট হয়েই রয়ে গিয়ে ছিলেন। 'তিনি আমাদের সংস্কারের প্রতি শক্তিশালী ভাবে উৎসাহী হয়ে ওঠার শিক্ষা দিয়েছেন। স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্রে পুরোহিতদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য তিনি আমাকে সংস্কারের প্রতি শক্তিশালীভাবে উৎসাহী হয়ে ওঠারও শিক্ষা দিয়েছিলেন।'

এই সমস্ত ক্ষেত্রে জেমস্ মিল কেবলমাত্র জন নক্সের প্রেরণাকেই বহন করে চলেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। জন নক্স একটি চরমপন্থী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি হয়েও সেই নৈতিক আগ্রহ এবং ধর্মতত্ত্বে উৎসাহকে ধরে রেখেছিলেন যা তাঁর পূর্বপুরুষদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন করে তুলেছিল। প্রথম থেকে প্রোটেষ্ট্যান্টরা তাদের বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের থেকে বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের মতগুলোকে বিশ্বাস না করে। এইজন্য আরও একটি মতকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াটা আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার নৈতিক উৎসাহ হিসেবে সমস্ত বিষয়ের সার।

এটাই প্রোটেষ্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিকদের নৈতিকতার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য। প্রোটেষ্ট্যান্টদের কাছে সেই মানুষই অসাধারণ ভালো মানুষ যে কর্তৃত্বের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ওয়র্ম্সের (Worms) ভোজন উৎসবে লুথারের মতো করে মতবাদসমূহকে গ্রহণ করে। প্রোটেষ্ট্যান্টদের মঙ্গলময়তা সম্পর্কে ধারণা কিছুটা ব্যক্তিতান্ত্রিক এবং বিচ্ছিন্ন। আমি নিজেই একজন প্রোটেষ্ট্যান্ট হিসেবে শিক্ষিত হয়েছি এবং সেই সময় অনেকগুলি বাক্য আমার যুব মনে যথেষ্ট পরিমাণে দাগ কেটে গেছে। সেটি হল, 'অনেক পথ অনুসরণ কর না, তাহলেই আনন্দ করবে।' আমি সচেতনতার সঙ্গে বলতে পারি আজকের দিনটাতেও এই বাক্যটি আমার সুগভীর কাজগুলোতে প্রভাব সৃষ্টি করে। ধার্মিকতা সম্পর্কে ক্যাথলিকদের ধারণা একেবারেই আলাদা তাদের কাছে সমস্ত রকম ধার্মিকতাই এমন বস্তু যার কাছে বশ্যতা স্বীকার করতেই হবে। কেবলমাত্র ঈশ্বরের কণ্ঠ হিসেবে বিবেক

...মেনে নিলেই চলবে না। প্রত্যাদেশ বা বাইবেলের শেষ গ্রন্থের শ্বাসপ্রশ্বাস ... গীর্জার কর্তৃত্বকেও মেনে নিতে হবে। এই ব্যবস্থা ক্যাথলিকদের ধার্মিকতার ...কে প্রোটেষ্ট্যান্টদের থেকে অনেক বেশি সামাজিক করে তুলেছে এবং ...র প্যাচকলকে আরও বেশি বড় করে তোলে যখন সে গীর্জার হয়ে কাজ ... প্রোটেষ্ট্যান্টরা তাদের সেই বিশেষ প্রোটেষ্ট্যান্ট সম্প্রদায়কে পরিত্যাগ করে ...যানে তারা লালিত-পালিত হয়েছিল এবং তা করে এই কারণে যে বহু আগে ... সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতারা বর্তমান যুগ অনুযায়ী কাজগুলো করে যেতে পারেনি ...। সেইজন্য নতুন সম্প্রদায়ের সঙ্গে মানিয়ে চলাটাই এখন প্রোটেষ্ট্যান্টদের ...যোগিতা। অন্যদিকে ক্যাথলিকরা চার্চের সমর্থন ব্যতীত নিজেদেরকে অসহায় ...ভব করে। যদিও সে যুক্ত হতে পারে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে, যেমন ...ন সহযোগিতা ও ভ্রাতৃপ্রেমের আদর্শে স্থাপিত কোন গুপ্ত সমিতিতে। কিন্তু ... আশাপ্রসূত বিদ্রোহ সম্পর্কে সর্বদাই সজাগ থাকে। সে সাধারণত তার ...ন মনের যে-কোন মাত্রায় এ বিষয়ে বিশ্বাস রাখে যে নৈতিক জীবন গীর্জার ...র মধ্যে সীমাবদ্ধ। অতএব স্বাধীন-চিন্তাবিদদের ক্ষেত্রে উচ্চ ধরণের ...তা পোষণ করাটা অসম্ভব হয়ে যায়। এই ধরণের দৃঢ় বিশ্বাস তাকে তার ...অনুযায়ী একটি স্বতন্ত্র পথে নিয়ে যায়। যদি সে আনন্দময় ও সহজ ...র ব্যক্তি হয় তবে সে উইলিয়াম জেমসের মতে সেই ছুটির দিনকে ভোগ ... পারবে যাকে তিনি মরাল হলিডে (Moral holiday) বলে উল্লেখ ...। এই ধরণের ব্যক্তির ক্ষেত্রে যথার্থ উদাহরণ হল মঁতে, যিনি ব্যবস্থাসমূহ ...ন্তসমূহের বিরুদ্ধে শত্রুতা প্রদর্শন করে তার বিদ্যাবুদ্ধিগত হলিডে ...liday) পালন করতেন। আধুনিক মানুষেরা এটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না ...নবজাগরণ ঠিক কতটা বুদ্ধিবিদ্যাগত মনোভাবের বিরুদ্ধ আন্দোলন ছিল। মধ্য ... গুরুকে প্রমাণ করাটাই ছিল একটা প্রথা। নবজাগরণ এই প্রথাসমূহকে ...ক্ষণ করার অভ্যাস আবিষ্কার করেছিল। যে ন্যায়-এর সঙ্গে মঁতে বন্ধুর মতো ...ন করতেন সেই ন্যায়গুলি হল তাই যা বিশেষ নঞর্থক ধারণাকে প্রমাণ ... উদাহরণস্বরূপ, তিনি যখন তাঁর পাণ্ডিত্য প্রকাশ করতেন এই সত্য প্রতিপন্ন ...ন্য যে যারাই অরিউসের মতো মারা গেছে তারা সবাই অরিউসের মতো ...ধর্মমতের বিরোধী ছিল না। বিভিন্ন মন্দ লোক যারা ওই একইভাবে মারা ... তাদের সংখ্যা গণনা করার পর, তিনি এই বলে এগিয়েছেন, 'কিন্তু কি ... অরিউসকেও দেখা গেল একই সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান হতে। ঈশ্বরের ...শা, জগতের ভালো ও মন্দ ভাগ্যের চেয়ে আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে ...যের এমন কিছু আছে যার কাছ থেকে আশা করা যায় এবং মন্দেরা এমন

কিছু যাকে ভয় করতে হয়।' প্রোটেষ্ট্যান্ট স্বাধীন-চিন্তাবিদদের বিপক্ষে ব্যবহৃত সম্পর্কীয় অপছন্দকর কিছু বৈশিষ্ট্য ক্যালিকদের রয়ে গেছে। কারণ হিসেবে আমাদের বলতে হয় যে ক্যাথলিক ধর্মতত্ত্বের ব্যবস্থা এতটাই ভয়ঙ্কর যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই এটা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না যে (যদি সে প্রবল বীরত্বের অধিকারী না হয়) সে অন্যান্যদের এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার জন্য তৈরি করবে।

ক্যাথলিক স্বাধীন চিন্তাবিদ তদনুযায়ী নৈতিক ও বিদ্যাবুদ্ধিগত ধর্মকর্মকে পরিত্যাগ করতে আগ্রহী, যখন প্রোটেষ্ট্যান্ট স্বাধীনচিন্তাবিদ উভয়কে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। জেমস মিল তাঁর পুত্রকে শিক্ষা দিয়েছিলেন এই প্রশ্ন করতে, 'কে আমাকে তৈরি করেছে?' আমাদের মন এর কোন উত্তর দিতে পারে না। কারণ আমাদের এমন কোন অভিজ্ঞতা নেই অথবা এমন কোন বিশ্বাসযোগ্য জ্ঞান নেই যার থেকে এর উত্তর দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে যে-কোন উত্তরই সেই অসুবিধার সৃষ্টি করে যা আমাদের এক ধাপ পিছিয়ে নিয়ে যায়। যেহেতু এই প্রশ্নটি সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে যে প্রশ্নে পরিবর্তিত করে তা হল 'কে ঈশ্বরকে তৈরি করেছেন?' এর সঙ্গে তুলনীয় ভলতেয়ারের সেই উক্তি যা তিনি তাঁর দর্শনের অভিধানে (Dictionaire philosophiquc) করতে বাধ্য হয়েছেন। 'ঈশ্বর' (Dicu) নামক প্রবন্ধটি নিম্নলিখিতভাবে শুরু হয়েছে; আরকাদিউসের রাজত্বের সময়, লোগোম্যাকোস কন্‌স্টানটিনোপোলের ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক স্কাইথিয়ায় যান এবং কলচিলস্ সীমান্তে জেফিরিন নামক উর্বর সমভূমিতে ককেসাসের পাদপৃষ্ঠে অবস্থান করেন। প্রাজ্ঞ বৃদ্ধ মানুষ ডন্‌ডিন্‌ডাক তখন বিরাট ভেড়ার খোঁয়াড় ও বিশাল খামারের মধ্যবর্তী একটি বড় লম্বা চওড়া ঘরে ছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী, পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কন্যা, পিতা-মাতা ও ভৃত্যদের সঙ্গে অল্প পরিমাণ আহার করে সবার সঙ্গে ঈশ্বরের স্তুতিবাচক সঙ্গীত গাইছিলেন।

প্রবন্ধটি একই পথে এগিয়ে গেছে এবং এই সিদ্ধান্তে এসে শেষ হয়েছে, 'সেই সময় থেকে আমি এই সংকল্প গ্রহণ করেছিলাম যে আর কখনও তর্ক করব না।' কেউ সেই সময়টাকে কল্পনাও করতে পারবে না যখন থেকে জেমস্ মিল কোন বিষয়ে, সে যতই কম মহান হ'ক, আর তর্ক না করার সংকল্প নিয়েছিলেন এবং যে ঘটনাকে তিনি একটি উপকথার দ্বারা বর্ণনা করেছেন। তিনি দক্ষতার সঙ্গে অসঙ্গতির শিল্পকে অভ্যাস করেননি, যেমন ভলতেয়ার লাইবনিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে করেছেন : 'তিনি উত্তর জার্মানিতে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছেন যে ঈশ্বর কেবল একটা জগৎই তৈরি করতে পেরেছিল।' যে নৈতিক আগ্রহের সঙ্গে জেমস মিল জগতে অশুভ শক্তির অস্তিত্বকে জোরালো করে দেখিয়েছেন তার সঙ্গে পরবর্তী প্রবন্ধগুলিতে ভলতেয়ারের উক্তির তুলনা করলে দেখা যাবে যে তিনি সেই একই কথা বলেছেন : 'অশুভ শক্তির অস্তিত্ব আছে 'এ'কথা মজার ছলে লুকুল্লুস অস্বীকার করে বলতে পেরেছিলেন, যিনি ছিলেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং

... তার স্ত্রী ও বন্ধুদের সাথে অ্যাপোলোর বৈঠকখানায় বসে সুখাদ্য খাচ্ছিলেন, ... তাঁকে জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখতে দেওয়া হ'ক, তিনি দেখবেন কিছু ... অবস্থাসম্পন্ন মনুষ্যজাতিকে এবং তাঁকে জ্বরে ভুগতে দেওয়া হ'ক, তিনি ... কাছেই নিজে শোচনীয় হয়ে যাবেন।'

... এবং ভলতেয়ার আনন্দময় সন্দেহবাদের চরম উদাহরণ। বহু ক্যাথলিক ... চিন্তাবিদ আনন্দময়তার থেকে অনেক দূরে থাকেন এবং তাঁরা সর্বদাই ... বিশ্বাস ও গীর্জার পরিচালনার প্রয়োজনীয়তাকে মনে মনে অনুভব করেন। ... যুগের মানুষেরা কখনও কখনও কম্যুনিষ্ট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এ ... লেনিন ছিলেন চরম উদাহরণ। লেনিন একজন প্রোটেষ্ট্যান্ট স্বাধীন ... দের থেকে তাঁর বিশ্বাসকে গ্রহণ করেছিলেন (ইহুদি ও প্রোটেষ্ট্যান্টদের ... কতাকে আলাদা করে পৃথক করা যায় না, কিন্তু তাঁর পূর্ববর্তী ... টাইনরা তাঁকে বাধ্য করেছিল গীর্জা সৃষ্টি করতে যে গীর্জা বিশ্বাসের ... । এর থেকে কম সফলতা প্রাপ্ত উদাহরণ হল অগাষ্ট কোঁৎ-এর প্রচেষ্টা। ... তার মর্জি অনুযায়ী, যদি তার মর্জি অস্বাভাবিক ক্ষমতাসম্পন্ন বা ব্যাধিগ্রস্ত ..., আগে বা পরে গীর্জার কোরকে স্থানান্তরিত হয়। দর্শনের রাজ্যে একটি ... দৃষ্টান্ত মি. সান্টাইয়ানা, যিনি সর্বদা গোঁড়ামী ব্যাপারটাকে ... সেছেন, কিন্তু যে ঘৃণাজনক ব্যাপারস্যাপার ক্যাথলিক গীর্জা আয়োজন ... থাকে তার চেয়ে বিদ্যাবুদ্ধিগত ভাবে কম ঘৃণাজনক ব্যাপারের জন্য তিনি ...। তিনি সর্বদা ক্যাথলিক গীর্জার প্রথা হিসেবে ক্যাথলিকবাদকে পছন্দ ... এবং পছন্দ করতেন তার রাজনৈতিক প্রভাবকে। কিন্তু উদারভাবে বলতে ... তিনি পছন্দ করতেন সেই আদর্শকে যা গীর্জা গ্রীস ও রোম থেকে গ্রহণ ..., কিন্তু ইহুদিদের কাছ থেকে গীর্জা যা গ্রহণ করেছে তাকে তিনি পছন্দ ... না। এর সঙ্গে অবশ্য এই কথাও বলা যায়, যে প্রতিষ্ঠাতাদের কাছে ...লিকবাদ ঋণী ছিল তাদের তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি এই ইচ্ছাও পোষণ ... পারতেন যে লুক্রেতিউস দিমোক্রেতিউসের মানসিকতার উপর নির্ভর করে ... গীর্জার উপর নিজের আদর্শের গীর্জা প্রতিষ্ঠার কাজে সফলতা পেলে ... ত। কেননা তার বিদ্যাবুদ্ধিতে বস্তুবাদ সর্বদা একটা আবেদন রাখতে ... এবং তার আগের কাজগুলোতে ক্যাথলিকবাদ ও বস্তুপুজোর স্বাতন্ত্র্যকে ...তে নিয়ে গিয়ে পুরস্কৃত করার চেয়ে তিনি বস্তুপুজোকেই আপন করে ...লেন। দীর্ঘ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সম্ভবত এই অনুভব করতে ...লেন, যে গীর্জাগুলোকে যারা পছন্দ করে তারা সত্তার রাজ্যের দ্বারা ... । মি. সানটাইয়ানা যদিও এক ব্যতিক্রমী ঘটনা এবং তিনি আমাদের কোন

আধুনিক শ্রেণীর সঙ্গে মানানসই নন। তিনি বাস্তবে নবজাগরণপূর্ব ব্যক্তি, যা সঙ্গে ঘিবেলিন্‌সের সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে যে ঘিবেলিন্‌সকে দান্তে নরকে শাস্তি ভোগ করতে দেখেছিলেন এপিকিউরাসের মতবাদের সঙ্গে লেগে থাকার জন্য। এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে জোর করে ডেকে আনা অতীতের স্মৃতিচারণজনিত বিষণ্নতা, যে বিষণ্নতা আমেরিকার সঙ্গে অনিচ্ছুক ও দীর্ঘ সম্পর্ক রাখতে গিয়ে স্পেনীয়দের মেজাজে ঘটেছিল।

সবাই জানে কিভাবে জর্জ এলিয়ট এফ-ডব্লু-এইচ মেয়ারকে শিখিয়েছিলেন যে ঈশ্বর বলে কিছু নেই, তবুও আমাদের ভালো হওয়া আবশ্যক। এই ধরণের বিশেষ আচরণের দিক থেকে জর্জ এলিয়ট একজন প্রোটেষ্ট্যান্ট স্বাধীন-চিন্তাবিদ। খুব পরিষ্কার করে বলতে গেলে একজন বলতেই পারে যে প্রোটেষ্ট্যান্টরা ভালো হওয়াটাকে পছন্দ করে এবং নিজেদের ভালো রাখার জন্য সেই অনুযায়ী ধর্মতত্ত্ব আবিষ্কার করে থাকে, যেখানে ক্যাথলিকরা খারাপভাবে থাকাটাকে পছন্দ করে অথবা তারা তাদের প্রতিবেশীদের ভালো রাখার জন্য ধর্মতত্ত্বের আবিষ্কার করে থাকে। এখানেই ক্যাথলিকদের সামাজিক চরিত্র এবং প্রোটেষ্ট্যান্টদের ব্যক্তিগত চরিত্র নিহিত। একজন মৌলিক প্রোটেষ্ট্যান্ট স্বাধীন-চিন্তাবিদ হিসেবে জেরমি বেন্থাম এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে সব সুখের মধ্যে সব থেকে বড় সুখ আত্ম-অনুমোদনের সুখ। এইজন্য তিনি কখনও খুব বেশি আহার কিংবা মদ্যপান করতেন না। কেননা তাতে বেসামাল জীবনের অপরাধবোধ কাজ করে, অথবা একই কারণে তিনি তার প্রতিবেশীর অর্থ কোন ভাবে চুরি করাটাও পছন্দ করতেন না, কেননা এইসব কোন জিনিসই তাকে এমন কোন দারুণ রোমাঞ্চ দিত না যা তিনি জ্যাক্ হরনারের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারেন। কিন্তু এই বিষয়টি খুব সহজ কথা নয়। তিনি বড়দিনের মটরদানা ত্যাগ করতেন তাকে ফিরে পাবার জন্য। অন্যদিকে ফ্রান্সে কঠোর আত্ম-সংযম নির্ভর নৈতিকতাকে প্রথমে ভেঙে ফেলা হল, তারপর, ফলস্বরূপ ধর্মতত্ত্বগত সন্দেহ পরে এলো। এই ধরণের বিভেদ সম্ভবত জাতিগত কিন্তু কোনরকম শাস্ত্রীয় বিভেদ নয়।

ধর্ম ও নৈতিকতার সঙ্গে যোগটা এমন যার সম্পর্কে জানতে গেলে নিরপেক্ষভাবে ভৌগোলিক অধ্যয়নের প্রয়োজন। আমার মনে আছে বৌদ্ধ সম্প্রদায় অন্তর্ভুক্ত হবার পর জাপানে পৌরোহিত্য ব্যাপারটি বংশনুক্রমিক হয়ে ওঠে। আমি এই বিষয়ে অনুসন্ধান করেছি যে কিভাবে এটা সম্ভব হত যখন কারুকে পুরোহিত হতে হবে আবিবাহিত হতে হত। কেউই আমাকে এই বিষয়ে সন্ধান দিতে পারেনি। কিন্তু শেষ এই ঘটনাটি সম্পর্কে একটি গ্রন্থ থেকে নিশ্চিত হই। এই ধরণের সম্প্রদায় শুরু হয়েছিল বিশ্বাসজাত ন্যায়বিচারমূলক মতবাদের দ্বারা এবং সেখানে এই ধরণের সিদ্ধান্ত ছিল যে যতদিন বিশ্বাস শুদ্ধ থাকে

... কোন পাপই কিছু করতে পারবে না। ফলস্বরূপ, সমস্ত পৌরোহিত্য ... পর্যবসিত হল। কিন্তু একমাত্র যে পাপ তাদের উত্তেজিত করে তুলেছিল তা ... বিবাহ। সেইদিন থেকে আজ আমাদের যুগ পর্যন্ত এই সম্প্রদায়ের পুরোহিতরা ... করে চলেছে। কিন্তু এছাড়া অন্যদিক থেকে তারা দোষমুক্ত জীবনযাপন ... । সম্ভবত যদি আমেরিকাকে বিবাহ একটি পাপ বলে বিশ্বাস করানো যেতে ... তবে তারা আর কোনদিন বিবাহ-বিচ্ছেদের তাগিদ অনুভব করত না। হয়ত ... এর বহুসংখ্যক তক্‌মা লাগানো ব্যাপারটা জ্ঞানী সমাজব্যবস্থার সারসত্তাজাত ... কার্য ছিল, কিন্তু সেই পাপ যারা সম্পাদন করত তাদেরই সহ্য করতে ... । এইভাবেই কারুর ক্ষতি না করে শয়তানের আনন্দ অর্জিত হতে পারত। ... সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে এই ধরণের ঘটনাই আমার উপর জোর করে ... দেওয়া হয়েছিল। প্রতিটি শিশুরই দুষ্টু হতে ইচ্ছে করে এবং তাকে যদি ... ভাবে শেখানো হয়, তাহলে সে তার দুষ্টুমি করার ভাবাবেগটিকে ... করবে প্রকৃত কোন ক্ষতিকারক কার্য করার মধ্যে দিয়ে। যদি তাকে এই ... দেওয়া হয় যে রবিবারে তাস খেলাটা একটা বাজে ব্যাপার অথবা ... ভাবে যদি তাকে বলা হয় শুক্রবারে মাংস খেতে তাহলে সে তার পাপমূলক ... আবেগটিকে চরিতার্থ করতে পারে কারও কোন ক্ষতি না করে। কিন্তু আমি ... এই রকম কোন আদর্শের উপর বিশ্বাস রাখি না। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে ... রকম ঘটনা, যার সম্বন্ধে আমি একটু আগেই বলেছি, তা নির্দেশ করে যে এই ... ব্যাপারকে অনেক বেশি গ্রাহ্য বলা যেতে পারে।

... পার্থক্যের উপর খুব বেশি জোর দেওয়ার দরকার নেই যে পার্থক্যটিকে ... প্রোটেষ্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিক স্বাধীন চিন্তাবিদদের মধ্যে বেশি করে দেখাতে ... করে। উদাহরণস্বরূপ, অষ্টাদশ শতকের বিশ্বকোষবিদ এবং দার্শনিকরা ... ধরণের ছিলেন কিন্তু কিছুটা দ্বিধান্বিত হয়েও আমি একথা বলবো যে ... বাট্‌লার ছিলেন ক্যাথলিক ধরণের। যদি কেউ লক্ষ্য করতে চায় তবে যে ... পার্থক্যটি ধরা পড়বে সেটি হল যে ঐতিহ্যের থেকে প্রোটেষ্ট্যান্ট স্বাধীন ... দের বেরিয়ে আসাটা প্রাথমিকভাবে বিদ্যাবুদ্ধিগত ব্যাপার ছিল, সেখানে ... স্বাধীন চিন্তাবিদের কাছে ছিল তা বাস্তব। মৌলিক প্রোটেষ্টান্ট স্বাধীন ... এমন কিছু করার সামান্য আকাঙ্ক্ষাও করতো না যা তার প্রতিবেশী নাকচ ... তাদের বংশপরম্পরাগত মতবাদের সমর্থনে। দুই খণ্ডে 'হার্বার্ট স্পেনসারের ... জীবন' নামক গ্রন্থটি (বহু গ্রন্থের মধ্যে একটি আনন্দজনক গ্রন্থ) সেই ... সম্পর্কে একটি সাধারণ মতো দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করেছে যেখানে বলা ... তাঁর উন্নত নৈতিক চরিত্র ছাড়া আর কিছুই তাঁর সম্পর্কে বলার নেই।' হার্বার্ট

স্পেনসার, বেনথাম, মিল অথবা যে-কোন স্বাধীন চিন্তাবিদ যে উদ্দেশ্যে তাঁদের কাজগুলো করে গেছেন এবং যে উদ্দেশ্যটা ছিল আনন্দই জীবনের শেষ লক্ষ্য, তাঁদের বেলায় ঘটেনি। আমার মতে তাঁরা নিজেরা যে আনন্দের খোঁজ করেছিলেন, কখনও ঘটেনি, অন্যদিকে ক্যাথলিকরাও তাদের মতো করে ওই একই সিদ্ধান্তে বাঁচা তাগিদে নিজেদের কাজ চালিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই বলা যেতে পারে যে জগৎটা ক্রমশ্যই পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে প্রোটেষ্ট্যান্ট স্বাধীন চিন্তাবিদ তা চিন্তা ও কার্যের ক্ষেত্রে সবরকম যোগ্য কিন্তু এই ব্যাপারটি প্রোটেষ্ট্যান্টবাদের সাধারণ অবক্ষয়ের লক্ষণ। পুরানো যুগগুলিতে প্রোটেষ্ট্যান্ট স্বাধীন চিন্তাবিদরা স্বাধীন প্রেমে সমর্থনে সিদ্ধান্ত নেবার যোগ্য ছিল এবং তারা একটি দিনও কঠোর অবিবাহি জীবনযাপন করত না। আমি মনে করি তার পরিবর্তনটা সত্যিই দুঃখজনক। যে-কো মহান যুগ এবং মহান ব্যক্তি কঠোর ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার মধ্যে দিয়েই উত্থি হয়েছেন। কঠোর ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য দরকার প্রয়োজনীয় নিয়মানুবর্তি ও তার প্রতি লেগে থাকার নিষ্ঠা। অন্যদিকে এই ব্যবস্থার ভাঙন প্রচুর পরিমাণ শক্তি নির্গত করে। তবে এটা ভাবা ভুল হবে যে ভাঙনের প্রথমেই যে প্রশংসনীয় ফলসমূ অর্জিত হয় তা অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত চলতে থাকবে। নিঃসন্দেহে একটি আদর্শ বলতে একটি নির্দিষ্ট কঠোর কার্যকে বোঝায়, এর সঙ্গে থাকে চিন্তাভাবনার নমনীয়তা, কিন্তু একমাত্র পরিবর্তনের সংক্ষিপ্ত সন্ধিক্ষণগুলির সময় ছাড়া এই ধরণের সাধনা অর্জন করাটা দুরবগাহ হয়ে ওঠে। একইভাবে পুরানো ভাবাদর্শগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তখন যখন বিবাদের প্রয়োজনীয়তার মধ্য দিয়েই নতুন অনমনীয় ধর্মমতসমূহ বেড়ে ওঠে। রাশিয়ায় বলশেভিক ঈশ্বর বিশ্বাসীরা লেনিনের দেবত্বের উপর সন্দেহ ছুড়ে দিয়েছিল এবং তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে অন্য কারও সন্তানকে ভালবাসাটা অন্যায় নয়। চীনদেশের কুয়োমিন্‌তাঙ ঈশ্বর বিশ্বাসীরা সান-ইয়াৎ-সেনকে অবশ্যই সংরক্ষণ করবে এবং কুনফুসিয়াসের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্য কদাচিৎ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে। আমার এটাই ভয় যে মুক্তির অবক্ষয় মানুষের ক্ষেত্রে ব্যাপারটাকে এত জটিল করে যে তারা কিছু কিছু বিবাদীয় ধর্মমতের সঙ্গে লেগে থাকার থেকে সম্পূর্ণ বিরত হবে। সম্ভব বিভিন্ন ধরণের ঈশ্বর বিশ্বাসীরা একটি গোপন সমাজে সম্মিলিত হবে এবং তারা সেইসব পদ্ধতিসমূহে ফিরে যাবে যেগুলো বেল তার শব্দকোষে আবিষ্কার করেছে। সেখানে এটাই সান্ত্বনা হয়ে দাঁড়াবে যে সাহিত্যবিষয়ক শৈলীর উপর মতামতে নির্যাতন যে-কোন মাত্রায় প্রশংসনীয় প্রভাব সৃষ্টি করবে।

৭

মধ্যযুগে জীবন যেমন

আমাদের নিজেদের পক্ষপাতিত্বকে মানিয়ে নেবার ক্ষেত্রে মধ্যযুগে আমাদের [illegible] অন্যান্য যুগগুলোর চাইতে অনেক বেশি মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। সেইসব [illegible] কখনও অতি কালো হয়ে পড়েছে আবার কখনও অতি গোলাপী হয়ে [illegible]। অষ্টাদশ শতক নিজেই নিঃসন্দিগ্ধভাবে মধ্যযুগগুলোকে কেবলমাত্র বর্বর [illegible] চিহ্নিত করেছে। জীবনের কাছে সেই সময়কার মানুষগুলি আমাদের ফরাসী [illegible] বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার অসঙ্গতি রচনা করেছিল এবং তা সেই অভিজ্ঞতার [illegible] নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল। যে অভিজ্ঞতাপ্রসূত যুক্তি গিলোটিনের দিকে [illegible] হয়েছিল তা 'বীরসম্প্রদায়ের যুগ'-এর গৌরবকে আরও গৌরবান্বিত [illegible] তুলেছিল এবং ইংরাজী ভাষাভাষীদের কাছে তা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল স্যার [illegible] স্কটের দ্বারা। গড়ে প্রায় সকল ছেলে ও মেয়ে এখনো মধ্যযুগগুলোর [illegible] দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত। এইসব ছেলেমেয়েরা মনে মনে কল্পনা করে [illegible] যুগটাকে যখন নাইটরা বর্ম পরিধান করে হাতে বল্লম নিয়ে বলত 'সত্য বটে' [illegible] 'আমার পবিত্রভূমির নামে শপথ করে বলছি,' অবশ্যই তারা একদিকে ছিল [illegible] বিনীত অন্যদিকে ছিল রাগান্বিত। যখন সব মহিলারাই ছিল সুন্দরী ও বিষণ্ণ [illegible] গল্পের শেষে তারা নিশ্চয়ই উদ্ধার পেত। আর এক রকম দৃষ্টিভঙ্গি আমরা [illegible] পারি যেটাকে আমরা তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি বলব, যেটা সম্পূর্ণ আলাদা হলেও [illegible] দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গির মতো যা মধ্যযুগগুলোকে প্রশংসা করে থাকে। এই [illegible] দৃষ্টিভঙ্গি হল যাজকীয় দৃষ্টিভঙ্গি যা সংস্কারকরণকে ঘৃণা করে জন্ম নিয়েছে। এই [illegible] দৃষ্টিভঙ্গিতে জোর দেওয়া হয়েছে ভক্তি, ধর্মীয় গোঁড়ামী, পাণ্ডিত্যপূর্ণ দর্শন এবং [illegible] দ্বারা খ্রীষ্টীয় সাম্রাজ্যের একত্রীকরণের উপর। রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির মতোই [illegible] দৃষ্টিভঙ্গিও যুক্তির বিরুদ্ধে এক প্রতিক্রিয়া, কিন্তু এই প্রতিক্রিয়াটা অপেক্ষাকৃত [illegible] ঋণাত্মক, যুক্তির ছদ্মবেশে যা চিন্তাভাবনার একটি বড় ব্যবস্থাকে প্রভাবিত [illegible] এবং যা একসময় জগৎকে দমিয়ে রেখেছিল ও ভবিষ্যতে আবার দমিয়ে [illegible] পারে।

[illegible] সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিগুলোতেই সত্যের উপকরণ আছে। মধ্যযুগগুলো ছিল [illegible], তারা ছিল বীরত্বব্যঞ্জক ও পবিত্র। কিন্তু আমরা যদি একটি সময়কে সত্য [illegible] দেখতে চাই তবে তাকে আমাদের নিজেদের সময়টার বিপরীত সময় [illegible] দেখলে চলবে না— তা সেই সময়ের সুবিধা বা অসুবিধা যার [illegible] ক্ষেত্রেই হ'ক না কেন। সেই সময়টাকে আমাদের দেখতে চেষ্টা করতে হবে

ঠিক সেইভাবে যেরকম তা ছিল সেই সব মানুষগুলোর কাছে যে মানুষগুলো তাদের মধ্যে বসবাস করত। সর্বোপরি, আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, প্রতিটি মহাযুগে বেশিরভাগ মানুষই ছিল সাধারণ যারা ঐতিহাসিকদের বড় বড় বিষয়ের চেয়ে তাদের প্রতিদিনের রুটির চিন্তায় ব্যস্ত থাকত। এইসব সাধারণ মরণশীল মানুষদের ছবি আঁকা হয়েছিল 'মেডিয়াভেল পিপ্‌ল্' নামকমিস্ এলিন পাওয়ারের একটি মনোরম গ্রন্থে। সে গ্রন্থে শারলেমা থেকে সপ্তম হেনরী পর্যন্ত সময়টিকে ধরে রাখা হয়েছিল। তাঁর গ্যালারীতে একমাত্র যে বিখ্যাত মানুষটির ছবি রাখা ছিল তার নাম মার্কোপোলো। এছাড়াও পাঁচটা কি তার বেশি যেসব ব্যক্তিদের ছিল তাদের পরিচয় ছিল অস্পষ্ট কিন্তু পরে তাদের পরিচয় খুঁজে পাওয়ার ফলে তাদের জীবন পরিচয়কে নতুন করে তৈরি করা গেছে। বীরত্ব যা অভিজাত সম্প্রদায়গত বিষয় ছিল তা এই গণতান্ত্রিক ইতিবৃত্তে স্থান পায়নি। সেখানে ভক্তি প্রদর্শিত হয়েছে চাষা ও ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের দ্বারা। কিন্তু যাজকীয় সম্প্রদায়ের দ্বারা ভক্তির প্রদর্শন দেখানো হয়নি এবং অষ্টাদশ শতকের পরিপ্রেক্ষিতে যে রকম বর্বর মানুষদের দেখার আশা করা হয়েছিল সেখানে তা ঘটেনি, সেখানে প্রতিটি মানুষই ছিল কম বর্বরোচিত। যদিও গ্রন্থটিতে বর্বরোচিত দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে একটি আশ্চর্যরকমের বৈপরীত্য দেখানো হয়েছে। এই বৈপরীত্যটি ছিল নবজাগরণের আগে ভেনিশিয়ান শিল্পকলা ও চতুর্দশ শতকে চৈনিক শিল্পকলার মধ্যে। এখানে দুটি ছবিকে দেখানো হয়েছে। একটি ভেনেশিয়ান শিল্পরীতিতে আঁকা মার্কোপোলোর জাহাজে ওঠার দৃশ্য এবং আর একটি চতুর্দশ শতকে চৈনিক শিল্পরীতিতে আঁকা চাও মেঙ্গ-ফু-এর স্থল দৃশ্য। মিস্ পাওয়ার বলেছেন, 'একটি (যেটি চাও মেঙ্গ-ফু-এর দ্বারা নির্মিত) স্পষ্টতই উন্নত শিল্পের নির্দশন এবং অন্যটি শিশুসুলভ সভ্যতা ও প্রায় গেঁয়ো শিল্পের নমুনা।' ছবি দুটোর মধ্যে তুলনা করতে গেলে লেখিকার কথাকে কেউই অস্বীকার করতে পারবে না।

লেডেনের অধ্যাপক হুইজিঙ্গার দ্বারা লিখিত 'দ্য ওয়েনিং অব দ্য মিড্‌ল এজেস' নামক সাম্প্রতিক গ্রন্থটি ফ্রান্স ও ফ্ল্যান্ডারস্-এ চতুর্থ দশম ও পঞ্চদশ শতক সম্পর্কে অসাধারণ সব উৎসাহোদ্দীপক ছবি দিয়েছে। এই গ্রন্থে বীরত্বকে এমন পরিষ্কার করে দেখানো হয়েছে যে তা মনোযোগ আকর্ষণ করে। বীরত্বকে এখানে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখানো হয়নি। তাকে দেখানো হল এমন একটা পরিশ্রমসিদ্ধ খেলা হিসেবে যা উচ্চবিত্ত শ্রেণী আবিষ্কার করেছিল তাদের অসহ্য বিরক্তিকর জীবনে আনন্দ পাবার জন্য। বীরত্বের প্রয়োজনীয় উপাদান ছিল প্রেম সম্পর্কে অদ্ভুত ধরণের ভাবুক কল্পনা, যে প্রেমে অতৃপ্ত হওয়াটাকেই আনন্দকর বিষয় হিসেবে ধরা হত। 'দ্বাদশ শতকে যখন প্রেমের কাব্যিক কল্পনার অন্তঃস্থলে অতৃপ্ত কামনার স্থান troubadours of Provence (প্রভেন্সের সেইসব

কবি যারা বীরত্বব্যঞ্জক প্রেমের উপর কাব্য রচনা করেছিল এবং একাদশ শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত তারা তাদের রচনা ধারাকে সমৃদ্ধ করেছিল— অনুবাদক) দখল করল, তখন সভ্যতার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল। প্রণয়গত কাব্য...নিজেই মূল বিষয় হিসেবে কামনার সৃষ্টি করত এবং অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভরে করে প্রেমের কল্পনার সৃষ্টি করত।'

উপরোক্ত গ্রন্থে এ'কথাও পাওয়া যায় যে 'উচ্চবিত্ত শ্রেণীদের অস্তিত্ব তাদের বিদ্যাবুদ্ধিগত ও নীতিগত মতো হিসেবে সাহিত্য কলা মন্দিরে সুরক্ষিত আছে যা ইতিহাসে একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য যুগগুলোতে সভ্যতার আদর্শ এতটা পরিমাণে প্রেমের কল্পনার সঙ্গে মিশতে পারেনি। ঠিক যেরকম ভাবে প্লাতোবাদ মধ্যযুগে সমস্ত রকম দর্শনের একটিমাত্র কেন্দ্রকে খুঁজে নেবার জন্য বৃথা প্রচেষ্টায় প্রতিনিধিত্ব করেছিল, তেমনি প্রণয়গত প্রেমের তত্ত্ব অপেক্ষাকৃত ভাবি পরিধির মধ্যে সেই সমস্তকিছুকে নিজের কাছে ধরে রেখেছিল যা মহৎ জীবনের অন্তর্ভুক্ত।'

মধ্যযুগের অনেক কিছুকেই রোমান ও জার্মান ঐতিহ্যের মধ্যে বিবাদরূপে বর্ণনা করা হয়। একদিকে ছিল গীর্জা আর একদিকে ছিল রাষ্ট্র। একদিকে ছিল ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন আর একদিকে ছিল বীরত্ব ও কাব্য। একদিকে ছিল আইন আর একদিকে ইন্দ্রিয়-আনন্দ, আসক্তিগত ভাবাবেগ এবং সব রকম নৈরাশ্যজনক অবস্থা ও জড়বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের উন্মাদনা। রোমের অবস্থা সেই আগের মতো ছিল না যে সময়টা কনষ্টানটিন ও জাষ্টিনিয়ানের সময় ছিল, এতদসত্ত্বেও সেখানে তখনও এমন কিছু ছিল যা অশান্ত জিনিসগুলোর জন্য প্রয়োজন ছিল এবং যাকে ছাড়া অন্ধকার যুগের থেকে সভ্যতার পুনরুত্থান সম্ভব ছিল না। কেননা মানুষ ছিল বন্যপ্রায় এবং তাদের দমানো যেতে পারত কেবলমাত্র শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভীতিজনক কঠোর আচরণের দ্বারা। ত্রাসের সঙ্গে ঘর করে নিজের প্রভাব না হারানো পর্যন্ত ধর্মযাজক তার কাজ চালিয়ে যেত। বিগত মধ্যযুগীয় শিল্পকলার একটি প্রিয় বিষয় হচ্ছে নৃত্য, যেখানে দেখা যায় নরকঙ্কাল মানুষের সঙ্গে নৃত্যরত। ড. হুইজিঙ্গা আরো কিছুটা এগিয়ে বলেছেন প্যারিসে নিরীহদের সেই গীর্জা-প্রাঙ্গণের কথা যেখানে ভিলিয়নের সমসাময়িকেরা আনন্দের জন্য বেড়াতে যেতেন। তিনি বলেছেন :

'মঠের তিন দিক ঘিরে গোরস্তানগুলোতে খুলি ও হাড় স্তূপাকৃতি করে রাখা হত এবং সেগুলো উন্মুক্ত করে রাখা হত যাতে হাজার হাজার মানুষ সেগুলো দেখে ভয়াবহ ধারণা লাভ করে.... মঠের নীচে মৃত্যুর নৃত্য বিভিন্ন মূর্তি ও কবিতার মধ্য দিয়ে প্রদর্শিত হত। পোপ, সম্রাট, সাধু ও বোকাদের নিয়ে মৃত্যুর অপক্ক মূর্তিগুলি দেখার জন্য এমন বাঁদরামীর আর কোন ভালো জায়গা ছিল না। বেরীর ডিউক

যিনি সেখানে কবরস্থ হবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তার ইতিহাস সম্পর্কে তিনজন জীবিত মানুষ ও তিনজন মৃত মানুষের মূর্তি গীর্জার প্রবেশপথে খোদিত করা হয়েছে। এক শতাব্দী পর, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রতীক হিসেবে মৃত্যুর একটি বিরাট মূর্তি সেখানে তৈরি করা হয়, যা এখন লুভ্যরে স্থান পেয়েছে। এটাই সেই মঠের একমাত্র ভগ্নাংশ হিসেবে টিকে রয়েছে সেখানে। পনেরো শতকের প্যারিসের লোকেদের এরকম শোকাবহ আচরণকে নকল করে গড়ে উঠেছিল ১৭৮৯ সালের পালাইস্ রয়াল। দিনের পর দিন, হাজার হাজার মানুষ মঠগুলোতে গিয়ে এইসব মূর্তি এবং সরল কবিতাগুলো দেখতে ও পড়তে লাগলো, যেগুলো তাদের মনে করিয়ে দিত যে তারা শেষের দিকে চলেছে। মুহুর্মুহু কবরস্থ করা এবং তাদের খুঁড়ে বার করে নিয়ে আসার পরিবর্তে সেই স্থানটি জনগণের জন্য একটি সুন্দর বেড়াবার ও ধ্যান করবার স্থানে পরিণত হল। সেইসব গোরস্থানের সামনেই তৈরি হল বিভিন্ন দোকান, মঠের সামনে ঘুরে বেড়াতে লাগলো পতিতারা। গীর্জার একটি দিকে একজন সন্ন্যাসিনীকে কবরস্থ করে রাখা হল। সেখানে মঠবাসীরা তাদের ধর্ম প্রচার করতে আসত এবং ধর্মীয় মিছিল সেখানে এসেই শেষ হত.... এমনকি সেখানে ভোজেরও আয়োজন করা হত। এইভাবেই ভয়ঙ্কর এতদূর পর্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠলো।'

মৃত্যুর নৃত্যজাত বিষণ্ণতা (Macabre) থেকে যে প্রেম আশা করা যেত তা ছিল এমন নিষ্ঠুরতা যা সাধারণ মানুষের কাছে মূল্যবান উপহারজাত আনন্দের মতো ছিল। মনস্ একজন দস্যুকে কিনেছিল শুধুমাত্র তাকে অত্যাচারিত দেখবার জন্য, যে অত্যাচার সাধারণ মানুষ খুব আনন্দের সঙ্গে নিয়ে ছিল এই কৌতূহলে যে তার মৃতদেহের ভেতর থেকে একটি নতুন পবিত্র শরীর নির্গত হবে। ১৪৮৮-তে বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহে বার্জেসের কিছু ম্যাজিসট্রেট্দের বাজার এলাকায় নিয়ে গিয়ে প্রবল অত্যাচার করা হয়েছিল জনগণের আনন্দের জন্য। ড. হুইজিঙ্গা বলেছেন যে তারা এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শেষে মৃত্যুভিক্ষা চেয়েছিল, কিন্তু তাদের জন্য সেইটুকু দানও অস্বীকার করা হয়েছিল 'যাতে জনগণ আবার তাদের উপর প্রবল অত্যাচার দেখে আনন্দ করতে পারে।'

হয়ত অষ্টাদশ শতকের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কেও কিছু বলা যেতে পারে।

ড. হুইজিঙ্গারের গ্রন্থটিতে মধ্যযুগের শেষের দিকের যুগগুলোর শিল্পকলা সম্পর্কে উৎসাহোদ্দীপক আলোচনা রয়েছে। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সঙ্গে আঁকা ছবির সৌন্দর্যকে সমান করে দেখা হয়নি। আঁকা ছবি মহানত্বজাত প্রেমের রক্তিম অবদান ছিল বা যুক্ত ছিল সামন্ততান্ত্রিক আড়ম্বরের সঙ্গে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সেই ঘটনাটির কথা, যেখানে বার্গান্ডির ডিউক শিল্পী স্লুটারকে ক্যাম্পমলো

অশ্বারোহী সৈন্যদলের একটি ছবি আঁকতে বললেন, তাতে স্লুটার যে ছবিটি আঁকলেন তা ছিল বার্গান্ডি ও ফ্লান্ডারের অশ্বারোহী সৈন্যদল ক্রসের দুটি বাহুতে পরস্পরের সম্মুখীন। সব থেকে কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনাটি হল এই ছবিটিতে জেরোমিয়ার যে ছবিটি অংশ হিসেবে আঁকা হয়েছে সেই ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে যে তার নাকে দুটি চশমা আঁটা। লেখক ফিলিস্টাইন পৃষ্ঠপোষকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই মহান শিল্পীর করুণ অবস্থার কথা জানিয়ে বলেছেন যে উক্ত ছবিটি আঁকার পর তারা ছবিটিকে নষ্ট করে দিলো এই বলে যে 'স্লুটার নিজেই জেরোমিয়ার নাকে চশমা এঁটে দিয়ে হয়ত ছবিটিকে নান্দনিক করতে চেয়েছেন'। শ্রীমতী পাওয়ার এই একই ধরণের আর একটি আশ্চর্য ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে অষ্টাদশ শতকের এবং ইতালির এক পুস্তক-বিশোধক (BOWDLER- যে পুস্তকের আপত্তিজনক অংশকে কেটে বাদ দেয়) টেনিশনের রচনাগুলিকে বিশোধন করেন ভিক্টোরীয় পরিশোধনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এবং আর্থারীয় গাথার উপর যে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন সেখানে ল্যান্সেলট ও গুয়েনিভারের প্রেমের সমস্ত ঘটনাগুলোকে কেটেছেঁটে বাদ দেওয়া হয়েছিল। ইতিহাস বহু কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনায় পূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, ষোড়শ শতকে মস্কোতে একজন জাপানী জেসুইট শহীদ হয়েছিলেন। আমার ইচ্ছা কোন পণ্ডিত ঐতিহাসিক এমন একটি গ্রন্থ রচনা করুন যে গ্রন্থটিকে চিহ্নিত করা হবে 'যে ঘটনাসমূহ আমাকে বিস্মিত করে' এই নামে। এই ধরণের গ্রন্থে জেরোমিয়ার চশমা ও ইতালির বিশোধকের স্থান অবশ্যই থাকবে।

৮

টমাস পেনের নিয়তি

(১৯৩৪ সালে রচিত)

দু' দুটো বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অংশগ্রহণ করে তৃতীয় এক বিপ্লবের প্রচেষ্টা করার ফলে যাঁকে ফাঁসির মঞ্চে প্রায় উঠতে হয়েছিল সেই টমাস পেন আমাদের সময়টাতে কিছুটা ফিকে হয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের প্রপিতামহদের কাছে তিনি ছিলেন এক পার্থিব শয়তান এবং তাঁর ঈশ্বর ও তাঁর রাজার কাছে তিনি ছিলেন ধ্বংসাত্মক নাস্তিক বিদ্রোহী। পরস্পর কখনই ঐক্যবদ্ধ ছিলেন না এমন তিনটি মানুষকে ভীষণভাবে বিপদে ফেলে তিনি তিক্ত শত্রুতা কুড়িয়েছিলেন। এই তিনজন মানুষ হলেন পিট, রোবস্‌পিয়ের এবং ওয়াশিংটন। এদের মধ্যে প্রথম দু'জন তাঁর মৃত্যু চেয়েছিলেন এবং তৃতীয়জন সযত্নে নিজের জীবন বাঁচাতে চিৎকার চেঁচামেচি না করে নানা রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। পিট ও ওয়াশিংটন তাঁকে ঘৃণা করতেন এইজন্য যে তিনি একজন ডেমোক্র্যাট ছিলেন, অন্যদিকে রোবস্‌পিয়ের তাকে ঘৃণা করতেন কেননা তিনি রাজার মৃত্যুদণ্ড ও সন্ত্রাসের রাজত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। সর্বদাই তাঁর ভাগ্যে বিরোধী পক্ষের প্রশংসা ও সরকারের ঘৃণা জুটেছে। যখন তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছেন তখন এই ওয়াশিংটন তাঁর সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। ফরাসী জাতি ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে স্তূপাকৃতি সম্মানে ভূষিত করেছে যতক্ষণ না জ্যাকোবিনরা ক্ষমতায় এসেছে। এমনকি ইংল্যান্ডেও প্রসিদ্ধ হুইগ রাষ্ট্রনেতারা তাঁকে বন্ধুর মতো সাহায্য করেছেন এবং তাদের ইস্তাহার তৈরি করবার ব্যাপারে তাঁকে কাজে লাগিয়েছেন। অন্যান্য মানুষদের মতোই তাঁরও কিছু ভুল ছিল, কিন্তু এটা ছিল তাঁর গুণ যার জন্য তিনি ঘৃণিত হয়েছিলেন এবং সফলতার সঙ্গে উচ্চ শিখরে উঠতে পেরেছিলেন।

ইতিহাসে পেনের গুরুত্ব এই কারণে যে তিনি গণতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রচার করেন। তিনি সেই সব গণতান্ত্রিকদের কথা বলেছিলেন যারা অষ্টাদশ শতকে ফরাসী ও ইংরেজ সম্ভ্রান্ত শ্রেণীদের মধ্যে ছিল, ছিল দার্শনিকদের মধ্যে ও আস্থাহীন মন্ত্রীদের মধ্যে, কিন্তু এদের সবাই তাদের নিজের নিজের ধারণাগুলোকে এমনভাবে গঠন করতো যা কেবলমাত্র শিক্ষিতদেরই দেওয়া যেত। পেন তাঁর মতবাদকে কোন রকম কাব্য না করে এমন এক শৈলীতে উপস্থাপিত করতেন যা সহজ সরল এবং সরাসরি হত, যার ফলে প্রতিটি বুদ্ধিমান কর্মী মানুষ সেই মতবাদকে প্রশংসা করতে পারত। এই ব্যাপারটাই তাঁকে বিপজ্জনক করে

[illegible] এবং যখন তিনি তাঁর অন্যান্য অপরাধে ধর্মীয় শিথিলতা প্রদর্শন করেন [illegible] ধর্মরক্ষকরা তাঁর সমস্ত সুযোগ সুবিধা কেড়ে নিয়ে তাঁকে তিরস্কারের ভারে [illegible] করে তোলে।

তাঁর জীবনের প্রথম ছত্রিশটা বছরে তেমন কোন প্রতিভার সন্ধান পাওয়া [illegible] যা তাঁর পরবর্তী জীবনে পাওয়া যায়। তিনি ১৭৩৯ সালে থেটফোর্ডে [illegible] করেন সাহায্যের উপর নির্ভরশীল এক দরিদ্র পরিবারে। তের বছর বয়স [illegible] তিনি আঞ্চলিক একটি ব্যাকরণ বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং মেয়েদের [illegible] পাড় তৈরি করে জীবিকা অর্জন করতে থাকেন। এই ধরণের পরিত্যক্ত [illegible] তার অভিপ্রেত ছিল না। সতেরো বছর বয়সে তিনি 'দ্য টেরিবল' নামক [illegible] জাহাজ রক্ষার জন্য বে-সরকারী সৈন্যদলে তালিকাভুক্ত হবার চেষ্টা [illegible] ছিলেন, যার সৈন্যাধ্যক্ষের নাম ছিল ডেথ (Death)। কিন্তু পেনের পিতামাতা [illegible] সেখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে সম্ভবত তাঁর জীবন রক্ষা করেছিলেন [illegible] এর কিছুদিন পরেই একটি ঘটনায় সেই জাহাজ রক্ষাকারী নাবিক [illegible] দলটির ২০০ জন সদস্যের মধ্যে ১৭৫ জন সদস্যই নিহত হয়। কিছুদিন [illegible] সপ্তবর্ষের যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উপরোক্ত ধরণের আর একটি [illegible] সৈন্যদলে যোগদান করেন। সেই সময় সমুদ্রবক্ষে তাঁর সংক্ষিপ্ত [illegible] জীবন সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না। ১৭৫৪ সালে তিনি লন্ডনে [illegible] মেয়েদের অন্তর্বাস তৈরি করবার কাজে আবার যোগ দেন এবং ওই একই বছরে [illegible] বিবাহ করেন কিন্তু তাঁর স্ত্রী কয়েক মাস পরেই মারা যান। ১৭৬৩ সালে [illegible] মাসুল আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী হিসেবে কাজে লাগেন কিন্তু দু'বছর [illegible] বরখাস্ত হন এই অভিযোগে যে তিনি তাঁর অনুসন্ধানমূলক কাজের সময় [illegible] না করে ঘরে বসে পড়াশুনো করছিলেন। প্রচণ্ড দারিদ্র্যের সময় তিনি সপ্তাহে [illegible] শিলিংয়ের বিনিময়ে একটি স্কুলে চাকরি পেয়ে যান এবং ইংল্যান্ডের গীর্জার [illegible] গ্রহণের চেষ্টা করেন। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই রকম দুঃসাহসিক [illegible] ফলে লিউইসের মাসুল আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী পদে পূর্ণ বহাল [illegible] বেঁচে যান। সেখানে তিনি বিবাহ করেন কোয়েকার সমাজের একটি মেয়েকে [illegible] কোয়েকার সমাজ বলতে ষোড়শ শতকে জর্জ ফক্সের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি [illegible] ধরনের ধর্মীয় সম্প্রদায়), কিন্তু ১৭৭৪ সালে সাধারণভাবে তাঁদের বিবাহ-[illegible] ঘটে, তবে এর পেছনে কারণ কি ছিল তা জানা যায়নি। এই বছরেই তিনি [illegible] তাঁর চাকরিটি হারান। এর কারণ ছিল তিনি মাসুল আদায়ের ভারপ্রাপ্ত [illegible] হিসেবে উচ্চ বেতনের জন্য সম্মিলিত ভাবে আবেদন সংগঠিত [illegible] ছিলেন। এরপর তিনি তাঁর যা কিছু ছিল তা বিক্রী করে দেন ঋণশোধ করবার

জন্য এবং যা কিছু বাঁচে তা দেন সেই স্ত্রীকে, কিন্তু নিজে আবার চরম দারিদ্র্যে পড়েন।

লন্ডনে তিনি মাসুল আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী হিসেবে উচ্চ বেতনের জন্য সংসদে সম্মিলিত আবেদন করতে গিয়ে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের সঙ্গে পরিচিত হন। বেঞ্জামিন তাঁর সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করতেন। এর ফলস্বরূপ তিনি ১৭৭৪ সালের অক্টোবর মাসে আমেরিকায় যাত্রা করেন ফ্র্যাঙ্কলিনের একটি চিঠি হাতে নিয়ে। সেখানে তাঁর সম্পর্কে লেখা ছিল 'একজন সরল ও উপযুক্ত যুবক'। যেই তিনি ফিলাডেলফিয়ায় পৌঁছলেন তখনি একজন লেখক হিসেবে তাঁর দক্ষতা প্রদর্শন করতে শুরু করলেন এবং খুব অল্প দিনের মধ্যে একটি জার্নালের সম্পাদক হয়ে গেলেন।

তাঁর প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৭৭৫ সালে যেখানে তিনি দাসত্ব ও দাস ব্যবসার বিরুদ্ধে জোরালো ভাষায় লেখেন। তাঁর বন্ধুরা বলতে পারেন যে তিনি এইসব করে তাঁর বিরুদ্ধে কিছু গোঁড়া শত্রুর সৃষ্টি করেছিলেন। এর কারণ ছিল তাঁর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে জেফারসন স্বাধীনতার সনদের খসড়ায় উক্ত বিষয়ের সন্নিবেশ করেন যা পরবর্তীকালে বাতিল করে দেওয়া হয়। দাসত্ব ব্যবস্থাটি পেনসিলভেনিয়াতে ১৭৭৫ সালেও টিকে ছিল। এই ব্যবস্থা সেখান থেকে দূরীভূত হয় ১৭৮০ সালের একটি আইন অনুযায়ী। সাধারণত সেখানে এই বিশ্বাস প্রচলিত যে পেন সেই আইনের প্রস্তাবনাটি রচনা করেন।

একদম প্রথম না হলেও পেনই প্রথম মানুষ যিনি ইউনাইটেড স্টেটের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করেছিলেন। ১৭৭৫ সালে অক্টোবরে স্বাধীনতার সনদে যারা স্বাক্ষর করেছিলেন তারা প্রত্যেকেই ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে মানিয়ে চলার আশা করেছিলেন। এ বিষয়ে পেন লিখলেন,

'আমি বিশ্বাস করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত নই যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর শেষ পর্যন্ত আমেরিকাকে ব্রিটেনের থেকে আলাদা করে দেবেন। তোমরা একে স্বাধীনতা বলেও ডাকতে পার আবার তোমাদের ইচ্ছে অনুযায়ী যা খুশী বলে ডাকতে পার, যদি তা ঈশ্বর ও মানবিকতার কারণে ঘটে তবে অবশ্যই তা চলতে থাকবে। যখন ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করবেন এবং আমাদেরকে এমন জনগণ রূপে তৈরি করবেন যারা তাঁর উপর নির্ভরশীল, তখন তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য আমাদের উচিত একটি উপমহাদেশীয় আইন প্রণয়ন করা যা নিগ্রোদের বিক্রি করার জন্য আমদানিকে বন্ধ করবে। তাদের নীতিকে কেউ তখন আর নরম না কঠিন করে তুলতে পারবে না যা এখানে এখন বর্তমান এবং তাদের স্বাধীনতা যথাসময়ে অর্জিত হবে।'

কেবলমাত্র স্বাধীনতার খাতিরে— রাজতন্ত্র থেকে স্বাধীনতা, স্বাধীনতা [illegible] থেকে, দাসত্ব থেকে এবং সবরকম স্বৈরাচারিতা থেকে— যা পেন আমেরিকা গঠনের জন্য চেয়েছিলেন।

স্বাধীনতার যুদ্ধের কঠিন দিনগুলোতে তিনি সারাটা দিন প্রচার করে বেড়াতেন [illegible] কাটাতেন ইস্তাহার রচনা করে যা 'common sense' নামে প্রকাশিত [illegible] রাতটা কাটাতেন ইস্তাহার সফলতা পেয়েছিল এবং বাস্তবিক পক্ষে এই [illegible] জয়লাভ সম্ভব হয়েছিল। ব্রিটিশরা মেনের ফলমাইথ ও ভার্জিনিয়ার [illegible] শহর পড়িয়ে দেবার পর, ৩১ শে জানুয়ারী ১৭৭৬ সালে ওয়াশিংটন [illegible] বন্ধুকে লেখেন:

'ফলমাউথ ও নরফোকের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তজাত প্রশ্ন যা 'common sense' [illegible] করার পর কোন উত্তর পাওয়া যায়নি, সেই সব প্রশ্নের উপর ভিত্তি করেই [illegible] যথার্থতা নির্ধারিত হবে।'

কাজটা ছিল সময়সাপেক্ষে বিষয়োপযোগী ও বর্তমানে ঐতিহাসিকভাবে [illegible], কিন্তু সেখানে এমন কিছু শব্দগুচ্ছ আছে যেগুলো আজও বলা হচ্ছে। [illegible] রাজার সঙ্গে নয়, বিবাদ সংসদের সঙ্গেও তা দেখবার পর, পেন [illegible], 'তাদের অধিকারসমূহ নিয়ে সংসদের নিম্নকক্ষ যতটা ঈর্ষান্বিত আর কেউ [illegible] তারা তাদের বিক্রি করে দিয়েছে।' সেই সময় এই ধরণের বিদ্রূপাত্মক [illegible] অস্বীকার করাটা ছিল অসম্ভব।

[illegible] স্বপক্ষে জোরালো সমর্থন উত্থিত হয় এবং কেবলমাত্র রাজতন্ত্রই [illegible] রোধ করতে পারে এইরকম ধারণাকে নিদারুণভাবে খণ্ডন করা হয়। তিনি [illegible] ইতিহাসকে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করে বলেন, 'রাজতন্ত্র ও উত্তরাধিকার [illegible] দেশটাকে রক্ত ও ছাইতে শুইয়ে দিয়েছে। এটা এমন এক ধরণের সরকার [illegible] স্বরে বাণীকে বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হয় এবং তাকে রক্তাক্ত করে তোলা [illegible] ১৭৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন যুদ্ধের ভাগ্য বিরূপ আকার ধারণ করেছে [illegible] পেন 'The Crisis' নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে প্রথমে এই কথা লিখলেন, 'এটা এমন একটা সময় যখন মানব-আত্মাকে অনেক পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। [illegible] কষ্টসহিষ্ণু দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ও সূর্যস্নাত স্বদেশপ্রেমিক সবাই একে একে [illegible] কাজের থেকে সরে যাচ্ছে, কিন্তু সব প্রতিকূলতা সহ্য করেও পিতৃভূমি যে [illegible] দাঁড়িয়ে আছে তার জন্য এখন তিনি নারী ও পুরুষ উভয়েই প্রেম ও [illegible] যোগ্য।'

[illegible] ওয়াশিংটন এই প্রবন্ধটি তাঁর সৈন্যবাহিনীর সম্মুখে পাঠ করে পেনকে এই [illegible] তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন যে এটা 'আপনার কাজের গুরুত্বের জীবন্ত

দৃষ্টান্ত।' আমেরিকা পেনের মতো এত জনপ্রিয় লেখক কেউ ছিলেন না। তিনি যা চাইতেন তবে কলমের জোরে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারতেন কিন্তু লেখা থেকে যে অর্থ তিনি পেতেন তা নিতে অস্বীকার করতেন। স্বাধীনতার যুদ্ধের শেষে সংযুক্ত রাষ্ট্রে তিনি চিরকালের জন্য শ্রদ্ধার আসনে বসলেন কিন্তু তখনও তিনি গরীব রইলেন। যদিও রাষ্ট্রের একটি আইন-সভা তাঁকে কিছু অর্থের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল এবং পরে আর একটি নতুন আইন-সভা তাঁকে একটি জমিদারী প্রদান করল। এইভাবে তাঁর বাকি জীবনে আরাম ও অবসরের সুযোগ মিললো। তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সফল বিপ্লবীদের গুণাগুণ নিয়ে সম্মানিত হয়ে থাকতে পারতেন কিন্তু তিনি তা থাকলেন না। তিনি রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পথে এলেন। কিভাবে বড় বড় লোহার পাত দিয়ে ব্রিজ তৈরী করা যায় তা দেখালেন যা আগে অসম্ভব বলে ভাবা হত। লোহার ব্রিজ তৈরির সূত্র ধরে তিনি আবার ইংল্যান্ডে গেলেন এবং সেখানে ব্রুক, পোর্টল্যান্ডের ডিউক ও স্বনামধন্য হুইগরা তাঁকে বন্ধুর মতো স্বাগত জানালেন। প্যাডিংটনে তিনি তাঁর বিরাট আকারের লোহার ব্রিজটি মডেল স্বরূপ তৈরি করলেন এবং প্রখ্যাত ইঞ্জিনিয়াররা তাঁকে প্রশংসা করলেন এবং এরপর তিনি তাঁর বাদবাকি জীবনটা একজন আবিষ্কারক হিসেবে কাটালেন।

ইংল্যান্ডের মতো ফ্রান্সও লৌহ ব্রিজের ব্যাপারে উৎসাহী ছিল। ১৭৮৮ সালে তিনি এই ব্যাপারে প্যারিসে গেলেন ও লাফায়েতসহ অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। এরপর তিনি তাঁর পরিকল্পনাটি অ্যাকাডেমি দ্য সায়েন্সে পেশ করলেন। এই ব্যাপারে অ্যাকাডেমি তার রায় জানাতে একটু দেরি করলেও পরে রায়টি তাঁর অনুকূলেই গিয়েছিল। বাস্তিল দুর্গের পতনের পর লাফায়েত কারাগারের চাবিকাঠি ওয়াশিংটনকে উপহার দেবেন বলে মনস্থ করলেন, এবং আটলান্টিক মহাসাগরের ওপারে তাঁর উপহারটি ওয়াশিংটনের হাতে পৌঁছে দেবার জন্য তিনি টমাস পেনকে একমাত্র বিশ্বস্ত মনে করলেন। কিন্তু পেন তখন ইংল্যান্ডে ব্রিজ তৈরী করবার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাই তিনি ওয়াশিংটনকে এই জানিয়ে চিঠি লিখলেন যে তাঁর পরিবর্তে এমন একজন বিশ্বস্ত মানুষকে প্রয়োজন যিনি নিরাপদে তাঁর হাতে সেই উপহারটি পৌঁছে দেবেন যে উপহারটি স্বৈরাচার অবসানের প্রথম স্মৃতিবিজড়িত চিহ্নস্বরূপ আমেরিকার আদর্শের প্রথম পাকা ফল হিসেবে ইউরোপে রোপিত হয়েছিল। এর পরে তিনি আরো লিখেছিলেন যে 'ফ্রান্সের বিপ্লবের সম্পূর্ণ সফলতা সম্পর্কে আমার আর কোন সন্দেহ নেই,' এবং আরও লিখলেন যে 'আমি একটা ব্রিজ তৈরি করেছি (একটা খিলানের উপর) যেটি একশ দশ ফিট লম্বা এবং খিলানের উপর লোহার দড়ি থেকে সেটি পাঁচ ফুট উঁচু।'

একটা সময় ব্রিজ নির্মাণ ও বিপ্লব তাঁর কাছে সমান ভাবে উৎসাহের বিষয় ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে বিপ্লবটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ইংল্যান্ডে সচেতনমূলক আন্দোলন গড়ে তোলার খাতিরে তিনি তাঁর 'মানুষের অধিকার' (Rights of man) প্রবন্ধটি রচনা করেন এবং যার ফলস্বরূপ গণতন্ত্রী হিসেবে তাঁর খ্যাতি লাভ হয়।

এই কাজটি যা জ্যাকোবিন-বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার সময়টাতে একটা ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক বিপর্যয়রূপে চিহ্নিত তা আধুনিক পাঠককে বিস্মিত করবে তার সাধারণ ভাষা ও কোমলতার পরিচয়ে। এ প্রবন্ধটি প্রাথমিকভাবে ব্রুকের প্রশ্নের উত্তররূপে লেখা হয়েছিল এবং লেখাটির মধ্যে তৎকালীন ফ্রান্সের ঘটনাগুলির সম্যক বিচরণ ও তার উপর যথার্থ আলোচনা ছিল। এই গ্রন্থটির প্রথম অংশটি প্রকাশিত হয় ১৭৯১ সালে, দ্বিতীয়টি প্রকাশিত হয় ১৭৯২ সালে। সুতরাং বিপ্লবের বিরূপ সমালোচনার দায়ে তাঁর ক্ষমা চাইবার কোন জায়গা নেই। এই গ্রন্থটির একটি ছোট্ট অধ্যায়ে প্রাকৃতিক অধিকার সম্পর্কে অল্প মর্মস্পর্শী লেখা তিনি লিখেছিলেন, কিন্তু সেখানে ব্রিটিশ সরকার সম্পর্কে তাঁর পরিচ্ছন্ন গভীর বোধের পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি। ব্রুক এইভেবে প্রশান্তি লাভ করেছিলেন যে ১৬৮৮ সালের বিপ্লবের ফলে অ্যাক্ট অব সেটলমেন্টের দ্বারা চিরকালের জন্য ব্রিটিশরা সার্বভৌম শক্তির বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হল। পেন কিন্তু ব্রুকের মতো ভেবে প্রশান্তি লাভ করলেন না, তিনি সেই ভেবে প্রশান্তি লাভ করেছিলেন যে সমৃদ্ধিকে কখনও আর বাঁধা যাবে না এবং সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংবিধান সংশোধন অবশ্যই ঘটবে।

তিনি লিখলেন, 'সরকারগুলোকে তিনটি মূল বিষয়ের অন্তর্গতরূপে ভাবা যেতে পারে। প্রথম, কুসংস্কার, দ্বিতীয়, ক্ষমতা, তৃতীয়, সমাজের সাধারণ স্বার্থ ও সমাজের সাধারণ অধিকার হিসেবে। প্রথমটি হল পুরোহিতদের সরকার, দ্বিতীয়টি হল বিজেতাদের সরকার এবং তৃতীয়টি হল বুদ্ধির দ্বারা নির্মিত সরকার।' প্রথম দুটি এক জায়গায় মিলেমিশে গেল এবং তা 'সেন্ট পিটারের চাবিকাঠি ও সেন্ট পলের চাবিকাঠিতে পরিণত হল, এবং পরবর্তীকালে তা আরও কয়েকটি টুকরো হয়ে নানা রকম ভণ্ড ও জোচ্চোর ধরণের পূজারী সরকারের সৃষ্টি করল।' এই ধরণের অসাধারণ পর্যবেক্ষণ সত্যই অপ্রতুল। তাঁর বেশিরভাগ কাজ প্রথমে ১৭৮৯ সাল থেকে ১৭৯১ সালের শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সের ইতিহাস সম্পর্কে এবং দ্বিতীয়টি ব্রিটিশ সংবিধানের সঙ্গে ১৭৯১ সালের ফ্রান্সের রায়ের তুলনা সম্পর্কীয়, এবং এই কাজে ফ্রান্স, তার কাছ থেকে বেশি উপকার পেয়েছে। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ১৭৯১ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সে রাজতন্ত্র ছিল। পেন ছিলেন গণতান্ত্রিক এবং তা তিনি কখনই গোপন করেননি, কিন্তু তিনি 'মানবের অধিকারসমূহ' নামক গ্রন্থে সে সম্পর্কে খুব একটা জোরও দেননি।

কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনার ক্ষেত্র ছাড়া পেন সর্বদা সাধারণ চেতনার কাছে আবেদন করেছেন। পিট্‌সের অর্থনীতির বিরুদ্ধে তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন এমন কারণের, যে কারণের উপর ভিত্তি করে রাজস্ববিভাগের সভাপতির কাছে আবেদন করা একান্ত উচিত। পেনের পথ অনুসরণ করে পরে কবেটও একই কাজ করেন। তিনি সেই ডুবে যাওয়া অর্থভাণ্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে বিরাট অঙ্কের টাকা ধার করাটাকে তুলনা করলেন খরগোশ ধরবার জন্য একটা মানুষকে হাতে লাঠি ধরিয়ে বসিয়ে রাখার সঙ্গে— যত দূর খরগোশরা ছোটে, ততদূর বসে থাকা মানুষটা সরে যায়। তিনি কবেটের পথ অনুসরণ করে রাজস্ববিভাগকে 'কাগজের টাকা বানাবার কুমোরের কারখানা' এই শব্দগুচ্ছ প্রয়োগ করে তার উপর আলোচনা করলেন। বস্তুত অর্থভাণ্ডারের উপর তাঁর লেখা কবেটের সঙ্গে তাঁর পূর্বের শত্রুতাকে মুছিয়ে দিয়ে সে জায়গায় তাঁর প্রতি কবেটের প্রশংসা এনে দিল। তাঁর বংশানুক্রমিক আদর্শের প্রতি আপত্তি যা ব্রুক এবং পিটকে আতঙ্কগ্রস্ত করেছিল তা আস্তে আস্তে হিটলার ও মুসোলিনি সমেত সমস্ত রাজনীতিবিদদের কাছে সাধারণভাবে গ্রাহ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াল। তাঁর লেখার শৈলী কখনই উদ্ধত ধরণের ছিল না। তাঁর লেখা ছিল পরিষ্কার, অকপট, প্রাণবন্ত, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষের লেখার মতো কখনই গালাগালিপূর্ণ ছিল না।

শুধু তাই নয়, পিট মনস্থ করেছিলেন যে পেনের বিরুদ্ধে মকদ্দমা করেও তাঁর 'মানব অধিকারসমূহ' নামক গ্রন্থটি বাতিল করে তিনি তাঁর সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু করবেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী লেডি হেসটার স্ট্যানহোপের মতে তিনি 'রোজই বলতেন টম পেন সর্বদাই সত্যের পক্ষে, কিন্তু তার পর আবার বলতেন, আমাকে আর যে কি করতে হবে? আসল কথাটা হল যদি আমরা টম পেনের মতামতকে মেনে নিই তবে আমাদের বিশ্রী ধরণের বিপ্লবে জড়িয়ে পড়তে হবে।' পেন এই মকদ্দমার প্রত্যুত্তর হিসেবে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। কিন্তু সেপ্টেম্বরের গণহত্যার পর ইংরেজ টোরিরা বর্ধিত আগুনে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ল। জাগতিক প্রজ্ঞায় অনেক বড় হয়েও কবি ব্লেক পেনকে প্ররোচিত করে বলেন যে তিনি যদি ইংল্যান্ডে থাকেন তাঁর ফাঁসি হবে। কর্মরত যে পুলিশ অফিসাররা তাঁকে ধরতে এসেছিল তাদের ফাঁকি দিয়ে তিনি ফ্রান্সে পালিয়ে যান। যাবার আগে কিছু ঘন্টা তিনি লন্ডনে থাকেন এবং সেখান থেকে তিনি কিছুক্ষণের জন্য ডোভারে আসেন এবং সেখানে তিনি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ফ্রান্সে যাবার অনুমতি পান, কেননা সেই কর্তৃপক্ষ কিছুদিন আগে ওয়াশিংটনের কাছ থেকে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ চিঠি পান যেখানে তিনি টমাস পেনকে সুযোগ সুবিধা দেবার কথা বলেছিলেন।

তখন ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড জড়িয়ে পরেনি, ফলে ডোভার ও কালেই একটি স্বতন্ত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিল। পেন ফ্রান্সের সাম্মানিক নাগরিকতা পেলেন, যার ফলে

তিনি তিনটি নির্বাচন এলাকার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন, যার মধ্যে কালেই তাঁকে সঙ্গে নিজের এলাকায় অভ্যর্থনা জানায়। তাঁকে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে শ্রদ্ধা জানাতে তারা তোপ দাগলো এবং সেই সঙ্গে তীরে দাঁড়ানো হাজারো মানুষ তাঁর জয়ধ্বনি করে উঠলো। কালেই-এর প্রতিনিধি হিসেবে তিনি যখন ফ্রান্সের মাটিতে পা রাখলেন তখন সৈনিকরা তাঁকে রাস্তা করে নিয়ে গেল, বড় বড় অফিসাররা তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁকে জাতীয় ফুল উপহারস্বরূপ দেওয়া হল। তার পরে ফরাসী কায়দায় আরো অনেক রকম সাম্মানিক আচরণ তাঁর সঙ্গে করা হল, বহু সুন্দরী মহিলা ও মেয়র তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

প্যারিসে পৌঁছে তিনি অহঙ্কারের জায়গায় অনেক বেশি জনতা-হৃদয় সহানুভূতি দেখালেন। তিনি আশা করেছিলেন ফ্রান্সে গণহত্যার জায়গায় একটি মধ্যবর্তী বিপ্লবের উত্থান হবে যা তিনি আমেরিকায় গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি গিরোডিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন, লাফায়েৎ সম্পর্কে বাজে চিন্তা দূর করে দেন (যা এখন লজ্জাজনক), এবং একজন আমেরিকানের মতো তিনি লুই লুইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেন, কেননা তিনি স্বাধীনতার যুদ্ধে সাহায্যকারী রাষ্ট্রকে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে রাজার শিরোচ্ছেদের বিরোধিতা করে জ্যাকোবিনদের রোষে পড়েন। তাঁকে প্রথমে সাম্মানিক অতিথির সম্মান থেকে বরখাস্ত করা হয়, পরে একজন বিদেশী হিসেবে তাঁকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। রোবসপীয়ের যতদিন ক্ষমতায় আসীন ছিলেন তার দশ মাস পরে পর্যন্ত পেন কারাগারে বন্দী ছিলেন। যদিও তাঁর এই অপমানের দায় ফ্রান্সের ছিল তবে তা ছিল আংশিক। এর পেছনে আমেরিকান মন্ত্রী গভর্নরনিয়ার ছিলেন সমানভাবে দায়ী। গুর্ভারনিয়ার ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র মতবাদী এবং তিনি ফ্রান্সের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের পক্ষ নিয়েছিলেন। আসলে গুর্ভারনিয়ার এই কাজ করেছিলেন পুরোনো প্রতিহিংসা মেটাবার জন্য। কেননা তিনি স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় গুর্ভারনিয়ারের কোন বন্ধুর বাজে কাজ ফাঁস করে দিয়েছিলেন। এরই জের টেনে তিনি পেন সম্পর্কে বলেছিলেন যে তাঁকে কোনরকম সাহায্য তিনি করতে পারবেন না। ওয়াশিংটন গোপনে ইংল্যান্ডের সঙ্গে জের চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন, তিনি পেনকে এই অবস্থায় দেখেও কোনরকম সহানুভূতি প্রদর্শন করলেন না এবং পেন ফরাসী সরকারকে আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল করে তোলেন। আশ্চর্যজনকভাবে তিনি গিলোটিন থেকে রেহাই পান, কিন্তু মারাত্মক শরীর খারাপের ফলে তিনি প্রায় মরতে বসেছিলেন। শেষে মরিসের বদলে মনরো আসেন যিনি পেনের সঙ্গে তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন এবং তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কয়েকমাস ধরে আন্তরিকতা ও যত্নের সঙ্গে সারিয়ে তোলেন।

পেন জানেননি মরিস তাঁর দুর্ভাগ্যের জন্য কি পরিমাণ দায়ী ছিলেন, কিন্তু তিনি ওয়াশিংটনকে কখনও ক্ষমা করতে পারেননি। ওয়াশিংটনের মৃত্যুর পর মানুষ হিসেবে তাঁর মর্মরমূর্তি নির্মাণের খবর শুনে, তিনি ভাস্করকে নীচের পঙ্‌ক্তিগুলি শুনিয়েছিলেন,

খনি থেকে তোল শিল্পী
যে ঠান্ডা কঠিন পাথর
তাই যে ওয়াশিংটন,
আবার মূর্তির কি প্রয়োজন!
তবুও যদি চাও,
তোমার কঠিন হাতে আঘাত হেনে
তাঁর বুকেতে গভীর করে
'অকৃতজ্ঞ' লিখে দাও।

তিনি ওয়াশিংটনকে একটি দীর্ঘ ও তিক্ত পত্র লেখেন যেটি বহুদিন অপ্রকাশিত থাকার পর ১৭৯৬ সালে প্রকাশিত হয় এবং যে পত্রটি শেষ হয় এই বলে :

'এবং আপনার সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে মহাশয়, আপনি ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে একজন বিশ্বাসঘাতক মানুষ (কেননা বিপদের সময় আপনি এরকমই আচরণ আমার সঙ্গে করেছেন), এবং জনগণের জীবনের ক্ষেত্রে একজন ভণ্ড মানুষ, এবং আপনি একজন স্বধর্মত্যাগী না প্রতারক তা নিয়ে জগৎ সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বিহ্বল হয়ে পড়বে এই সিদ্ধান্ত নিতে যে আপনি মঙ্গলজনক আদর্শ পরিত্যাগ করেছিলেন না কোনদিনই তেমন কোন আদর্শ আপনার ছিল না।'

যারা কেবল ইতিহাসের ঐতিহ্যময় ওয়াশিংটনকে চেনেন তারা এই ধরণের পত্রকে বর্বরোচিত বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু ১৭৯৫ সালে রাষ্ট্রপতির পদ নিয়ে জেফারসন ও অ্যাডামসের মধ্যে নির্বাচনের লড়াইতে ওয়াশিংটন অ্যাডামসকে সমর্থন করলেন এ'কথা জেনেও যে অ্যাডামস রাজতন্ত্র ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর সমর্থক। শুধু তাই নয়, তিনি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের পক্ষ নিলেন এবং যে প্রজাতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক আদর্শ নিয়ে তিনি আমেরিকার উচ্চ স্থানে এসেছিলেন সেই আদর্শের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। জনগণের পক্ষ নিয়ে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসাজাত পত্রটি প্রমাণ করে যে পেনের কথাগুলো বেঠিক ছিল না।

পেনকে বন্দীদশার করুণ অবস্থায় ফেলে রেখে যাওয়াটা ওয়াশিংটনের পক্ষে খুবই কষ্টকর হয়ে উঠত যদি না এই জেদি মানুষটি তাঁর শেষে মুক্ত জীবনগুলিতে গণতন্ত্রের উপর সেই সব মতামত প্রকাশ করে দিন কাটাতেন, যে মতামতকে ভিত্তি করে তিনি ও জেফারসন মেনে নিতে পেরেছিলেন ওয়াশিংটন ও অ্যাডাম্সকে যারা ধর্ম বিষয়ে জনগণের যে-কোন রকম শিথিলতাকে যত্নসহকারে এড়িয়ে যেতেন। নিজের দূরদৃষ্টির ফলে নিজের বন্দীদশাকে আগে থেকে জানতে পেরে 'যুক্তির যুগ' (The age of reason) প্রবন্ধটি লিখতে শুরু করেন, এবং গ্রন্থটির প্রথম ভাগটি লেখা শেষ করার ছয় ঘণ্টার পর তিনি গ্রেফতার হন। এই গ্রন্থ তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিদের আহত করে এবং তাদেরকেও আহত করে যারা তাঁর রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। বর্তমানে এই গ্রন্থটির কিছু বাজে লেখা ছেড়ে দিলে বাদবাকি যে লেখাগুলি পড়ে থাকবে তা খুব কম যাজকই অস্বীকার করে উঠতে পারবেন। প্রথম অধ্যায়ে তিনি লেখেন,

'আমি একটিমাত্র ভগবানে বিশ্বাসী এবং আমি এজীবনের পরেও সুখ-আশা করি।

'আমি মানুষের সমতায় বিশ্বাসী, এবং আমি বিশ্বাস করি যে ধর্মীয় কর্তব্যসমূহ নির্ভর করে ন্যায়বিচার, প্রেমময় করুণা এবং মনুষ্যজাতিকে সুখী করার প্রচেষ্টার মধ্যে।'

এই সমস্ত কথাগুলো মোটেই ফাঁকা বুলি ছিল না। জনগণের সেবায় ব্রতী হবার প্রথম দিন থেকেই তিনি যে-কোন রকম নিষ্ঠুরতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। ১৭৭৫ সালে তিনি দাসত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন এবং মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত নিজের সমর্থিত দলের কিংবা বিরুদ্ধ দলের কোনরকম নিষ্ঠুরতাকে বরদাস্ত করেননি। সেই সময় ইংল্যান্ডে কতিপয় ব্যক্তির নিষ্ঠুর শাসন চলছিল। তারা সংসদকে নিজেদের পক্ষে ব্যবহার করে গরীব শ্রেণীকে আরও গরীব করে তুলেছিল। পেন এই ধরণের জঘন্য শাসনের রাজনৈতিক সংস্কার চাইলেন। ফলস্বরূপ তাঁকে সে দেশ ছাড়তে হল নিজের জীবন বাঁচাতে। ফ্রান্সে রাজতন্ত্যার প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন এবং অল্পের জন্য মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেলেন। আমেরিকার দাসত্বপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এবং স্বাধীনতা ঘোষণার আদর্শকে সমর্থন করে তিনি সেখানকার সরকারের দ্বারা পরিত্যক্ত হলেন ঠিক তখন যখন তাঁর ওই সরকারের সমর্থন খুব দরকার ছিল। তাঁর ধর্মমতকে এখন অনেকেই মেনে থাকেন। তিনি যে ধর্মমত পোষণ করতেন এবং সারাটা জীবন মেনে চলতেন তা হল সত্য ধর্ম বলতে বোঝায় ন্যায়বিচার, প্রেমময় করুণা প্রদর্শন এবং মানবজাতিকে সুখী করবার প্রচেষ্টা।' কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না যিনি নিজেকে এই বিচারে একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ বলতে পারেন।

'যুক্তির যুগ' নামক গ্রন্থটির বেশিরভাগ অংশ নৈতিক দিক থেকে ওল্ড টেষ্টামেন্টের সমালোচনা। বর্তমান যুগে খুব কম মানুষই Pentateuch এবং Book of Joshua-তে ধর্মের নামে নারী, পুরুষ ও শিশুকে নির্বিচারে হত্যার যে ঘটনার কথা নথিভুক্ত আছে তা মানতে পারবেন। কিন্তু পেনের সময়ে ইজরায়েলীয় ধর্মকে নিন্দা করাটা অপবিত্র বলে মনে করা হত কেননা তারা ওল্ড টেষ্টামেন্টের দ্বারা মনোনীত ছিল। এর ফলে অনেক ধর্মপ্রাণ মানুষ তাঁকে চিঠি লিখে তাদের উত্তর জানিয়েছিল। এদের মধ্যে উদারপন্থী ল্যাঙাফের বিশপ Pentateuch-এর ঘটনা মোজেসের দ্বারা লিখিত নয় বলে প্রচার করেন এবং জালমা-র (Psalma) নয় বলে দাবী করেন। এইজন্য তিনি তৃতীয় জর্জের শত্রুতাকে দায়ী করেন যাঁর জন্য ডেভিডের রচনাকে ঠিক মতো অনুবাদ করা যায়নি। কিছু কিছু বিশপ প্রত্যুত্তরে বলেন যে পেন একজন কৌতূহলী মানুষ ছাড়া আর কিছুই নন। উদাহরণস্বরূপ 'যুক্তির যুগ' গ্রন্থটি এই সন্দেহ করে এগিয়েছে যে সত্যই ঈশ্বর মিডিয়ানটিয়দের মধ্যে নারী-পুরুষ-শিশু হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন না দেননি। কেননা অল্পবয়স্ক মেয়েদের রক্ষা করাটাই তখন ধর্ম ছিল। বিশপ রেগে গিয়ে প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন যে অল্পবয়স্ক মেয়েদের কখনই অবৈধ কর্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে রক্ষণ করার নিয়ম ছিল না যে রকম পেন বিশ্রীভাবে বলতে চেয়েছেন, তবে দাসী হিসেবে তাদের রক্ষণ করাটাকে নৈতিক দিক থেকে আপত্তি করার কিছু নেই বলে জানান বিশপ। আমাদের সময়ে গোঁড়া ধর্মাবলম্বীরা হয়ত ভুলে গেছেন আজ থেকে একশচল্লিশ বছর আগে গোঁড়া ধর্মাবলম্বী বলতে ঠিক কি বোঝাত। ধর্মমতকে নরম করতে গিয়ে কি ধরণের অত্যাচার পেনকে সেই সময় সহ্য করতে হয়েছিল যার ফলস্বরূপ আজকে আমাদের যুগটা লাভবান। কবরের ভারপ্রাপ্ত পুরোহিতরাও পেনের মৃত্যুর পর তাদের কবরভূমিতে তাঁর দেহ কবরস্থ করার অনুমতি দেয়নি। শেষ পর্যন্ত ঐরকম একজন কৃষক পুরোহিত (যারাও সংখ্যায় খুব কমই আছে) পেনের নশ্বর দেহকে কবরস্থ করে।

'যুক্তির যুগ' প্রকাশিত হবার পর পেনের রচনাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবাটা বন্ধ হয়ে গেল। অনেক দিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি আরোগ্য লাভ করলেন তখন তিনি দেখলেন ফ্রান্সের জ্ঞাতব্য বিষয়ক পুস্তকে তাঁর কোন জায়গা নেই, এমন কি প্রথম কনসালেও তাঁর কোন জায়গা নেই। নেপোলিয়ন যদিও তাঁর সঙ্গে কোনরকম খারাপ ব্যবহার করেননি, তবুও তাঁর তাকে তেমন কোন দরকার হয়নি কেবলমাত্র ইংল্যান্ডে তাঁকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আন্দোলনের একজন সম্ভাব্য এজেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা ছাড়া। এরপর তিনি আমেরিকায় থাকবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন এবং যুক্তরাষ্ট্রবাদীদের বিরুদ্ধ পক্ষ জেফারসন অনুরাগীদের কাছে এ' বিষয়ে সাহায্য চান। কিন্তু ইংরেজদের হাতে ধরা পড়লে

... ফাঁসি অবধারিত ছিল। এরপরে ১৮০২ সালে তিনি বালতিমোরে এসে নামেন ... সঙ্গে সঙ্গে জেফারসনকে একটি চিঠি লেখেন (জেফারসন তখন রাষ্ট্রপতি) :

'আট দিন ধরে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে হ্যাভার থেকে আমি শনিবার এখানে ... পৌঁছলাম। আমার অনেক রকম মডেল ও চাকা প্রভৃতি অনেক কিছু ...ছিলাম এবং জর্জটাউনের জন্য নেওয়া জিনিসের মোড়কগুলো জাহাজে তোলা ... আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা আপনার প্রতি জ্ঞাপন করলাম। আপনার ... অনুরাগী নাগরিক, টমাস পেন।

কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রবাদী ছাড়া তাঁর বাদবাকি পুরোনো বন্ধুরা যে তাঁকে স্বাগত ...বেন এ বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু একটা অসুবিধা ছিল। ...পতি পদের জন্য জেফারসন মরণপণ লড়ছিলেন। নির্বাচনী প্রচারে তাঁর ...দ্ধে সব থেকে বড় যে-অস্ত্রটি তাঁর বিরোধী সমস্ত দলের মন্ত্রীরা ব্যবহার করে ...ছিল তা হল তাঁর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ। তাঁর বিরোধী দল তাঁর সঙ্গে ...র অন্তরঙ্গতাকে বড় করে দেখিয়ে দুজনকে একজোড়া ব্যভিচারী বলে প্রচার ...ছিল। কুড়ি বছর পরেও স্বদেশবাসীর এই ধর্মীয় গোঁড়ামী দেখে তিনি এতটাই ...হত হয়েছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের ত্রিমূর্তিবাদে অবিশ্বাসী একজন মন্ত্রী যিনি তাঁর ...একটি চিঠি প্রকাশ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তাঁকে প্রত্যুত্তরে লিখেছিলেন, ... শ্রদ্ধেয় মহাশয়, সমস্ত জগতের জন্য নয়। ... আমার খুব তাড়াতাড়ি বেড় ...য়ার পাগল খুলিটাকে নিয়ে আসা উচিত যে বকবক করে আথানাসীয়দের মনে ...কে প্রতিষ্ঠা করবে...তাই ক্যালভিনের কাঠ ও আগুন এবং তার বলি ...সারভেটাসের থেকে আমাকে বাঁচান।' এই কারণে এটা খুব আশ্চর্যের বিষয় নয় ... যখন সারভেটাসের নিয়তি তাদের হুমকি দিচ্ছিল তখন জেফারসন ও তাঁর ...নৈতিক অনুরাগীরা পেনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রাখার লজ্জাকে ঢাকার চেষ্টা ...করল এবং অস্বীকার করবে। পেনের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করা হয়েছিল ফলে ...অভিযোগ করার কোন উপায়ই নেই, কিন্তু পুরোনো সেই সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্ক ...আর হয়ে গেল।

...র অন্যান্য বন্ধুদের কাছে তাঁকে আরও খারাপ অবস্থায় পড়তে হয়েছিল। ...ফিলাডেলফিয়ায় তাঁর প্রথম বন্ধুদের মধ্যে একজন ফিলাডেলফিয়ার ডাক্তার রুশ তাঁর জন্য ...ত্ত করেননি। রুশ লেখেন, 'তাঁর যে আদর্শের কথা তিনি যুক্তির যুগ নামক ...বইতে অকপটে বলতে পেরেছেন তা আমাকে এতটাই অসন্তুষ্ট করেছে যে আমি ...র সঙ্গে আর নতুন করে কোন সম্পর্ক তৈরি করতে ইচ্ছুক নই।' তিনি নিজের ...প্রতিবেশীদের কাছে ছিলেন অত্যাচারিত এবং স্ট্যাগ কোচে (বল্গা-হরিণ বাহিত ...) তাঁকে কোন বসবার জায়গা দেওয়া হত না। তাঁর মৃত্যুর তিন বছর আগে থেকে ...ভোট দিতে দেওয়া হত না এই অভিযোগে যে তিনি একজন বিদেশী। তাঁকে

অনৈতিক ও অমিতাচারী বলে অভিযুক্ত করা হয় এবং তাঁর জীবনের শেষ বছরগুলো তাঁকে একাকিত্ব ও দারিদ্র্যে কাটাতে হয়। তিনি মারা যান ১৮০৯ সালে। যে সময় তিনি মারা যাচ্ছেন তখন দুজন পাদ্রী তাঁর ঘরে জোর করে ঢুকে তাঁকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে চান, তখন তিনি অনেক কষ্টে একবার বলেন, 'আমাকে একা থাকতে দিন। সুপ্রভাত।' এতদসত্ত্বেও গোঁড়া ধর্মাবলম্বীরা বলে বেড়ালেন মৃত্যুশয্যায় তাঁর স্বীকারোক্তির কথা যা সবাই বিশ্বাস করে থাকে।

মৃত্যুর পর তাঁর খ্যাতি আমেরিকার চেয়ে ইংল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়ে বেশি। তাঁর রচনাগুলো প্রকাশ করা বেআইনী ছিল, কিন্তু তা বারবার প্রকাশিত হতে লাগলো। যদিও বেআইনীভাবে প্রকাশ করার জন্য বহু মানুষ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। ১৮১৯ সালে পেনের রচনা প্রকাশ করার জন্য সর্বশেষ অভিযুক্ত করা হয়েছিল রিচার্ড কারলাইল ও তাঁর স্ত্রীকে। তাঁকে তিন বছরের জন্য দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তাঁর উপর পনেরোশো পাউন্ড জরিমানা ধার্য করা হয়েছিল। তাঁর স্ত্রীকে দণ্ড দেওয়া হয়েছিল এক বছরের জন্য ও পাঁচশো পাউন্ড জরিমানা ধার্য করা হয়েছিল। ওই বছরেই কবেট পেনের অস্থি ইংল্যান্ডে নিয়ে আসেন এবং ইংল্যান্ডে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বীরযোদ্ধাদের অন্যতম যোদ্ধা হিসেবে তাঁর খ্যাতিকে প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও তাঁর অস্থিকে চিরস্থায়ী বিশ্রামের জায়গা দিতে পারেননি। মনকিয়োর কনওয়ে (পেনের জীবনী ও তাঁর রচনাগুলি লেখা ও প্রকাশ করার ক্ষেত্রে যিনি যথেষ্ট নিষ্ঠা ও যত্নের পরিচয় দিয়েছেন।) বলেছেন, 'যে স্মৃতিস্তম্ভের চিন্তা কবেট করেছেন তা কোনদিনই গড়ে উঠবে না।' এই ঘটনাটিকে নিয়ে ইংল্যান্ডের সংসদে ও পৌরসভায় যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। বোলটন শহর-ঘোষক পেনের অস্থি পৌঁছনোয় খবর ঘোষণা করার জন্য তিন সপ্তাহ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। ১৮৩৬ সালে পেনের অস্থি কবেটের হাত থেকে পশ্চিমের এক গ্রহীতার কাছে যায়। লর্ড চ্যান্সেলার পেনের অস্থিকে সম্পদ হিসেবে মানতে অস্বীকার করেন। ফলে সেই অস্থি ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত একজন দিনমজুরের দ্বারা রক্ষিত হয়, তারপর তা ১৩ নম্বর বেডফোর্ড স্কোয়ারে, লন্ডনের এক ফার্নিচার ব্যবসায়ী বি. টিলির হাতে যায়...১৪৫৪ সালে রেভারেন্ড আর এইচ (ইউনিটারিয়ান) ই, ট্রুলাভকে বলেন যে তিনি টমাস পেনের খুলি ও ডান হাতের হাড়টি কিনেছেন,' কিন্তু তাঁর এই কথা সত্য কিনা তা যথেষ্ট অনুসন্ধান সাপেক্ষ। তাঁর নশ্বর দেহের কোন কিছুই আর পড়ে নেই, এমনকি তাঁর খুলি বা ডান হাতটিও কোথাও পাওয়া যায় না।

পৃথিবীতে পেনের প্রভাব দু'ধরনের। আমেরিকার বিপ্লবের সময় তিনি উৎসাহ দৃঢ়তার জন্য প্রেরণা জুগিয়েছেন এবং বিপ্লবে জয়লাভের জন্য বহু কিছুই করেছেন।

ফ্রান্সে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল ক্ষণস্থায়ী ও কৃত্রিম, কিন্তু ইংল্যান্ডে তিনি পিট ও লিভারপুলের দীর্ঘ স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ শ্রেণীর হয়ে কঠোর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। বাইবেলের উপর তাঁর মতামতসমূহ তাঁর ঈশ্বরের ত্রিত্ববাদে অবিশ্বাসের থেকে অনেক বেশি তার সমসাময়িকদের অসন্তুষ্ট করেছিল, অথচ আজ কোন এক আর্চবিশপ ওই মতবাদই পোষণ করছেন। কিন্তু যারা সত্যিই তাঁর অনুরাগী ছিল তারা ছিল সেই সব মানুষ যারা তাঁর আদর্শকে গ্রহণ করে আন্দোলন করে পিটের নির্দেশে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সেইসব মানুষদের কেউ ছিল Owenites, Chartists, Trade unionist ও Socialist যারা Gagging Acts-এর দ্বারা ক্লেশ ভোগ করেছিল। এই সমস্ত অবদমিত বীরদের কাছে শ্রদ্ধা, মানবিকতা ও সম-মনোভাবাপন্নতার উদাহরণ তিনি নিজেকে দিয়েই রেখে গেছেন। যখনই জনসাধারণের কোন ব্যাপার তাঁর কাছে এসেছে তখনই তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অহঙ্কারের কথা ভুলে গেছেন। তাঁর নিজের প্রতি এই অনীহার জন্য জগৎ তাঁকে শাস্তি দিয়েছে। যদি তিনি একটু কম দয়ালু হতেন, একটু কঠোর হতে পারতেন, তবে বোধহয় আজ তিনি খ্যাতির চূড়ায় উঠতে পারতেন। প্রশংসাকে ধরে রাখতে গেলেও কিছুটা জাগতিক প্রজ্ঞার প্রয়োজন হয়।

৯

সুন্দর মানুষ

(প্রথম প্রকাশ ১৯৩১)

সুন্দর মানুষ যারা তাদের প্রশংসা করে একটি প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা হল। কিন্তু পাঠক এ'কথা জানতে চাইতেই পারে ঠিক কেমন ধরণের মানুষকে আমি সুন্দর মানুষ হিসেবে বিবেচনা করি। তাদের প্রয়োজনীয় গুণের উপর নির্ভর করে তাদের নির্বাচন করাটা কিছুটা জটিল হয়ে যাবে। তাই আমি নির্দিষ্ট ধরণের কিছু মানুষের কথা আলোচনা করব যারা সুন্দর মানুষের আয়তায় পড়ে। সুন্দরী অল্পবয়স্কা অবিবাহিতা মাসি বা পিসি অবশ্যই সুন্দর মানুষ, বিশেষত যদি তারা ধনী হয়। ধর্মযাজকরা খুব সুন্দর, একমাত্র সেই ধরণের ঘটনা ছাড়া যে ঘটনার ফলে তারা আত্মহত্যার ভান করে কীর্তন দলে ভিড়ে তার প্রেমিকের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় পালায়। আমার বলতে দুঃখ হচ্ছে যে, যুবতী মেয়েরা বর্তমানে কদাচিৎ সুন্দর হয়। যখন আমি যুবক ছিলাম, তখন যুবতী মেয়েরা খুব সুন্দর ছিল— অর্থাৎ, আমি বলতে চাইছি তখন যে-কোন বিষয় শুধু নয়, যে-কোন ব্যক্তি, এমন কি যুবকদের কোন উল্লেখযোগ্য দিক সম্পর্কে মায়েদের মতামতকে তারা মূল্য দিত। তারা ঠিক সময় মায়ের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলত 'হ্যাঁ মা' এবং 'না মা'। তারা তাদের বাবাকে ভালোবাসত কেননা সেটাকে কর্তব্য বলে মনে করত, এবং মাকে ভালোবাসত এই কারণে যে মা তাদের সামান্য ভুল কাজ করা থেকে রক্ষা করত। যখন তারা বাগদত্তা হত তখন তারা নিজেদের আধুনিকা করে সাজাতে ভালোবাসত এবং বিবাহের পর তারা নিজেদের সুন্দর করে সাজিয়ে রাখাটাকে স্বামীকে ভালোবাসা জনিত কর্তব্য বলে মনে করত, কিন্তু অন্যান্য মহিলাদের তারা বোঝাত যে এটা এমন একটা কর্তব্য যা তারা অতিকষ্টে সম্পাদন করে। তারা তাদের শ্বশুর ও শাশুড়ীর সঙ্গে খুব সুন্দর ব্যবহার করত, কিন্তু কোন কর্তব্যহীন ব্যক্তি যে এরকম ব্যবহার করতে পারে না তা যদি আমরা আগে বুঝে নিতে পারি তবে এই মেয়েদের আমরা ভালো করে বুঝতে পারব। তারা অন্যান্য মহিলা সম্পর্কে বিদ্বেষপূর্ণভাবে কথা বলত না, কিন্তু যখন তারা মুখ খুলত এবং কথা খরচ করত তখন তা একজন দেবদূতীর মহানুভবতার সঙ্গেই করত। এই ধরণের মহিলাদের শুদ্ধ ও মহান মহিলা বলা যায়। কিন্তু হায়, এই ধরনের মহিলা কেবলমাত্র বৃদ্ধাদের মধ্যে ছাড়া এখন আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

কৃপাবশত আজও যারা বেঁচে আছেন তাঁদের প্রবল ক্ষমতা। তারা শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করেন। তাঁরা ভিক্টোরীয় ধরণের ভণ্ডামিকে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা যেখানে করেছেন সেখানে খুব অসফলতা পাননি। তাঁরা আইনসভাকে 'নৈতিক প্রেক্ষাপটে' আজও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন এবং পায়ে তেল মাখানো ধরণের

[illegible] সৃষ্টি করেন। তারা কাগজের হয়ে লেখে এমন সব যুবকদের বৃদ্ধা [illegible] সম্পর্কে তাদের মতামত প্রকাশ করবার জন্য উৎসাহিত করেন যাতে [illegible] মানসের বিচিত্র ধরনের মনস্তাত্ত্বিক কল্পনা ও শৈলীকে ধরতে পারেন। [illegible] আনন্দকে বাঁচিয়ে রেখেছে, না হলে অন্যান্যরা তা বুভুক্ষুর মতো খেয়ে [illegible] ফেলত। উদাহরণস্বরূপ, মঞ্চে উঠে আজেবাজে কথা শোনার আনন্দ [illegible] প্রথাগত রীতির বাইরে একটু বেশি খালি গা দেখার আনন্দ। সর্বোপরি তারা [illegible] পর্যন্ত শিকার করার আনন্দকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ইংল্যান্ডের শায়ার বা [illegible]গুলোতে শেয়াল শিকারের জন্য লোকদের অভিযুক্ত করা হয়। এই ধরণের [illegible] যেমন খরচ সাপেক্ষ, অন্যদিকে কিছু কিছু সময় তেমন ভয়ঙ্কর। এছাড়াও [illegible] শেয়াল কোনভাবেই পরিষ্কার করে বোঝাতে পারে না যে শিকার [illegible]কে সে কতটা অপছন্দ করে। এই সমস্ত ব্যাপারে মানুষ-শিকার করাটা [illegible] মজার খেলা হতে পারত। যদি খেলাটা সুন্দর মানুষদের জন্য না হত তবে [illegible] মানুষদের জন্য খেলাটা মুস্কিলের হত। যে খেলাগুলোকে এইসব সুন্দর [illegible]গুলো দোষারোপ করে সেই খেলাগুলো মানবিক, কিন্তু যখন তারা 'খেলবে [illegible]' বলে ডাক ছাড়ে তখন শিকারীরা একত্র হয় এবং শিকারের পেছনে ছুটে [illegible] শিকারকে বন্দী করে অথবা তাকে মেরে ফেলে। বিশেষত খেলাটা তখন [illegible] করে জমে ওঠে যখন শিকার হিসেবে কোন মহিলাকে ধরা হয়। এই খেলাটা [illegible]লাদের হিংসা বা পুরুষদের ধর্ষকাম থেকে ঘটে। এই মুহূর্তে ইংল্যান্ডে থাকেন [illegible] এক বিদেশিনী মহিলাকে আমি জানি যিনি তার স্বামী ছাড়াও আরও একজন [illegible]র সঙ্গে সুখে শান্তিতেই আছেন যাকে তিনি ভালোবাসেন, আবার সেই [illegible] তাঁকে ভালোবাসে। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর রাজনৈতিক মতামত যতটা [illegible]শীল হওয়া দরকার ছিল ততটা রক্ষণশীল হয়নি। যদিও সেই মতামতগুলো [illegible] মতামতই, তবুও বলা যায় যে তিনি সেই মতামতগুলোকে মানতে কিছুই [illegible]। সুন্দর মানুষেরা এই ঘটনার সত্যাসত্য জানবার জন্য স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে [illegible] লাগালো এবং সেই মহিলাকে তাঁর নিজের দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হল যাতে [illegible] না খেতে পেয়ে মরেন। ইংল্যান্ডে ও আমেরিকায় বিদেশীরা নৈতিকভাবে [illegible]জনক কাজকর্ম করে বেড়ায়। এইজন্য আমরা পুলিশের কাছে কৃতজ্ঞ যে [illegible] বিদেশীদের এই মর্যাদাহানিকর কাজকে সামলে বেড়ায় এবং যাতে আমাদের [illegible] কেবলমাত্র ধার্মিক বিদেশীরাই থাকতে পারে তার দিকে চোখ রাখে।

[illegible] মনে করা আমাদের অবশ্যই উচিত নয় যেসব সুন্দর মানুষই মহিলা। [illegible] বলা যায় যে পুরুষের থেকে মহিলারাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সুন্দর মানুষ হয়ে [illegible]। ধর্মের সেবিকারা ছাড়াও অন্যান্য জায়গায় আরও অনেক সুন্দর মানুষ [illegible]। এইসব মানুষ হল তারা যারা নিজেদের জন্য বিরাট সৌভাগ্যকে তৈরি

করেছে এবং যারা এখন তাদের ব্যবসা থেকে অবসর নিয়ে তাদের সৌভাগ্যের দানশীলতার পেছনে খরচ করছে। ম্যাজিস্ট্রেটরাও প্রায় অনিবার্যভাবে সুন্দর মানুষ। যদিও এটা বলা যেতে পারে না যে তারা আইন আদালতকে সমর্থন করে তারাই সুন্দর মানুষ। মনে আছে যখন আমি যুবক ছিলাম যখন চরম শাস্তি সম্পর্কে আগে থেকেই একজন সুন্দর মহিলা আমাকে শুনিয়ে রেখেছিলেন যে এ'ধরণের শাস্তি ভালো নয় এবং একজন ফাঁসুড়ে কখনই একজন ভালো মানুষ হতে পারে না। কোন ফাঁসুড়েকে ব্যক্তিগতভাবে কখনও জানিনি তাই তার সম্পর্কে সেই মহিলার যুক্তিকে পরীক্ষা করে দেখে নেবার সুযোগ কখনও পাইনি। আমি একজন মহিলাকে জানি যিনি একদিন ট্রেনের মধ্যে একজন ফাঁসুড়ের সাক্ষাৎ পান এ'কথা না জেনে যে সেই লোকটি একজন ফাঁসুড়ে। আবহাওয়া খুব ঠাণ্ডা থাকার জন্য সেই ভদ্রমহিলা যখন তাকে একটি কম্বল দিতে যান তখন সেই লোকটি বলে ওঠে 'ম্যাডাম, যদি জানতেন আমি কে তা হলে আপনি একাজ করতেন না, ফাঁসুড়ে ব্যক্তিটির এই ধরণের আচরণ ও কথাবার্তা প্রমাণ করে যে সেও একজন সুন্দর মানুষ। যদিও এ'ধরণের ঘটনা একটি ব্যতিক্রম। ডিকেন্সের 'বারনাবি রাজ' এ যে ফাঁসুড়েটির কথা বলা হয়েছে, জোর দিয়ে বলা যায় যে সে কখনই সুন্দর মানুষ নয়, সম্ভবত এক অদ্ভুত ধরণের মানুষ।

যেহতেু ফাঁসুড়েরা সুন্দর মানুষ নয় সেহেতু চরম শাস্তি (ফাঁসি) ভালো না এই ধরণের যে যুক্তি সেই মহিলার কাছ থেকে আমরা পাই, আমি মনে করি তার সঙ্গে একমত হওয়া যায় না। কেননা একজন সুন্দর মানুষ হতে গেলে যে কোন রকম নিষ্ঠুর আচরণ থেকে বাস্তবে রক্ষিত হতে হয় এবং যারা রক্ষা করবার কাজ করে তারা কখনও সৌন্দর্যের অধিকারী হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, মনে করুন, সমুদ্রতীরবর্তী একটি ডুবন্ত জাহাজ, যে জাহাজটিতে করে অনেক বন্দী শ্রমিকদের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর মহিলা যাত্রীও ছিল। যাদের মধ্যে ধরেই নেওয়া যায় যে সবাই সুন্দরী মহিলা ছিল। তাই তাদের আগে বাঁচানো হল। যে-সব মানুষ এই বহু বন্দী শ্রমিকদের নিয়ে যাচ্ছিল তাদের বড় সুন্দর পদ্ধতিতে বাঁচবার সুযোগ মিলল সেইসব শ্রমিকদের দ্বারাই। সেই সুন্দর মহিলারা যখনই বুঝল যে তারা রক্ষা পাচ্ছে তখনই তারা সেইসব ডুবে যাওয়া শ্রমিকদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল কিন্তু তাদের কোমল হৃদয় কার্যকরী হয়ে উঠলো সেইসব শ্রমিকদের দ্বারা রক্ষা হবার পর।

সাধারণত সুন্দর মানুষেরা সমগ্র জগতের খবরদারি করার ভারটি বেতনভুক কর্মচারীদের হাতে দিয়ে রেখেছে। কারণ তারা বুঝেছে যে যারা সত্যই সুন্দর মানুষ তাদের পক্ষে এই খবরদারি করা সম্ভব নয়। তবে একটা জায়গা আ

যেখানে তারা কোন রকম অংশগ্রহণ করে না আর তা হল পেছনে কামড়ানো বা কোনরকম কেলেঙ্কারীজনিত ঘটনায়। কেবলমাত্র নিজের ক্ষমতার দ্বারা মানুষ রাজনৈতিক যাজক সম্প্রদায়ভুক্ত হতে পারে। যদি ক খ-এর বিরুদ্ধে কথা বলে এবং খ ক-এর বিরুদ্ধে বলে তবে যে সমাজে তারা বাস করে সেই সমাজ অনুযায়ী একজন তার কর্তব্য করছে আর একজন ঈর্ষান্বিত হয়ে তার বিরুদ্ধে কথা বলছে। কিন্তু যে ব্যক্তিটি জনগণের হয়ে কর্তব্য করছে সে ওই দুই ব্যক্তির থেকে অনেক বেশি সুন্দর। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা স্কুলের অন্যান্য শিক্ষিকাদের চেয়ে সুন্দর কিন্তু যে মহিলাটি স্কুল পরিচালনার বোর্ডে আছেন তিনি প্রধান শিক্ষিকা ও অন্যান্য শিক্ষিকাদের চেয়ে অনেক সুন্দর। নামী-দামী পদবী-টদবিগুলোর বলি নারী বা পুরুষ প্রথমেই তাদের জীবনের অস্তিত্বকে হারায়। আবার যারা এই পদবীগুলোতে পৌঁছতে পারে না, তারা অধৈর্য আলোকেও পরিণত হতে পারে। এইজন্য আমাদের অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে যে মঙ্গলের খাতিরে এই বিষয়টি বেশ শক্তিশালী এবং আমাদের অবশ্যই সেইসব সুন্দর মানুষদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা উচিত যারা এই ধরণের ব্যবস্থা বজায় রেখেছেন।

সুন্দর মানুষদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল নিজ সত্তা নির্ভর উন্নতির সশব্দ সাধনা। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন কিন্তু সুন্দর মানুষেরা মনে করেন যে তারা এই কাজটি আরও ভালোভাবে করতে পারতেন, কিন্তু স্বর্গীয় হস্তকর্মের অধীনে বহু বিষয় ও কাজ আছে, তাই সেই ধরণের কোন কাজ করবার ইচ্ছা অবশ্যই ঈশ্বর নিন্দাজনক এবং তার উল্লেখ করাও কোন রকমভাবে সুন্দর নয়। স্বর্গীয় মানুষেরা বলে থাকেন যে যদি আমাদের প্রথম জনক জননী আপেলটি না খেতেন তবে মানবজাতি অনন্তকাল নিষ্পাপ ধরণের ফলে পূর্ণ হয়ে যেত—গিবন এরকম ধরণের কথাই বলেছেন। এই বিষয়ে স্বর্গীয় পরিকল্পনা সত্যই রহস্যজনক। স্বর্গীয় মানুষদের মতে পাপের শাস্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি যথার্থ, অর্থাৎ আপেল খেয়েছো তার ফল ভোগ কর। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী যে সমস্যাটা দাঁড়ায় তা হল সুন্দর মানুষের ক্ষেত্রে যেটা শাস্তি হয়ে দাঁড়ায়, দুঃখজনকভাবে সেই একই শাস্তি অন্যান্য মানুষের ক্ষেত্রে আনন্দজনক হয়ে ওঠে। মনে হয় যে, শাস্তি ব্যাপারটি তৈরি হয়েছে কিছু ভুল লোকদের ঘাড়ে পড়বার জন্য। সুন্দর মানুষদের বহু উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য হল নিঃসন্দেহে এই অনিচ্ছাকৃত অন্যায়ের প্রতিকার করা। তারা এটাই নিশ্চিত করতে সর্বদা প্রচেষ্টা করতে থাকে যে জীববিদ্যা অনুযায়ী ফল উৎপাদনের সাধন উর্বর অথবা শীতল এই দুভাবে করা যায়, এবং যারা উর্বরভাবে কাজ করে, দেখা যায় তারাই সুন্দর মানুষদের মধ্যে ক্ষমতায় আসীন হয় এবং যারা এই ক্ষমতায় আসীন হয় কেলেঙ্কারীর দ্বারা তাদের চরিত্র কলঙ্কিত হবার

পর। তারা কেলেঙ্কারীর ব্যাপারটিকেও খুব সুন্দর করে আড়াল করে রাখার প্রয়াস করে থাকে। তারা সেন্সরকে নিজেদের হাতে পাবার চেষ্টা করে যাতে গোপনে ঘটে যাওয়া কুৎসিত নোংরামীর চেয়ে সেইসব গ্রন্থ ও নাটককে বাতিল করে দিতে পারে যেখানে কেলেঙ্কারীর কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই ব্যাপারে তারা অন্য জায়গায় প্রায় সরল হয় এবং আইন ও প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ঈশ্বর কেন যে মানবশরীরটি তৈরি করেছেন তা জানা যায় না, কিন্তু যে কোন ব্যক্তি এটা মনে করে নিতে পারে যে সর্বময় ঈশ্বর মানবশরীরকে এইভাবে তৈরি করেছেন তার জন্য যাতে সুন্দর মানুষেরা কোনরকম আঘাত না পায়। সম্ভবত এর পেছনে সঠিক কোন কারণ আছে। ইংল্যান্ডের ল্যাঙ্কাশায়ারে যতদিন বয়ন-শিল্প গড়ে উঠেছে ততদিন ধরে দেখা যাচ্ছে যে বয়ন-শিল্পের সঙ্গে মিশনারীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। মিশনারীরা বর্বরদের শেখাচ্ছে কিভাবে মানব শরীরকে আচ্ছাদিত করতে হয় এবং তার ফলে বস্ত্রশিল্পের চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে। যদি মানব শরীর সম্পর্কে লজ্জার কোন কিছু না থাকত, তবে বয়নশিল্প তার লাভের উৎসমুখ হারাত। এই দৃষ্টান্ত আমাদের যে ঘটনাটি দেখায় তা হল, পাছে পুণ্যের প্রচার আমাদের লাভ কমিয়ে দেয় তাতে আমাদের ভীত হবার কোন প্রয়োজন নেই।

'নগ্ন সত্য' এই শব্দগুচ্ছটি যিনিই আবিষ্কার করে থাকুন না কেন তিনি অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। নগ্নতা যে-কোন সঠিক মানসিকতা-সম্পন্ন মানুষের কাছে একরম ধাক্কা এবং ঠিক এই কারণেই তা সত্য। কি ধরণের বিভাগে আপনি যুক্ত আছেন তাতে কিছু আসে যায় না, আপনি খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবেন যে সত্য এমন একটি বস্তু যা সুন্দর মানুষ তাদের চেতনায় স্বীকার করেন না। এটাই আমার দুর্ভাগ্য যে এমন একটি মামলার শুনানীর জন্য আদালতে উপস্থিত থাকতে হয় যে ঘটনাটি সম্পর্কে আমার প্রথম শারীরজ্ঞান ছিল, কিন্তু আমি দেখে আঘাত পেয়েছিলাম যে সেইসব শ্রদ্ধার বেড়াজালে আবদ্ধ প্রবেশদ্বার ভেদ করবার জন্য কোন সত্যই সেখানে অনুমোদন পায় না। যে সত্য আইন আদালতে প্রবেশের সুযোগ পায় তা নগ্ন নয়, কিন্তু আদালতের পোশাকের অপেক্ষাকৃত কম সুন্দর অংশে যে সত্য লুকিয়ে থাকে তা নগ্ন সত্য। সরাসরি খুন, চুরিমূলক অপরাধের মামলার ক্ষেত্রে তা সত্য সে কথা আমি বলিনি, আমি বলেছি সেই সব মামলা মোকদ্দমার কথা যেখানে সংস্কারের উপাদান থাকে, যেমন— রাজনৈতিক মামলা, বা অশ্লীলতার মামলা। আমি বিশ্বাস করি এই ব্যাপারে আমেরিকার থেকে ইংল্যান্ড অনেক বেশি হীন পর্যায় পড়ে কেননা ইংল্যান্ড তার সৌন্দর্যের অনুভবের দ্বারা সব অসুন্দর বস্তুর অদৃশ্য আধা-সচেতন নিয়ন্ত্রণকে একটা উৎকর্ষে নিয়ে যেতে পারছে। যদি আপনি আদালতে কোন অপরিপক্ক ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চান তবে আপনি দেখবেন

া কোনরকম কাজ করতে চাওয়াটা সাক্ষ্যপ্রমাণজাত আইনের বিরুদ্ধ এবং কেবলমাত্র বিচারক ও বিরুদ্ধ আইনজীবীই নয়, আপনার পক্ষে যিনি আইনজীবী তিনিও ওই ধরণের ঘটনার কথা বলতে বাধা দেবেন।

এই একই ধরণের অবাস্তবতা রাজনীতিতে প্রবেশ করে থাকে সুন্দর মানুষদের অনুভবের ফলস্বরূপ। যদি আপনি কোন সুন্দর মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করেন তিনি যে দলের সমর্থক সেই দলের কোন রাজনীতিবিদ সাধারণ একজন ক্ষমতাশীল ব্যক্তি এবং যিনি রাশি রাশি মানুষের থেকে কোন অংশে বড় নন তবে দেখবেন সেই সুন্দর মানুষটি রুষ্ট হয়ে আপনার উপদেশটি অস্বীকার করবেন। ফলস্বরূপ রাজনীতিবিদদের নিষ্কলঙ্ক হয়ে সামনে আসাটা একান্ত প্রয়োজন। বেশিরভাগ সময় সমস্ত দলের রাজনীতিবিদরা তাদের পরিচিত হয়ে ওঠবার সময়ে কোনরকম ক্ষতির আশঙ্কা দেখলে মৌনভাবে একত্র হন তাকে বাধা দেবার জন্য। রাজনীতিবিদদের পেশাগত অভিন্নতা যতটা তাদের একত্র করে তার চেয়ে দলের স্বতন্ত্রতা অনেক কম তাদের বিভক্ত করে থাকে। এইভাবে সুন্দর মানুষেরা তাদের মহান মানুষদের সম্পর্কে কল্পনাময় ছবি সংরক্ষণে সমর্থ হন। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভাবতে বাধ্য করানো হয় যে, খ্যাতি কেবলমাত্র উচ্চ-ধর্ম বা গুণের দ্বারাই অর্জিত হতে পারে। এটা সত্য যে কিছু কিছু অসাধারণ সময়ে রাজনীতিবিদরা অপরাধে অসহ্য হয়ে উঠেছে এবং সর্বদা সেইসব রাজনীতিবিদরা যথার্থ সম্মানের জন্য বিবেচিত হন না যারা শিষ্টাচারবর্জিত ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, পারনেল প্রথমে খুনীদের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক রাখার জন্য সফলতার সঙ্গে অভিযুক্ত হন এবং তারপর তাকে এমন অনৈতিকতার অভিযোগে সফলতার সঙ্গে অভিযুক্ত করা হয় যে অভিযোগের কথা কোন অভিযোগকারী স্বপ্নেও ভাবতে পারবে বলে মনে হয় না। আমাদের কালে পূর্বইউরোপের কম্যুনিস্ট এবং আমেরিকার চরমপন্থী দল ও শ্রমিক আন্দোলনকারীরা সমাজের বাইরে অবস্থান করত। কোন সুন্দর মানুষদের বিরাট দল তাদের প্রশংসা করত না এবং যদি তাদের মধ্যে কেউ প্রথাগত আইনের বিপক্ষে যেত তবে তার পক্ষে কোনরকম ক্ষমা জুটত না। এইভাবে সুন্দর মানুষদের গতিহীন নৈতিক ধারণাসমূহ তাদের সম্পত্তির প্রতিরক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল এবং এইভাবেই তাদের অপরিমেয় যোগ্যতা আর একবার প্রমাণ করা যায়।

সুন্দর মানুষ যখনই কোন আনন্দ দেখে তখনই খুব সঠিকভাবে তাকে সন্দেহ করতে পারে। তারা জানে যে, সে যতটা প্রজ্ঞা (Wisdom) বাড়ায় ততটা দুঃখও বাড়ায় এবং তারা অনুমান করে যে, সে যতটা দুঃখকে বাড়ায় ততটাই প্রজ্ঞাকে কমাতে পারে। এই কারণে তারা অনুভব করে যে দুঃখের প্রসারণে প্রজ্ঞার প্রসারণ

হচ্ছে। কেননা প্রজ্ঞা চুনীর থেকেও বেশি মূল্যবান। তারা মনে করে যে এইরকম কাজ করে তারা সুবিচার করছে কেননা তা আখেরে লাভজনক হবে। উদাহরণস্বরূপ, তারা শিশুদের খেলার জন্য মাঠ তৈরি করে দেয় এই কারণে যাতে তারা নিজেদেরকে মানবপ্রেমিক মনে করতে পারে। তারপর সেখানে খেলার জন্য এত শর্ত চাপায় যে কোন শিশুই সেখানে খেলে সুখী হয় না যতটা তারা সুখী হয় রাস্তায় খেলে। শিশুরা সেই খেলার মাঠ ও রঙ্গালয় কেবলমাত্র রবিবার দিনটি ছাড়া বাদবাকি দিনে পরিহার করে চলে, কেননা সেই দিনে সেগুলো সবার জন্য খোলা থাকে বলে তারা সেখানে আনন্দ করতে পারে। কর্মস্থলে যুবতী মহিলাদের যতদূর সম্ভব বাধা দেওয়া হয়ে থাকে যুবক পুরুষদের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে। যতজন সুন্দর মানুষকে আমি চিনি তারা তাদের পরিবারের প্রিয়জন সম্পর্কে এই ধরণের আচরণই করে থাকে এবং তাদের শিশুদের তারা কেবলমাত্র নির্দোষ কিছু খেলা খেলতে বাধ্য করে। যদিও আমি এ'কথা বলতে দুঃখবোধ করছি, সৌন্দর্যের এই ধরণের মাত্রা আগে যতটা ছিল এখন তা খুবই কম। পুরোনো যুগে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হত :

ঈশ্বরের দণ্ডের একটি আঘাত হলে, ছোট্ট পাপী নরকে শীঘ্র যায় চলে।

থেকে এটা বোঝা যায় যে শিশুরা খুব গোলমাল করলে বা যে কাজ তাদের জন্য মন্ত্রকেরা নির্দিষ্ট করে দেয়নি সেই রকম কাজে অতি প্রশ্রয় পেলে তাদের কপালে ওইরকম ঘটবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর শিক্ষা যা 'দ্য ফেয়ারী চাইল্ড ফ্যামিলি'তে দেওয়া হচ্ছে তা সুন্দর মানুষ তৈরির জন্য একটি অমূল্য সম্পদ। আমি কতিপয় পিতামাতাকে জানি যারা বর্তমানে এই ধরণের উচ্চ মাপের জীবনযাপন করে থাকেন। এটা খুব সাধারণ ধারণা হয়ে গেছে যে শিশুরা নিজেরাই আনন্দ করতে পারে এবং এটা খুব ভয়ের ব্যাপার যে যেসব শিশুরা এই ধরণের কোমল আদরের উপর শিক্ষিত হচ্ছে তারা যখন বড় হবে তখন আনন্দ পাবার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ভয়ঙ্কর ব্যাপার যে ঘটাবে না এমন নয়।

এটাই আমার কাছে ভয়ের ব্যাপার যে সুন্দর মানুষদের সময়টা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। দুটো বিষয় এই সময়টাকে শেষ করছে। প্রথম বিষয় হল এই ধারণা বিশ্বাস পোষণ করা যে সুখী হবার জন্য কোন কষ্ট বা ক্ষতিকে স্বীকার করতে হবে না এবং সুখী হবার ক্ষেত্রে কেউ কম যোগ্য নয়। দ্বিতীয় বিষয়টি হল বড় বড় যুদ্ধ বলাকে অপছন্দ করা। এই অপছন্দটি নীতির মতোই সুন্দর। যুদ্ধের দ্বারা এই ধরণের বিদ্রোহকে উৎসাহিত করা হয়েছিল তখন যখন সমস্ত দেশের যুবক মানুষেরা নিয়ন্ত্রিত নিশ্চয়তার মধ্যে ছিল এবং উচ্চ নৈতিকতার নামে তারা যুবক মানুষদের একে অন্যকে হত্যা করতে প্ররোচিত করেছিল। এসব মিটে গেলে

[illegible] [illegible] তারা এই ভেবে আশ্চর্য হয়ে গেল যে, উচ্চ-ধর্ম তৈরি করে সেই [illegible] বিভেদ যা মিথ্যা ও দুর্দশাকে প্রেরণা দেয়। আমি এই ভেবে ভীত হই যে [illegible] পূর্বক মানুষেরা সময় আসার আগেই না তাদের এই ধরণের বাস্তব ও উচ্চ [illegible] নীতিতে অনিত মৌলিক মতাদর্শকে গ্রহণ করতে প্রবৃত্ত হয়ে ওঠে।

[illegible]শিত মানুষদের মূল বিষয়টি হল যে তারা সহযোগিতা মূলক ভাবে জীবনকে [illegible]ালার প্রবণতা সম্পন্ন জীবনকে ঘৃণা করে। শিশুর গোলমাল এবং সর্বোপরি [illegible] পদ্ধতি নিয়ে তাদের চিন্তা তাদের মর্যাদা আবিষ্ট করে রাখে। সংক্ষেপে [illegible]ানুষ সর্বদাই সেই ধরণের মানুষ যাদের মন নোংরা।

১০

নতুন প্রজন্ম

[বর্তমান প্রবন্ধটি রাসেল The new generation নামক একটি গ্রন্থের ভূমিকা রূপে লেখেন, যে বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদরা ও সমাজবিজ্ঞানের ছাত্ররাও লেখেন। রাশিয়া একমাত্র 'রাষ্ট্র যা পুরোনো ধর্মীয় সংস্কারের অধীনে নেই'– রাসেলের এই ধরণের মন্তব্য লক্ষ করে বলা যায় এই প্রবন্ধটি ১৯৩০ সালের দিকে রচিত। পরবর্তীকালে স্ট্যালিনের রাজত্বে যৌনতা সম্পর্কীয় নিয়মাবলী প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয় এবং এই বিষয়ে যে-সব আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাতে দেখা পশ্চিমা দেশগুলোর চেয়ে সেখানে বেশি গোঁড়া বা অবদানমূলক ব্যবস্থাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। ১৯ সালে রাসেল নিজেই সেখানকার এই উন্নতির সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।]

এই গ্রন্থের পরবর্তী পাতাগুলোতে শিশুদের মঙ্গল করা ও তাদের সা পিতামাতার সম্পর্ক সম্বন্ধে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ লেখকেরা তাদের মতো প্র করেছেন। এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে আমি সেই পথ সম্পর্কে আলো করতে প্রস্তাব করি যে পথে নব্য জ্ঞান রূপান্তরিত হয়েছে এবং এখনও রূপান্তি হয়ে চলেছে— অর্থাৎ ঐতিহ্যময় জীববিদ্যাগত সম্পর্কের পথ। আমি ক জ্ঞানের অভিপ্রায়মূলক ও উদ্দেশ্যমূলক প্রভাব সম্পর্কে চিন্তা করছি না। আমি যে ধরণের জ্ঞানের প্রভাব সম্পর্কে চিন্তা করছি প্রাকৃতিক শক্তি হিসেবে যে ভীষণভাবে কৌতূহলোদ্দীপক ও আশাতীত ধরণের ফল প্রদান করতে পা আমি নিশ্চিত যে জেম্‌স ওয়াটের কখনই মাতৃতান্ত্রিক ধরণের পরিবার প্র করবার ইচ্ছা ছিল না। যদিও এই বিষয়টিকে সম্ভবপর করে তুলে পুরুষ নি কাজের জায়গা থেকে বহু দূরে গিয়ে ঘুমোতে ভালোবাসে। গ্রামের জনসাধারণে মধ্যে এই রকম ঘটনাই দেখা যায়। শহরতলির পরিবারগুলোতে পিতার খুবই কম— বিশেষত তিনি যদি গল্‌ফ খেলেন যা তারা সাধারণত খেলে থা তার শিশুর জন্য মূল্য প্রদান করে তিনি শিশুর জন্য কি কিনছেন তা দেখা কি কষ্টকর এবং কেবলমাত্র ঐতিহ্যের দিক থেকে তিনি তার শিশুকে দর-কষাকষি বস্তু ভাবছেন কিনা তা নিয়েও সন্দেহ করা যায়। পিতৃতান্ত্রিক পরিবার স্বর্ণযুগে পুরুষ মানুষকে প্রচুর সুযোগ সুবিধা দিয়েছে। এই পরিবার তাকে দিয়েছে যে পুত্র তাকে বৃদ্ধ বয়সে দেখাশুনা করবে এবং তাকে বহু শত্রুর থেকে রক্ষা করবে। এখন যে শ্রেণীর অন্তর্গত হয়ে মানুষ বসবাস করে সেখা তারা বিনিয়োগ করে অথবা তাদের উপার্জিত সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করে বাঁ তাই এখন পিতা-পুত্র যতদিনই এক সঙ্গে থাকুক না কেন পুত্র এখন আর পি পক্ষে লাভজনক বা সুবিধাজনক নয়।

অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের ফলে যে নব্য জ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে, তা আমাদের যুগটিকে হঠাৎই যেমন জটিল করে তুলেছে অন্যদিকে তেমন কৌতূহলজনকও করে তুলেছে। পুরোনো যুগগুলোতে মানুষ প্রকৃতির অধীনে ছিল। সে দু'ধরনের প্রকৃতির অধীনস্থ ছিল আবহাওয়া ও ফসলের উর্বরতা ইত্যাদি জড় প্রকৃতির অধীনস্থ ছিল। আবহাওয়া ও ফসলের উর্বরতা ইত্যাদি জড় প্রকৃতির অধীনস্থ ছিল, অন্যদিকে সে অন্ধ উত্তেজনাকর মানবিক প্রকৃতির অধীনস্থ ছিল যা তাকে তাড়না দিত ও যুদ্ধ করাত। পুরুষত্বহীনতা বা অক্ষমতার ফলজনিত বোধ আমাদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। কর্তব্যের মধ্যে ভয়কে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে এবং নৈতিক গুণাবলী বা ধর্মের (Virtue) মধ্যে বিতৃষ্ণাকে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে ধর্ম তার কাজ করত। কতিপয় নমুনা হিসেবে এখনো যারা বিদ্যমান সেইসব আধুনিক মানুষের পরিচালক স্বতন্ত্র। বস্তুজগৎ তাদের কাছে এখন কোন স্বীকৃত বিষয় নয় যা আমাদের সঙ্গে ও প্রার্থনাপূর্ণ বিনয়ের সঙ্গে তাদের গ্রহণ করতে হবে। বস্তুত তাদের কাছে বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের জন্য একপ্রকার কাঁচামালের মতো। ক্যালিফোর্নিয়া এমন একটি স্থান যেখানে জলকে অবশ্যই আনতে হয়, কিন্তু ম্যালেরিয়া আক্রান্ত এমন একটা জায়গা যেখান থেকে জলকে সরাতে হয়। মানুষ এমন কোনো অনুমোদন করে না যা তার সঙ্গে প্রাকৃতিক শত্রুতা চালিয়ে যেতে পারে। এখানে পদার্থগত প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের লড়াইতে শয়তানের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করবার জন্য ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন নেই। যে বিষয়টি সম্ভবত এখনও খুব কম প্রশংসিত হয়েছে তা হল একই ধরণের অনিবার্য পরিবর্তন যা মানবপ্রকৃতির মধ্যে হতে শুরু করেছে। এটা এখন পরিষ্কার যে যখন ব্যক্তি তার নিজের উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে পাল্টাতে অসুবিধা বোধ করতে পারে, তখন যদি বৈজ্ঞানিক মনস্তাত্ত্বিকদের শিশুদের সঙ্গে স্বাধীনভাবে চলতে দেওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয় তবে তারা ঠিক সেইরকম ভাবে শিশুদের সুবিধাজনক অবস্থায় আনবার কার্যকলাপ করতে পারে যেরকম ভাবে ক্যালিফোর্নিয়রা মরুভূমিকে সুবিধাজনক অবস্থায় আনবার জন্য কাজ করে থাকে। যে শয়তান কেবল পাপ করায় সেই শয়তানের খেলা আর রইল না, বিষয়টি আজ (শরীরের) দূষিত অবস্থা ও অজ্ঞাতমূলক অবস্থাজাত হয়ে পড়েছে।

পাঠক এই প্রসঙ্গে পাপের ব্যাখ্যা শোনবার আশা করবেন। যদিও কোনরকম অসুবিধা নেই। পাপ হল তাই যা সেই সব মানুষদের অপছন্দের শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে (Sin is what is disliked by those control ...)।

আমি অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে যে এই অবস্থা বৈজ্ঞানিক ক্ষমতার ... অর্পণ করা হয় যা এক নতুন ও গভীর দায়িত্ব। এখনো মনুষ্যজাতি

বেঁচে আছে এই কারণে যে সে তার উদ্দেশ্যসমূহকে অর্জন করবার জন্য যতই বোকার মতো ছুটুক না কেন তাদের এমন কোন অর্জিত জ্ঞান নেই যা দিয়ে সে উদ্দেশ্যসমূহকে অর্জন করতে পারে। এখন, যখন এই জ্ঞান অর্জিত হয়েছে তখন জীবনের লক্ষ্যসমূহ সম্পর্কে প্রজ্ঞার একটি বিরাট মাত্রা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমাদের বিহ্‌ল যুগে এই প্রজ্ঞা কোথায় দেখতে পাওয়া যাবে?

উপরোক্ত প্রতিফলনগুলি এই নির্দেশ করে যে আমাদের সমস্ত প্রথা, এমনকি যেগুলো আমাদের প্রবৃত্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত সেগুলো আগে যেমন ছিল বা এখন যেমন আছে তার চেয়ে নিকট ভবিষ্যতে অনেক বেশি সুচিন্তিত ও সজাগ হয়ে উঠবে এবং তার বিশেষ প্রয়োগে শিশুদের ফিরে পাওয়া যাবে ও লালনপালন করা যাবে। নতুন পথ পুরোনো পথের থেকে অনেক বেশি ভালো হবে; আবার তা খুব সহজে খারাপও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমাদের যুগের নব্য জ্ঞান ঐতিহ্যমূলক আচরণের যান্ত্রিকতাকে এমন কঠিন আঘাত দিয়েছে যে পুরোনো ধরণের প্যাটার্ন বা আদল আর টিকে থাকতে পারেনি এবং ফলে নতুন ধরণের আদল ভালো বা মন্দ যে-কোন কিছুর জন্য অতি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল।

মানুষ তার অবিশেষজ্ঞ অতীতেও বেঁচে ছিল, যখন একটি মানুষ তার নিজের জুতো নিজে তৈরি করত আবার তাকেই নিজের কেকটি বানাতে হত। পুরুষ মানুষের কার্যকারিতা এর বাইরে চলে গেল, কিন্তু নৈতিকতার জের টেনে মহিলাদের কার্যকারিতায় অনুরূপ পরিবর্তন এলো না। শিশুদের লালনপালন করা একটা বিশেষজ্ঞতার কাজ যা করতে গেলে দরকার বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞান ও মানানসই পরিবেশ। ঘরে শিশুদের মানুষ করাটা যেন একটা ঘুরন্ত চাকার কাজ এবং তা কোনভাবেই অর্থনৈতিক নয়। জ্ঞান বিকাশের সাথে সাথে শিশু-প্রকৃতির বেশিরভাগ দিকগুলোকে ঘরের থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। এমনকি ঘরে শিশুর জন্ম হওয়ার প্রথাটিও আর রইল না। শিশু অসুস্থ হয়ে পড়লে আর সেই প্রাচীন ধারায় টোটকা চিকিৎসার ব্যবস্থা টিকে থাকল না যা আমাদের পূর্বপুরুষদের বহু শিশুকেই হত্যা করেছে। নিজের মায়ের হাঁটুর সামনে বসে আর প্রার্থনা করার প্রথা রইল না, সে জায়গায় এলো সানডে স্কুলে গিয়ে প্রার্থনার রেওয়াজ। জোর করে দাঁত তুলে ফেলার অথবা দাঁতে তার বাঁধার রেওয়াজ আর রইল না যা আমার যুবক বয়স পর্যন্ত টিকে ছিল। কিংবা দরজায় হাতল লাগানো বা দরজায় খিল লাগানো ব্যাপারটাও আর থাকল না। শিশুর জীবন সম্পর্কে প্রথম অংশটি চিকিৎসাবিদ্যাজনিত জ্ঞানের আওতায় পড়ে, দ্বিতীয়টি পড়ে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানজনিত জ্ঞানের আওতায় এবং তৃতীয়টি পড়ে শিশু-মনস্তত্ত্বের আওতায়। কিন্তু শেষে বিভ্রান্ত মা এসব কিছু বাজে কাজ ভেবে পরিত্যাগ করে এবং ইডিপাস কম্‌প্লেক্সের শাসানি শুনে তার প্রাকৃতিক স্নেহটি পাপের গন্ধে ভরে যায়।

এই পরিবর্তনের প্রধান কারণটি হল জন্ম ও মৃত্যুর হ্রাসপ্রাপ্তি। সৌভাগ্যবশত এই দুটি একই সঙ্গে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। কারণ যদি একটির পরিবর্তনে আর একটির হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটত তবে ফল হত মারাত্মক। জগতের সব সরকার সেই গীর্জাগুলোর সঙ্গে মিলে এই ধ্বংসাত্মক কার্য করতে তাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছে যে গীর্জাগুলোর প্রভাব মানুষের দুর্দশা ও কাপুরুষতার উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। তারা উভয়ে মিলে জন্মের হার হ্রাসকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে যা মৃত্যুর হার হ্রাসের সঙ্গে সমানভাবে যুক্ত। এই বিষয়ে মানবজাতির জন্য সৌভাগ্যবশত ব্যক্তির স্বার্থপরতা তাদের সম্মিলিত নির্বুদ্ধিতার চেয়ে শক্তিশালী প্রমাণিত হতে পেরেছে। আধুনিক পরিবারের ছোট্ট আকার পিতামাতাকে তাদের শিশুর সম্পর্কে এক নতুন মূল্য— চেতনা দিয়েছে। যেসব পিতামাতার দুটি শিশু আছে তারা চায় না তাদের শিশুদের মধ্যে যে-কোন একটি শিশু মারা যাক, কিন্তু পুরোনো ধাঁচের পরিবারে যেখানে দশটা পনেরোটা ছেলেমেয়ে জন্মাতো সেখানে যত্নের অভাবে অর্ধেক সংখ্যক ছেলেমেয়েকে বলি চড়ানোটা কোন ব্যাপারই ছিল না। শিশুদের উপর আধুনিক বৈজ্ঞানিক যত্নের বিষয়টি আধুনিক ছোট আকারসম্পন্ন পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

একই সঙ্গে এই পরিবর্তন পরিবারকে শিশুর মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশের দিক থেকে কম মানানসই করে তুলেছে এবং মহিলাদের কর্মে ডুবে থাকার দিক থেকে আরও সুবিধাজনক করে তুলেছে। পরিবারের পনেরোটা শিশুর মধ্যে অর্ধেক করে মারা যাওয়ার বিষয়টি নিঃসন্দেহে একটি নিরানন্দজনক জীবনকার্য। কিন্তু যে-কোনভাবেই হোক সেখানে নিজেকে জানবার জন্য কিছুটা অবসর মিলত, সেদিকে দুটো কি তিনটে ছেলেমেয়ের পরিবারে জীবন-কার্যকে যথেষ্ট বলে ভাবা যাচ্ছে না, কিন্তু যতদিন পুরোনো ধরণের পরিবারকে ধরে রাখা হবে ততদিন জীবনের অন্যান্য দিকগুলোতে তা গভীরভাবে হস্তক্ষেপ করবে। অন্যদিকে, ছোটখাটো শিশুর পরিবারে মানুষ শিশুকে আরও বেশি বোঝা মনে করবে।

বর্তমানে যখন মানুষ উচ্চ-ভাড়ার দরুন নগরগুলো ঘিঞ্জি পরিবেশের বাস করে তখন দৈহিক নিয়ম অনুযায়ী গৃহটি শিশুদের পরিবেশের জন্য একেবারেই বাজে। যে মালী নার্সারির বাগানে চারাগাছকে লালনপালন করে সে সেই গাছদের জন্য ঠিক মাটি, ঠিক পরিমাণ আলো ও বাতাস, ঠিক পরিমাণ জায়গা ও ঠিক প্রতিবেশীদের ব্যবস্থা করে থাকে। সে গাছগুলোকে আলাদা আলাদা টবে রেখে একের পর এক তাদের লালনপালন করার চেষ্টা করে না। শহরতলীয় গৃহগুলোতে শিশুরা যতদিন থাকবে ততদিন এইরকমভাবেই শিশুদের লালনপালন করবার চেষ্টা করা হবে। শিশুরা চারাগাছের মতো। তাদের ঠিক ভাবে বেড়ে ওঠবার জন্য চাই ঠিক পরিমাণ জমি, আলো, বাতাস এবং তাদের নিজেদের মতো প্রতিবেশী। শিশুদের সেই জায়গাতেই

বড় হওয়া উচিত যেখানে কোনরকম উত্তেজনা ছাড়াই তারা পাবে স্বাধীনতা। গৃহগুলির মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ সেখানকার দৈহিক পরিবেশের মতোই বাজে। চিৎকার চেঁচামেচিকেও একটি অন্যতম বিষয় হিসেবে মনে করা যেতে পারে। বড় হয়ে যাওয়া ছেলেমেয়েরা তাদের চারপাশে নিরবচ্ছিন্ন টেসি খেলার শব্দকে সহ্য করবে এরকম আশা তাদের কাছ থেকে করা যেতে পারে না, কিন্তু একটি শিশুকে চিৎকার চেঁচামেচি করতে না দেওয়াটা এমন একটা নিষ্ঠুরতা যা তার মধ্যে ক্রোধের জন্ম দেয় যা তাকে গভীর নৈতিক দোষে দুষ্ট করে তোলে। এই একই রকম ঘটনা ঘটে যদি তাদের কোন জিনিস ভাঙতে বাধা দেওয়া হয়। যখন একটি বালক রান্নাঘরের তাকে উঠে কাচের কাপ-ডিস ভেঙে ফেলে তখন তার পিতামাতা কদাচিৎ আনন্দিত হতে পারে। অথচ তার এই ধরণের কার্যকলাপ তার দৈহিক বিকাশের জন্য একান্ত প্রয়োজন। যে পরিবেশ শিশুর জন্য তৈরি সেখানে এই রকম প্রাকৃতিক এবং স্বাস্থ্যকর ভাবাবেগকে করাবার কোন প্রয়োজন নেই।

পিতামাতার দৃষ্টিকোণে মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন অনিবার্যভাবে বৈজ্ঞানিক ও অর্থনেতিক বিবর্তনের জন্য ঘটেছে যা পরিবারকে প্রভাবিত করে। নিশ্চয়তা ও চেতনার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য প্রমাণিত হতে পারে এবং এক্ষেত্রে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার দক্ষতা বারবার সংগঠিত ও হিংস্র যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তাকে বাড়িয়ে তুলবে বাড়তি জনসংখ্যাকে কমিয়ে আনবার উপায় হিসেবে।

এই কারণে, যদি রাষ্ট্রকে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হতে হয় তবে রাষ্ট্রের আলোকিত হওয়াটা একান্তভাবে প্রয়োজন। কিন্তু রাষ্ট্র একা এই কাজটি করতে পারবে না, তবে বেশিরভাগ মানুষ যখন পুরোনো কুসংস্কারগুলোকে সংরক্ষণ করা জোর করে বন্ধ করে তখন ব্যাপারটি সম্ভব হবে। সব থেকে বেশি আলোকিত মানুষেরা একটি অবাস্তব জগতে বাস করে এবং সেই জগৎ তাদের সীমিত বন্ধুবান্ধবের মধ্যে আবদ্ধ। তারা কল্পনা করে নেয় যে জগতের সবটাই প্রায় আলোকিত তবে কতিপয় অবাস্তব মানুষ এখনও অনালোকিত রয়ে গেছে। যেখানে তথাকথিত নৈতিক বিষয়গুলো যুক্ত সেখানে বাস্তব রাজনীতি ও আইন পরিচালনা সম্পর্কে অল্প অভিজ্ঞতা সেইসব মানুষের জন্য যথেষ্ট লাভজনক হতে পারে যেসব মানুষ শিশুপ্রকৃতি সম্পর্কে বা অন্যান্য বিষয়ে যৌক্তিক মতামত পোষণ করে থাকেন। আমি সাহসের সঙ্গে বলতে পারি যে রাশিয়ার বেশিরভাগ যুক্তিবাদীদের চেয়ে যুক্তিবাদের বিস্তৃত জনপ্রিয় প্রচারকার্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ধরে নেওয়া যাক পরিবারপ্রথা এবং শিশুদের জন্য যুক্তিগতভাবে পরিচালিত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ভেঙে গেছে, তাহলে তখনও প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য অন্য কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে আরও কিছুটা এগিয়ে যাওয়া একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়বে। যেসব মহিলারা জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে অভ্যস্ত এবং যারা নিজেদের জন্য কোন

ধারণ করতে চান না তারা গর্ভধারণ কালের অস্বস্তি এবং শিশুর জন্ম দেওয়ার ব্যথা সহ্য করার ইচ্ছা খুবই কম রাখেন। ফলস্বরূপ, ভবিষ্যতে জনসাধারণকে ধরে রাখার গর্ভধারণের বিষয়টি একটি খরচসাপেক্ষ পেশায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা স্বাভাবিকভাবেই এসে যাবে। যদিও এই পেশাটি সব মহিলা বা সংখ্যাগরিষ্ঠ মহিলারা গ্রহণ করবে না, কেবলমাত্র নির্দিষ্ট শতাংশ মহিলারা জন্ম দেওয়ার বিষয়ে সম্পূর্ণ উপযুক্ততার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ উক্ত পেশা গ্রহণ করবে। কিন্তু এই বিষয়ে তাদের কাছে সন্তানের উপযুক্ততার পরীক্ষায় পিতাকে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং তারা কত শতাংশ সন্তান গঠন করতে চাইবে সেটা একটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু সে সম্পর্কে কথা বলার জন্য আমাদের এখন ডাকা হয়নি। খুব তাড়াতাড়ি উপযুক্ত পরিমাণ নির্দিষ্ট করাটা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে, যেহেতু জন্মের হার হ্রাসের দিকে থাকলে, জনসংখ্যার বাড়ও কমবে। অন্যদিকে, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী জনগণ গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সমস্যাকর হয়ে উঠবে। যদি চিকিৎসাবিদ্যা ও ওষুধপত্র মানুষকে বেশি বছর বাঁচিয়ে রাখতে সফল হত তবে গোষ্ঠীগুলি লাভের বদলে সমস্যাকাতর হয়ে উঠত।

শিশুদের গড়ে তোলার বিষয়ে যৌক্তিক মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে মনুষ্যজাতির যে আশা করা যেতে পারে তা অসীম। যৌনতার বিষয়টি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। শরীরের বিশেষ কিছু অংশ সম্পর্কে তাদের শিশুদের কুসংস্কারগত আচরণ করানো হয়ে থাকে এবং বিশেষ কিছু কথাবার্তা বা চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে তাদের ভয় পাবার শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে এবং ওই একই ধরণের শিক্ষা দেওয়া হয় বিশেষ খেলা সম্পর্কে যা প্রকৃতি তাদের খেলতে উৎসাহিত করে থাকে। এর পরের কারণটি ঘটে তা হল যখন শিশুটি বড় হয় তখন সে প্রমের কোন পথ কঠিন ও কদর্য হয়ে দাঁড়ায়। সমগ্র ইংরেজি ভাষাভাষী লোকেরা তাদের শৈশব থেকেই সুখী বিবাহে অসমর্থ হতে শেখে। সেখানে শিশুরা প্রাপ্তবয়স্কদের কোন কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করবার সুযোগ পায় না বা পর্যবেক্ষণ করে তারা সেরকম কার্যকলাপ করবার চেষ্টা করবে এবং তা করবার ক্ষেত্রে বাধা পাবে। ফলে পরবর্তীকালে তারা পরম ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার থেকে যথার্থ প্রতিযোগিতায় অংশ স্থানান্তরিত হবে তা সহজেই অনুমেয়।

পাপের ধারণা বহু শিশু ও যুবক-যুবতীকে আঁকড়ে বসে থাকে এবং প্রায়শই তাদের জীবনে তাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে এবং সেইসব বিকৃতির উৎস হয়ে থাকে যা তাদের জীবনে কোন ধরণের কার্যকরী উদ্দেশ্যকে সংঘটিত করে না। পাপের ঘটনা ঘটে সম্পূর্ণভাবে যৌনতার বিষয়ে প্রথাগত নৈতিক শিক্ষার জন্য। যৌনতা একটি খারাপবস্তু যা সুখী প্রেমকে অসম্ভব করে তোলে এই ধরণের মনোভাবসম্পন্ন পুরুষ যে-সব মহিলাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে সেইসব

মহিলাদের ঘৃণা করতে শেখায় এবং কখনও কখনও তাদের সঙ্গে তারা নি
আচরণও করে ফেলে। অধিকন্তু যখন যৌনতাকে রোধ করা হয় তখন
জটিলতা যৌনভাবাবেগেরে উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় তা মানুষ
ভাবপ্রবণ বন্ধুত্ব, ধর্মীয় উদ্দীপনা, উচিত অনুচিত প্রভৃতির দিকে ঠেলে দেয়
বুদ্ধিগত আন্তরিকতার অভাব ঘটায় এবং যা বাস্তব বোধও বুদ্ধির দিক থে
অনিষ্টকর। শৈশবে যে নৈতিক শিক্ষার অত্যাচার সহ্য করতে হয় তার থেকে
পরবর্তীকালে নিষ্ঠুরতা, বোকামি, অসমর্থতা প্রভৃতির জন্ম হয় যা সংগতি
ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনিষ্টকর। এছাড়াও অন্যান্য আরও অনেক ধরণে
গোলমাল এর থেকে জন্ম নেয় খুব সহজ সরল ভাষায় বলা যেতে পারে
যৌনতায় কোনরকম নোংরামি নেই এবং এই বিষয়ে প্রথাগত আচরণ কোন অর্থ
রাখে না। আমি বিশ্বাস করি যে আর কোন বিষয় মানুষের দুর্দশা ঘটাবার ক্ষে
এতটা বেশি শক্তিশালী নয়, এই বিষয়টি সরাসরি নিরবচ্ছিন্নভাবে একের পর এ
অনিষ্টসাধন করে। শুধু তাই নয়, এটি মানুষের মমতাবোধ, স্নেহ প্রভৃতির পথ
রুদ্ধ করে দাঁড়ায় যার দ্বারা সে মানুষের উপর বিভিন্ন প্রতিকারযোগ্য অশুভ ক
প্রভাব অর্থাৎ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, জাতিভিত্তিক অত্যাচারের হাত থে
মানুষকে সারিয়ে তুলতে পারে যেগুলোর দ্বারা মানবতা অত্যাচারিত।

এইসব কারণে শিশু-মনস্তত্ত্ব বিষয়ক সেইসব গ্রন্থসমূহের খুবই প্রয়োজন
উক্ত জ্ঞানের প্রসার ঘটাবে এবং উক্ত বিষয়ে যৌক্তিক আচরণের শিক্ষা দি
পারবে। আমাদের এই সময়টাতে এক ধরণের দৌড়-প্রতিযোগিতা চলছে রা
ক্রমবর্দ্ধমান শক্তির বৃদ্ধি ও কুসংস্কারের শক্তির ক্রমবর্দ্ধমান হ্রাসের মধ্যে। শি
সঙ্গে সম্পর্কের দিক থেকে রাষ্ট্রের ক্ষমতাসমূহ যে বেড়েছে তা অনিবার্য ছিল। নি
যদি এই ক্ষমতা সীমার বাইরে চলে যায় তবে কুসংস্কার সংখ্যাগরিষ্ঠদের নিয়
করবে এবং কুসংস্কারহীন সংখ্যালঘিষ্ঠ মানুষ রাষ্ট্রীয় প্রচারকার্যের দ্বারা চু
যাবে, ফলে যে-কোন গণতান্ত্রিক দেশে নতুন করে কোন প্রতিবাদ গড়ে উঠবে না
আমাদের সমাজ ক্রমশই সামগ্রিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠছে, ফলে যে-কো
দিকে কোনরকম সংস্কার অন্যান্য দিকেও পরিবর্তন আনতে বাধ্য এবং কো
সংস্কারই আর বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে তোলার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু আমি মনে করি
কোন যুগের থেকে আমাদের যুগটা শিশুকে নিয়ে অনেক বেশি কাজ ক
সহৃদয়ভাবে ইচ্ছুক এবং আমরা যদি বুঝতে পারি যে প্রথাগত নৈতিক শিক্ষা
মানসের পক্ষে যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তবে আমরা সেইরকম চাহিদার
করতে পারি যে চাহিদার ফলে খুব তাড়াতাড়ি যন্ত্রণাদায়ক কারণের
বৈজ্ঞানিক ও সহৃদয়কর কোন প্রতিকার করা যাবে।

১১

আমাদের যৌনতামূলক নীতিসমূহ

(প্রথম প্রকাশ ১৯৩৯ সালে)

মানবজীবনের অন্যান্য যে-কোন উপাদানের চেয়ে যৌনতাকে বেশির ভাগ মানুষ অযৌক্তিকভাবে দেখে থাকে। গণহত্যা, মহামারী, উন্মত্ততা, সোনা, মূল্যবান রত্ন— এইসব বস্তু, বস্তুত যৌনভাবাবেগমূলক আশা ও ভয়ের বিষয়— যা এখনও চলছে। অতীতেও চলেছিল পৌরাণিক কাহিনী বা ঘটনার মধ্য দিয়ে অথবা কোন কুয়াশাচ্ছন্ন যাদুর মধ্য দিয়ে। কিন্তু এখানে সেখানে কিছু জায়গা ছাড়া সব জায়গায় যুক্তির সূর্য উঠে সেই কুয়াশাকে দূর করে দিল। যৌনতার অঞ্চলে যে ঘন মেঘ জমে ছিল তা স্বাভাবিক ছিল কেননা যৌনতা মানবজীবনের সব চেয়ে ভাব-বিহ্বল অংশ।

যদিও বর্তমানে এই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে আসছে যে আধুনিক জগতের অবস্থা এমন ভাবে কাজ করছে যাতে যৌনতার প্রতি আচরণ ও মনোভাব পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কি ধরণের পরিবর্তন বা পরিবর্তনসমূহ সে ঘটাবে সে সম্পর্কে নিশ্চিত করে কেউ কিছু বলতে পারবে না। কিন্তু এটা লক্ষ্য করা সম্ভব যে এখন কিছু শক্তি বা বল এই বিষয়ে কাজ করছে এবং এর ফলে সামাজিক কাঠামোতে কি ধরণের ঘটনা ঘটবে তা নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব।

মানব-প্রকৃতি যতদূর জানা যায় তার ভিত্তিতে বলা যায় এমন কোন সমাজ গঠন একেবারে অসম্ভব যেখানে বিবাহের বাইরে যৌন মিলন ঘটবে না। এর জন্য যে-সব শর্ত একান্ত প্রয়োজন তা বর্তমান জীবনে কোনভাবেই মেনে চলা সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয় এবং সেই শর্তসমূহই বা কি— আসুন সে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করি।

যে অঞ্চলে কতিপয় প্রতিবেশী বসবাস করে সেখানে একবিবাহ প্রথা কার্যকরী করে তোলার ক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করা গেলেও তা অচলতার সৃষ্টি করে। যদি কোন এক ব্যক্তি কখনও বাড়ি থেকে না বেরোয় এবং নিজের স্ত্রী ছাড়া কখনও অন্য কোন মহিলাকে দেখতে না পায়, তাহলে তার পক্ষে বিশ্বস্ত হওয়াটা অনেক সোজা। কিন্তু যদি সে তার স্ত্রী ছাড়া বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা করে অথবা জনবহুল কোন শহরতলীতে বসবাস করে তা হলে সমস্যাটি সমানুপাতিকভাবে সমস্যাসঙ্কুল হয়ে দাঁড়াবে। একবিবাহের পক্ষে সব থেকে সাহায্যকারী বিষয়টি হল কুসংস্কার। যারা বিশ্বাস করে যে 'পাপ' অনন্ত শাস্তির পথ সৃষ্টি করে, আশা করা যায় যে তারা পাপকে এড়িয়ে চলবে এবং কিছুদূর পর্যন্ত তা এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করবে, কিন্তু যতটা আশা করা যেতে পারে ততটা এড়িয়ে চলতে পারবে

না। জনতার সমর্থন মানেই পুণ্য। যেমন কৃষিজীবী সমাজ, যেখানে একজন মানুষ যা যা করে তা সবই তার প্রতিবেশীরা জানতে পারে, সেক্ষেত্রে যা-কিছু প্রথার দিক থেকে নিন্দনীয় তাকে এড়িয়ে চলার শক্তিশালী কারণসমূহ তার থাকে। কিন্তু সঠিক আচরণের জন্য সমস্ত কারণসমূহ আগে যতটা প্রভাবশালী ছিল ততটা প্রভাবশালী আর রইল না। বিচ্ছিন্নভাবে অতি অল্প মানুষের মধ্যে ছাড়া সমস্ত মানুষের মধ্যে থেকে নরকের আগুনের প্রতি বিশ্বাস চলে গেল এবং একটা বড় শহরে কেউই জানে না তার প্রতিবেশী কি করে। এইজন্য আধুনিক শিল্পবাদের উত্থানের আগে তারা একবিবাহের প্রতি যতটা অনুরাগী ছিল আর যে তা রইল না তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

যদিও বলা যেতে পারে নৈতিক নীতিসমূহের প্রতি সজাগ থাকার ক্ষেত্রে ব্যর্থ জনতার সংখ্যা বাড়তে থাকল বলেই আমাদের জীবনের নৈতিক মানসমূহ বদলে গেল। আমাদের বলা হয়ে থাকে যে যারা পাপ করে তাদের জানা উচিত বা ভাবা উচিত যে তারা পাপ করে এবং আমাদের এও বলা হয়ে থাকে যে নৈতিক উপদেশ বা আইনসমূহ মেনে জীবনে চলাটা খুবই দুষ্কর। উত্তরে আমি বলব যে ভালো বা মন্দের প্রশ্নটা নির্ভর করবে মানুষ সুখী হতে পারছে কি পারছে না তার উপর। বহু প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ সেই সমস্ত জিনিস বিশ্বাস করে থাকে যা তাদের শৈশবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল এবং যখনই তাদের জীবন রবিবারের প্রার্থনা-সভায় যাবার সময় করে উঠতে পারে না বা তার সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন হতে পারে না তখনই তারা তাদের হৃদয়ে নিজেদেরকে পাপী বলে অনুভব করে থাকে। ক্ষতিটা কেবল আত্মজ্ঞান ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ও আত্মজ্ঞানবিহীন ও শিশুসুলভ ব্যক্তিত্বের মধ্যেই একটা ব্যবধান সৃষ্টি করে না, উপরন্তু প্রথাগত নৈতিকতার ভালো দিকগুলো অচল দিকগুলোর জন্য দুর্নাম কুড়োয় এবং এর ফলে মনে করা হয় যে যদি ব্যাভিচারিতা ক্ষমার যোগ্য হয় তবে আলস্য, অসততা, দয়ামায়াহীনতাও ক্ষমার যোগ্য। এই ভয়ঙ্কর দিকটি সেই ব্যবস্থা থেকে অবিচ্ছেদ্য যে ব্যবস্থা যুবকদের শিক্ষা দিয়ে থাকে এবং সেই সব যুবককে পরিণত বয়সে বহুসংখ্যক বিশ্বাসকে নিশ্চিতভাবে পরিত্যাগ করতে হয়। তাই সামাজিক অর্থনৈতিক বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় তারা ভালোগুলোকেও মন্দের সঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

ঈর্ষামূলক ভাবাবেগ ও বহুবিবাহের প্রতি আগ্রহমূলক ভাবাবেগের দ্বন্দ্ব থেকে কাজ চালানো যায় এমন যৌনমূলক নীতিতে পৌঁছনোর বিষয়ে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। প্রবৃত্তিগত দিক থেকে দেখতে গেলে ঈর্ষা নিঃসন্দেহে খুবই মামুলী ব্যাপার। যার স্ত্রী অবিশ্বাসিনী, সমাজে সেই মানুষটিকে হাস্যাস্পদ হবার যোগ্য বিষয় হিসেবে ভেবে নেওয়া হয়। এর ফলে যেখানেই তার স্ত্রী সম্পর্কিত সেখানেই

[illegible] এমনকি স্ত্রী সম্পর্কে কোন আকর্ষণ না থাকলেও সে এইরকম ঈর্ষা [illegible] করে থাকে। ঈর্ষা সম্পত্তি সম্পর্কীয় জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত, তাই যেখানে এই [illegible] বিষয়টি যত কম সেখানে ঈর্ষা ব্যাপারটিও তত কম। প্রচলিত রীতি [illegible] বিশ্বস্ততাকে যেভাবে আশা করা হয়ে থাকে তা যদি না করা হয় তবে [illegible] ব্যাপারটিও হ্রাস পাবে, যদিও মানুষ যতটা মনে করে তার থেকেও ঈর্ষাকে [illegible] কমিয়ে দেওয়া সম্ভব। যতদিন পিতাদের অধিকার ও কর্তব্যসমূহ বজায় [illegible] ততদিন ঈর্ষার একটি নির্দিষ্ট সীমা থাকে। যতদিন এই ব্যাপারটি বজায় [illegible] ততদিন পুরুষমানুষ এই বিষয়ে অবশ্যই নিশ্চয়তা চাইবে যে তারা তাদের [illegible] সন্তানের পিতা। যদি মহিলাদের যৌন-স্বাধীনতা পালনের অধিকার দেওয়া [illegible] তাহলে পিতাদের গুরুত্ব ম্লান হয়ে যায়, ফলে স্ত্রী আর বেশি দিন তার স্বামীর [illegible] আশা করতে পারে না। যথাসময়ে এই ধরণের ঘটনাই ঘটবে। কিন্তু সেটা [illegible] মৌলিক সামাজিক পরিবর্তনের ফলেই ঘটবে এবং ভালো বা মন্দ যে-কোন [illegible] হ'ক এর ফল অনিশ্চিত।

[illegible] মধ্যে, যদি বিবাহ ও পিতৃত্বকে সামাজিক প্রথা হিসেবে টিকে থাকতে হয় [illegible] বিশৃঙ্খলতা ও সারা জীবন ধরে একবিবাহের মধ্যে একটি বোঝাপড়ামূলক স্থান [illegible] প্রয়োজন। কিন্তু কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে সব থেকে সঠিক বোঝাপড়াটা কি [illegible] সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ নয়, কেননা সময় ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে [illegible] ও জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহের বিশ্বাসযোগ্যতার উপর সিদ্ধান্ত নেবার বিষয়টি [illegible] করে। স্পষ্টতার উপর নির্ভর করেই কিছু বলা যেতে পারে।

[illegible] প্রথমে শারীরবিদ্যাগত ও শিক্ষাগত উভয় দিক দিয়েই এটি কখনই কাম্য [illegible] [illegible] কুড়ি বছরের আগেই মহিলাদের বাচ্চা-কাচ্চা হবে। এইজন্য আমাদের [illegible] [illegible] এমন হওয়া উচিত যাতে এই ধরণের ঘটনা একদম না ঘটে।

দ্বিতীয়ত, পূর্ব যৌন অভিজ্ঞতা ছাড়া, পুরুষ কি মহিলার দৈহিক আকর্ষণ ও [illegible] [illegible] সফল করে তোলবার জন্য যে সহানুভূতির একান্ত প্রয়োজন তা বুঝতে [illegible] তবে এরকম আশা করা যায় না। অধিকন্তু নিয়ম অনুযায়ী অর্থনৈতিক [illegible] [illegible] পুরুষকে বিবাহ রোধ করতে বাধ্য করে এবং এটাও আশা করা যায় না যে [illegible] কুড়ি থেকে তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত কুমার থেকে যাবে। শারীরবিদ্যাগত দিক [illegible] [illegible] তারা এরকম করবে তা আশা করা যায় না, এর থেকে এটা ভালো যদি তাদের [illegible] [illegible] ক্লাসের মেয়েদের সঙ্গে তাদের অস্থায়ী সম্পর্ক থাকে এবং সেই সম্পর্ক [illegible] [illegible] পেশাগত হওয়া উচিত নয়, কেননা সেই সম্পর্কের উদ্দেশ্য টাকা নয় [illegible]। এই উভয় কারণে যুবক অবিবাহিত মানুষের এই বিষয়ে যথাযোগ্য স্বাধীনতা [illegible] [illegible] উচিত যা শিশুদের বেলায় এড়িয়ে চলা দরকার।

তৃতীয়ত, বিবাহ-বিচ্ছেদ কোন পক্ষকেই দোষারোপ না করে করা সম্ভব এবং কোনভাবেই বিষয়টিকে ঘৃণার চোখে দেখা উচিত নয়। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের যে কোন কারুর ইচ্ছায় একটি বন্ধ্যা বা শিশুহীন বিবাহিত জীবনের সমাপ্তি টানা যায় এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে যে-কোন বিবাহের সমাপ্তি টানা যায় এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে যে-কোন বিবাহের সমাপ্তি হওয়া দরকার— যদি প্রয়োজন হয় তবে এর জন্য এক বছরের নোটিশ উভয় পক্ষ থেকেই দেওয়া যেতে পারে। যদিও বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যাপারটি অন্যান্য কারণেও ঘটা সম্ভব— যেমন পাগলামি, মানসিক বিষণ্ণতা, নিষ্ঠুরতা এবং এরকম আরও কারণে, কিন্তু পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে করাটাই স্বাভাবিক কারণ।

অর্থনৈতিক দোষ থেকে যৌনতাকে মুক্ত করতে সম্ভবপর সব কাজই করা উচিত। বর্তমানে স্ত্রীরা পতিতাদের মতোই তাদের যৌন সৌন্দর্যকে বিকিয়ে বাঁচে, এমনকি অস্থায়ী স্বাধীন সম্পর্কের ক্ষেত্রেও পুরুষ উভয়পক্ষের খরচ চালাবে এটাই আশা করা হয়ে থাকে। এর ফলে যে ঘটনাটি ঘটে তা হল টাকা ও যৌনতার মধ্যে একটি হীন সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং এইরকম ক্ষেত্রে মহিলাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনরকম দয়ামায়ামূলক জায়গা থাকে না। যৌনতা চার্চের দ্বারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত হলেও কখনও তা পেশা হওয়া উচিত নয়। ছেলেমেয়ে দেখাশুনো করা, ঘরদোর সামলানো, রান্নাবান্না করা ইত্যাদির জন্য মহিলাদের বেতন দেওয়াটা উচিত, কিন্তু কেবলমাত্র পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক রাখার জন্য টাকা নেওয়াটা ঠিক নয়। কোন মহিলা একবার যখন ভালোবেসেছে বা কোন পুরুষের ভালোবাসা পেয়েছে তখন দুজনের কারুর দিক থেকে তা থেমে গেলে কেবলমাত্র টাকার অনুদানের উপর নির্ভর করে তার জীবন চিরদিন চলতে পারে না। একজন মহিলা অবশ্যই পুরুষের মতোই তার জীবিকা অর্জনের জন্য কর্ম করবে এবং একজন অলস স্ত্রী আবশ্যিকভাবে আর সম্মানের যোগ্য থেকে না।

(২)

বর্তমান যৌন আচরণের গৃহীত নীতির উদ্ভবের মধ্যে খুবই স্বতন্ত্রভাবে দুটি আদিম ভাবাবেগ অংশগ্রহণ করে থাকে। এদের মধ্যে একটি হল বিনয় আর অপরটি হল ঈর্ষা। যে-কোন আকারে ও যে-কোন মাত্রায় বিনয় মানবজাতির মধ্যে প্রায় একটি চিরন্তন বিষয় এবং এটি এমন একটি ধর্মীয় মানা-না-মানার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে যাকে নির্দিষ্ট কিছু আকার ও শিষ্টাচারবিধি অনুযায়ী অবশ্যই ভাঙতে হবে অথবা কিছু স্বীকৃত ভদ্র-আদব কায়দার সঙ্গে সঙ্গতি সম্পন্ন হতে হবে। না সব কিছু দেখা যায়, না সব ঘটনাকে উল্লেখ করা যায়। এটি ভিক্টোরীয় যুগের আবিষ্কার বলে কিছু আধুনিক মানুষ মনে করেন বটে, তবে তা নয়। বিপরীতভাবে বলতে

...ল, নৃতত্ত্ববিদরা প্রাচীন বর্বরদের মধ্যে বিনয়ের পরাকাষ্ঠাকে বিশদ আকারে ...ক্ষা করেছেন। মানব-চরিত্রের গভীর মূলে অশ্লীলতার কল্পনা আছে। আমরা এর ...রকে যেতে পারি বিপ্লব-প্রীতির মধ্য দিয়ে অথবা বৈজ্ঞানিক উৎসাহের দ্বারা, ...কেনা বায়রনের মতো এটাকে খারাপ বা বাজে বলে ভাবার ইচ্ছার দ্বারা, কিন্তু ...ভাবার চেষ্টা করেও আমরা আমাদের স্বাভাবিক ভাবাবেগ থেকে তাকে কখনই ...ছে ফেলতে পারি না। কোন একটি গোষ্ঠীতে নিঃসন্দেহে কোনটি কুৎসিত বলে ...গণ্য করা হবে তা নির্ণয় করে সেই গোষ্ঠীর রীতির উপর। কিন্তু এমন কিছু ...নীতি থাকে যেগুলো মানব-প্রকৃতির উৎসের সঙ্গে চরমভাবে জড়িত, তাই ...গুলোকে শুধুমাত্র রীতি বলে ছেড়ে দিলেই হবে না। প্রায় সমস্ত সমাজেই ...তা উদ্রেককারী অশ্লীল গ্রন্থ ও যৌন আবেদনের জন্য শরীর প্রদর্শন ...পারটিকে এক ধরণের অপরাধ বলে মনে করা হয়, কিন্তু একমাত্র তখনই ...পারটিকে ছেড়ে দেওয়া হয় যখন তা ধর্মীয় উৎসবের আকার ধারণ করে, যা ...শই সমস্ত সমাজে ঘটে থাকে।

...তাবাদ— বিনয়ের সঙ্গে যার মনস্তাত্ত্বিক সংযোগ থাকলে থাকতেও পারে ...না-ও পারে— এমন একটি ভাবাবেগ যা সভ্যতার একটি বিশেষ স্তরে পৌঁছবার ...ই হয়তো উত্থিত হয়েছে এবং তার পরে তা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ওল্ড ...মেন্ট বা পুরোনো বাইবেলের গ্রন্থগুলোতে এই বিষয়টিকে দেখা যায়নি। কিন্তু ...কালে অ্যাপোক্রিফা ও নব্য বাইবেল প্রভৃতি গ্রন্থে তা দেখা যায়। একইভাবে ...পুরোনো যুগে বিষয়টিকে খুব কমই দেখা গেছে, কিন্তু যত দিন গেছে তত তা ...উঠেছে। ভারতবর্ষে খুব প্রাচীন যুগে বিষয়টি গড়ে উঠেছিল এবং তা খুবই ...তা অর্জন করেছিল। আমি বিষয়টির উৎস সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে ...ই কিন্তু বিষয়টি যে বেশিরভাগ সভ্য জাতির মধ্যে একটি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবাবেগ ...কিছুটা জায়গা দখল করে নিতে পেরেছে সে সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ। বিনয় ...টির ধরন বোঝা যায় যখন আমরা কোন সম্মানিত ব্যক্তি, বিশেষ করে যে ব্যক্তি ...পবিত্রতার গুণে গুণান্বিত, তাকে কোন প্রেমের খেলার সঙ্গে যুক্ত ভাবতে ...হই, কেননা যে-কোন মর্যাদার উচ্চতম মাত্রার ক্ষেত্রে বিষয়টি কখনই ...নয়। রক্তমাংসের দাসত্বের থেকে আত্মাকে মুক্ত করার ইচ্ছা জগতের বহু ...ধর্মকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে এখনো ...একটা শক্তিশালী জায়গা দখল করে রেখেছে।

...আমি বিশ্বাস করি যে ঈর্ষা বিষয়টি যৌনতামূলক নৈতিকতার সম্পর্কে ...প্রভাবশালী কারণ। ঈর্ষা প্রবৃত্তিগত ভাবেই ক্রোধের উদ্রেক করে এবং ...যুক্তিসংগত কারণেই নৈতিক অসন্তুষ্টির সৃষ্টি করে। সভ্যতার বিবর্তনের

কোন একটি প্রাচীন স্তরে পুরুষ জাতির মধ্যে পিতৃত্বকে নিশ্চিত করার আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে পুরোপুরিভাবে প্রবৃত্তিগত এই উদ্দেশ্যে বা গতি সঞ্চারের বিষয়টি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এই বিষয়ে নিশ্চয়তা ছাড়া পিতৃতান্ত্রিক পরিবার গড়ে ওঠা অসম্ভব ছিল এবং পিতৃত্ব তার সমস্ত রকমের অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব পালন করেও কখনও সামাজিক প্রথাসমূহের ভিত্তিস্বরূপ হয়ে উঠতে পারত না। তদনুযায়ী কোন মানুষের স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তা সামান্য দূষণীয় নয়। ব্যভিচারীকে নিন্দা করার জন্য সব থেকে বড় বাস্তব কারণটি হল যে সে বিহ্বলতা বা গোলমালের সৃষ্টি করে এবং রক্তপাতও ঘটায়। স্বামীর অধিকারসমূহকে অসম্মমান করার জন্য বিরাট যুদ্ধের উদাহরণ আমরা দেখেছি ট্রয়কে দখল করার মধ্যে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অপমানও এ ধরণের ঘটনা ঘটাত, তবে তা নিতান্তই অল্প। সেই সময় স্ত্রীদের অধিকার বলে কোন কিছুই ছিল না এবং স্ত্রীদের প্রতি স্বামীদের কোন কর্তব্যই থাকত না, যদি এক স্বামী অপর স্বামীর সম্পত্তিকে সম্মান করার কর্তব্য পালন করত।

যে নৈতিক আদর্শের উপর নির্ভার করে গড়ে ওঠা মনোভাব সম্পর্কে আমরা এতক্ষণ ধরে আলোচনা করছি তার উপর ভিত্তি করে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের পুরোনো ব্যবস্থা বলতে গেলে সাফল্যই পেয়েছিল। সেখানে দমিয়ে রাখার ক্ষমতা পুরুষ মানুষের হাতেই ছিল তাই তাদের হাতে ছিল অপর্যাপ্ত স্বাধীনতা। অন্যদিকে নারী, যারা ছিল নির্যাতিত, তারা এমন দাসত্বের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল যে তাদের অসুখী মনোভাব কোনরকম আমলই পেত না। বর্তমান জগতে পুরুষের সঙ্গে সমতার যে দাবি নারী করেছে তা এক প্রয়োজনীয় নতুন ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে। এই সমতা দু'ভাবে নিশ্চিত করা যায় হয়— পুরুষমানুষ একবিবাহ প্রথায় কঠোরভাবে আবদ্ধ হ'ক যা তারা অতীতে নারীর উপর জোর করে চাপিয়ে দিত অথবা পুরুষের সঙ্গে সমভাবে নারীকেও বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে ঐতিহ্যময় নৈতিক আদর্শের বেড়াজাল থেকে মুক্তি দেওয়া হ'ক। মহিলাদের অধিকার নিয়ে আন্দোলনকারীদের বেশিরভাগ অগ্রদূতরা প্রথম পথটিকেই বেছে নিয়েছিলেন। গীর্জাও এই পথটিকে সঠিক পথ হিসেবে ধরে নিয়েছে কিন্তু দ্বিতীয় পথটি অনেক বেশি মানুষ কার্যকর পথ হিসেবে গ্রহণ করেছে, যদিও তত্ত্বগত দিক থেকে তাদের বেশিরভাগ অংশ নিজেদের আচরণ ন্যায়সংগত কিনা সে বিষয়ে সন্দিহান এবং যারা এটা বুঝতে পেরেছে যে কিছু নতুন নৈতিক নীতির প্রয়োজন তারা সেই নীতির উপদেশ বা পথ কি হওয়া উচিত তা নিয়ে মুস্কিলে পড়েছে।

অভিনবত্বের অন্য আর একটি উৎস আছে এবং তা হল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবের ফলে দুর্বল হয়ে যাওয়া যৌন জ্ঞান সম্পর্কে ধর্মীয় নিষেধসমূহ। এই

প্রথমেই হয়েছে যে রোগের মতো বিভিন্ন ধরণের অনিষ্টকর ঘটনার সঙ্গে ততদিন কার্যকরভাবে এঁটে ওঠা যাবে না যতদিন না এ বিষয়ে আগের চেয়ে অনেক বেশি খোলাখুলিভাবে বলা যাবে এবং এটা দেখা যাবে যে যৌনভাব ও অজ্ঞতা ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারে অনেক বেশি ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করবে। সমাজবিদ্যা ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ মনোযোগী ছাত্রদের যৌন ব্যাপারে নীরব না থাকার পরামর্শদান করে। অনেক বাস্তববাদী শিক্ষাবিদ বাচ্চাদের সঙ্গে থাকার অভিজ্ঞতা থেকে ওই একই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। মানব-আচরণ সম্পর্কে যাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তাদের পক্ষে কোন কার্যকে 'পাপ' বলে চিহ্নিত করাটা অসম্ভব বলে পড়ে। তারা মনে করেন যা আমরা করি তার উৎস আমাদের বংশধারা, আমাদের শিক্ষা ও আমাদের পরিবেশের মধ্যে নিহিত, তাই তার পেছনের কারণগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে বন্ধ করতে হবে, তাকে দোষারোপ বা নিন্দা করে নয়। এইভাবেই সমাজের ক্ষতিসাধন করাটাকে রোধ করা যেতে পারে।

এই কারণে, যৌন আচরণ সম্পর্কে নতুন জ্ঞানের খোঁজ করতে গিয়ে আমরা যেন প্রাচীন কালের অযৌক্তিক সেইসব ভাবাবেগের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পড়ি যে ভাবাবেগের দ্বারা পুরোনো নৈতিক নিয়ম গড়ে উঠেছিল। যদিও কোন দৈবাৎ কারণে আমরা এটা মনে করতেই পারি যে এইসব নীতিসমূহের মধ্যে এমন কিছুময় কিছু ছিল যার জন্য সম্ভবত দুর্বল হয়ে গেলেও সেগুলো সমস্যার সমাধানগুলোর মধ্যে রয়ে গেছে। ধনাত্মকভাবে যে কাজটা আমরা করতে পারি তা হল আমরা নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারি কোন্ নৈতিক নিয়মসমূহ মানবিক সম্পর্কসমূহকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। কিন্তু একটা কথা আমাদের মনে রাখতেই হবে যে নিয়ম যাই হোক না কেন তা কখনও চিরন্তন বা সার্বজনীন হয়ে উঠবে না। নিয়মগুলির মধ্যে বাস্তবে যে কার্যকর প্রভাব থাকবে সেগুলোর সম্পর্কে আমাদের বিবেচনা করে দেখতেই হবে, কিন্তু তাদের সম্পূর্ণ কার্যকর প্রভাবটি দেখার পর আমাদের বিবেচনা করে দেখার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

(৩)

আবার সেই যৌন বিষয়ের জ্ঞানের প্রশ্নে আসা যাক যা সেই প্রাচীন যুগ থেকে চলে আসছে এবং আমাদের বিভিন্ন সমস্যার সঙ্গে যুক্ত সেই প্রশ্নগুলি নিতান্তই সরল ও এমন যা সন্দেহপূর্ণ নয়। শিশুদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কোনভাবে তাদের থেকে গোপন করে যাওয়ার পেছনে কোন সঠিক যুক্তি নেই। তাদের কৌতূহলপ্রসূত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সরাসরিভাবে দেওয়া দরকার। যা তাদের ভাল লাগে তাদের মনকে আকর্ষণ করে, যেমন মাছ ধরার অভ্যাসের বিষয়ে

প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতোই যৌনতা সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর সরাসরিই বলা দরকার। কিন্তু উত্তর দিতে গিয়ে যেন কোন রকম ভাবাবেগ না থাকে, কেননা ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষমতা থাকে না। মাথার উপর দিয়ে চলে যাওয়া উচ্চ কথাবার্তা বোঝার মতো কোন ঘটনা তারা দেখে উঠতে পারে না। মৌমাছি ও ফুলের মধ্যে ভালোবাসার কথা বলে শুরু করাটা ভুল হয়ে যাবে। জীবনের বাইরে থেকে জীবনের ঘটনাসমূহকে ব্যাখ্যা করতে যাওয়ার কোন কারণ নেই। শিশু যা জানতে চায় সর্বদাই এ বিষয়ে কথাবার্তা শোনে ও জানতে পারে তারা এ বিষয়ের উপর এত কথাও বলে না এবং এত চিন্তাও করে না। প্রথাগত অজ্ঞতা ও বাস্তবজ্ঞান তাদেরকে তাদের বড়দের কাছে ভণ্ডামী ও কপটতা করতে শেখায়। অন্যদিকে জীবনে যদি সত্য করে কোন অজ্ঞতা থাকে তবে তা কঠিন আঘাত ও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় ও বাস্তব জীবনের সঙ্গে মানিয়ে চলার ব্যাপারে মুস্কিল হয়ে যায়। সমস্ত ধরণের অজ্ঞতাই দুঃখজনক, কিন্তু যৌনতার মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে অজ্ঞতা ভীষণভাবে বিপজ্জনক।

যখন আমি বলি যে শিশুদের যৌনতার বিষয়ে বলা দরকার, তখন আমি এটা বলতে চাই না যে তাদের এ বিষয়ে কেবলমাত্র মনস্তাত্ত্বিক ঘটনাসমূহ বলা হোক। তাদের সেইটুকুই বলা হোক যেটুকু তারা জানতে চায়। প্রাপ্তবয়স্কদের সাত্ত্বিক করে তোলার কোন চেষ্টার দরকার নেই। অন্যদিকে, তাদের এ কথা বলাও উচিত নয় যে যৌনতা কেবলমাত্র বিবাহিত জীবনের জন্য। শিশুদের বঞ্চনা করার কোনরকম অজুহাত করা উচিত নয়। যখন কোন শিশু তার পিতামাতাকে মিথ্যা কথা বলতে দেখে তখন তারা নিজেদের মধ্যে দৃঢ়তা হারায় এবং পরে পিতামাতার কাছে মিথ্যা কথা বলাটাকে ন্যায়সংগত বলে ধরে নেয়। জোর করে শিশুদের মনে কোন কিছু ঢোকাবার কথা আমি বলছি না। কোন্‌টা সত্য নয় এ ধরণের কথা তাকে বলার চেয়ে যে-কোন বিষয়ে যে-কোন কথা তাকে দ্রুত বলে দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। মিথ্যা-ঘটনার বা সাত্ত্বিকতার যে ধারণা গড়ে ওঠে তা সঠিক পুণ্য নয়। কেবলমাত্র তত্ত্বের উপর নির্ভর করেই কথা বলা উচিত নয়, কথা বলা দরকার বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। আমি মনে করি যৌন বিষয়ে খোলাখুলি মনোভাব শিশুকে সেই বিষয়ে অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা, নোংরা ও অসম্পূর্ণ চিন্তাভাবনা থেকে বিরত করতে পারে। একমাত্র এই পথটিই আলোকিত যৌন নৈতিকতার দিকে নিয়ে যাবার জন্য অনিবার্যভাবে একটি প্রাথমিক পথ।

যেখানে প্রাপ্তবয়স্কদের যৌন আচরণের বিষয় যুক্ত সেখানে যৌন বিষয় সম্পর্কে একটি আপোসমূলক জায়গায় আসাটা খুব সহজ ব্যাপার নয়, কেননা সেখানে পরস্পর-বিরোধী দুটি শিবির ক্রিয়াশীল যারা নিজের নিজের জায়গা

[illegible]শালী। মৌলিক সমস্যাটা হল ঈর্ষান্বিত ভাবাবেগ ও যৌন বৈচিত্র্যের [illegible]। কিন্তু এটা সত্য যে দুটি ভাবাবেগের মধ্যে কোনটা চিরন্তন নয়। এমন [illegible] দেখা যায় (যদিও তা খুবই অল্প) যারা কখনই ঈর্ষান্বিত হয় না। এমন [illegible] থাকে (পুরুষের মতো মহিলাদের মধ্যেও) যারা তাদের পছন্দ করা [illegible] পাত্রীর উপর থেকে তাদের স্নেহ বা আসক্তি কখনও মুছতে পারে না। [illegible] দুই ধরণের মানুষের আচরণকে চিরন্তন করে তোলা সম্ভব হত তবে এ [illegible] গণতোষজনক নৈতিক আইন তৈরি করা সহজ হত। এটা স্বীকার করে [illegible] ভাবে যে লক্ষ্যে পৌঁছতে প্রথাসমূহের দ্বারা এই দুই ধরণের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন [illegible] সমাজীতে গড়ে তোলা যেতে পারে।

[illegible] কিছুর ভিত্তি যৌনতার নৈতিকতার দ্বারা আচ্ছাদিত আছে। কিন্তু আমি [illegible] করি না যে ততক্ষণ আমরা কোন কিছুর সম্পর্কেই খুব একটা ধনাত্মকভাবে [illegible] পারি যতক্ষণ বিভিন্ন ব্যবস্থাজাত কার্য ও যৌন বিষয়ে যৌক্তিক শিক্ষাজাত [illegible] অনেক পরিমাণে অর্জন করতে পারি। এটা পুরোপুরি পরিষ্কার যে প্রথা [illegible] বিবাহ ব্যবস্থা কেবলমাত্র শিশুদের জন্যই রাষ্ট্রকে উৎসাহিত করে। কিছু [illegible] এই ব্যবস্থাটিকে একেবারেই ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে দেখা দরকার। [illegible] পরিষ্কার যেখানে শিশুরা যুক্ত সেখানে রাষ্ট্র পিতার দ্বারা তাদের প্রতি কর্তব্য [illegible] করার জন্য উৎসাহিত হয় এবং যে কর্তব্যটি প্রধানত আর্থিক হয়ে থাকে। [illegible] ভার্জিনিয়ার মতো দেশে যেখানে বিবাহবিচ্ছেদ বিষয়টি খুব সহজ সেখানে [illegible] বিবাহবিচ্ছেদের পর শিশু মায়ের সঙ্গে চলে যায়, যার ফলে সেখানে পিতৃতান্ত্রিক [illegible] ব্যবস্থা একেবারে মুছে যেতে বসেছে। যেখানে মজদুরীনির্ভর [illegible] দায়িত্বের প্রশ্ন যুক্ত সেখানে এই বিষয়টি বেড়ে গেলে রাষ্ট্র পিতার উপর ন্যস্ত [illegible] অধিগ্রহণ করবে, ফলে যুক্তিসংগত অবস্থা ও সামর্থ্য না থাকার জন্য [illegible] বিবাহ করবার রেওয়াজটি রোধ হবে এবং সম্ভবত ধনিক শ্রেণী ও [illegible] মধ্যে ব্যবস্থাটি কেবলমাত্র প্রচলিত রীতি হিসেবে থেকে যাবে।

[illegible] আগে পুরুষ ও নারী উভয়ে যদি যৌন সম্পর্ক, বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদে [illegible], দয়া মায়া, সত্যবাদিতা ও সুবিচারকে অভ্যাস করে তবে ভালো হয়। [illegible] ধারণা অনুযায়ী যারা যৌন পবিত্রতার অধিকারী তারা প্রায়শই মনে করে [illegible] তারা সুন্দর মানুষের মতো আচরণ করার হাত থেকে মুক্ত। বেশিরভাগ [illegible] মানুষ যৌন বিষয়টির দ্বারা এতটাই আবিষ্ট থাকেন যে তারা নৈতিকভাবে [illegible] কিন্তু সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর অতি সামান্যই জোর [illegible] থাকেন।

১২
স্বাধীনতা ও মহাবিদ্যালয়সমূহ

[এই প্রবন্ধটি ১৯৪০ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয়। নিউইয়র্কের সিটি কলেজের অধ্যাপক বিচারক ম্যাক্‌গিহান রাসেলকে অনুপযুক্ত সাব্যস্ত করার কিছুদিন পরেই এই প্রবন্ধটি রচিত হয়।]

(১)

বর্তমান বিদ্যালয় সম্পর্কিত স্বাধীনতার মান সম্পর্কে আলোচনা করার শব্দটির দ্বারা আমরা কি বোঝাতে চাই সে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করে পারি। বিদ্যালয় সংক্রান্ত স্বাধীনতা বলতে যা বোঝায় তা হল সেই শিক্ষককে নির্বাচিত করা যে শিক্ষকের দক্ষতার বিচারক হবে অন্যান্য শিক্ষকেরা। একজন দক্ষ অঙ্কবিদ, পদার্থবিজ্ঞানবিদ ও রসায়নবিদ্যাবিদ অন্য অঙ্কবিদ, পদার্থবিজ্ঞানবিদ ও রসায়নবিদ্যাবিদদের দ্বারা বিবেচিত একমাত্র তাদের দ্বারাই ঐক্যসম্মতভাবে এই বিচার করা যেতে পারে।

কলেজ বা মহাবিদ্যালয় সংক্রান্ত স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যারা তারা মনে শিক্ষকদের নিজস্ব বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ছাড়াও অন্যান্য গুণ প্রয়োজন। তারা মনে করেন যে একজন শিক্ষক কখনই তাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে না যারা ক্ষমতা ধারণ করে আছে। অন্যান্য রাজনৈতিক ও নীতি অগ্রাহ্যকারী রাষ্ট্রসমূহ এই বিষয়ে পরিষ্কারভাবে কঠিন পথ অবলম্বন থাকে। কেরেন্স্কির সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালের বাইরে রাশিয়া কোনদিনও মহাবিদ্যা সংক্রান্ত স্বাধীনতা ভোগ করতে পারেনি। কিন্তু আমি মনে করি জা রাজত্বকালের থেকেও এই বিষয়ে অনেক কম স্বাধীনতা বর্তমানে সেখানে হয়ে থাকে। যুদ্ধের আগে স্বাধীনতার ক্ষেত্রে অনেক অভাব থাকলেও জার্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বিষয়ে মোটামুটিভাবে স্বাধীনতার আদর্শকে স্বীকার নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনও কিছুজন ছাড়া প্রায় সব দক্ষ পণ্ডিত মানু নির্বাসনে পাঠাবার ফল হিসেবে সবই বদলে গেছে। কিছুটা কম আকারে ইতালিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ওই একই ধরণের স্বৈরাচারিতা চলে। গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে সাধারণত এই ধরণের প্রবণতা খুবই দুঃখজনক। এই বিষয়টিকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না যে এই ধরণের প্র সেখানেও এই একই ধরনের অশুভ ঘটনার জন্ম দেবে।

বিপদ এমনই বস্তু যা গণতন্ত্র হাজার চেষ্টা করেও দূর করতে পারে গণতন্ত্র হল তাই যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ একজন একনায়কের স্বৈরাচারী হয়ে পড়ে যদি তারা তাদের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ব্যবহার একটি সভ্য গণতান্ত্রিক দেশে সংখ্যালঘিষ্ঠদের জন্য সহনশীল মনোভাব প্রয়োজনীয় উপাদান, কিন্তু বাস্তবে এই উপাদানটি যথেষ্টভাবে মনে রাখা

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ব্যাপারে সেইসব বিচক্ষণতাকে অনুসরণ করা দরকার যা বিশেষভাবে তাদের জন্যই প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা একদিকে বিশেষভাবে জ্ঞানী ও বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হবেন যার দ্বারা তারা তাদের প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে যেমন সমর্থ হবেন, অন্যদিকে সেইসব প্রশ্নের উপর আলোকপাত করতে পারবেন। বিতর্কিত বিষয়ের উপর আলোচনা করবার সময় তারা যদি নীরব ভূমিকা পালন করেন তবে যতটা পরিমাণ নীরবতা তারা পালন করবেন, ধরে নেওয়া হবে, ততটা পরিমাণে পক্ষপাতিত্ব করে তারা জনসাধারণের মঙ্গলকে বঞ্চনা করছেন। বহু বছর আগে চীনের সম্রাট সরকারের সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এই জন্য তিনি একটি পরীক্ষকমণ্ডলী নির্মাণ করেন যে মণ্ডলী সেইসব প্রখ্যাত ও জ্ঞানীগুণীদের নিয়ে গঠিত হত যারা সম্রাট ও তার সরকারের দোষ-ত্রুটি ধরিয়ে দিতে সমর্থ হত। দুর্ভাগ্যবশত সব কিছুর মতোই এই প্রথাটিও সেখানে প্রচলিত রীতিনীতির মধ্যে পড়ে গেল। পরবর্তীকালে বিশেষ কিছু বিষয় নির্ধারিত হল যার উপর তারা সমালোচনা করতে পারত। এক্ষেত্রে নৃপুংসকদের ক্ষমতা ছিলো উল্লেখযোগ্যভাবে বাধা। কিন্তু যদি তারা তাদের উপর প্রদত্ত অধিকারের বাইরে গিয়ে সমালোচনার প্রচলিত রীতি লঙ্ঘন করে কিছু করবার চেষ্টা করত তবে সম্রাট তাদেরকে হত্যা করার ব্যাপারটি ভুলে যাবার অধিকারী ছিলেন। অনেকটা একই রকম ব্যাপার আমাদের মধ্যে ঘটে। একটি বিরাট ক্ষেত্রে সমালোচনা অনুমোদনীয়। কিন্তু সেই সমালোচনা সত্যই বিপজ্জনক হয়ে ওঠে সেখানে সমালোচনাকারী বা তার ভাগ্যে শাস্তি জুটবেই।

এই দেশে মহাবিদ্যালয়ের স্বাধীনতা দুদিক থেকে বিপদগ্রস্ত। এদের মধ্যে একটি হল অভিজাত শ্রেণীর সরকার আর অন্যটি হল গীর্জাগুলি। যারা এইসব মহাবিদ্যালয়ে একচেটিয়া ও ধর্মতত্ত্বমূলক বিবাচন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে থাকে। সাম্যবাদের অপবাদের খোঁচায় এই দুজন সহজেই মিলে গেছে এবং যাদেরই মতামতকে তারা অপছন্দ করছে তাদের বিরুদ্ধেই তারা অন্ধভাবে সাম্যবাদের অভিযোগ ছুড়ে দিচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, আমি এটা খুব ভালো করে দেখেছি যে ১৯২০ সাল থেকে আমি সোভিয়েট ইউনিয়নকে বারবার সমালোচনা করে এসেছি এবং বলেছি যে সেখানকার সরকার নাৎসী সরকারের মতোই মন্দ কিন্তু আমার সমালোচক সেইসব কথা উল্লেখ করে কেবলমাত্র আমি আমার লেখাতে যে দু'একটি আশাব্যঞ্জক কথা সেই সরকার সম্পর্কে বলেছি সেগুলোরই উল্লেখ করেছেন।

যাদের মতামতকে অপছন্দ করা হচ্ছে তাদের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করা হবে সেটা কিছু বিশেষ শক্তিশালী ব্যক্তি সম্প্রদায়ের দ্বারা ক্রমশই এমন নিপুণ

হয়ে উঠছে যে শৃঙ্খলিত অগ্রগতির ক্ষেত্রে তা বিপজ্জনক। যদি কোন যুবক বিষয়ে অজ্ঞাত থাকে তবে যে-কোন সময় তার অফিসের বড়বাবু তাকে পেশাগ দিক দিয়ে অযোগ্য ভাবতে পারেন এবং তার চাকরিটি চলেও যেতে পারে। বৃদ্ধ মানুষেরা এই পদ্ধতিটিকে না করে উঠতে পারার ফলে তাদের সঙ্গে জনগণের বিরোধ বাড়তে থাকে। বেশিরভাগ শিক্ষক স্বাভাবিকভাবেই এই ধরণের বিপদ নিজের জন্য কখনই ডেকে আনার চেষ্টা করেন না, এইজন্য তারা জনসমক্ষে অপেক্ষাকৃত উদার মনোভাব কখনই প্রকাশ করেন না। এটা একটা বিপজ্জনক বিষয়, এইজন্যই নিরপেক্ষ বুদ্ধি পক্ষপাতদুষ্ট নীরবতা পালন করে থাকে এবং তারা যাতে তাদের নিজেদের জায়গাটাতে ঠিকঠাক থাকতে পারেন তার জন্য সংরক্ষণশীলতা ও প্রচ্ছন্নতার শক্তিকে মেনে নিতেই হয়।

(২)

আমেরিকার সংবিধান রচয়িতাদের অনুপ্রাণিত করেছিল যে উদার গণতন্ত্রের আদর্শ, সে সম্পর্কে উত্থিত প্রশ্নসমূহের সমাধান গায়ের জোরে সমাধান না করে যুক্তির মধ্য দিয়ে করতে হবে। উদারপন্থীরা সর্বদাই মনে করে থাকেন যে মতামত সমূহকে অবশ্যই বহু বিতর্কের মধ্য দিয়ে ছেঁকে নিতে হবে, শুধুমাত্র এক পক্ষের কথা শুনেই তা গ্রহণ করলে চলবে না। প্রাচীন ও আধুনিক উভয় যুগে স্বৈরাচারী সরকার বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। আমার দিক থেকে বলতে গেলে এই ব্যাপারে ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করার কোন কারণ আমি দেখতে পাই না। যদি আমার ক্ষমতা থাকত তবে আমি আমার বিরুদ্ধ পক্ষের মতামতকে দমাতে কখনই সুযোগ খুঁজতাম না। আমি সব ধরণের মতামতকে সমানভাবে সুযোগ দিতাম এবং বিতর্ক ও আলোচনার থেকে বেরিয়ে আসা ফলাফলকে ত্যাগ করতাম। আমি যতদূর জানি পোল্যান্ডে জার্মান নির্যাতনের বলি যে ক'জন শিক্ষক ছিলেন তাদের মধ্যে কিছু প্রাচীন যুক্তিবিদ ছিলেন যারা গোঁড়া ক্যাথলিক ছিলেন। কিন্তু আমি তাদের সহযোগী ধর্মবিদরা কোন রকম অভিনন্দন আমাকে জানাবে না তা জেনেও আমার ক্ষমতায় তাদের মহাবিদ্যালয়গত অবস্থাকে অবশ্যই ফিরিয়ে দিতাম।

উদার ও অনুদার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটির হল যে উদার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সব প্রশ্ন আলোচনাযোগ্য এবং সব মতামত কম বা বেশি সন্দেহযোগ্য। কিন্তু অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বিশেষ কিছু মতামতা এমনই চরম যে তা উত্তরযোগ্য নয় এবং সেইসব প্রশ্নের বিরুদ্ধে কোন মতামতকে অবশ্যই অনুমোদন দেওয়া যাবে না। এ বিষয়ে যেটা সব থেকে কৌতূহলোদ্দীপক তা হল সেই বিশ্বাস, যে যদি এ সম্পর্কে কোন নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের অনুমোদন দেওয়া হয়

করে তা মানুষকে ভুল সিদ্ধান্তে নিয়ে যাবে, এইজন্য ভুলের বিরুদ্ধে বাঁচার অস্ত্র খোলা। এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি কখন সেই ধরণের মানুষ গ্রহণ করতে পারে না যারা মানুষের কার্যকে সংস্কারের থেকে মুক্তি দিয়ে বিচার করতে চায়।

ধর্মযুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে ইংল্যান্ড ও হল্যান্ডে উদার দৃষ্টিভঙ্গির উত্থান ঘটে। ১৩০ বছর ধরে প্রচণ্ড হিংস্রতা ও বর্বরতার মধ্য দিয়ে এই যুদ্ধ ঘটলেও তা কোন পক্ষকেই বিজয়ী বলে ঘোষণা করতে পারেনি। প্রতিটি পক্ষই মনে করেছিল যে তারা নিজের ক্ষেত্রে সঠিক এবং মানবজাতির জন্য তাদের বিজয় একান্তই গুরুত্বপূর্ণ। পরিশেষে সচেতন মানুষ বহুদিন ধরে এই যুদ্ধের অশেষ দুঃখ-কষ্টকে সহ্য করে বুঝতে পেরেছিল যে উভয় পক্ষই তাদের গোঁড়া মনোভাবের দিক থেকে ভুল ছিল। জন লক এই নতুন যুগের শুরুতেই নতুন ধরণের দর্শন ও রাজনীতি সম্পর্কে লিখতে শুরু করলেন। মানুষের বিচার কখনও যে সঠিক হতে পারে না সে সম্পর্কে তিনি জোর দিয়েই বললেন এবং অগ্রগতির যুগের সূচনা করলেন যা ১৯১৪ সাল পর্যন্ত টিকে রইল। লক ও তাঁর অনুগামীদের জন্য ক্যাথলিকেরা প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বী দেশগুলোর প্রতি সহনশক্তি প্রদর্শন করতে পেরেছিল। যেখানে সপ্তদশ শতকে দেখা যায় যে তখন মানুষ কম বা বেশি সহনশীলতার পাঠ গ্রহণ করেছিল, কিন্তু মহাযুদ্ধের (The Great War) শেষে উদারনীতিবাদের দার্শনিকদের উচ্চ আদর্শগুলোকে সবাই ভুলে গেল। দ্বিতীয় চার্লসের বিচার-সভার খ্রীষ্টীয়দের সময় কোয়েকারদের আমরা যেমন ভয় করে চলতাম সেরকম আর বেশিদিন ভয় করে চলতে হল না আমাদের। কিন্তু সপ্তদশ শতকে কোয়েকার-রা তৎকালীন যুগে সমস্যা সমূহকে যে আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতেন সেই একই রকম দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শে যখন কিছু মানুষ বর্তমান সমস্যা সমূহকে অমান্য করেছি যেগুলো প্রাচীনতার দোষে দুষ্ট, কিন্তু এটা দুঃখজনক এবং অনিবার্যভাবে একটা ধাক্কা যে আমরা নতুন মতবাদ-গুলোকেও মেনে নিতে পারছি না।

গণতন্ত্রের সঠিক কার্যকারিতায় সম্ভবত দুটি দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। একটি দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত সমস্ত ক্ষেত্রেই চরমভাবে কার্যকরী লাভ করতে পারে। আর একটি দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী যেখানে সাধারণ সিদ্ধান্তের প্রয়োজন নেই সেখানে যতদূর সম্ভব অবশ্যই বিভিন্ন ধরণের মতামতের প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত সংখ্যাগত হার অনুযায়ী। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী যখন কোন মত সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা সমর্থিত হয় তখন অন্যান্যদের মতামত প্রকাশ করার অনুমতি দেওয়া আবশ্যিকভাবেই উচিত নয়। যদিও তা প্রকাশ করতে অনুমতি দেওয়া হয় তবে তা অপেক্ষাকৃত কম প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমে প্রকাশ

করতে হবে। অন্য দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ মতোই সংখ্যালঘিষ্ঠদের ম প্রকাশের সুযোগ দেওয়া উচিত, তবে তা সংক্ষিপ্ত ছোট্ট আকারে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে এই একই বিষয়ের প্রয়োগ হয়। রাষ্ট্রের অধীনে যে-সব পুরু ও মহিলা শিক্ষকের পদে আসীন আছেন তাদের মতামতকে সংখ্যাগরিষ্ঠে মতামত বলে প্রকাশ করা উচিত নয়। যদিও স্বাভাবিকভাবেই বেশিরভাগ শিক্ষক সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকেই নিজের মত হিসেবে প্রকাশ করে থাকেন। শিক্ষকদে মতামতের মধ্যে একরূপতা কখনও চাওয়া যেতে পারে না কেননা তাদে মতামতের মধ্যে বিচিত্রতাই উত্তম শিক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজন। এমন প্রশ্নসমূ যাকে কেন্দ্র করে জনগণ দ্বিধাবিভক্ত সেই প্রশ্নটির একপেশে উত্তর দিয়ে কো মানুষই পাশ করে শিক্ষিত হতে পারে না। গণতন্ত্রের শিক্ষা সম্পর্কীয় কো প্রতিষ্ঠানে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল যুক্তি সমূহকে ওজন করে দেখে নেওয়ার ক্ষমতা সম্পর্কে ও মনকে মুক্ত করার শিক্ষা দেওয়া যাতে যে পক্ষটি ন দিকটি সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত তাকে আগেভাগেই গ্রহণ করার মতো মানসিক প্রস্তু আসে। শিক্ষকদের অকপটে মতামত প্রকাশ করার উপর যখন নিয়ন্ত্রণ আসে তখন শিক্ষা তার সেবামূলক কাজ বন্ধ করে দিয়ে মানুষের দ্বারা গঠিত জা (Nation of men) গঠনের পরিবর্তে এক দল উন্মাদগ্রস্ত ধর্মান্ধকে তৈরি করে। মহাযুদ্ধের (Great War) অবসানের পর থেকে উন্মাদগ্রস্ত ধর্মান্ধতা জগতে বেশিরভাগ অংশ ছেয়ে ফেলল তার তীব্র বিষে যা ধর্মযুদ্ধের সময়গুলোতে ঘটেছিল। যারা স্বাধীন আলোচনার বিরোধিতা করে এবং যে মতামতের উপ নির্ভর করে যুবকেরা নিজেদের প্রকাশ করতে পারে তার উপর যারা নিয়ন্ত্রণ চাপায় তারাই ধর্মান্ধতার বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করে এবং জন লক ও তাঁর অনুগামী অতলস্পর্শী গভীর বিবাদ ও অসহনশীলতার হাত থেকে যে পৃথিবীকে রক্ষা করেছিল সেই পৃথিবীকে তারা সেখানেই ঠেলে দেয়।

এমন দুটি প্রশ্ন দেখা যায় যে দুটির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না এদের মধ্যে একটি হল উত্তম ধরণের সরকারের কাঠামো নিয়ে এবং অন্যটি সরকারে কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে। গণতন্ত্রই সরকারের উত্তম কাঠামো সে সম্পর্কে আমার কো সন্দেহ নেই, কিন্তু তার কার্যের সম্পর্কে বলতে গেলে এ কথা বলতে হয় যে তা অন্য যে-কোন সরকারের কার্যের মতোই বাজে। এমন কিছু বিশেষ বিষয় আছে যার উপ সাধারণ ক্রিয়ার প্রয়োজন। এই কারণেই সাধারণ সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজনও নে আবার, তা আকাঙ্ক্ষিতও নয়। এই অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে মত প্রকাশে পরিধিটিও পড়ে। কিন্তু মতামতকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রবণতা যাঁদেরই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে তাঁদেরই থাকে, তাই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের স্বাধীনতার যাতে এক

[illegible] থাকে তার জন্য সেখানে অবশ্যই সেই সব রীতিনীতিকে কার্যকরী করে তোলার [illegible] গড়ে উঠিত পরিচালকমণ্ডলী থাকার প্রয়োজন যারা হয় বাস্তবে অথবা তত্ত্বগত দিক [illegible] রক্ষা করতে পারবে। মধ্যযুগে ইউরোপে গীর্জা এবং রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদের মধ্য [illegible] যেখানে যে সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল সেই সভ্যতাকে গ্রহণ করেছিলো যেসব [illegible] যেখানে এই ধরনের স্বাধীনতা দেখতে পাওয়া যায় এবং ঐতিহাসিকভাবে সেই [illegible] উৎসকে প্রমাণও করা যায়। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে গীর্জা রাষ্ট্রের দ্বারা [illegible] হয়েছিল এইভাবেই সেই রাশিয়াতে স্বাধীনতার যে-কোন ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ [illegible] কারণটিকেও আমরা সম্ভবত চিহ্নিত করতে পারব যে রাশিয়া [illegible] কনস্টান্টিনোপলের সভ্যতাকে গ্রহণ করেছিল। পশ্চিমা দেশগুলোতে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে [illegible] ক্যাথলিক গীর্জা এবং পরে বিভিন্ন প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায় ক্রমশ বিশেষ কিছু [illegible] অর্জন করে।

শিক্ষাগত স্বাধীনতা গীর্জার স্বাধীনতার একটি অংশ ছিলো এবং এর ফলে অষ্টম [illegible] সময় তা জ্ঞানের আলো থেকে বিচ্যুত ছিলো। আমি আবারও বলতে চাই— [illegible] রাষ্ট্রে সরকারের কাঠামো যাই হোক, স্বাধীনতার সংরক্ষণের বিষয়ে এমন [illegible] পরিচালক বর্গের অস্তিত্ব থাকবে যাদের হাতে রাষ্ট্রের সীমিত স্বাধীনতার [illegible] থাকবে এবং এইসব পরিচালক বর্গের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্তি একান্ত [illegible]। বর্তমানে আমেরিকায় বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে শিক্ষাগত [illegible] লক্ষ্য করা যায় সেই স্বাধীনতা গণতন্ত্রের কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিচালিত [illegible]লয়গুলিতে লক্ষ্য করা যায় না এবং এর কারণ হল সরকারের যথার্থ [illegible] সম্পর্কে বিস্তৃত ভুল ধারণা।

[illegible]

[illegible] প্রদানকারীরা ভেবে থাকেন যেহেতু তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের [illegible] দিয়ে থাকেন সেইহেতু কিভাবে তারা শিক্ষা দেবেন তা ঠিক করার অধিকার [illegible] এই আদর্শকে যদি যুক্তিগতভাবে বিচার করা যায় তবে যে অর্থটি দাঁড়াবে [illegible] বিদ্যার জন্য যে সুযোগ সুবিধাগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা পেয়ে [illegible] সেগুলো নিষ্ফল এবং তাদের শিক্ষার বিষয়েও ওই একই কথা বলা যেতে [illegible] তাদের বিশেষ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তারা তা ব্যবহার করতে পারেন না। [illegible], চিকিৎসকদের মতো নিয়ন্ত্রণের কৌশল' ('Folly, Doctor-like, [illegible] skill') এমন এক বস্তু যা সেক্সপীয়রকে শান্ত-মৃত্যুর জন্য কাঁদিয়েছে। [illegible] বেশিরভাগ আমেরিকান গণতন্ত্র বলতে যা বোঝে তা হল সমস্ত রাষ্ট্রীয় [illegible]লয়গুলোর উপর এই ধরণের নিয়ন্ত্রণের উপস্থিতি থাকা একান্ত দরকার।

ক্ষমতার ব্যবহার অবশ্যই দরকার তবে জ্ঞানী ব্যক্তির উপর অন্ধকারাচ্ছন্ন ব্যক্তি ক্ষমতার ব্যবহারের ক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে প্রয়োজন। যে রোমান সৈন্য আর্কিমিডিসকে হত্যা করেছিল সে যদি তার যুবক বয়সে জ্যামিতি শিখতে বাধ্য হত তবে সে এই সুপ্রসিদ্ধ অপরাধীর জীবনের অবসান করবার সময় দুর্দান্ত রোমাঞ্চকর আনন্দ উপভোগ করতে পারত। কোন মূর্খ আমেরিকান ধর্মান্ধ ব্যক্তি সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে তার গণতান্ত্রিক শক্তিকে ব্যবহার করে একই ধরণের রোমাঞ্চ অনুভব করে যে ব্যক্তি অশিক্ষিত ব্যক্তি সম্পর্কে ঘৃণ্য দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে থাকে।

সম্ভবত ক্ষমতার গণতান্ত্রিক অপব্যবহারের মধ্যেই বিশেষ বিপদ নিহিত থাকে, বিশেষ করে তখন যখন সম্মিলিতভাবে সেগুলো উন্মত্ত জনতার দ্বারা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। জনতার ডাইনি শিকারের প্রবৃত্তিকে উস্কে দেবার কৌশল সব মানুষের জানা আছে সে গণতন্ত্রের অশুভ দিকটিকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষমতাও ধারণ করে। গণতন্ত্র হল সেই জায়গা যেখানে ক্ষমতার ব্যবহার সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা হয়ে থাকে। ফলে স্বৈরাচারের দিকে যাবার ভাবাবেগ মাদকতা সেখানে খুব সহজেই তৈরি হয় যা অনিবার্যভাবে তাড়াতাড়ি ধীরগতিতে কর্তৃত্বের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। এই বিপদের বিরুদ্ধে প্রধান রক্ষাকবচটি হল সঠিক শিক্ষা। সম্মিলিত ঘৃণার অযৌক্তিক উদ্রেকের প্রবণতার সঙ্গে লড়াই করার ক্ষেত্রে যাকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু শিক্ষকই এই ধরণের শিক্ষা প্রদান করতে আগ্রহী। কিন্তু অভিজাততন্ত্র ও যাজক সম্প্রদায়ের প্রভুরা এই কর্তব্যকে সঠিকভাবে পালন করার ক্ষেত্রে তাদের যতদূর সম্ভব বাধা দিয়ে থাকেন। কেননা এইসব মানুষদের ক্ষমতা আসে জনতার অযৌক্তিক ভাবাবেগের থেকে। তারা জানে যে যদি যৌক্তিক চিন্তার ক্ষমতা তাদের মধ্যে আসে তবে তারা ক্ষমতাচ্যুত হবে। তাই নীচে মূর্খ পরস্পর-সংযুক্ত ক্ষমতা এবং উপরে ক্ষমতার প্রতি ভালোবাসা যুক্তিবান মানুষের প্রচেষ্টাকে পঙ্গু করে দেয়। এই দেশে আজ পর্যন্ত জনগণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা অর্জন হয়েছে তার থেকে অনেক বেশি শিক্ষাগত স্বাধীনতা এই অশুভ দিকটিকে নিবৃত্ত করতে পারে। বুদ্ধিবৃত্তির অ-জনপ্রিয় আকারের নির্যাতন যে-কোন দেশের পক্ষে গভীরভাবে বিপজ্জনক এবং জাতীয় ধ্বংসের কারণ হিসেবে প্রায়শই ঘটে থাকে। চোখের সামনে আমরা স্পেনকে উদাহরণস্বরূপ দেখতে পারি যেখানে ইহুদি ও মুরদের নির্বাসনের ফলে কৃষি-ব্যবস্থা ধ্বংসের দিকে গেল এবং সেখানে সম্পূর্ণ পাগলের মতো অর্থ-ব্যবস্থার পরিচালনা গ্রহণ করা হয়েছে। স্পেন এই দুটি কারণের জন্যই ইউরোপে তার শক্তিশালী অবস্থা থেকে নিচে নেমে হয়েছিলো যদিও পঞ্চম চার্লস সর্বপ্রথম এই দুটি কারণপ্রসূত কার্যকে ঢাকা দেবার চেষ্টা করেন। খুব সাধারণভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এই একই ধরণের

জার্মানীতে একই কার্যকে উৎপাদন করবে, যদি তা নিকট ভবিষ্যতে না-ও হয় তার ভবিষ্যতে তা ঘটবেই। এই একই ঘটনা রাশিয়াতেও অনেক দিন ধরে চলছে এবং প্রতিরক্ষার ব্যবস্থায় তাদের অযোগ্যতা থাকলেও, ভবিষ্যতে সেখানে যা কার্য ঘটতে চলেছে তা সহজেই দৃষ্টিগ্রাহ্য।

এই মুহূর্তে রাশিয়া একটি দেশ হিসেবে সবচেয়ে ভালো উদাহরণ। সেখানে শ্রমিক শ্রমজীবীদের উপর যথেষ্ট পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত থাকায় তারা নিউইয়র্কে চলে যাবার চেষ্টা করছে। অধ্যাপক এ.ভি. ছিল ১৯৩৮ সালের অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল জার্নাল অব সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর থেকে যে কথাগুলির উল্লেখ করেছেন সেগুলো হল :

১) প্রকৃত দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অর্থাৎ সময় ও স্থানের (Time and space) পারিপ্রেক্ষিতে অসীমকে বিচার করার ধারণা গ্রহণ না করার ফলে আধুনিক বুর্জোয়াদের বিশ্বতত্ত্বের উৎপত্তি সম্পর্কে ধারণা এক গভীর বিভ্রান্তিতে পর্যবসিত হয়েছে।

২) ফ্যাসিবাদের দালালরা একটা সময় মহাকাশবিদ্যা থেকে অন্যান্য বিষয় ও সংবাদ-মাধ্যম (Press) সবাইকে নিজের অধীনে আনতে পেরেছিলো, কিন্তু তাদের শত্রুভাবাপন্ন এই সব কাজের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া সাহিত্যে এখন প্রতি-প্রগতিক বুর্জোয়া আদর্শের বৈপ্লবিক প্রচার চলছে।

৩) বিশ্বতত্ত্বের সমস্যার উপর বর্তমান সোভিয়েতের বস্তুবাদমূলক কার্যসমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে এবং জনগণের শত্রুদের দ্বারা এখনো পর্যন্ত অবদমিত।

৪) বিজ্ঞান অনুরাগীদের একটি বিরাট অংশ বুর্জোয়াদের সাম্প্রতিক বিশ্বতত্ত্বের প্রচারসমূহের আদর্শগত দিকের প্রতি উদাসীন থাকার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠছে।

৫) সোভিয়েতের জনসাধারণের শত্রুদের অনাবৃত করতে নব্য সোভিয়েত বস্তুবাদমূলক বিশ্বতত্ত্বের উন্নতি একান্ত প্রয়োজন।

৬) দর্শনগত পদ্ধতিবিদ্যার (Philosophic methodolgy) উপর ভিত্তি করে বিশ্বতত্ত্বের তত্ত্বসমূহ গঠনের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানের রণাঙ্গণে সোভিয়েত বিজ্ঞানের প্রবেশ করাটা বর্তমানে বিশেষ প্রয়োজন।

যেমনা 'আমেরিকার' স্থানে 'সোভিয়েত'কে বসতে হবে। 'সাম্যবাদকে' 'ধনীবাদের' স্থানে বসতে হবে। 'ক্যাথলিক সত্যের' স্থানে 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ'কে বসতে হবে। আপনাদের শুধু সেই তথ্যকে খুঁজে বের করতে হবে যার উপর আমাদের শিক্ষাগত স্বাধীনতার শত্রুরা তাদের সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।

(H)

এদিকে একটি উৎসাহব্যঞ্জক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে সাধারণতায় সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচার নতুনভাবে বেড়ে না উঠে আজ থেকে একশ বছর আগের চেয়ে অনেক কমে আসছে। যে কেউ ডি. টকিউভেলির 'ডেমোক্রেসি

ইন আমেরিকা' নামক গ্রন্থে উপসংহারটি পড়ে দেখতে পারেন। সেই গ্রন্থে তিনি যা বলেছেন তার বেশিরভাগ অংশ এখনো প্রয়োগযোগ্য। কিন্তু তাঁর কিছু পর্যবেক্ষণ আর সত্য হিসেবে টিকে থাকতে পারেনি। উদাহরণস্বরূপ, আমি তাঁর এ ধরণের কথাকে মেনে নিতে পারি না যে, 'সভ্য জগতে আর কোন দেশেই দর্শনের প্রতি এত কম মনোযোগ দেওয়া হয় না যতটা আমেরিকায় দেওয়া হয়। কিন্তু আমি মনে করি এখনো সেখানে ন্যায়বিচারের কিছু অস্তিত্ব আছে যদিও তা হয়ত ডি. টকিউভেলির সময়ের চেয়ে কম। তিনি লিখেছেন।'

'মতামতের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আমেরিকার সংখ্যাগরিষ্ঠরা এক মারাত্মক বেড়াজাল সৃষ্টি করে। এই বেড়াজালের ভেতরেই একজন লেখক যা খুশী তাই লিখতে পারেন, কিন্তু যদি তিনি এই বেড়াজাল অতিক্রম করতে চান তাহলে তাকে অনুশোচনা করতে হয়। তাকে শুধু জনগণের সন্ত্রাসই সহ্য করতে হয় না, প্রতিদিন গালাগালের নির্যাতন ও অবজ্ঞাও সহ্য করতে হয়। তার রাজনৈতিক জীবন চিরদিনের মতো নষ্ট হয়ে যায়। যেহেতু তিনি সেই একমাত্র কর্তৃত্বকে অসন্তুষ্ট করেছেন যে তাঁর জীবনে সফলতাকে আনাতে পারত। সব ধরণের ক্ষতিপূরণ তার ক্ষেত্রে অস্বীকার করা হয়। এমনকি তার খ্যাতির দিকটিও কেড়ে নেওয়া হয়। তিনি তাঁর মতামত প্রকাশের আগে কল্পনা করতে পারেন যে তাঁর মতামতটি তিনি সর্বসাধারণের সামনে তুলে ধরবেন এবং অন্যান্য অনেকেই তাকে সমর্থন করবে কিন্তু যেই না তিনি তা প্রকাশ করেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সশব্দে দমিয়ে দেয় এবং যারা তাঁর সম্পর্কে কিছু বলতে চান না, বুঝতে হবে তারা তাঁকে পছন্দ করে এবং নীরবতায় তাকে পরিত্যাগ করেন। শেষে তিনি বশ্যতা স্বীকার করেন। প্রতিদিন তিনি যা চেষ্টা করেছেন তার জন্যই উৎপীড়িত হয়েছেন, তারপর একসময় নীরবতায় তাঁকে থিতিয়ে যেতে হয়। এ যেন সত্য বলার অপরাধে তীব্র মনস্তাপে জ্বলে-পুড়ে মরার অবস্থা।'

গণতন্ত্রে একজন ব্যক্তির উপর সমাজের ক্ষমতা সম্পর্কে ডি. টকিউভেলি যা বলেছেন আমি মনে করি তা অবশ্যই মেনে নিতে হয়। তিনি বলছেন, 'যখন একটি গণতান্ত্রিক দেশের একজন প্রতিবেশী ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে দেশের অন্যান্য প্রতিবেশীদের সঙ্গে তুলনা করে তখন সে এই ভেবে গর্ব বোধ করে থাকে যে সে তাদের যে-কোন কারুর সঙ্গে এক ও সমান। কিন্তু যখন সে তার দেশের জনসাধারণের সমগ্রতাকে জরিপ করে এবং সেই বিরাট অংশকে নিজের বিপরীতে তুলনা করতে চায় তখন সে নিজের তুচ্ছতা ও দুর্বলতাকে মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পেরে অভিভূত হয়ে যায়। এই একই বোধ তাকে বুঝতে শেখায় যে সে তার প্রতিটি নাগরিকের সঙ্গে স্বাধীন (আলাদাভাবে নয়) এবং তখন সে বুঝতে পারে এই বিরাট সংখ্যক জনসাধারণের প্রভাবের কাছে সে অরক্ষিত ও একা

গণতান্ত্রিক জনসাধারণের মধ্যে জনগণই একটি অদ্বিতীয় ক্ষমতা, যার সম্পর্কে কোন অভিজাততান্ত্রিক জাতি ঠিকমতো করে কোন ধারণা করে উঠতে পারে না, কোনো এরকম দেশ কোন বিশেষ মতামতকে প্ররোচিত করে না। সে ওই মতামতসমূহকে জোর করে কার্যক্ষম করে তোলে এবং পারস্পরিক যুক্তির উপর নির্ভর করে সর্বজনের মনের বিরাট চাপে সেই মতামতসমূহ কার্যকরী মতামতে পরিণত হয়ে ওঠে।'

১৬. টকিউভেলির সময় থেকে লেভিয়াথানের (Leviathan) বিরাটত্ব ব্যক্তি মানুষকে গিলে ফেলে বহু গণতান্ত্রিক দেশেই নিজের বিরাট পদক্ষেপ নিয়েছে। এটা আধুনিক সভ্য জগতের পক্ষে আসন্ন একটি মারাত্মক বিপদের সংকেত। যদি একে এখনি রোধ করা না হয় তবে বিদ্যাবুদ্ধিগত অগ্রগতির সমাপ্তি ঘটবে। কোনো সব বিদ্যাবুদ্ধিগত অগ্রগতির জন্য দরকার এমন এক বিশেষ স্বাধীনতা যা বাইরের মতামতের দ্বারা বিঘ্ন হবে না। কিন্তু যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাকে বিশেষ ধর্মীয় সম্মানে দেখা হয় সেখানে এই ধরণের স্বাধীনতা থাকতে পারে না, কারণ সেখানে গোঁড়া ধর্মাবলম্বীরা উক্ত ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে মনে করেন। ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি সম্মানের চেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রতি সম্মান আরও বেশি বিপজ্জনক, কেননা সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাকে নিরূপণ করা যায়। সম্ভবত চল্লিশ বছর আগে ডারবান শহরে Flat Earth Society-র একজন সদস্য সমগ্র জগৎকে বিতর্কে আহ্বান করেছিলেন। এই আহ্বানে জগতের সপক্ষে সাড়া দিয়েছিলেন একজন জাহাজের ক্যাপটেন। তাঁর একটি মাত্রই যুক্তি ছিল যে পৃথিবীটি গোলাকার কেননা সমগ্র পৃথিবীটি ঘোরবার পর তিনি তাকে গোলাকারই পেয়েছেন। তাঁর এই যুক্তিটি খুব সহজেই দমিত হল এবং Flat Earth সংঘের সভ্যরা দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে গেল। জনগণের কণ্ঠ এইভাবে নির্ণীত হয়ে আসছে। একজন সত্যনিষ্ঠ গণতন্ত্রবাদী অবশ্যই এই সিদ্ধান্ত নেবেন যে ডারবানে পৃথিবীটা সমতল। আমি আশা করি সেদিন থেকে ডারবানের সাধারণ বিদ্যালয়ে আর কেউ শিক্ষা দিতে পারেনি (আমার বিশ্বাস যে সেখানে কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই) যতক্ষণ না সে এই সম্মতি জ্ঞাপন করেছে যে পৃথিবী সমতল বিষয়টি এমন একটি নাস্তিক মতো যা সাম্যবাদের দিকে মানুষকে নিয়ে যাবার একটা কৌশল হিসেবে তৈরি হয়েছে এবং পরিবার প্রথাকে ধ্বংস করবার কাজে লাগে। এই মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে আমার তথ্য ত্রুটিপূর্ণ।

দুঃখের বিষয় সমবেত প্রজ্ঞা (Wisdom) বা সমষ্টিগত জ্ঞান ব্যক্তিদের বুদ্ধিগত প্রতিভূ নয়। যে-সব ব্যক্তি গৃহীত মতামতসমূহের বিরোধিতা করে তারাই সমস্ত ধরণের অগ্রগতির উৎস হয়ে আসছে আজ পর্যন্ত। তারা নৈতিক ও বুদ্ধিগত অগ্রগতির উৎস। খুব স্বাভাবিকভাবেই তারা জনপ্রিয় নয়। গোঁড়া

ধর্মাবলম্বীদের নিন্দায় সক্রেটিস্, ক্রাইস্ট এবং গ্যালিলিও সমানভাবে বিপদে পড়েছেন। আগেকার দিনে দমন করার জন্য যে পন্থা ব্যবহার করা হত তা আজকে আমাদের দিনের থেকে যথেষ্ট দুর্বল ছিলো এবং সে সময় প্রচলিত ধর্মমতের যারা বিরোধিতা করত তারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেও যথেষ্ট প্রচার পেতেন। শহীদের রক্তই গীর্জার বীজ। কিন্তু জার্মানীর মতো দেশে এই ব্যাপারটি সত্য রইল না। সেখানে শহীদের দুঃখ-যন্ত্রণাকে গোপন রাখা হয় এবং প্রচারিত শহীদের মতবাদের কোন চিহ্নই রাখা হয় না।

শিক্ষাগত স্বাধীনতার বিপক্ষে যারা আছেন তারা যদি কোন পথ পান তবে এই দেশকে তারা জার্মানের নীচেও নামাতে পারেন যাতে তারা যে মতবাদসমূহকে অমনোনীত করেছে তা প্রচার না পায়। ব্যক্তিচিন্তার প্রতিষেধ হিসেবে তারা সংগঠিত স্বৈরাচারের সৃষ্টি করে। যা-কিছু নতুন তাকেই তারা বে-আইনী বলে ঘোষণা করে। তারা মনুষ্যসমাজকে ফোঁপরা করে ছাড়ে এবং পরিশেষে এমন এক মনুষ্যধারার সৃষ্টি করে যারা মানব-ইতিহাসের কোন রকম চিহ্ন না রেখে জীবন-মৃত্যুর তরঙ্গের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। কারুর কারুর মনে হতে পারে যে তারা এই মুহূর্তে যেটা দাবি করছে সেটা খুব একটা গভীর বিষয় নয়। এই প্রশ্ন করা যেতেই পারে, যে জগৎ যুদ্ধের দ্বারা নির্যাতনের নিদারুণ যন্ত্রণায় জর্জরিত এবং তাদের জন্য বহুসংখ্যক নির্যাতন-শিবির বা বন্দী-শিবির (Con-centration camp) পূর্ণ, যারা কোন পাপকর্ম করতে নারাজ, সে জগতে শিক্ষাগত স্বাধীনতার গুরুত্ব কতখানি? আমি স্বীকার করি এইসব কিছুর তুলনায় শিক্ষাগত স্বাধীনতা গুরুত্বের দিক দিয়ে কখনই প্রথম শ্রেণীভুক্ত নয়। কিন্তু এটি একই যুদ্ধের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমরা এ কথা যেন স্মরণ রাখি যে বিষয়টি এখন সংকটে। যাকে বড় বড় সমস্যার সামনে খুব ছোট বলে মনে হতে পারে তা হল মনুষ্যজাতির ক্ষেত্রে বিশ্বাস ও আশা প্রকাশ করবার জন্য ব্যক্তি-মানব-আত্মার স্বাধীনতা, সেই আশা ও বিশ্বাস বহুজনের দ্বারা সমর্থিত হোক, কিংবা কতিপয় জনের দ্বারাই হোক অথবা কারুর দ্বারা নাই বা হোক। নতুন আশা, নতুন বিশ্বাস এবং নতুন চিন্তা মনুষ্যজাতির জন্য সর্বদাই প্রয়োজনীয় এবং সৃষ্টিশীলতা সমভাব থেকেই যে তা উত্থিত হবে তা আশা করা যেতে পারে না।

১৩

ঈশ্বরের অস্তিত্ব

(বার্ট্রান্ড রাসেল ও ফাদার এফ. সি. কপলেস্টোন-এর মধ্যে একটি বিতর্ক। এই বিতর্কটি মূলত ১৯৪৮ সালে বিবিসির থার্ড প্রোগ্রামে সম্প্রচারিত হয়। ১৯৪৮ সালের 'হিউম্যানিটিয়াস' পত্রিকার শরৎকালীন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং বর্তমান গ্রন্থে ফাদার কপলেস্টোনের সহৃদয় অনুমতিতে পুনর্মুদ্রিত করা হয়েছে।)

কপলেস্টোন : যখন আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি, তখন আমাদের সম্ভবত এমন একটি অস্থায়ী চুক্তিতে আসার দরকার যার দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে ঈশ্বর বলতে ঠিক কি বোঝায়। আমি মনে করি, ঈশ্বর বলতে বোঝায় একটি চরম ব্যক্তিগত সত্তা যিনি জগৎ এবং জগতের স্রষ্টার থেকে স্বতন্ত্র। অন্তত সাময়িকভাবে কি আপনি ঈশ্বর বলতে আমি যা বোঝাতে চাইলাম তা গ্রহণ করবেন?

রাসেল : হ্যাঁ, আমি এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করলাম।

কপলেস্টোন : ধন্যবাদ। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমার মতামত ধনাত্মক এবং আমি মনে করি তাঁর অস্তিত্ব দার্শনিকভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে। সম্ভবত আপনি অবশ্যই আমায় জানাবেন যে আপনি এ বিষয়ে একজন নাস্তিক অথবা অজ্ঞেয়বাদী মনোভাব রাখেন কি না। আমি বলতে চাই যে আপনি কি এটি বলতে চাইবেন যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যেতে পারে কি না?

রাসেল : না, আমি বলতে পারি যে আমি অজ্ঞেয়বাদকে সমর্থন করি।

কপলেস্টোন : আপনি কি এটি আমার সঙ্গে মেনে নেবেন যে ঈশ্বরের সমস্যা হল একটি মহৎ গুরুত্বের সমস্যা? উদাহরণস্বরূপ, আপনি কি মেনে নেবেন, যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব না থাকত তবে মানবজাতি এবং মানবের ইতিহাস অন্য কোন উদ্দেশ্য না চলে কেবলমাত্র নিজেদের পছন্দ মতো উদ্দেশ্যেই চলত। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি সেই উদ্দেশ্যের কথা, কার্যকরীভাবে যে উদ্দেশ্য কেবলমাত্র তারাই করে যা লোকের উপর চাপাবে যাদের অন্যদের উপর উদ্দেশ্য চাপিয়ে দেবার মতো ক্ষমতা আছে।

রাসেল : মোটামুটিভাবে বলতে গেলে আমি হ্যাঁ বলব, যদিও আপনার শেষ বাক্যটির উপর আমার কিছু সীমা (Limitation) রাখা প্রয়োজন।

কপলেস্টোন : আপনি কি এটি মেনে নেবেন যদি ঈশ্বর বলে কিছু না থাকে অর্থাৎ পরম সত্তা বলে যদি কিছু না থাকে তবে কোন পরম মূল্য থাকতে পারে না? আমি বোঝাতে চাইছি যে আপনি কি এটি মেনে নেবেন যে যদি কোন পরম সত্তা না থাকে তবুও মূল্যসমূহের আপেক্ষিকতা ফল প্রয়োগ করতে পারে?

রাসেল : না, আমি মনে করি এইসব প্রশ্নগুলি যুক্তিগতভাবে স্বতন্ত্র। উদাহরণস্বরূপ, ধরুন জি. ই. মুর-এর প্রিন্সিপিয়া এথিকা (Principia Ethica) গ্রন্থটির কথা। সেখানে তিনি দেখিছেন যে, অমঙ্গলের একটা স্বতন্ত্রতা আছে এবং এই দুটোই একটি নির্দিষ্ট কল্পনা, কিন্তু এই ধারণাটিকে সমর্থন করার জন্য তিনি ঈশ্বরের ধারণার অবতারণা করেননি।

কপলেস্টোন : ধন্যবাদ। মনে করা যাক আমরা মঙ্গল বিষয়ক প্রশ্নটিকে ততক্ষণ সরিয়ে রাখব যতক্ষণ না আমরা কোন নৈতিক বিষয়বস্তুতে আসছি। আমি প্রথমে অধিবিদ্যাগত যুক্তি দেব। আমি লাইবনিজের 'অনিশ্চয়তা' (Contingency) সম্পর্কিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে যে অধিবিদ্যাগত যুক্তি গড়ে ওঠে তাকে প্রাধান্য দিয়ে কিছু বলব এবং তারপর আমরা নৈতিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি। ধরুন আমি অধিবিদ্যাগত বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেব, তারপর আমরা ঐ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা চালাতে পারি কি?

রাসেল : আমার মনে হয় এটাই ঠিক পরিকল্পনা।

অনিশ্চয়তাজাত বিষেয়

কপলেস্টোন : ধন্যবাদ। পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে আমি বিষয়টিকে কয়েকটি স্তরে ভেঙে নেব। সবার আগে আমার জানা দরকার যে এই জগতে অন্তত এমন কিছু সত্তা আছে যাদের বেঁচে থাকার কোন কারণই নেই। উদাহরণস্বরূপ, আমি আমার পিতামাতার উপর নির্ভর করে থাকি, বাতাসের উপর, খাদ্যের উপর এরকম আরও অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে থাকি। দ্বিতীয়ত, জগৎ সহজভাবে বাস্তব অথবা সামগ্রিকভাবে কল্পিত অথবা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর (Individual objects) সমষ্টি এবং তাদের মধ্যে কোন একটি বস্তুও নিজের অস্তিত্বের কোন কারণ প্রদান করতে পারে না। এমন কোন জগৎ নেই যে-জগৎ যে-বস্তু (object) থেকে গঠিত হয়েছে তার থেকে স্বতন্ত্র। জগতের এইসব সদস্য-বস্তুদের চেয়ে মানুষ কিছুটা স্বতন্ত্র হলেও সেও তাই। এইজন্য, আমার বলা উচিত, যেহেতু বস্তুসমূহ ও ঘটনাসমূহ বিদ্যমান এবং যেহেতু অভিজ্ঞতালব্ধ কোন বস্তুই তার অস্তিত্বের কোন কারণ নিজের মধ্যে দর্শাতে পারে না, তাই সমগ্র বস্তুর পেছনে যে- কারণ আছে তা অবশ্যই বস্তুর বাইরে অবস্থিত এবং সেই কারণটি অবশ্যই এক বিদ্যমান সত্তা। তাই বলা যায় এই সত্তাটি হয় নিজেই নিজের অস্তিত্বের কারণ অথবা তা নয়। যদি তাই হয় তবে তা শুভ এবং মঙ্গলময়। যদি তা না হয় তা হলে আমরা আরও কিছুটা দূর এগোতে পারি। কিন্তু ওই অর্থে যদি আমরা অসীমের দিকে এগোই তাহলে অস্তিত্বের ব্যাখ্যা করবার জন্য আর কিছুই পড়ে থাকে না। সুতরাং

আমার বলা উচিত, অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করবার জন্য আমাদের অবশ্যই এমন একটি ধারণার নিকট আসার দরকার যে সত্তাটি তার নিজের অস্তিত্বের কারণটি নিজেই ধারণ করে রাখে। অর্থাৎ আমি বলতে চাই যে যেটি কখনও অবিদ্যমান (not existing) হতে পারে না।

রাসেল : এই প্রশ্নের উত্তর বহুদিক থেকে দেওয়া যেতে পারে এবং ঠিক কোন দিক থেকে এর উত্তর শুরু করা যাবে তা বার করা সামগ্রিকভাবে খুব সোজা কাজ নয়। কিন্তু আমি মনে করি যে, আপনার যুক্তির উত্তরে সম্ভবত যে উত্তম দিকটিকে দিয়ে আলোচনা শুরু করা যায় সেটি হল 'প্রয়োজনীয় সত্তা'। 'প্রয়োজনীয়' (necessary) এই শব্দটি বচনের (propositions) উপর তাৎপর্যমূলক ভাবে কেবলমাত্র প্রয়োগ করা যেতে পারে বলে আমি মনে করি। বস্তুত এই ধরণের বচনগুলি বিশ্লেষণমূলক অর্থাৎ বলা যেতে পারে এই ধরণের বিষয় অস্বীকার করার ক্ষেত্রে স্ববিরোধমূলক। যদি এমন কোন সত্তা থাকে যার অস্তিত্ব অস্বীকার করার ক্ষেত্রে স্ববিরোধমূলক, তবে আমি কেবল প্রয়োজনীয় সত্তাকেই স্বীকার করে নেব। এখন আমি জানতে চাই লাইব্‌নিজ বচনসমূহকে কারণের সত্যসমূহ এবং ঘটনার সত্যসমূহ এই দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন তা আপনি গ্রহণ করবেন কিনা। প্রথমটি অর্থাৎ কারণের সত্যসমূহ (truth of reason) প্রয়োজনীয় সত্তা।

কপলেস্টোন : যদি তাই হয় তবে আমার এই বিষয়ে সম্মতি দেওয়া উচিত যা যে বিষয়টিকে লাইব্‌নিজের ধারণাপ্রসূত কারণের সত্যকে ঘটনার সত্য (truth of fact) বলা হেয়ে থাকে। যেহেতু লাইব্‌নিজের জন্যই বিষয়টি পরবর্তী সময় কেবলমাত্র বিশ্লেষণমূলক বচনে (analytical proposition) পর্যবসিত হয়। মনে হতে পারে যে লাইবনিজের ঘটনার সত্যসমূহ শেষে কারণের সত্যসমূহের আকারে নেমে আসে, অর্থাৎ বিশ্লেষণমূলক বচনে (analytical proposition) উপনীত হয়, অন্তত একজন সর্বজ্ঞ মনের (omnis-cient mind) কাছে। অতএব, তার সঙ্গে আমি একমত হতে পারি না। কেবলমাত্র একটি বিষয়ের জন্যই এটি স্বাধীনতার (freedom) অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়। কিন্তু আমি লাইব্‌নিজের সমগ্র দর্শনটিকে সমর্থন করতে চাই না। তবে অনিশ্চয়তা থেকে প্রয়োজনীয় সত্তা পর্যন্ত যেসব যুক্তি আমি ব্যবহার করে থাকি যেগুলি যথার্থ কারণের আদর্শের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, কারণ, আমার মনে হয় এইসব যুক্তি এমন একটি সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার সাধারণ সূত্রাকারে প্রকাশ যা আমার মতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের একটি মৌলিক অধিবিদ্যাগত বিষয়।

রাসেল : কিন্তু আমার মনের কাছে 'একটি প্রয়োজনীয় বচন' অবশ্যই বিশ্লেষণমূলক হবে। এটা অবশ্যই অন্য কোন অর্থ বোঝাবে বলে আমার মনে হয়

না। বিশ্লেষণমূলক বচন সর্বদাই জটিল হয়ে থাকে এবং কিছুটা পরে যুক্তিপূর্ণ হয়ে ওঠে। 'বিচারশক্তিশূন্য পশুও পশু' বচনটি একটি বিশ্লেষণমূলক বচন, কিন্তু এটি হয় একটি পশু' এমন বচন কখনই বিশ্লেষণমূলক হতে পারে না। বস্তুত, সমস্ত বচন যেগুলি বিশ্লেষণমূলক হতে পারে সেগুলো গঠিত হতে কিছুটা সময় নেয়।

কপলেস্টোন : এ-রকম একটি বচনকে নেওয়া যাক 'যদি অনিশ্চিত কোন সত্তা থাকে তবে প্রয়োজনীয় সত্তা আছে।' আমি মনে করি, যে-বচনটিকে অনুমানসিদ্ধ ভাবে প্রকাশ করা হল তা একটি প্রয়োজনীয় বচন। যদি আপনি প্রতিটি প্রয়োজনীয় বচনকে একটি বিশ্লেষণমূলক বচন বলতে যান, তবে পরিভাষাগত বিবাদ এড়াতে আমি বচনটিকে বিশ্লেষণমূলক বচন হিসেবে মেনে নেব, যদিও আমি বচনটিকে পুনরুক্তিগত বচন (tautolgical proposition) হিসেবে বিবেচনা করব না। কিন্তু অনিশ্চিত একটি সত্তা আছে এই অনুমানের উপর বচনটি একটি প্রয়োজনীয় বচন। যে-অনিশ্চিত সত্তাটি কার্যত বিদ্যমান তাকে অভিজ্ঞতার দ্বারা অবশ্যই আবিষ্কৃত হতে হবে। একটি অনিশ্চিত সত্তা আছে, এইরকম বচন কখনও বিশ্লেষণমূলক বচন হতে পারে না। যদিও আপনি জানেন, আমার এ কথা বলা উচিত যে একটি অনিশ্চিত সত্তা আছে এবং যা অনুসরণ করে এমন এক প্রয়োজনীয়তাকে যাকে অনুসরণ করে ধরে নিতে হয় একটি প্রয়োজনীয় সত্তা আছে।

রাসেল : এই বিষয়ে যে বাধাটি আছে তা হল যে আমি প্রয়োজনীয় সত্তার ধারণাটিকে স্বীকার করি না। আমি স্বীকার করি না অন্য সত্তাকে 'অনিশ্চিত' বলে ভাবার মধ্যে কোন বিশেষ অর্থ আছে। এইসব শব্দগুচ্ছগুলি আমার কাছে কোন তাৎপর্যমূলক বিষয় নয় একমাত্র সেই যুক্তির মধ্যে ছাড়া যে যুক্তিটিকে আমি বাতিল করেছি।

কপলেস্টোন : আপনি কি এই বোঝাতে চাইছেন যে আপনি এই পদগুলিকে বাতিল করেন এই কারণে যে সেগুলো সেই তর্কবিদ্যার সঙ্গে মানানসই হবে না যাকে 'আধুনিক তর্কবিদ্যা' বলা হয়ে থাকে?

রাসেল : পদগুলোর ঠিক কি অর্থ তা আমি বুঝতে পারি না। যেমন 'প্রয়োজনীয়' এ পদটি আমার মনে হয় একটি অনর্থক শব্দ। একমাত্র যখন শব্দটি বিশ্লেষণমূলক বচনে প্রয়োগ হয় তখন মানতে পারি, কিন্তু যখন বস্তুসমূহের (things) প্রতি প্রয়োগ হয় তখন আমার কাছে তা অনর্থক বলে মনে হয়।

কপলেস্টোন : প্রথমেই আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করব 'আধুনিক তর্কবিদ্যা' বলতে আপনি কি বোঝেন? যতদূর আমি জানি পৃথক ব্যবস্থাসমূহ (different system) বলতে কিছু আছে। দ্বিতীয়ত, কখনই সমস্ত আধুনিক তর্কবিদ্যা

...অর্থহীনতাকে নিশ্চিতভাবে স্বীকার করে নেবেন না। যে-কোনভাবেই ... আমরা উভয়ই জানি যে এমন একজন বিখ্যাত আধুনিক চিন্তাবিদ আছেন ... আধুনিক তর্কবিদ্যার উপর জ্ঞান সুগভীর কিন্তু যিনি অবশ্যই অধিবিদ্যাকে ...ন বলে ভাবেননি অথবা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে তিনি ঈশ্বরের ...াকে (problem of God) অনর্থক এমন ভাবেননি। আবার বলা যায় যদি ... আধুনিক তর্কবিদরা অধিবিদ্যাকে অর্থহীন মনে করেন তাহলেও এটা মনে ... কোন মানে নেই যে তারা সবাই সঠিক। অধিবিদ্যাগত পদসমূহ অর্থহীন ... আমার কাছে এমন একটি বচন যা নির্ভর করে আছে অনুমিত বা ...ক দর্শনের উপর। এর পেছনে যে গোঁড়ামিটা কাজ করে তা হল যা আমার ... ঢোকে না তাই অ-বিদ্যমান (non-existent), অথবা তা অর্থহীন কিংবা ... একটি আবেগমূলক ভাবেব প্রকাশ। আমি সহজভাবে এটাই বলতে চাইছি ... যারা বলেন আধুনিক তর্কবিদ্যার একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা যে কোন অর্থ (mean- ...) বোঝাবার একমাত্র মানদণ্ড তারা আরও বেশি গোঁয়ার। তারা গোঁয়ার্তুমি করে ... একটি অংশকে দর্শনের সমগ্র অংশ রূপে চালাতে চাইছে। সর্বোপরি, ... 'অনিশ্চিত' (Contingent) সত্তা এমন একটি সত্তা যার নিজের মধ্যেই ... সত্তার কোন কারণ নেই, 'অনিশ্চিত' সত্তা বলতে আমি এ রকমই বোঝাতে ... আমার মতো আপনিও জানেন যে আমাদের বাইরে অবস্থিত কোন কিছু বা ... প্রকৃতির দ্বারা আমাদের অস্তিত্বের কোন ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ ... পিতামাতার কথা বলতে পারি। অন্যদিকে একটি 'প্রয়োজনীয়' সত্তা বলতে ... এমন একটি সত্তা যা কখনই 'অ-বিদ্যমান' (not-exist) হতে পারে না। ... বলতেই পারেন যে এ রকম কোন সত্তা নেই, কিন্তু এ বিষয়ে আপনি ... বিশ্বাস করাতে পারবেন না যে পদসমূহ আমি ব্যবহার করছি তা আপনি ... না। যদি আপনি সেইসব পদসমূহকে না বোঝেন, তা হলে কেমনভাবে ... বলতে পারেন যে এ রকম কোন সত্তা নেই, যদি এই হয় তবে আপনি কি ... বলা

...ল : দেখুন, অনেকগুলো দিক থেকেই এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় ... আমি সেগুলোর ভেতর ঢোকার কোন প্রস্তাব করছি না। সাধারণভাবে কখনই ... অধিবিদ্যার অর্থহীন ব্যাপার সম্পর্কে আলোচনা চালিয়ে যাব না। আমি ... করব বিশেষ বিশেষ কিছু পদসমূহের অর্থহীনতার সম্পর্কে, কেননা ... পদসমূহের কোন ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কোন সাধারণ ... প্রেক্ষিতে আমি সেগুলোকে আলোচনা করব না। এটা কোন সাধারণ ... এটা একটা বিশেষ বস্তু (thing), কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য সেইসব

দিকগুলোর সম্পর্কে আমি আলোচনা বন্ধ রাখবো এবং আমি বলবো যে যা এ... ধরে আপনি বলেছেন আমার মনে হয় তা আমাদের আবার ফিরিয়ে নিয়ে ... সেই তাত্ত্বিক (ontological) বিষয়ের দিকে যে, এমন একটি সত্তা আছে ... সারসত্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার অস্তিত্ব, তাই তার অস্তিত্ব বিশ্লেষণমূলক। ... আমার মনে হয় এটা অসম্ভব, কারণ এর ফলে যে প্রশ্নটা সামনে আসে তা ... অস্তিত্ব বলতে একজন কি বোঝে এবং এই বিষয়ে আমি মনে করি এ... নামাঙ্কিত কর্তাকে (subject) কখনই তাৎপর্যমূলকভাবে বিদ্যমান বলা যেতে ... না কিন্তু বর্ণিত (described) কর্তাকে বিদ্যমান বলা যেতে পারে এবং সেই অ... কখনই বিধেয় (predicate) নয়।

কপলেস্টোন : আমি মনে করি আপনি বলতে চাইছেন যে এটি একটি ... ব্যাকরণ অথবা বলার ক্ষেত্রে একটি বাজে পদ-বিন্যাস, উদাহরণস্বরূপ, 'টি. ... এলিয়ট বিদ্যমান আছেন', উদাহরণরূপে, একজন বলতে পারেন 'মার্ডার ই... ক্যাথিড্রাল-এর লেখক, বিদ্যমান আছেন।' আপনি কি বলতে চাইছেন 'জগ... কারণের অস্তিত্ব আছে' এই ধরণের বচন অর্থহীন? আপনি বলতে পারেন ... জগতের কোন কারণ নেই, কিন্তু আমি এটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি ... কেমনভাবে আপনি বলতে পারেন যে 'জগতের কারণ আছে' এই রকম ... অর্থহীন? বচনটিকে প্রশ্নাকারে রাখুন যেমন, 'জগতের কি কোন কারণ আ... অথবা 'জগতের অস্তিত্বের কোন কারণ কাজ করে কি?' বেশিরভাগ মানুষ ... ধরণের প্রশ্নকে অবশ্যই বুঝবে, যদি তারা উত্তর সম্পর্কে একমত না-ও হয়।

রাসেল : 'জগতের অস্তিত্বের কোন কারণ কাজ করে কি?' এই ধরণের প্র... অর্থ আছে বই কি। কিন্তু যদি আপনি বলেন হ্যাঁ, ঈশ্বরই জগতের কারণ' তা... আপনি ঈশ্বরকে নামবাচক বিশেষ্য বা একটি নির্দিষ্ট নামে (proper nam... ব্যবহার করছেন। তাই 'ঈশ্বর বিদ্যমান আছেন' এই ধরণের বাক্য কখনই ... একটি বিবৃতি হয়ে উঠতে পারে না যার একটি মানে আছে— ঠিক এই কথা... আমি বলতে চাইছি। কারণ এইজন্যই বলা যেতে পারে যে এ ধরণের ... কখনই বিশ্লেষণমূলক বচন হতে পারে না যদি আমরা বলি যে এটা বা ... বিদ্যমান আছে। উদাহরণরূপে মনে করুন যে আপনি একটি কর্তাকে ... পারেন যেমন 'বিদ্যমান গোলাকার-চৌকোণ,' এটাকে একটি বিশ্লেষণমূল... বচনের মতো লাগলেও তা বিদ্যমান নয়।

কপলেস্টোন : না, তা নয়। অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন ধারণা আপনার না থা... আপনি কখনই নিশ্চিত করে বলতে পারেন না যে এটি বিদ্যমান নয়। যেমন ... 'গোলাকার-চৌকোণের অস্তিত্ব', আমি অবশ্যই বলব এর কোন মানে নেই।

রাসেল : আমি সম্পূর্ণভাবে একমত। 'প্রয়োজনীয় সত্তা' প্রসঙ্গে আমি ওই একই কথা বলব।

কপলেস্টোন : আমার মনে হয় আমরা একটা কানাগলির মধ্যে ঢুকে পড়েছি। প্রয়োজনীয় সত্তা এমন একটি সত্তা যে অবশ্যই বিদ্যমান আছে অথবা বিদ্যমান থাকতে পারে না— এই ধরণের বচন আমার কাছে একটি নির্দিষ্ট মানে রাখে। কিন্তু আপনার কাছে এর কোন অর্থ নেই।

রাসেল : আমরা বিষয়টির উপর একটু চাপ দিতে পারি। আপনার মত অনুযায়ী একটি সত্তা যা অবশ্যই বিদ্যমান এবং বিদ্যমান থাকতে পারে না, অবশ্যই এমন একটি সত্তা হবে যার সারসত্তাই তার অস্তিত্ব।

কপলেস্টোন : হ্যাঁ, এটি এমন একটি সত্তা যার সারসত্তাকে অবশ্যই বিদ্যমান থাকতে হবে। কিন্তু কেবলমাত্র ঈশ্বরের সারসত্তার (essence) ধারণা থেকে আমি কোনো অস্তিত্ব প্রমাণ করতে ইচ্ছুক নই। কারণ এখনো পর্যন্ত ঈশ্বর সম্পর্কে কোন স্বজ্ঞা (intuition) আমাদের আছে বলে আমি মনে করি না। আমি মনে করি অভিজ্ঞতার জগতের দ্বারাই আমাদের ঈশ্বরের বিষয়ে তর্ক চালাতে হবে।

রাসেল : হ্যাঁ, পার্থক্যটি আমি পরিষ্কারভাবেই বুঝতে পারছি। কিন্তু একই কি একটি সত্তা সম্পর্কে যার যথেষ্ট জ্ঞান আছে তার পক্ষেই এটা বলা সত্য হবে যে এই সত্তাটি আছে যার সারসত্তাই তার অস্তিত্ব!'

কপলেস্টোন : হ্যাঁ, যদি কেউ ঈশ্বরকে দেখত তবে অবশ্যই সে বুঝতে পারত যে তিনি অবশ্যই বিদ্যমান।

রাসেল : অতএব আমি বলতে চাই যে এমন একটি সত্তা আছে যার সারসত্তাই তার অস্তিত্ব, যদিও আমরা সেই সারসত্তাকেই জানি না।

কপলেস্টোন : হ্যাঁ, আমি এর সঙ্গে আরও যোগ করব যে আমরা পূর্বকল্পিত বিষয় হিসেবে সারসত্তাকে জানি না। আমাদের অভিজ্ঞতায় কেবলমাত্র একটি সম্ভাব্য কল্পনা যার দ্বারা আমরা সত্তার অস্তিত্ব বিষয়ক জ্ঞানে আসতে পারব এবং কেউ কেউ প্রমাণ করতেই পারে যে সারসত্তা এবং অস্তিত্ব অভিন্ন। কারণ যদি সারসত্তা এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদি অভিন্ন না হত তবে ঈশ্বরের অস্তিত্বের জন্য ঈশ্বরের বাইরে অন্য কোন যথার্থ কারণের প্রয়োজন হয়ে পড়ত।

রাসেল : এবার যথেষ্ট কারণের দিকে সমগ্র বিষয়টি ঘুরে গেল এবং আমি মনে করব যে 'যথেষ্ট কারণ' সম্পর্কে আপনি এমনভাবে ব্যাখ্যা করেননি যাতে বুঝতে পারি— আপনি যথেষ্ট কারণ বলতে ঠিক কি বোঝেন? আপনি কারণ বলতে কিছু বলতে চাননি বোধহয়?

কপলেস্টোন : কখনই নয়। কারণ (cause) হল এক ধরনের 'যথেষ্ট কারণ' (sufficient reason)। একমাত্র অনিশ্চিত সত্তার একটি কারণ থাকতে পারে।

ঈশ্বর তাঁর নিজের জন্য যথেষ্ট কারণ এবং তিনি নিজেই তাঁর কারণ (cause) ন... যথেষ্ট কারণ বলতে আমি বোঝাতে চাই কোন বিশেষ সত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে অনুরূপ বা পর্যাপ্ত ব্যাখ্যার কথা।

রাসেল : কিন্তু ঠিক কখন একটি ব্যাখ্যা অনুরূপ বা পর্যাপ্ত হতে পারবে? ধরুন আমি একটা দেশলাই কাঠি দিয়ে আগুন ধরাতে উদ্যোগী। আপনি বলতে পারেন যে এর জন্য অনুরূপ যে ব্যাখ্যাটি হবে তা হল আমি দেশলাই কাঠিটিকে দেশলাই বাক্সের উপরে ঘষবো।

কপলেস্টোন : বাস্তব উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে এটি ভালো কথা কিন্তু তত্ত্বগত দিক দিয়ে এটা একটি আংশিক ব্যাখ্যা। একটি অনুরূপ বা পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা হল সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা। যার সঙ্গে আর কোন কিছুই নতুন করে যোগ করা সম্ভব নয়।

রাসেল : তা হলে আমি বলতে পারি যে আপনি তাকিয়ে আছেন এমন কিছুর দিকে যেটি কখনই পাওয়া যেতে পারে না এবং যাকে কারুর পাবার আশা করা উচিত নয়।

কপলেস্টোন : একজন এটা দেখেনি বলতে এক জিনিস বোঝায়, কিন্তু একজনের এটা দেখা উচিত নয় বলাটা আমার কাছে গোঁড়ামি মনে হয়।

রাসেল : হতে পারে, তবে আমি জানি না। আমি বলতে চাই একটি বস্তুর ব্যাখ্যা হল একটি অন্য বস্তু যা দ্বিতীয় বস্তুর উপর নির্ভরশীল করে তোলে। আপনি যা করতে চাইছেন তার জন্য আপনাকে একটি দুঃখজনক পথ অবলম্বন করতে হবে যা আমরা করতে পারি না।

কপলেস্টোন : আমাদের বস্তুসকলের দুঃখজনক নকশা (Scheme) সম্পর্কে কিংবা সমগ্র বিশ্বের দুঃখজনক নকশা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই কি আমাদের তোলা উচিত নয়?

রাসেল : হ্যাঁ, আমি মনে করি না এধরণের প্রশ্ন করার মধ্যে কোন রকম অর্থ আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে 'বিশ্ব' (universe) শব্দটিকে আমার সুবিধাজনক শব্দ হিসেবে মনে হয়, কিন্তু আমি মনে করি না কোন কিছুর স্বপক্ষে এই শব্দটি বসালেই তার একটি অর্থ হয়ে যাবে।

কপলেস্টোন : যদি শব্দটি অর্থহীন হয় তা হলে সেটিকে ব্যবহার করাটা খুব সুবিধাজনক হতে পারে না। কোন ক্ষেত্রেই আমি বলি না যে বিশ্বটি সে বস্তুসমূহের থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র যে বস্তুসমূহ তাকে গঠন করেছে। (প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত সারাংশে আমি যার ইঙ্গিত দিয়েছিলাম) যা কিছু আমি করছি তা কারণ খোঁজার জন্যই করছি। এই ব্যাপারে বস্তুসকলের কারণ— একটি বাস্তব বা কল্প সমগ্রতা (totality) যা গঠন করেছে তাকে যাকে আমরা বিশ্ব বলে ডেকে থাকি

[illegible] অথবা যদি আপনি পছন্দ করেন তবে বলব আমার অস্তিত্ব, কিংবা [illegible] যে-কোন অস্তিত্বকে আপনি কি অবোধগম্য বলে মনে করেন?

রাসেল : আমি কি এই প্রশ্ন করতে পারি যে যদি একটি শব্দ অর্থহীন হয় তবে [illegible] সুবিধার্থে ব্যবহারযোগ্য (Handy) হতে পারে না? যে শব্দটি শুনতে ভালো [illegible] বাস্তবে বেঠিক। যেমন 'The' অথবা 'Then'-এর মতো শব্দকেই ধরুন। এই [illegible] দুটি কোন বস্তুকে নির্দেশ করে না, কিন্তু এই শব্দ দুটি যথেষ্ট দরকারি শব্দ। [illegible] মনে করি 'বিশ্ব' (Unvicrsc) শব্দটিও তাই। কিন্তু এই বিষয়টিকে ছেড়ে [illegible] আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন 'বিশ্ব' শব্দটিকে আমি অবোধগম্য ভাবি কি [illegible] করে আমি বলব যে আমি মনে করি 'বিশ্ব'টি অবোধগম্য। — আমি এটাও [illegible] করি যে এর কোন ব্যাখ্যা হয় না। আমার মতে বোধগম্য শব্দটি একটি অন্য [illegible]। বোধগম্যতা নিজেই বস্তুর সঙ্গে অন্তর্নিহিতভাবে কাজ করতে বাধ্য থাকে [illegible] তার সম্পর্কসমূহের সঙ্গে কাজ করতে বাধ্য থাকে না।

কপলেস্টোন : আমি যা বলতে চাই তা হল ঈশ্বরের থেকে বিচ্ছিন্ন জগৎ [illegible] আনুষঙ্গিকভাবে অবোধগম্য। আপনি জানেন আমি বিশ্বাস করি না অনন্তবাচক [illegible] ঘটনাসমূহ বা তার অনুভূমিক ধারাবাহিকতাকে— যদি এই ধরণের [illegible] ধারাবাহিকতাকে অনন্ত ঘটনাসমূহে প্রমাণ করা যেত তবে তা অবস্থার (situation) [illegible] কিছুটা হলেও সঙ্গতিকর হত। যদি আপনি চকোলেটকে যুক্ত করেন তবে [illegible] চকোলেটকেই পাবেন, কখনই ভেড়াকে পাবেন না। যদি আপনি অনন্তের [illegible] চকোলেটকে যুক্ত করতেন তবে আপনি আনুমানিকভাবে অনন্ত সংখ্যা [illegible] পেতেন। তাই যদি আপনি অনিশ্চিত সত্তার সঙ্গে অনন্তকে যুক্ত করেন [illegible] অনিশ্চিত সত্তাকেই পাবেন কখনও প্রয়োজনীয় সত্তাকে পাবেন না। আমার [illegible] অনুযায়ী অনিশ্চিত সত্তাসমূহের অনন্ত ধারাবাহিকতা একটি অনিশ্চিত [illegible] মতোই নিজেই নিজেকে ঘটাতে অসমর্থ (বা নিজেই নিজের কারণ হতে [illegible] অনুবাদক) যদিও আমি মনে করি যে আপনি বলবেন কোন বিশেষ [illegible] অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করবে কে সে সম্পর্কে প্রশ্ন তোলাটা অবৈধ?

রাসেল : যদি এটিকে ব্যাখ্যা করে আপনি এটাই বোঝান তবে তা সর্বৈব [illegible] কেননা আপনি এর একটি কারণ অনুসন্ধান করেছেন।

কপলেস্টোন : যদি তাই হয় তবে একটি বিশেষ বস্তুর বেলায় থামব কেন? [illegible] সমস্ত বিশেষ বস্তুসমূহের অস্তিত্বের কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা উচিত নয়?

রাসেল : কারণ আমার মনে হয় চিন্তা করবার মতো কোন যুক্তি (reason) [illegible] কারণের (cause) সমগ্র ধারণাটি এমন একটি ধারণা যা আমরা বিশেষ [illegible] সমূহের পর্যবেক্ষণ থেকে পেয়ে থাকি। সমগ্র বস্তুসমূহের কোন রকম কারণ [illegible] রকম যুক্তি কোন রকম ভাবে সঙ্গতিকর বলে আমি মনে করি না।

কপলেস্টোন : যদি তাই হয়, তাহলে বলা যায় যে কারণ বলে কিছু নে বিবৃতিটি আমাদের কোন কারণ অনুসন্ধান করা উচিত নয় বিবৃতিটির মধ্যে একরকম নয়। কারণ বলে কিছু নেই তখনই বলা যাবে (যদি কখনও বলা যায়) যখন অনুসন্ধান শেষ হবে, কিন্তু অনুসন্ধান শুরুর সময় এ ধরনের বিবৃতি দেওয়া যায় না। যে-কোন ক্ষেত্রে, যদি সমগ্রের কোন কারণ না থাকে, তাহলে আমার চিন্তাধারা অনুযায়ী তার অবশ্যই নিজের একটি কারণ আছে। যা আমার কাছে অসম্ভব বলে মনে হয়। অধিকন্তু যদি একটি প্রশ্নের উত্তরে এটা বলা যায় যে তা বলে কিছু একটা আছে তবে স্বীকার করে নেওয়া যায় যে প্রশ্নটির অর্থ আছে।

রাসেল : না, এর নিজের কোন কারণের প্রয়োজন নেই। আমি যা বলছি তা হল কারণের কল্পনাকে সমগ্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না।

কপলেস্টোন : তাহলে সারত্রের সঙ্গে আপনি একমত হবেন যে, বিশ্ব হল তা যাকে তিনি 'অকারণ' (gratuitous) বলেছেন?

রাসেল : 'অকারণ' (Gratuitous) যে ধরণের অর্থ বহন করে তা বোধহয় অন্য কোন অর্থ। আমি বলি যে বিশ্বটা বিশ্বই এবং এটাই সব।

কপলেস্টোন : আমি বুঝতে পারছি না কিভাবে সমগ্র (total) অথবা যে-কোন কিছু যা এখানে আছে সে সম্পর্কে কোন বৈধতা না মেনেই আপনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। কেন কিছুই না থাকার থেকে কিছু থাকা ভালো— এটা প্রশ্ন? ঘটনাটি হল যে বিশেষ কারণ থেকে আমরা যে আকস্মিকতার জ্ঞান (Knowledge of casuality) অভিজ্ঞতালব্ধ ভাবে পেয়ে থাকি তা ধারাবাহিকতার কারণ কি এর জিজ্ঞাসার সম্ভাবনাকে অবৈধ করে তোলে না। যদি 'কারণ' (Cause) শব্দটি অর্থহীন হয় অথবা জড়বস্তু (Matter) সম্পর্কে কারেন্টর দৃষ্টিভঙ্গিকে সঠিক বলে দেখানো যেতে পারত তবে আমি মেনে নিতাম যে প্রশ্ন করাটি অবৈধ হবে, কিন্তু আপনি 'কারণ' শব্দটিকে অর্থহীন বলে ধরতে চান না এবং আমি এ-ও মনে করি না যে আপনি একজন কান্টীয় (Kantian)।

রাসেল : আপনার হেত্বাভাস বা দোষ (Fallacy) আমার কাছে কিরকম মনে হয় তা আমি ব্যাখ্যা করতে পারি। বিদ্যমান প্রতিটি মানুষের একটি মা আছে এবং আপনার যুক্তিটি আমার কাছে এরকম মনে হয় যে এইজন্যই মানবজাতির একটি মা আছে, কিন্তু মানবজাতির অবশ্যই কোন মা নেই— এটা তর্কবিদ্যার ভিন্ন ক্ষেত্র।

কপলেস্টোন : এর মধ্যে কোন সমতা দেখতে পাচ্ছি না। যদি আমি বলতাম 'প্রতিটি বস্তুর একটি বাহ্য ব্যাপার সংক্রান্ত কারণ (Phenomenal cause) আছে তাই সমগ্র শ্রেণীর (Whole series) একটি বাহ্য ব্যাপার সংক্রান্ত কারণ আছে

... এখানে একটি সমতা থাকত, কিন্তু আমি তা বলছি না। আমি বলছি, প্রতিটি ... একটি বাহ্য ব্যাপার সংক্রান্ত কারণ আছে, যদি আপনি অনন্ত ... ধারাবাহিকতার (Infinit series) উপর জোর দেন— কিন্তু বাহ্য ব্যাপার সংক্রান্ত ... সমূহের ধারাবাহিকতা, ধারাবাহিকতার সম্পর্কে একটি অপর্যাপ্ত ব্যাখ্যা। ... ধারাবাহিকতার কোন বাহ্য ব্যাপার সংক্রান্ত কারণ নেই কিন্তু তার অজ্ঞেয় ... (Transcendent cause) আছে।

... : এটাই সর্বদা ধরে নেওয়া হয় যে কেবলমাত্র প্রতিটি বস্তুই নয়, ... ভাবে সমগ্র জগতেরও একটি কারণ আছে। কিন্তু এই ধারনার কোন ভিত্তি ... পাই না। তবে যদি আপনি এই ভিত্তির উপর আমাকে কিছু বলেন ... শুনবো।

... : ঘটনাসমূহের শ্রেণী হয় কারণগত অথবা কারণগত নয়। যদি ... কারণগত হয়, তবে শ্রেণীর বাইরে কোন কারণ অবশ্যই থাকবে। যদি এটি ... না হয় তবে তা নিজেই নিজের পর্যাপ্ত কারণ যাকে আমি প্রয়োজনীয় ... । কিন্তু এটি কখনও প্রয়োজনীয় হতে পারে না যেহেতু প্রতিটি সদস্যই ... এবং আমরা এ বিষয়টি মেনেই নিয়েছি যে সমগ্রের কোন বাস্তবতা ... ঐক্যই এটি কখনই প্রয়োজনীয় হতে পারে না— অথবা অকারণগতও ... পারে না— তাই এর অবশ্যই কোন কারণ আছে। আমি বলতে চাই, 'বিশ্বটা ... আছেই এবং তা অনির্বচনীয়'— এই ধরণের বিবৃতি কখনও যুক্তিগত ... থেকে পাওয়া যায় না।

... : এই বিষয়ে আমি উদ্ধত হতে চাই না, কিন্তু আমি বলতে পারি যে ... সব বস্তুসমূহকে কল্পনা করতে পারি যে বস্তুসমূহ আপনার মতে ... কল্পনা করতে পারে না। বস্তুসমূহের কোন কারণ নেই তা পদার্থবিদরা ... নিশ্চিত করে দেখিয়েছেন এই ঘটনার মধ্য দিয়ে যে পরমাণুর মধ্যে ... কোয়ান্টামের স্থানান্তরণের (Individual quantum transition in atom) ... কারণ নেই।

... : এই বিষয়টি একটি অস্থায়ী অনুমান কিনা সে বিষয়ে আমি ... করছি।

... : তা হতে পারে, কিন্তু বিষয়টি এই সত্য প্রদর্শন করছে যে ... আমাদের মন একে কল্পনা করতে পারে।

... : আমি স্বীকার করি কিছু বিজ্ঞানী— পদার্থবিদরা— একটি ... ক্ষেত্রের মধ্যে প্রত্যয়হীনতার (Indetermination) বিষয়টি বাদ দিতে ... কিন্তু অনেক বিজ্ঞানীরা এরকম করতে ইচ্ছুক নন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের

অধ্যাপক ডিঙ্গল্ এই মত পোষণ করেন যে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা
আপেক্ষিক পর্যবেক্ষণ (Correalting observation) বর্তমান পারমাণবিক
সফলতা (অথবা অসফলতা) সম্পর্কে আমাদের কিছু জানাতে পেরেছে কি
প্রকৃতির সম্পর্কে কিছু বলতে পারেনি। অনেক বৈজ্ঞানিক এই দৃষ্টিভঙ্গি
করেছেন। আমি এটাই বুঝে উঠতে পারি না কিভাবে যে-কোন ব্যাপা
পদার্থবিদরা তত্ত্বকে বাস্তব ক্ষেত্রে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হন অথচ তাঁরা তত্ত্ব গঠ
ক্ষেত্রে এরকম করেন না। আমি বুঝতে পারি না প্রকৃতিতে যে বোধগম্য
(Intelligibility) এবং শৃঙ্খল (Order) আছে তার চেয়ে অন্য অনুমানের
কিভাবে বিজ্ঞানকে পরিচালিত করা যেতে পারে। পদার্থবিদরা নীরবতার
পূর্বেই মেনে নেন যে অনুসন্ধানমূলক প্রকৃতির মধ্যে এবং ঘটনাসমূহ
কারণসমূহকে খোঁজার মধ্যে কিছু অর্থ আছে, ঠিক যে-রকমভাবে এক
গোয়েন্দা পূর্বে মেনে নেয় যে খুনীকে খুঁজে বার করাটার মধ্যে একটা অর্থ আ
অধিবিদ্যাবিদরা ধরে নেন যে সরাসরি ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু বা বিষয়ের কারণ খ
যুক্তিকে খোঁজার মধ্যে একটা অর্থ আছে। একজন কান্টীয় না হয়ে আমি মনে ক
যে একজন অধিবিদ্যাবিদ অনুমানের ক্ষেত্রে একজন পদার্থবিদের মতোই
সংগত। উদাহরণস্বরূপ, যখন সারত্রে বলেন যে জগৎটি অকারণ তখন আমি ম
করি তিনি 'অকারণ' বলতে যা বোঝাতে চেয়েছেন সে বিষয়ে পর্যাপ্ত বিবে
করেননি।

রাসেল : এখানে একটি বিশেষ অনধিকার চর্চা হয়েছে বলে আমার মনে হ
একজন পদার্থবিদ কারণের অনুসন্ধান করেন, এবং তা অনিবার্যভাবে এই
প্রকাশ করে যে সর্বত্রই কারণ সমূহের অস্তিত্ব আছে। যে-মানুষটি সোনার খো
করছে সে এই ভেবে সোনার খোঁজ করছে না যে সোনা সর্বত্রই আছে। এই
কথা পদার্থবিদের ক্ষেত্রেও সত্য যখন তিনি কারণসমূহের অনুসন্ধান করেন
সারত্রের কথাই ধরুন। তিনি কি বলতে চেয়েছেন তা আমি জানি বলে দা
করি না, কিন্তু আমার এরকম মনোভাব রাখা উচিত নয় যে তাকে আমি
করতে পারি। আমার দিক থেকে আমি মনে করি যে জগতের খেয়ালের (
of the world) একটি ব্যাখ্যা আছে এরকম মনে করাটা একটা ভুল। আমি
না কেন একজন এইরকম ব্যাখ্যা পাবার আশা করে থাকে এবং আমি মনে
আপনি বিজ্ঞানীদের অনুমানকে কেন্দ্র করে যা বললেন তা একটি অতিবিবৃ

কপলেস্টোন : আমার মনে হয় বিজ্ঞানীরা এই ধরণের অনুমান গঠন ক
যখন একটি বিশেষ সত্তাকে বার করতে তাঁরা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান, তখন
পরীক্ষা নিরীক্ষার পেছনে একটি অনুমান নিহিত থাকে যে বিশ্বটি কোন আ

যাচনা নয়। পরীক্ষা নিরীক্ষার সাহায্যে একটি সত্যকে আবিষ্কার করার সম্ভাবনা থাকে। পরীক্ষা নিরীক্ষা মন্দও হতে পারে, অথবা তাঁরা যে-ফল চান সেই অনুযায়ী না ও হতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে বিজ্ঞানীদের অনুমান অনুযায়ী পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে একটি সত্য আবিষ্কার করার সম্ভাবনা থেকেই যায়। এই কারণেই আমার মনে হয় একটি শৃঙ্খলিত ও বোধগম্য বিশ্বকে অনুমান করা যায়।

রাসেল : আমার মনে হয় আপনি যতটা প্রয়োজনীয় তার থেকে বিষয়টিকে বেশি সাধারণ করে তুলেছেন। নিঃসন্দেহে একজন বিজ্ঞানী অনুমান করতে পারেন যে কোন বস্তুকে বা সত্যকে হয়ত বার করা যাবে এবং প্রায় সে-রকমই বার হবে। কিন্তু তিনি এইরকম অনুমান করেন না যে সেটাই বার হবে। এটাই আধুনিক পদার্থবিদ্যার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

কপলেস্টোন : আমি মনে করি বিজ্ঞানী তার কাজ করতে করতে অনুমান করেন অথবা অনুমান করতে বাধ্য থাকেন। অধ্যাপক হ্যাল্‌ডেনকে উদ্ধৃত করে এটাও বলা যায়, 'যখন আমি কেটলীর নীচে গ্যাস জ্বালালাম তখন জলের কিছু অণু বাষ্প হয়ে উড়ে গেল, কিন্তু কে এই কাজটা করছে তা দেখবার কোন পথ নেই।' তা বলে সম্ভাবনার ধারণাকে (Idea of change) সর্বত্র ব্যবহার করা যাবে কেবলমাত্র আমাদের যেখানে জ্ঞান আছে সেখানে ছাড়া— এই ধরণের ধারণাকে কখনই তিনি অনুসরণ করতে বলেননি।

রাসেল : না, তা অবশ্যই নয়— অন্তত তিনি যা বলেছেন তা যদি আমি করতে পারি। তিনি বহু বস্তুকেই খুঁজে বার করেছেন। বিজ্ঞানীরা জগতে যা কিছু ঘটছে তার অনেক কিছুই খুঁজে বার করছেন, সর্বপ্রথমে যেগুলো সাময়িক শৃঙ্খলসমূহকে (Casual chains) শুরু করেছে।—প্রথম কারণগুলি এমন যে কারণসমূহের নিজেদেরই কোন কারণ নেই। তিনি মনে করেন না যে প্রতিটি বস্তুর একটি কারণ আছে।

কপলেস্টোন : নিশ্চয়ই সেগুলো বিশেষ নির্বাচিত ক্ষেত্রের মধ্যে স্থিত প্রথম কারণ (First cause), কিন্তু আপেক্ষিকভাবে প্রথম কারণ।

রাসেল : আমি মনে করি না যে তিনি এ ধরণের কথা বলবেন। যদি এটি এমন একট জগৎ হয় যেখানে সব ঘটনা না হলেও বেশিরভাগ ঘটনার কারণ আছে, তাহলে তিনি অনুমানের দ্বারা সম্ভাবনা ও অনিশ্চয়তাকে বর্ণনা করতে সক্ষম হবেন যে আপনি যে বিশেষ ঘটনাটির সম্পর্কে উৎসাহিত তার সম্ভবত একটি কারণ আছে। যে-কোন ব্যাপারেই আপনি সম্ভাবনার চেয়ে বেশি কিছু পাবেন না এবং সেটাই যথেষ্ট।

কপলেস্টোন : এটাও হতে পারে বিজ্ঞানী সম্ভাবনার (Probability) চেয়ে বেশি কিছু অর্জন আশা করতে পারে না, কিন্তু প্রশ্নের অবতারণা করে তিনি

অনুমান করেন যে ব্যাখ্যা সম্পর্কিত প্রশ্নের একটি অর্থ আছে। কিন্তু মহানুভব রাসেল, আপনার বিষয়টি কি তাই যে জগৎ সম্পর্কে কোন রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাটাও একটা অবৈধ ব্যাপার?

রাসেল : হ্যাঁ, আমি এমন মতই পোষণ করে থাকি।

কপলেস্টোন : যদি এটা এমন একটি প্রশ্ন হয় যার কোন অর্থ আপনার কাছে নেই, তাহলে তার সম্পর্কে আলোচনা করাটাও দুষ্কর হয়ে উঠবে, তাই নয় কি?

রাসেল : হ্যাঁ, এটা খুবই দুষ্কর। আপনি কি বলেন— আমরা কি অন্য কোন বিষয়ের উপর আলোচনা করতে পারি?

ধর্মীয় অভিজ্ঞতা

কপলেস্টোন : আসুন আলোচনা করা যাক। সম্ভবত আমি ধর্মীয় অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একটি কথা বলতে পারি এবং তারপর আমরা নৈতিক অভিজ্ঞতার উপর আলোচনা চালাতে পারি। আমি মনে করি না ধর্মীয় অভিজ্ঞতার অর্থ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কিত দৃঢ় প্রমাণের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং আলোচনার চরিত্রটির কিছুটা পরিবর্তন হল। আমার মতে এ বলাটা সত্য হবে যে এর সব থেকে উত্তম ব্যাখ্যাটি ঈশ্বরের অস্তিত্বের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা বলতে আমি কেবল মঙ্গলজনক অনুভবকে বোঝাতে চাইছি না। আমি বোঝাতে চাইছি বস্তু সম্পর্কে একটি প্রেমময় অথচ অপরিচ্ছন্ন সচেতনতাকে যা অভিজ্ঞতা অর্জনকারীর কাছে নিজ আত্মার এক ধরণের তুরীয় ভাব। এটি এমন এক ভাব যাকে চিত্রিত করা যায় না অথবা কল্পনা করা যায় না, কিন্তু যার বাস্তবতা সম্পর্কেও কোন সন্দেহ করা অসম্ভব— অন্তত অভিজ্ঞতা অর্জন করার সময় কোন রকম সন্দেহ করাটা অসম্ভব। আমি দাবি করতে পারি যে তা যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব এবং মানসিকভাবে নিজের মনেই নিজে জানা ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। যে-কোন মাত্রায় যে প্রকৃত প্রাথমিক অভিজ্ঞতা এই প্রকল্পের বা অনুমানের উপর সহজেই ব্যাখ্যা করা যায় সে অভিজ্ঞতার কিছু বস্তুগত কারণ আছে।

রাসেল : এই যুক্তির উত্তরে আমি যা বলব তা হল, এই সমগ্র বিষয়টি আমাদের নিজেদের মানসিক অবস্থা থেকে জাত হয়ে আমাদের বাইরে কোন কিছুকে নির্দেশ করে। যা আমার মতে অতি চালাকির বিষয়। এমনকি যখন আমরা সবাই তার ন্যায্যতাকে স্বীকার করে নিই, এবং এইরকম করাটাকে আমরা যখন ন্যায়সংগত বলে অনুভব করি, তখনও বিষয়টিকে আমার এক ধরণের চালাকি মনে হয়। আমরা এরকম করি তার কারণ এটি মানবজাতির একরকম সংস্কার। যদি একটি ঘরে ভীড় থাকে এবং যদি সে ঘরে একটা ঘড়ি থাকে, তবে

পাবে ওই ঘড়িটিকেই দেখতে পাবে। ঘটনাটি হল যে তারা সবাই ঘড়িটিকে দেখতে পাবে। এই ঘটনাটি তাদের এই চিন্তা করাবে যে এই ঘটনাটি কোন ভ্রম বা মায়া নয়। কিন্তু সেখানে এইসব ধর্মীয় অভিজ্ঞতাসমূহ অতি ব্যক্তিগত ধারণ প্রবণতাসম্পন্ন হয়।

কপলেস্টোন : হ্যাঁ, ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে এই রকম ঘটে। আমি যথার্থ ধর্মীয় অভিজ্ঞতার কথা বলছি। আমি কোন ভাবে এই ব্যাপারে দর্শনসমূহকে (Visions) অন্তর্ভুক্ত করছি না। আমি কেবল বোঝাতে চাইছি তুরীয় বস্তু সম্পর্কে ধারণাতাকে বা যাকে তুরীয় বস্তু (Transcendent object) বলা হয়ে থাকে তাকে। আমি সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করি যে তা অবর্ণনীয়। আমার মনে আছে উলিয়াম হাক্সলে তাঁর কোন একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন যে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, যখন অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা, প্রেমে পড়া, কলা ও কাব্যকে প্রশংসা করার ধারণাতার মতোই অনেকটা। তাই আমি বিশ্বাস করি, যখন আমরা কাব্য ও কলাকে প্রশংসা করি তখন আমরা নির্দিষ্ট কোন কবিতাসমূহ ও কলা সম্পর্কীয় কাজকে প্রশংসা করে থাকি। যদি আমরা প্রেমে পড়ি তাহলে আমরা কারুর সঙ্গে প্রেমে পড়ি, কখনই এমন প্রেমে পড়ি না যেখানে কেউ নেই।

রাসেল : কিছুক্ষণের জন্য আমি ধারাবাহিকতাকে ভাঙছি। এই বিষয়টিই যে কখনো ঘটবে এরকম কোন কারণ নেই। যতক্ষণ কিছু জলজ্যান্ত মানুষ কাল্পনিক চরিত্রের প্রেমে আত্মহত্যা না করছে ততক্ষণ জাপানী ঔপন্যাসিকরা মনে করেন যে তাদের সফলতা আসেনি।

কপলেস্টোন : জাপানের এই ধরণের ঘটনার পক্ষে আপনার বক্তব্যকে আমি সমর্থন করি। আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে আমি আত্মহত্যা করিনি, কিন্তু যদি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ পড়ার পর আমি আমার জীবনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য দৃঢ়ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলাম। যদিও আমি অবশ্যই স্বীকার করব যে আমার উপর ওই গ্রন্থ দুটির বাস্তব প্রভাব ও যথার্থ অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মধ্যে আমি কোন সাদৃশ্য দেখতে পাইনি, কেননা একজন বহিরাগত ব্যক্তির সেই অভিজ্ঞতার ধারণা যতটা অর্জন করা যেতে পারে ততটাই আমার ছিল।

রাসেল : আমরা অবশ্যই ঈশ্বরকে উপন্যাসের চরিত্রসমূহের কোন সত্তা হিসাবে দেখবো না। আপনি অবশ্যই স্বীকার করবেন যে এই দুটির মধ্যে একটি পার্থক্য আছে।

কপলেস্টোন : আমি অবশ্যই তা স্বীকার করব। কিন্তু আমি একথা অবশ্য বলব উত্তম ব্যাখ্যা সম্ভবত হয় কোন শুদ্ধ অধ্যাত্মবাদী ব্যাখ্যা (Subjectivisit

explanation) নয়। যদিও অধ্যাত্মবাদী ব্যাখ্যা কিছু বিশেষ মানুষের ক্ষেত্রে সঙ্গ যাদের ভেতর অভিজ্ঞতা ও জীবনের মধ্যে খুব কম সম্পর্কই আছে। মোহগ্র প্রবঞ্চিত ও এমন ধরণের মানুষদের এরকমভাবে দেখতে পাওয়া যায়। নি আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের মতানুযায়ী যাকে শুদ্ধ ধরনের অধ্যাত্মবাদ বলে আমরা মনে করতে পারি, তার অভিজ্ঞতা যখন আপনি পাবেন তখন তার ফল হ গতিশীল ও সৃষ্টিশীল প্রেমের প্রবাহ। আমার মনে হয় অভিজ্ঞতার বিষয়ব কারণের (Objective cause) প্রকৃত অস্তিত্বই তার একমাত্র উত্তম ব্যাখ্যা।

রাসেল : ঈশ্বর বলে কিছু নেই এরকম কিছু নিয়ে আমি গোঁয়ারের ম লড়াই করতে চাইছি না। যে ভাবে আমি অন্য নথিসমূহকে (Records) নিয়ে থাকি সেরকম ভাবে যা নথিভুক্ত তাকেই কেবল গ্রহণ করতে পারি। আমি জানি সেখানে অনেক কিছু সম্পর্কেই বলা হয়েছে। আমি এ বিষয়েও নিশ্চিত যে আপনি মঙ্গলক উপদেবতা এবং অমূলক বস্তু ও শয়তান বিষয়ক বহু জিনিস সেখান থেকে গ্রহ করবেন না যেখানে এই সমস্ত জিনিস সম্পর্কেও ওই একই প্রত্যয় ও বিশ্বাসে সঙ্গে বলা হয়েছে। একজন অতীন্দ্রিয়বাদীর দর্শন (Vision) যদি সত্যই হয় ত শয়তান আছে এই বিষয়টিও সত্য। কিন্তু আমি শয়তান আছে বলে কিছু জা না।

কপলেস্টোন : কিন্তু শয়তানের বিষয়ে বলতে গিয়ে মানুষ দর্শন, ভূ দেবদূত, মঙ্গলকর উপদেবতা এবং আরও অনেক কিছুর কথা বলে থাকে। আ কাল্পনিক ভূত ইত্যাদিকে অবশ্যই বাতিল করব, কারণ আমি মনে করি ব অস্তিত্ব ছাড়াই সেগুলোকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এবং যেগুলোকে দেখা যে পারে বলে মনে হয়।

রাসেল : কিন্তু আপনি কি জানেন না এমন প্রচুর পরিমাণ নথিভুক্ত ঘটনা আছে যেখানে মানুষ তাদের নিজেদের হৃদয়ের ভেতর থেকে শয়তানের কথা শুনেছে ঠিক সেই রকম ভাবে, যেরকম ভাবে ঈশ্বর তাদের হৃদয় থেকে নিজে অতীন্দ্রিয় অস্তিত্ব সম্পর্কে তাদের নিশ্চিত করেছেন। কোন বাহ্যিক দর্শনের কথা এখন বলছি না, আমি সম্পূর্ণভাবে মানসিক অভিজ্ঞতার কথা বলছি। ঈশ্বরে অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মতোই এও সেই একই ধরণের অভিজ্ঞতা এবং আমি এটা বুঝতে পারি না যে কিভাবে অতীন্দ্রিয়বাদীরা আমাদের বলে থাকেন যে ঈশ্ব বিষয়ক যে কোন আলোচনা শয়তান বিষয়ক আলোচনার সমানুপাতিক নয়।

কপলেস্টোন : এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণভাবে একমত। যদিও সেইসব মানু কল্পনা করেছিল বা চিন্তা করেছিল যে তারা শয়তানকে বলতে শুনেছিল বা তা দেখেছিল। শয়তানকে অস্বীকার করে সময় নষ্ট করার কোন ইচ্ছাই আমার নে

[illegible] আমি মনে করি যে মানুষ এই দাবি করেছে যে তারা ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা লাভ [illegible]। অ-খ্রীষ্টীয় প্লুটনিয়ামের ঘটনার কথাই ধরা যাক তিনি স্বীকার করেছেন [illegible] এই ধরণের অভিজ্ঞতা অবর্ণনীয়। বস্তুটি কেবল প্রেমময় এবং এইজন্য তা [illegible] কোন বস্তু নয় যা ভয় বা ঘৃণার কারণ হয়ে থাকে। এবং সেই অভিজ্ঞতার [illegible] সেখানে বহন করা হয়েছে, অথবা আমি বলতে চাই সেই অভিজ্ঞতার [illegible] প্লুটনিয়ামের জীবনের নথিপত্রে বহন করা হয়েছে। যে-কোন ভাবেই [illegible] মনে করা খুবই যুক্তিযুক্ত হবে যে তার এই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল। [illegible] আমরা প্লুটনিয়ামের দয়া ও বদান্যতা সম্পর্কে প্রফিরির তথ্যসমূহকে গ্রহণ [illegible] ইচ্ছুক হই তবে তা আমরা অবশ্যই মেনে নেব বলে আশা করি।

[illegible]সেল : একটি বিশ্বাস মানুষকে খুব নৈতিক করে তোলে এরকম কোন [illegible] নেই, তা সেই বিশ্বাসের স্বপক্ষে যতই বলা হ'ক না কেন।

[illegible]পলেস্টোন : কিন্তু যদি প্রকৃতই প্রমাণ করা যেতে পারে যে বিশ্বাসই মানুষের [illegible] উপর শুভ কার্য করতে পারে তবে তাকে আমি একটি সত্যের সাপেক্ষে [illegible] বলে ধরে নেব, এবং সেই সত্যের সম্পূর্ণ বৈধতাকে মেনে না নিলেও তার যে-[illegible] পরিমাণের ধনাত্মক দিকটিকে মেনে নেব। যে-কোন ঘটনাতেই অতীন্দ্রিয় [illegible]দিতা ও পবিত্র জীবনের পক্ষে প্রমাণ হিসাবে আমি চরিত্রগুলো ব্যবহার করেছি [illegible] তার বিশ্বাসসমূহের পক্ষে কোন প্রমাণ হিসেবে আমি তা দেখাইনি।

[illegible]সেল : কিন্তু আমিও তাকে প্রমাণ হিসেবে মনে করি না। আমি নিজেও [illegible] অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলাম যা আমার চরিত্রকে মৌলিকভাবে পরিবর্তন [illegible] দিয়েছে এবং সেই সময় আমি ভেবেছিলাম মঙ্গলের জন্যই আমার চরিত্রটি [illegible] হয়েছে। সেইসব অভিজ্ঞতাগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল কিন্তু তারা আমার [illegible] কোন অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। আমি মনে করি না যে যদি আমি মনে [illegible] যে তারা আমার বাইরে কোন অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত, তবে ঘটনাটি দাঁড়াত [illegible], সেই অভিজ্ঞতাগুলির এমন একটি কার্যকরী প্রভাব থাকত, যার ফলে [illegible] ঠিক, এই রকম কোন-না-কোন প্রমাণ রাখত।

[illegible]পলেস্টোন : না, তা নয়, আমি মনে করি যে আপনার মঙ্গলজনক [illegible] বর্ণনার মধ্যে দিয়েই যে সত্যের প্রমাণ হচ্ছে সেটাই মঙ্গলজনক কার্য। [illegible] করে মনে রাখবেন, আমি একথা বলছি না যে একজন অতীন্দ্রিয়বাদী তার [illegible] অভিজ্ঞতা বা মধ্যস্থতার ব্যাপারে আলোচনা ও সমালোচনা থেকে মুক্ত [illegible]।

[illegible]সেল : স্পষ্টতই একটি যুবক ছেলের চরিত্র ইতিহাসের কোন মহান মানুষের [illegible] পড়ার পর চিরকালের জন্য দারুণভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং এইরকম

প্রায়শই হয়। এটাও ঘটতে পারে যে সেই মহান মানুষটি পৌরাণিক হয়ে গেছে এবং বিদ্যমান নন, কিন্তু সেই যুবক চিরকালের জন্য এমনভাবে প্রভাবিত হয়েছে যেন সেই মহান মানুষটি নিজেই তাকে এরকম প্রভাবিত করেছেন। এইরকম মানুষ এখানে অনেক আছেন। উদাহরণস্বরূপ, প্লুটার্কের জীবন যে লাইকারগুসকে গ্রহণ করেছিল তিনি কোন কালেও বিদ্যমান ছিলেন না, কিন্তু যদি লাইকারগুসকে পড়েন তবে আপনার এমন মনে হবে যে তিনি আগে বিদ্যমান ছিলেন। তখন আপনি এমন একটি বস্তুর দ্বারা প্রভাবিত হবেন যাকে আপনি ভালোবাসেন কিন্তু তা কোন বিদ্যমান বস্তু নয়।

কপলেস্টোন : এ ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে একমত যে একটি মানুষ উপন্যাসের কোন চরিত্রের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। যা তাকে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে কোন প্রশ্নে না গিয়ে (আমি অবশ্যই বাস্তব মূল্যের কথা বলব) আমি বলব যে সেই মানুষটির অবস্থা (Situation) এবং একজন অতীন্দ্রিয় মানুষের অবস্থা স্বতন্ত্র। সর্বোপরি যে মানুষটি লাইকারগুসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে সে এমন কোন দুর্দমনীয় ধারণা অর্জন করতে পারেনি যে সে যে-অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তা চরম বাস্তব।

রাসেল : আমি মনে করি না যে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি এবং ইতিহাসে এইসব অনৈতিহাসিক চরিত্রগুলির সম্পর্কে আমার যুক্তিটি আপনি ধরতে পেরেছেন। আমি অনুমান করতে পারছি না সেই বিষয়টিকে যাকে আপনি কারণ-নির্ভর কার্য বলে অভিহিত করেছেন। আমি অনুমান করছি, যুবক ছেলেটি এই ব্যক্তির সম্পর্কে পড়ে এবং তাকে বাস্তব বলে বিশ্বাস করে, তাকে ভালোবাসে— যা ঘটা খুবই সহজ এবং তার এই ভালোবাসাটা একটা ভূতকে ভালোবাসার মতো।

কপলেস্টোন : একটি অর্থে সে একটি ভূতকে ভালোবাসছে বিষয়টি যথার্থভাবে সত্য। আমি এই অর্থেই কথাটি বলছি যে সে এক্স বা ওয়াই-কে ভালোবাসছে যে বিদ্যমান নয়। কিন্তু ওই একই সময়ে আমার মনে হয়, সে যাকে ভালোবাসছে সে ভূত নয়। সে অনুভব করে একটি বাস্তব মূল্যকে, এবং এমন একটি ধারণাকে সে স্বীকার করে নেয় যা বস্তুগতভাবে ন্যায্য এবং এই কারণেই তা তার প্রেমকে উত্তেজিত করে তোলে।

রাসেল : এই একই অর্থ আমরা উপন্যাসের চরিত্রগুলি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পূর্বেই পেয়েছিলাম।

কপলেস্টোন : হ্যাঁ, একটি অর্থে মানুষের অশরীরী বা ভূতকে ভালোবাসা যথার্থভাবে সত্য। কিন্তু আর একটি অর্থে সে তাকেই ভালোবাসছে যাকে একটি মূল্য হিসেবে অনুভব করে।

রাসেল : কিন্তু আপনি কি এখন সেই কার্যের কথা বলছেন না, আমি বলতে চাইছি যা কিছু ভালো তাই ঈশ্বর অথবা যা কিছু ভালো তার সমষ্টি ঈশ্বর— এমন একটি ব্যবস্থা যা মঙ্গলময় এবং এই কারণে যখন একটি যুবক কোন কিছুকে ভালোবাসে তখন সেটাই ভালো যেটাকে যে ভালোবাসছে। আপনি কি এগুলেই বলতে চাইছেন? যদি তাই হয় তবে বিষয়টি একটু তর্ক সাপেক্ষ।

কপলেস্টোন : সর্বেশ্বরবাদকে সামনে রেখে ঈশ্বর সমগ্র মঙ্গলের সমষ্টি বা সমগ্র কিছু একটা ব্যবস্থা (System) যা মঙ্গলময়— এরকম আমি বলি না। আমি সর্বেশ্বরবাদী নই, কিন্তু আমি মনে করি যে সমস্ত মঙ্গলময়তা যে-কোন পথেই ঈশ্বরে প্রতিফলিত হয় এবং তাঁর কাছ থেকেই অগ্রসর হয়, এই অর্থে একটি মানুষ যা সত্যই মঙ্গলজনক কোন কিছুকে ভালোবাসে সেই ঈশ্বরকে ভালোবাসে, সামান্যিক যদি সে ঈশ্বরের প্রতি মনোযোগ নাও রাখে তাহলেও। কিন্তু এখনও আমি বলে নেব যে মানুষের এই ধরণের আচরণের ন্যায্যতা নির্ভর করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়ার উপর।

রাসেল : হ্যাঁ, কিন্তু তা প্রমাণ করবার একটি বিষয়।

কপলেস্টোন : একেবারেই ঠিক, কিন্তু আমি অধিবিদ্যাগত বিষয়টিকে প্রমাণপত্র হিসেবে ভাবি, তবে এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে পার্থক্য ঘটবে।

রাসেল : আমি অনুভব করি যে কিছু বস্তু মঙ্গলময় এবং অন্য বস্তুগুলো মন্দ। আমি সেইসব বস্তুকে ভালোবাসি যেগুলো মঙ্গলময়, কেননা সেগুলোকে আমি মঙ্গলময় ভাবি এবং আমি সেই সমস্ত বস্তুকে ঘৃণা করি যেগুলোকে আমি ঘৃণা করি। আমি সেরকম বলি না যে এই বস্তুগুলো ভালো কেননা তারা স্বর্গীয় মঙ্গলময়তার সঙ্গে যুক্ত।

কপলেস্টোন : হ্যাঁ, কিন্তু ভালো ও মন্দের মধ্যে বিচারটি আপনার কি-রকম অথবা এই দুটির মধ্যে পার্থক্য আপনি কিভাবে করেন?

রাসেল : যখন নীল ও হলুদের মধ্যে পার্থক্য করতে যাই তখন আমার বিচারের কোন প্রয়োজন হয় না। নীল ও হলুদের মধ্যে পার্থক্য করতে গেলে আমার কি বিচারের প্রয়োজন? আমি দেখতেই পাই যে তারা স্বতন্ত্র।

কপলেস্টোন : এটি একটি সুন্দর বিচার বলে আমাকে মানতেই হবে। আপনি কিন্তু নীল ও হলুদ রঙকে দেখেই তাদের পার্থক্য করেন, কিন্তু ভালো ও মন্দকে পার্থক্য করার কোন ক্ষমতা বলে?

রাসেল : আমার অনুভবের দ্বারা।

কপলেস্টোন : আপনার অনুভবের দ্বারা আপনি তা করেন। ঠিক আমি এটাই আশা করেছিলাম। আপনি কি মনে করেন শুভ এবং অশুভ বিষয়টি কেবল অনুভবের বিষয়?

রাসেল : কেন এক ধরণের বস্তুকে নীল মনে হয়, এবং অন্য ধরণের বস্তুকে হলুদ মনে হয়? পদার্থবিদদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমি একটু বেশি বা কম উত্তর দিতে পারি এবং ওই একইভাবে একটি জিনিস মঙ্গলময় ও আর একটি জিনিস অশুভ কি করে হয় তার উত্তরও দেওয়া সম্ভব, কিন্তু উত্তরটি বিষয় সাপেক্ষে যাচ্ছে না, তাই আপনাকে আমি উত্তরটি দিতে পারব না।

কপলেস্টোন : বেলসেনের সেনানায়কের আচরণের কথা আলোচনা করা যাক। যা আপনার অনাকাঙ্ক্ষিত ও অশুভ মনে হবে আমার কাছেও তাই হবে, কিন্তু অ্যাডলফ্ হিটলারের কাছে তা মঙ্গলময় ও আকাঙ্ক্ষিত বলে মনে হবে। আমি মনে করি যে আপনি অবশ্যই স্বীকার করে নিয়েছেন যে-বিষয়টি হিটলারের জন্য মঙ্গলজনক আপনার কাছে তা অমঙ্গলজনক।

রাসেল : না, বিষয়টিকে আমি এমন ভাবে নেব না। আমি মনে করি মানুষ এ বিষয়ে ভুল করতেই পারে যেমন সে অন্য বিষয়ে ভুল করতে পারে। যদি আপনার ন্যাবা রোগ হয় তবে আপনি সব কিছুতেই হলুদ দেখবেন কিন্তু সেগুলো হলুদ নয়। আপনি একটি ভুল করছেন।

কপলেস্টোন : হ্যাঁ, একজন ভুল করতে পারে, কিন্তু প্রশ্নটি যদি কেবলমাত্র অনুভব বা আবেগ সম্পর্কিত হয় তবে কি আপনি ভুল করবেন? কি তার আবেগসমূহে আবেদন রাখতে পেরেছিল সে সম্পর্কে হিটলারই সম্ভবত একমাত্র বিচারক।

রাসেল : এটা বলা একদম ঠিক হত যে এটি তার আবেগসমূহে আবেদন রেখেছিল, কিন্তু আপনি সে সম্পর্কে অনেক কিছুই বলতে পারেন, অন্যান্য এতগুলো বিষয়ের মধ্যে কেবলমাত্র ওই একই ধরণের বস্তু যদি হিটলারের আবেগসমূহে আবেদন রাখে তাহলে হিটলার আমার আবেগসমূহে স্বতন্ত্র আবেদন রাখবে।

কপলেস্টোন : বিষয়টি আমি মেনে নিলাম। অনুভবের বাইরে কোন বস্তুর প্রমাণ নেই, তাহলে বেলসেনের সেনানায়কের আচরণকে আপনি কিভাবে নিন্দা করবেন?

রাসেল : ঠিক সেই ভাবে যেভাবে একজন বর্ণান্ধ মানুষকে করা যায়, তার থেকে বেশি কিছু নয়। আমরা বিদ্যাবুদ্ধিগতভাবে একজন বর্ণান্ধ মানুষকে নিন্দা করি ও আমরা এরকম করি ব্যক্তি সংখ্যালঘিষ্ঠদের মধ্যে পড়ে বলেই না?

কপলেস্টোন : এর কারণ হিসেবে আমি বলব সেই মানুষটির যা অভাব তা সাধারণত মানব প্রকৃতির অন্তর্গত।

রাসেল : হ্যাঁ, কিন্তু সে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে পড়ে তবে তার সম্পর্কে আমরা ও কথা বলব না।

কপলেস্টোন : তাহলে আপনি বলবেন যে অনুভবের বাইরে এমন কোন বিষয় ... যা দিয়ে কেউ বেলসেনের সেনানায়ক, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস অথবা ... আর্ক বিশপের আচরণকে আলাদা করে দেখতে পারবে।

... : অনুভব বিষয়টি অতি সাধারণীকরণ। আপনাকে কার্যসমূহের ... এবং সেই প্রভাবসমূহ অনুযায়ী আপনার অনুভবকে নিতে হবে। ... দেখবেন, এই বিষয়ে আপনি একটি যুক্তি দিতে পারেন যদি আপনি বলেন ... কিছু বিশেষ ধরণের ঘটনা আছে যেগুলো আপনার পছন্দ অনুযায়ী নয়। ... আপনি কার্যসমূহের প্রভাবসমূহকে অবশ্যই কারণ হিসেবে মেনে নিতে ... করেন। তখন আপনি খুব ভালো ভাবে বলতে পারবেন যে বেলসেনের ... কার্যসমূহের প্রভাব খুবই যন্ত্রণাদায়ক এবং নিরানন্দজনক ছিল।

কপলেস্টোন : শিবিরে থাকা মানুষের কাছে তা সত্যই নিরানন্দজনক ও ... ছিল বলে আমি স্বীকার করি।

... : হ্যাঁ, কিন্তু তা শুধু শিবিরে থাকা মানুষদের কাছেই নিরানন্দজনক ... না, বাইরের মানুষদের কাছেও তা চিন্তার বিষয় ছিল।

কপলেস্টোন : হ্যাঁ, কল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে পুরোপুরি সত্য। এটাই আমার ... আমি তাদের অনুমোদন করি না এবং আমি জানি যে আপনিও তাদের ... করেন না। আমি বুঝতে পারছি না কি সেই কারণ যে-কারণে আপনি ... অনুমোদন করেন না, কারণ সর্বোপরি সেইসব কার্যসমূহ বেলসেনের ... কাছে আনন্দজনক।

... : হ্যাঁ, কিন্তু আপনি জানেন যে ওই ব্যাপারে আর বেশি কোন দরকার ... একটা দরকার আমার বর্ণ (Colour) উপলব্ধি করবার জন্য আছে। এমন ... মানুষ আছে যারা মনে করে সব কিছুই হলুদ, এমন কিছু মানুষ আছে যারা ... রোগে ভুগছে এবং আমি এটা প্রমাণ করতে পারব না যে বস্তুগুলো হলুদ ... তার কোন প্রমাণও নেই, কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ আমার সঙ্গে একমত ... যে সেগুলো হলুদ নয়, এবং অনেক মানুষ আমার সঙ্গে একমত হবেন যে ... আপনার সেনানায়ক ভুল করেছিলেন।

কপলেস্টোন : আপনি কি কোন নৈতিক বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করবেন?

... : এ সম্পর্কে উত্তর দিতে গেলে একটা বড়োসড়ো উত্তর দিতে হয়। ... আগে বলতে গেলে বলব— হ্যাঁ। তত্ত্বগতভাবে বলতে গেলে বরং যত্ন ... আমার দরকার নৈতিক বাধ্যবাধকতা ব্যাখ্যা করা।

কপলেস্টোন : আপনি কি মনে করেন যে 'উচিত' (ought) শব্দটির একটি ... অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আছে।

রাসেল : না, আমি তা মনে করি না, কারণ আপনি জানেন, কিছুক্ষণ আগে আমি বলেছিলাম, কারুকে কার্যের হিসেবে নিতেই হয়, এবং আমি মনে করি সঠিক আচরণ হল তাই যা ঘটনাসমূহের (circumstances) মধ্যে নিহিত সমস্ত সকল রকমের কার্যসমূহের (Acts) অন্তর্নিহিত মূল্যের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ভারসাম্য তৈরি করে এবং আপনি যাকে সঠিক কাজ বলে ভাবেন সেই কাজের সম্ভাব্য প্রভাবসমূহের (effects) হিসেবটা আপনাকে নিতেই হয়েছে।

কপলেস্টোন : নৈতিক বাধ্যবাধকতার বিষয়টি আমি নিয়ে এসেছি কারণ আমি মনে করি যে এই পথেই কেউ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে। মানবজাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ভুল ও ঠিকের মধ্যে একটি পার্থক্য টেনে এনেছিল এবং ভবিষ্যতেও আনবে। আমি মনে করি যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের নৈতিক ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতার একটি চেতনা আছে। আমার মত হল এই যে বাধ্যবাধকতা, নৈতিক আইনের চেতনা এবং মূল্যের অনুভবের ব্যাখ্যা সব চেয়ে ভালো হয়ে থাকে মূল্যের তুরীয় ভিত্তি (Transcendent Ground Of Value) বা নৈতিক আইনের রচনাকারের কল্পনার মধ্য দিয়ে। 'নৈতিক আইনের রচনাকার' বলতে আমি বোঝাতে চাইছি নৈতিক আইনের একজন খামখেয়ালী রচনাকারের কথা। বাস্তবে আমি মনে করি যে আধুনিক নাস্তিকেরা উল্টো পথে গিয়ে এই যুক্তি দেখান যে 'ঈশ্বর বলে কিছু নেই, সুতরাং কোন পরম মূল্য বা পরম আইন বলে কিছু নেই'— বিষয়টি পুরোপুরি যুক্তিযুক্ত।

রাসেল : আমি 'পরম' শব্দটি পছন্দ করি না। আমি মনে করি না পরম বলে কোন কিছু থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, নৈতিক আইন সর্বদাই পরিবর্তিত হচ্ছে। মানবজাতির ক্রমবিবর্তনের কোন একটি সময় সবাই মনে করত নরখাদকতা একটি কর্তব্য।

কপলেস্টোন : আমি মনে করি না যে কোন বিশেষ 'নৈতিক' বিচারসমূহের মধ্যে স্বতন্ত্রতা নৈতিক আইনের চিরন্তনতার বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্তমূলক যুক্তি খাড়া করতে পারে। কিছুক্ষণের জন্য আসুন আমরা মনে করি যে পরম নৈতিক মূল্যসমূহ বলে কিছু আছে। এমনকি এই কল্পনার উপর নির্ভর করে আশা করা যেতে পারে যে স্বতন্ত্র ব্যক্তিসমূহ এবং স্বতন্ত্র সম্প্রদায়সমূহ সেইসব মূল্যসমূহের অন্তরে বিভিন্ন মাত্রায় অন্তর্দৃষ্টিকে ভোগ করে থাকে।

রাসেল : একজনের 'উচিত' (ought) বলতে ধরণের অনুভব কাজ করে আমি ঠিক সেই অনুভবের সঙ্গে 'উচিত' কথাটিকে নিতে উৎসাহী এবং অনুভবের সেই অনুরণনের সঙ্গে নিতে চাই যেভাবে একের পর এক মানুষের পিতামাতারা তাদের ধাত্রীরা এখনও পর্যন্ত নিয়ে আসছে।

পালেস্টোন : আমি বিস্মিত হব যদি আপনি কেবল পিতামাতা ও ধাত্রীদের কাছে 'উচিত' শব্দটির ধারণাকে বাজে অজুহাত দিয়ে এড়িয়ে যান। আমি [illegible] জানি না কিভাবে এই শব্দটি নিজের অর্থের চেয়ে অন্যভাবে কোন [illegible] কাছে প্রকাশিত হতে পারে। আমার মনে হয় যে যদি মানুষের বিবেক-[illegible] একটি নৈতিক শৃঙ্খলা থাকত তাহলে সেই নৈতিক শৃঙ্খলা ঈশ্বরের অস্তিত্ব [illegible] অবোধগম্য হত।

[illegible]গেল : তাহলে আপনাকে দুটি বস্তুর মধ্যে একটি বা অন্যটির সম্পর্কে [illegible] হবে। ঈশ্বর খুব কম শতাংশ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন— যাদের মধ্যে [illegible] পড়েন— অথবা তিনি বর্বরদের বিবেকের মধ্যে যা বলে থাকেন তা সত্য [illegible]

পালেস্টোন : আপনি জানেন, আমি এ-রকম কোন প্রস্তাব করছি না যে [illegible] ঈশ্বর বিবেককে নৈতিক উপদেশ প্রদান করেন। নৈতিক আইনের [illegible] বা আধেয় সম্পর্কে মানবজাতির ধারণা পরিবেশ ও শিক্ষার বিশাল [illegible] উপর নিশ্চিতভাবে নির্ভর করে এবং একটি মানুষ তার সামাজিক [illegible] প্রকৃত নৈতিক ধারণাসমূহের বৈধতা নির্ধারণের যুক্তিকে অবশ্যই [illegible] করবে। কিন্তু গৃহীত নৈতিক সংহিতার সমালোচনার সম্ভাবনাকে সামনে [illegible] আগেই মনে করে নেওয়া হয় যে একটি বস্তুগত মান বিদ্যমান, ফলস্বরূপ [illegible] আদর্শ নৈতিক শৃঙ্খলা আছে যা নিজেই নিজেকে স্থাপন করে (আমি [illegible] চাই যার বাধ্যবাধকতামূলক চরিত্রকে স্বীকার করে নেওয়া যায়)। আমি [illegible] যে এই আদর্শ নৈতিক শৃঙ্খলার স্বীকৃতি অনিশ্চয়তার স্বীকৃতির একটি [illegible] ঈশ্বরের অস্তিত্বের বাস্তব ভিত্তির অর্থ প্রকাশ করে।

[illegible]গেল : কিন্তু আমার মনে হয় যে আইন-প্রণেতা সর্বদা কারুর পিতামাতা [illegible] রকম কিছু হয়ে আসছে। এই হিসেবে বহু পার্থিব আইন-প্রণেতা আছেন [illegible] এই কারণেই বলা যায় কেন ভিন্ন কাল ও দেশের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের [illegible] আশ্চর্যরকম স্বতন্ত্র।

পালেস্টোন : বিশেষ নৈতিক মূল্যসমূহে যে-ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় তাকে [illegible] করতে এটি সাহায্য করে, যদি না হত, তবে তা ব্যাখ্যাতীত হয়ে যেত। [illegible] বস্তুর উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা সেই নৈতিক আইনের বিষয়ে যে-[illegible] ঘটে চলেছে তাকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে যে-নৈতিক আইন তা [illegible] (nation)অথবা ওই জাতি, অথবা এই ব্যক্তি অথবা ওই ব্যক্তির দ্বারা [illegible] কিন্তু কান্টের ভাষা যার আকারকে (Form) নিরপেক্ষ অনুজ্ঞা বা পরম [illegible] (Categorical imperative) বলা যায় সেই 'উচিত' (Ought) শব্দটি

কিভাবে পিতামাতা ও ধাত্রীর দ্বারা বাহিত হয়ে অন্যের কাছে পৌঁছচ্ছে তা আমি বুঝতে পারছি না। যতদূর আমি জানি, এমন কোন পদ নেই যার দ্বারা 'ঔ' শব্দটিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এই শব্দটিকে কেবল এই শব্দের দ্বারাই ব্যাখ্যা করা যায়, অন্য কোন পদের দ্বারা একে ব্যাখ্যা করা যায় না, কারণ একবার 'ঔ' শব্দটিকে কেবল এই শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা না করে অন্য পদের দ্বারা ব্যাখ্যা করে আপনি বিষয়টিকে এড়িয়ে গেছেন। 'উচিত' শব্দটি আর বেশি দিন নৈতিক 'উচিত' (Moral ought) রইল না। শব্দটি অন্য আরও কিছু অর্থ বহন করে।

রাসেল : আমি মনে করি 'উচিত' শব্দের অর্থটি কোন কল্পিত অসম্মতি প্রভাব যা ঈশ্বরের কোন কল্পিত অসম্মতিও হতে পারে। অবশ্য এটি কারুর কাছে অসম্মতি এবং আমার মতে এটিই 'উচিত' শব্দটির অর্থ।

কপলেস্টোন : আমার মনে হয় শব্দটি বাহ্যিক প্রথা ও ধর্মীয় নিষেধ এরকম এমন কিছুর অর্থ বহন করবে যাকে পরিবেশ এবং শিক্ষার মধ্য দিয়ে সহজেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কিন্তু সবকিছু যার অন্তর্ভুক্ত তাকেই আমি আইনের বিষয় বা বিষয়ের আধেয় (Content) বলে থাকি। 'উচিত' (Ought) এমনই একটি শব্দ যা যে-কোন মানুষের দ্বারা কখনই আর একটি মানুষের কাছে বাহিত হতে পারে না, কারণ এমন অন্য কোন পদসমূহ নেই যার দ্বারা এই শব্দটি বাহিত হতে পারে। এই শব্দটি আমার কাছে পুরোপুরি— (রাসেল কপলেস্টোনের কথাটি শেষ করতে না দিয়ে বললেন)—

রাসেল : আমি এরকম কথা বলবার কোন যুক্তি দেখি না— আমি বোঝাতে চাইছি যে আমরা সবাই জানি অবস্থাসাপেক্ষ প্রতিক্রিয়াসমূহকে (Conditioned re-flexes)। আমরা জানি যে একটি জন্তু যদি কোন একটি কাজ করার জন্য বারবার এক ধরণের শাস্তি পেয়ে থাকে তবে কিছুকাল পরে সে ক্ষান্ত হয়ে যাবে। আমি মনে করি না যে জন্তুটি এই যুক্তি নিজের মধ্যে তুলে নিজেকে ক্ষান্ত করবে যে 'আমি যদি এই কাজটি করি তবে প্রভু রাগ করবেন"।' তার এই অনুভূতি কাজ করবে, যে ওই কাজটি করবার মতো কাজ নয়। এটাই একমাত্র আমি আমাদের সঙ্গে করতে পারি, আর কিছু নয়।

কপলেস্টোন : একটি জন্তুর কোন নৈতিক বাধ্যবাধকতা আছে বলে মনে করার কোন যুক্তি আমি দেখি না। একটি জন্তু তার অমান্যতাধর্মী কার্যকলাপ করবার জন্য নৈতিকভাবে দায়ী হবে এরকমভাবে একটি জন্তুকে আমরা অভিযুক্ত দেখি না। কিন্তু একটি মানুষের নৈতিক মূল্যসমূহ ও বাধ্যবাধকতার বোধ আছে। একটি মানুষকে মানুষ যে মর্যাদা দেবে তা একটি জন্তুকেও দেওয়া যেতে পারে বলে আমি মনে করি না। আমি মনে করি না যদি কেউ এমন করেও তবে

আপনি সত্যই এরকম করতে চাইবেন। যদি 'আচরণবাদ' সত্য হত তাহলে সম্রাট [illegible] এবং আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের নৈতিক উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন স্বতন্ত্রতা [illegible] না। মহানুভব রাসেল, আপনি জানেন যে আপনি বেলসেনের [illegible]কের আচরণকে নৈতিকভাবে দূষণীয় বলে মনে করেন, কিন্তু আপনি [illegible] ধরণের কার্যের কোন পরিবেশে কখনই থাকেননি, অথচ আপনি কি [illegible] মনোভাব পোষণ করেন যে সম্ভবত মানবজাতির সুখের ভারসাম্য কিছু [illegible]র উপর এই রকম জঘন্য আচরণ চালিয়ে বাড়ানো যেতে পারে?

রাসেল : আমি একটি পাগলা কুকুরের আচরণকে কখনই অনুকরণ করব না। [illegible]টি হল এই যে আমি এটা করব না বললেই তা বাস্তবে এই প্রশ্নের জবাব [illegible] যাবে না।

কপলেস্টোন : না, যদি আপনি ঘটনার ফল হিসেবে ঠিক ও ভুলের [illegible]তামূলক ব্যাখ্যায় যেতেন তবে হয়ত এই রকমই হত। আমি মনে করি [illegible] ধরণের নাৎসি এরকমই ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, যদিও এই ধরণের ব্যাখ্যা [illegible]টা অনুশোচনামূলক, তবে অনেক পরে যে ভারসাম্য আমরা দেখতে পাব [illegible]কে আরও বেশি করে সুখি করবে। আমি মনে করি না যে আপনি এরকম [illegible] বলবেন, আপনি কি এরকম বলবেন? আমার ধারণা অনুযায়ী আপনি বলে [illegible] এই ধরণের কাজ ঠিক নয়— তা সত্ত্বেও যদি আপনি একথা বলতে প্রস্তুত [illegible] তবে আমি মনে করব যে আপনার অবশ্যই ভুল বা ঠিকের একটি মানদণ্ড [illegible] মানদণ্ড যে-কোন ভাবেই হ'ক অনুভবের বাইরে। আমার কাছে মনে [illegible] অনুভবের বাইরে কোন মানদণ্ডকে মেনে নিলে শেষে ফলস্বরূপ তা মূল্যের [illegible] ঈশ্বরে গিয়ে দাঁড়াবে।

রাসেল : আমার মনে হচ্ছে সম্ভবত আমরা সব গুলিয়ে ফেলছি। এটি কার্য [illegible] এমন একটি সরাসরি অনুভব নয় যার দ্বারা আমি বিচার করব, কিন্তু [illegible]টি কার্যসমূহ অনুযায়ী বরং একটি অনুভব। আমি এমন কোন পরিস্থিতিকে [illegible] করি না যেখানে বিশেষ ধরণের কিছু আচরণ মঙ্গলজনক কার্য করবে। [illegible] এমন কোন পরিস্থিতির কথা কল্পনা করতে পারি না যেখানে এই ধরণের [illegible] কোন লাভজনক কার্য করতে পেরেছে— যদিও আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও [illegible] বাধ্য হচ্ছি— 'আমি এইগুলি পছন্দ করি না, কিন্তু আমি এগুলির বিষয় [illegible] হচ্ছি ঠিক যেভাবে আমি অপরাধমূলক আইনের সম্পর্কে একমত হয়ে [illegible] যদিও আমি শাস্তিকে গভীরভাবে অপছন্দ করি।

কপলেস্টোন : সম্ভবত এইবার আমি আমার অবস্থান গুছিয়ে নেব। আমি দুটি [illegible] যুক্তি প্রদর্শন করেছি। প্রথম, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অধিবিদ্যার যুক্তির দ্বারা

দার্শনিকভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে, দ্বিতীয়, একমাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্বই এম
একটি ঘটনা যা মানুষের নৈতিক অভিজ্ঞতা ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতার চেতনা তৈ
করতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে, আমি মনে করি যে মানুষের নৈতিক বিচারে
পরিমাপ করবার জন্য আপনার পথ অনিবার্যভাবে এমন একটি স্ববিরোধের দি
নিয়ে যায় যেখানে আপনার তত্ত্ব যা বোঝাতে চায় এবং আপনার নিজের স্বতঃস্ফূ
বিচার দুটি একে অপরের থেকে ভিন্ন। অধিকন্তু আপনার তত্ত্ব নৈতি
বাধ্যবাধকতাকে বাতিল করে দেয় এবং বাতিল করে দেওয়া বিষয়টির কো
ব্যাখ্যা হতে পারে না। অধিবিদ্যাগত বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এ
ঐকমত্যে আসতে পেরেছিলাম যে জগৎটি অনিশ্চিত সত্তার দ্বারা গঠিত। অর্থা
তা এমন একটি সত্তা যার নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে কেউই কোন কিছু নির্ণয় কর
পারে না। আপনি বলেন ঘটনাসমূহের ধারাবাহিকতার (Series of events) কো
ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। আমি বলি যে যদি কোন প্রয়োজনীয় সত্তা না থাকে
তাহলে কোন সত্তা অবশ্যই বিদ্যমান থাকবে না এবং বিদ্যমান থাকতে পারে
এবং কিছু বিদ্যমান থাকবে না। অনিশ্চিত সত্তাসমূহের ধারবাহিকতার অসীম
যদি প্রমাণিতও হয় তবুও তা অসঙ্গত প্রমাণিত হবে। কিছু অবশ্যই বিদ্যমা
এইজন্য এমন কিছু অবশ্যই থাকবে যা এই ঘটনার কারণ, আর তা হল এম
একটি সত্তা যা অনিশ্চিত সত্তাসমূহের ধারাবাহিকতার বাইরে অবস্থিত। যা
আপনি এটি স্বীকার করেন তাহলে আমরা এই আলোচনা করতে পারব যে সত্তা
ব্যক্তিগত, মঙ্গলময় এবং এরকম আরও অন্য কিছু কি না। প্রকৃত যে বিষয়টি
উপর আলোচনা হয়েছে তা হল প্রয়াজনীয় সত্তা আছে কি নেই তার উপর।
বিষয়ে আমি ধ্রুপদী দার্শনিকের সঙ্গে আমার নিজে মিল খুঁজে পেয়েছি।

আমি মনে করি যে আপনি এই মত পোষণ করেছেন যে বিদ্যমান সত্তাসমূ
কেবলমাত্র এখানে আছে বলেই আছে, তাই তাদের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা সম্পর্কে প্র
তোলার কোন ওজর আমার নেই। কিন্তু আমি এই বিষয় অবশ্যই নির্দেশ করা
যে এই অবস্থাকে কোন যুক্তিগত বিশ্লেষণের দ্বারা সত্য বলে প্রমাণ করা যাবে
এটি এমন এক দর্শনকে (Philosophy) প্রকাশ করে থাকে যা নিজেই নি
প্রমাণ রূপে দাঁড়ায়। আমি মনে করি আমরা একটি কানাগলির মধ্যে ঢুকে প
কারণ আমাদের দর্শনের ধারণাসমূহ মৌলিকভাবে স্বতন্ত্র। আমার মনে হয়
যাকে আমি দর্শনের একটি অংশ বলে ভাবি তাকে আপনি সমগ্র দর্শন
ভাবেন, অন্তত যতদূর পর্যন্ত আপনি দর্শনকে যুক্তিযুক্ত বলে ভাবেন ততটা পর্য
আপনি তাকে দর্শন বলে ভাবেন। যদি আপনি আমায় ক্ষমা করেন তবে বলব
আপনার নিজের যৌক্তির ব্যবস্থা যাকে আপনি সেকেলে যুক্তির (উদ্দেশ্য

বিশ্লেষণ) বিপরীতে 'আধুনিক' বলে আখ্যায়িত করেন, তা করতে গিয়ে আপনি আমার এক দর্শন পোষণ করে থাকেন যাকে যৌক্তিক বিশ্লেষণের দ্বারা কখনই সত্য বলে প্রমাণ করা যাবে না। সর্বোপরি, ঈশ্বরের অস্তিত্বের সমস্যা একটি অস্তিত্ববাচক সমস্যা যেখানে যৌক্তিক বিশ্লেষণ অস্তিত্বের সমস্যার সঙ্গে সরাসরি কোন সম্পর্ক ঘটায় না। সুতরাং আমার মনে হয় যে পদসমূহ কেবল একটি সমস্যাসমূহের গুচ্ছের সঙ্গে জড়িত এরকম ঘোষণা করাটা অর্থহীন কেননা তা অন্য সমস্যাসমূহের গুচ্ছের ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব আলোচনা শুরুর সময় থেকে স্থাপন করতে হবে এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বের জন্যই আলোচনা বিস্তৃতি ঘটে। এটি নিজেই একটি দার্শনিক কার্য যা ন্যায্যতা বা সত্যতা নিরূপাদনের প্রয়োজনে নিজেই নিজের পক্ষে দাঁড়ায়।

রাসেল : আমার বক্তব্যের সারাংশ হিসেবে আমি অল্প কিছু বলতে চাই। প্রথমত, অধিবিদ্যাগত বিষয়ের দিক থেকে আমি 'অনিশ্চিত' জাতীয় কোন পদকে স্বীকার করি না অথবা ফাদার কপলেস্টোনের মতানুযায়ী এরকম ধরণের ব্যাখ্যার সম্ভাবনাকেও আমি স্বীকার করি না। আমি মনে করি 'অনিশ্চিত' শব্দটি বিশেষভাবে কোন কিছুর সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে যা আপনার মতানুযায়ী এক ধরণের দৈবাৎ চরিত্রসম্পন্ন এবং আমি একমাত্র কারণগত অর্থ ছাড়া সত্য বলে কোন কিছুকে চিন্তা করি না। আপনি কখনও কখনও কোন বস্তু সম্পর্কে কারণগত ব্যাখ্যা দিতে পারেন যাকে আপনি কোন কিছুর প্রভাব বা কার্য ভাবেন, কিন্তু তা একটি জিনিসের পরিবর্তে আর একটি জিনিস বোঝাচ্ছে এবং আমার মতে যে-কোন কিছুর সম্পর্কে ফাদার কপলেস্টোনের ধারণা অনুযায়ী কোন ব্যাখ্যা নেই যে-সব বস্তুসমূহকে আখ্যায়িত করা হচ্ছে তার কোন অর্থই নেই কারণ তারা হতে পারে সেরকম বস্তু বলে কিছুই নেই। এই কারণেই ফাদার কপলেস্টোনের অভিযোগ সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা বলব। তাঁর অভিযোগ কান্টের মতোই আমি তর্কবিদ্যাকে সম্মান করি-- তবে সেটা কোন ঘটনাই হতে পারে না। আমি দর্শনের মতো তর্কবিদ্যাকে কোন মতেই মেনে নিই না। আমি মনে করি তর্কবিদ্যা দর্শনের একটি অতিপ্রয়োজনীয় অংশ এবং দর্শনে তাকে অবশ্যই ব্যবহৃত হতে হয় এবং তার ফলে আমি মনে করি তিনি এবং আমি একই জায়গায় অবস্থিত। তিনি যে-তর্কবিদ্যা ব্যবহার করেন তা কান্টের সময় নতুন ছিল এবং সেগুলোর বেশিরভাগ ছিল এক ধরনের গুজব হেগেল এবং অ্যারিস্টটল সেই তর্কবিদ্যা সম্পর্কে নিজেও হট্টগোল তৈরি করেন। বর্তমানে এটি পুরোনো ও সম্মানীয় হয়ে পড়েছে এবং আপনি অবশ্যই এর থেকে বেশি হইচই করবেন না। যে-তর্কবিদ্যায় আমি বিশ্বাসী তা

তুলনামূলকভাবে নতুন এবং এই কারণে আমি একে নিয়ে হইচই করবার জন্য অ্যারিস্টটলকে অনুকরণ করতে বাধ্য হয়েছি, কিন্তু তা বলে আমি এর সব কিছু যে দর্শন বলে মনে করি না তা নয়। আমি মনে করি এটি দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং যখন আমি তা বলি তখন সেই বা সেই শব্দের কোন অর্থও আমি দেখতে পাই না এবং যেভাবে একটি বিশেষ শব্দকে আমি খুঁজে বার করেছি তার ভিত্তির এটাই পুঙ্খানুপুঙ্খ কারণ যে আমি তা পেরেছি কারণ আমি সেই শব্দগুলোকে নিয়ে চিন্তা করেছি। তবে অধিবিদ্যায় ব্যবহৃত সমস্ত শব্দগুলোই অর্থহীন তা ভাবার কোন কারণ নেই, অথবা এইরকম যে-কোন কিছু সম্পর্কে আমার সত্যই কোন ধারণা নেই।

নৈতিক বিষয় সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে আমি দেখি নৃতত্ত্ব ইতিহাস পড়বার সময় কিছু মানুষ কার্যটিকে জঘণ্য বলে মনে করে এবং এই কারণেই আমি নৈতিক বাধ্যবাধকতার বিষয়ে স্বর্গীয় উৎসকে স্বীকার করতে পারি না, অবশ্য ফাদার কপলেস্টোন আমাকে তার উত্তর দেবার জন্য অনুরোধ করেননি। নিজের বাবাকে খেয়ে আনন্দ কর এবং এরকম আরও অনেক কিছু, যাকে নৈতিক বাধ্যবাধকতা হিসেবে ভাবা হয় সেইরকম নৈতিক বাধ্যতাকে আমি কখনও খুব সুন্দর ও মহৎ বস্তু বলে ভাবতে পারি না। এজন্যেই নৈতিক বাধ্যবাধকতা অর্থে আমি কোন স্বর্গীয় উৎসকে আরোপ করি না, আমি মনে করি বিষয়টিকে সহজ ভাবে একেবারে অন্য পথ দিয়েও নির্ণয় করা যায়।

১৪

ধর্ম কি আমাদের অসুখ সারাতে পারে?

(এই প্রবন্ধটির দুটি অংশ স্টকহোমের সংবাদ পত্রিকা Dagens Nyheter-এ প্রকাশিত হয় ৯ই নভেম্বর ও ১১ই নভেম্বর ১৯৫৪ সালে।)

মনুষ্যজাতি আজ ভয়ঙ্কর বিপদ ও ভীতির সম্মুখীন। ভীতি মানুষকে আজ ধর্মের আশ্রয় খোঁজার প্রবণতাসম্পন্ন করে তুলেছে। সমগ্র পশ্চিমে ধর্মের সাধারণ পুনরুত্থান ঘটে গেছে। নাৎসি ও কম্যুনিষ্টরা খ্রীষ্টান ধর্মকে পরিত্যাগ করেছে এবং আমাদের অনুশোচনাকর সব কাজগুলোই তারা করেছে। এই সিদ্ধান্তটি নেওয়া খুব সহজ হবে যে হিটলার এবং সোভিয়েত সরকারের দ্বারা খ্রীষ্টানধর্মকে অস্বীকার আমাদের অসুখের কারণের জন্য অন্তত আংশিকভাবেও দায়ী, কেননা যদি জগৎ খ্রীষ্টীয়ধর্মে আবার ফিরে আসত তবে আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান হত। আমার বিশ্বাস যে সন্ত্রাস থেকেই এই ধরণের সম্পূর্ণ ভ্রমের জন্ম হয়ে থাকে এবং আমি মনে করি যে এটা একটা বিপজ্জনক ভ্রম কারণ এটা সেইসব মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করে যাদের চিন্তাভাবনা হয় ফলপ্রসূ হতে পারত অথবা ন্যায্য সমাধানের পথে পরিচালিত হত।

এর সঙ্গে জড়িত প্রশ্নটি কেবলমাত্র বর্তমান জগতের অবস্থার সঙ্গেই সম্পর্কিত নয়। এটা খুবই সাধারণ প্রশ্ন এবং তাকে নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহু বিতর্ক ঘটে গেছে। প্রশ্নটি হল এই যে গোঁড়া ধর্মের সাহায্য না পেলে সমাজগুলো সাধারণ নৈতিকতাকেও যথার্থভাবে পালন করতে পারত না। আমি নিজেই মনে করি যে ধর্মের উপর নীতিগুলোর নির্ভর ততটাই। যতটা ধার্মিক মানুষেরা তাদেরকে ধারণ করে। এমন কি আমি এও মনে করি যে যারা ধর্মীয় গোঁড়ামীকে অস্বীকার করে তারা বরঞ্চ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক উৎকর্ষতাকে পালন করে থাকে তাদের চেয়ে অনেক যারা ধর্মের গোঁড়ামীকে গ্রহণ করে থাকে। বিশেষ করে সত্যের ধর্ম এবং বুদ্ধিগত অখণ্ডতার ক্ষেত্রে এই সত্যকে মেনে নিতে হবে বলে আমি মনে করি। বুদ্ধিগত অখণ্ডতা বলতে আমি বোঝাতে চাইছি প্রমাণ সাপেক্ষে কষ্টকর প্রশ্নসমূহ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার অভ্যাসকে অথবা সেইসব প্রশ্নসমূহকে সিদ্ধান্তহীন ভাবে পরিত্যাগ করার অত্যধিক অভ্যাসকে যেখানে প্রমাণ অমীমাংসিত। যদিও এই ধরণের নৈতিক উৎকর্ষতা গোঁড়া ধর্মব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত মানুষের দ্বারা অবহেলিত, তবু আমার মতে এই ধরণের ধর্মের বিরাট সামাজিক গুরুত্ব আছে এবং খ্রীষ্টধর্ম অন্য কোন সংগঠিত বিশ্বাসের ব্যবস্থার চেয়ে এই ধর্ম জগতের কাছে লাভজনক।

আসুন আমরা কিছুক্ষণের জন্য বিবেচনা করে দেখি কি নৈতিক নিয়মগুলি গৃহীত হয়েছে। নৈতিক নিয়মগুলি বিশদভাবে দু'প্রকার, ধর্মীয় শাস্ত্রে যে নৈতিক নিয়মগুলি দেখা যায় সেগুলির শাস্ত্রীয় ভিত্তি ছাড়া আর কোন ভিত্তি নেই এবং এমন কিছু নৈতিক নিয়ম আছে যা স্পষ্টতই সামাজিক উপযোগিতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। গ্রীসের গোঁড়া (orthodox) গীর্জার নিয়ম অনুযায়ী একই বাচ্চার দু'জন ধর্মপিতামাতা (Godparents) অবশ্যই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবে না। স্পষ্টতই এর নৈতিক নিয়মের শাস্ত্রীয় ভিত্তি ছাড়া আর কিছুই নেই এবং যদি আপনি মনে করেন যে নিয়মটি গুরুত্বপূর্ণ তা হলে একথা বলে আপনি ঠিক করবেন যে ধর্মের এই ব্যাপারটিকে পরিহার করে চলতে হবে কারণ তা না হলে তা লঙ্ঘিত নৈতিক নিয়মের দিকে পরিচালিত হবে। কিন্তু এই নৈতিক নিয়মগুলি এমন কোন নিয়ম না যাকে ঘিরে প্রশ্ন উত্থিত হবে। যে-সমস্ত নৈতিক নিয়মগুলি প্রশ্নের সম্মুখীন, বুঝতে হবে সেগুলির শাস্ত্রীয় নিয়মের বাইরে সামাজিক গুরুত্ব আছে।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা চৌর্যবৃত্তিকে নিতে পারি। যে সম্প্রদায়ে প্রত্যেকেই চুরি করে সেখানে তা প্রত্যেকের পক্ষে অসুবিধাজনক, কিন্তু যেখানে চৌর্যবৃত্তি নেই বললেই চলে সেখানে মানুষ তাদের ইচ্ছামত জীবন চালাতে পারে। কিন্তু আইন, নৈতিক নিয়ম ও ধর্মের অনুপস্থিতিতে মুশকিল হতে পারে। প্রতিটি ব্যক্তির কাছে একটি আদর্শ সম্প্রদায় সেই জায়গা যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি সৎ এবং সে একমাত্র চোর, এর ফলে বলা যায় যে ব্যক্তির উৎসাহকে সেই সম্প্রদায়ের সঙ্গে পুনর্মিলিত করতে গেলে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে এবং এই অপরাধমূলক আইন ও পুলিশ এই বিষয়ে সকল ভাবে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু অপরাধীরা সর্বদাই ধরা পড়ে না, এবং পুলিশ শক্তিমানের পক্ষে অনৈতিকভাবে প্রবণতাসম্পন্নও হয়ে উঠতে পারে। যদি মানুষ এই বিষয়ে প্ররোচিত হতে পারে যে এখানে ঈশ্বর আছেন যিনি পুলিশ ব্যর্থ হলেও চৌর্যবৃত্তিকে শাস্তি দেবেন, তবে মনে করা যায় যে এই বিশ্বাস সততাকে বৃদ্ধি করবে। যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখে তারা আগেভাগেই বিশ্বাস করে নেবে যে ঈশ্বর চৌর্যবৃত্তিকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। এই বিষয়ে ধর্মের উপযোগিতা সম্পর্কে নাবোথার আঙুর বাগানের গল্পে চিত্রিত আছে যে সেখানে রাজাই চোর যিনি যে-কোন পার্থিব বিচারের ঊর্ধ্বে।

আমি অস্বীকার করব না যে অতীতের অর্ধ-সভ্য সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে এই ধরণের বিচার সামাজিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত আচরণকে বর্ধিত করত। কিন্তু বর্তমান দিনে নৈতিক নিয়মগুলোর উপর ধর্মতত্ত্বের উৎসকে (Theological origin) আরোপ করে এই ধরণের মঙ্গল করা যেতে পারে যা এমন গভীর অমঙ্গলের সঙ্গে জড়িত যার থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয়। এর ফলে মঙ্গল বিষয়টি তুলনামূলকভাবে তুচ্ছ হয়ে পড়ে। সভ্যতা যত এগিয়েছে, পার্থিব অনুমোদন ও

...ণা ...তই নিশ্চিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে স্বর্গীয় সমর্থন অনিশ্চিত হয়েছে। ...ণ চিন্তা করবার মতো অনেক যুক্তি খুঁজে পেল, যেমন— যদি তারা চুরি করে ...ল তাদের ধরা হবে এবং এই ধারণা ক্রমশ কমে যেতে থাকল যে যদি তারা ...া ...ও পড়ে তবুও ঈশ্বর তাদের শাস্তি দেবেন। এমনকি বর্তমানে উচ্চ ধার্মিক ...ণরাও আশা করতে পারে না যে চুরি করার জন্য তাদের নরকে যেতে হবে। ...া মনে করে ঠিক সময় মতো অনুতপ্ত হলেই হল এবং যে-কোন ঘটনাতেই নরক ...ণ আগের মতো নিশ্চিত বা খুব ভয়ঙ্কর নেই। কোন সভ্যসমাজে বেশিরভাগ ...ণই চুরি করে না। আমি মনে করি সাধারণ উদ্দেশ্য পৃথিবীতে শান্তির মতো ...ই নয়। এই ঘটনার প্রমাণ মেলে খনি থেকে সোনা-উত্তোলনকারীদের শিবিরে ...া কোন বিশৃঙ্খল সমাজে যেখানে প্রায় প্রত্যেকেই চুরি করে।

কিন্তু আপনি এ কথা বলতে পারেন, যদিও চুরি করার বিষয়ে শাস্ত্রীয়নিষিদ্ধ ...া বেশি দিন প্রয়োজনীয় হয়ে থাকেনি, তবুও তা কোনভাবে আমাদের ক্ষতি ...ণা যেহেতু আমরা সবাই চাই মানুষ যাতে চুরি না করে। যদিও সমস্যাটা ...ালো এই যে, শাস্ত্রীয়বিধি গ্রহণের বিষয়ে মানুষ যখন সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়ে, ...া তার সেই সন্দেহ প্রবণতা ক্ষতিকর ও অপ্রীতিকর পথে সমর্থিত হয়। যদি ...ক উৎকর্ষতার জন্য ধর্মতত্ত্ব প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় এবং যদি নাছোড়বান্দা ...পন্ধানকারীরা ধর্মতত্ত্বকে সত্য বলে ভাবার কোন যুক্তি না দেখে, তবে দেখা যায় ...র্তৃপক্ষ নাছোড়বান্দা অনুসন্ধানকারীদের ভগ্নোৎসাহ করবার জন্য কোমর বেঁধে ...া পড়েন। পূর্বের শতকগুলোতে তারা যে-কোনভাবে এই সব নাছোড়বান্দা ...পন্ধানকারীদের পুড়িয়ে মেরে তাদের ক্ষান্ত করত। রাশিয়াতে তারা যে ...ক্তিসমূহ ব্যবহার করে তা কিছুটা উন্নত, কিন্তু পশ্চিমা দেশগুলোতে কর্তৃপক্ষ ...ণাকে মৃদুভাবে প্ররোচিত করবার পদ্ধতিটিকে যথার্থ করে তুলেছে। এদের ...া বোধহয় বিদ্যালয়গুলির ভূমিকা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে কর্তৃপক্ষ যা ...ত্য করে সে বিষয়ে কোন রকম যুক্তিতর্ক শোনার থেকে যুবকদের সরিয়ে রাখা ...ত্তও যারা অনুসন্ধানকারী মনোভাব দেখাতে আগ্রহী হয়ে পড়ে তারা সামাজিক ...ণার সম্মুখীন হয় এবং যদি সম্ভব হয় তাদের ভাবতে বাধ্য করা হয় যে তারা ...কভাবে দূষণীয় হয়ে পড়েছে। এইভাবে নৈতিক নিয়মসমূহের যে-কোন ব্যবস্থা ...র্মতত্ত্বের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে তা এমন সব যন্ত্র যার দ্বারা ক্ষমতার ধার ...া তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখে এবং যুবকদের বিদ্যাবুদ্ধিগত উৎসাহকে ধ্বংস ...।

বর্তমানে বহু মানুষের মধ্যে আমি সভ্যতা সম্পর্কে উদাসীনতা দেখি যাকে আমি ...ণা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি না। উদাহরণস্বরূপ, খ্রীষ্টীয়ধর্মের পক্ষ নিয়ে ...া মানুষ তর্ক করে তখন তারা থমাস অ্যাকুইনাসের মতো এই যুক্তি তোলে না

যে ঈশ্বর আছেন এবং তিনি বাইবেলে তাঁর ইচ্ছাকে প্রকাশ করেছেন। এর পরিবর্তে তারা এই বিষয়ে তর্ক করে যে যদি মানুষ এই ধরণের চিন্তা করে তবে সে যতটা ভালো কাজ করতে পারবে, সে যদি না ভাবে তবে ততটা পারবে না। এই কারণে ঈশ্বর বিদ্যমান কিনা সেই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করবার অনুমতি আমাদের নিজেদেরকে দেওয়া উচিত নয়— সাধারণ মানুষ তর্ক করে এইরকম সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছায়। যদি কোন অসতর্ক মুহূর্তে সন্দেহ মাথা তোলে তাহলে আমরা তাকে জোর করে দমন করব। যদি নাছোড়বান্দা চিন্তাভাবনা সন্দেহের কারণ ঘটায় তবে সেই নাছোড়বান্দা চিন্তাভাবনাকে আমরা অবশ্যই চিবিয়ে ফেলবো। যদি গোঁড়া ধর্মের সরকারী ব্যাখ্যাকাররা আপনাকে বলে যে মৃতা স্ত্রীর ভগ্নীকে বিবাহ করা মন্দ কাজ তবে আপনি পাছে নৈতিক ভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন তাই তাদের অবশ্যই বিশ্বাস করবেন। যদি তারা আপনাকে বলে যে জন্মনিয়ন্ত্রণ একটি পাপ তাহলে আপনি তাদের মতামত গ্রহণ করবেন, যদিও স্পষ্টভাবে আপনি জানেন জন্মনিয়ন্ত্রণ ছাড়া বিপর্যয় নিশ্চিত। যদি কোন বিশ্বাস, সে যাই হ'ক না কেন, সত্যের চেয়ে অন্য কোন কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তাহলে সমস্ত ধরণের অশুভ বা অমঙ্গলজনক বিষয়গুলি লাফিয়ে উপরে উঠে আসবার জন্য প্রস্তুত থাকে। অনুসন্ধান সম্পর্কে অনুৎসাহ. যার সম্পর্কে আগেই আমি বলেছি, তা উঠে আসা অমঙ্গলজনক বিষয়গুলির মধ্যে প্রথম, কিন্তু বাদবাকি অন্য বিষয়গুলি ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। গোঁড়া ধর্মাবলম্বীদের কাছে কর্তৃত্বের স্থানটি খোলা থাকবে। ঐতিহাসিক নথি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে যদি তারা গৃহীত মতামতসমূহ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে। আগে বা পরে উদারতাকে একটি অপরাধ বলে মনে করে নিয়ে তাকে কোন খুঁটিতে বেঁধে রাখা হবে, কিংবা তাকে বাজে বস্তু বলে পরিত্যাগ করা হবে অথবা বন্দী শিবিরে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। আমি সেই মানুষটিকে শ্রদ্ধা করি যে যুক্তি দেয় যে ধর্ম সত্য এবং এইজন্যই তাকে বিশ্বাস করা উচিত, কিন্তু আমি তাদের জন্য প্রগাঢ় নৈতিক দোষ অনুভব করি যারা বলে থাকেন যে ধর্মকে অবশ্যই বিশ্বাস করা উচিত কারণ ধর্ম কার্যকরী এবং ধর্ম সত্য কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন করে যারা সময় কাটান তাদের সম্পর্কেও আমি ওই একই দোষ অনুভব করি।

খ্রীষ্টীয় আত্ম-পক্ষ সমর্থনকারীদের (Christian apologist) মধ্যে সাম্যবাদকে খ্রীষ্টধর্মের থেকে খুব স্বতন্ত্র বলে মনে করাটা একটা প্রচলিত ব্যাপার এবং খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী জাতিগুলি সাম্যবাদের অমঙ্গলজনক দিকগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখিয়ে তার তুলনায় তারা কত সুন্দর আছে, আনন্দে আছে তা দেখাতে সর্বদা ব্যস্ত। আমার কাছে ষএকটা বিরাট ভুল। সাম্যবাদের অমঙ্গলজনক দিকগুলো বিশ্বাসের যুগগুলিতে (Ages of Faith) খ্রীষ্টধর্মের যে অমঙ্গলজনক দিকগুলো ছিল তারই মতো। অগপু (The Ogpu) প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধমত দমনের জন্য স্থাপিত

বিচারালয়ের বিপক্ষে গিয়েছিল কেবলমাত্র আকারগত দিক থেকে। নিষ্ঠুরতাও ওই একই রকম। এই ধরণের বিচারালয় যেখানেই সুযোগ পেয়েছে সেখানেই ধ্বংস করেছে। যেমন—সে বর্তমানে রুশিয়দের বিদ্যাবুদ্ধিগত ও নৈতিক জীবনকে ধ্বংস করে। সাম্যবাদীরা ইতিহাসকে মিথ্যা প্রমাণিত করে এবং গীর্জাগুলো নবজাগরণের আগে পর্যন্ত ওই একই কাজ করেছিল। যদি গীর্জা সোভিয়েত সরকারের মতো আপনা বাজে না-ও হয় তবে তার কারণ, যারা গীর্জা আক্রমণ করেছিল তাদের প্রভাব ট্রেন্টের কাউন্সিলের (Council of Trent) থেকে আজ পর্যন্ত গীর্জার যা কিছু উন্নতি হয়েছে তা তার শত্রুদের জন্যই হয়েছে। এমন অনেকে আছে যারা সোভিয়েত সরকারকে আপত্তিজনক বলে ভাবেন কারণ তারা সাম্যবাদের অর্থনৈতিক মতবাদকে অপছন্দ করেন, কিন্তু এই বিষয়ে ক্রেমলিন প্রাচীন খ্রীষ্টীয়ধর্ম, ক্যাথলিসিজম ও প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী মধ্যযুগীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রীষ্টীয় ধর্মাবলম্বী মানুষের সঙ্গে তুলনীয়। প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী মানুষের মধ্যে যদিও সাম্যবাদ আদৌ নয়। একজন গোড়া ধর্মের শহীদ স্যার টমাস মুর সাম্যবাদীদের সুরেই বলেছিলেন খ্রীষ্টধর্মের এটাই বৈশিষ্ট্য যে এটি একমাত্র কল্পনার কাছে আত্মসমর্পণ করে। এটি কোন সোভিয়েত মতবাদ নয় যাকে বিপজ্জনক বলে ভাবা যেতে পারে। এটি একটি পথ মাত্র যে পথে মতবাদটি গড়ে উঠেছে। যে পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় ধারণাটি উঠে এসেছে তা হল সেই পাপকে সন্দেহ করা যে পাপের ফলে কঠোরতম শাস্তি জোটে। খ্রীষ্টানদের মতো কম্যুনিষ্টরাও বিশ্বাস করে যে মুক্তির জন্য মতবাদটিই একান্ত প্রয়োজনীয় এবং এটি সেই ধরণের বিশ্বাস যা তার জন্য মুক্তির পথকে সম্ভাবনাময় করে তোলে। খ্রীষ্টধর্ম ও সাম্যবাদের মধ্যে এটাই এমন একটি সাদৃশ্য যেখানেই তারা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধ হয়ে ওঠে। যখন বিজ্ঞানের দুটি শাখার মধ্যে মত বিরোধ হয় তখন তারা ধর্মনিরপেক্ষ কোন হস্তের কাছে সাহায্য আশা করে না। যে বিষয়টি নিয়ে তাদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিয়েছিল সেই বিষয়টির উপর সিদ্ধান্ত নেবার জন্য বিষয়টির পরবর্তী উন্নয়নের জন্য তারা অপেক্ষা করে, কারণ বিজ্ঞানের মানুষ হিসেবে তারা জানেন যে, কোন কিছুই অভ্রান্ত নয়। কিন্তু দুজন শাস্ত্রজ্ঞ যখন পরস্পর মতবিরোধী হয়ে ওঠেন তখন যেহেতু প্রমাণ করবার মতো এমন কিছু সামনে থাকে না যা দিয়ে দুজনের মধ্যে কেউ তার সম্মান রাখতে পারে, তাই দুজনের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা ও জোর যার মুল্লুক তার ধরণের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমি স্বীকার করব যে খ্রীষ্টধর্ম আগে যা ক্ষতি করত এখন তার চেয়ে অনেক কম ক্ষতিকর। এর কারণ এখন তা আগের মতো আগ্রহপূর্ণ বিশ্বাসের বিষয় নয়। সম্ভবত ঠিক সময়ে এই একই ধরণের পরিবর্তন সাম্যবাদেও ঘটবে এবং যদি তা ঘটে তবে আজ যে ধর্মমতকে নিন্দনীয় করে তোলা হচ্ছে সেই মতও অনেক কম নিন্দনীয় হবে। কিন্তু যদি পশ্চিমা দেশগুলোর এই দৃষ্টিভঙ্গি

জয়লাভ করে যে ন্যায় ও সামাজিক স্থায়িত্বের জন্য খ্রীষ্টধর্ম একান্ত প্রয়োজনীয় তবে খ্রীষ্টধর্ম আবার একবার অমঙ্গলজনক প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে উঠবে যা সে হয়ে উঠেছিল মধ্য যুগগুলোতে এবং ক্রমশ বর্তমান সাম্যবাদের মতো হয়ে উঠে এমন একটি জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে যেখানে দুজনের মধ্যে কোন মীমাংসা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠবে। এটি সেই পথ নয় যে পথ দিয়ে জগৎকে ধ্বংসের হাত থেকে মুক্ত করা যেতে পারে।

(২)

আমার প্রথম প্রবন্ধে যে-কোন গৃহীত ধর্মমতের ব্যবস্থাজাত অমঙ্গলসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম সত্যের উপর ভিত্তি করে নয়, কেবল সামাজিক উপযোগিতার উপর ভিত্তি করে। খ্রীষ্টধর্ম, সাম্যবাদ, ইসলাম ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুধর্ম এবং সব ধর্মমত ব্যবস্থার উপর সমানভাবে প্রযোজ্য কিন্তু একমাত্র সেই ব্যবস্থা ছাড়া যে ব্যবস্থা বিজ্ঞানের মানুষের দ্বারা গঠিত এক চিরন্তন আবেদনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। যদিও খ্রীষ্টধর্মের স্বপক্ষে একটি বিশেষ বিতর্ক গড়ে উঠে আজ সম্মুখে অগ্রসর যা উক্ত ধর্মে বিশেষ যোগ্যতার উপর নির্ভর করেই হয়েছে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ইতিহাসের অধ্যাপক হারবার্ট বাটারফিল্ড তাঁর বাগ্মিতা ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করে এইসব যোগ্যতাসমূহকে আমাদের সামনে রেখেছেন (গ্রন্থটির নাম Christianity and History, লন্ডন, ১৯৫০) এবং তাকে আমি গ্রহণ করব একটি বিশাল জনসমর্থনের মুখপাত্র হিসেবে যে জনসমর্থনের সঙ্গে তিনি নিজেও সংযুক্ত।

অধ্যাপক বাটারফিল্ড বিশেষ কিছু বিষয়কে নিজের কোলে টেনে নিয়ে সেইসব যুক্তিতর্ক-সাপেক্ষ বিষয়ের সুবিধাজাত সুযোগ নিয়েছেন যাতে মনে হবে তিনি বাস্তবে তার থেকে অনেক বেশি মুক্ত-মনের মানুষ। তিনি স্বীকার করেন যে খ্রীষ্টীয় গীর্জা নির্যাতনে বিশ্বাসী ছিল এবং চাপের ফলেই এই ধরণের কার্যকে পরিত্যাগ করেছে এবং করতে বাধ্য হয়েছে। তিনি স্বীকার করেন যে বর্তমানে রাশিয়া ও পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে চাপা উত্তেজনা ক্ষমতার রাজনীতির ফল যা রাশিয়ার সরকার যদি গ্রীসের গোঁড়া গীর্জার সঙ্গে সংযুক্ত থাকত তা হলেও ঘটত। তিনি মনে করেন কিছু কিছু নৈতিক উৎকর্ষতা কিছু স্বাধীন চিন্তাবিদদের দ্বারাও প্রদর্শিত হয়েছে যা অনেক খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের আচরণে দেখা যায়নি। কিন্তু এইরকম স্বীকৃতি সত্ত্বেও তিনি এই ধরণের মনোভাব ধরে রেখেছেন, যে-সব অমঙ্গলজনক অবস্থার জন্য জগৎ এখনো ভুগছে তা দূর হতে পারে যদি জগৎ খ্রীষ্টীয়ধর্মমতের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং তার মতে কিঞ্চিত পরিমাণ খ্রীষ্টীয় ধর্মমতকে মানতে গেলে কেবলমাত্র ঈশ্বর ও তাঁর অমরত্বকে মানলেই চলবে না, তার সঙ্গে অবতারত্বেরও বিশ্বাস রাখা একান্ত

[illegible]। তিনি বিশেষ কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের সংযোগের উপর [illegible] দিয়েছেন এবং ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হিসেবে এইসব ঘটনাসমূহকে গ্রহণ [illegible] যে ঘটনাগুলি তার ধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত না হলে কোনভাবেই তাঁর কাছে [illegible] উঠত না। আমি মনে করি না যে কুমারী জননী বিষয়টি এমন একটি প্রমাণ যাকে ধর্মতত্ত্বে বিশ্বাস রাখায় অভ্যস্ত ব্যক্তি ছাড়া কোন নিরপেক্ষ অনুসন্ধানকারী বিশ্বাসজনক বলে মেনে নেবেন। পৌত্তলিক পুরাণে (Pagan mythology) এমন অনেক গল্প আছে যেখানে এ-ধরণের কাহিনী পাওয়া যায়, কিন্তু [illegible] এধরণের কাহিনীকে স্বপ্নেও সত্য বলে ধরে নিতে পারে না। একজন [illegible] হওয়া সত্ত্বেও অধ্যাপক বাটারফিল্ড যেখানে খ্রীষ্টধর্মের বিষয় জড়িত [illegible] সঠিক ইতিহাসমূলক প্রশ্ন উত্থাপনের বিষয়ে অনাগ্রহোদ্দীপক। তাঁর ভদ্রতা [illegible] প্রতারণাপূর্ণ যুক্তি তার নিজের ভদ্রতা প্রতারণাপূর্ণ আবহাওয়ার মুখোশের তলায় [illegible] হলেও তা অতি সূক্ষ্মতার সঙ্গে বিবৃত হতে পারে যেমন 'খ্রীষ্ট সত্যই [illegible] মায়ের সন্তান কিনা, কিংবা 'কুমারী মা সত্যই পবিত্র আত্মাকে গর্ভে ধারণ [illegible] কিনা সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা উচিত নয়, এই ঘটনাটি সত্য কিনা তা [illegible] না গেলেও এই ঘটনাটিকে সত্য বলে বিশ্বাস করে নিলে বর্তমান জগৎ [illegible] হাত থেকে রেহাই পাবে।' অধ্যাপক বাটারফিল্ডের কাজের কোন [illegible]তেই খ্রীষ্টধর্মের মতাদর্শকে সত্য বলে প্রমাণ করবার কোন চেষ্টাই নেই। [illegible] প্রচলিত একটি ধারণা দেখা যায় যে খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাস রাখাটা কার্যকর। [illegible] বাটারফিল্ডের যুক্তিতে এমন অনেক স্তর আছে যা একজনের বোঝার পক্ষে [illegible] পরিচ্ছন্ন ও যথার্থ নয়, কেননা যদি সেখানে পরিচ্ছন্নতা ও যথার্থতা থাকত [illegible] ওইসব যুক্তিগুলিকে বেঠিক বা অসত্য বলে প্রতীয়মান করে ছাড়ত। আমার [illegible] বাটারফিল্ডের বিতর্কটি কতকগুলি অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তায় পূর্ণ, যেমন— [illegible] মানুষ তার প্রতিবেশীকে ভালোবাসে তবে তা ভালো হবে, কিন্তু তা করবার [illegible] তাদের মধ্যে বেশি প্রবণতা নেই। খ্রীষ্ট বলেছেন এই কাজটা তাদের করা [illegible] এবং যারা খ্রীষ্টকে একজন ভগবানের মর্যাদা প্রদান করে না তাদের চেয়ে [illegible] তাকে সেই মর্যাদা দিয়ে থাকে তাদের খ্রীষ্টের শিক্ষার উপর অনেক বেশি [illegible] দিতে হবে। এইজন্য যারা চায় যে মানুষ তার প্রতিবেশীকে ভালোবাসুক [illegible] তাদের এই বুঝিয়ে প্ররোচিত করবার চেষ্টা করেন যে খ্রীষ্ট একজন ভগবান [illegible]।

[illegible] ধরণের যুক্তির ক্ষেত্রে এত আপত্তি রয়ে যায় যে কোন আপত্তিটি দিয়ে শুরু [illegible] সেটাই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমত, অধ্যাপক বাটারফিল্ড এবং তাঁর [illegible] যারা অপরকে প্ররোচিত করে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে প্রতিবেশীকে [illegible] মঙ্গলজনক বিষয় এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তারা বলে

থাকেন যে তারা উক্ত দৃষ্টিভঙ্গি খ্রীষ্টের শিক্ষা থেকে গ্রহণ করেননি। অন্যদিকে, ঠিক উল্টোভাবে তারা বলে থাকেন যে তাঁরা এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন এই কারণে যে তাঁরা খ্রীষ্টের শিক্ষাকে তাঁর স্বর্গীয়ত্বের প্রমাণ হিসেবে শ্রদ্ধা করেন। বলতে গেলে ধর্মতত্ত্ব-নির্ভর কোন নীতিবিদ্যা তাঁদের নেই, কিন্তু তাঁদের নিজেদের নীতিবিদ্যা নির্ভর একটি ধর্মতত্ত্ব আছে। তাঁরা এইরকম ভাব দেখাতে চাইছেন যেন এ ধর্মতত্ত্বগত ভিত্তি দেখালেই প্রতিবেশীকে ভালোবাসার বিষয়টি জমে উঠবে এবং এ একটি বড় আবেদন রাখতে পারবে এবং এইভাবেই তারা অন্য যুক্তিগুলোকে দেখিয়েছেন এই মনে করে যে সেগুলোকে ধর্মতত্ত্বের চৌহদ্দির বাইরে রাখলে এ অনেক বেশি প্রভাবশালী হয়ে উঠবে। এটি একটি বিপজ্জনক পদ্ধতি। অনেক প্রোটেস্টান্ট এই মনোভাব পোষণ করত যে সাব্বাথকে (ছুটির দিন) ভঙ্গ করাটা খুন করার অপরাধের সামিল। যদি আপনি তাদের এই বলে প্ররোচিত করেন যে সাব্বাথকে ভঙ্গ করাটা কোন দোষের নয় তাহলে তারা এটাও মনে করে নেবে যে খুন করাটাও কোন অপরাধ নয়। প্রতিটি ধর্মতত্ত্বগত নীতিবিদ্যাকে এইরকম যৌক্তিকভাবে সমর্থনও যেমন করা যেতে পারে, আবার অন্যদিকে তাকে কেবলমাত্র কুসংস্কারমূলক নিষেধের সমাহার বলেও মনে করা যেতে পারে। ধর্মতত্ত্বের যে অংশটিকে যৌক্তিকভাবে সমর্থন করা যেতে পারে তাকে সমর্থন করাই দরকার এই কারণে যে যারা তার অযৌক্তিক অংশটিকে আবিষ্কার করে, সুযোগ পেলে তারা হঠকারিতার সঙ্গে সমস্ত নীতিগুলোকেই বাতিল করে দেবে।

কিন্তু বাস্তবে খ্রীষ্টধর্ম তার বিরোধী পক্ষ ও শত্রুদের চেয়ে উত্তম নৈতিকতার জন্য দাঁড়িয়ে আছে? আমি মনে করি না যে ইতিহাসে কোন সৎ ছাত্র বিষয়টিকে একটি ঘটনা বলে মেনে নেন। অন্যান্য ধর্ম থেকে খ্রীষ্টধর্ম যেখানটায় স্বতন্ত্র তা হল এই ধর্ম নির্যাতনের বিষয়ে সর্বদাই দারুণভাবে প্রস্তুত থাকে। বৌদ্ধধর্ম কখনও একটি নির্যাতনমূলক ধর্ম হয়ে দেখা দেয়নি। খলিফার সাম্রাজ্য ইহুদি ও খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের কাছে অনেক বেশি উদার কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্মাবলম্বী রাষ্ট্রগুলি ইহুদি ও মুসলমানদের কাছে অতটা উদার নয়। তাদেরকে কর প্রদান করেই ইহুদি ও খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীরা অনুৎপীড়িত অবস্থায় থাকতে পেরেছে। যখন রোম সাম্রাজ্য খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী হল ঠিক সেই মুহূর্তে ইহুদি-খেদানো আন্দোলন খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। ধর্মযুদ্ধের ধর্মীয় আগ্রহ পশ্চিম ইউরোপে ইহুদিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীরাই অন্যায়ভাবে দ্রেইফুসকে ও স্বাধীন চিন্তাবিদদের অভিযোগ করেছিল যারা তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছিল। আধুনিক যুগে কেবলমাত্র ইহুদিদের বেলাতেই নয়, অন্যান্যরাও যখন বলি হয়েছে তখন অতিশয় ঘৃণার বিষয়টি খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের দ্বারাই রক্ষিত হয়েছে। কঙ্গোর রাজা লিওপোল্ডের সরকারের অতিশয় ঘৃণা গীর্জার দ্বারাই গোপন ছিল না।

[illegible] ধারাই তা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং তা শেষ হয় কেবলমাত্র স্বাধীন পরিচালনার [illegible]। সমগ্র তর্কটি যেখানে গিয়ে দাঁড়ায় তা হল খ্রীষ্টীয়ধর্ম এমন একটি নৈতিক [illegible] উত্তোলন করেছে যা সমগ্র ঐতিহাসিক প্রমাণকে অবজ্ঞা করে এবং তাদের [illegible] প্রমাণিত করার দ্বারা রক্ষিত হতে পারে।

প্রথাগত উত্তরটি হল, যে-খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীরা আমাদের অনুশোচনাকর কোন কিছু [illegible] তারা প্রকৃত খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী নয় এই অর্থে যে তারা খ্রীষ্টের শিক্ষাকে অনুসরণ [illegible] না। যে-কেউ ওই একইভাবে বলতে পারে যে সোভিয়েত সরকার প্রকৃত [illegible]বাদের দ্বারা গঠিত নয়, কেননা মার্কস এই শিক্ষা দিয়েছেন যে স্লাভরা [illegible]দের থেকে নিম্ন মানের এবং এই মতবাদ ক্রেমলিনের দ্বারা গৃহীত হয়নি। [illegible] শিক্ষকের অনুসরণকারীরা সর্বদা তার মতবাদকে কিছু কিছু জায়গা থেকে [illegible] ত্যাগ করে। যাদের লক্ষ্য গীর্জার প্রতিষ্ঠা করা কথাটি তাদের মনে রাখা উচিত। [illegible]টি গীর্জাই আত্ম-সংরক্ষণের একটি প্রবৃত্তিকে গড়ে তোলে এবং সেই প্রবৃত্তিগত [illegible] সংরক্ষণের পক্ষে প্রতিষ্ঠাতার মতবাদের যে যে অংশ সাহায্য করতে পারে না [illegible] অংশসমূহ ক্রমশ হ্রাস পায়। কিন্তু যে-কোন ঘটনা যাকে আধুনিক আত্ম-পক্ষ [illegible]কারীরা 'সত্য' খ্রীষ্টধর্ম বলে থাকে, তা স্বযত্নে নির্বাচিত পদ্ধতির উপর নির্ভর [illegible] গড়ে ওঠে। সুসমাচারগুলিতে যা দেখতে পাওয়া যায় তাকে এই 'সত্য' ধর্ম [illegible]ভাগ ক্ষেত্রে এড়িয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, ভেড়া ও ছাগলের নীতিকথা এবং [illegible] মতবাদ যেখানে বলা হয়েছে যে বদমাইসরা অনন্ত নরকের আগুনে ঝরে [illegible] কষ্ট ভোগ করবে। এই ধর্ম গিরিচূড়ার উপর ধর্মোপদেশের থেকে বিশেষ [illegible] অংশ তুলে নেয়, যদিও সেই অংশগুলোকেও তারা কার্যক্ষেত্রে বাতিল করে [illegible]। তারা প্রত্যাহার বা নিরোধের মতবাদকে ত্যাগ করে, উদাহরণস্বরূপ, যা [illegible] মতো অ-খ্রীষ্টীয়রা করে থাকেন। তারা যে-বিশেষ উপদেশগুলিকে সমর্থন [illegible] থাকেন সেই উপদেশগুলি এমন সব উচ্চ নৈতিকতার অন্তর্ভুক্ত যাতে মনে হয় [illegible]গুলি অবশ্যই একটি স্বর্গীয় উৎস থেকে নিঃসৃত। অধ্যাপক বাটারফিল্ড [illegible] জানেন যে এই সব উপদেশগুলো খ্রীষ্টের সময়ের আগে ইহুদিদের দ্বারাই [illegible] হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, তাদের দেখা যায় হিল্লেলের (Hillel) শিক্ষা ও [illegible] কুলপতির টেষ্টামেন্ট (Tes-taments of the Twelve Patriarcs), এই [illegible] বর্তমানে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত রেভারেণ্ড ড. আর. এইচ. চার্লস বলেন, গিরিচূড়ার [illegible]দেশে আত্ম (Spirit) সম্পর্কে বহুরকম উদাহরণ পাওয়া যায় এবং তা [illegible] পাঠ্যগ্রন্থের প্রধান শব্দগুচ্ছসমূহের জন্ম দেয়। যেমন—সুসমাচারগুলি উক্ত [illegible] চিহ্নগুলিকে প্রদর্শন করে থাকে এবং মনে হয় সেন্ট পল গ্রন্থটিকে [illegible] সঙ্গী হিসেবে (Vade mecum) ব্যবহার করতেন। ড. চার্লস মত পোষণ [illegible] খ্রীষ্ট উক্ত গ্রন্থের সঙ্গে অবশ্যই পরিচিত ছিলেন। আমাদের যেমন বলা

হয়ে থাকে যে যদি নৈতিক শিক্ষা উৎকর্ষতা উক্ত গ্রন্থের রচয়িতার স্বর্গীয়ত্বকে প্রমাণ করে, তবে টেষ্টামেন্টের অজ্ঞাত লেখক অবশ্যই স্বর্গীয় ছিলেন।

জগৎটি যে একটি বাজে আকারে সজ্জিত ছিল তা অস্বীকার করা যায় না এবং সেখান থেকে বেরোবার একটি রাস্তা হিসেবে খ্রীষ্টধর্ম কোন কাজ করেছে এই ধারণা মনে করার সামান্য কারণও ইতিহাস থেকে খুঁজে পাওয়া যায় না। আমাদের সমস্যাগুলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের থেকে গ্রীক ট্র্যাজেডির অপ্রতিরোধ্যতার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে এসেছে এবং সাম্যবাদী ও নাৎসিরা যার ফল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উৎসের দিক থেকে সমগ্রভাবে খ্রীষ্টীয়। তিনজন সম্রাট যেমন ভক্তিনিষ্ঠ ছিলেন অন্যদিকে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের মতো যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। জার্মান ও রাশিয়ার যে সব সমাজবাদীদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ সম্পর্কে বিরোধিতা এসেছিল তারা খ্রীষ্টবিরোধী ছিল। ফ্রান্সে জোরের গুপ্তহত্যা আন্তরিক খ্রীষ্টীয়দের দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল কিন্তু বিরোধিতা এসেছিল ইংল্যান্ডের উল্লেখযোগ্য নাস্তিক জনি মর্লের কাছ থেকে। সাম্যবাদের সব থেকে বিপজ্জনক বৈশিষ্ট্যটি হল যে এটি মধ্যযুগীয় গীর্জার বৈশিষ্ট্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তারা তাদের সেইসব গৃহীত মতবাদ- সমূহের সঙ্গে উন্মত্তভাবে যুক্ত যে-মতবাদগুলি তাদের পবিত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ। তারা এইসব মতবাদগুলিকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে অনিচ্ছুক এবং যারা সেই মতবাদ-গুলিকে বাতিল করে তাদের তারা বর্বরদের মতো শিরশ্ছেদ করে। আমরা পশ্চিমে যে ধর্মোন্মত্তা ও গোঁড়ামীর উত্থানের কথা বলছি না যা আমাদের কাছে অবশ্যই একটি সুখের বিষয় হয়ে উঠতে পারে, বরঞ্চ সেই মনোভাবের উত্থানের কথা বলা হচ্ছে যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে সাম্রাজ্যবাদী রাজত্বের ঘৃণ্য বৈশিষ্ট্যগুলো চিরন্তন বলে প্রমাণিত হয়েছে। জগতের যা প্রয়োজন তা হল মানব পরিবারের পরস্পর নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা, সহনশীলতা ও অনুভব। এই পরস্পর নির্ভরশীলতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে আধুনিক আবিষ্কারগুলির মধ্য দিয়ে। শুধু পার্থিব যুক্তি তাদের প্রতিবেশীর উপর তাদের দয়ালু আচরণকে যথেষ্ট শক্তিশালী করে গড়ে তোলে ততটা পূর্বে কোন যুগেই তারা হতে পারেনি। এইরকম বিবেচনার দিকে আমাদের অবশ্যই তাকাতে হবে, এবং কোন মধ্যযুগীয় অপরিষ্কার পুরাণগুলির দিকে আমাদের ঘুরে দাঁড়ালে চলবে না। বলা যেতে পারে যে, বিদ্যাবুদ্ধি আমাদের রোগের কারণ হয়েছে, কিন্তু অবিদ্যাবুদ্ধি সেই রোগকে কখনই সারিয়ে তুলবে না। কেবলমাত্র জ্ঞানদীপ্ত বুদ্ধিই জগৎকে সুখী করে তুলতে পারে।

১৫

ধর্ম এবং নীতিশাস্ত্র

(১৯৫২ সালে লিখিত)

অনেক মানুষ আমাদের বলে থাকেন যে ঈশ্বর বিশ্বাস ছাড়া একটি মানুষ কখনো যেমন সুখীও হতে পারে না তেমনি নৈতিকভাবে উৎকর্ষসম্পন্নও হতে পারে না। আমি বলতে পারি নৈতিক উৎকর্ষতা কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণ থেকেই আসতে পারে, কখনই তা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আসে না। সুখের কথা বলা গেলে অভিজ্ঞতা বা পর্যবেক্ষণ কোনটাই আমাকে এই চিন্তা করায়নি যে গড়পড়তা হিসেবে বিশ্বাসীদের থেকে অবিশ্বাসীরা সুখী অথবা অসুখী হয়ে থাকে। এটি অসুখী হবার সব থেকে বড় কারণটিকে খুঁজে বার করবার একটি প্রচলিত রীতি, যেমন দুর্দশাকে যকৃতের গোলযোগের কারণ হিসেবে না দেখে তাকে বিশ্বাসের অভাব হিসেবে দেখে গর্বিত হওয়া অনেক সোজা। নৈতিকতার বিষয়ে বলতে গেলে বলতে হয় যে তা নির্ভর করে কিভাবে একজন ওই পদটিকে বোঝে তার উপর। আমার ক্ষেত্রে আমি মনে করি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক উৎকর্ষতা হল দয়া এবং বুদ্ধি। বিদ্যাবুদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয় যে-কোন শাস্ত্রের দ্বারা, সেই শাস্ত্র যাই হ'ক না কেন। দয়া অনুভবটি বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে পাপ ও শাস্তির উপর বিশ্বাসের দ্বারা (এই প্রসঙ্গে বলতে হয় যে সোভিয়েত সরকার এই একটিমাত্র বিশ্বাসকে গোঁড়া খ্রীষ্টান ধর্ম থেকে গ্রহণ করেছে)।

এই বিচিত্র বাস্তব পথ আছে যেখানে ঐতিহ্যময় নৈতিকতা হস্তক্ষেপ করে থাকে সেই সব বিষয়ে যেগুলো সামাজিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত। এর মধ্যে একটি হল জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রতিরোধ। জনসংখ্যার সীমাটাই হল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। ওষুধের ব্যবহার এই বিষয়টিকে আগের চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ করে তুলল। যদি আমরা জাতি (Ation) এবং কুল একশ বছর আগের ব্রিটিশদের মতো এখনো উর্বর থাকি এবং যারা এই বিষয়ে তাদের অভ্যাস বদলাতে চায় না, তাদের যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ ছাড়া আর কোন পরিণাম থাকে না। যে-কোন বুদ্ধিমান ছাত্রের কাছেই এই বিষয় পরিচিত হলেও ধর্মতত্ত্বের ধ্বজাধারীদের কাছে এটা খুব পরিচিত নয়।

আমি বিশ্বাস করি না যে ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্বাসের ক্ষয় মঙ্গল ছাড়া আর কিছু আনতে পারে। আমি এক মুহূর্তে স্বীকার করতে রাজি আছি যে নাৎসি ও ফ্যাসিস্টদের মতাদর্শের নতুন ব্যবস্থা পুরোনো ব্যবস্থাগুলোর চাইতেও খারাপ,

কিন্তু যুবকদের মনের মধ্যে গোঁড়া মতাদর্শগত অভ্যাস যদি ধীরে ধীরে তার জায়গা গ্রহণ করা বন্ধ না করত তবে ওই নতুন ব্যবস্থা কখনই মানুষের মনে স্থান অর্জন করতে পারত না। স্ট্যালিনের ভাষা সেই ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষাস্থল সম্পর্কে স্মৃতিপূর্ণ যেখানে তিনি তার শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। জগতে আজ যা চাই কোন উপদেশ-বাক্য নয়, চাই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানমূলক আচরণ যা এই বিশ্বাসের সঙ্গে মিলিত হবে যে লক্ষ লক্ষ মানুষের উপর অত্যাচার আকাঙ্ক্ষিত নয়– স্ট্যালিনের দ্বারাই আরোপিত হ'ক অথবা বিশ্বাসীদের কল্পিত পরমেশ্বরের দ্বারাই হ'ক।

সুখের সন্ধানে

প্রথম পর্ব

১

মানুষ কী কারণে অসুখী হয়?

পাখীরা যতক্ষণ সুস্থ থাকে, প্রচুর খেতে পায়, ততক্ষণই সুখে থাকে। মনে হয় মানুষেরও সেরকম থাকা উচিত, কিন্তু আধুনিক বিশ্বে মানুষ সুখী নয়। অন্তত পক্ষে অধিকাংশ মানুষই সুখী নয়। আপনি নিজে যদি অসুখী হন, তাহলে বলা করতে পারেন আপনিও এ ব্যাপারে কোনও ব্যতিক্রম নন। আর আপনি যদি সুখী হয়ে থাকেন তাহলে নিজের কাছেই জানতে চান আপনার ক'জন বন্ধু আপনার মতো সুখী। তারপর আপনি বন্ধুদের জীবন পর্যালোচনা করে মুখ দেখে মনের রূপ চেনার বিদ্যাটা আয়ত্ত করে নিন। আপনি যাদের প্রতিদিন দেখেন মনের মনোভাবের সাথে যাতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন তার জন্যে মনকে তৈরী করুন। কবি ব্লেক বলেছেন :

'আমি যাকে দেখি তার মুখে দেখি একই চিহ্ন
ক্লান্তিলতার চিহ্ন, বিষাদের চিহ্ন।'[১]

ভাব নানা প্রকার হলেও আপনি সব জায়গায় সেই অসুখীভাবকে দেখতে পাবেন। মনে করুন আপনি নিউইয়র্কে আছেন, যা একটি আধুনিকতম নগর। কোনও সময়ে এই নগরের এক জনাকীর্ণ রাজপথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকুন, অথবা সপ্তাহশেষে কোনও বড় রাস্তায় অথবা কোনও সান্ধ্য নাচের আসরে। এবার মন থেকে অহংভাবটা দূর করে মনটাকে শূন্য করুন, তারপর সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করুন একের পর এক অজানা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব দিয়ে। ঠিক তখন আপনি বুঝতে পারবেন ওদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ধরনের আলাদা আলাদা অসুখ রয়েছে। আপনি তাদের মধ্যে খুঁজে পাবেন উদ্বেগ, অতিরিক্ত মনঃসংযোগ, একাগ্রতা, জীবন সংগ্রামে ব্যাকুলতা ছাড়া অন্য সব বিষয়ে অনীহা, খেলাধুলায় অনীহা, অন্যদের ব্যাপারে সহমর্মিতার অভাব। সপ্তাহ শেষে রাজপথে দেখবেন অসংখ্য নারী-পুরুষের ভিড়, যাদের অনেকেই খুব ধনী। যারা চলেছে আনন্দের সন্ধানে। সবারই গতি যেন সমতালে, যে গতি ধীরতম মোটরযানের সাথেই শুধু সম্ভব। গাড়ির ভিড়ে পথ ঢেকে গেছে। কোনও কিছু দেখার উপায় নেই, চোখ সরালেই ঘোরালেই দুর্ঘটনা।

---

[১] ব্লেক– William Blake (১৭৫৭-১৮২৭) অষ্টাদশ শতকের কবি। যুক্তিবাদকে অস্বীকার করে অতীন্দ্রিয়বাদকে অবলম্বন করে কাব্যসাধনা করেছেন। রাসেলের উদ্ধৃতি-"Songs of Innocence" কবিতা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

সব গাড়ির সব যাত্রীরা কী করে অন্য গাড়িকে টপকে যাবে সেই চিন্তায় মেতে আছে। কিন্তু ভিড় সামলে তা করার উপায় নেই। এই চিন্তা থেকে যদি তাদের মন অন্য দিকে সরিয়ে নেয় কখনও, বিশেষ করে যারা গাড়ির চালক নয় তারা তা হলে তখন তারা এক অনুচ্চারিত বিরক্তিতে কাতর হয়ে পড়ে। সাথে সাথে তাদের চোখে মুখে ফুটে ওঠে ক্লান্তির ছাপ।

একবার হয়তো গাড়িভর্তি এক দল অশ্বেতাঙ্গ লোক প্রচুর হৈ চৈ করে মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে আনন্দে। কিন্তু তাদের ব্যবহারে অন্যরা কষ্ট পাবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা কোনও দুর্ঘটনা ঘটিয়ে পুলিশের হাতে পড়বে, কারণ ছুটির দিনে রাজপথে আমোদ-প্রমোদ বেআইনি।

অথবা, আপনি কোনও উৎসবমুখর সন্ধ্যার জনতাকে লক্ষ্য করুন, তারা আমোদ-প্রমোদে ভেসে সুখী হওয়ার জন্যে এসেছে– যেমন ভয়শূন্য মন নিয়ে লোকে দন্তচিকিৎসকের কাছে যায়। তারা মদ্যপান ও প্রমোদে ভেসে যাওয়াকে আনন্দের দরজা মনে করে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা মাতাল হয়ে পড়ে। তাদের সঙ্গীদের মনে কতটুকু বিতৃষ্ণা জেগে উঠছে সেদিকে আর তাকিয়ে দেখে না। তারপর আরো কিছু মদ্যপান করে তারা কাঁদতে আরম্ভ করে। তারা যে কত অপদার্থ এবং নৈতিকভাবে মায়ের স্নেহের অনুপযুক্ত তা নিয়ে অনুতাপ করতে আরম্ভ করে। প্রকৃতিস্থ অবস্থায় তাদের বিচারবুদ্ধি যে পাপবোধকে চেপে রাখে মদ এসে তাকে তা থেকে মুক্ত করে দেয়।

সমাজ ব্যবস্থা এবং ব্যক্তি মনস্তত্ত্বের মধ্যে এই নানা প্রকার অতৃপ্তির কারণ খুঁজে দেখতে হবে। এই ব্যক্তি-মনস্তত্ত্ব আবার অনেকাংশে সমাজ ব্যবস্থার পরিপূরকের ওপর নির্ভরশীল। কোন কোন পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থা সুখ ও তৃপ্তির পরিপোষক, তা নিয়ে আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। যেমন যুদ্ধ-বন্ধ, অর্থনৈতিক শোষণ এবং নিষ্ঠুরতা ও ভয়ের শিক্ষা– এইসব বিষয়ে এই লেখায় কোনও আলোচনা করার ইচ্ছা আমার নেই। যুদ্ধকে এড়ানো কী ভাবে সম্ভব, তা আবিষ্কার করা আমাদের সভ্যতার পক্ষে জরুরী। কিন্তু সেই পথ আবিষ্কৃত হলেও তা কোনও কাজে লাগবে না, কারণ মানুষ যতদিন অসুখী থাকবে, ততদিন সে অবিনাশী দিনের আলো সহ্য করার চেয়ে পরস্পরকে উচ্ছেদ করা কম ভীতিকর মনে করবে। যন্ত্রনির্মিত দ্রব্য যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তাদের তা মেটাবার যদি কিছুমাত্র সদিচ্ছা থাকে, তবে দারিদ্রকে ধরে রাখা বন্ধ করতে হবে। কিন্তু ধনবানরা নিজেরাই যদি এমন দুর্দশাগ্রস্ত হয়, তাহলে সকলকে ধনবান তৈরী করার কী লাভ? নিষ্ঠুরতা এবং ভয়ের শিক্ষা খারাপ, কিন্তু যারা নিজেরাই এইসব কুপ্রবৃত্তির দাস তারা আর কী শিক্ষা দিতে পারে? এইসব বিবেচনা থেকে আমি

প্রসঙ্গ চলে আসে। পুরুষ হোক অথবা নারী, আমাদের এই পিছন ফিরে তাকানো সমাজের মধ্যে বর্তমানে বাস করে, আত্মতৃপ্তির জন্যে এখন, এই মুহূর্তে সে কী করতে পারে? এই প্রশ্ন আলোচনা করতে আমি শুধু তাদের কথা উল্লেখ করব যাদের ব্যবহারিক অর্থে দুঃখ ভোগ করার কোনও চরম হেতু নেই। আমি ধরেই নেব তাদের খাদ্য ও বাসস্থানের জন্যে যথেষ্ট উপার্জন রয়েছে। সাধারণ কায়িক পরিশ্রমের জন্যে উপযুক্ত স্বাস্থ্য রয়েছে, আমি বড় ধরনের কোনও বিপদের প্রসঙ্গ তুলছি না, যেমন সকল সন্তানের মৃত্যু অথবা প্রকাশ্য কোনও গ্লানি। এসব অভাবের মধ্যে নয়, কিন্তু আমি যা নিয়ে আলোচনা করব তা ভিন্ন ধরনের। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে সভ্য বিশ্বের অনেক দেশের প্রচুর মানুষ দিনের পর দিন যেসব ছোট ছোট অতৃপ্তি ভোগ করে, তার কোনও বাইরের কারণ না থাকাতে, তা থেকে তারা মুক্তির উপায় খুঁজে পায় না, আর সেজন্যে তা আরও বেশি অসহনীয় মনে হয়। আমার মনে হয়, এই অতৃপ্তির মোটামুটি কারণ হচ্ছে পৃথিবী সম্বন্ধে ভুল ধারণা, ভুল নৈতিকতাবোধ এবং জীবনের ভুল উদ্দেশ্য, যার ওপর শেষ পর্যন্ত তাদের চরিত্রলাভ নির্ভর করে, যা সেইসব আয়ত্তের পরিধির মধ্যেই থাকে। আমি এমন কিছু পরিবর্তনের পরামর্শ দিচ্ছি যা ঘটাতে পারলে কোনও ব্যক্তি যদি মোটামুটি সভ্যবী না হয়, তা হলে সে সুখী হতে পারবে।

যে দর্শনবিদ্যার কথা বলতে যাচ্ছি, সম্ভবত আমার নিজের জীবনের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করলে তার সাথে প্রকৃত পরিচয় ঘটবে। আমি সুখী হয়ে জন্মাইনি, শৈশবে আমার প্রিয় স্তবগান ছিল 'পার্থিব বিষয়ে শ্রান্ত এবং আপন পাপে ভারাক্রান্ত।' পাঁচ বছর বয়সে আমার অন্তরে প্রতিফলিত হয়েছিল, যদি আমি সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচি, যা আমার বর্তমান বয়সের মাত্র চৌদ্দ ভাগের এক ভাগ, তা হলে আমার সামনে যে সুবিস্তৃত একঘেয়ে জীবন রয়েছে তা সহ্য করাই অসম্ভব বলে পড়বে। কৈশোরে আমি জীবনকে ঘৃণা করেছি এবং ক্রমাগত আত্মহত্যার ইচ্ছা প্রবল হয়েছে। কিন্তু গণিতশাস্ত্রকে বেশি করে জানতে আগ্রহী হওয়ায় আমি সেই ইচ্ছা থেকে দূরে থেকেছি। তার জন্যেই আমি এখন জীবনকে উপভোগ করছি। এখন আমি বরং বলতে পারি, একটি বছর শেষ হচ্ছে আর আমিও জীবনকে আরো বেশি উপভোগ করছি। এটা সম্ভব হয়েছে, কারণ কী আমার চাওয়া, তা জানতে পারার জন্যে। এইভাবে ধীরে ধীরে অনেকগুলি উপভোগ্য বস্তুর দখল প্রতিষ্ঠা করেছি। আর এর জন্যে অংশত দায়ী হচ্ছে কিছু কামনার বস্তুকে সফলভাবে ত্যাগ করতে পারা, যেমন কিছু বিষয়ের নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা বা, সব কিছু অর্জন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি মূলত যা অসম্ভব বলে ধারণা করেছি তা-ই ত্যাগ করেছি। আমার এই পরিবর্তনের প্রধান কারণ এই যে,

আমি নিজের সম্বন্ধে ভাবনা কমিয়ে দিতে পেরেছিলাম। যেমন যারা পিউরিটানদের শিক্ষা পেয়েছে আমিও তাদের মতো আমার পাপ, বোকামি এবং নানা ভুল-ত্রুটি বিষয়ে ধ্যান করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। নিজেকে মনে হত, এবং যথার্থই মনে হত, আমি একটা হতভাগ্য উদাহরণ। ধীরে ধীরে আমার নিজের বিষয়ে, আমার ভুল-ত্রুটির বিষয়ে উদাসীন থাকতে শিখলাম। আমার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু বাইরের বস্তুতে ঘনীভূত করতে আরম্ভ করলাম। যা হচ্ছে চলমান দুনিয়ার অবস্থা, জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা শাখা-প্রশাখা আর স্নেহভাজন সহমর্মী ব্যক্তিরা। বাইরের জিনিসে মন দিলে অবশ্য সেসব আবার তাদের নিজস্ব ধরনের সম্ভাব্য মনোবেদনা বয়ে আনে। যেমন বিশ্ব যুদ্ধে মত্ত হয়ে উঠতে পারে, কোনও বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানার্জন সাধ্যের বাইরে হতে পারে, প্রিয় বন্ধুরা মারা যেতে পারে। কিন্তু এই রকম মনোযন্ত্রণা জীবনের উৎকর্ষকে নষ্ট করতে পারে না, যেমন পারে নিজের প্রতি ঘৃণাজাত বেদনা। বাইরের প্রত্যেকটি কাজে অনুসন্ধিৎসা যে কোনও কাজে উৎসাহ দেয় এবং সেই অনুসন্ধিৎসা যতদিন সজীব থাকে ততদিন তা সম্পূর্ণভাবে অবসাদকে প্রতিরোধ করার কাজে লাগে। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে কৌতূহল অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো কোনও প্রেরণার সঞ্চার করে না। নিজের ব্যাপারে উৎসাহ, দিনলিপি লেখার প্রেরণা দিতে পারে। মনোবিজ্ঞানে আগ্রহ জাগতে পারে অথবা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হতে সাহায্য করতে পারে। তাও আবার আশ্রমের দৈনন্দিন কাজে ডুবে গিয়ে নিজের অহং ভুলে যেতে না পারলে সুখী হওয়া যাবে না। যে তৃপ্তি তিনি ধর্মের করুণায় পেয়েছেন বলে ভাবছেন, তা তিনি একজন ঝাড়ুদার হয়েও পেতে পারতেন, যদি তিনি সেই পদে থাকতে বাধ্য হতেন। যেসব হতভাগ্যের আত্মনিমগ্নতা এমন-ই গভীর যে, অন্য কোনও উপায়ে তা থেকে তাদের উদ্ধার করা যাবে না। তাদের তৃপ্তিলাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে বাইরের শৃঙ্খলার ওপর ভরসা।

আত্ম-নিমগ্নতা নানা ধরণের। সাধারণভাবে তিনটি ধরণের ওপর আলোচনা করা যেতে পারে : পাপী, আত্মপ্রেমিক এবং আত্মঅহংকারী।

আমি 'পাপী, অর্থে যে পাপকাজ করে তাকে বোঝাচ্ছি না। কেন না পাপকাজ সকলেই করে না হলে কেউ করে না। সবকিছু নির্ভর করে পাপ বলতে কী বোঝায় তার ওপর। পাপী বলতে যে ব্যক্তি পাপের চিন্তায় নিমগ্ন তাকে বোঝাতে চাই। এই ব্যক্তি সবসময় নিজের কাজের বিরোধী। যদি তিনি ধার্মিক হন, তবে এই আত্মবিরোধিতাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে ব্যাখ্যা করেন। তার নিজের বিষয়ে তার একটা সুস্পষ্ট ধারণা আছে। তার নিজের সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তার সাথে সেই ধারণার অবিরাম বিরোধ চলছে। শৈশবে তার জননীর হাঁটুর পাশে বসে যেসব নীতিবাক্য

তিনি শুনেছেন যদি তা দীর্ঘদিন যাবৎ তার চেতনা থেকে হারিয়ে যায়, তবে তার অন্যে পাপবোধ হয়তো তার চেতনার গভীরে ডুবে আছে এবং শুধুমাত্র মত্ত অবস্থায় অথবা ঘুমের ঘোরে, তবুও সবকিছুর স্বাদ নষ্ট করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। মনের গভীরে কিন্তু তিনি এখনও শৈশবে শেখা নিষিদ্ধ জিনিসকে সেভাবেই মেনে নেন। শপথ করা অন্যায়, মদ্যপান অন্যায়, সাধারণ ব্যবসায়িক চতুরতা অন্যায় এবং সবার ওপরে যৌনতা অন্যায়। তিনি অবশ্য এইসব উপভোগ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেন না। কিন্তু এর জন্যে তার অধঃপতন হচ্ছে এই ধারণা থেকে সবকিছু তার বিষময় হয়ে ওঠে। একটিমাত্র সুখ যা তিনি অন্তর দিয়ে পেতে চান তা হচ্ছে তার জননীর স্নেহাদর। যা তিনি পেয়েছেন শৈশবে, যা তাকে এখনও উদ্বেলিত করে। কিন্তু সেই আনন্দ তার জন্যে আর উন্মুক্ত নয়। তাই আর কিছুকে তিনি পরোয়া করেন না। যেহেতু পাপ তাকে করতেই হবে, তাই গভীরভাবেই তিনি তাতে ডুবে যেতে চান। যখন তিনি প্রেমে পড়েন তখন তিনি প্রেমিকার কাছে মাতৃসুলভ কোমল স্পর্শ খোঁজেন, কিন্তু তা পেলেও গ্রহণ করতে পারেন না। কারণ মাতৃমূর্তির আভাসের জন্যে কোনও নারীকে তিনি সম্মান করতে পারেন না, তারা তার যৌনসঙ্গী হয়েছেন বলে। তারপর ব্যর্থতার জন্যে তার মধ্যে জাগে ওঠে এক নিষ্ঠুরতা। তা থেকে জেগে ওঠে অনুশোচনা, আর সেই সাথে পুনরায় তিনি আবার কল্পিত পাপবোধ আর প্রকৃত অনুশোচনার স্বাদহীন পথে যাত্রা করেন। এটাই অধিকাংশ দুশ্চরিত্র লম্পটদের মনস্তত্ত্ব। তারা যে পথভ্রষ্ট হন তার কারণ হল তারা একটি অপ্রাপ্যনীয় জিনিসের ওপর নিষ্ঠা রেখে চলেন (তা হচ্ছে মা কিংবা মায়ের প্রতিকল্প)। এ সাথে যুক্ত হয়েছে সেই হাস্যকর নৈতিকতা, যা তার মনে শৈশবে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথম জীবনের বিশ্বাস ও ভালবাসার অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়াই এইসব মাতৃসুলভ গুণাবলীর শিকারদের সুখ পাওয়ার প্রথম স্তর।

আত্মপ্রেম, একদিক থেকে, অভ্যাসজাত পাপবোধের বিপরীত-আশ্রয়ী। আত্মপ্রেমের উপাদান হচ্ছে নিজেকে ভালবাসার অভ্যাস এবং অপরের ভালবাসা পাওয়ার কামনা। কিছুদূর পর্যন্ত এটা স্বাভাবিক এবং এর জন্যে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু মাত্রাধিক্য ঘটলে এটা খুবই ক্ষতিকর। অনেক নারীর মধ্যে, বিশেষ করে ধনী-সমাজের মহিলাদের মধ্যে ভালবাসা অনুভবের ক্ষমতা সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। তখন তাদের মনে জেগে ওঠে অন্য পুরুষদের ভালবাসা পাওয়ার এক তীব্র কামনা। এই ধরণের নারী যখন সন্দেহমুক্ত হন যে কোনও পুরুষ তাকে ভালবেসেছেন, তখনই সেই পুরুষের প্রয়োজন তার জীবনে শেষ হয়ে যায়। পুরুষদের ক্ষেত্রেও এটা দেখা যায়, কিন্তু এত বেশি নয়। এ প্রসঙ্গে 'লিয়েজঁ

দাঁগেরোসে' নামক কাহিনীর নায়ক, এ সুবিখ্যাত ধ্রুপদী দৃষ্টান্ত। মিথ্যা অহংকার এত উচ্চতায় ওঠে যে, তখন অন্য কোনও মানুষ সম্বন্ধে তার প্রকৃত কোনও কৌতূহল থাকে না। তাই এরা প্রেম থেকে প্রকৃত কোনও সুখ লাভ করতে পারেন না। উদাহণস্বরূপ বলা যায়, একজন আত্মপ্রেমিক চিত্রশিল্পীদের প্রচুর শ্রদ্ধা পেতে দেখে নিজে চিত্রশিল্পের ছাত্র হতে পারেন, কিন্তু যেহেতু এই শিক্ষালাভ তার কাছে বিশেষ একটি উদ্দেশ্যসাধনের উপলক্ষ্য, তাই শিল্পের আঙ্গিকে তার কোনও স্বাদ থাকবে না এবং নিজেকে বাদ দিয়ে তিনি অন্য কোনও কিছুর কথা ভাবতেই পারবেন না। এর ফল হবে ব্যর্থতা এবং নৈরাশ্য, অর্থাৎ ঈপ্সিত প্রশংসার পরিবর্তে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ লাভ। যে সব ঔপন্যাসিক তাদের উপন্যাসে আদর্শ নায়িকারূপে নিজেদের তুলে ধরেছেন তাদের ক্ষেত্রেও একথা বলা যায়। যে বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্ক বাইরের তার প্রতি প্রকৃত আকর্ষণ কতটুকু তার ওপর যথার্থ সাফল্য নির্ভর করে। সফল রাজনীতিবিদদের বেলায় দেখা যায় সেই বিয়োগান্ত নাটক। কারণ তাদের নিজের সমাজের প্রতি যে আকর্ষণ এবং যে অব্যবস্থা দূর করবেন বলে তিনি দাঁড়ান, তার পরিবর্তে তার মধ্যে আত্মপ্রেম জেগে ওঠে এবং তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন শুধু নিজের জন্যে। তাই তিনি আর শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য থাকেন না, কেউ তাকে শ্রদ্ধাও করে না। যে ব্যক্তির একমাত্র ভাবনা যে পৃথিবীর সব লোক তার প্রশংসা করুক, তার পক্ষে লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব নয়। যদি তা সম্ভবও হয় তবুও তিনি পুরোপুরি সুখী হতে পারবেন না, কারণ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি কখনো সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক নয়। একজন আত্মপ্রেমিক নিজেকে কৃত্রিমভাবে একটি সীমার মধ্যে ততটুকু আবদ্ধ করেন যেটুকু করেন একজন পাপবোধে তাড়িত ব্যক্তি। আদিম মানুষ ভাল শিকারী বলে হয়তো গর্বিত ছিল, কিন্তু শিকারকে অনুসরণ করার মধ্যে যে উদ্দীপনা তা সে উপভোগ করত। আত্মতৃপ্তি বিশেষ একটা সীমা লঙ্ঘন করলে তার নিজের দোষে সব কাজেই আনন্দকে নষ্ট করে দেয়, যা তখন পৌছে যায় উদাসীনতা আর একঘেয়েমিতে। প্রায় ক্ষেত্রে এর মূলে রয়েছে আত্মবিশ্বাসের অভাব যার প্রতিকার রয়েছে আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির মধ্যে। কিন্তু এই আত্মমর্যাদা লাভ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে সফল কাজের মধ্যে নিজেকে যুক্ত রাখা যার প্রেরণা পাওয়া যাবে বস্তুগত ব্যাপার থেকে।

আত্ম-অহংকারীর সঙ্গে আত্মপ্রেমিকের পার্থক্য হচ্ছে, তিনি আকর্ষণীয় হওয়ার চেয়ে বেশি চান ক্ষমতাবান হতে। তারা চান লোকে তাদের ভালবাসার চেয়ে ভয় করুক বেশি। বহু উন্মাদ এবং ইতিহাস প্রসিদ্ধ অধিকাংশ মহৎ ব্যক্তি এই শ্রেণীতে পড়েন। মিথ্যা অহংকারের মতো ক্ষমতার প্রতি ভালবাসা সাধারণ মনুষ্য-চরিত্রের একটি প্রবল উপাদান এবং তাকে সেইভাবেই গ্রহণ করতে হবে। যখন এর মাত্রা

অত্যধিক বৃদ্ধি পায় অথবা অসম্পূর্ণ বাস্তববোধের সাথে যুক্ত হয়ে যায়, তখন-ই তা মারাত্মক হয়ে ওঠে। আর তা ঘটলে মানুষ অসুখী বা নির্বোধ হয়। যদি দুটো না-ও হয়, যে উন্মাদ নিজেকে মুকুটধারী রাজা মনে করছে, একদিক থেকে তিনি অবশ্য সুখী। কিন্তু তা এমন নয় যা কোনও প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি ঈর্ষা করবে। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে 'আলেকজান্ডার দি গ্রেট'[১] উন্মাদের সমগোত্রীয়, যদিও তিনি উন্মাদের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার ক্ষমতা রাখতেন। কিন্তু নিজের স্বপ্ন সফল করতে তিনি পারতেন না, কারণ তা তাঁর সাফল্যের সাথে সাথে অতিমাত্রায় বেড়ে গিয়েছিল। যখন এ বিষয়ে আর দ্বিধা ছিল না যে ইতিহাসের পরিচিত কালে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়ী, তখন তিনি ভাবলেন যে তিনিও একজন ঈশ্বর। তিনি কী একজন সুখী মানুষ ছিলেন? তাঁর মাদকাসক্তি, উগ্র ক্রোধ, নারীর প্রতি ঔদাসীন্য এবং তাঁর দেবত্বের দাবি, এসব থেকে বোঝা যায় তিনি তা হতে পারেননি। মানব প্রকৃতির সমস্ত উপাদান বাদ দিয়ে কোনও একটি বিশেষ উপাদানের অনুশীলন করলে শেষ পর্যন্ত সুখী হওয়া যায় না। সাধারণত আত্মগর্বী ব্যক্তি হলে, তা সে উন্মাদ হোক বা নামমাত্র প্রকৃতিস্থ হোক, অতিরিক্ত অবমাননা থেকে জাত হীনতাবোধের ফল। স্কুলে নেপোলিয়ন[২] সহপাঠীদের তুলনায় হীনমন্যতাবোধে ভুগছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন দরিদ্র বৃত্তিধারী ছাত্র, আর সহপাঠীরা ছিলেন অভিজাত পরিবারের। তারপর তিনি যখন দেশত্যাগী রাজানুগতদের ফিরে আসার অনুমতি দিলেন তখন তাঁর প্রাক্তন স্কুল সহপাঠীদের তাঁর সামনে মাথা নত করে অভিবাদন করতে দেখে তৃপ্তি লাভ করেছিলেন। কী স্বর্গীয় আনন্দ! তবুও তিনি জার (রাশিয়ার সম্রাট)-কে পরাজিত করে তা থেকেও একই ধরণের আনন্দ পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই অভিযান শেষ পর্যন্ত তাঁকে সেন্ট হেলেনায় নির্বাসনে নিয়ে যায়। কোনও মানুষই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয় না। সেজন্যে যে জীবন অসহায়তার প্রভাবে পড়ে কোনও না কোনও দিন তাকে দুরতিক্রম্য বাধার সামনে পড়তেই হয়। এমনটি যা ঘটতে পারে সে জ্ঞান পাছে চেতনাকে গ্রাস করে, তাই তাকে আটকাতে হয় এক ধরণের পাগলামির সাহায্যে। যদি কোনও ব্যক্তি প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী হন, তা হলে যদি কেউ তার ভুল ধরিয়ে দেন তখন তিনি তাঁকে কারাগারে প্রেরণ অথবা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন। রাজনৈতিক

---

১. আলেকজান্ডার : Alexander the Great (খ্রিঃ পূঃ ৩৫৬-৩২৩)। সম্রাট ফিলিপের পুত্র। বিশ্ববিখ্যাত দিগ্বিজয়ী, দার্শনিক অ্যারিস্টটল তাঁর গৃহশিক্ষক ছিলেন।

২. নেপোলিয়ন, Napolean Bonaparte (১৭৬৯-১৮২১)। ফরাসী জেনারেল, পরে কনসাল এবং সম্রাট। ইউরোপের ইতিহাসে সুবিখ্যাত এক নাম। শেষ জীবন কাটে নির্বাসনে-সেন্ট হেলেনা দ্বীপে। সেখানেই মৃত্যু।

দমন এবং মনোবিকলন অর্থে দমন হাত ধরে চলে। যখনই কোথাও মনোবিকলিত দমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তখনও প্রকৃত সুখের অভাব দেখা যায়। ক্ষমতাকে নিজের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখলে সুখ বৃদ্ধিতে অনেকভাবে সাহায্য করে। কিন্তু তাকে জীবনের চরম লক্ষ্য করলে তার ফল বিপদ ডেকে আনতে পারে, বাইরের দিক থেকে না হলেও অন্তরের দিক থেকে।

এটা স্পষ্ট যে, অতৃপ্তির মনস্তাত্ত্বিক কারণ অনেক এবং নানা ধরণের। কিন্তু তাদের মধ্যেও একটা মিল আছে। জন্ম-অসুখী তাকেই বলা হয় যে প্রথম জীবনে কোনও স্বাভাবিক কামনার সহজ পরিতৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। পরে সেই একটিমাত্র কামনার পরিতৃপ্তিকেই অন্য আর সব কিছুর চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। ফলে সে তার জীবনকে একটিমাত্র দিকেই চালিত করেছে। কামনার সাথে প্রস্তুতির ওপরেই অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়েছে, তার সাথে যুক্ত আনুষাঙ্গিক উপকরণসমূহকে অগ্রাহ্য করে। বর্তমানে আর এক নতুন ব্যাপার দেখা যাচ্ছে, কোনও ব্যক্তি নিজেকে কোনও বিষয়ে অতি পরাজিত মনে করার ফলে কোনও পথেই তৃপ্তিকে খুঁজে না পেয়ে খুঁজতে শুরু করেছে চিত্তবিক্ষেপ আর বিস্মৃতিকে। এরপর সে সহজ আনন্দের অনুসারী হয়ে উঠবেই। এর অর্থ হল সে নিজেকে অর্ধমৃত করে জীবনকে সহনীয় করে তোলার চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ মাতলামির কথা বলা যায়, যা হল সামাজিক আত্মহত্যা। মাতলামি থেকে যে সুখ পাওয়া যায় তা শুধুই নেতিবাচক, অতৃপ্তিকে সাময়িকভাবে ভুলে থাকা। আত্মপ্রেমী এবং আত্মগর্বী লোক অন্তত বিশ্বাস করে সুখ লাভ করা সম্ভব, যদিও তা পাওয়ার জন্যে তারা ভুল পথ অবলম্বন করে। কিন্তু যে লোক নেশার পথে এগিয়ে যায়, সে নেশাই তা হোক সে সবছুির ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে শুধুমাত্র বিস্মৃতি ছাড়া। তার ক্ষেত্রে প্রথম কর্তব্য হচ্ছে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, সুখ অবশ্যই প্রত্যেকের কাম্য। নিদ্রাহীন ব্যক্তি যেমন নিদ্রাহীনতার জন্যে গর্বিত, অসুখী ব্যক্তি তেমনি অসুখী হওয়ার জন্যে সবসময় গর্বিত থাকে। দারিদ্রের অহংকার, অতৃপ্তির অহংকার এসব কিছুই মনে হয় সেই লেজকাটা খেঁকশিয়ালের মতোই অহংকারের। যদি তা সত্যি হয় তাহলে তার প্রতিবিধান হল নতুন লেজ গজানোর শিক্ষা দান করা। যদি তারা সুখের পথ দেখতে পায়, তাহলে আমার বিশ্বাস, খুব কম মানুষই স্বেচ্ছায় অসুখী হওয়ার পথ বেছে নেবে। এমন লোক যে রয়েছে তা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু তাদের সংখ্যা এত বেশি নয় যে তাকে গুরুত্ব দিতে হবে। আমি তাই ধরে নেব যে, পাঠকেরা অসুখী হওয়ার চেয়ে সুখী হতেই চাইবেন। আমি জানি না এ বিষয়ে বুঝতে তাঁদের কোনও সাহায্য করতে পারব কিনা, কিন্তু এই ধরনের যে কোনও প্রচেষ্টা তাদের কোনও ক্ষতি করবে না।

২

বায়রনীয় অ-সুখ

বিশ্বের ইতিহাসে পূর্বেও যেমন ছিল, বর্তমানেও সবার ধারণা এই যে, আমাদের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানী, তাঁরা প্রাচীন যুগের সব উৎসাহ-উদ্যমের পরিচয় পেয়েছেন এবং বুঝতে পেরেছেন যে বেঁচে থাকার জন্যে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। যাঁরা এই মতো ধারণ করেন, তাঁরা যথার্থই অসুখী, কিন্তু তা নিয়ে তাঁরা গর্বিত। কারণ তাঁরা বিশ্বের এই প্রকৃতিকে অতৃপ্তির হেতুরূপে প্রচার করেন এবং মনে করেন যে, আলোকিত মানুষের পক্ষে অতৃপ্তিই হচ্ছে একমাত্র যৌক্তিক মনোভাব। তাঁরা তাঁদের অতৃপ্তির জন্যে অহংকার বোধ করেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ দুর্দশাকে উপভোগ করেন, তিনি নিজে দুর্দশাগ্রস্ত নন। এই পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত সরল। এ বিষয়ে দ্বিধা নেই যে উচ্চমন্যতাবোধ এবং অন্তর্দৃষ্টি দুঃখভোগ জনিত কিছু ক্ষতি পূরণ করে। কিন্তু সহজ আনন্দ উপভোগের অভাব তা পূরণ করতে পারে না। আমি মনে করি না যে অসুখী হওয়ার মধ্যে কোনও উচ্চমার্গের বিচারবোধ আছে। জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের অবস্থায় যতটা সম্ভব ততটাই সুখী হবেন এবং যদি তিনি অনুভব করেন যে পৃথিবীর ব্যাপারে ভাবনা একটা বিশেষ সীমার পর বেদনাদায়ক, তখন তিনি তার পরিবর্তে অন্য কিছু ভাববেন। এই অধ্যায়ে এই কথাটাই আমি প্রমাণ করতে চাই। পাঠককে বোঝাতে চাই যে নানারকম বিতর্ক থাকলেও যুক্তি কখনো সুখের ওপরে নিষেধবিধি আরোপ করেনি। আমি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছি যারা তাদের দুঃখের কারণকে আন্তরিকভাবে তাদের পৃথিবী সম্পর্কিত ধারণার জন্য দায়ী করেন, তারা ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেন। মূল কথা হচ্ছে, তারা কেন অসুখী তা-ই তারা জানেন না। আর এই অতৃপ্তি তাদের অভ্যস্ত পারিপার্শ্বিক বিশ্বের কম পছন্দের বৈশিষ্ট্যসমূহের দিকেই তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে রাখে।

আধুনিক আমেরিকানদের জন্যে আমি যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীটি তুলে ধরতে চাই তা 'মিস্টার জোসেফ উড ক্রাচ' তাঁর 'দ্য মডার্ন টেম্পার' নামে যে পুস্তক তাতে তুলে ধরেছেন। আমাদের পূর্বপুরুষদের জন্যে এটি করেছেন কবি বায়রন।[১] পরকালের জন্যে করেছেন 'একলিজিয়াস্টেস'-এর লেখক। মিস্টার ক্রাচ বলেছেন: আমরা পরাহত এবং জগতে আমাদের স্থান নেই, কিন্তু তাই আমরা আমাদের মানবজন্মের জন্যে দুঃখিত নই।

---

১. বায়রন, Lord Byron (১৭৮৮-১৮২৪)। Lord Gordon নামেও মায়ের পদবীতে পরিচিত। রোমান্টিক যুগের কবি।

আমরা বরং মানবরূপে ধ্বংস হব। তবুও পশুরূপে বেঁচে থাকতে চাইব না। কবি বায়রন বলেন :

'যে আনন্দ নিয়ে যায় কাল, কভু নাহি দেয় তাহা ফিরে।
যৌবনের ভারের গরিমা ডুবে যায় কাল সিন্ধু নীরে।'[১]

'একলিজিয়াস্টেস'-এর লেখক বলেন :

'এই কারণে, যাঁরা এখনও বেঁচে আছেন তাদের চেয়ে মৃত, অর্থাৎ যাঁরা আগেই মরে গেছেন, তাদের আমি বেশি সাধুবাদ দিয়েছি।

সত্যিই এই দুই প্রকারের মানুষের চেয়ে সেই বেশি ভাল যিনি এখনও জন্মগ্রহণ করেননি, যিনি এখনো সূর্যের নিচে ঘটে যাওয়া পাপাচার দেখেননি।'

এই তিনজন নৈরাশ্যবাদী জীবনের সকল উপভোগের বিষয়কে দেখেই এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন যার মধ্যে কোনও আনন্দের কণা নেই। মিস্টার এ. নিউইয়র্কের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের সমাজে বাস করেছেন। বায়রন পৌরাণিক যুগের নায়কদের মতো হেলেসপন্টে সাঁতার কেটেছেন এবং চুটিয়ে প্রেম করেছেন। একলিজিয়াস্টেসের লেখক প্রমোদের বৈচিত্রে বায়রনকে ছাড়িয়ে গেছেন। তিনি মদে ডুবেছেন, সঙ্গীতে আত্মহারা হয়েছেন এবং আনুষঙ্গিক সব কিছুতেই নিজেকে জড়িত করেছেন। তিনি জলাশয় তৈরী করেছিলেন। তাঁর অনেক সেবাদাস ও সেবাদাসী, অনেকে তাঁর বাড়িতেই জন্ম নিয়েছিল। এমন অবস্থাতেও তিনি বুদ্ধিভ্রষ্ট হননি। কিন্তু তবুও তিনি দেখেছেন সব কিছু অর্থহীন। এমনকি জ্ঞানও তাঁর কাছে অর্থহীন।

"আমি অন্তর দিয়ে জানতে চেয়েছি জ্ঞানকে, জানতে চেয়েছি উন্মাদনা ও মুর্খতাকে। আমি দেখেছি আত্মা এতেও পীড়িত হয়, কারণ যত জ্ঞান তত অনুতাপ। যে মানুষ জ্ঞানকে বাড়াবেন তিনি দুঃখকেই বাড়াবেন।"

তাঁর জ্ঞান তাঁকে বেদনাহত করেছিল, মনে হয়। তিনি এ থেকে মুক্তির পথ চেষ্টা করেছিলেন।

"অন্তর থেকে আমি বলেছিলাম এবার এসো, আনন্দ দিয়ে যাচাই করি তোমাকে।

অতএব প্রমোদে ভেসে যাও। কিন্তু দেখলাম তাও অর্থহীন।"

কিন্তু তাঁর জ্ঞান তাঁর সঙ্গ ছাড়েনি,

---

১. অনুবাদ মোতাহার হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬)। তিনি বার্ট্রান্ড রাসেলের "Conquest of Happiness"-এর ভাব অবলম্বনে "সুখ" গ্রন্থটি রচনা করেন।

আমি তখন নীরবে বললাম, যেমন বুদ্ধিহীনের বেলায় ঘটে, তেমনি আমার ক্ষেত্রেও ঘটে। তা হলে আমি বেশি জ্ঞানী হলাম কেন? তখন আবার আমি মনে বললাম, এও অর্থহীন।

সুতরাং আমি জীবনকে ঘৃণা করতে শুরু করলাম। কারণ যা কিছু এই বিশ্বে ঘটছে তা আমার কাছে বেদনাদায়ক। কারণ সবকিছুই অর্থহীন এবং মানস-পক্ষে বিরক্তিকর।"

আমি লেখকদের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা যে, লোকে অনেক আগেকার দিনের কথা পড়েন না। কিন্তু যদি পড়তেন; তাহলে তারা এই সিদ্ধান্তে আসতেন লেখার সম্পর্কে যাই বলা হোক, নতুন বই লেখা নিশ্চিতভাবেই অর্থহীন। আমি দেখাতে পারি জ্ঞানী লোকের পক্ষে একমাত্র একলিজিয়াস্টেসের সঙ্গে উন্মুক্ত, সেকথা ঠিক নয়। তা হলে ঐ একই মেজাজের পরবর্তী অন্যসব বিষয়ে আমাদের আর ভাববার কিছু নেই। এই ধরণের আলোচনায় আমাদের লেখার মনন এবং তার বুদ্ধিদীপ্ত প্রকাশ— এই দুইয়ের পার্থক্যটা মনে লেখার মননের সাথে কোনও তর্ক নেই, কোনও অনুকূল ঘটনায় তার হতে পারে অথবা আমাদের শারীরিক কোনও পরিবর্তনে তার পরিবর্তন পারে, কিন্তু তর্ক দ্বারা কখনো নয়। আমি নিজে এই অভিজ্ঞতা অর্জন । যখন মনে হয়েছে সব কিছু অর্থহীন, এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়েছি দার্শনিক চিন্তা দিয়ে নয়। পেয়েছি কোনও অবশ্য করণীয় কাজের চাপে আপনার শিশুসন্তান অসুস্থ হলে আপনি অসুখী হতে পারেন। কিন্তু কখনো মনে হবে না যে এসব অর্থহীন। আপনার মনে হবে যে সন্তানকে সুস্থ করতেই হবে। এ প্রশ্ন আপনার মনে উঠবেই না যে জীবনের কোনও চরম আছে কিনা। ধনী লোক মনে করতে পারেন এবং সচরাচর মনে করেও সবকিছু অর্থহীন। কিন্তু যদি কোনও কারণে তার অর্থনাশ হয়, তবু তার মনে না যে পরবর্তী আহারের ব্যাপারটাও অর্থহীন। প্রকৃতিলব্ধ অভাবের থেকেই এই অনুভূতি জাগ্রত হয়। মানবজাতি অন্যসব প্রাণীর মতো বিশেষ ধরণের জীবনযুদ্ধের উপযোগী হয়ে সৃষ্টি হয়েছে। প্রচুর অর্থের মানুষ বিনা শ্রমে তার সব খেয়াল চরিতার্থ করতে পারে। অবস্থা যদি পরিশ্রমের অভাবই সুখের একটি প্রধান উপকরণ তার জীবন থেকে । যেসব জিনিসের প্রতি মানুষের কামনা প্রবল নয়, সেসব যদি সে করে, তা হলে সে মনে করবে কামনা পূরণে সুখলাভ হয় না। তার কিছু দার্শনিক ভাবনায় অভ্যস্ত হয়ে থাকে, তা হলে তার মনে হবে জীবন দুঃখময়। তা হলে যে মানুষ যা চায়, তাই যদি পেয়ে যায়, সে

আরও অসুখী। সে ভুলে যায় যে কিছু অভাব থাকা সুখের একটি অ
উপাদান।

এই হল মেজাজ বা মননের কথা, যা এখানে শেষ করতে হয়।
একলিজিয়াস্টেসে বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনাও রয়েছে।

"নদী সাগরে গিয়ে পড়ছে, তবু সাগর অপূর্ণ।
সূর্যের নিচে নতুন কিছুই নেই।
পূর্ব-স্মৃতি বলে কিছুই নেই।
এই পৃথিবীতে সূর্যের নিচে যে শ্রম আমি করেছি,
আমি ঘৃণা করেছি তাকে, কারণ আমার পরে যে জন্মাবে
তাকে দিয়ে যেতে হবে অর্জিত সম্পদ।"

এই আলোচনা আধুনিক দার্শনিকের ভাষায় সাজিয়ে নিলে তা অ
এইরকম দাঁড়াবে : মানুষ নিরন্তর পরিশ্রম করছে, বস্তু অবিরাম গতিশী
কিছুই অবিনশ্বর নয়। যদিও পরিবর্তনের নিয়মে যা করে আসছে তার সাথে
কোন পার্থক্য নেই। কোনও মানুষ মারা গেলে তার উত্তরপুরুষ তার শ্রমে
ভোগ করে। নদী পড়ছে সাগরে গিয়ে। কিন্তু তার জলরাশি সেখানে থাকে
বারবার সীমাহীন, উদ্দেশ্যহীন চক্রে মানুষ এবং সব জাগতিক বস্তুর উদ্ভ
বিনাশ হচ্ছে। কোনও উন্নতি নেই, স্থায়ী কোনও ফল নেই। এমনি চলছে দি
পর দিন। বছরের পর বছর। নদীদের যদি বুদ্ধি থাকত, তা হলে তারা চল
স্তব্ধ হয়ে থাকত। সলোমন[১] যদি বুদ্ধিমান হতেন, তাহলে তিনি উত্তরপু
ভোগের জন্যে ফলের গাছ পুঁততেন না।

কিন্তু অন্য মেজাজে দেখলে সব কিছুর চেহারা বদলে যাবে। সূর্যে
নতুন কিছুই আর নেই। কেন, আকাশছোঁয়া অট্টালিকা, আকাশ-যান,
রাজনীতিবিদদের বেতার ভাষণের কথা ভাবুন? সলোমন[২] এসবের কিছু জা
কি? যদি রাজ্যের অভ্যন্তর থেকে ফিরে এসে তিনি শেবার রাণির প্র
উদ্দেশ্যে প্রচারিত বেতার ভাষণ শুনতে পেতেন, তাহলে তাতে কী তিনি তাঁ
গাছপালা আর জলাশয়ের মাঝখানে সান্ত্বনা পেতেন না? যদি তাঁর অধীনে কো
তথ্য দপ্তর থাকত এবং সংবাদপত্রে তাঁর হারেমের আরাম সম্বন্ধে কী বলছে
তাঁর সাথে তর্করত বিরোধী জ্ঞানীদের কী দুর্দশা ঘটছে, তা যদি সেই
সংবাদপত্রের কাটিং পাঠিয়ে তাঁকে জানাতে পারত, তাহলেও কী তিনি নি

---

১. সলোমন, Solomon, খ্রিস্টপূর্ব দশম শতকের হিব্রু রাজা। খ্রিস্ট সমাজে
চিন্তাধারাপুষ্ট 'Legos Theology' গৃহীত।

২. Eccleiasten সলোমনের রচনা নয়। কিন্তু তাঁর নামের সাথেই এই গ্রন্থ সংযু

...র নিচে নতুন কিছুই নেই? হয়তো এসব তাঁর নৈরাশ্যকে সম্পূর্ণ দূর করতে ...না। কিন্তু এসব কিছুকে তিনি নতুনভাবে প্রকাশ করতে বাধ্য হতেন। বস্তুত ...মাদের সময় সম্পর্কে মিস্টার ক্রাচের একটি অভিযোগ এই যে, সূর্যের নিচে ...নিস একটু বেশিই আছে। নতুনত্বের অভাব অথবা উপস্থিত— দুই-ই যদি ...বিরক্তিকর হয় তাহলে তার কোনটি নৈরাশ্যের সত্যি কারণ হতে পারে তা ...য় না। তার ওপর এই কথাটি বিবেচনা করে দেখুন : "সব নদী সাগরে ...লীন হচ্ছে, তবু সাগর পূর্ণ হচ্ছে না। যেখান থেকে নদীসমূহ আসছে, ...সেখানেই আবার ফিরে যাচ্ছে।" নৈরাশ্যের কারণরূপে বিবেচনা করলে এর অর্থ ...ভ্রমণ নিরানন্দময়। লোকে গ্রীষ্মকালে স্বাস্থ্যকর স্থানে যায়, আবার ফিরে ...। এতে প্রমাণ হয় না যে গরমের দিনে স্বাস্থ্যনিবাসে যাওয়া অর্থহীন। জলের ...অনুভূতি থাকত, তা হলে তা হয়তো শেলির[৫] 'ক্লাউড' (মেঘ)-এ বর্নিত ...নিজের সাহসে ভরা ভ্রমণচক্রটা উপভোগ করত। উত্তরাধিকারীর জন্যে ...যাওয়ার বেদনাবোধ থেকে বলা যায় যে বিষয়টি দুদিক থেকে বিবেচনা ...যেতে পারে। উত্তরাধিকারীর দিক থেকে দেখতে গেলে এটি স্পষ্টতই কম ...ব্যঞ্জক। সব কিছুই পরিণতিতে দূরে চলে যায়। শুধু সেই কারণে তার জন্যে ...ওয়া উচিত নয়। যদি তাদের পরিবর্তে খারাপ জিনিস আসে তাহলে ...আশাব্যঞ্জক হওয়ার একটি কারণ মনে করা যেতে পারে। সলোমন যেমন ...করেন, যদি তেমন কিছু ফিরে আসে? তা হলে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটাই তো নষ্ট ...যায়। অবশ্যই যায় না, যদি না আবর্তনের প্রতিটি স্তর আলাদাভাবে ...ব্যঞ্জক না হয়। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তা কী বয়ে আনবে, তার মধ্যে ...সমস্ত অর্থ নিহিত, এইভাবে দেখার ধারণাটাই অত্যন্ত ক্ষতিকর। ...নিজেরই একটি মূল্য আছে। তার অংশবিশেষের কোনও মূল্য না ...সমগ্রেরও কোনও মূল্য থাকে না। জীবন আর যাই হোক মিলনান্তক নাটক ...অবিশ্বাস্য রকমের বহু দুর্ভোগের ভিতর দিয়ে গিয়ে নায়ক-নায়িকার ...মিলন ঘটে যে নাটকে, বাস্তব জীবনকে তার অনুরূপ ভাবা উচিত নয়। ...আমার সময়ে বেঁচে আছি এবং সেই সময়কে যথারীতি উপভোগ করছি, ...পুত্র পরে আসবে এবং সেও তার সময়ের সম্পদ ভোগ করবে। তারপর ...আসবে। এরইমধ্যে বিয়োগান্তক কী রয়েছে? বরং আমি যদি চিরজীবী ...তা হলে শেষ জীবনে সব আনন্দ বিস্বাদে পরিণত হত। জীবন দুর্বিসহ ...উঠত। যেভাবে জীবন চলছে তাতে তা চিরসজীব রয়েছে,

---

...Shelley (১৭৯২-১৮২২), রোমান্টিক যুগের কবি। স্বল্পায়ু। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ...West Wind', 'The Cloud', 'the Skylark' এবং 'Song of Prosperive'।

"জীবনের আঁচে তপ্ত করেছি দুহাতে ভাই
আগুন নিভেছে, এবার আমিও বিদায় চাই।"[১]

মৃত্যুতে যন্ত্রণা পাওয়া যতটা যুক্তিসঙ্গত, এই মনোভাবও ততটাই যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং যুক্তি দিয়েই যদি মেজাজ গড়তে হয়, তা হলে হতাশ হওয়ার যতটুকু যুক্তি আছে, খুশী হওয়ার পক্ষেও ততটুকু যুক্তি রয়েছে।

'একলিজিয়াস্টেস' বিষাদময়। মিস্টার ক্রাচের 'মডার্ন টেম্পার' হৃদয়বিদা মিস্টার ক্রাচ অন্তরের অন্তস্থলে বিষণ্ন, কারণ মধ্যযুগীয় মূল্যবোধ ভেঙ্গে পড় পরবর্তী অসুখী যুগের অনেক মূল্যবোধ আর শাশ্বত মনে হয় না। তিনি বলে "আধুনিক নিরানন্দ কালটা হচ্ছে মৃত দুনিয়ার প্রেত-অধ্যুষিত কাল, এবং সেকাল স্থিতিশীল হয়ে ওঠেনি। যে কিশোর পৌরাণিক ধর্মীয় ভাবধারায় হয়েছে, সে যেমন স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্রে দিগভ্রান্ত, এর সঙ্কট অনেকটা রকম।" একটি বিশেষ বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সম্পর্কে এটা সম্পূর্ণ সত্য। সাহিত্যের শিক্ষালাভ করেছেন, তাই আধুনিক বিশ্ব সম্পর্কে কোনও খবর না। এঁরা প্রথম জীবনের বিশ্বাসকে আবেগের ভিত্তির ওপর স্থাপন করার পেয়েছেন। তাই যা আধুনিক জগতের জ্ঞান দ্বারা পূরণ করা যায় তাতে আস্থা নেই। অন্যান্য আরো সাহিত্য-কর্মীর মতো। মিস্টার ক্রাচ এই ধারণা নির্ভর করে বলছেন যে, বিজ্ঞান তার প্রতিজ্ঞা পালন করেনি। এই প্রতিজ্ঞা তা অবশ্য তিনি বলেননি। কিন্তু তিনি মনে হয় ভাবেন ষাট বছর আগে ডা ও হাক্সলি বিজ্ঞান থেকে এমন কিছু আশা করেছিলেন, যা বিজ্ঞান দিতে পারে আমার মনে হয় এর সবটুকুই ভুল এবং এই ভুল পোষণ করে এসেছেন সে

লেখক এবং যাজক, যাঁরা চান না তাঁদের বিশেষ জ্ঞানকে কেউ তুচ্ছ করুক। এ কথা সত্যি যে বর্তমানের জগতে অনেক নৈরাশ্যবাদী রয়েছে। যখন অনেক লোকের আয় কমে যায় তখনি নৈরাশ্যবাদের প্রকোপ দেখা যায়। ঠিক যে মিস্টার ক্রাচ একজন আমেরিকান এবং মোট কথা আমেরিকানদের যুদ্ধের কারণেই অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে বুদ্ধিজীবী খুবই দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। তা ছাড়া যুদ্ধ প্রত্যেকের মধ্যেই অনিশ্চয়তার ভাব জাগিয়ে তুলেছে। একটা যুগের মানসিক গঠনে বিশ্বের প্রকৃতি বিষয়ক মতবাদের তুলনায় এইসব সামাজিক কারণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ত্রয়োদশ শতক সবচেয়ে নৈরাশ্রময় যুগ। যে বিশ্বাসের অভাব মিঃ ক্রাচ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, তা ত্রয়োদশ শতকের নৈরাশ্যভরা তৎকালীন সম্রাট এবং কয়েকজন ইতালিয়ান অভিজাত ব্যক্তি ছাড়া অন্য

১. মোতাহার হোসেন চৌধুরীর অনুবাদ।

[illegible] ছিল। মিঃ ক্রাচ বলেছেন কিছু মূল্যবোধের অবক্ষয়ের জন্যেই আধুনিক [illegible] মানুষের এই দুর্দশা, তা কিন্তু সঠিক নয়। রজার বেকন[১] বলেছেন, "যে [illegible] অতীত যুগের তুলনায় বর্তমান পাপ বেশি মাত্রায় রাজত্ব করছে এবং পাপ [illegible] বিপরীতধর্মী। যদি বিশ্বের সমগ্র অবস্থা দেখি এবং সব জায়গায় তার রূপ [illegible] দাঁড়িয়েছে তা বিবেচনা করি, তাহলে আমরা দেখতে পাব দুর্নীতি সর্বকালের [illegible] ছাড়িয়ে গেছে এবং তা সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে শীর্ষমহলে। ... লাম্পট্য [illegible] দরবারকে কলুষিত করেছে এবং ঔদারিকতা সবার মনিব সেজে বসেছে...। [illegible] শীর্ষস্তরে যদি এই অবস্থা হয় তাহলে নিচের দিকের অবস্থা কী? গীর্জার [illegible] দেখুন, কীভাবে তাঁরা আত্মাকে উদ্ধার করার চেয়ে অর্থের পিছনে [illegible]। ...তারপর ধর্মীয় গোষ্ঠীদের দেখা যাক, যা বলতে যাচ্ছি তা থেকে কেউ [illegible] পারে না। দেখুন তাদের কী পরিমাণ অধঃপতন হয়েছে— কেউ এ থেকে বাদ [illegible], নতুন গোষ্ঠী (ফ্রায়ারগণ) নিজেদের উচ্চ মর্যাদাবোধ থেকে ভয়ানকভাবে [illegible] নেমে গেছে। যাজকশ্রেণী এখন অহংকার, লাম্পট্য এবং লালসাগ্রস্ত। এবং [illegible] যাজক-সহকারীরা একসাথে ছুটেছে, প্যারিসে হোক বা অক্সফোর্ডে, [illegible] তারা কলহ, মারামারি এবং আরো সব কুকর্ম দ্বারা জনগণকে কলংকিত [illegible]। ...প্রত্যেকে যদি লালসা চরিতার্থ করতে পারে, তবে কী হচ্ছে, কেমন [illegible] হচ্ছে, কোন্ কৌশলে হচ্ছে, কিছুই আসে যায় না।" প্রাচীন যুগের পৌত্তলিক [illegible] সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "তাঁদের জীবন আমাদের চেয়ে এত বেশি ভাল [illegible], দুয়ের মধ্যে কোনও তুলনা চলে না। যেমন ভাল ছিল শালীনতায় এবং [illegible] নিন্দা করার ব্যাপারে, তার সব আনন্দ, ঐশ্বর্য্য এবং মর্যাদা নিয়ে। এসব [illegible] যাবে অ্যারিস্টটল,সেনেকা, টুলি, অভিসেনা, আলফারাবিয়াস, প্লেটো, [illegible] এবং অন্যান্যদের লেখা থেকে। এইভাবে তাঁরা জ্ঞানের রহস্যে [illegible] ছিলেন এবং তার রহস্য ভেদ করেছিলেন।"[২] রাজার বেকনের অভিমত [illegible], তাঁর সমকালীন সাহিত্যসেবীদের কেউ তাঁর মতো নিজের যুগকে পছন্দ [illegible]। এসবের মূলে কোনও দার্শনিক তত্ত্ব রয়েছে আমি তা মূহূর্তের জন্যেও [illegible] করি না। বাস্তব অর্থে এর মূলে আছে যুদ্ধ, দারিদ্র্য এবং সন্ত্রাস।

মিঃ ক্রাচের রচনার করুণতম অধ্যায় হচ্ছে প্রেম বিষয়ে আলোচনা। [illegible] যুগের লোকদের প্রেম বিষয়ে ধারণা খুব উচ্চস্তরের ছিল। কিন্তু

[illegible], Roger Bacon (১২১৪-১২৯২), ইউরোপের মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ [illegible] এবং দার্শনিক।

[illegible](কুলটন)-এর বিখ্যাত গ্রন্থ "From St. Francis to Dante" হ'তে [illegible] রাসেল।

আমরা আমাদের আধুনিক বাস্তববোধ দিয়েই প্রেমকে দেখি। "ভিকটোরিয়ান
মধ্যে যারা অতিরিক্ত সন্দেহবাদী, তাদের কাছে প্রেম ঈশ্বরের কিছু উদ্দেশ্য
করত যা তারা হারিয়ে ফেলেছিল। তাদের কাছে প্রেম ছিল ঈশ্বরের প্রতি
এই সঙ্কটের মুখে অনেক শক্তলোকও সাময়িকভাবে অতীন্দ্রিয়বাদী হয়ে পড়
তারা নিজেদের দেখেছেন এমন এক রহস্যময় শক্তির মুখোমুখি, যা তাদের
একপ্রকার ভক্তির ভাব জাগিয়ে তোলে, যা অন্য কিছুতে জাগায় না। তা এম
কিছু, যার প্রতি তাদের প্রশ্নহীন আনুগত্য সমর্পন করা উচিত। এ কথা
মর্মমূল থেকে অনুভব করেন। তাদের কাছে, প্রেম ঈশ্বরের মতোই সবকি
আনুগত্য দাবি করে। ঈশ্বরের মতোই জীবনের এক অর্থময় রূপবৈচি
বিশ্বাসীদের ভূষিত করে। যাকে এখন পর্যন্ত যে কোনও ভাবে বিশ্লেষণ
বাতিল করা যায়নি। তাদের চেয়ে আমরা ঈশ্বরহীন পৃথিবীতে বেশি অভ্যস্ত, কি
এখনও এমন পৃথিবীতে অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি, যেখানে প্রেম নেই। প্রেমহী
ঈশ্বরহীন পৃথিবী যখন হবে, তখনি নিরীশ্বরতার সঠিক অর্থ কী তা বুঝা
পারব।" এটি খুবই কৌতুকের ব্যাপার যে আমাদের কালের তরুণদের চো
ভিকটোরিয়ান যুগ যত প্রেমময় মনে হচ্ছে, সে যুগের লোকদের কাছে তা তত
প্রেমময় ছিল না। আমার দুজন মহিলার কথা মনে পড়ে, দুজনেই সে যুগের কি
কিছু বৈশিষ্ট্য ধারণ করতেন। আমার প্রথম জীবনে দুজনেই খুব পরিচিতা ছিলেন
এঁদের একজন ছিলেন নীতবাদী এবং অন্যজন ছিলেন ভলটেয়ারপন্থী, অর্থাৎ
মানতেন না। প্রথম মহিলা এই বলে দুঃখ করতেন যে, সব কবিতা যেন শুধু
নিয়ে লেখা এবং তাঁর মতে বিষয়টা স্বাদহীন। পরের মহিলা বলতেন— "আমা
বিরুদ্ধে কারো কিছু বলবার নেই। কিন্তু আমার মতে বাইবেলের দশ-আদেশে
ষষ্ঠটি অগ্রাহ্য করা যত খারাপ, সপ্তমটি তত নয়। কেন না আর যাই হোক এ
অন্যপক্ষের সম্মতি চাই।" এই দুটি মতের কোনওটাই, যাকে মিঃ ক্রা
বিশেষভাবে ভিকটোরিয়ানরূপে চিহ্নিত করেছেন তা নয়। কারণ এই দু'
মহিলা প্রেমে শ্রদ্ধাশীল নন তা খুব ভাল করে বোঝা যায়। মিঃ ক্রাচ লেখকজী
এমন কয়েকজন লেখকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, যাঁরা আপন পরিবেশে
মানিয়ে নিতে পারেননি নিজেদের। এর একটা বড় উদাহরণ আমার মনে
রবার্ট ব্রাউনিং[১]। কিন্তু প্রেম নিয়ে কবি রবার্ট ব্রাউনিং-এর ধারণা আমার
কিছুটা শ্বাসরোধী মনে হয়। তাঁর প্রেমের দর্শন হচ্ছে :

---

১. ব্রাউনিং, Robert Browning (১৮১২-১৮৮৯), বিখ্যাত ইংরেজ কবি। তাঁর কা
নিস্পৃহতা ও দুর্বোধ্যতার অভিযোগ তোলেন অনেক সমালোচক।

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তাঁর সৃষ্ট হীনতম জীবও
গর্বিত হয় দ্বৈত আত্মায়, তাঁদের একটি পৃথিবীর দিকে
তাকাবার জন্যে।
অন্যটি দয়িতার দিকে ফেরাবার জন্যে।"

এ থেকে বুঝতে পারা যায়, সার্বিকভাবে এই জগতে প্রতিযোগিতার ভাবই [illegible] সম্ভাব্য পথ। কেন? কারণ ব্রাউনিং বলবেন পৃথিবী নিষ্ঠুর। তা হলে [illegible] বলতে হয়, পৃথিবী আপনাকে আপনার মূল্যে মেনে নেবে না। ব্রাউনিং [illegible] অনুকরণে দুজনে পরস্পর প্রশংসাকারী সমিতি গঠন করতে পারেন। [illegible] বিচার না করে কাজের সর্বদা প্রশংসা পাওয়া নিঃসন্দেহে আনন্দদায়ক। [illegible] এমন অবিমিশ্র প্রশংসাই চেয়েছিলেন সাথীর কাছে, ব্রাউনিং 'অরোরা লি'-[illegible] প্রশংসা না করার সাহসিকতার জন্য ফিটজেরাল্ড[১০]-কে মাত্রাহীন নিন্দা [illegible]। এভাবে তিনি নিজেকে উচু স্তরের বীরপুরুষ ভেবেছিলেন। সুতরাং [illegible] [illegible]পক্ষেরই সমালোচনাশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হওয়াকে আমি সত্যি প্রশংসামূলক [illegible] পারি না। এর মূলে রয়েছে ভীতি এবং নিরপেক্ষ সমালোচনার ঠাণ্ডা ঝাপ্টা [illegible] নিরাপদে থাকার কামনা। অনেক বয়স্ক চিরকুমার নিজেদের ঘরে আরামের [illegible] পাশে বসে একই তৃপ্তি লাভ করেন। আমি নিজে ভিকটোরিয়ান যুগে [illegible] কাটিয়েছি। মিঃ ক্রাচের আদর্শে আমি আধুনিক নই। কোনও ভাবেই [illegible] বিশ্বাস হারাইনি। কিন্তু ভিকটোরিয়ানরা যে প্রেমের প্রশংসা করেন [illegible] বিশ্বাসী নই। এ প্রেমে দুঃসাহসিকতা আছে। জাগ্রত এর দৃষ্টি, এ [illegible] বোধের জন্ম দেয় তেমনি অশুভ দিককে ভুলিয়ে দেয় না। আমার প্রেম [illegible] অথবা পবিত্র এরকম ভনিতা করে না। প্রেমে এইসব গুণাবলী [illegible] যে প্রশংসার যোগ্য, যৌন নিষেধাজ্ঞার পাপপূণ্য বোধ থেকে [illegible] ভিকটোরিয়ানদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে অধিকাংশ যৌনতাই অশুভ [illegible] যৌনতার অনুমোদন দেওয়া হত তার সাথে জুড়ে দেওয়া হত নানাধরণের [illegible] বিশেষ সব বিশেষণ। বর্তমান যুগের তুলনায় অতীত যুগে যৌন-ক্ষুধা [illegible] বেশি ছিল। এই ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই যে ঠিক এই কারণে [illegible] লোকেরা যৌনতার গুরত্ব খুব বাড়িয়ে দিয়েছে। যেমন সাধুরা সবসময় [illegible]। বর্তমান কালে আমরা এক সংশয়-পূর্ণ যুগের ভিতর দিয়ে চলেছি। [illegible] আমরা অনেকেই পুরানো আদর্শ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি কিন্তু নতুন কিছুই [illegible] তাতে তাদের অসুবিধা বেড়েছে যারা এখনও পুরানো আদর্শে বিশ্বাস

[illegible]গাণ্ড (১৮০৯-৮৩), ইংরেজ কবি, পারস্যের কবি ওমর খৈয়ামের [illegible] ইংরেজি অনুবাদক রূপে বিখ্যাত।

করেন। এতে তাদের মনোজগতে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে যা থেকে জন্ম নিচ্ছে
নৈরাশ্য, অনুশোচনা এবং বিশ্বনিন্দুকতা। আমার বিশ্বাস এদের সংখ্যা খু
নয়। কিন্তু এ যুগে তাদেরই প্রাধান্য বেশি। আমার বিশ্বাস কেউ যদি এ
সাধারণ অবস্থাপন্ন যুবকদের সাথে ভিকটোরিয়ান যুগের যুবকদের তুলনা
তা হলে দেখবেন প্রেম সম্পর্কে বর্তমান সময়েই তৃপ্তিলাভ বেড়েছে এবং
আগের চেয়ে প্রেমের মূল্য নিয়ে আন্তরিকতা এখন অনেক বেড়ে গেছে।
কিছু বিশ্বনিন্দুক সবকিছুই খারাপ দেখে, তার কারণ খুঁজতে হবে তাদের
মনের ওপর অতীত আদর্শের অত্যাচারের মধ্যে, আর খুঁজতে হবে
সময়ের লোকের আচরণ-নিয়ন্ত্রক যৌক্তিক নৈতিক আদর্শের মধ্যে। অন্য
মধ্যে এর প্রতিকার নেই। অতীতের প্রতি মমত্ববোধের মধ্যেও নেই,
আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীকে সাহসের সাথে স্বীকার করার মধ্যে। আর রয়েছে
বাতিল কুসংস্কারকে তাদের সব রহস্যময় গুপ্তস্থান থেকে নির্মূল করার মধ্যে।

প্রেমের মূল্য দেওয়া কেন তা সংক্ষেপে বলা খুব কঠিন। তবু আমি
করব। প্রেমের মূল্য দেওয়া উচিত কারণ প্রেম নিজেই আনন্দের উৎস
প্রেমের উচ্চতম মূল্য না হলেও, এর প্রত্যেকটি স্তরে এই আনন্দই অনিবার্য
অবস্থান করছে।

"হে প্রেম! তারা তোমাকে খুব ভুল করে
বলে তোমার মধুরতা তিক্ত
কিন্তু তোমার রসাল ফল এমন যে
তার চেয়ে মধুরতর আর কিছু নেই।"

এই কয়েকটি পংক্তির অজ্ঞাতনামা লেখক নিরীশ্বরবাদের কোনও যু
খুঁজছেন না, বিশ্বরহস্যের চাবিও নয়। তিনি নিজের মধ্যেই আনন্দকে
করছেন। প্রেম যে শুধু আনন্দের উৎস তাই নয়, এর অভাবও বেদনার
দ্বিতীয়ত প্রেমকে এজন্যে মূল্যবান মনে করতে হবে, কারণ তা জীবনে
আনন্দের স্বাদ বাড়িয়ে দেয়। যেমন সঙ্গীত, পর্বতে সূর্যোদয় এবং পূর্ণিমায়
প্লাবিত সমুদ্র। যে মানুষ তার প্রেমিকার সাথে মিলে সুন্দর জিনিস
করেনি সে প্রেমের যে যাদু-ক্ষমতা আছে তার সন্ধান পায়নি। প্রেম অহং
আবরণটা ভেঙে ফেলতে পারে। কারণ এটি জৈব-সহযোগিতারই এমন
যাতে একের প্রকৃতিজাত উদ্দেশ্য মেটাতে অপরের আবেগের প্রয়োজন হয়
নানা যুগে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনেক দর্শনের আবির্ভাব ঘটেছে। তাদের
মহৎ কোনওটা নয়। স্টোইক এবং প্রথমযুগের খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস
মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ মঙ্গল পাওয়া সম্ভব শুধুমাত্র নিজের স্বাধীন ইচ্ছা

অন্তত পক্ষে অন্য মানুষের সাহায্য ছাড়া। অন্যেরা ক্ষমতাকেই মনে করেছেন জীবনের চরম লক্ষ্য। কেউ কেউ মনে করেছেন ব্যক্তিগত আমোদ-প্রমোদকে। এসবই বিশেষ নির্জন দর্শনের পর্যায়ে পড়ে। কেন না এতে অনুমান করা হয়েছে যে, মঙ্গল এমন একটা বস্তু যা শুধু ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সমাজে নয়, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে আলাদাভাবে রূপায়িত হওয়া সম্ভব। আমার বিবেচনায় এ সকল মতবাদ মিথ্যা এবং তা শুধু নৈতিক মতবাদ হিসাবে নয়, আমাদের সহজাত প্রবৃত্তির উৎকৃষ্ট অংশের প্রকাশরূপেও। মানুষ সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল। এবং কিছু ত্রুটিপূর্ণ হলেও প্রকৃতি তার ভিতর এমন সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে যাতে সহযোগিতার জন্যে যে বন্ধুত্বপূর্ণ অন্তর প্রয়োজন তা সেই সহযোগিতা প্রেরণা যোগায়, যাদের কিছুমাত্র প্রেমের অভিজ্ঞতা রয়েছে তারা তাদের প্রিয়জনের চরম মঙ্গলের সাথে সম্পর্কহীন এমন কোনও দর্শনে তৃপ্ত হবে না। সন্তানস্নেহের অনুভূতি আরও বেশি ক্ষমতাশালী। কিন্তু তার শ্রেণী প্রকাশ ঘটে পিতা-মাতার পরস্পরের প্রেমের ফলে। আমি এমন দাবি করি না যে মহৎ প্রেম খুব একটা সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু এ কথা বলি যে মহৎ প্রেম এমন কিছু মূল্যবোধ তুলে ধরে, যা অন্যভাবে অজানা থেকে যেত। প্রেমের নিজেরই ভিতর এমন একটা ঐশ্বর্য আছে, যাকে অবিশ্বাস দিয়ে স্পর্শ করা যায় না। মহৎ প্রেম সব সংশয়বাদীর নাগালের বাইরে। যারা তাদের অক্ষমতার জন্যে যদিও সংশয়বাদকেই দায়ী করে।

"সত্য প্রেম দীর্ঘজীবী অনল
যা মনে জ্বলছে অনন্তকাল
কখনো রুগ্ন হয় না, মরে না, শীতল হয় না,
কখনো স্থানচ্যুত হয় না।"

এর পর মিঃ ক্রাচ ট্র্যাজেডি নিয়ে কী বলেছেন তা দেখব। তিনি এ প্রসঙ্গে যা বলেন, আমি তার সাথে সহমত পোষণ করি। ইবসেনের[১] 'গোস্টস', শেক্সপীয়ারের[২] 'কিং লিয়র' থেকে নিম্নমানের। 'প্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি, উন্নত শব্দরাজি উপহার, কোনও কিছুই ইবসেনকে শেক্সপীয়ারে রূপান্তরিত করতে পারত না। যে উপাদান থেকে শেক্সপীয়ার তাঁর নাটক সৃষ্টি করেছেন, মানবিক মর্যাদাবোধ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা, মানুষের আদিম প্রবৃত্তির ওপর গুরুত্ববোধ এবং জীবনের বিস্তার-সম্পর্কিত কল্পনার আশ্রয়, ইবসেনের কল্পনায় এসবের কোনও

---

১. ইবসেন, Henrik (Johan) Ibsen (১৮২৪-১৯০৬)। নরওয়ের কবি ও নাট্যকার। আধুনিক নাট্যকলার প্রবাদপুরুষ।

২. শেক্সপীয়ার, William Shakespeare (১৫৬৪-১৬১৬)। ইংরেজী সাহিত্যের মহাকবি, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার।

গুরুত্ব নেই, এবং তাঁর সমসাময়িকদের কাছেও তার কোনও গুরুত্ব থাকতে পারে না, ছিলও না। মধ্যবর্তী শতক সমূহের মধ্যে ঈশ্বর, মানুষ এবং প্রকৃতি সব কিছু কেন জানি মূল্য হারিয়ে ফেলেছে যার অর্থ এই নয় যে, আধুনিক শিল্পের বাস্তবতা আমাদের মানুষের হীনতার সন্ধানে লিপ্ত করেছে। এইভাবে মানুষের জীবনের হীনতা বাস্তববাদী চিত্রকলা পদ্ধতি যেন কোনওভাবে আমাদের ওপর চাপানো হয়েছে।' এটা নিঃসন্দেহে সেই ব্যাপার যে, প্রাচীন ধাঁচের ট্র্যাজেডি যেখানে রাজকুমারদের দুঃখের কথা থাকত তা বর্তমান কালের উপযোগী নয়। আমরা যখন অখ্যাত কোনও ব্যক্তির দুঃখের কথা একই রীতিতে আলোচনা করি, তখন তার প্রতিক্রিয়া এক হয় না। এর কারণ অবশ্য এটা নয় যে জীবনের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির অবনতি হয়েছে। বরঞ্চ এর বিপরীতটাই সত্যি। কারণ, এখন আমরা বিশেষ কয়েকজন ব্যক্তিকে আর বিশ্বের মহৎ মানুষ বলে মনে করতে পারি না। একমাত্র তাদেরই বিয়োগান্ত নাটকে আবেগের অধিকার থাকবে, আর অন্যেরা কিছু লোকের মহিমা বাড়াবার জন্যে উদয়াস্ত পরিশ্রম করবে, এমন কথা আমরা মেনে নিতে পারি না। শেক্সপীয়ার বলেছেন :

"ভিক্ষুকরা মারা গেলে আকাশে ধূমকেতুর উদয় হয় না।
কিন্তু রাজকুমাররা মারা গেলে তাদের মৃত্যুতে
আকাশ ঝলসে ওঠে।"

শেক্সপীয়ারের কালে এই আবেগ সামগ্রিকভাবে কেউ বিশ্বাস না করলেও এতে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ রয়েছে যা বাস্তবতা বিশ্বজনীন এবং শেক্সপীয়ার নিজে তা মেনে নিয়েছিলেন। শেক্সপীয়ার তাঁর কালকে অতিক্রম করতে পারেন নি। এরই ফলে নাটকের চরিত্র কবি সিনার মৃত্যু কৌতুকময়। কিন্তু সিজার, ব্রুটাস এবং ক্যাসিয়াসের মৃত্যু শোকাবহ। কোনও ব্যক্তির মৃত্যুর মধ্যে যে পার্থিব গুরুত্ব, পূর্ণতা পেয়েছে সেই মূল্যবোধ আমরা হারিয়ে ফেলেছি কেন না আমরা এখন গণতন্ত্রী, শুধু বাইরের রূপেই নয় অন্তরের উপলব্ধিতেও। তাই অতি বিয়োগান্ত নাটককে এখন ব্যক্তিকেন্দ্রিকের চেয়ে সমাজকেন্দ্রিক হতে হয় বেশি। আমি যা বলতে চাই তার একটি উদাহরণ তুলে ধরছি; এর্নস্ট টোলার রচিত গ্রন্থ 'মাসেমেনশ'[১]-এর সাহায্যে। আমার মনে হয় না, এই গ্রন্থ অতীতে শ্রেষ্ঠ সব যুগে যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহ রচিত হয়েছে তার কোনওটার সমতুল্য। কিন্তু সেসব গ্রন্থের সাথে এর যে যথার্থ তুলনা চলে, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। এই গ্রন্থ উন্নত করে অন্তরকে, এখানে গভীরতা এবং বাস্তবতাবোধ থেকে বীরোচিত কর্মকাণ্ড চিত্রিত হয়েছে। অ্যারিস্টটল যেমন বলেছেন তেমনি এই গ্রন্থে

১. Vera Meynell ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন 'Masses and Man' নামে।— রাসেল

করুণা ও ভীতি জাগিয়ে পাঠকমনকে কলুষমুক্ত করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত এই ধরনের আধুনিক বিয়োগান্ত নাটক কমই রচিত হয়েছে। কারণ এখন শিল্পিত সাধারণ বিষয় দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করা যাবে না, অথচ প্রাচীন আঙ্গিক এবং বিষয়কে পরিত্যাগ করতে হবে। এই কাজ কঠিন। ট্র্যাজেডি রচনা করলে পাঠকদেরকে ট্র্যাজেডি অনুভব করতে হবে। সেই অনুভবের জন্যে যে বিশ্বে তিনি বাস করেন তার জন্যে সচেতন থাকতে হবে। শুধু অন্তরে নয়, প্রতি রক্তকণায় এবং স্নায়ুতে। মিঃ ক্রাচ তাঁর বইয়ে প্রথম থেকে শেষাবধি মাঝে মাঝে নৈরাশ্যের কথা বলে গেছেন। তিনি যে বীরোচিতভাবে আনন্দহীন বিশ্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন তা হৃদয়কে স্পর্শ করে। কিন্তু এই আনন্দহীনতার কারণ হচ্ছে তিনি এবং অধিকাংশ সাহিত্যসেবী এখন পর্যন্ত পুরানো আবেগসমূহকে নতুন যুগের প্রেরণায় রূপায়িত করতে শেখেন নি। প্রেরণার অস্তিত্ব আছে। কিন্তু সাহিত্যিকদের নিজস্ব রচনাতে তা নেই। যে সব সাহিত্যিক গোষ্ঠী রয়েছেন, সমাজের জীবনের সাথে তাদের প্রাণের কোনও সংযোগ নেই। এই সংযোগ খুব জরুরী, যদি মানুষের গভীরতর আন্তরিকতা এবং গভীরতা দিয়ে আসল দুঃখ এবং বেদনাকে পরিমাপ করতে হয়। যেসব প্রতিভাদীপ্ত যুবক জগতে তাদের কিছুই করার নেই মনে করে, তাদের আমি বলি : 'লেখার চেষ্টা ত্যাগ কর, তার পরিবর্তে না-লেখার চেষ্টা কর। বিশাল বিশ্বে বেরিয়ে পড়, জলদস্যু হও। বোর্ণিওতে গিয়ে বাস কর, সোভিয়েত রাশিয়ায় গিয়ে শ্রমিক হও, এমন জীবনকে গ্রহণ কর, যাতে তোমার প্রাথমিক জাগতিক চাহিদা মেটাতে তোমার প্রায় সকল ক্ষমতা দখল করে নেয়।' আমি প্রত্যেকের জন্যে এই পরামর্শ দান করছি না। শুধু তাদের জন্যে যারা মিঃ ক্রাচ আবিষ্কৃত 'অসুখ' নামের রোগে সংক্রামিত হয়েছে। আমার বিশ্বাস এরকম জীবন-যাপন করার কয়েক বছর পরে সাবেক-বুদ্ধিজীবী দেখতে পাবে, চেষ্টা করেও তিনি আর না লিখে পারছেন না, এবং এমন অবস্থা আসবে যখন নিজের কাছে আর তার লেখা তুচ্ছ মনে হচ্ছে না। লেখার আকৃতি থেকে মুক্ত তিনি অপার আনন্দ লাভ করবেন।

৩

প্রতিযোগিতা

আপনি আমেরিকার যে কোনও লোক অথবা ইংল্যান্ডের যে কোনও ব্যবসায়ে লিপ্ত লোকের কাছে যদি জানতে চান, জীবনকে উপভোগ করার পথে সবচেয়ে প্র প্রতিবন্ধক কী, তা হলে তিনি বলবেন : 'জীবন সংগ্রাম'। তিনি অবশ্য আন্তরিকভাবেই সে কথা বলবেন। কারণ তিনি তা বিশ্বাস করেন। কথাটা একদি দিয়ে যেমন সত্য, তেমনি অন্য অর্থে এবং গুরুত্বপূর্ণ অর্থেই তা মিথ্যা। জীবনসংগ্রা এমন একটি জিনিস, যা ঘটবেই। আমরা যদি সৌভাগ্যবান না হই, তা হ আমাদের সকলকেই জীবনসংগ্রামের মুখোমুখি হতে হয়। কনরাডের[১] কাহিনী নায়ক ফকের কথা উদাহরণস্বরূপ ধরে নেওয়া যায়। ফক ছিল এক পরিত্য জাহাজে। নাবিকদের মধ্যে যে দুজনের আগ্নেয়াস্ত্র ছিল, তাদের মধ্যে সে একজন অন্য কয়েকজন নাবিকের শরীর ছাড়া তাদের জন্যে কোনও খাদ্যবস্তু ছিল না দুজনে সেইসব শবদেহকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে যখন সব শেষ হয়ে গেল তখন স হল প্রকৃত জীবনসংগ্রাম। দুই জনের মধ্যে জয়ী হয়েছিল ফক। কিন্তু তারপর থেকে সে নিরামিশাষী হয়ে গেল। কোনও ব্যবসায়ী যখন 'জীবনসংগ্রামে'র কথা বলে তখন তিনি এই ধরণের জীবনসংগ্রামের কথ ভাবেন না। তার কাছে জীবনযু কথাটি ভুল অর্থে ব্যবহৃত। অত্যন্ত সাধারণ একটা ব্যাপারকে মহিমা দান করা জন্যে এটিকে তিনি নির্বাচিত করেছেন। তার স্বশ্রেণীর ব্যবসায়ীদের কজন না খেয়ে মারা গেছেন, সে কথা জানতে চান তার কাছে। আরো জানতে চান তার বন্ধুদ যারা সর্বস্বান্ত হয়েছেন। পরে তাদের কী ঘটেছে, সকলেই জানে কোনও ব্যবসা সর্বহারা হলেও তিনি আহারে-বসনে, যে লোকটি যথেষ্ট ধনী হয়ে সর্বহারা হওয়া সুযোগ পাননি, তার চেয়ে অনেক সুখে থাকেন। এই শ্রেণীর লোকেরা জীবনসংগ্রামের অর্থ বলে বোঝে জীবনে সাফল্য পাওয়ার সংগ্রামকে। যারা সংগ্রা রত, তাদের মনে এই যে ভয় নেই যে পরদিন সকালে তাদের প্রাতঃরাশ জুটবে না তাদের ভয় হল প্রতিবেশীদের চেয়ে যদি কয়েক ধাপ ওপরে উঠতে না পারেন।

অবাক হতে হয় একথা ভেবে যে, তারা উপলব্ধি করতে পারছেন না যে কোনও যন্ত্রে তারা ধরা পড়েননি যা থেকে তাদের অব্যাহতি নেই। মূল কথাটা হ যে দৈনন্দিন একঘেয়ে, বাঁধাধরা ও ক্লান্তিকর কাজ তারা করছেন। সেটা ওপরে ও সোপান নয়। আমি অবশ্য উচ্চ-স্তরের ব্যবসায়ীদের কথা ভাবছি। তারা এর মধ্যে প্রচুর উপার্জন করেছেন এবং তারা যদি চান তা দিয়েই সারা জীবন কাটাতে পারে

---

১. কনরাড. Joseph Conrad (১৮৫৭-১৯২৫)। বৃটিশ ঔপন্যাসিক, তিনি জা পোলিশ। Lord Jim তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

এইরকম জীবন কাটানো তাদের কাছে গ্লানিকর মনে হয়। যেন তারা শত্রুর সামনে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু যদি তাদের কাছে জানতে চান তাদের কাজ দিয়ে জনসাধারণের কোন্ উপকারটা করছেন, তা হলে তারা একজন আদর্শ জীবনের প্রচারমূলক অসার কিছু কথা তুলে ধরবেন। ঐ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো কিছু তাদের কাছে নেই।

এই রকম একজন মানুষের জীবন বিবেচনা করুন, মনে করুন তার সুন্দর বাড়ি, সুন্দরী পত্নী এবং সুন্দর সব সন্তান রয়েছে। তিনি অন্য সবার ঘুম ভাঙার আগেই ওঠেন এবং তাড়াতাড়ি অফিসে বেরিয়ে পড়েন। সেখানে গিয়ে তাকে একজন কর্মকর্তার স্বরূপ প্রকাশ করতে হয়। তাকে চোয়াল দৃঢ় নিবদ্ধ করার কৌশল আয়ত্ত করতে হয়। অভ্যাস করতে হয় বাচনভঙ্গিতে দৃঢ়তা প্রকাশ এবং বাক সংযমের, যাতে অফিসভৃত্য ছাড়া আর, সবার কাছে তা প্রভাব বাড়াতে পারে। তিনি অফিসের চিঠির বিষয়ে নির্দেশ দেন, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে টেলিফোনে আলাপ করেন, বাজারের অবস্থা যাচাই করেন। তারপর এমন কোনও ব্যক্তির সাথে দুপুরের আহার সারেন, যার সাথে তিনি কোনও লাভজনক লেনদেন করেছেন অথবা করবেন বলে আশা করেন। সারা অপরাহ্ণ একই ধরণের কাজ চলে। তারপর তিনি বাড়ি ফেরেন। তখন তিনি ক্লান্ত, নৈশাহারের পূর্বে যথাযথ পোষাক পরে তিনি নৈশাহারে বসেন তারই মতো ক্লান্ত অন্য লোকদের সাথে। খাওয়ার সময়, যেসব মহিলা তখনো ক্লান্ত হওয়ার সুযোগ পাননি, তাদের সঙ্গ উপভোগ করছেন, এমন ভান করে যেতে হয়। এই হতভাগ্য লোকটি ঠিক কত সময় পরে মুক্তি পান তা আগে বলা সম্ভব নয়। অবশেষে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন এবং কয়েক ঘণ্টার জন্যে তার উত্তেজিত স্নায়ু বিশ্রাম পায়।

এই ব্যক্তির কর্মজীবনে রয়েছে একশত গজ দৌড়ের মনস্তত্ত্ব। কিন্তু যেহেতু এই দৌড়ের শেষ লক্ষ্য হচ্ছে কবরস্থান, সেহেতু একশত গজের পক্ষে যে পরিমাণ প্রয়োজন, এক্ষেত্রে তা মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। তিনি তার সন্তানদের সম্পর্কে কিছু জানেন? সপ্তাহের কাজের দিনগুলিতে তাকে থাকতে হয় অফিসে। আর সপ্তাহান্তে তিনি থাকেন গলফ লিংকে। তিনি তার স্ত্রীর সম্পর্কে কতটুকু খবর রাখেন? সকালে যখন স্ত্রীকে ফেলে বেরিয়ে যান, তখনো স্ত্রীর ঘুম ভাঙে না। সারা সপ্তাহ স্বামী-স্ত্রী দুজনে সামাজিকতা রক্ষায় ব্যস্ত থাকেন, যা দুজনের অন্তরঙ্গ আলাপ আলোচনায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তার সম্ভবত কোনও পুরুষবন্ধু নেই যিনি তার কাছে মূল্যবান। কিন্তু তার এমন অনেক বন্ধু আছে যাদের সাথে সদ্ভাবের অভিনয় করতে হয়। মাঝে মাঝে তার ইচ্ছা হয় এই আনন্দ যদি সত্যিই অনুভব করতে পারতেন। তিনি বসন্তকালকে বা ফসল তোলার

কালকে ততটুকুই জানেন, যতটা বাজারে লাভক্ষতির সাথে যুক্ত। মনে হয়
অনেক বিদেশও ঘুরে দেখেছেন, কিন্তু চরম ক্লান্তির চোখে। বই তার কাছে
সঙ্গীত মূল্যহীন। এভাবে বছরের পর বছর কাটিয়ে তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন,
মনোযোগ আরো একাগ্র হয়, ব্যবসার বাইরে জীবন হয় শুষ্ক এবং নিরানন্দময়
আমি এই জাতীয় প্রৌঢ় আমেরিকানদের স্ত্রীকন্যাদের সাথে ইউরোপে দেখে
স্পষ্টই বোঝা গেল এরা বেচারাকে বুঝিয়েছেন কিছু ছুটি উপভোগ করা উচিত
মেয়েদের পুরানো মহাদেশ ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। মাতা
আনন্দে তাকে ঘিরে দাঁড়ায় এবং যা কিছু তাদের কাছে দেখার মতো মনে
তাদের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গৃহস্বামী চরম ক্লান্ত, বিরক্ত। শুধু ভা
থাকেন অফিসের লোকেরা এখন কী করছে অথবা বেস-বল ক্রীড়াজগতে
হচ্ছে। তার নারী-সঙ্গীরা অবশেষে তার সম্পর্কে হতাশ হন এবং মনে
পুরুষরা এক একজন বস্তুবাদী বর্বর। একথা তাদের কখনো কী মনে হয় না
লোভের কাছে তিনি নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। এ কথা অবশ্য সম্পূর্ণ সত্যি
যেমন সতীদাহ প্রথা একজন ইউরোপীয়ানের দৃষ্টিতে যেমন, আসলে ঠিক তা
হতে পারে দশটির ক্ষেত্রে নটি বিধবা স্বেচ্ছায় আত্মদান করেছে। কারণ তা
তৈরী করা হয়েছে পুড়ে মরার গৌরব লাভের জন্যে। কারণ তাই ছিল ধর্মে
বিধান। ব্যবসায়ীর গৌরব এবং ধর্ম দাবি করে আরো অধিক অর্থ উপার্জন
সুতরাং তিনি হিন্দু বিধবার মতো এই অত্যাচার আনন্দের সঙ্গে মেনে নেন
অমেরিকান ব্যবসায়ীকে আরো সুখী করতে হলে তার ধর্মকে পরিবর্তন করে নি
হবে। যতদিন তিনি শুধু সফলতা নয়, অন্তর থেকে বিশ্বাস করবেন সাফল্যে
পিছনে ধাবমান হওয়াই মানুষের কর্তব্য। যিনি তা করেন না তিনি হতভাগ্য
ততদিন তার জীবন এমন কেন্দ্রীভূত এবং চিন্তাময় থাকবে যাতে
কোনওভাবেই সুখী হতে পারবেন না। অর্থ বিনিয়োগের একটি সহজ উদাহরণ
দেওয়া যেতে পারে। প্রায় প্রত্যেক আমেরিকান তার অর্থের ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ
থেকে শতকরা ৮ ভাগ লভ্যাংশ চাইবেন, তবুও নিরাপদ বিনিয়োগ ৪ শতাংশ
চাইবেন না। এর ফলে তাদের প্রায়ই অর্থনাশ হচ্ছে, সাথে সাথে অবিরাম মানসিক
উদ্বেগ আর অশান্তি বেড়ে চলেছে। আমার নিজের কথা হচ্ছে আমি অর্থ থেকে
চাই তা হচ্ছে নিরাপত্তার সাথে অবসর। কিন্তু একজন আধুনিক মানুষ যা চান
হচ্ছে আরো বেশি অর্থ যা দিয়ে চমকপ্রদ সমারোহ প্রকাশ করা যায়। যাতে
দীপ্তির আভায় সমশ্রেণীর ব্যক্তিকে অতিক্রম করতে পারেন। আমেরিকার
সামাজিক মান অনির্দিষ্ট এবং সবসময় ওটা ওঠা-নামা করে। তার ফলে
ধরনের উন্নাসিক প্রবৃত্তি সেখানে সামাজিক অবস্থান ভেদে একরকম স্থায়ী

গেছে। ফলে তা বড় অস্থির। যদিও একমাত্র অর্থ দিয়েই শুধু মানুষ বড় হয়ে ওঠে না, তবু অর্থকে বাদ দিয়েও বড় হওয়া কঠিন। তার ওপর অর্থ সৃষ্টি করাই হল মস্তিষ্কের স্বীকৃত মাপ। যে ব্যক্তি অনেক অর্থ উপার্জন করেন তিনি চালাক, যিনি করতে পারেননি তিনি চালাক নন। কে আর নির্বোধ বলে পরিচিত হতে চান! সুতরাং বাজারের অবস্থা অনিশ্চিত হলে তার অবস্থা পরীক্ষার সময় ছাত্রদের অবস্থার মতো অস্থির হয়ে পড়ে।

ব্যবসায় বিনষ্ট হলে পরিণতি কী হতে পারে, ব্যবসায়ীর এই দুশ্চিন্তার ভিতর অযৌক্তিক অথচ অযৌক্তিক ভয়ের একটা অংশ প্রায়ই অনুপ্রবেশ করে। একথা স্বীকার করা নেওয়া উচিত, আরনল্ড বেনেটের[১] 'ক্লে-হ্যাংগার' যতই ধনবান হন, তার মন সারাক্ষণ শংকিত ছিল যে, তিনি কারখানার ভিতর মারা যাবেন। আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই যে, যারা শৈশবে দারিদ্র্যে কষ্ট পেয়েছেন, তারা সবসময় ভয়ে থাকেন যে, তাদের সন্তানরাও সেই দারিদ্র্য ভোগ করবেন। তারা ভাবতে থাকেন সেই দারিদ্র্য রুখে দিতে যত অর্থের সঞ্চয় গড়ে তোলা প্রয়োজন তা প্রায় অসম্ভব। এই ভয় প্রথম প্রজন্মে অনিবার্য, কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম, যারা কঠিন অভাবের মুখোমুখি হননি তাদের কাছে এই ভয় সামান্য, বাস্তব সমস্যার শুধু একটা অংশবিশেষ।

সন্তোষের মূল উৎস প্রতিযোগিতামূলক সাফল্যের ওপর নির্ভর করে। এর চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়াই হল বাস্তব সংকট। একথা আমি অস্বীকার করি না যে, অর্থের অনুভূতি জীবন উপভোগ সহজ করে দেয়। একজন চিত্রশিল্পীর কথা ধরা যাক, তিনি যদি প্রথম যৌবনে অখ্যাত থাকেন এবং পরে তার প্রতিভা যথার্থ স্বীকৃতি পায়, তিনি আরো সুখী হবেন। একথাও আমি অস্বীকার করি না যে অর্থ একটা পর্যন্ত সুখকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। কিন্তু সেই দূরত্ব অতিক্রম করলে, তা আরো বেড়ে যাবে আমি তা মনে করি না। আমি মনে করি সাফল্য সুখের একটা উপাদান মাত্র। অন্যান্য আর সব উপাদানকে ত্যাগ করে যদি সাফল্য লাভ হয়, তা হলে তাকে অনেক বেশি মূল্যে কেনা হয়।

ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর জীবনে যে দর্শন প্রচলিত, তাই হল তাদের সকল দুঃখের কারণ। ইউরোপে এখনো অন্যান্য কিছু গোষ্ঠী রয়েছে, যাদের মর্যাদা নষ্ট হয়নি। কোনো কোনো দেশে একটি অভিজাত গোষ্ঠী আছে। বুদ্ধিবৃত্তি সব দেশেই রয়েছে। দু একটি ছোট দেশ বাদ দিলে অন্যসব দেশে সেনা এবং নৌবহর খুব সম্মান পায়।

---

[১] আরনল্ড বেনেট, Arnold Bennet (১৮৬৭-১৯৩১) ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক, The Old Wive's Tale তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

এখন একথা সত্যি যে একজন ব্যক্তির বৃত্তি যাই হোক, তার সাফল্যের মধ্যেও প্রতিযোগিতার একটি উপাদান আছে। তথাপি এ'কথাটা সত্যি যে, যে ধরনের বৃত্তি মর্যাদা পায়, তা শুধু সাফল্য নয়, তা হল তার উৎকর্ষতা। যাই হোক তা, তার ওপরই নির্ভর করে সাফল্য। একজন বিজ্ঞানীর অর্থ থাকতে পারে, নাও পারে, অর্থ রয়েছে বলে তিনি বেশি শ্রদ্ধেয়, না হলে ততটা শ্রদ্ধেয় নন। একথা কখনো সত্যি নয়। একজন নৌবহরের খ্যাত এডমিরাল বা জেনারেলকে দরিদ্র দেখলে কেউ অবাক হন না। প্রকৃতপক্ষে এসব ক্ষেত্রে দারিদ্র্য নিজেই এক প্রকার সম্মান বহন করে যেন। এইসব কারণে ইউরোপে শুধুমাত্র অর্থ-প্রতিযোগিতা কিছু বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমিত এবং মনে হয়, সে কারণে তারা সবচেয়ে বেশি প্রভাববিস্তারকারী বা সম্মানিত নন। কিন্তু আমেরিকায় বিষয়টি অন্যরকম, সেখানে পরিসেবাসমূহ জাতীয় জীবনে খুব ছোট ভূমিকা পালন করে বলে তাদের কোনও প্রভাব দেখা যায় না। জ্ঞানসমৃদ্ধ বৃত্তি সম্পর্কে বলা যায় যে, বাইরের কোনও ব্যক্তি বলতে পারেন না, একজন ডাক্তার কিংবা একজন আইনজীবী তাদের নিজ নিজ পেশায় কতটা যোগ্য। তাদের যোগ্যতা বিচার হবে শুধু তাদের উপার্জন থেকে, এবং তাদের জীবনযাত্রার মান থেকে। অধ্যাপকেরা তো ব্যবসায়ীদের ভাড়া করা ভৃত্য। সেজন্যে তারা প্রাচীন দেশগুলিতে যে শ্রদ্ধা পান, আমেরিকাতে পান তার চেয়ে অনেক কম। এই কারণেই সেখানকার পেশাজীবীরা ব্যবসায়ীদের অনুকরণ করেন এবং ইউরোপের মতো তাদের আলাদা কোনও অস্তিত্ব নেই। সুতরাং ধনিক গোষ্ঠীদের মধ্যে আর্থিক সাফল্যের জন্যে যে অশালীন এবং নির্ভেজাল সংগ্রাম চলছে তা বন্ধ করতে পারার মতো কিছুই নেই।

প্রথম বয়স থেকেই আমেরিকান বালকেরা উপলব্ধি করে যে অর্থ-ই হল একমাত্র বস্তু যাকে গণ্য করা যায়। শিক্ষালাভে যথেষ্ট অর্থ উপার্জনের সুযোগ নেই তাই শিক্ষা নিয়ে তারা ভাবে না। শিক্ষার যে উদ্দেশ্য পরিকল্পিত হয়েছিল, তা হচ্ছে উপভোগের ক্ষমতাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে শিখিয়ে দেওয়া। উপভোগ বলতে আমি বোঝাতে চাই সেইসব সূক্ষ্ম বিষয়ের উপভোগ, যা অপরিশীলিত মানুষের অধিকারের সীমার বাইরে। অষ্টাদশ শতকে একজন 'ভদ্রলোকের' একটি বিশেষ পরিচয় ছিল, তিনি সাহিত্য, চিত্রকলা এবং সঙ্গীতে বিশেষ আনন্দ পেয়ে থাকেন। আজকের দিনে আমরা তার রসবোধের সাথে একমত নাও হতে পারি। কিন্তু এর মধ্যে অন্ততপক্ষে কোনও অসাধুতা ছিল না। আজকের দিনে ধনীলোকের রসবোধ সম্পূর্ণ আলাদা হতে চলেছে। তিনি কখনো বই পড়েন না। যদি তিনি নিজের সুনাম বৃদ্ধির জন্যে চিত্রশালা স্থাপনের ব্যবস্থা করতে থাকেন, তবে তার জন্যে ছবি পছন্দ করার ভার ছেড়ে দেবেন চিত্রবিশেষজ্ঞদের ওপর। এ থেকে যে আনন্দ

। পারেন, তা ছবির সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে নয়, অন্য ধনী ব্যক্তিদের এইসব ... করতে দেননি সেই আনন্দে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও, যদি ইহুদী হন, তবে ...ী হতে পারেন। ইহুদী না হলে তিনি যেমন অন্যান্য শিল্পে, তেমনি এখানেও ...ক হতে পারেন। এসবের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, অবসর নিয়ে কী করবেন, ... তা জানেন না। তিনি যতই ধনবান হতে থাকেন ততই তার পক্ষে আরো ... অর্থ উপার্জন করা সহজতর হয়। এবং অবশেষে দিনে পাঁচ মিনিটের অবসর ... তা কীভাবে কাটাবেন তা তিনি জানেন না। বেচারা শেষ পর্যন্ত সাফল্যের ...া কর্মহীন হয়ে পড়েন। সাফল্যই যতদিন জীবনের লক্ষ্য বলে স্বীকৃতি পাবে, ...া এরকমই হবে। সাফল্য অর্জনের পর তা নিয়ে কী করা যায় তা যতদিন ... না শিখবে, ততদিন তার জন্যে তাকে বিরক্তি আর ক্লান্তির বোঝা বহন ... হবেই হবে।

...র প্রতিযোগিতামূলক অভ্যাস ধীরে ধীরে নিজের সীমা ছাড়িয়ে অন্যদিকে ... হয়। একটা বই পড়ার দুটো উদ্দেশ্য রয়েছে। এক বইটার পাঠ ..., আর সেই পড়ার কথা অন্যদের বলা। আমেরিকায় মেয়েদের অভ্যাস ... প্রতিটি মাসে কোনও কোনও বই পড়া অথবা পড়ার ছলনা করা। কেউ ... সম্পূর্ণ বইটা শেষ করে, কেউ মাত্র প্রথম অধ্যায়টি পড়ে, কেউ শুধু বইটির ...না পড়ে। কিন্তু সবার টেবিলেই এসব দেখা যায়। তারা কিন্তু প্রথম ... সাহিত্যপুস্তক পড়ে না। পাঠাগারগুলি কখনো পড়বার জন্যে 'হ্যামলেট' ... কিং লিয়র' বেছে নিয়েছে এমন একটি মাসের নাম পাওয়া যাবে না। এমন ... মাসের কথা বলা যাবে না, যে মাসে দান্তে* সম্বন্ধে জানার প্রয়োজন মনে ... ফলে যা পড়া হয় তা সবই সাধারণ মানের আধুনিক বই, কোনও শ্রেষ্ঠ ... নয়, এটাও প্রতিযোগিতার ফলাফল। সম্ভবত এর সব কিছুই খারাপ ...না যেসব মেয়ের কথা বলা হচ্ছে তারা নিজেরা পছন্দ করে বই পড়লে, ... সাহিত্য-পুরোহিত এবং সাহিত্য-প্রভুরা তাদের জন্যে যা পছন্দ করতেন, ... তার থেকে খারাপ হত।

...নিক জীবনে প্রতিযোগিতার ওপর যে প্রাধান্য আরোপ করা হয়েছে তার ... সমাজের আদর্শাবলীর ক্ষয়ের সম্পর্ক বিদ্যমান। অগাস্টার যুগ শেষে ... যা ঘটেছিল তা অবশ্যই এই ধরনের। নারী ও পুরুষ, বুদ্ধিবৃত্তিক আনন্দ ... ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সাধারণ

---

* Dante Alighieri (১২৬৫-১৩২১) ইতালীর কবি। বিশ্বনন্দিত মহাকবিদের ...কে বলা হয় ইউরোপীয় রেঁনেসার প্রথম সূর্যরশ্মি Divine Comedy তাঁর ... কাব্য।

আলাপচারিতায় শৈল্পিক দক্ষতা, অষ্টাদশ শতকের ফরাসী সালোঁ-তে যার উৎকর্ষ ঘটেছিল, চল্লিশ বছর পূর্বেও তার ঐতিহ্য সজীব ছিল। এই উচ্চস্তরের শিল্প, যা প্রদর্শন করতে হত এমন কিছুর জন্যে যা ক্ষণস্থায়ী যুগে তার কোনও মূল্য নেই যেন। চীনে দশ বছর পূর্বেও এর চর্চা ছিল। আমার ধারণা জাতীয়তাবাদীদের দেশসেবার নতুন উদ্যম এর চর্চাকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করেছে। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের জ্ঞান যা পঞ্চাশ বা একশত বছর পূর্বে শিক্ষিতসমাজে বিশ্বজনীন নির্মল আনন্দ পরিত্যক্ত হয়েছে। বসন্তকালে একদল আমেরিকান ছাত্র তাদের ক্যাম্পাস-সীমান্তের বনানীর ভিতর দিয়ে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল। চমৎকার সব বনফুলে চারিদিক ছেয়ে রয়েছে। পথপ্রদর্শকদের একজনও ঐ কাননের একটি ফুলের নামও জানে না। এ তো তাদের কোনও কাজে লাগবে না। এই জ্ঞান তাদের উপার্জনও বাড়াবে।

এটা কারও ব্যক্তিগত সমস্যা নয়। কোনও ব্যক্তি বিশেষ তার বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিরোধও করতে পারবে না। এই সমস্যার প্রকাশ সাধারণভাবে যে জীবনদর্শন গৃহীত হয়েছে তা থেকে। যে দর্শন জীবনটাই একটা সংগ্রাম, একটা প্রতিযোগিতা, যাতে শুধু সম্মান অর্জন বিজয়ী। এর জন্যেই বুদ্ধি এবং মেধাকে কাজে না লাগিয়ে প্রবৃত্তির অতিবৃদ্ধি করা হচ্ছে। কিন্তু সম্ভবত একথা বলবার সময় আমরা ঘোড়ার আগে গাড়িকে দিচ্ছি। পিউরিটান (রক্ষণশীল) নীতিবাগিশরা আধুনিক সময়ে সর্বদা ইচ্ছার ওপর জোর দিয়েছেন, যদিও মূলে তারা বিশ্বাসকেই প্রধান্য দিতেন। হয়তো ইউরিটানবাদ তার দীর্ঘজীবনে এমন একটা প্রতিযোগিতার জন্ম দিয়েছে যার মধ্যে ইচ্ছাশক্তির অতিবৃদ্ধি ঘটেছে এবং সেই সাথে ইন্দ্রিয়বোধ এবং মেধা অনাহারে শুকিয়ে মারা হয়েছে, এবং এরকম একটি প্রতিযোগিতার ধারা তাদের প্রকৃতির পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত বলে গ্রহণ করেছে। সে যাই হোক প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় ডাইনোসরদের বুদ্ধির চেয়ে দৈহিক শক্তির অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা, আধুনিক ডাইনোসরদের দৈহিক ক্ষমতার বিশাল মূল্য সর্বাঙ্গীনভাবে তাদের অনুকরণ করতে প্ররোচিত করেছে। প্রত্যেক যে শ্বেতাঙ্গদের জন্যে এরাই হচ্ছে আদর্শ এবং আগামী একশত বছর পর্যন্ত আরো বেড়ে যাবে বলে মনে হয়। যারা এই ফ্যাশনের অনুসরণ করেনি, অবশ্য একথা ভেবে সান্ত্বনা পেতে পারে যে, ডাইনোসররা শেষ পর্যন্ত বিজয়ী পারেনি। তারা পরস্পরকে হত্যা করেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বুদ্ধিমান যারা দাঁড়িয়ে তাদের হত্যালীলা দেখেছিল, তারাই পেয়ে গেছে তাদের যা উত্তরাধিকার। আমাদের আধুনিক ডাইনোসররাও এমনিভাবে নিজেদের

...ণ করে যাচ্ছে, গড়ে প্রত্যেক বিবাহ থেকে দম্পতিরা দুটি সন্তানও পেতে
...সন্তান আসুক এমন কামনা থেকে তারা জীবনকে উপভোগ করেন না।
...এই অহেতুক উদ্দীপনাহীনতার দর্শন যা তারা উত্তরাধিকার সূত্রে বহন করে
...তাদের পিউরিটান পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে, তা বর্তমান পৃথিবীতে
...ব্যাধি বলে দেখা গেছে। তারা তাদের জীবনদর্শনে এমনি অসুখী যে,
...সন্তান কামনা তাদের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়েছে। তাই জৈবিক বিচারে
...বিলুপ্তি অনিবার্য। সেদিন খুব দূরে নয়, যখন তাদের স্থান দখল করবে
...মানুষ যারা আরো আমোদপ্রিয় এবং প্রাণচঞ্চল।

...প্রতিযোগিতা জীবনের মূল লক্ষ্যরূপে বিবেচিত, তা অত্যন্ত ভয়ানক,
...ধ্বংসাত্মক, তেমনি দৃঢ়পেশিবদ্ধ এবং অনড় বাসনার ব্যাপার যে তা খুব বেশি
...দুই প্রজন্ম পর্যন্ত জীবনের সমরূপ ভিত্তি বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।
...পালামা শেষ হলে তা থেকে অবশ্যই স্নায়বিক ক্লান্তি জন্ম নেবে, নানারকম
...মনোবৃত্তির উদয় হবে এবং কাজের মতো-ই কঠিন এবং কঠোরভাবে
...আমোদের পিছনে ছুটবে (কাজে অবসর উপভোগ সম্ভব নয় বলে)। এবং
...বন্ধ্যাত্বের কারণে বংশলুপ্তি ঘটবে। প্রতিযোগিতার দর্শনে শুধু যে
...স্পৃহা বিষময় হয়ে ওঠে তা নয়, অবকাশও একই পরিমাণ বিষময় হয়ে
...অবকাশ শান্তিদান করে এবং ক্লান্ত স্নায়ুকে সজীব করে তোলে তাকেই
...মনে হয়। প্রতিযোগিতর বেগ অবধারিতভাবে বেড়ে যাবেই এবং তার
...পরিণতি হবে মাদকদ্রব্য সেবনে আশ্রয় লাভ এবং ভেঙে পড়া। এর
...উপায় হচ্ছে জীবনের সুষম আদর্শে সুস্থ এবং প্রশান্তির জায়গাটা
...করে তাকে স্বীকৃতিদান।

৪

বিরক্তি এবং উত্তেজনা

বিরক্তি, মানবিক আচরণের একটি উপাদানরূপে তার প্রাপ্য মর্যাদা পায়নি। এটা আমার বিশ্বাস। আমার আরো বিশ্বাস সমস্ত ঐতিহাসিক ধরলে এই বিরক্তি এক বিরাট সহায়ক চালিকাশক্তিরূপে দেখা দিয়েছে। আ দিনে একথা আরো বেশি সত্যি। বিরক্তিকে বিশেষভাবে একটি মানবিক বলে মনে হতে পারে। বন্দী প্রাণী, এটা সত্যি, মাঝে মাঝে উদাস হয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে পায়চারি করে, হাই তোলে, কিন্তু প্রকৃতির নিজস্ব পরিবে বিরক্তির সমধর্মী কিছুর অভিজ্ঞতা লাভ করে বলে আমার মনে হয় না। অ সময় তারা শত্রুর সন্ধানে নিয়ত থাকে অথবা খাদ্যের অথবা দুয়েরই। তারা সঙ্গমে ব্যস্ত, কখনো দেহকে উষ্ণ রাখতে ব্যস্ত। কিন্তু কখনো যদি থাকে তখনো বিরক্তি অনুভব করে বলে আমি মনে করি না। সম্ভবত বিষয়ের মতো, এ বিষয়েও বনমানুষদের সাথে আমাদের মিল রয়েছে, তাদের সাথে কোনও দিন বাস করা হয়নি বলে পরীক্ষার সুযোগ পাইনি। বি একটি প্রধান উপাদান বর্তমান অবস্থার সাথে অধিকতর আরামপ্রদ কাল্পনিক অবস্থার সাথে তুলনা। বিরক্তির আরো একটি উপাদান কর্মদক্ষতাকে সম্পূর্ণ কাজে না লাগানো। যে শত্রু কাউকে হত্যা করতে করছে তার কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়া আমার মতে অপ্রীতিকর তবে কোন বিরক্তিকর নয়। যে মানুষকে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে, সে বিরক্তি অনুভব কর যদি না তার অতিমানবিক সাহসিকতা থাকে। হাউস অব লর্ডস-এ প্রথম দিতে গিয়ে কেউ কখনো হাই তোলেননি। এ বিষয়ে প্রয়াত ডেভনশিয়ারের একটি ব্যতিক্রম। তার জন্যে তিনি লর্ডদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা অর্জন করেছি বিরক্তি হল ব্যর্থ কামনা প্রকাশের ঘটনা, যা প্রীতিকর নয় কোনওভাবেই সে ঘটনা এমন যা অবসাদ-জর্জরিত মনে একদিনকে অন্যদিনের চেয়ে ক করে তুলবে। বিরক্তির বিপরীত হল, এক শব্দে বলতে গেলে, আনন্দ না উত্তেজনা।

মানুষের অন্তরে, বিশেষ করে পুরুষদের উত্তেজনার স্পৃহা অত্যন্ত গভীর বেঁধেছে। আমার অনুমান, এই কামনা আগে যা ছিল তার চেয়ে সহজ হয়েছে শিকারের মাধ্যমে। শিকারকে অনুসরণ করার মধ্যে উত্তেজনা আছে উত্তেজনা আছে আর প্রেম নিবেদনে। বর্বর মানুষ ঘুমন্ত স্বামীর পার্শ্বচ সাথে অবৈধ প্রেমলীলায় রত হবে। এটা জেনেও স্বামী জেগে উঠে

[illegible] মৃত্যু এরকম এক অবস্থা, আমার মনে হয় বিরক্তিকর নয়। কিন্তু [illegible] আগমনের পর জীবন বিস্বাদ হয়ে পড়েছে। হয়নি শুধু অভিজাতদের [illegible] কারণ তারা এখন পর্যন্ত শিকারের যুগে রয়ে গেছেন। যন্ত্রযুগের মানুষদের [illegible] কথা অনেক শোনা যায়। কিন্তু আমার মতে প্রাচীন পদ্ধতির কৃষিকাজ [illegible] রকম ক্লান্তিকর। অধিকাংশ সমাজসেবক যা মনে করেন, আমি তার [illegible] টা মনে করি। আমার বলা উচিত যন্ত্রযুগ বিশ্বের মোট বিরক্তির [illegible] কমিয়ে দিয়েছে। চাকুরীজীবীদের কাজের সময়টার ওপর তাদের [illegible], কিন্তু সান্ধ্যকালীন অবসর তারা বিভিন্ন ধরনের আমোদ-প্রামাদে [illegible] পারে। এই উপভোগ প্রাচীনপন্থী পল্লীগ্রামে অসম্ভব ছিল। নিম্ন [illegible] জীবনে যে পরিবর্তন এসেছে সেটাও ভেবে দেখুন। আগের দিনে [illegible] আহারের পর স্ত্রীকন্যারা বাসনপত্র ধুয়ে ঘর পরিষ্কার করার পর সকলে [illegible] পারিবারিক গল্প-গুজব করত। সেটাই ছিল তাদের জন্যে আনন্দ উপভোগ। [illegible] বাড়ির বড়কর্তা ঘুমিয়ে পড়তেন, স্ত্রী উল বুনতেন, মেয়েরা ভাবত [illegible] মরণের কথা অথবা মরুভূমির টিমবকটুতে গিয়ে বাস করার কথা। তাদের [illegible] করতে দেওয়া হত না, বাড়ি থেকে বাইরে যেতে দেওয়া হত না। কারণ [illegible] ছিল এই যে সে সময় তাদের বাবা আলাপ করবেন তাদের সাথে যা [illegible] অন্যেই আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে। ভাগ্য প্রসন্ন হলে অবশেষে তারা বিয়ে [illegible] এবং তাদের সন্তান জন্মাবার পর আবার তারা নিজেদের প্রথম জীবনের [illegible] আনন্দ চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেয়ে যেত। আর যদি বিয়ের সৌভাগ্য [illegible] হলে সারাজীবন কুমারী থেকে শেষে মনে হয় দেহেমনে এক ক্ষয় হয়ে [illegible] পরিণত হত। এমন ভয়ংকর ভাগ্য যা বর্বররা প্রদান করত তাদের [illegible]। শত বছর আগের পৃথিবীর বিষয় বিবেচনা করতে হলে সেসব [illegible] পরিমাণটা মনে রাখতে হবে। এবং আরও অতীতে ফিরে গেলে বিরক্তির [illegible] আরো খারাপ মনে হবে। মধ্যযুগের একটি পল্লীর একঘেয়ে শীতকালের [illegible] দেখুন। লোকে লিখতে পড়তে জানত না, অন্ধকারে তাদের আলো [illegible] ছিল শুধু মোমবাতি, তাদের একটিমাত্র ঘর, অগ্নিকুণ্ডের ধোঁয়ায় ভরে [illegible] পুরো বাড়িতে সেই একটিমাত্র ঘরই শুধু হিমঠাণ্ডা নয়। পথ চলা তখন [illegible] ছিল, তাই ভিন্ন পল্লীর মানুষের দর্শন খুব কম মিলত। শীতের সন্ধ্যায় [illegible] আনন্দজনক খেলা ছিল ডাইনিবুড়িকে খুঁজে বেড়ান এবং এই খেলার [illegible] যেসব কারণে তাদের মধ্যে বিরক্তি অন্যতম।

[illegible] পুরুষদের তুলনায় আমাদের বিরক্তি অনেক কম, কিন্তু আমরা বিরক্তিকে [illegible] পাই। আমরা জানি, বা বিশ্বাস করতে শিখেছি যে বিরক্তি মানুষের

জীবনের স্বাভাবিক অংশ নয়, এবং বিরক্তিকে এড়ানো যারা চরম উত্তেজনা কাজের সাহায্যে। আজকাল মেয়েরা নিজেরা উপার্জন করে স্বাবলম্বী হয়েছে। স্বনির্ভরতা তাদের সন্ধ্যাবেলা নিজেদের মতো করে আনন্দে কাটাতে সুযোগ করেছে। তারা এখন তাদের ঠাকুমাদের সময়ের দুর্ভোগ এবং 'সুখী পারিবারিক সময়' কাটাবার অত্যাচার থেকে রেহাই পেয়েছে। আমেরিকায়, যারা শহরে বাস করছে, কিংবা করতে পারছে না, প্রত্যেকের একটি মোটরগাড়ি আছে, অন্তত একটি মোটর সাইকেল। এই যন্ত্রযানের সাহায্যে তারা সিনেমায় যেতে পারে। প্রত্যেক বাড়িতে অবশ্য একটি রেডিও আছে। আগের চেয়ে অনেক সহজে তরুণ-তরুণীরা মিলতে পারে। প্রত্যেক পরিচারিকা অন্তত সপ্তাহে একদিন। প্রমোদ আশা করে যা স্থায়ী হয়েছিল জেন অস্টেনের[১] নায়িকার ক্ষেত্রে সা উপন্যাস জুড়ে। সামাজিক স্তরে যতই আমরা ওপরের দিকে উঠেছি আমাদের উত্তেজনা উপভোগের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। যাদের সামর্থ্যে কুলাচ্ছে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং সাথে নিয়ে চলেছে আমোদ, নৃত্য মদ্যপান। আর যে কারণেই হোক তারা নতুন স্থানে এসব উত্তেজনা বেশি উপভোগের আশা করছে। যাদের কষ্ট করে উপার্জন করতে হয়, কাজের সময় তাদের জন্যে কিছু বিরক্তি যেন অপেক্ষা করে থাকেই। কিন্তু যাদের প্রচুর থাকার ফলে কাজ করে জীবন চালাতে হয় না তাদের চোখের সামনে যে আদর্শ তা হচ্ছে বিরক্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত জীবন। এই আদর্শ মহৎ, আমি তার অমর্যাদা করা থেকে দূরে থাকতে চাই। কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, আদর্শবাদীরা এটা লাভ করা যত সহজ বলে ভাবেন তা তত সহজ নয়, বেশ কঠিন-ই বলা যায়। যাই হোক সকালগুলি বিরক্তিকর, গতদিনের সন্ধ্যাগুলির আনন্দময়তার অনুপাতে। মধ্য বয়স আসবে, সম্ভবত বার্ধক্যও আসবে। বিশ বছর বয়সে লোকে ভাবে। বছরেই জীবন শেষ হয়ে যাবে। আমি, আটান্ন বছর বয়সেও এই মত পোষণ করি না। আমার বিশ্বাস আর্থিক মূলধন ব্যয় করা যতটা অবিজ্ঞজনিত কাজ, জীবনের মূলধন নষ্ট করাও তাই। সম্ভবত কিছু বিরক্তি জীবনের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। বিরক্তি থেকে পলায়নের ইচ্ছা খুব স্বাভাবিক। সুযোগ পেলে মানুষের সকল জাতি তা প্রকাশ করেছে। শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে যখন অসভ্যেরা প্রথম সুরার স্বাদ পেল, তারা এর সাহায্যে এতদিনের বার্ধক্যজনিত অবসাদ থেকে

---

১. জেন অস্টেন, Jane Austen (১৭৭৫-১৮১৭)। ব্রিটিশ মহিলা ঔপন্যাসিক। সৌজন্য শিষ্টাচার, সামাজিক নীতিবোধের আদর্শে বিশ্বাসী। তাঁর রচনা নিখুঁত শিল্পকলায় উজ্জ্বল।

...পাবার একটা পথ পেয়ে গেল, এবং যে যে সময়ে সরকার হস্তক্ষেপ ... সেই সেই সময় ছাড়া তারা অবিরাম মদ্যপান এবং হুল্লোড় করতে ... বরণ করেছে। যুদ্ধ, গণহত্যা এবং উৎপীড়ন— এসবই বিরক্তি থেকে ...বার এক একটি পথ। এমন কী চুপচাপ থাকার চেয়ে প্রতিবেশিদের সাথে ... বিবাদ করাও অনেক ভাল বলে মনে হয়। নীতিবাগীশদের কাছে বিরক্তি ... একটি প্রধান সমস্যা এবং মানবসমাজে অন্তত অর্ধেক পাপ বিরক্তির ভয়েই ... থাকে।

বিরক্তি সম্পূর্ণ অশুভ, এটা মনে করা অনুচিত। বিরক্তি দু'রকমের হতে ... এক ধরনের বিরক্তি ফলপ্রসু, অন্যটা একেবারে ফলহীন। প্রথমটা জন্মে ... বার নেশার অভাবে, দ্বিতীয়টার উদ্ভব হয় প্রয়োজনীয় কাজের অভাবে। সব ... উত্তেজনা সীমিতভাবে হলেও মাদকবস্তুর একটা ভূমিকা থাকে। যে জীবন ... উত্তেজনাপূর্ণ তা পরিশ্রান্ত এক জীবন যেখানে শিহরণ পাওয়ার জন্যে, যা ... একটা প্রয়োজনীয় অংশ বলে মনে করা হয়, দরকার হয় অবিরাম অতি ... কিছুর যোগান। যে ব্যক্তি অতিরিক্ত উত্তেজনায় অভ্যস্ত সে একজন অসুস্থ ... লোভ রয়েছে গোলমরিচের প্রতি, সে পরে মরিচের পরিমাণমাত্রা ... গেলেও আর স্বাদ পাবে না, অথচ সেই পরিমাণ গোলমরিচে অন্য যে ... আটকে মারা যাবে। অতিরিক্ত উত্তেজনা এড়ানোর মধ্যে কিছু বিরক্তি ... আর অতিরিক্ত উত্তেজনা শুধু যে স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর তা নয়, তা ... উপভোগের স্বাদ নষ্ট করে দেয় আর গভীর ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পরিবর্তে ... আসক্তি জন্মায়। জ্ঞানের বদলে চাতুর্য্য এবং রূপের বদলে অমসৃণতা ... তোলে। উত্তেজনার বিরুদ্ধে আমি চরম কিছু বলছি না। কিছু পরিমাণে ... স্বাস্থ্যপ্রদ কিন্তু অন্য সব জিনিসের মতো এর মাত্রাও পরিমাণের বাইরে ... ঠিক নয়। উত্তেজনা খুব কম হলে রুগ্ন আসক্তি জাগিয়ে তুলবে আর খুব ... বেশী হয়ে গেলে তা ক্লান্তিকর হয়ে উঠবে। সুতরাং সুখী জীবনে কিছু পরিমাণে ... পাওয়া করার মতো ক্ষমতা থাকা জরুরী এবং এটা খুব প্রয়োজনীয় বিষয় যা ... অবশ্যই শেখানো উচিত।

... শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের কিছু বিরক্তিকর অংশ থাকে এবং সমস্ত মহৎ জীবনেই কিছু ... অনাকর্ষণীয় বিস্তার থাকে। ধরা যাক কোনও আমেরিকান প্রকাশকের ... জন্যে সেই প্রথম ওল্ড টেস্টামেন্টের পাণ্ডুলিপি দেওয়া হয়েছে। তাঁর ... কী হতে পারে তা অনুমান করা কঠিন নয়। বিশেষ করে এই গ্রন্থের ... একটা অধ্যায় নিয়ে তিনি বলতে পারেন না যে আপনার পাঠকরা কতগুলি ... নাম জানতে আগ্রহী হবে, যাদের সম্বন্ধে আপনি তেমন কিছুই বলেননি।

আমি স্বীকার করছি, আপনি শুরুটা খুব সুন্দরভাবে করেছেন। আমি প্রথমে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম, কিন্তু সবকিছু এত বিস্তারিতভাবে বলা অতিশয়োক্তি গেছে। এর ভিতরকার উজ্জ্বল অংশগুলি রেখে অবান্তর অংশ সব বাদ দি যুক্তিসঙ্গত আকারে কলেবর কমিয়ে পাণ্ডুলিপিটি আবার আমার কাছে ফি আসুন।' আধুনিক প্রকাশকের বক্তব্য অনেকটা এই ধরনের। কারণ তিনি আধু পাঠকের বিরক্তির ভয় সম্পর্কে জানেন। তিনি কনফুসিয়াসের[২] শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, কো মার্ক্সের ক্যাপিটাল এবং অন্যান্য সব পবিত্র গ্রন্থ যেগুলি 'বেস্ট সেলার' প্রমাণিত হয়েছে, সম্পর্কেও একই কথা বলবেন। শুধু পবিত্র গ্রন্থ সম্বন্ধে বিরক্তিকর অংশ সম্বলিত সব শ্রেষ্ঠ উপন্যাস নিয়ে তাঁর এই মত। যে উপন্যা প্রথম পাতা থেকে শেষ অবধি নানা চিত্তহারী বিষয়ে ঝলমল করে তা অব মহৎ কোনও গ্রন্থ নয়। মহৎ লোকের জীবনও, কয়েকটি মহৎ মুহূর্ত ছাড়া সব চিত্তহরণকারী হয় না। সক্রেটিস[৩] নিশ্চয় মাঝে মাঝে ভোজসভায় যোগ দিয়ে এবং নিশ্চয় হেমলক পানের পর যখন বিষক্রিয়া শুরু হয়েছে তখনও আলাপচারিতায় প্রচুর তৃপ্তি পেয়েছেন। কিন্তু জীবনের অধিকাংশ কাল তিনি জানর্থিপের সাথে শান্তিতে কাটিয়েছেন। বিকেলে ভ্রমণের সাহায্যে স্বাস্থ্য করেছেন এবং কয়েকজন বন্ধুর সাথে মিলিতও হয়েছেন। শোনা যায় কান্ট[৪] জীবনে কোয়েনিসবার্গ থেকে দশ মাইলের বেশি দূরত্বে যাননি। ডারউইন[৫] পরিভ্রমণ শেষ করে অবশিষ্ট জীবন নিজের ঘরেই কাটিয়েছেন। মার্ক্স[৬] কয়ে বিদ্রোহের সৃষ্টি করে অবশিষ্ট জীবন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে কাটানোর সি নিয়েছিলেন। মোট কথা, দেখা যাচ্ছে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন কাটানোই ব্যক্তিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং তাঁদের আনন্দ উপভোগ এমন নয়; যা বাই দৃষ্টিতে উত্তেজনাপূর্ণ মনে হতে পারে। বিরামহীন কাজ ছাড়া কোনও বড় সা সম্ভব নয়। সুতরাং এই কাজে এমনভাবে আবিষ্ট হতে হবে যে এবং তা এত য যে, তা শেষ হলে তীব্র কোনও আমোদ উপভোগ করার শক্তি থাকে না। ছুটির দিনে শারীরিক শক্তি বাড়ানোর জন্যে কঠিন কিছু করা চলে, যা আল্‌পস পর্বতে আরোহণ করা শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হতে পারে।

---

২. কনফিউসিয়াস, Confucias (খ্রীঃ পূঃ ৫৫০-৪৭৯)। চৈনিক দার্শনিক। প্র প্রজ্ঞাবান দার্শনিক রূপে পৃথিবীতে আজও স্বীকৃত এবং সম্পূজিত।

৩. সক্রেটিস, Socrates (খ্রীঃ পূঃ ৪৬৯-৩৯৯)। প্রাচীন গ্রীসের বিশ্বনন্দিত দার্শ তিনি ছিলেন পৃথিবীতে নীতি-নৈতিকতার প্রবর্তক। প্লেটো (Plato) তাঁর প্রখ্যাত

৪. কান্ট, Imannel Kant (১৮০৯-১৮৮২)। জার্মান দার্শনিক ও বিজ্ঞানী।

৫. ডারউইন, Charles Rovert Darwin (১৮০৯-১৮৮২)। অবিস্মরণীয় জীব বি 'Origin of Species' তাঁর প্রাণীজগতের ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্বেও বিরোধী বিপ্লবাত্মক ম

কম-বেশি একঘেয়ে জীবনযাপনের ক্ষমতা শৈশবকাল থেকেই অর্জন করা উচিত। এ বিষয়ে আধুনিক পিতা-মাতাদের দোষ দেওয়া যেতে পারে। তারা সন্তানদের উপভোগের জন্যে অতিরিক্ত আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করেন, যেমন চলচ্চিত্র প্রদর্শন এবং ভাল ভাল খাদ্যের আয়োজন। বিশেষ কোনও উপলক্ষ্য ছাড়া সন্তানদের কাছে তাদের একটা দিন যে অন্য দিনের চেয়ে আলাদা হওয়া কতটা প্রয়োজনীয় তা তারা বুঝতে পারেন না। শৈশবের সব আনন্দ এমন হওয়া উচিত যা শিশুরা চেষ্টা করে মাথা খাটিয়ে নিজেদের পরিবেশ থেকে নিজেরাই উদ্ভাবন করে নিতে পারে। উত্তেজক আনন্দ, যাতে কোনও দৈহিক পরিশ্রম নেই, যেমন নাটক উপভোগ করা, এমন প্রমোদের ব্যবস্থা তাদের জন্যে খুব কম করা উচিত। এই ধরনের উত্তেজনা নেশার মতো, ধীরে ধীরে তার মাত্রা বাড়ানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। উত্তেজনাময় উপভোগের সময় শারীরিক যে নিষ্ক্রিয়তা দেখা যায়, তা স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিপরীত। জমিতে একটি চারাগাছ বাধা না পেলে স্বাভাবিকভাবে সবচেয়ে বেশি বাড়ে। শিশুর ক্ষেত্রে ঠিক তেমনই হয়। ছোটদের পক্ষে অতিরিক্ত দেশভ্রমণ, বিচিত্র বিষয়ের ওপর তাদের মনে ছাপ ফেলা ভাল নয়। কারণ তা হলে তারা বেড়ে ওঠার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় একঘেয়েমিও আর সহ্য করতে পারবে না। আমি বলি না যে একঘেয়েমির নিজস্ব একটা মূল্য আছে। আমি বলি যে কিছু মাত্রায় একঘেয়েমি না থাকলে কোনও কোনও ভাল কাজ সম্ভব হয় না। ওয়ার্ডওয়ার্থের[৭] 'প্রেলিউড'-এর কথাই ধরা যাক, প্রত্যেক পাঠকই জানেন তাঁর ভাবনা বা অনুভূতির মূল্য যাই হোক, তাঁর পক্ষেই তা সম্ভব হয়েছে, কোনও কৃত্রিম শহরবাসী যুবকের পক্ষে তা সম্ভব হত না। কোনও বালক বা যুবকের যদি গঠনমূলক কিছু করার ইচ্ছা থাকে তবে তাদের কাজের জন্যে প্রয়োজন হলে তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই অনেক বিরক্তি সহ্য করবে। কিন্তু যে বালক বিক্ষেপ এবং অপচয়ের মধ্যে জীবন কাটিয়েছে তার মনে গঠনমূলক কিছু করবার কামনা জাগ্রত হবে না। এই কারণেই তার মন সব সময় ছুটতে পারে একের পর এক আনন্দের দিকে, কিছু সৃষ্টি করার দিকে নয়। এই অবস্থায় কোনও একটা যুগ যদি নিরক্তিকে সহ্য করতে না পারে, তা হলে সেই যুগ হবে ক্ষুদ্র মানুষের যুগ,

---

৬ মার্কস, Karl Marx (১৮১৮-১৮৮৩)। রাইনল্যান্ডে জন্ম, ইহুদি সম্প্রদায়ের লোক। সাম্যবাদী মতবাদের প্রবক্তা। 'Das Capital' তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ। যাকে বলা হয় 'Bible of the Proleteriat'।

৭ ওয়ার্ডওয়ার্থ, William Wordsworth (১৭৭০-১৮৫০) ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক কবি।

যে মানুষ অন্যায়ভাবে প্রকৃতির শান্ত পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, যে মানুষের ভিতরকার সব জীবনধর্ম ধীরে ধীরে শুষ্ক হয়ে যায়, সেই মানুষ যেন ফুলদানিতে সাজানো কর্তিত কুসুম।

আমি রহস্যমূলক ভাষা পছন্দ করি না। তবু আমি জানি না, যা বলতে চাই তা কবিতার বিশেষ কাব্যময় ভাষা ব্যবহার না করে বিজ্ঞানের ভাষায় কী করে বলব। আমরা যা কিছু নিয়ে ভাবতে চাই, আমরা যে এই বসুন্ধরার সন্তান সে কথা ভুললে চলবে না। আমাদের জীবন পৃথিবীর জীবনেরই অংশ এবং আমরা সব উদ্ভিদ ও প্রাণীর মতো পৃথিবী থেকেই জীবনের পুষ্টি সংগ্রহ করে থাকি। বসুন্ধরার জীবনছন্দ ধীরগামী, হেমন্ত এবং শীত বসুন্ধরার পক্ষে ততটুকু প্রয়োজন যতটুকু প্রয়োজন বসন্ত ও গ্রীষ্ম। স্থিতি তেমনি অপরিহার্য যেমনি গতি। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের চেয়েও শিশুর পক্ষে পার্থিব জীবনের জোয়ার-ভাটার প্রবাহের সাথে সংযোগ রাখা বেশি প্রয়োজন। মানুষের দেহ যুগ যুগ ধরে এই ছন্দের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে এবং ধর্ম তার থেকে কিছু অংশ নিয়ে ইস্টার উৎসবের সাথে মিলিয়ে দিয়েছে। যেমন ইস্টার উৎসবে আমি দু'বছর বয়সের একটি বালককে দেখেছি, যে সবসময় লন্ডনে বাস করেছে সে প্রথম সবুজ গ্রামাঞ্চলে এসে হেঁটে বেড়াবার সুযোগ পেয়েছে। তখন ছিল শীতকাল। প্রত্যেকটি জিনিস ভিজে এবং কর্দমাক্ত, প্রাপ্তবয়সী লোকের চোখে আনন্দজাগানিয়া কিছুই ছিল না। কিন্তু সেই বালকের মধ্যে বিচিত্র এক উল্লাস জেগে উঠল। সে ভিজে মাটির ওপর নতজানু হয়ে বসল আর মুখখানা ডুবিয়ে দিল সবুজ ঘাসের মধ্যে এবং অর্ধস্ফুট উল্লাসধ্বনি করতে লাগল। যে আনন্দ সেই বালক উপভোগ করছিল তা আদিম, সরল এবং অনন্য। এতে তার যে দৈহিক ও মানসিক চাহিদার তৃপ্তিসাধন হচ্ছিল, তা এমন গভীর যে, যাদের এই প্রয়োজন থেকে দূরে রাখা হয়, তারা কখনও মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে পারে। অনেক আনন্দের মধ্যে, যেমন জুয়াখেলা তার একটি ভাল উদাহরণ হতে পারে, মাটির সাথে তাদের কোনও সংযোগ নেই। এরকম আনন্দ যখন শেষ হয়, তা মানুষের মনে ঘৃণার বোধ জাগিয়ে তোলে, তাকে অতৃপ্ত রেখে যায়। কিন্তু তার কারণ কী, তা সে বুঝতে পারে না। এই আনন্দ এমন কিছুই দেয় না। যাকে আমোদ বলা যেতে পারে, বরং যেসব আমোদ-প্রমোদ আমাদের বসুন্ধরার প্রাণের সাথে সংযোগ ঘটায় তার মধ্যে এমন কিছু থাকে যা আমাদের গভীরভাবে তৃপ্তি দেয়। যখন তার অবসান হয়; তখন যে আনন্দ সে বহন করে আনে তার রেশ থেকে যায়, যদিও যখন তারা থাকে তাদের তীব্রতা অন্যান্য উদ্দীপক এবং চিত্তচাঞ্চল্যকর আমোদের চেয়ে কম হতে পারে। এই দুইয়ের পার্থক্য সম্পর্কে আমার মনে যা আছে, তা স্বরলহরীর সব স্তরের

কাজের মধ্যেই আছে, সরলতম কাজ থেকে সূক্ষ্মতম সব কাজের মধ্যে। যে দু বছরের বালকটির কথা কিছুক্ষণ আগে বলেছি, সে পৃথিবীর জীবনের সাথে মিলনের যতদূর সম্ভব আদিমতম রূপটি তুলে ধরেছে। কিন্তু উচ্চতর স্তরে এই মিলনটি পাওয়া যাবে কবিতার মধ্যে। শেক্সপীয়ারের গীতিকবিতা এত সুন্দর হতে পেরেছে এই জন্যে যে, তা এই একই আনন্দে পূর্ণ, যে আনন্দ দুই বছরের বালককে ঘাসকে আলিঙ্গন করার প্রেরণা দিয়েছিল, 'ঐ শোনো লার্ক পাখির গান' এবং 'ঐ হলুদ বালু কণিকারা কাছে এসো'— এই দুটি কবিতার কথা মনে করুন, দেখবেন এই কবিতা দুটির মধ্যে সেই দুই বছরের বালকের আধো আধো উচ্চারণে প্রকাশিত সেই একই আবেগ যে সুসংস্কৃত ভাষায় ফুটে উঠেছে। অথবা প্রেম এবং শুধু যৌন আকর্ষণের তফাতের কথা ভাবুন, প্রেম এমন এক উপলব্ধি যার মধ্যে দীর্ঘ খরার পর সৃষ্টি স্পর্শ পেলে উদ্ভিদের যেমন হয়, তেমনি আমাদের প্রত্যেক সত্তা নতুন জীবন পায় এবং সতেজ হয়। প্রেম-বিহীন যৌনমিলনে এই উপলব্ধির কোনও সন্ধান পাওয়া যাবে না, যখন ক্ষণিকের আনন্দ শেষ হয়ে যাবে, পড়ে থাকবে শুধু ক্লান্তি, ঘৃণা এবং জীবনের শূন্যতাবোধ। প্রেম পার্থিব জীবনের অঙ্গ, প্রেমবিহীন যৌনমিলন তা নয়।

যে বিশেষ ধরনের বিরক্তিতে আধুনিক নাগরিকরা ভুগছে তা পার্থিব জীবনের সাথে তাদের যে বিচ্ছেদ ঘটেছে তার সাথেই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। মরুভূমিতে তৃষ্ণার্তের মতোই এ জিনিস জীবনকে তাপিত, ধূলিময় এবং তৃষিত করে তোলে। আমাদের নিজেদের পছন্দানুযায়ী জীবনধারা বেছে নেওয়ার মতো সঙ্গতি রয়েছে, আমাদের মধ্যে যারা বিশেষ ধরনের অসহনীয় বিরক্তিতে ভোগে, তাদের সেই বিরক্তির কারণ শুনতে আত্মবিরোধী মনে হলেও তা হচ্ছে বিরক্তির ভীতি। কর্মব্যস্ততার বিরক্তি থেকে পালিয়ে গিয়ে তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর কবলে গিয়ে পড়েন এবং তা অনেক বেশি খারাপ। সুখী জীবন অনেক পরিমাণে শান্ত জীবন হওয়া চাই। কেননা এইটাই একমাত্র পথ। শান্তিময় পরিবেশেই আনন্দ বেঁচে থাকে।

৫

অবসাদ

অবসাদ নানা রকমের। তাদের মধ্যে কয়েকটি আবার সুখের পথে অন্যগুলির তুলনায় অনেক বেশি অন্তরায় সৃষ্টি করে। শুধুমাত্র শারীরিক অবসাদ, যদি মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়, তা হলে তা সুখের একটা কারণ হতে পারে। এতে ভাল ঘুম হয়, ক্ষুধা বেড়ে যায় এবং ছুটির সম্ভাবিত আমোদসমূহকে মাধুর্যে ভরে তোলে। কিন্তু তা যদি মাত্রাতিরিক্ত হয় তাহলে অত্যন্ত ক্ষতিকর। কৃষক রমণীরা উন্নত দেশসমূহের বাইরের সব দেশে ত্রিশেই বুড়ি হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর ভেঙ্গে পড়ে। শিল্পায়ন প্রথার প্রথম যুগে অতি পরিশ্রমে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দৈহিক বৃদ্ধি স্তব্ধ হয়ে যেত এবং প্রায় তারা মারা যেত। চীন এবং জাপানে এখনো তা হচ্ছে, যেখানে শিল্পায়ন নতুন। আমেরিকার দক্ষিণের অঙ্গরাজ্যগুলিতে এ প্রথা এখনো দেখা যায়। শারীরিক শ্রম একটা নির্দিষ্ট মাত্রার বাইরে চালাতে গেলে তা বর্বরোচিত অত্যাচারে পরিণত হয়। প্রায়ই এ'ধরনের অত্যাচার করে শ্রমিকদের জীবনকে দুঃসহনীয় করে তোলা হয়েছে। আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত অংশে, যা হোক, দৈহিক অবসাদ অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে শিল্পব্যবস্থার উন্নতি সাধন করে। বর্তমানকালে উন্নত সমাজে যে রকমের অবসাদ সবচেয়ে ভয়ানক তা হল স্নায়ুবিক অবসাদ। বিস্ময়ের ব্যাপার হল এই যে, এই অবসাদ ধনবানদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবল এবং ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবীদের তুলনায় শ্রমজীবীদের মধ্যে অনেক কম দেখা যায়।

আধুনিক জীবনে স্নায়বিক অবসাদ থেকে মুক্তি পাওয়া খুব কঠিন ব্যাপার। প্রথমত পুরো কাজের সময়ে, কাজ করে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে শহরের কর্মীরা সব সময় নানারকম শব্দ দূষণের মুখোমুখি হয়। এটা সত্যি অধিকাংশ শব্দে সে মনোযোগ না দেওয়ার বিদ্যাটা শিখে নেয় কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই শব্দ তার শক্তিকে ক্ষয় করে দেয়। তা তার জন্যে আরও ক্ষতির কারণ হয় এই জন্যে যে, ঐ শব্দ না শোনার জন্যে অবচেতন মনে একটা চেষ্টা চলতে থাকে, যা স্নায়ুকে পীড়িত করে। তাছাড়া আমাদের অজান্তে আরো একটি জিনিস আমাদের মধ্যে অবসাদ তৈরী করে এবং তা হচ্ছে অবিরাম অজ্ঞাত পরিচয় লোকদের সাথে মেলা হওয়া। অন্যান্য সব প্রাণীর মতো মানুষেরও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হচ্ছে স্বশ্রেণীর প্রত্যেক অপরিচিতকে মনে মনে পরীক্ষা করে নেওয়া, সেই আগন্তুকের সাথে বন্ধুর মত ব্যবহার করবে না শত্রুর মতো তা ঠিক করা। ভিড়ের সময় মাটির নিচে পাতাল রেলে যারা যাতায়াত করেন তাদের এই প্রবৃত্তিকে চেপে রাখতে হয়।

[illegible]ও যারা গায়ে গায়ে চাপাচাপি করে বসেন, তাদের সবার বিরুদ্ধে এক [illegible] ক্রোধ অনুভব করেন। সকলের তাড়া থেকে সকালের গাড়ি ধরার এবং [illegible] ফলে অজীর্ণতা। ফলশ্রুতিতে যতক্ষণে অফিসে পৌঁছে দিনে কাজ শুরু করা [illegible] যায়, ততক্ষণে কালো কোট পরিহিত কর্মীটির স্নায়ু ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে। [illegible] সমগ্র মনুষ্যসমাজকেই তার আবর্জনা বলে মনে হয় তার মনিবও ঠিক একই [illegible] অফিসে আসেন। এবং কর্মীর মানসিক ক্ষতিপূরণ করার কোনও ব্যবস্থা [illegible] করতে পারেন না। ছাঁটাই হওয়ার ভয় থেকেই সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার দেখাতে [illegible] কর্মীটি, কিন্তু এই অস্বাভাবিক আচরণ তার স্নায়বিক চাপ আরো বাড়িয়ে [illegible]। যদি কর্মীরা সপ্তাহে একবার মনিবের নাক টেনে লম্বা করার সুযোগ পেতেন [illegible] তার সম্বন্ধে কর্মীরা কী ভাবেন তা প্রকাশ পেত এবং তাতে তাদের [illegible] চাপ অনেক কমে যেতে পারত। কিন্তু মনিবের অবস্থাও প্রায় অনুরূপ। [illegible] থেকে কোনও ফল লাভ করা যেত বলে মনে হয় না। কর্মচারীর কাছে [illegible] হওয়ার ভয় যেমন, নিয়োগকর্তা মনিবের কাছে দেউলিয়া হওয়ার ভয়ও [illegible]। অবশ্য একথা ঠিক, অনেকে এত বড় আসনে আছেন যে তাদের এই ভয় [illegible]। কিন্তু এই ধরনের উচ্চ অবস্থানে পৌঁছাতে তাদের বছরের পর বছর কঠিন [illegible] ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে তাদের বিশ্বের সকল [illegible] ঘটনাবলীর ওপর সক্রিয় দৃষ্টি রাখতে হয়েছে এবং তার সাথে তাদের [illegible] প্রতিযোগীদের সব রকমের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালাতে হয়েছে। [illegible] কিছুর বিলিত ফল হল, যখন সত্যিই সাফল্য এল, তখন দেখা গেল [illegible] লাভকারীর স্নায়ু দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং উদ্বেগ তার নিত্যসঙ্গী হয়ে [illegible]। যখন আর দরকার নেই তখনো তিনি তাকে ছাড়তে পারছেন না। একথা [illegible] যে, ধনীদের পুত্ররা রয়েছে, কিন্তু তারা ধনী হয়ে না জন্মালে যেসব উদ্বেগে [illegible], ঠিক তার অনুরূপ উদ্বেগ নিজেদের জন্যে তৈরী করে নিতে তারা সফলকাম [illegible]। বাজি ধরে, জুয়া খেলে তারা তাদের পিতাদের বিরক্তি উৎপাদন করে। [illegible] গা ভাসিয়ে ঘুমের সময় কমিয়ে দিয়ে শরীরকে দুর্বল করে এবং যখন [illegible] কিছুটা শান্ত হয়, তখন পিতারা তাদের জন্যে যে সুখের ব্যবস্থা করেছেন তা [illegible] করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, পছন্দের অথবা প্রয়োজনের [illegible] থেকে, অধিকাংশ আধুনিক মানুষ স্নায়ুর পক্ষে ক্ষতিকর জীবন কাটায় এবং [illegible] তারা এত পরিশ্রান্ত থাকে যে, সুরার সাহায্য ছাড়া কোনও আনন্দ [illegible] করতে পারে না।

যে সব ধনী বোধহীন তাদের কথা ছেড়ে দিয়ে সাধারণভাবে যাদের অবসাদ [illegible] জীবনসংগ্রামের সাথে যুক্ত, তাদের কথায় আসা যায়। প্রায় সব ক্ষেত্রেই

এদের অবসাদ আসে দুশ্চিন্তা থেকে। দুশ্চিন্তা এড়ানো যায় উন্নততর জীবনদর্শন গ্রহণ করে এবং আর একটু মানসিক-শৃঙ্খলার সাহায্যে। অধিকাংশ নারী ও পুরুষ তাদের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে অতিমাত্রায় অপারগ। এ কথায় আমি বলতে চাই যে, যেখানে প্রতিকারের কোনও উপায় নেই সেখানেও তারা উদ্বেগজনক বিষয়ের চিন্তা থেকে দূরে থাকতে পারে না। মানুষ ব্যবসাবিষয়ক চিন্তাকে বিছানায় সঙ্গে করে নিয়ে যায়। যে সময়ে তাদের পরের দিনের ঝামেলা নিয়ন্ত্রণের জন্যে নতুন শক্তি সঞ্চয় করা প্রয়োজন, তখন তারা তখনকার প্রতিকারহীন দুশ্চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকে। তারা পরবর্তী দিনে সঠিক চলার পথ কী হবে তা নিয়ে ভাবতে চায় না। তাদের ভাবনা হচ্ছে অর্ধ-উন্মাদের লক্ষণযুক্ত নিদ্রাহীনতার রোমন্থন। পরদিন সকাল পর্যন্ত এই মধ্যরাতের উন্মাদ-ভাব তাদের মনে জড়িয়ে থাকে। ফলে তাদের বিবেচনা-বোধ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, মেজাজ খারাপ হয় এবং যে-কোনও বাধায় তা সহজে রেগে আগুনের মতো জ্বলে ওঠে। জ্ঞানী ব্যক্তি যন্ত্রণার সময় ভাবেন একা উদ্দেশ্য নিয়ে। অন্য সময়ে তারা আলাদা কিছু নিয়ে ভাবেন কিন্তু রাত্রিতে কিছুই ভাবেন না। আমি এমন কথা বলতে চাই না যে, গভীর সংকট যেমন, যখন ধ্বংস আসন্ন অথবা একজন মানুষের সন্দেহ করার কারণ থাকে যে স্ত্রী তাকে প্রতারনা করছে, তখন তার পক্ষে কিছু চিন্তা না করা সম্ভব। অবশ্য কেউ যদি তার মনকে বিশেষভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে থাকে তা আলাদা কথা। তবে তারা সংখ্যায় বড় কম। তারাই শুধু তাৎক্ষণিকভাবে যার প্রতিকার হবে না, তেমন বিষয়ে উদ্বেগহীন থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণ দিনের সাধারণ সব অসুবিধা যার তার সম্পর্কে কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন না হয়, তা থেকে নিজেকে দূরে রাখা সম্ভব। সাধারণ মনকে আবাদ করতে পারলে সুখ এবং কর্মদক্ষতা কী পরিমাণ বেড়ে যায় তা ভাবলে অবাক হতে হয়। এই মন সঠিক সময়ে এবং বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবে, সবসময় অল্প চিন্তায় মগ্ন থাকবে না। যখন কোনও কঠিন বা উদ্বেগাকুল সিদ্ধান্তে পৌছানোর প্রয়োজন হয়। যত তাড়াতাড়ি সব উপায় পাওয়া যাবে তাতেই সবচেয়ে গভীর চিন্তা প্রয়োগ করা উচিত এবং একবার সিদ্ধান্তে উপনীত হলে তা সংশোধন করা ঠিক নয়, যদি না একবারে নতুন কোনও তথ্য পাওয়া যায়। অব্যবস্থিত চিত্ততার মতো ক্লান্তিকর আর কিছু নেই এমন অর্থহীনও কিছু নেই।

যেসব বিষয় দুশ্চিন্তার কারণ তার অপ্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারলে অনেক দুশ্চিন্তা কমে যায়। আমি অনেক সভায় ভাষণ দিয়েছি, প্রথমদিকে শ্রোতাদের দেখে আমি ভয় পেতাম এবং ঘাবড়ে গিয়ে ভালভাবে বলতে পারতাম না। এই কঠিন পরীক্ষাকে আমি এমনই ভয় পেতাম যে, সব সময় মনে ইচ্ছা হত বক্তৃতা

যেন আমার পা ভেঙে যায়। বক্তৃতা যখন শেষ হত আমি স্নায়ুর যন্ত্রণায় একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়তাম। তারপর ধীরে ধীরে আমি নিজেকে ভাবতে শিখলাম, আমি ভাল বলি বা খারাপ বলি, কোন ক্ষেত্রেই পৃথিবীর ক্ষতি বা লাভ কিছু নেই। দেখা গেল ভাল বা খারাপ বলা নিয়ে দুশ্চিন্তা যত কমিয়ে আনলাম, আমার ভাষণ তত কম খারাপ হতে লাগল। এমনিভাবে স্নায়ুযন্ত্রণা কমতে কমতে প্রায় শূন্যের কোঠায় চলে গেল। এইভাবে অনেক স্নায়বিক অবসাদ রোধেই ব্যবস্থা নেওয়া যায়। আমাদের কাজসমূহ ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যা আমরা স্বাভাবিকভাবে ভাবি। আমাদের সাফল্য বা ব্যর্থতায়, মোট কথা, বিশেষ কিছু আসে যায় না। এমন কী গভীর দুঃখও বাঁচতে পারে। যেসব বিপদকে কোনময় মনে হয়েছে যে, তারা জীবনের সুখ চিরদিনের জন্যে নষ্ট করে দেবে, তারাও সাথে সাথে তাদের তীব্রতা এতই কমে যায় যে মনে করাই অসম্ভব হয়ে ওঠে। কিন্তু সব আত্ম-কেন্দ্রিক বিষয়ের ওপরের বাস্তব হচ্ছে কোনও মানুষের কাছেই জগতের খুব একটি বড় অংশ নয়। কোনও ব্যক্তি যদি ভাবনা এবং কাজকে অহংবোধের অতীত বিষয়ে কেন্দ্রীভূত করতে পারেন, তাহলে তিনি সব সময়ের মধ্যে অবস্থান করেও একটু শান্তি পেতে পারেন যা কোনও অহংসর্বস্ব মানুষের পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়।

যাকে বলা হয় স্নায়ুর স্বাস্থ্যবিদ্যা, তা নিয়ে খুব কমই অনুশীলন করা হয়েছে। কারখানা বিষয়ক মনস্তত্ত্ব অবশ্য অবসাদ নিয়ে বিষম অনুসন্ধান চালিয়েছে এবং একথা খুব সযত্নপ্রসূত পরিসংখ্যান দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, কোনও ব্যক্তি দীর্ঘসময় ধরে কোনও কাজ করতে থাকে তা হলে শেষ পর্যন্ত তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু এই ফলাফলের জন্যে এত বৈজ্ঞানিক আড়ম্বরের প্রয়োজন ছিল না। মনস্তত্ত্ববিদরা অবসাদ দিয়ে অনেকে গবেষণা করেছেন। যার পরিধি বেশ বিস্তৃত। যার মধ্যে স্কুলগামী শিশুরাও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কোনও পরীক্ষাই মূল বিষয়কে স্পর্শ করেনি। অবসাদের গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে অবশ্যই আধুনিক জীবনের আবেগ। বিশুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক অবসাদ বিশুদ্ধ পেশীজাত অবসাদের মতো রাতের মধ্যেই তার ক্ষতিপূরণ করে নেয়। কোনও ব্যক্তির যদি আবেগহীন কিছু কাজ বেশি করতে হয়, যেমন দীর্ঘ গণনাসংক্রান্ত কাজ, তবে তিনি তার সারাদিনের অবসাদ দিনের শেষে নিয়মিত ঘুমিয়ে দূর করেন। অতিরিক্ত কাজের যে ক্ষতি হয়, তা শুধু সেই কাজের জন্যে নয়, সেই ক্ষতি হয় দুশ্চিন্তা ও ভয়ের জন্যে। আবেগজাত অবসাদের অসুবিধা এই যে তা বিশ্রামের অন্তরায়। মানুষ যতই ক্লান্ত হয় ততই তার পক্ষে তা দূর করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অবসাদের একটা লক্ষণ হচ্ছে নিজের কাজকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করা

এবং কাজ থেকে ছুটি নিলে সব কিছু বরবাদ হয়ে যাবে এই ধারণা। আমি যদি চিকিৎসক হতাম, এরকম যার বিশ্বাস তাদের প্রত্যেককে ছুটি নেওয়ার ব্যবস্থা দিতাম। স্নায়ুবৈকল্যে যা মনে হয় কাজের চাপে ঘটেছে, আসলে তার প্রত্যেকটি আমি যতটা জানি তা ঘটেছে কিছু আবেগ থেকে উৎপন্ন উদ্বেগ থেকে, যা থেকে রোগী পালাবার জন্যে পথ খুঁজে নেন কাজের মধ্যে। কারণ তার যে দুর্ভাগ্য ঘটেছে তার চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়ার মতো অন্য কোনও পথ খোলা থাকে না বলেই তিনি কাজ ছাড়তে চান না। অবশ্য এই দুশ্চিন্তা দেউলিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থেকেও হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে তার কাজ আর দুশ্চিন্তা একসূত্রে বাঁধা। কিন্তু সেই অবস্থাতেও তার বিচারশক্তি আচ্ছন্ন হয় এবং উদ্বেগের তাড়নায় তার দুশ্চিন্তা হয়তো তাকে কাজের দিকে ঠেলে দেয় এবং এইজন্যেই দেউলিয়া হওয়ার সর্বনাশ আগেই ঘটে যায়। যদি তিনি কাজ কম করতেন তাহলে তা দেরিতে ঘটত। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আবেগ উদ্ভূত উদ্বেগ স্নায়ুবৈকল্যের কারণ, কাজ নয়।

উদ্বেগের মনস্তত্ত্ব কোনও ভাবেই সরল নয়। মানসিক শৃঙ্খলার কথা আগেই উল্লেখ করেছি, অর্থাৎ কোনও বিষয়ে ঠিক সময়ে চিন্তা করার অভ্যাসই হল সেই শৃঙ্খলা। ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ, প্রথমত চিন্তার অপব্যয় কম করে দিনের কাজ শেষ করা যায়। দ্বিতীয়ত এটি নিদ্রাহীনতার প্রতিষেধক এবং তৃতীয়ত এটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে তৎপরতা এবং দক্ষতা বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু এই ধরনের ব্যবস্থা অবচেতন বা অচেতন মনকে স্পর্শ করতে পারে না এবং যখন কোনও ঝামেলা দেখা দেয় এই ধরনের ব্যবস্থা যদি চেতনার গভীরে প্রবেশ করতে না পারে তাতে কোনও ফল পাওয়া যায় না। মনোবিজ্ঞানীরা চেতনার ওপর অবচেতনার ক্রিয়া নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন, কিন্তু অবচেতনার ওপর চেতনার ক্রিয়া নিয়ে তেমন কিছু করা হয়নি। অথচ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যায় শেষেরটির মূল্য অনেক বেশি। এই অবচেতনার সীমায় কখনো যদি যৌক্তিক বিশ্বাস গড়ে তুলতে হয় তাহলে এ বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বিশেষ করে তা উদ্বেগ-সম্পর্কিত বিষয়ে প্রয়োগ করা যায়। একথা নিজেকে বলা খুব সহজ যে এই ধরনের দুর্ভাগ্য দেখা দিলে তা খুব ভয়ানক হবে না। কিন্তু এটি শুধুমাত্র সচেতন বিশ্বাসরূপে থাকলে ততক্ষণ এটি রাত্রির অনিদ্রাও বন্ধ করবে না, দুঃস্বপ্নও বন্ধ করতে পারবে না। আমার নিজের বিশ্বাস হল, যথেষ্ট বেগ এবং তীব্রতা যোগ করলে সচেতন বিশ্বাস অবচেতনার মধ্যে রোপিত করা সম্ভব। অবচেতনার অধিকাংশ পূর্বের আবেগসচেতন চিন্তা দিয়ে গঠিত, বর্তমানে তারা সমাহিত অবস্থায় রয়েছে। এইভাবে সমাহিত করার কাজ স্বেচ্ছায় করা যায় এবং এইভাবে অবচেতনাকে কাজে লাগিয়ে অনেক প্রয়োজনীয় কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। আমি দেখেছি এ

... যদি কখনো কোনও কঠিন বিষয়ের ওপর কিছু লিখতে হয়, তাহলে আমি ... নিখুঁত পথ খুঁজে নিই। আমি খুব গভীরভাবে চিন্তা করি এবং আমার পক্ষে ... সম্ভব ততটাই করি কয়েক ঘণ্টা বা কয়েকদিন ধরে। এই সময় শেষ হলে ... আদেশ করি যে কাজটি আপাতত বিস্মৃতির অতলে চাপা পড়ুক। তারপর ... মাস পার হয়ে যাওয়ার পর আমি সচেতনভাবে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা শুরু ... আবার তাতে দেখতে পাই যে আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এই কৌশল ... কাজের আগে কাজ শেষ হওয়ার অন্তবর্তী মাসগুলিতে কাজের অগ্রগতি নেই ... দুশ্চিন্তায় ভুগতাম। সেই দুশ্চিন্তার জন্যে কাজ যে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেত ... তা নয়, অন্তবর্তী মাসগুলিও অকারণে নষ্ট হয়ে যেত। অথচ আমি এখন এই ... অমূল্য কাজে মন দিতে পারি। দুশ্চিন্তা নিয়ে সমরূপ নানারকম পথ খুঁজে ... নেওয়া যেতে পারে। যখন কোনও দুর্ভাগ্য ভয় দেখায় তখন খুব গভীর এবং ... ভাবে ভেবে দেখুন তা সবচেয়ে বেশি কতটা ক্ষতিকর হতে পারে। সম্ভাব্য এই ... দুর্ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে ভেবে দেখুন বাস্তবে এই দুর্ভাগ্য সত্যিই ততটা ... ভয়ানক নয়। এইরকম যুক্তি সবসময় পেয়ে যাবেন, কারণ দুর্ভাগ্য চরমরূপ গ্রহণ ... করে এমন কিছু ঘটে না যার কোনও সৃষ্টিমূলক গুরুত্ব আছে। দুর্ভাগ্যের ... ভয়ানক মুখে, তার দিকে শান্তভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে যদি ... মনে বলা যায়, 'বেশ তো, যাই ঘটুক তাতে আমার কিছুই এসে যায় না', তা ... হলে দেখা যাবে দুশ্চিন্তা কমে গেছে আশাকেও ব্যাপকভাবে ছাড়িয়েছে। এই ... কাজটি বেশ কয়েকবার করার প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু পরিশেষে যদি কঠিন ... ভয়ের মুখে দাঁড়াতে মানসিক প্রস্তুতিতে কোনও গলদ না থাকে, তা হলে দেখা ... দুশ্চিন্তা বাতাসে উড়ে গেছে এবং তাকে প্রতিস্থাপন করেছে একধরনের ... প্রশান্তি।

... দূরে রাখার ব্যাপক সাধারণ কৌশলের এটি একটা অংশমাত্র। দুশ্চিন্তা ... ভয় এবং সব ধরনের ভয় থেকেই জন্ম হয় অবসাদের। যে ব্যক্তি ভয় ... করতে শেখেননি তার প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় অবসাদ অতিমাত্রায় কমে ... ভয় সবচেয়ে ভয়ংকর তা সেইখানেই দেখা যায় যেখানে আমরা তার ... মুখীন হতে চাই না। অসময়ের মুহূর্তে ভয়ংকর সব চিন্তা মনের মধ্যে হঠাৎ ... আসে। সেসব কোন ধরনের হবে তা ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে। তবে প্রত্যেক ... মানুষের মনের কোণে কোন না কোন ভয় লুকিয়ে আছে। কারো কাছে এই ভয় ... মৃত্যু, কারো কাছে তা আর্থিক বিপর্যয়, তৃতীয় জনের কাছে তা কলঙ্কজনক ... কিছু করা ফাঁস হওয়া, চতুর্থ জনের কাছে তা সন্দেহের দাহ, পঞ্চম জন ভেবে ... আতঙ্কিত হয়ে উঠছেন যে প্রথম বয়সে শোনা নরকানলের কথা। সম্ভবত সত্যি,

মনে হয় এরা সকলেই ভয় থেকে মুক্তি পেতে ভুল কৌশলের সাহায্য নি
যখনই তাদের মনে ভয় দেখা দেয়, তারা অন্য কিছু নিয়ে চিন্তা করেন, আ
প্রমোদ অথবা কাজ অথবা যা খুশি নিয়ে মেতে উঠে চিন্তাকে বিক্ষিপ্ত করে
কিন্তু প্রত্যেক ধরনের ভয় মনোযোগ না দেওয়ার জন্যে আরো খারাপ হয়ে
মনকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টার অর্থই হচ্ছে, যে ভূতের বিভীষিকা
দৃষ্টি ফেরানো হচ্ছে, তাকে মান্যতা দেওয়া। সব রকমের ভয় সম্পর্কে
ব্যবস্থা হচ্ছে তা নিয়ে যুক্তিপূর্ণ চিন্তা করা। গভীর মনঃসংযোগ করে যতক্ষণ
সে ভয়ের সাথে পরিচিত হওয়া না যায়, ততক্ষণ। অবশেষে এই পরিচয়
বিভীষিকার ধারাকে ভোঁতা করে দেবে। বিষয়টাই বিরক্তিকর মনে হবে
আমাদের চিন্তাও তা থেকে দূরে চলে যাবে। কিন্তু আগের মতো তার
কোনও চেষ্টার প্রয়োজন হবে না, তা সরে যাবে তার সম্বন্ধে কোনও উৎস
বলে। যখন আপনার কোনও কিছু নিয়ে চিন্তা করতে মন চাইবে, তা যাই
সবচেয়ে ভাল পরিকল্পনা হল তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা। স্বাভাবিকভাবে
করা হত তার চেয়ে বেশি। যাতে শেষ পর্যন্ত সে বিষয়ে মোহটা দূর হয়ে যা

যে বিষয়ে আধুনিক নৈতিকতা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ তা হল ভয়ের প্রশ্ন। সা
সত্যি যে দৈহিক সাহসিকতা, বিশেষ করে যুদ্ধের সময় পুরুষদের
প্রত্যাশিত। কিন্তু অন্যান্য কারণে সেই সাহসিকতা প্রত্যাশিত নয় এবং নারীদে
কাছ থেকে কোনও ধরনের সাহসিকতাই আশা করা হয় না। পুরুষ তাকে
করুক, তা যদি কোনও নারী কামনা করে তাহলে সাহসী নারীকে তার সা
কথা গোপন করতে হয়। দৈহিক বিপদভিন্ন অন্য বিষয়ে সাহসী লোক স
খারাপ ধারণার সৃষ্টি হয়। জনমত সম্পর্কে নিস্পৃহ ঔদ্ধত্য বলে ভাবা হয় এ
পুরুষ জনগণের কর্তৃত্ব অস্বীকার করতে সাহসী হয় তাকে উপযুক্ত শাস্তি দে
চেষ্টা করে। এ সবই যা হওয়া উচিত তার বিপরীত। প্রত্যেক ধরনের সাহস
নারী বা পুরুষ যার ক্ষেত্রেই হোক, সৈনিকের দৈহিক সাহসের তুল্য প্রশংসা পা
উচিত। যুবকদের ভিতরকার দৈহিক সাহসের সাধারণত্ব একথার প্রমাণ দে
জনমতের দাবি এই সাহসের জন্ম দিতে পারে। সাহস বেশি হলে দুশ্চিন্তা ক
যায়। সুতরাং ক্লান্তিও কমে যায়। আধুনিক নারী-পুরুষ যে ধরনের স্নায়ু
অবসাদে ভুগছে তার অধিকাংশই সচেতন অথবা অবচেতন ভয় থেকে
নিচ্ছে।

প্রায় সব ধরনের অবসাদের উৎস হচ্ছে উত্তেজনার প্রতি আকর্ষণ।
কোনও মানুষ অবসর সময় ঘুমিয়ে কাটাতে পারে, তা হলে তিনি সক্ষম থাকে
কিন্তু কাজের সময়টা তার কাছে শুষ্ক লাগে এবং অবসর পেলেই তিনি

...ভোগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। অসুবিধা হচ্ছে এই যে, যে সব ...ভোগের জিনিস সহজে পাওয়া যায়, যার বাইরের চাকচিক্য বেশি, সেসবের ...ভোগ স্নায়ুকে ক্ষয় করে। উত্তেজক আমোদ একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম ...লে তা বিকৃত মনোভাবের, না হয় কোনও সহজাত অতৃপ্তির পরিচয় দেয়। ...বাহের প্রথম অবস্থায় প্রায় ব্যক্তিই উদ্দীপক উপভোগের প্রয়োজন বোধ ...না। কিন্তু বর্তমান আধুনিক বিশ্বে বিবাহ এত দীর্ঘদিন পর্যন্ত আটকে রাখতে ...য়, শেষপর্যন্ত উপার্জনের দিক থেকে যখন আর কোনও অসুবিধা থাকে না, ...দেখা যায় উদ্দীপক আমোদ উপভোগটা এর মধ্যেই অভ্যাসে পরিণত হয়ে ...এবং তা মাত্র স্বল্প সময়ের জন্যে আটকে রাখা সম্ভব। বর্তমানে বিবাহের যে ...চাপ বহন করতে হয় তা এড়িয়ে যদি জনমত কোনও যুবককে একুশ বছর ...বিবাহের অনুমতি দিত তা হলে অনেক মানুষই কাজের মতো অবসাদজনক ...আমোদের পথে পা বাড়াত না। এমনই হওয়া উচিত, এরকম সুপারিশ ...অবশ্য নীতিবিগর্হিত এবং বিচারক লিন্ডসের ভাগ্যে কী ঘটেছিল তা থেকেই ...করা যাবে। দীর্ঘকালের সম্মানজনক কর্মজীবন সত্ত্বেও তিনি নিন্দিত ...হয়েছেন। তাঁর অপরাধ ছিল, তিনি বড়দের রক্ষণশীলতার জন্যে তরুণরা ...উপভোগ ভোগ করে সেসব থেকে তাদের বাঁচাতে চেয়েছিলেন। আমি আর ...বিষয়ে বেশিদূর যাব না। এই বিষয়ে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আরো কিছু ...আলোচনা করব।

সাধারণ ব্যক্তি যেসব আইন এবং বিধিবিধান বদলাতে পারেন না, কিন্তু তার ...থেকে বাঁচতে হয়, তার পক্ষে উৎপীড়ক নীতিবিদদের তৈরী এবং সুরক্ষিত ...সাথে পেরে ওঠা কঠিন। কিন্তু এটা বুঝতে পারা উচিত যে, উদ্দীপক ...আমোদ সুখের পথে এগিয়ে দেয় না। যতদিন আরো তৃপ্তিদায়ক উপভোগ ...বিবাহের বাইরে থাকবে, ততদিন উদ্দীপক জিনিস ছাড়া তার পক্ষে জীবনকে ...কাটানো প্রায় অসম্ভব মনে হবে। এই অবস্থায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি একটিমাত্র কাজ ...করতে পারেন তা হচ্ছে নিজের উপভোগের সীমা নিয়ন্ত্রণ করা এবং স্বাস্থ্য ও ...পক্ষে ক্ষতিকারক অবসাদজনক প্রমোদে মত্ত না হওয়া। তরুণদের ...দূর করার প্রকৃত উপায় হচ্ছে সামাজিক নীতিমালার পরিবর্তন সাধন। ...তরুণদের ভেবে দেখা উচিত যে, পরে তাদেরও বিয়ে করার মতো ...আসবে। অতএব যা সুখী বিবাহকে অসম্ভব করে তুলতে পারে এমনভাবে ...কাটানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কারণ এ থেকে বিপদ সহজেই ঘটে যেতে ...অবসন্ন হলে। তখন বিয়ে করাটাই অর্থহীন হয়ে যাবে।

স্নায়বিক অবসাদের সবচেয়ে খারাপ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তা ব্যক্তি এবং বাইরের জগতের মধ্যে একটা আবরণ টেনে দেয়। বাইরের পৃথিবীর ধারণা তার কাছে পৌছায় অপূর্ণ, অস্বচ্ছ এবং পরিবর্তিতরূপে। তিনি তখন অন্য কোনও ব্যক্তিকে সহ্য করতে পারেন না, আহারে তৃপ্তি পান না, সূর্যালোকে আনন্দ পান না। সামান্য কয়েকটি জিনিসের প্রতি তার তীব্র মনোযোগ থাকে। অন্য সব কিছুর প্রতি তিনি উদাসীন। ফলে অবসাদ ধীরে ধীরে বেড়েই চলে এবং একসময় তা এমন অবস্থায় পৌছে যায় যে, তখন তার চিকিৎসার প্রয়োজন দেখা দেয় এ সবই পূর্ব অধ্যায়ে আলোচিত, পৃথিবীর সাথে শূন্য হয়ে যাওয়া সম্পর্কের শাস্তি। কিন্তু আমাদের বর্তমান নগরাঞ্চলে যেভাবে জন-বিস্ফোরণ ঘটছে তাতে মাটির সাথে কী করে সংযোগ রক্ষা করা যাবে তা ভেবে পাওয়া সহজ নয়। যাই হোক, এখানে আমরা আমরা সেই বিশাল সামাজিক সমস্যার কাছাকাছি চলে এসেছি যা নিয়ে এই গ্রন্থে কোনও আলোচনা করার ইচ্ছা আমার নেই।

৬
ঈর্ষা

দুশ্চিন্তার পরেই অসুখী হওয়ার এক শক্তিশালী কারণ সম্ভবত ঈর্ষা। আমার বলা উচিত এই ঈর্ষা বা পরশ্রীকাতরতা মানুষের সর্বাপেক্ষা সনাতন এবং গভীরতম ক্রোধ-প্রবৃত্তির অন্যতম। বয়স এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে শিশুদের এটি খুব বেশি চোখে পড়ে এবং প্রত্যেক শিক্ষাদানকারীর উচিত এই প্রবৃত্তিকে খুব যত্নময় দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করা। একটি শিশুকে বঞ্চিত করে অন্য এক শিশুর প্রতি সামান্য পক্ষপাতও সাথে সাথে তার চোখে পড়ে এবং তাতে সে রেগে যায়। যারা শিশুদের দেখাশোনা করেন, তাদের চরম, কঠোর, অপরিবর্তিত এবং সমভাগে বণ্টনযোগ্য ন্যায়বিচারের পথে চালিত হতে হবে। কিন্তু ঈর্ষা ও বিদ্বেষ (বিদ্বেষ ঈর্ষারই বিশেষ এক রূপ) বিষয়ে শিশুরা বড়দের তুলনায় একটু বেশি খোলামেলা। এই আবেগ শিশুদের মধ্যে যেমন বড়দের মধ্যেও একই রকম দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ পরিচারিকাদের কথা বলা যায়। আমার মনে পড়ে একজন বয়স্কতা পরিচারিকা গর্ভধারণ করার পর আমরা বলেছিলাম সে কোনও ভারী জিনিস তুলুক, আমরা তা চাই না। তার অব্যবহিত ফল দেখা গেল অন্যসব পরিচারিকারাও ভারী জিনিস তোলা বন্ধ করে দিল। তখন সেরকম কাজের দরকার হলে আমাদের নিজেদেরই তা করে নিতে হত। ঈর্ষা হল গণতন্ত্রের ভিত্তি। হেরাক্লিটাস[১] বলেন এফেসাসের নাগরিকদের ফাঁসি দেওয়া উচিত। কারণ তারা বলেছিলেন, 'আমাদের মধ্যে কেউ প্রথম স্থানীয় হবে না।' গ্রীকরাজ্যগুলিতে প্রায় সমস্ত সব আন্দোলনই প্রায় এই ক্রোধ-প্রবৃত্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। আধুনিক কালের সম্বন্ধেও একথা সত্যি। তবে একটি আদর্শবাদী মতবাদ রয়েছে, যার মতে সেটি হল আদর্শ রাষ্ট্রপরিচালন ব্যবস্থা। আমি নিজে এই মতবাদকে সত্যি বলে মনে করি। কিন্তু ব্যবহারিক রাজনীতিতে এমন কোনও বিভাগ নেই, যেখানে বড় রকমের পরিবর্তনের জন্যে আদর্শবাদী মতবাদ যথেষ্ট শক্তিশালী। যখন বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে যায়, তখন তাকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করার জন্যে যেসব যুক্তি দেখা দেয় তা সবসময় ছদ্মবেশী মানসিক চাঞ্চল্য। মাদাম রোঁলার আত্মকথা পড়ে দেখুন, যিনি বারংবার জনসেবায় উদ্বুদ্ধ মহিয়সী নারীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। দেখা যাবে যা তাকে এমন উদ্দীপ্ত গণতন্ত্রীতে পরিণত করেছিল তা হল অভিজাত বাসগৃহ দেখার পর তার ভৃত্যদের বাসস্থান দেখতে যাবার অভিজ্ঞতা।

[১] হেরাক্লিটাস্, Heraclitus (খ্রিঃ পূঃ ৫৩৫-৪৭৫), প্রাচীন গ্রীসের বস্তুবাদী, অজ্ঞেয় অলৌকিক তত্ত্বের বিরুদ্ধবাদী দার্শনিক।

সাধারণ সম্ভ্রান্ত মহিলাদের জীবনে ঈর্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

যখন ভূগর্ভস্থ রেলে বসে থাকেন তখন পাশ দিয়ে যদি কোনও সুসজ্জিতা মহিলা চলে যান, তখন অন্য মহিলাদের চোখের দিকে তাকাবেন, দেখবেন তাদের নিজেকে সম্ভবত আরো ভালরূপে সজ্জিতা দুচারজন ছাড়া সেই পাশ কাটানো মহিলার প্রতি ঈর্ষাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে এবং নানাভাবে তার বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করার চেষ্টা করছে। এই সাধারণ ঈর্ষার একটি রূপ হচ্ছে কুৎসার প্রতি আসক্তি। অন্য নারী সম্পর্কে যে কোনও কুৎসা, তুচ্ছ প্রমাণের ওপর দাঁড়িয়ে থাকলেও সাথে সাথে বিশ্বাস করা হয়। উন্নত নীতিজ্ঞানও একই উদ্দেশ্যসাধন করে। যারা ঘটনাক্রমে এর বিরুদ্ধাচরণ করে ফেলে, তাদের ঈর্ষা করা হয় এবং তাদের অন্যায়ের জন্যে শাস্তি প্রদানকে পূণ্য কাজ বলে মনে করা হয়। এই বিশেষ ধরনের পূণ্য নিশ্চয় নিজেরই পুরস্কার।

ঠিক একই জিনিস আবার দেখা যাবে পুরুষদের মধ্যেও। পার্থক্যটা শুধু এই যে নারীরা অন্য সব নারীকেই তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভাবে, কিন্তু পুরুষরা একই পেশাজীবী হলে তবেই পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে। এইটাই সাধারণ নিয়ম। পাঠক, আপনি কখনো অবিবেচকের মতো এক চিত্রশিল্পীর কাছে অন্য শিল্পীর প্রশংসা করেছেন? আপনি কী কখনো একই দলের একজন রাজনীতিবিদের প্রশংসা অন্য রাজনীতিবিদের কাছে করেছেন? যদি করে থাকেন, তা হলে শতকরা নিরানব্বই ক্ষেত্রে আপনি বিদ্বেষের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন। লেবনিজ[২] এবং হাইজেনসের[৩] মধ্যে যেসব পত্র বিনিময় হয়েছিল তার মধ্যে কয়েকটি চিঠিতে দেখা যায় নিউটনের[৪] মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে। এই অনুমান থেকে অনেক দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁরা পরস্পরকে লিখেছে 'মিঃ নিউটনের মতো অতুলনীয় প্রতিভার বিচার ক্ষমতা আচ্ছন্ন হয়ে পড়া কি পরিতাপের বিষয় নয়?' এই দুই বিখ্যাত ব্যক্তি একের পর এক চিঠিতে স্পষ্টতই বিষয়টি মনে মনে উপভোগ করেছেন এবং কুম্ভীরাশ্রু ফেলেছেন। বাস্তবক্ষেত্রে যে ঘটনা নিয়ে তাঁরা শোকোচ্ছ্বাস ভণিতা করেছেন, তা ঘটেইনি, যদিও নিউটনের কিছু খামখেয়ালি আচরণ এই ধরনের গুজবের জন্ম দিয়েছিল।

---

২. লেবনিজ, Leibniz Gottfried (১৬৪৬-১৭১৬)। জার্মান গণিতবিদ, পদার্থবিদ এবং দর্শনেও তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।

৩. হাইজেনস, Christian Huygens (১৬২৯-১৬৯৫)। জন্ম নেদারল্যান্ডে। বিখ্যাত পদার্থ এবং গণিতবিদ। জ্যোতির্বিজ্ঞানেও তাঁর অবদান অসামান্য।

৪. নিউটন, Sir Issac Newton (১৬৪২-১৭২৭), বস্তুজগতের ক্রিয়াশীল মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের আবিষ্কারক। তাঁকে আধুনিক বিজ্ঞানের জনক বলা হয়।

সাধারণ মানুষের সবরকম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ঈর্ষা হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ানক। ঈর্ষান্বিত লোক শুধু যে অন্যের ওপর দুর্ভাগ্য চাপাতে চায় তা নয়, সুযোগ পেলে চাপিয়েও দেয় এবং সে নিজেও ঈর্ষায় অসুখী হয়। নিজের যা আছে তা থেকে আনন্দলাভ না করে অন্যের যা আছে তা নিয়ে দুঃখ পায়। সে অন্যের সমস্ত সুবিধা ভোগ করছে, সম্ভব হলে তা থেকে বঞ্চিত করে। অথচ যেসব সে পাচ্ছে পেলে তা তাদের মতোই তার কাছে কামনীয় হত। যদি এই মনোবৃত্তিকে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাহলে তা সকল সৌন্দর্যের পক্ষে ভয়ংকর হয়ে ওঠে। এমনকী বিশেষ দক্ষতার সফল প্রয়োগেও। শ্রমিক যখন পায়ে হেঁটে তার কাজে যায় তখন চিকিৎসক রোগী দেখতে গাড়িতে যাবেন কেন? যেখানে সকলে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় বাস করছে তখন বিজ্ঞান গবেষককে কেন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বাস করতে দেওয়া হবে? কেন বিশ্বের পক্ষে মূল্যবান এবং দুর্লভ প্রতিভার অধিকারী কোনও ব্যক্তিকে গৃহকর্মের ভাবনা থেকে মুক্তি দেওয়া হবে? সমাজ এসব প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারে না। সৌভাগ্যক্রমে মানুষের স্বভাবে একদিকে কিছুর অভাব থাকলে অন্যদিকে তার পরিপূরক কিছু থাকে, যেমন সহানুভূতিশীল মনোবৃত্তি। যিনি মানবজাতির সুখবৃদ্ধি কামনা করেন, তার উচিত প্রশংসা পাওয়া এবং ঈর্ষা বা পরশ্রীকাতরতা কমানো।

কিন্তু ঈর্ষার প্রতিষেধক কি? সন্তদের কাছে স্বার্থত্যাগরূপ প্রতিষেধক আছে। তাঁদের ভিতর এক সন্ত অন্য সন্তকে ঈর্ষা করছেন এমনটা অসম্ভব নয়। বহু বছর ধরে উচ্চ স্তম্ভে বাস করে সেন্ট সিমিয়ান স্টাইলাইটস[৫] যদি শুনতেন অন্য কোনও সন্ত আরো দীর্ঘদিন এবং আরো সরু কোনও স্তম্ভে বাস করছেন তা হলে সম্পূর্ণ খুশী হতেন কিনা তা নিয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে। সন্তদের কথা থাকুক, সাধারণ নর-নারীর ঈর্ষার একমাত্র ওষুধ হচ্ছে সুখ লাভ করা। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে এই যে ঈর্ষা বা পরশ্রীকাতরতা নিজেই সুখের পথে একটি মারাত্মক বাধা। শৈশবের দুরবস্থা ঈর্ষাকে বাড়িয়ে দেয়। যে শিশু দেখে তাকে ছেড়ে তার কোনও ভাই বা বোন বেশি ভালবাসা পাচ্ছে তখন থেকে সে ঈর্ষা করতে শেখে। সে যখন বড় হয়ে বাড়ি ছেড়ে বাইরে যায় তখন সেইসব অবিচার খুঁজে বেড়ায়, যা তার প্রতি হওয়া সম্ভব। যদি অবিচার তার সাথে সাথে তা তার চোখে পড়ে। যদি তা না হয়, তাহলে সেই অবিচার নিয়েই কল্পনা করে, এমন লোক তো অসুখী হবেই।

---

৫ সিমিয়ান স্টাইলাইটস, St Simeon stylites (খ্রিঃ পূঃ ৩৯০-৪৯৫), সিরিয়ার সন্ত। সিরিয়ার আলেপ্পেতে একটি স্তম্ভের ওপর উপবিষ্ট হয়ে একইভাবে ৩৭ বছর বাস করেছিলেন।

সে বন্ধুদের কাছেও বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। কারণ কোন সময় কল্পনার অবহেলা এড়িয়ে চলার কথা সে মনে রাখতে পারে না। কেউ তাকে পছন্দ করে না, সেকথা সে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে প্রথমে। পরে সে বিশ্বাসকে নিজের ব্যবহারের সাহায্যে সত্যি করে তোলে। শৈশবের আরেকটি দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে পিতামাতার বাৎসল্যবোধ কম তাদের সন্তান হওয়া। এই অবস্থায় নিজের যথার্থ আদরের কোনও ভাইবোন না থাকলেও অন্য পরিবারের বাবা-মাকে অন্য সন্তানদের তার চেয়েও বেশি আদর করছে দেখতে পারে। এতে শিশুদের তার ঘৃণা জন্মাবে, নিজের বাবা-মার ওপরও এবং বড় হলে তার অবস্থা বাইবেলে বর্ণিত ইসমাইলের মতো হয়েছে মনে হবে। কোনও কোনও রকম সুখ প্রত্যেকের স্বাভাবিক জন্মগত অধিকার। তা থেকে বঞ্চিত হওয়া তাকে মানসিকভাবে নিষ্ক্রিয় আর বিষাক্ত করে তোলে।

কিন্তু ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি বলতে পারে, 'আমাকে এসব কথা বলে কী লাভ? সুখ হল ঈর্ষার প্রতিষেধক। আমি যতক্ষণ ঈর্ষা বোধ করি ততক্ষণ সুখের দেখা পাই না, আর তুমি বলছ সুখ না পাওয়া পর্যন্ত আমি ঈর্ষা হতে বিরত হতে পারি না।' কিন্তু বাস্তব জীবন এত যুক্তির ধার ধারে না। ঈর্ষা বা পরশ্রীকাতরতার কারণগুলি যদি জানতে পারা যেত, তাহলে এই রোগটি সারাবার পথে অনেক অগ্রগতি হত। কোনও তুলনার ভাষায় চিন্তা করার অভ্যাস ভয়ানক। যখন সুখদায়ক কিছু ঘটে তা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করা উচিত, তখন ভাবা উচিত নয় যে, অন্য কোনও লোক হয়তো এমন সুখ উপভোগ করে যা এর তুলনায় ম্লান। ঈর্ষাকাতর লোকটি বলবে, 'ঠিক কথা, রোদে ভরা উজ্জ্বল দিন, এখন বসন্তকাল, পাখিরা কুজন করছে, ফুলদল বিকশিত; কিন্তু আমি জানতে পেরেছি, সিসিলির বসন্ত এর চেয়ে সহস্র গুণ বেশি মনোরম। সেখানে হেলিকনের কুঞ্জবনে পাখির গান আরও মধুর এবং শারণের গোলাপ আমার বাগানের যে কোনও গোলাপের চেয়ে আরও বেশি মনজুড়ানো।' এসব ভাবতে ভাবতে ঈর্ষাকাতর লোকটির মন আকাশে সূর্যকে মেঘে ঢেকে দেয়, পাখির গান অর্থহীন কোলাহলে পরিণত হয়, ফুলগুলির দিকে আর তাকাতে ইচ্ছা করে না। এইভাবে জীবনে সব আনন্দকে দূরে ঠেলে দেয়। সে ভাবে, 'আমার প্রেমিকা খুব সুন্দরী, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি, কিন্তু শেবার রাণি কী অপরূপাই না ছিলেন! হায়রে সলোমন যে সুযোগ পেয়েছিলেন, আমি যদি তা পেতাম!' এই ধরনের সব তুলনা অর্থহীন নির্বুদ্ধিতা। শেবার রাণি হোক অথবা পাশের বাড়ির প্রতিবেশী হোক, যদি আমাদের অতৃপ্তির কারণ হয়, তাহলে উভয়ক্ষেত্রেই সে কারণ সমান মূল্যহীন। বুদ্ধিমান অন্যের কী আছে আর কী নেই তা নিয়ে ভেবে নিজের আনন্দকে নষ্ট

না। প্রকৃতপক্ষে ঈর্ষা এক ধরনের অন্যায়, যার কিছু অংশ নৈতিক, কিছুটা বুদ্ধিবৃত্তিক। ঈর্ষার নিজের কোনও রূপ নেই, শুধু তুলনার সাহায্যে তাকে অনুভব করা যায়। মনে করুন আমি যে বেতন পাচ্ছি তা আমার প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট। যাতে আমার তৃপ্ত থাকা উচিত। কিন্তু আমি জানতে পারলাম, এমন একজন, যে আমার চেয়ে কোনও দিকেই বড় নয়, সে আমার দ্বিগুণ বেতন পাচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমি যদি ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়ি তা হলে আমি যা পাচ্ছি যা আমার তৃপ্তিদায়ক হওয়া উচিত, তা ম্লান হয়ে গেল এবং আমার ওপর অবিচারের ধারণা আমাকে ক্ষয় করতে শুরু করল। এসবের যথাযথ প্রতিকার হচ্ছে মানসিক শৃঙ্খলা এবং অর্থহীন চিন্তা করার অভ্যাস ত্যাগ করা। মূল কথা হচ্ছে, সুখ অপেক্ষা ঈর্ষা করার মতো বড় কিছু নেই। যদি আমি ঈর্ষাকে দূর করতে পারি তাহলে আমি সুখকে পেয়ে যাব এবং তখন আমি হব ঈর্ষার পাত্র। যে ব্যক্তি আমার চেয়ে দ্বিগুণ বেতন পাচ্ছেন। এই চিন্তার কোনও শেষ নেই। যদি আপনি গৌরব চান তা হলে আপনি নেপোলিয়নকে[৬] ঈর্ষা করবেন। কিন্তু নেপোলিয়ন সীজারকে[৭] ঈর্ষা করতেন। সীজার করতেন আলেকজান্ডারকে[৮] এবং নিশ্চিতভাবে বলতে পারি আলেকজান্ডার ঈর্ষা করতেন হারকিউলিসকে[৯]। যার কোনও বাস্তব অস্তিত্ব ছিল না। অতএব একমাত্র সাফল্যের দিক থেকে আপনি ঈর্ষাকে এড়াতে পারবেন না। কারণ ইতিহাসে অথবা পুরাণে সব সময় এমন লোক পাওয়া যাবে যিনি আপনার চেয়ে বেশি সফল। আপনি ঈর্ষা থেকে দূরে থাকতে পারেন। যদি যে আনন্দ আপনার কাছে আসবে, তা উপভোগ করেন, যে কাজ আপনার করা উচিত তা করেন অহেতুক যাদের আপনি বেশি সৌভাগ্যবান মনে করেন তাদের সাথে নিজেকে তুলনা না করেন।

অপ্রয়োজনীয় বিনয়ের সঙ্গে ঈর্ষার সম্পর্ক গভীর। বিনয়কে একটি গুণ বলেই মনে করা হয়। কিন্তু আমার নিজের সন্দেহ খুব বেশি, বিনয়ের বাড়াবাড়ি হলে তাকে আর গুণ বলা যায় কিনা। বিনয়ী লোকের মনে বিশেষ প্রত্যয় জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন হয়। তারা সার্থকভাবে পারবেন এমন কাজ শুরু করতেও সাহস

---

৬. নেপোলিয়ন, পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

৭. সীজার. Julias Cacsar (খ্রীঃ পূঃ ১০২-৪৪), রোমের অদ্বিতীয় বীর জুলিয়াস সীজার। ইতিহাসে তাঁর মতো চরিত্রের দেখা খুব কম মেলে।

৮. আলেকজান্ডার, Alexander (খ্রীঃ পূঃ ৩৫৬-৩২৩), বিশ্বের দিগ্বিজয়ীদের তালিকায় প্রথম নাম— Alexander the Great।

৯. হারকিউলিস, Hercules, গ্রীক পুরাণের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। গ্রীক পুরাণে তাকে দেবদেবতার (Demigod) মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

পান না। বিনয়ীদের বিশ্বাস, তারা যাদের সঙ্গে সাধারণভাবে মিশে থাকে, তারা সব বিষয়েই বড়। তাই তারা বিশেষভাবে ঈর্ষার শিকার হন, যার জন্যে তাদের মনে ঈর্ষা থেকে অতৃপ্তির জন্ম হয়। আমি মনে করি, কোনও বালককে বড় করে তোলার সময় সে যে খুব ভাল, এই কথাটা বলার পক্ষে অনেক কিছু আছে। আমার মনে হয় না কোনও ময়ুর তার পুচ্ছের জন্যে অন্য ময়ুরকে ঈর্ষা করে, কারণ প্রত্যেকটি ময়ুর মনে করে তার পুচ্ছই পৃথিবীতে সুন্দরতম। এর ফলেই ময়ুরেরা শান্তিপ্রিয় বিহঙ্গ। কল্পনা করুন, কোনও ময়ুরকে শেখানো হল, নিজেকে নিয়ে সুন্দর ভাবনা অন্যায়, তা হলে সে অন্য ময়ুরকে পেখম মেলতে দেখামাত্র নিজেকে বলত, 'আমি কিছুতেই কল্পনা করব না যে, আমার পেখম ওর চেয়ে সুন্দর, কারণ তা হবে আত্ম-অহংকার। কিন্তু হায়, তাহলে তো আমি ওর মতো সুখী হতাম। ঐ জঘন্য পাখিটা নিজের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে এতটা আত্মবিশ্বাসী! ওর একটা পালক যদি ছিঁড়ে দিই, তাহলে আর তুলনার কোনও ভয় থাকবে না।' সম্ভবতঃ সে তাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করবে এবং প্রমাণ করবে যে ওটি একটি খারাপ ময়ুর, যে অময়ুরোচিত আচরণের অপরাধে দোষী এবং সে তাকে ময়ুরদের নেতৃমণ্ডলীর অধিবেশনে অভিযুক্ত করবে। ক্রমে সে এই নীতি প্রতিষ্ঠা করবে যে, বিশেষভাবে সুন্দর পুচ্ছধারী ময়ুরেরা প্রায় সবসময় খারাপ হয় এবং ময়ুররাজ্যের জ্ঞানী শাসকদের উচিত ঝুলে পড়া বিশীর্ণ পালকধারী নিরহংকার ময়ুরকেই ভাল ময়ুর বলে নির্বাচন করা। এই নীতি অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার পর সে সুন্দর শ্রেষ্ঠ সব ময়ুরদের একসাথে করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। শেষ পর্যন্ত সত্যিই সুন্দর ময়ুরদের মনোহরণ পুচ্ছ অতীতের এক অস্পষ্ট স্মৃতি হয়ে যাবে। নীতিধর্মের ছদ্মবেশে এই হচ্ছে ঈর্ষার জয়লাভ। কিন্তু যেখানে প্রত্যেক ময়ুর নিজেকে অন্যের চেয়ে বেশি সুন্দর মনে করছে, সেখানে এইসব দমননীতির কোনও প্রয়োজন নেই। প্রতিযোগিতায় প্রত্যেকটি ময়ুর প্রথম পুরস্কার পেতে আশা করে এবং প্রত্যেকেই সেখানে তার নিজের ময়ুরীকে মূল্যবান মনে করে। তাই সে বিশ্বাস করে প্রথম পুরস্কার সেই পেয়েছে।

ঈর্ষা অবশ্যই প্রতিযোগিতার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। যে সৌভাগ্য আমাদের নাগালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে কখনো আসবে না তাকে আমরা ঈর্ষা করি না। যে যুগে সামাজিক স্তরভেদ ঈশ্বরের বিধান বলে নির্ণীত হয়ে গেছে, সেই যুগে ধনী দরিদ্রের ভেদকেও ঈশ্বরের বিধান বলে মান্য করার বাধ্যতা চলে এসেছে। সেখানে দরিদ্ররা ধনীদের ঈর্ষা করে না, ভিক্ষুকরা কোটিপতিদের ঈর্ষা করে না। কিন্তু অন্য ভিক্ষুকরা যদি সাফল্য লাভ করে, তাহলে অবশ্যই তাদের ঈর্ষা করবে। বর্তমান বিশ্বে সামাজিক অবস্থানের অস্থায়িত্ব এবং গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের

সামাজনীতিতে ঈর্ষার পরিসর অনেকদূর বিস্তৃত হয়েছে। বর্তমান মুহূর্তে এটি ক্ষতিকর। কিন্তু আরো ন্যায়সঙ্গত সমাজব্যবস্থায় পৌছাবার জন্যেই এই অন্যায়কে দূর করে যেতে হবে। অসম ব্যবস্থাকে যুক্তি দিয়ে দেখলে তাকে অন্যায় বলেই মনে হবে যদি অবশ্য সেই অসমতা গুণের উৎকর্ষের ওপর না দাঁড়ায়। যখনি তাকে অন্যায় বলে দেখা হবে তখন সে ঈর্ষার জন্ম হবে তার প্রতিকার সেই অন্যায় দূর না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। সুতরাং আমাদের যুগে ঈর্ষা এক অদ্ভুত ধরনের ভূমিকা পালন করছে। দরিদ্র ধনীকে ঈর্ষা করে, দরিদ্রতর জাতিরা ধনী জাতিদের ঈর্ষা করে, নারী ঈর্ষা করে পুরুষদের, সতী নারীরা ঈর্ষা করে অসতীদের, তারা শাস্তি পাচ্ছে না বলে। যদিও এই কথাটাই সত্যি যে ঈর্ষা বিভিন্ন শ্রেণী, বিভিন্ন জাতি ও নারী পুরুষের মধ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রধান সহায়ক শক্তি। একই সাথে একথাও সত্যি যে ঈর্ষার ফলে যে ন্যায় প্রতিষ্ঠা পাবে বলে আশা করা যায়, তা কিন্তু ভাগ্যহীনদের সুখ বাড়ায় না। যেসব আবেগ ব্যক্তিজীবন নষ্ট করে দেয়, তা সমাজজীবনও নষ্ট করে দেয়। একথা মনে করা অনুচিত যে ঈর্ষার মতো ক্ষতিকর কিছু থেকে ভাল ফল পাওয়া যাবে। সুতরাং যাঁরা আদর্শবাদী নীতির কারণে সামাজিক ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের বৃদ্ধি কামনা করেন তাঁদের অবশ্যই আশা করা উচিত যে, ঈর্ষা ছাড়া অন্য কোনও শক্তিই হবে সেই পরিবর্তনের যন্ত্র।

সব খারাপ জিনিসের মধ্যেই পরস্পর একটা যোগসূত্র থাকে এবং একটি খারাপ থেকে অন্য একটি খারাপের জন্ম হতে পারে। সাধারণভাবে দেখা যায় অবসাদ ঈর্ষার একটি কারণ। যখন নিজের কাজ শেষ করার পক্ষে নিজের শক্তিকে অপ্রতুল মনে হয় তখন সাধারণভাবে তার মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়, যাদের প্রতি ঈর্ষা জেগে উঠবেই। ঈর্ষা কমানোর একটা সহজ উপায় হচ্ছে তাই অবসাদ কমানো। কিন্তু সবচেয়ে জরুরী বিষয় হচ্ছে এমন একটা জীবন বেছে নেওয়া যা প্রবৃত্তিকে সুখজনক করে তোলে। যে ঈর্ষা স্বাভাবিক পেশাজাত বলে মনে হয় এমন অনেক ঈর্ষার বাস্তব উৎস হল যৌনতা। বিবাহিত জীবন সুখের হলে এবং মনের মতো সন্তান পেলে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সেই সন্তানকে সুস্থভাবে মানুষ করার মতো প্রচুর সংস্থান থাকবে, ততক্ষণ সে অন্য লোকদের কাছে অতিরিক্ত বৈভব বা সাফল্যের জন্যে ঈর্ষা করবে না। মানুষের সুখের কারণগুলি এতই সাধারণ যে, ভদ্রলোকরা তা স্বীকার করতে চান না যে তাদের জন্যে কীসের। যে কোনও সুসজ্জিতা রমণীকে দেখলেই যেসব রমণী ঈর্ষিত হয়ে তাকান তাদের কথা আগেই বলেছি। তারা যে তাদের সহজ প্রবৃত্তিজাত আনন্দধারায় সুখী নন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। প্রবৃত্তিজাত সুখ ইংরেজিভাষী

মানুষের মধ্যে বিশেষ করে নারীদের মধ্যে খুব দুর্লভ। এই ব্যাপারে সভ্যতা মনে হয় পথ হারিয়ে ফেলেছে। ঈর্ষা কমাতে হলে তার কারণ খুঁজে বের করতেই হবে এবং যদি কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া না যায় তাহলে আমাদের সভ্যতার এক ভয়ংকর বিপদ ডেকে আনবে, যা থেকে উৎপন্ন ঘৃণিত উন্মত্ততায় ধ্বংস হয়ে যাবে সেই সভ্যতা। প্রাচীনকালে লোকে শুধু তাদের প্রতিবেশীদের ঈর্ষা করত, কারণ তাদের পরিচিতের সেই ছিল সীমা। এখন শিক্ষা এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে ব্যক্তিকে না চিনেও বৃহত্তর মানবসমাজ তাদের কাছে নৈর্ব্যক্তিকভাবে পরিচিত হয়ে উঠে। ছায়াছবির মাধ্যমে ধনীদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তারা জানতে পারে বলে মনে করে। সংবাদপত্র তাদের বিদেশী জাতির অসভ্যতা সম্বন্ধে জানিয়ে দেয়। প্রচারের মাধ্যমে যাদের চামড়ার রং তাদের চেয়ে আলাদা তাদের নোংরা কার্যকলাপের কথাও তারা জানতে পারে। হলুদ জাতি ঘৃণা করে সাদাদের, সাদা কালোদের এবং এইভাবেই চলতে থাকে। বলা যেতে পারে এসব প্রচারের কুফলজাত। কিন্তু এই ব্যাখ্যায় কোনও গভীরতা নেই। প্রচার কেন বন্ধুত্বের মনোভাব তৈরী না করে ঘৃণা সৃষ্টিতে অধিকতর সাফল্য লাভ করে? এর স্পষ্ট কারণ হচ্ছে মানুষের মনকে বর্তমান সভ্যতা যেভাবে তৈরী করেছে তাতে সে বন্ধুত্বের চেয়ে ঘৃণার দিকেই বেশি করে ঝুঁকে পড়েছে। সে ঘৃণাপ্রবণ কারণ সে অতৃপ্ত, কারণ সে গভীরভাবে অনুভব করে সম্ভবত নিজের অজান্তে সে কোনও কারণে জীবনের অর্থ হারিয়ে ফেলেছে। সম্ভবত অন্যেরা আমাদের ঠকিয়ে প্রকৃতির দান, মানুষের সব আনন্দ উপভোগের ভাল ভাল জিনিসগুলি নিয়ে নিয়েছে। আধুনিক মানুষ যেসব সুখ ভোগ করে সেসবের আসল সমষ্টি আদিম যুগের সমাজে যেসব সুখ দেখা যেত তার চেয়ে সন্দেহাতীতভাবে অনেক বেশি। কিন্তু তা আরও কত বাড়ানো যেতে পারে সেই চেতনাই যেন বেশি তাদের মধ্যে। সন্তানদের নিয়ে যখনই পশুশালায় যাওয়ার সুযোগ ঘটে, তখনই আপনি যেসব বানর ব্যায়ামের কসরত দেখাচ্ছে বা বাদাম ভেঙে মুখে দিচ্ছে না তাদের চোখে এক অদ্ভুত অব্যক্ত বেদনা দেখতে পাবেন। আপনি কল্পনা করতে পারেন তারা ভাবছে তাদের মানুষ হয়ে জন্ম নেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব তার রহস্য উদ্ধার করতে পারছে না। বিবর্তনের পথে তারা পথ হারিয়ে ফেলেছে, তাদের জ্ঞাতিরা এগিয়ে গেছে আর পড়ে রয়েছে পিছনে। সভ্য মানুষের সত্ত্বাও একইরকম, পশুশালায় বানরের মতোই পীড়িত ও বেদনাহত। সে বুঝতে পারে প্রায় তার নাগালের মধ্যেই তার চেয়ে ভাল কিছু রয়েছে, কিন্তু সে জানে না কোথায় তাকে খুঁজে বেড়াবে কীভাবেই বা তাকে লাভ করবে। নৈরাশ্যে আক্রান্ত হয়ে সে তারই মতো পথহারা এবং অসুখী মানুষদের ওপর রেগে যায়। বিবর্তনের পথে চলতে চলতে আমরা

আমরা একটি পর্যায়ে পৌঁছেছি যেটি অন্তিম পর্যায় নয়। এই পর্যায়কে আমাদের অতিক্রম করে যেতে হবে অতি দ্রুত, কারণ যদি আমরা তা না পারি তাহলে আমাদের অধিকাংশ মধ্যপথে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং অবশিষ্টেরা সন্দেহ আর ভয়ের বশে নিজেদের হারিয়ে ফেলবে। সুতরাং ঈর্ষা অশুভ হলেও-এর ফল ভয়ানক হলেও সম্পূর্ণরূপে শয়তানের নিয়ন্ত্রণে নয়। এটি আংশিকভাবে একটি বীরসুলভ আত্মার প্রকাশ, এই বেদনা তাদের অন্ধরাত্রে পথ চলা আরো ভাল বিশ্রামের স্থান পাবে অথবা মৃত্যু আর ধ্বংসের উদ্দেশ্যে। এই নৈরাশ্যের মধ্যে সঠিক পথটি খুঁজে পেতে হলে সভ্য মানুষ তার হৃদয়কে উদার করবে। যেমন সে করেছে তার মস্তিষ্ককে। নিজেকে অতিক্রম করার শিক্ষা তাকে শিখে নিতে হবে এবং তা করতে গিয়ে তাকে জেনে নিতে হবে সমগ্র বিশ্বের মুক্তির পথ।

৭

পাপের চেতনা

পাপের চেতনা সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ে কিছু আলোচনার সুযোগ হয়েছিল আমাদের। এবার বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই। কারণ প্রাপ্তবয়স্কদের জীবনে যেসব গুরুত্বপূর্ণ মূলগত মনস্তাত্ত্বিক কারণে অসন্তোষ দেখা দেয়, পাপের চেতনা তাদের মধ্যে অন্যতম।

পাপ নিয়ে ঐতিহ্যগত ধর্মীয় মানসিকতা একটা রয়েছে, কিন্তু কোনও আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ তা স্বীকার করেন না। মনে করা হত, বিশেষভাবে প্রোটেস্ট্যান্টরা, কেউ কোনও কাজ করতে প্রলুব্ধ হলে, বিবেকই তাকে বলে দেয় কোন্ কাজ পাপময়। সে কাজ শেষ হলে তার দুটি বেদনাদায়ক অনুভূতি হয়। প্রথমটি হচ্ছে মর্মবেদনা, যার কোনও মূল্য নেই; অপরটি হচ্ছে অনুশোচনা, যা তার পাপকে মুছে ফেলতে পারে। প্রোটেস্ট্যান্ট দেশসমূহে যারা এই মতবাদে বিশ্বাস হারিয়েছে, তাদের মধ্যেও অনেক কমবেশি পরিবর্তন করে পাপ বিষয়ে রক্ষণশীল মতটি গ্রহণ করেছে অবশ্য কিছুকালের জন্যে। আমাদের কালে অংশত মনঃসমীক্ষার ফলে সব বিপরীত হয়ে গেছে। অরক্ষণশীলরাই যে শুধু প্রাচীন পাপ-তত্ত্ব মানেন না তা নয়, যারা এখনো নিজেদের রক্ষণশীল বলে বিশ্বাস করেন তারাও অনেকে মানেন না। বিবেককে এখন আর কোনও রহস্যময় কিছু বলে মনে করা হয় না। কারণ এতদিন তা রহস্যময় ছিল বলেই ঐশীবাণী বলে মনে করা হত। আমরা জানি যে বিবেক বিশ্বের বিভিন্ন অংশে বিভিন্নভাবে ক্রিয়া করে এবং উদারভাবে বলতে গেলে সব জায়গায় উপজাতিদের সংস্কৃতির সাথে তা অঙ্গাঙ্গী জড়িত, তা হলে কোনও ব্যক্তিকে যখন বিবেক দংশন করে তখন প্রকৃতপক্ষে কী ঘটে?

'বিবেক' শব্দটি স্বাভাবিকভাবে কয়েকটি আলাদা অনুভূতির অর্থবোধক, যার সহজতমটি হচ্ছে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়। পাঠক, আপনি নিশ্চয় সম্পূর্ণ দোষহীন জীবন কাটিয়েছেন, কিন্তু আপনি যদি এমন কোনও মানুষের কাছে জানতে চান যিনি কোনও সময় এমন অন্যায় কিছু করেছেন ধরা পড়লে যার শাস্তি হত। ধরা পড়া অবধারিত জানলেও অন্যায় কাজের জন্যে তিনি অনুতপ্ত হয়েছেন। আমি বলি না যে পেশাগত চোর সম্বন্ধেও একথা মিলে যাবে, কারণ কিছু পরিমাণ কারাবাসকে সে পেশাগত ঝুঁকি হিসাবেই গ্রহণ করবে। কিন্তু একথা প্রযোজ্য হতে পারে সম্মানিত অপরাধীদের বেলায়। যেমন কোনও ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, যিনি অবস্থার চাপে অর্থ আত্মসাৎ করেছেন অথবা কোনও ধর্মযাজক যিনি প্রলোভন

...ত হয়ে ইন্দ্রিয়কে সংযত করতে পারেননি। ধরা পড়ে যাওয়ার আশংকা কম ...লে তাঁরা অপরাধের কথা বিস্মৃত হতে পারেন। কিন্তু ধরা পড়লে অথবা পড়ার ...না দেখা দিলে তাঁদের মনে হয় ন্যায়ের পথেই তাঁদের থাকা উচিত ছিল এবং ...ইচ্ছা তাঁদের পাপের গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁদের মনে প্রখর চেতনা জাগিয়ে ...লে। দল থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার ভয়ও এই অনুভূতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ...নাও তাস খেলায় প্রতারণা করে অথবা প্রতিশ্রুত ঋণ পরিশোধ করে না সে ...ধরা পড়ে, তাহলে দলবদ্ধ লোকের তিরস্কারের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থনের ...নিজের মধ্যে কিছুই খুঁজে পায় না। এ বিষয়ে সে ধর্মসংস্কারক, রাজদ্রোহী ...বীর সাথে তুলনীয় নয়। কারণ তাঁরা মনে করেন বর্তমানে যেভাবে তাঁদের ...করছে, আগামীদিন তাদের সেভাবেই শ্রদ্ধা জানাবে। বর্তমানে তাঁদের ...যাই ঘটুক আগামীদিন তাঁদের সমর্থন করবে। এই ব্যক্তিবর্গ জনগণের ...সত্ত্বেও নিজেদের অপরাধী মনে করেন না। কিন্তু যাঁরা প্রচলিত ...সম্পূর্ণ স্বীকার করেও তার বিরুদ্ধচারণ করেন, তাঁরা খুবই দুঃখ ভোগ ...। যদি সমাজ তাঁদের বহিষ্কৃত করেন এবং এই বিপদের ভয়ে অথবা বিপদ ...গেলে যে দুঃখ পান, তাতে সহজেই তাঁরা মনে করতে পারেন যে তাদের ...ছিল পাপ-পূর্ণ।

কিন্তু সর্বাধিক গুরুত্ববাহী যে পাপের চেতনা তার মূল খুব গভীরে। এই মূল ...হবে অবচেতনের ভিতর। জনগণের অননুমোদনের ভয়ে তা চেতনের ...দেখা দেয় না। চেতন অবস্থায় কিছু কাজ পাপরূপে চিহ্নিত হয় কিন্তু ...সাহায্যে তাকে দেখা যায় না। যখন একজন মানুষ এই ধরনের কাজ ...তখন তিনি অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। কিন্তু কেন তা বুঝতে পারেন না। ...হয় এইরকম লোক হওয়াই তাঁর উচিত ছিল যিনি পাপ বলে যা বিশ্বাস ...তা থেকে দূরে থাকতে পারেন। তিনি নৈতিকতার দিক থেকে শুধু তাঁদেরই ...করেন, যাদের অন্তর তিনি পবিত্র বলে মনে করেন। তিনি কমবেশি দুঃখের ...প্রমাণ দিতে পারেন যে তাঁর পক্ষে সন্ত হওয়া সম্ভব নয়। এই সাধুত্ব সম্পর্কে তাঁর ...তা সম্ভবত এই যে, তা সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে পালন করা প্রায় ...। ফলে একটা পাপবোধ নিয়েই তিনি জীবন কাটিয়ে দেন। মনে করেন যা ...তা তাঁর জন্যে নয় এবং মনে করেন ভাবাবেগপূর্ণ অনুতাপের ...ই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত।

...প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এর শিকড় লুকিয়ে আছে তার ছ'বছর বয়সের আগে ...মানী ও ধাত্রীর কাছ থেকে পাওয়া নীতিশিক্ষার মধ্যে। ঐ সময়ের আগেই ...শিখেছে শপথ করা অন্যায় এবং যতদূর সম্ভব নারীসুলভ ভাষা ছাড়া অন্য

ভাষা ব্যবহার না করা এবং খারাপ লোকেরাই মদ পান করে। ধূমপান উচ্চস্তরে
গুণাবলীর সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। তিনি শিখেছেন মিথ্যা কথা কখনো বলা উচিত
নয়। সবার উপরে যৌনাঙ্গ নিয়ে যে কোনওরকম কৌতূহল ঘৃণা কাজ। এইসব
তিনি মায়ের মতো বলেই জেনেছেন এবং সেই মতো তাঁর সৃষ্টিকর্তার মত বলেও
মনে করেছেন। মায়ের স্নেহভরা ব্যবহার অথবা মা যদি অবহেলা করেন তাহলে
ধাত্রীর স্নেহ তার জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ এবং তা লাভ করেছেন যখন পর্যন্ত তিনি
নৈতিক-বিধান ভাঙ্গার পাপী বলে পরিচিত হননি। অতএব তিনি সেইসব অনাচার
আচরণের সাথে যুক্ত হয়েছেন যা তাঁর জননী এবং ধাত্রী অনুমোদন করেন না।
ক্রমে তিনি বড় হয়েছেন এবং তাঁর এই নীতি-বিধান কোথায় থেকে এসেছে তা
ভুলে গেছেন। আর ভুলে গেছেন এইসব বিধি-বিধান না মানলে তাকে প্রথম
জীবনে কী কী শাস্তি পেতে হত। কিন্তু তারপরও তিনি সেসব ছুঁড়ে ফেলে দেননি
এবং এসব অমান্য করলে তার ভাগ্যে ভয়ানক কিছু ঘটতে পারে, সেই অনুভূতি
তার নষ্ট হয়নি। এইসব শিশুসুলভ নীতিশিক্ষার অধিকাংশের কোনও যৌক্তিক
ভিত্তি নেই এবং এই শিক্ষা এমন যে, সাধারণ মানুষের সাধারণ আচরণে তা
প্রয়োগ করাও চলে না। কোনও লোক যদি, যাকে 'খারাপ ভাষা বলে তা ব্যবহার
করে, উদাহরণস্বরূপ যুক্তিপূর্ণ দিক থেকে এমন কথা বলা চলে না যে, সে তেমন
ভাষা ব্যবহার করে না তার চেয়ে যে নিকৃষ্ট।' তা সত্ত্বেও বাস্তবে প্রত্যেকটি লোক
সন্ত সম্পর্কে কল্পনা করতে গিয়ে শপথ করা থেকে বিরত থাকা প্রয়োজনীয় তা
বলে মনে করে। যুক্তির আলোয় দেখলে এটি বুদ্ধিহীনতা ছাড়া অন্য কিছু নয়, মদ
এবং তামাক সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। মদ সম্পর্কে দক্ষিণের দেশসমূহে এই
মনোভাব দেখা যায় না, বরঞ্চ সেখানে এই মনোভাবে কিছু অপবিত্রতা রয়েছে।
কারণ আমাদের প্রভু এবং তাঁর প্রধান শিষ্যরা মদ্যপান করতেন। তামাক সম্পর্কে
কোনও ধারণা না রাখাই ভাল, যেহেতু তামাকের ব্যবহার জানার অনেক আগে
আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তদের আবির্ভাব হয়েছিল। কিন্তু এখানে যুক্তিপূর্ণ বিচার সম্ভব
নয়। তামাক পেলেও কোনও সন্ত তা খেতেন না। এই পর্যবেক্ষণের মূলে রয়েছে
কোনও সন্তের পক্ষে এমন কিছু করা সম্ভব ছিল না যা তাকে আনন্দ দান করতে
পারে। এটাই সর্বশেষ বিশ্লেষণ। সাধারণ নীতিবোধের মধ্যে এই তাপসিক
উপাদান সবার মনে অচেতনভাবেই প্রবেশ করেছে কিন্তু আমাদের নৈতিক
বিধানকে যুক্তিহীন করে তুলতে এই বোধ সবদিক থেকেই প্রভাব বিস্তার করেছে।
যুক্তিপূর্ণ নৈতিকবোধে যে কোনও লোকের আনন্দ লাভ প্রশংসনীয় এবং এমন কি
নিজেরও, যদি না তাকে নষ্ট করতে নিজেকে বা অপরকে একই সাথে
সমভারাক্রান্ত বেদনা দেওয়া না হয়। তাপসিকতার ধারণা থেকে যদি আমরা

...পাই, তবে আদর্শ ধার্মিক মানুষ তিনি-ই হবেন, যিনি সবরকম ভাল ...উপভোগ করার অনুমতি দেবেন, যদি না কোনও খারাপ কাজ সেই ...কে লঙ্ঘন করে না যায়। মিথ্যাভাষণের প্রশ্ন আবার তোলা যাক। আমি ...করি না পৃথিবীতে মিথ্যার আধিক্য রয়েছে এবং সত্যতা বৃদ্ধি পেলে ...আরো উন্নত থাকতে পারতাম। কিন্তু মিথ্যা কোনও ভাবেই সমর্থনযোগ্য ...কথা আমি অবশ্যই অস্বীকার করি এবং আমার মনে হয় প্রতিটি যুক্তিবাদী ...করেন। একদা গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণকালীন একটি ক্লান্ত খেঁকশিয়াল দেখেছিলাম ...শেষ অবস্থা। তবুও জোর করে দৌড়াচ্ছে প্রাণের ভয়ে। কয়েক মিনিট ...শিকারীদের সাথে দেখা হল। তারা জানতে চাইল আমি শিয়ালটিকে ...কি না। আমি বললাম, দেখেছি। তারা এরপর প্রশ্ন করল, শিয়ালটি কোন্ ...গেছে। তখন আমি মিথ্যা কথা বললাম। এখানে সত্য উচ্চারণ করলে আমি ...ভাল লোক হতাম বলে আমি মনে করি না।

...যৌনতার ক্ষেত্রে শৈশবের নৈতিক শিক্ষা সবচেয়ে ক্ষতিকর হয়। যদি ...কঠোর বাবা-মা কিংবা ধাত্রীর কাছে কোনও শিশু এই বিষয়ে প্রথাগত ...পেয়ে থাকে, তা হলে ছ'বছরের মধ্যেই তার মনে যৌনাঙ্গ এবং পাপের ...নিয়ে এমন ধারণা দৃঢ়প্রোথিত হয়ে যাবে যে, জীবনভর সেই শিক্ষা ...বিস্মৃত হবে না। এই বোধ অবশ্য ঈডিপাস কমপ্লেক্সে আরো দৃঢ় হয়, কারণ ...নারীকে সে শৈশবে সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছে তার সঙ্গে সবরকম স্বাধীন ...অসম্ভব। তার ফলে অনেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ নারীকে যৌন সম্পর্কে হীন ...এবং নিজেদের পত্নীরা যদি যৌন-সঙ্গমকে ঘৃণা না করে তবে তাদের ...করতে পারে না। অথচ স্ত্রী যদি কামশীতল হয়, তাহলে সহজাত প্রবৃত্তি ...তৃপ্তির সন্ধান করবে অন্য জায়গায়। তার ক্ষণিকের যৌনতৃপ্তি তাকে ...বোধে বিষাক্ত করে তোলে। তাই সে বিবাহ বা বিবাহ-বহির্ভূত কোনও ...সম্পর্ক নিয়ে সুখী হতে পারে না। আবার নারীদের বেলায় পবিত্র ...শিক্ষায় জোর দিলে একটি ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে। নারী তখন ...থেকেই স্বামীর সাথে যৌন সম্পর্কে দূরত্ব বজায় রেখে চলবে এবং তা ...আনন্দলাভ করতে ভয় পাবে। বর্তমানে অবশ্য এ বিষয়ে পঞ্চাশ বছর আগে ...অবস্থান ছিল তার পরিবর্তন ঘটেছে। একথা অবশ্য বলা যায় যে, ...শিক্ষিতদের ভিতর পুরুষদের যৌনজীবন আরো বেশি বিকৃত এবং ...উঠেছে নারীদের পাপবোধের তুলনায়।

...ছোটদের যৌনতা বিষয়ে যে প্রাচীন শিক্ষা চলে আসছে তার কুফল নিয়ে ...মধ্যে একটা ব্যাপক সচেতনতা এর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এই

বিষয়ে পালনীয় সঠিক নিয়ম সরল। শিশু বয়ঃসন্ধিতে না পৌঁছানো পর্যন্ত বা মেয়ে, যেই হোক তাকে যৌনতার ব্যাপারে কোনও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া না এবং একই সাথে স্বাভাবিক দৈহিক ক্রিয়া ঘৃণার যোগ্য এমন কোনও তার মনে ঢুকিয়ে দেওয়া থেকে দূরে থাকতে হবে। নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার যখন এগিয়ে আসবে, তখন মনে রাখতে হবে সেই শিক্ষা যেন যুক্তিপূর্ণ হয় প্রত্যেক বিষয় তাকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। বর্তমান গ্রন্থে আমি বিষয়ে কিছু বলতে চাই না। এই গ্রন্থে আমি বরং যুক্তিহীন পাপের জাগানো অবিজ্ঞজনোচিত শিক্ষা থেকে যে সব কুফল দেখা দেয়, তা কীভাবে দূর করতে পারে তা নিয়েই বলতে চাই।

পূর্ববর্তী অধ্যায় সমূহে আমাদের যে সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাই। সমস্যাটি হল আমাদের সচেতন চিন্তা যে যুক্তিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ন্ত্রণ দিকে অবচেতনভাবে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য করা। কোনও মানুষের কখনো মানসিক অবস্থায় ভেসে যাওয়া উচিত নয়। তাতে বারবার এই মুহূর্তে পরক্ষণেই কোনও না কোনও জিনিসে বিশ্বাসের বদল হয়। ক্লান্তিতে, মদ্যপানে এবং অন্যান্য কারণে পাপের চেতনা বেড়ে যায় সচেতন ইচ্ছাশক্তি হয়ে পড়ে বলে। এইসব মুহূর্তে (মদ্যপান করার সময় ছাড়া) মানুষ যা করে তা তার নিজের উচ্চতর সত্ত্বার প্রত্যাদেশরূপে মনে করা হয়, "শয়তান রুগ্ন ছিল, শয়তানটা সন্ত হয়ে যাবে।" কিন্তু এটা ভাবা অযৌক্তিক যে সবল দুর্বল মুহূর্তে অতিরিক্ত অর্ন্তদৃষ্টি লাভ হয়। দুর্বল মুহূর্তে শিশুসুলভ সব কল্পনা উড়িয়ে দেওয়া কঠিন। কিন্তু তার জন্যে প্রাপ্তবয়স্ক লোকের, যে নিজের ওপর পূর্ণ আস্থাশীল, তার বিশ্বাসকে বাদ দিয়ে সেই শিশুসুলভ বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য মনে করার কোনও কারণ নেই। পক্ষান্তরে কোনও ব্যক্তি যদি তার বিচারশক্তিতে আস্থাশীল হয়ে কিছু বিশ্বাস করে, তাহলে সেই বিশ্বাস তার সবসময়ের মানদণ্ডরূপে গণ্য হওয়া উচিত। সঠিক কৌশল প্রয়োগ করতে পারা অবচেতনতার উৎস থেকে উৎসারিত শিশুসুলভ অভিভাবনাগুলিকে দমন সম্পূর্ণভাবেই সম্ভব, এমন কী তার আধেয়কেও পরিবর্তন করা যায়। যখন আপনি, যুক্তি খারাপ ভাবছে না, এমন কাজের জন্যে দুঃখ অনুভব করতে শুরু করবেন, তখনই আপনি দুঃখের যে অনুভূতি তার কারণ কী তা পরীক্ষা দেখবেন এবং সেসব যে অবাস্তব তা নিজেকে বিস্তারিতভাবে বোঝাবেন। আপনার সচেতন বিশ্বাস এমন শক্ত এবং জোরালো হবে, যাতে তা আপনার অবচেতনায় ছাপ রেখে যায়, যা আবার এত শক্ত হবে যাতে আপনার জননী বা ধাত্রীর কাছ থেকে পাওয়া ছাপকে অতিক্রম করে যেতে পারে

...একবার যুক্তি এবং পরক্ষণেই আবার অযুক্তির মুহূর্তে ফিরে গিয়ে সন্তুষ্ট ...না। অযৌক্তিকতাকে কাছ থেকে দেখুন, দৃঢ়সংকল্প হোন যে তাকে ...সম্মান করবেন না এবং কোনওভাবে আপনাকে প্রভাবিত করতে দেবেন ...তা আপনার চেতনায় অর্থহীন চিন্তা বা অনুভূতি চাপাতে চেষ্টা করবে ...সমূলে তাদের উপড়ে ফেলবেন, তাদের পরীক্ষা করবেন এবং ত্যাগ ...। অর্ধেক যুক্তি এবং অর্ধেক শিশুসুলভ বুদ্ধিহীনতার দোলায় নিজেকে ...মান প্রাণীর মতো করে তুলবেন না। আপনার শৈশব যাঁরা নিয়ন্ত্রিত ...তাদের স্মৃতির প্রতি যদি অশ্রদ্ধা দেখাতে হয় তার জন্যে ভয় পাবেন ...আপনার কাছে তখন কঠোর এবং জ্ঞানী মনে হয়েছিল। কারণ শৈশবে ...দুর্বল এবং বুদ্ধিহীন ছিলেন। এখন আপনি তা নন, তাই আপনার দায়িত্ব ...জোরে যে সম্মান এখনো দেখাচ্ছেন তা তাদের প্রাপ্য কিনা তা বিবেচনা ...জন্যে তাদের আপাত দৃশ্যশক্তি ও বুদ্ধিমত্তাকে পরীক্ষা করে দেখা। ...ঐতিহ্য পরম্পরায় যে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তাতে পৃথিবীর কোনও ...হয়েছে কিনা এই প্রশ্ন গুরুত্ব সহকারে নিজেকে করুন। ভেবে দেখুন ...আচার-স্বীকৃত ধার্মিক ব্যক্তির মনন-সৃষ্টিতে কতটুকু বিশুদ্ধ কুসংস্কারের ...প্রয়োজন হয়েছে এবং আরো ভেবে দেখুন, অবিশ্বাস্য সব নিষেধবিধি ...কাল্পনিক নৈতিক বিপদসমূহ কীভাবে ঠেকানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু ...দের যেসব বাস্তব বিপদের মুখে পড়ার ভয় আছে তাদের ব্যাপারে ...উল্লেখ পর্যন্ত নেই। কোন্ কোন্ ক্ষতিকর কাজের দিকে সাধারণ লোকের ...থাকে? আইনকে বাঁচিয়ে ব্যবসাতে প্রতারণা, অধীনস্থ কর্মচারীদের প্রতি ...সাধারণ, স্ত্রী এবং সন্তানদের প্রতি নিষ্ঠুরতা, প্রতিযোগীদের প্রতি বিদ্বেষ, ...দ্বন্দ্ব হিংস্রতা— এইসবই হল সত্যিকারের অন্যায়, যা সম্মানীয় এবং ...নাগরিকদের মধ্যে সাধারণভাবে দেখা যায়। এইসব অন্যায়ের সাহায্য ...একজন মানুষ তার চারপাশের পরিবেশে দুর্দশা বিস্তারিত করে এবং ...ধ্বংস করার কাজে যতটুকু দেবার তা দিয়ে দেয়। তবুও, এই ধরনের ...যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন কিন্তু এসব কাজের জন্যে নিজেকে সমাজ ...অথবা স্বর্গীয় সুবিধা পাওয়া থেকে বঞ্চিত মনে করে না। ...তার দুঃস্বপ্নের মধ্যে আনত দৃষ্টিতে তিরস্কার রত তার মায়ের মূর্তিটি ...না। কেন তার অবচেতন নৈতিকতা যৌক্তিকতা থেকে এভাবে বিচ্ছিন্ন? ...শৈশবে সে যাদের হাতে মানুষ হয়েছে তারা যে নৈতিকতায় বিশ্বাসী ছিল ...কোনও যুক্তি নেই। কারণ এই নৈতিকতা সমাজের প্রতি ব্যক্তির কর্তব্য ...শিক্ষা থেকে জন্ম নেয়নি। কারণ এ হচ্ছে প্রাচীন যুক্তিহীন নিষেধবিধির

ছোট ছোট খণ্ড দিয়ে তৈরী। কারণ মরণাপন্ন রোমান সমাজকে যে আত্মিক [illegible] পীড়িত করেছিল এর মধ্যেই নিহিত ছিল এর উপাদান। আমাদের নামমাত্র নৈতিকতাবোধ তা যাজক এবং মানসিকভাবে দাস মনোবৃত্তির নারীদের [illegible] সময় এসে গেছে বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনে স্বাভাবিক ভূমিকা যাদের গ্রহণ [illegible] হবে তাদের এই যন্ত্রণাকর এবং বাতিল জিনিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার [illegible] নেওয়ার।

কিন্তু যদি ব্যক্তিগত সুখকে বাড়ানো এবং মানুষকে একই মানে বাস [illegible] সক্ষম করার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহকে সফল করতে হয়, তাহলে দুই মানের [illegible] দোলায়িত না হয়ে যুক্তির সাহায্যে যা পাওয়া যায় তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা [illegible] অনুভব করা প্রয়োজন। অধিকাংশ মানুষই শৈশবের সব কুসংস্কার হালকা [illegible] ত্যাগ করে মনে করে তাদের আর কিছু করণীয় নেই। তারা বুঝতেই পারে [illegible] যে, সেসব কুসংস্কার এখনো তাদের মনের গভীরে অজ্ঞাতবাস করে রয়েছে [illegible] যুক্তির পথে কোন্ বিশ্বাসে পৌছাতে হবে তা নিয়ে ভাবা উচিত। যাতে তা [illegible] কী ঘটতে পারে তা আগেই অনুধাবন করা যায়। নিজের মধ্যেই সন্ধান করা [illegible] নতুন বিশ্বাসের সাথে অসঙ্গতিকর কোনও পূর্ব বিশ্বাস এখনও বেঁচে আছে কিনা [illegible] পাপের চেতনা প্রখর হলে এবং মাঝে মাঝে তা হবেই, তখন তাকে প্রত্যাদেশ [illegible] মহৎ কিছুর জন্যে আহ্বান মনে না করে তাকে একটি রোগ এবং দুর্বলতা [illegible] মনে করা উচিত। এর ব্যতিক্রম হবে শুধু পাপের চেতনা যেখানে যুক্তিপূর্ণ [illegible] দ্বারা নিন্দিত হয় সেখানে। মানুষ নৈতিকতাবর্জিত হোক এমন কোনও পরামর্শ [illegible] আমি দিচ্ছি না, আমি শুধু বলছি তারা যেন কুসংস্কারজাত নৈতিকতা পরিহার [illegible] করে। কারণ এটি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস।

কিন্তু কোনও মানুষ যদি তার নিজের যৌক্তিক বিধান ভঙ্গ করে তার পরে [illegible] পাপের চেতনা জীবনকে উন্নততর করার শ্রেষ্ঠ উপায় কি না, তা নিয়ে [illegible] সন্দেহ রয়েছে। পাপ-চেতনার মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা হীন। যাতে কোনও [illegible] আত্মমর্যাদা নেই। আত্মমর্যাদার অভাব কখনো কারো মঙ্গল করেনি। যুক্তিবাদী [illegible] মানুষ নিজের অবাঞ্ছিত কাজকে, অপরের অবাঞ্ছিত কাজকে যে দৃষ্টিতে দেখে [illegible] সেভাবেই দেখবে। যে কাজগুলি ঘটনার কারণে সৃষ্ট এবং তা যে অবাঞ্ছিত [illegible] ভালভাবে উপলব্ধি করে তাকে এড়াতে হবে, অথবা যেখানে তা সম্ভব তা [illegible] ঘটনার কারণে ঘটতে পারে, তা এড়াতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে পাপের চেতনা উন্নত জীবনের সহায়ের কারণ না হয়ে ঠিক [illegible] বিপরীতই হয়। মানুষকে তা অসুখী করে, নিজেকে হীন বলে ভাবতে শিখায় [illegible]

...খী হওয়ার কারণে সে প্রায় হয়তো অন্যদের ওপর অতিরিক্ত দাবি জানাতে ...ক, যা তাদের সাথে তার ব্যক্তিগত সম্পর্কে বাধা সৃষ্টি করে। নিজেকে হীন মনে ...াতে তার চেয়ে উন্নত লোকদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। তার পক্ষে প্রশংসা ...া কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু ঈর্ষা করা সহজ হয়ে যায়। সে সবার কাছে বিরক্তিকর ...া ওঠে এবং ধীরে ধীরে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। অন্যের প্রতি উন্মুক্ত ও উদার ...ভাব শুধু যে অন্যকেই আনন্দ দেয় তা নয়। যে এর অধিকারী তার জন্যেও ...ম সুখের উৎস। এই ধরনের লোক সাধারণত সকলেই পছন্দ করে। কিন্তু ...শব চেতনা যার মনকে অধিকার করে থাকে তার পক্ষে এই ধারণা গড়ে তোলা ...া কম ক্ষেত্রেই সম্ভব। এটা হচ্ছে সুস্থিরতা এবং আত্মবিশ্বাসের ফল। এটা সব ...নের সংহতি দাবি করে, যা দিয়ে আমি চেতনার সবগুলি স্তরকে বোঝাতে চাই— ...ন, অবচেতন, অচেতন, সব, যারা একত্রে সম্মিলিতভাবে ক্রিয়া করবে। সব ...া নিজেদের মধ্যে বিরোধিতায় মেতে থাকবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সমন্বয় ...শিক্ষিত শিক্ষার দ্বারা সম্ভব হয়। কিন্তু শিক্ষা যেখানে জ্ঞানশূন্য, সেখানে এই কাজ ...া কঠিন। এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে চেষ্টা করেন মনোবিশ্লেষকরা। কিন্তু আমার ...ণা প্রায় সব ক্ষেত্রেই রোগীরাই এই কাজ করতে পারে, অবস্থা চরম পর্যায়ে ...লেই বিশেষজ্ঞের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। একথা বলা উচিত নয়; "আমার এসব ...াত্ত্বিক শ্রম দেওয়ার মতো সময় নেই। আমি ব্যস্ত মানুষ। আমার সময় কাজের ...া ঠাসা, মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারে কাজ করার জন্যে আমি আমার অচেতন মনের ...র ভার দিলাম।" ব্যক্তিত্ব নিজের মধ্যে দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেলে যে পরিমাণ ...ণা ও কর্মদক্ষতা নষ্ট করে এমন অন্য কিছু করে না। যে সময় ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন ...ন অংশকে সমন্বয় করার কাজে খাটে, সেটাই হল কার্যকরভাবে সময়-ব্যয়। ...ি বলছি না কেউ প্রতিদিন নিয়মি একঘণ্টা সময় আত্মসমীক্ষার জন্যে তুলে ...ক। আমার মতে এটি শ্রেষ্ঠ উপায় নয় কারণ এতে আত্মসমীক্ষার জন্যে তুলে ...ক। আমার মতে এটি শ্রেষ্ঠ উপায় নয় কারণ এতে আত্মমগ্নতা বাড়ায় এবং ...ন আরোগ্যযোগ্য ব্যাধির একটা অংশ। সুসমন্বিত ব্যক্তিত্ব সবসময় বহির্মুখী। ...ি যা বলতে চাই, তা হল, মানুষ তার মনকে স্থির করবে দৃঢ়তার সাথে, যা সে ...ভাবে বিশ্বাস করে তা নিয়ে। এর বিপরীত অযৌক্তিক বিশ্বাসকে প্রশ্নাতীত ...তে অনুমতি দেবে না অথবা তার ওপর কোনওরূপ প্রভাব বিস্তার করতে ...া, যদি তা ক্ষণকালের জন্যেও হয়। এটা হচ্ছে যুক্তির সাথে নিজের মুখোমুখি ...ার প্রশ্ন। যেসব মুহূর্তে প্রলুব্ধ হতে হয় শিশুর মতো হতে। কিন্তু যুক্তির যদি ...ন জোর থাকে তাহলে সময় খুব কম লাগে। সুতরাং এই কালক্ষেপণকে অগ্রাহ্য ...চিত।

অনেক মানুষের কাছে যৌক্তিকতা পছন্দনীয় নয়। যেখানে এই রকম অ... সেখানে যেসব কথা আমি বলছি তা অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হ... অনেকের এমন ধারণা রয়েছে যে, যুক্তিকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিলে ... মনের গভীরতর সব আবেগকে হত্যা করে। আমার মনে হয় এই বিশ্বাস মানু... জীবনে যুক্তি স্থান নিয়ে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা থেকেই জন্ম নিয়েছে। আবেগ সৃষ্টি ক... যুক্তির কাজ নয়। যদিও মানুষের মঙ্গলের পথে বাধা সৃষ্টিকারী আবেগকে খুঁ... বের করা এবং প্রতিহত করা তার কাজের একটা অংশ। যৌক্তিক মনস্ত... কাজের অংশ হল সন্দেহাতীতভাবে ঘৃণা এবং ঈর্ষাকে বন্ধ করার উপায় খুঁজে ... করা। এটা একটা ভুল ধারণা যে এইসব আবেগকে কমিয়ে আনার সাথে স... যুক্তি নিন্দা করে না এমন সব আবেগের শক্তিও কমিয়ে দেওয়া হয়। আবেগ... ভালবাসায়, বাৎসল্যে, জনহিতকর কাজে, শিল্প অথবা বিজ্ঞানের প্রতি নি... এমন কিছু নেই যা যুক্তি কমাতে চাইবে। যুক্তিবাদী মানুষ যখন এইসব আবে... অনুভব করবে, সে খুশী হবে যে সে এইসব অনুভব করে, যার শক্তি কমানো... কোনও কারণও নেই, কারণ এইসব আবেগ সুন্দর জীবনেরই অঙ্গ, যে জীবন ... বয়ে আনে নিজের জন্যে এবং অন্যের জন্যেও। এইসব আবেগের মধ্যে ... অযৌক্তিকতা নেই এবং অনেক যুক্তিহীন মানুষ শুধুমাত্র গতানুগতিক আবেগ... অনুভব করে। কোনও মানুষের ভয় পাওয়ার কারণ নেই যে, সে যদি নিজে... যুক্তিবাদী করে তোলে তাহলে জীবন আনন্দহীন হয়ে যাবে। বরং যৌক্তিক... মূলত অভ্যন্তর সমন্বয়ভাবে চিন্তা করতে পারে। সে নিজের শক্তি স্বাধীন... কাজে লাগাতে পারে। পক্ষান্তরে যে মানুষ অভ্যন্তর দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত সে তা ... না। নিজের মধ্যে আবদ্ধ থাকার মতো স্বাদহীন আর কিছু নেই। যেমন নেই শ... ও মনোযোগ বাইরে ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো আনন্দময় আর কিছু।

আমাদের ঐতিহ্যবাহী নৈতিকতা খুব বেশি আত্মকেন্দ্রিক এবং পাপের ... সম্পর্কে ধারণা এই অজ্ঞানতাজাত আত্মকেন্দ্রিকতারই একটা অংশ। ... নৈতিকতার মাধ্যমে সৃষ্ট অবস্থার ভিতর দিয়ে যে মানুষ কখনো পার হয়ে যা... তার কাছে যুক্তি অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। কিন্তু যে একবার অন্তত ... চেতনায় রোগগ্রস্ত হয়েছে তাকে সারিয়ে তুলতে যুক্তি প্রয়োজনীয়। মনে ... মানসিক বিকাশের জন্যে এই রোগের প্রয়োজন রয়েছে। আমার মনে হয় ... মানুষ যুক্তির সাহায্যে এই অবস্থা পার হয়ে গেছে সে একটা উচ্চতর স্তরে ... গেছে এবং যে মানুষের এই রোগ এবং তার নিরাময় সম্বন্ধে কো... অভিজ্ঞতা অর্জন করা হয়নি সে ততটা উচ্চস্থানে উঠতে পারে নি। আমা... সময়ে যৌক্তিকতার প্রতি ঘৃণা খুবই বিস্তৃত। যার কারণ মূলত এই যে, ...

...ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আমাদের ধারণা অত্যন্ত অগভীর। যে মানুষ নিজেকে নিজের ...ায়ী করে তোলে সে উদ্দীপক এবং চিত্তহরণকারী জিনিসের প্রতি মোহ অনুভব ...। সে জোরালো উত্তেজনা পছন্দ করে কিন্তু তার কোনও উপযুক্ত কারণ নেই। ...ক্রিয়াকলাপ করে নিজেকে বহির্মুখী করার জন্যে এবং চিন্তা করার বেদনাময় দায় ...ক থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে। যে কোনও ধরণের উত্তেজনা তার কাছে ...কর্মের প্রমত্ততা এবং সে আসল সুখ কী তা কল্পনা করতে পারে না বলে। ...থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাওয়া তার কাছে একমাত্র প্রমত্ততার ভিতর দিয়ে ...ধরণেই মনে করে, এটা মনের গভীর স্তরে অবস্থিত একটি রোগের লক্ষণ। ...কোনো এই রোগ নেই সেখানে মেধার ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকলে তা থেকে ...মতো আনন্দ লাভ করা যেতে পারে। যে মুহূর্তে মন সবচেয়ে ক্রিয়াশীল থাকে, ...কাজ কম হয় তখনই গভীর আনন্দের স্পর্শ পাওয়া যায়। যে আনন্দের জন্য ...করা প্রয়োজন হয়, তা সে যে ধরণেরই হোক, সে আনন্দ কৃত্রিম এবং ...ধারণা। সত্যিকার তৃপ্তিদায়ক আনন্দের সাথে থাকে মানসিক শক্তির পূর্ণ ...ব এবং যে পৃথিবীতে আমরা জীবন কাটাই তার সম্পর্কে পূর্ণতম জ্ঞান।

৮

নির্যাতন-বাতিক

চরম আকারের নির্যাতন-বাতিক উন্মত্ততার একটি স্বীকৃত রূপ। কোনও মানুষের ধারণা অন্যেরা তাকে হত্যা করতে চায়, অথবা বন্দী করে অথবা অন্য কোনও গুরুতর ক্ষতি করতে চায়। এই কাল্পনিক নির্যাতনের কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করার ইচ্ছা তাদের প্রায়ই হিংসামূলক কাজে প্ররোচিত করে, যে জন্যে তাদের স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই ধরনের মস্তিষ্কবিকৃতির মতো এটা একটি বিশেষ প্রবণতার বাড়াবাড়ি মাত্র। যেসব মানুষ স্বাভাবিক বলে পরিচিত তাদের মধ্যে দেখা যায় না তা নিয়ে চরম অবস্থাসমূহ নিয়ে আমি আলোচনা করব না কারণ তা মনোবিদদের। আমি মৃদুতর অবস্থাসমূহ নিয়ে কিছু বলব। কারণ সেগুলি প্রায় ক্ষেত্রে সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, আর সেসব নিশ্চিতরূপে উন্মত্ততার সীমায় যখন না রোগী নিজেই তার ব্যবস্থা করতে পারে, অবশ্য যদি তাকে সঠিক পথে সম্মত করানো যায় এবং সে বুঝতে পারে এই বাতিকের উদ্ভব তার নিজের থেকেই হয়েছে, অন্যের কল্পিত শত্রু বা নিষ্ঠুরতা থেকে নয়।

নারী বা পুরুষ, এমন এক ধরনের মানুষের সাথে আমরা পরিচিত। চিরদিন নিজেদের অকৃতজ্ঞতা, নিষ্ঠুরতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার কাছে হত বলে মনে করে। এই ধরনের মানুষদের ক্ষেত্রে তাদের কথা প্রায় সত্য বলে মনে হয় এবং যারা তাদের বেশিদিন ধরে চেনে না তাদের কাছ থেকে সহানুভূতি পায়। স্বাভাবিকভাবে তারা আলাদা আলাদা ভাবে যেসব পায় তার মধ্যে অসম্ভাব্য কিছুই থাকে না। যেসব দুর্ব্যহারের কথা তারা বলে তা নিশ্চয় মাঝে মাঝে ঘটে থাকে। কিন্তু যারা তাদের হাতে এইরকম যন্ত্রণা ভোগ করে দুর্জনদের সংখ্যা দিনে দিনে এত বাড়তে থাকে যে, শেষ পর্যন্ত শ্রোতার কাহিনীর সত্যতা নিয়ে সন্দেহ জাগে। সম্ভাবনা রীতির নিয়মে কোনও সমাজে বিভিন্ন ধরনের যেসব লোক বাস করে তারা সারা জীবন না দুর্ব্যবহার পায়। যদি কোনও বিশেষ গোষ্ঠীর একজন লোক, তার নিজের নিহিত থাকার সম্ভাবনা বেশি এবং হয় সে যে যন্ত্রণা ভোগ করেনি তা করছে বলে কল্পনা করছে অথবা অচেতনভাবে এমন ব্যবহার করছে অন্যের মনে অনিয়ন্ত্রণীয় বিরক্তির উদ্রেক হচ্ছে। অভিজ্ঞ লোকেরা নিজেদের বিশ্বের দ্বারা উৎপীড়িত বলে নিজেদের মনে করেন, তারা

[illegible] দেখে এবং তাদের সহানুভূতি না পেয়ে এই হতভাগারা মনে করে [illegible] একটি লোক তাদের বিরুদ্ধে চলে গেছে। এ অবস্থার প্রতিবিধান সহজ নয়, [illegible] তা সহানুভূতি পেলে যেমন, সহানুভূতি না পেলে তেমন বেড়েই যায়। [illegible]-বাতিকগ্রস্ত মানুষ যখন দেখে যে তার দুর্ভাগ্যের কাহিনী বিশ্বাস করা [illegible] তখন সে তা আরও অলংকৃত করে বলতে থাকে এবং একসময় তা [illegible] যোগ্যতার শেষ সীমায় পৌঁছে যায়। অন্যদিকে সে যদি দেখে তার কথা [illegible] করা হচ্ছে না, তখন সে তার প্রতি মানুষের বিচিত্র ধরনের নির্দয়তার [illegible] উদাহরণ সেই লোকের মধ্যে দেখতে পায়। এই রোগ এমন যে শুধু [illegible] পড়ার মাধ্যমে তার নিরাময় সম্ভব এবং সেই উদ্দেশ্য সফল করতে হলে এই [illegible] রোগীর মনেও প্রতিষ্ঠা করাতে হবে। এই অধ্যায়ে আমি কিছু সাধারণ [illegible] দেব, যার সাহায্যে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের মধ্যে কী পরিমাণ [illegible] বাতিক রয়েছে (যা থেকে সকলেই কমবেশি ভুগছে), তা সন্ধান করতে [illegible] এবং তাদের চিহ্নিত করা গেলে পরিত্যাগ করাও সহজ হবে। সুখের [illegible] এটি একটি প্রয়োজনীয় অংশ। কারণ, প্রত্যেকেই আমাদের প্রতি খারাপ [illegible] করে, এই কথা যদি আমরা সবসময় ভাবি, তা হলে সুখী হওয়া [illegible] অসম্ভব।

[illegible] পূর্ণ জল্পনা নিয়ে প্রায় প্রত্যেকটি লোক যে ধারণা পোষণ করে, তাতে [illegible] যায় যুক্তিহীনতার একটি সর্বজনীন ধরণ পরিচিতদের সম্পর্কে এমন কি [illegible] সম্পর্কে বিদ্বেষপূর্ণ রটনা প্রচার করার লোভ কম লোকেই সংবরণ করতে [illegible] শুধু যখন মানুষ তার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রচারের কথা শোনে তখন ক্ষুব্ধ এবং [illegible] হয়। একথা তারা মনেই করে না যে, তারা যেমন অন্যের বিরুদ্ধে প্রচার [illegible] তারাও তেমনি তাদের বিরুদ্ধে একই কাজ করে। এই ধারণা মৃদু স্তরের। [illegible] এর আধিক্য ঘটলে মানুষ নির্যাতন-বাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আমরা নিজেদের [illegible] কোমল ভালবাসা এবং গভীর সম্মান বোধ করি অন্যদের কাছ থেকেও [illegible] কামনা করি। আমরা এ কথাটা ভাবি না যে, আমরা অন্যকে নিয়ে [illegible] করি, অন্যেরা আমাদের সম্পর্কে ভাল কিছু চিন্তা করুক তা আমরা আশা [illegible] পারি না। এ রকম যে হয় না তার কারণ আমাদের যোগ্যতা অনেক বেশি [illegible] আর অন্যের যোগ্যতা, যদি কিছু থেকেও থাকে তবে তা শুধু বদান্য [illegible] ধরা পড়ে। কোনও না কোনও ব্যক্তি আপনার বিরুদ্ধে ভীষণ কিছু [illegible] কথা শুনলে আপনার মনে পড়ে যাবে তার বিরুদ্ধে উচিত এবং ন্যায্য, [illegible] করতে পারতেন তা থেকে নিরানব্বই বার বিরত থেকেছেন এবং ভুলে [illegible] শততম বারে একটা অসতর্ক মুহূর্তে তার সম্পর্কে সত্যি আপনি কী

ভাবেন তা প্রকাশ করে ফেলেছেন। তখন কিন্তু আপনার মনে হবে, এই কা আপনার সংযমের পুরস্কার? ক'বার আপনি মুখ খোলেন নি, সে বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। তিনি শুধু জানেন আপনি শততম বলে কী বলেছেন, তা হলে আমার ধারণা প্রথমেই প্রায় সব বন্ধুত্বের অবসান হয়ে যেত। দ্বিতীয় যে ফলটি পাওয়া যায় সেটি খুব চমৎকার হতে পারত। কারণ বন্ধুহীন জগৎ অসহ্য হয়ে উঠত এবং তখন আমরা পরস্পরকে যে সম্পূর্ণ কলঙ্কশূন্য মনে করি না, তা মিথ্যার আবরণে লুকিয়ে রাখার প্রয়োজন বোধ না করে পরস্পরকে ভালবাসতে শিখতাম। আমাদের বন্ধুদের অনেক ত্রুটি রয়েছে তা আমরা জানি। কিন্তু তবুও সাধারণভাবে তারা মনের মতো মানুষ এবং তাদের আমরা পছন্দ করি, কিন্তু তারাও অসহনীয়। আমরা আশা করি, তারা মনে করুক জগৎ সংসারে সব মানুষের ত্রুটি আছে, শুধু আমাদের নেই। যখন আমাদের ত্রুটির কথা স্বীকার করতে বাধ্য হই, তখন আমরা এই প্রত্যক্ষ ব্যাপারটার ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করি। সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন থাকার ধারণা কারও থাকা উচিত নয় এবং তার জন্যে তাদের অহেতুক দুর্ভাবনাও কিছু নেই।

নির্যাতন-বাতিকের শিকড় প্রবেশ করেছে আমাদের নিজেদের যোগ্যতাবিষয়ে অতিরঞ্জক ধারণার অতি গভীরে। ধরা যাক আমি একজন নাট্যকার, প্রত্যেকটি নিরপেক্ষ ব্যক্তির কাছে এটা নিশ্চয় স্পষ্ট যে আমি এই যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। তার পরেও কোনও কারণে আমার নাটক খুব কম অভিনীত হয় এবং যখন হয়ও, সফল হয় না। এই অদ্ভুত ঘটনার ব্যাখ্যা কি? স্পষ্টই বোঝা যায় কোনও না কোনও কারণে সকল ব্যবস্থাপক, অভিনেতা এবং সমালোচক একসাথে মিলে আমার বিরুদ্ধাচরণ করছে। এর কারণ আমার নিজের কাছে মহা গৌরবের। আমি নাট্যজগতের মহারথীদের পায়ে মাথা নোয়াতে অস্বীকার করেছি। আমি সমালোচকদের চাটুকারিতা করিনি। আমার নাটকসমূহে এমন সব স্পষ্ট কথা রয়েছে যা তাদের আঘাত করলে তা অসহনীয় হয়ে উঠবে। আর এই কারণে আমার অন্য সকলকে লঙ্ঘন করে যাওয়া যোগ্যতার স্বীকৃতি মেলে না।

এরপর ধরা যাক যন্ত্র আবিষ্কারের কথা। সে কোনও দিন তার আবিষ্কারের মূল্য অন্য কোনও ব্যক্তিকে দিয়ে পরীক্ষা করাতে পারল না। যন্ত্র উৎপাদকেরা ছকবাঁধা পথে চলে। নুতন কিছুতেই তাদের আগ্রহ নেই। আর তাদের নিজেদের যন্ত্র উদ্ভাবনের লোক রয়েছে, তারাই অস্বীকৃত নতুন নতুন প্রতিভার অনধিকার প্রবেশ রোধ করতে সফল হয়। অবাক হওয়ার কথা শিক্ষিত গোষ্ঠীর কাছে লেখার পাণ্ডুলিপি পাঠালে তাঁরা তা হারিয়ে ফেলেন অথবা না পড়েই ফেরত পাঠিয়ে দেন। যেসব ব্যক্তিদের কাছে আবেদন জানানো হয়, তাঁরা কোনও অজানা কারণে তার

পাত্তা দেন না। এসব ব্যাপারকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? বেশ বোঝা যায় [illegible] কিছু লোকের একটা মিলন সমিতি আছে। যাঁরা শুধু নিজেদের মধ্যেই [illegible] সব উদ্ভাবনের ফল ভাগ করে নিতে চান। যে লোক তাঁদের সমিতির [illegible] নন, তার কোনও কথা তাঁরা শোনেন না।

এরপর আরেকজন মানুষ যার অভিযোগ বাস্তব ঘটনার সাথে জড়িত এবং [illegible], কিন্তু সে তার অভিজ্ঞতার আলোকে তাকে সাধারণভাবে দেখে এবং এই [illegible] পৌঁছায় যে জগতের চাবি তার দুর্ভাগ্যের মধ্যেই রয়েছে। আমরা মনে [illegible] পারি সে হয়তো গুপ্তচর বিভাগের কোনও কলঙ্ক সম্পর্কে জানতে পেরেছে [illegible] সরকারের স্বার্থে গোপন থাকা প্রয়োজন। তার পক্ষে এই উদ্ভাবনের জন্যে [illegible] পাওয়া কঠিন। কিন্তু এই কলঙ্ক কাহিনী যদিও তাকে উত্তেজিত করেছে যারা [illegible] কাছে মহৎ প্রাণ মানুষ বলে বিবেচিত, তাঁরা এর প্রতিকারে সামান্যতম ব্যবস্থা [illegible]ও স্বীকৃত নন। তার বর্ণিত ঘটনা যথার্থ হলেও তার ধারণা হল, নানা [illegible]কে সমর্থন দিয়ে যারা ক্ষমতাশালী হয়েছে সেইসব অপরাধ চাপা দিয়ে [illegible]ই তারা সারাক্ষণ নিজেদের ব্যস্ত রাখে। এ ধরনের রোগীদের সারিয়ে [illegible] বেশ কঠিন, কারণ দৃষ্টিভঙ্গীতে আংশিক সত্যতা থাকে। অনেক বেশি [illegible] তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলেও প্রত্যক্ষভাবে যেটুকুর সংস্পর্শে তারা [illegible], তাই তাদের মনে স্বাভাবিকভাবে গভীর প্রভাব রেখে দিয়ে গেছে, এটা [illegible] ভুল মাত্রাজ্ঞান দেয়। ফলে যা ঘটে, তা হল, সাধারণ ঘটনার চেয়ে [illegible] ঘটনায় তারা অহেতুক বেশি গুরুত্ব আরোপ করে।

[illegible] এক ধরনের লোক যারা প্রায়ক্ষেত্রে বাতিকগ্রস্ত হয়ে থাকেন, তাঁরা হলেন [illegible]পকারী। তাঁরা লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাদের উপকার করে বেড়ান এবং [illegible] কোনও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে ভয়ে, বিস্ময়ে শিউরে ওঠেন। পরের [illegible]কার করার উদ্দেশ্যকে যতটা দোষহীন ভাবা হয় বাস্তবে তা নয়। [illegible]লিপ্সার মধ্যে ছলনা আছে, এর রয়েছে নানা ছদ্মবেশ। অন্যের উপকার করা [illegible] বলে যা বিশ্বাস করা হয় তার থেকে যে আনন্দ পাওয়া যায়, প্রায় ক্ষেত্রে তার [illegible] থাকে সেই ক্ষমতালিপ্সা। লোকের 'উপকার করা'র অর্থ বলতে সাধারণভাবে [illegible] কোনও আনন্দ থেকে বঞ্চিত করা বোঝায়। যেমন মদ্যপান বা জুয়া খেলা [illegible] বলসতা বা অন্য কিছু। এক্ষেত্রে এমন একটা উপাদান দেখা যায় যার অনেকটা [illegible]ক নৈতিকতার উত্তম দৃষ্টান্ত। যেমন তাদের প্রতি আমরা বিরত থাকি [illegible] শ্রদ্ধা ধরে রাখার জন্যে। বলা যায় যারা ধূমপানের বিরুদ্ধে আইন তৈরীর [illegible] (এ ধরনের আইন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অনেক অঙ্গরাজ্যে আছে অথবা [illegible]) তাঁরা নিঃসন্দেহে ধূমপায়ী নন এবং তাদের কাছে অন্যের সুখদায়ক ধূমপান

বেদনার উৎস। তাঁরা যদি প্রত্যাশা করে থাকেন যারা পূর্বে ধূমপানের আসক্ত ছি তাদের একটি প্রতিনিধিদল এই জঘন্য দুষ্কর্ম থেকে তাদের মুক্তি দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ জানাতে আসবে, তাহলে তাঁরা হতাশ হবেন। এরপর তাঁরা ভাবতে পারেন যে, জনকল্যাণে তাঁরা জীবন সমর্পণ করেছেন এবং এজন্যে যাদের কৃতজ্ঞ হওয়ার সবচেয়ে বেশি কারণ ছিল তারাই সেটা প্রকাশ করার সুযোগ খুঁজে পেল না এবং এই বিষয়ে সবচেয়ে বেশি অসচেতন হয়ে রইল।

যে সব গৃহকর্ত্রী পরিচালিকাদের নৈতিকতা পাহারা দিয়ে রাখেন তাদেরও পরিচারিকাদের সম্পর্কে একই ধরনের মনোভাব দেখা যায়। কিন্তু বর্তমানে ভৃত্যসমস্যা এমন প্রবলরূপ নিয়েছে যে, পরিচারিকাদের প্রতি এ ধরনের অনুদার প্রদর্শন দেখা যায় না।

রাজনীতির উচ্চস্তরে একই রকম ঘটনা দেখা যায়। যে রাষ্ট্রনেতা ধীরে ধীরে সব ক্ষমতা নিজের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করেছেন এই জন্যে যে তিনি জনকল্যাণে উচ্চমাত্রায় এবং মহৎ কিছু করতে পারবেন, যার জন্যে তিনি নিজের আরাম পর্যন্ত ত্যাগ করেছেন এবং যার জন্যে তাঁর রাজনীতিতে প্রবেশ। সেই তিনি যখন দেখেন জনসাধারণ তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে তখন তাদের অকৃতজ্ঞতায় তিনি হতবাক হয়ে যান। একথা তাঁর মনেই হয় না যে তাঁর কাজের মধ্যে জনসেবার উদ্দেশ্য না থাকতে পারে অথবা ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করার আনন্দই তাঁকে সেসব কাজে প্রেরণা যুগিয়েছে। রাজনৈতিক সভায় বা দলীয় মুখপত্রে যেসব বাঁধা ভাষা ব্যবহার করা হয়, ক্রমে সেইসব তাঁর কাছে সত্যি বলে মনে হয় এবং তিনি দলীয় বাগাড়ম্বরকে উদ্দেশ্যের যথার্থ বিশ্লেষণ বলে ভুল করেন। বিরক্ত এবং মোহমুক্ত হয়ে পৃথিবী থেকে অবসর নেন যখন পৃথিবীও তার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। তিনি এই ভেবে অনুতাপ করেন যে কেন তিনি জনকল্যাণরূপী একটি কৃতজ্ঞতাবিহীন কাজে নেমেছিলেন।

এই উদাহরণগুলি থেকে চারটি সাধারণ নীতির পরিচয় পাওয়া যাবে, যদি তার সত্যতা ভালভাবে উপলব্ধি করা যায় তাহলে নির্যাতন-বাতিকের নিরাময় সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা দেবে। প্রথমটি হল : আপনার উদ্দেশ্য আপনার কাছে যতটা পরার্থবাদী বলে মনে হচ্ছে সবসময় ততটা নয়, সে কথা অবশ্যই মনে রাখবেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে : নিজের যোগ্যেতা সম্পর্কে অতিরিক্ত ধারনা পোষণ করবেন না। তৃতীয়টি হচ্ছ : নিজের সম্পর্কে আপনার যে পরিমাণ উৎসাহ আছে কাছ থেকে ততটা আশা করবেন না। এবং চতুর্থটি হচ্ছে : আপনাকে নিয়ে করার জন্যে অধিকাংশ লোক ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এমন কল্পনা করবেন না। আমি পরপর এইসব সাধারণ নীতি সম্পর্কে কিছু বলছি।

পরকল্যাণব্রতী এবং নির্বাহিকদের পক্ষে তাদের অভিপ্রায় নিয়ে সন্দেহ পোষণ করা প্রয়োজন। এই ধরণের ব্যক্তিদের কল্পনায় পৃথিবী বা তার অংশবিশেষ কী রকমের হওয়া উচিত তার একটা দৃশ্য থাকে এবং তাঁরা কখনো সঠিকভাবে, কখনো বা ভুলভাবে মনে করেন যে, সেই কল্প-দৃশ্য বাস্তবে রূপায়িত করলে সমগ্র মানবসমাজ অথবা তার কোনও অংশের পরম মঙ্গল হবে। কিন্তু তাঁরা একথাটা কখনো উপলব্ধি করতে পারেন না যে, যারা তাঁদের কাজের ফলে উপকৃত হবেন তাদের প্রত্যেকেরই, কে কেমন পৃথিবী চায়, সে সম্পর্কে তাদের নিজস্ব মতো প্রকাশের সমান অধিকার রয়েছে। নির্বাহী ব্যক্তিদের প্রত্যেকের নিশ্চিত ধারণা যে তাদের কল্পিত দৃশ্যই যথার্থ এবং তার সঙ্গে যার অমিল হবে সে ভুল। কিন্তু তার কল্পনার চরিত্র যে নিশ্চয়তা দিচ্ছে বাস্তবে তা যথার্থ কিনা তার কোনও প্রমাণ নেই। এর ছাড়া বিশ্বাস হচ্ছে প্রায় সময় দেখা যায় শুধুমাত্র আনন্দ লাভের ছদ্মবেশ যা মনে আসেছে যেসব পরিবর্তন তিনি ঘটাতে চান সেখান থেকে, যেখানে তিনি পাচ্ছেন তার কারণ। ক্ষমতাপ্রিয়তা ছাড়াও আরো একটি উদ্দেশ্য দেখা যায় তা হল লাভ, যে এসব ব্যাপারে প্রবলভাবে ক্রিয়া করে। আমি অভিজ্ঞতা থেকে বলছি পার্লামেন্টের সদস্যপদ প্রার্থী মহৎ, আদর্শবাদী যখন দেখেন যে ভোটদাতারা মনস্থির নিয়েছে যে তিনি নামের শেষে 'এম. পি' অক্ষর দুটি লেখার গৌরব অর্জন করার জন্যেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তখন তিনি তাদের বিশ্বনিন্দুকতার কথা দেখে বিস্মিত হন। নির্বাচন শেষ হওয়ার পর যখন তিনি চিন্তা করার সময় পান, তখন তাঁর মনে হয় হয়তো বিশ্বনিন্দুক ভোটদাতারাই সঠিক, আদর্শবাদ সাধারণ উদ্দেশ্যকেও একরকম অদ্ভুত ছদ্মবেশ পরিয়ে দেয়। সুতরাং আমাদের রাজনীতিবিদদের কাছে কিছু প্রকৃতনিন্দা অপ্রীতিকর হয় না। চলিত নৈতিকতা যারা জনকল্যাণ লোকের মনে জাগে, তাঁরা অধিকাংশ মানুষের সাধ্যের অতীত কাজ যারা নিজেদের মহৎ গুণের জন্যে গর্বিত তাঁরা প্রায় সময়েই কল্পনা করেন যে তাঁরা দুর্লভ আদর্শে তাঁরা পৌঁছে গেছেন। মহৎ ব্যক্তিদের বিভিন্ন কার্যধারার পেছনে আত্ম-স্বার্থের উদ্দেশ্য থাকে, তবে তার জন্যে দুঃখপ্রকাশের কোনও কারণ নেই, কেন না ব্যাপারটা অন্যরকম হলে মানুষ জাতি হিসাবে বেঁচে থাকতে পারত না। যে মানুষ অন্যেরা খেল কিনা শুধু তাই দেখতে সময় নষ্ট করে নিজের খাওয়ার কথা ভুলে যায়, তার বিনাশ অবধারিত। অবশ্য শক্তির পুনরায় সংগ্রাম করার জন্যেই শুধু সে কিছু খেয়ে নিতে পারে। এই কারণে খেলে তা সম্পূর্ণ হজম হয় কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কারণ এতে খাবারের যে রস নিঃসরণ হওয়ার কথা তা যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষরিত হয় না, তাই আমার কথা হচ্ছে খাওয়ার প্রয়োজনেই তার তা করা উচিত এবং ভোজনের সময় ভোজনের ইচ্ছায় আপ্লুত থাকা উচিত নয়।

এবং আহার সম্বন্ধে যা সত্যি, অন্য সব ব্যাপারেও তা সমান সত্যি। যা [illegible] করতে হবে তা প্রচুর পরিমাণে করতে হলে কোনও উদ্দীপনার সাহায্য প্রয়োজন এ[illegible] স্বার্থ জড়িত না থাকলে উদ্দীপনা আসে না। এদিক থেকে দেখতে গেলে আমি স্বার্থে[illegible] উদ্দেশ্যের সাথে আরো কিছু যুক্ত করতে চাই এবং তা হচ্ছে জৈব-সম্পর্কিত ব্যক্তি[illegible] স্বার্থ। যেমন শত্রুর বিরুদ্ধে স্ত্রী এবং সন্তানদের রক্ষা করার সহজ প্রবৃত্তি। এই মা[illegible] পরার্থবাদ মানুষের সাধারণ প্রকৃতির অংশ কিন্তু যে মাত্রা সাধারণ নৈতিকতা দাবি [illegible] তা খুব কম ক্ষেত্রেই খাঁটিভাবে পাওয়া যায়। যেসব ব্যক্তি নিজেদের নৈতিক উৎকর্ষ [illegible] নিয়ে উচ্চ প্রশংসা পেতে চান, তারা যে মাত্রায় আত্মস্বার্থহীনতা লাভ করেছেন [illegible] সন্দেহ। তা তারা অর্জন করেছেন বলে বিশ্বাস করেন। এবং এই কারণেই সত [illegible] মর্যাদালাভের চেষ্টার সাথে এক ধরনের আত্মপ্রতারণা যুক্ত হয়, আর তা থেকেই [illegible] সহজেই জন্ম নেয় নির্যাতন-বাতিক।

আমার চারটি সাধারণ নীতির দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছে, নিজের যোগ্য[illegible] সম্পর্কে অতিরিক্ত ধারণা পোষণ করা ঠিক নয়, তার নীতি সম্পর্কিত অংশে [illegible] পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু নৈতিক যোগ্যতা ছাড়া [illegible] যোগ্যতা সম্পর্কেও অতিরিক্ত ধারণা পোষণ করা ঠিক নয়। যে নাট্যকা[illegible] কোনও নাটকই সাফল্য লাভ করেনি তার শান্তভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া উ[illegible] সেগুলি ভাল নাটক নয়। এই ধারণা সমর্থনযোগ্য নয় বলে সাথে সাথে বা[illegible] করে দেওয়া ঠিক নয়। যদি দেখা যায় ধারণার সাথে বাস্তবের সঙ্গতি আছে, [illegible] হলে একজন পরিচয়দায়ক দার্শনিকের মতো তিনি তা গ্রহণ করবেন। এ[illegible] সত্যি যে যোগ্যতা স্বীকৃতি পায়নি এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে রয়েছে। কিন্তু স্বী[illegible] পেয়েছে এমন দৃষ্টান্ত তার চেয়ে অনেক বেশি। যদি কোনও প্রতিভা সমকালে [illegible] না পেয়ে থাকেন, তা হলেও যে পথে তিনি এগিয়েছেন তা থেকে দূরে সরে যা[illegible] উচিত নয়, স্বীকৃতি না পাওয়া সত্ত্বেও। পক্ষান্তরে তিনি যদি অহংসর্বস্ব প্রতিভাহী[illegible] ব্যক্তি হন, তিনি পথ থেকে দূরে সরে দাঁড়ালেই ভাল করবেন। এই দুইজনে[illegible] মধ্যে কে কোন দলের মধ্যে পড়েন তা জানবার কোনও উপায় নেই যদি এ[illegible] তাঁর শ্রেষ্ঠ কর্ম অস্বীকৃত হওয়ার জন্যে বেদনায় আহত হয়ে থাকেন। আপনি যদি [illegible] প্রথম দলে পড়েন তাহলে আপনার অধ্যবসায়কে বলব বীরোচিত। যদি দ্বি[illegible] দলের হন তাহলে বলব হাস্যকর। আপনার মৃত্যুর শতবর্ষ পরে জানা যা[illegible] আপনি কোন্ দলভুক্ত ছিলেন। এর মধ্যে একটি পরীক্ষা করা যেতে পারে, যদি [illegible] তা অব্যর্থ সে কথা বলা যায় না, যদি নিজেকে আপনি একজন প্রতিভাবান ম[illegible] করেন কিন্তু প্রকাশকালে আপনি কী জরুরী তাগিদ অনুভব করেন কোনও ধারণা বা অনুভূতি তুলে ধরার জন্যে অথবা আপনি প্রশংসা অর্জনের ইচ্ছা থেকে তা[illegible]

[illegible] ? প্রকৃত শিল্পী তাঁর শিল্পকর্ম শেষ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং আশা করেন যে তাঁর কাজ প্রশংসিত হবে। কিন্তু কেউ যদি প্রশংসা নাও করেন তাহলেও তিনি তাঁর শিল্পরীতি পরিবর্তন করবেন না। কিন্তু যাঁর কাছে অন্যের প্রশংসা লাভ করাই মুখ্য, তার নিজের মধ্যে কোনও জোর নেই নিজস্ব কোনও শিল্পরীতি গঠনের। শিল্পকর্ম প্রশংসা না পেলে এমন ধরনের শিল্পীর সেই কাজ ছেড়ে দেওয়া উচিত। আরো সাধারণভাবে বলতে গেলে বলা যায়, জীবনে যে শাখাই আপনি বেছে নিন, যদি দেখেন যে আপনার পারদর্শিতা সম্বন্ধে আপনি যতটা উচ্চ ধারণা পোষণ করেন, অন্যেরা তা করছেন না, তাহলে নিশ্চিত মনে ভাববেনও না তারাই ভুল করছেন। আপনি যদি এইভাবে ভাবতে থাকেন, তাহলে সহজেই এই বিশ্বাসের শিকার হবেন যে, আপনার যোগ্যতা যাতে স্বীকৃতি না পায় তার জন্যে একটি ষড়যন্ত্র চলছে আর এই বিশ্বাসই, নিশ্চিত থাকুন যে আপনার জীবনে সুখের অন্তরায় হয়ে উঠবে। আপনার যোগ্যতা যতটা আপনি আশা করেছিলেন ততটা নয়। একথা মেনে নিতে মুহূর্তের জন্যে আপনি ব্যথাতুর হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু সে ব্যথাও একসময় শেষ হবে, তার পরেও আবার সুখী জীবন ফিরে আসা সম্ভব।

আমাদের তৃতীয় সাধারণ নীতি হচ্ছে অন্যের কাছ থেকে বেশি আশা না করা। আগে এটাই রীতি ছিল কোনও মহিলা দীর্ঘকাল রোগে শয্যাশায়ী থাকলে তিনি আশা করতেন অন্তত তার একটি কন্যা তার সেবাশুশ্রূষায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত করবে। তার জন্যে যদি মেয়েটিকে অবিবাহিতা থাকতে হয়, তাও। অন্যের কাছ থেকে এই ধরনের পরার্থপরতা কামনা করা যুক্তি বিরোধী। যে পরার্থবাদীর কাছে এই প্রত্যাশা যত ক্ষতির অহংবাদীর কাছে ততটাই ক্ষতি। অন্যের সাথে বিশেষ করে নিকটজন এবং প্রিয়জনদের সাথে ব্যবহারে একটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ, যদিও কথাটি সব সময় মনে রাখা কঠিন, তারা আপনাকে দেখে তাদের নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে যা তাদের অহংবোধকে অন্যের কাছে নিজের জীবনের মূল পথ পরিবর্তন করবে। এতটা আশা তাদের কাছে আশা করা অনুচিত। এমন একটা সময় আসে যখন স্নেহের আকর্ষণ এত তীব্র যে চরম আত্মত্যাগও স্বাভাবিক হয়ে যায়। কিন্তু আত্মত্যাগ যদি স্বাভবিক না হয় তা করা উচিত নয় এবং তা না করার জন্যে নিন্দিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। লোকে প্রায়ই অন্যের যে আচরণের নিন্দা করে তা যথাযথ সীমা অতিক্রম করে সর্বগ্রাসী অহংবোধের বিরুদ্ধে তা অন্যের স্বাভাবিক অহংবোধের সুস্থ হওয়ার চেয়ে বেশি নয়।

আমাদের উল্লেখিত সাধারণ নীতি হচ্ছে— আমরা নিজেদের বিষয়ে চিন্তা করতে যত সময় নষ্ট করি, অন্যেরা আমাদের বিষয়ে চিন্তা করতে অনেক কম

সময় নষ্ট করে, এই সত্যি কথাটা বুঝতে পারা। নির্যাতন-বাতিকে যে উন্মাদ হয়ে গেছে সে কল্পনা করে সব ধরণের লোক, যাদের প্রকৃতপক্ষে অনেক কাজ এবং সমস্যা রয়েছে তারা ঐ ভাগ্যহত উন্মাদের ক্ষতি সাধনের জন্যে সকাল-দুপুর-রাত নিজেদের ব্যস্ত করে রেখেছে। অনুরূপভাবে যে নির্যাতন বাতিকগ্রস্ত তুলনামূলকভাবে একটু ভাল সে সবরকম কাজকেই নিজের সম্পর্ক থেকে দেখে অথচ তা নয়। প্রকৃপক্ষে তার কোনও অস্তিত্বই নেই। অবশ্য এই ধারণা তার আত্মশ্লাঘাকে পরিতৃপ্ত করে। অনেক বছর ধরে ব্রিটিশ সরকার প্রধানত নেপোলিয়নকে পরাস্ত করার কাজে ব্যাপৃত ছিল। কিন্তু যখন একজন ব্যক্তি, যার কোনও গুরুত্ব নেই কল্পনা করে অন্যেরা সর্বক্ষণ তার কথা ভাবছে তখন বুঝতে হবে সে ধীরে ধীরে উন্মাদ হয়ে যাওয়ার পথে এগিয়ে চলেছে। ধরা যাক, কোনও নৈশভোজসভায় আপনি একটি ভাষণ দিয়েছেন। সচিত্র কাগজসমূহে অন্যান্য বক্তাদের ছবি প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু আপনার কোনও ছবি নেই। এর কারণ কীভাবে দেখা হবে? আপনার মনে হবে অন্যান্য বক্তারা আপনার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হওয়ার কারণে নয়, এর কারণ নিশ্চয়ই পত্রিকার সম্পাদকেরা আপনাকে অগ্রাহ্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু কেন তারা এমন নির্দেশ দেবেন? এর কারণ নিশ্চয়ই তারা আপনার মহান গুরুত্বকে ভয় পান। এইভাবে আপনার ছবির অপ্রকাশ, আপনার মনে হবে, আপনাকে অবহেলা করার বদলে সূক্ষ্মভাবে আপনাকে অভিনন্দন জানানো। কিন্তু এই ধরণের আত্মপ্রতারণা নিদেন আনন্দ দিতে পারে না। আপনার মনের পিছনে যে মন আছে, সে জানতে পারবে প্রকৃত ঘটনা এর বিপরীত এবং তা নিজের কাছে যথাসম্ভব গোপন রাখার জন্যে ক্রমে ক্রমে আপনাকেই নানা ধরনের উদ্ভট হেতু উদ্ভাবন করতে হবে। এসব বিশ্বাস করার চেষ্টা থেকে শেষ পর্যন্ত মনের ওপর যে চাপ পড়বে তা অত্যন্ত বেশি। তা ছাড়া এই বিশ্বাসের সাথে জড়িত হয়ে যাবে যে আপনি ব্যাপক শত্রুতার লক্ষ্যবস্তু যা আপনার মনে অত্যন্ত বেদনাদায়ক যে অনুভূতি জাগিয়ে রাখবে তা হচ্ছে পৃথিবীর সাথে আপনার সদ্ভাব নেই। আর এই অনুভূতি আপনার আত্মমর্যাদাবোধকে বাঁচিয়ে রাখবে। যে তৃপ্তির ভিত্তি আত্মপ্রতারণা, তা দূর করা। সত্য যতই অতৃপ্তিকর হোক প্রথমবারেই তার সাথে সমতা রেখে জীবনকে গড়ে করার দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত।

৯

জনতের ভয়

খুব কম লোকই সুখী হতে পারে, যদি সামগ্রিকভাবে তাদের জীবনধারা ও [illegible] নিয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী, যাদের সাথে তাদের সামাজিক সম্পর্ক রয়েছে এবং [illegible]ভাবে যেসব প্রতিবেশীদের সাথে বাস করতে হয়, তারা অনুমোদন না [illegible]। বর্তমান সমাজের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা আলাদা আলাদা গোষ্ঠীতে বিভক্ত [illegible] তাদের নৈতিকতাবোধ ও বিশ্বাসও পরস্পর থেকে ভিন্নতর। এই অবস্থা শুরু [illegible] ষোড়শ শতকের পোপবিরোধী ধর্ম বিপ্লবের সময় থেকে সম্ভবত বলা [illegible] রেঁনেসার সময় থেকে এবং ক্রমেই প্রবলতর হয়ে উঠছে। প্রোটেস্ট্যান্ট এবং [illegible]থলিকদের কথা বলা যায়, তারা যে শুধু ধর্মতত্ত্বে আলাদা তাই নয়, অনেক [illegible] ব্যাপারেও তারা আলাদা। অনেকগুলি কাজ অভিজাত শ্রেণীর অনুমোদিত [illegible] যা সহ্য করত না মধ্যবিত্ত শ্রেণী (বুর্জোয়া)। তারপর আগমন ঘটল [illegible]পন্থী এবং স্বাধীন চিন্তার সমর্থকদের। তাঁরা ধর্মীয় কর্তব্য পালন স্বীকার [illegible] না। আমাদের নিজেদের কালে ইউরোপ মহাদেশ জুড়ে লোকেরা খুব [illegible] রকমভাবে ভাগ হয়ে গেছে সমাজতন্ত্রী এবং অন্যান্য দলে, যেখানে শুধু [illegible]নীতি নেই, রয়েছে জীবনের সকল বিভাগ। ইংরেজি ভাষাভাষি দেশসমূহে এই [illegible] অসংখ্য। কিছু দল চিত্রশিল্পকে নন্দিত করে। কিছু দল মনে করে ওটা [illegible]লের চিন্তা, অন্তত আধুনিক হলে তো কথাই নেই। কারো কারো মতে [illegible]া আনুগত্য একটি মহৎ গুণ, কারো মতে এটি পাপ, আবার কারো মতে [illegible] ধরনের বুদ্ধিহীনতা। সাধারণ নৈতিকতায় বিশ্বাসী মানুষ ব্যভিচার একটি [illegible] অপরাধ বলে মনে করে। আবার এক বিপুল সংখ্যক লোক একে [illegible]যোগ্য মনে না করলেও ক্ষমাযোগ্য অপরাধ বলে মনে করে। ক্যাথলিকদের [illegible] বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ কিন্তু অধিকাংশ অ-ক্যাথলিক একে বৈবাহিক চাপ [illegible] মুক্ত হওয়ার প্রয়োজনীয় অপনোদক বলে গ্রহণ করে।

এই ধরনের বিচিত্র সব দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে কোনও নির্দিষ্ট রুচি ও বিশ্বাসযুক্ত [illegible] গোষ্ঠীর মধ্যে নিজেকে সমাজচ্যুত মনে করবে, কিন্তু অন্য গোষ্ঠীর [illegible]ান সম্পূর্ণ সাধারণ এবং স্বাভাবিক মানুষ বলে গৃহীত হবেন। এইভাবে [illegible] অসন্তুষ্টি জন্ম নেয় বিশেষভাবে তরুণদের মধ্যে, কোনও তরুণ বা তরুণীর [illegible]ভাবে যেসব ধারণা জন্ম নেয়, তা যেন বাতাস থেকে ধরা। কিন্তু তারা [illegible] পায় যে বিশেষ সামাজিক পরিবেশে তারা বাস করছে সেখানে এইসব (খ্রিস্টান) ধর্মমন্দির থেকে পাওয়া অভিশাপ যেন। তাই তরুণ সমাজের

মনে সহজেই এটা মনে হতে পারে, তারা যে সামাজিক পরিবেশের সাথে খা
তা সমগ্র বিশ্বের মধ্যে প্রতিনিধি স্থানীয়। তারা বিশ্বাস করতেই চাইবে না
মতো তারা ধৃষ্টতা বলে বিবেচিত হতে পারে মনে করে এখানে প্রকাশ করতে
পায়, সেইসব অন্য জায়গায় ভিন্ন পরিবেশে এ যুগের অত্যন্ত সাধারণ
বিবেচিত হবে। দেখা যায়, পৃথিবী সম্বন্ধে অজ্ঞতার কারণে নানা ধরনের
অনাবশ্যক দুঃখ ভোগ করে কখনো শুধুমাত্র তরুণ বয়সে, কখনো জীবনভর
অন্তরণ শুধু যে বেদনার উৎস, তা নয়, এতে বিপরীত পরিবেশের
মানসিক স্বাধীনতা রক্ষার অপ্রয়োজনীয় কাজে শক্তির অনর্থক অপচয় হয়
একশটির মধ্যে নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে ধারণাসমূহের যুক্তিপূর্ণ পরিণতির
পরিচালিত করতে এক ধরনের ভয়ের সঞ্চার হয়। ব্রন্টি ভগ্নিরা[১] তাদের
প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোনও সহানুভূতিশীল লোকের দেখা পাননি।
এমিলিকে স্পর্শ করেনি। তিনি তেজস্বিনী ছিলেন এবং তাতে দীপ্তি ছিল
শারলেট এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। কারণ, প্রতিভা থাকলেও তাঁর দৃষ্টি ছিল
একজন গৃহশিক্ষিকার। এমিলি ব্রন্টির মতো ব্লেকও[২] মনের দিক থেকে
অন্তরীণ ছিলেন। কিন্তু তিনি এমিলির মতোই নিজের ভুল দিকটাকে শুধরে
পেরেছিলেন। তিনি যে নির্ভুল ছিলেন এবং তাঁর সমালোচকরাই ভুল ছিলেন
বিষয়ে তাঁর মনে কোনও দ্বিধা ছিল না। জনমত বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী নিচের
চরণে প্রকাশিত হয়েছে :

একমাত্র লোক যে আমার পরিচিত
যে আমার বমন-উদ্রেক কোনও রকমে
বন্ধ করেছিল, তার নাম ফ্যাঞ্জেলি—
তিনি ছিলেন একসাথে তুর্কি এবং ইহুদি।
সুতরাং প্রিয় খ্রিস্টান বন্ধুগণ
তোমরা কি করছো?

---

১. ব্রন্টি ভগ্নিরা, Bronte Sisters। ভিক্টোরীয় যুগের ব্রন্টি ভগ্নিরা হলেন উপন্যা
এমিলি ব্রন্টি (১৮১৮-৪৮), শার্লেট ব্রন্টি (১৮২৬-৫৫) এবং এ্যান ব্রন্টি (১৯২০-
স্বল্প জীবনের অধিকারিণী এই তিন ভগ্নির উপন্যাসে বিক্ষুব্ধ, নির্যাতিত আশা
ঘোষণা এবং নারীসমাজের পূর্ণতর জীবনের অধিকারের প্রশ্ন প্রখরভাবে ফুটে
২. ব্লেক, William Blake, (১৭৫৭-১৮২৭)। ইংরেজ কবি ও চিত্রকর, যোগ্য
পেয়েছেন মৃত্যুর পর।

কিন্তু অন্তর্জীবনে এমন শক্তি ধারণ করেন তেমন লোকের সংখ্যা বেশি নয়। প্রত্যেকের পক্ষেই সহানুভূতিশীল পরিবেশ সুখের জন্যে প্রয়োজন। অবশ্য অধিকাংশ লোকই নিজেদের চারপাশে যে পরিবেশ খুঁজে পায় তা সহানুভূতি হয়। তারা তরুণ বয়সে প্রচলিত সব কুসংস্কার আত্মভূত করে নেয় এবং চতুর্পাশে যেসব বিশ্বাস এবং রীতিনীতির সন্ধান পায় তার সাথে সহজভাবে মানিয়ে নেয়। কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক লোকের পক্ষে, যাদের কোনও রকম বুদ্ধিবৃত্তিক বা শৈল্পিক ক্ষমতা রয়েছে এই ধরনের সব কিছু নির্বিবাদে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কোনও লোক যদি ছোট মফঃস্বল শহরে জন্মান, তবে শৈশব থেকেই তার মানসিক উৎকর্ষের জন্যে যা কিছু প্রয়োজন তার প্রত্যেকটির বিরোধিতার দ্বারা নিজেকে পরিবেষ্টিত দেখবে। যদি তার গভীর কোনও বই পড়তে ইচ্ছা করে, অন্য ছেলেরা তাকে অবজ্ঞা করবে। শিক্ষকেরা বলবেন এই ধরনের বই মনকে বিক্ষিপ্ত করে। যদি তার শিল্পের প্রতি আকর্ষণ দেখে তাহলে সমবয়সীরা তাকে ভাববে লিঙ্গহীন আর গুরুজনরা মনে করবে অনৈতিক। যদি সে কোন সম্মানজনক পেশা গ্রহণ করতে চায়, যা তার নিজের সম্প্রদায়ের লোকদের কাছেই অসাধারণ হয় তাহলে তারা বলবে সে নিজেকে সম্প্রদায়ের ওপরে তুলতে চায়। আরও ভালো যা তার বাপ-দাদার জন্যে ভাল তা তার জন্যেও মঙ্গল। যদি সে তার বাবা-মায়ের ধর্মীয় মতবাদ বা রাজনৈতিক আনুগত্য নিয়ে সমালোচনার প্রবণতা দেখায়, তা হলে সে নিজের জন্যে সমূহ বিপদ ডেকে আনবে। এইসব কারণে যে যোগ্যতার অধিকারী অধিকাংশ তরুণ-তরুণীর বিকাশশীল বয়ঃসন্ধিকালটা হয় দুঃখের সময়। তাদের যেসব সঙ্গী খুব সাধারণ মানের তাদের জন্যে এই সময়টা আনন্দ এবং উপভোগের কারণ হতে পারে, কিন্তু যারা নিজেরাই গুরুত্বপূর্ণ হতে করতে চায় এবং ঘটনাচক্রে তার যে পরিবেশে তারা জন্মেছে সেখানে সঙ্গীর মধ্যেও পায় না। সমবয়সীদের মধ্যেও পায় না।

এইরকম তরুণ-তরুণীরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তখন তারা মনে করে মনের সঙ্গী পেয়ে যায় এবং কয়েক বছর আনন্দে কাটায়। যদি তারা ভাগ্যবান হয় তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করার পরেও এমন কাজ পেয়ে যেতে পারে যেখানে মনের সঙ্গী পাওয়া তখনো হয়তো সম্ভব। লন্ডন বা নিউইয়র্কের মতো শহরে বাস করছে এমন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সাধারণত যাদের সাথে মনের মিল হয় এমন একদল সঙ্গী পেতে পারে। যেখানে তাদের কোনও লুকোচুরি বা ভণ্ডামির প্রয়োজন তাদের হবে না। কিন্তু কাজের স্বার্থে তারা যদি ছোট কোনও জায়গায় যেতে বাধ্য হয়, বিশেষভাবে যেখানে সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা ধরে রাখার প্রয়োজন হয়, যেমন দরকার হয় চিকিৎসক বা আইনজীবীর, তাহলে তাদের

জীবনভর নিজের আসল ধারণা ও বিশ্বাসকে নিত্যদিন সংস্পর্শে আসা অধিকাংশ লোকদের কাছ থেকে অবশ্যই গোপন রাখতে হবে। বিশাল দেশ হওয়ার জন্য আমেরিকার পক্ষে এটা বিশেষ করে সত্যি। উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমে অনেক সব জায়গার নিঃসঙ্গ লোকদের দেখা মিলবে। যারা বইয়ে এমন সব জায়গার কথা পড়েছে, যেখানে যেতে পারলে তাদের একাকীত্ব ঘুচতে পারে, কিন্তু সেখানে বাস করার সুযোগ তারা পায় না। তারা যেখানে থাকে সেখানে মন খুলে কথা বলার ন্যূনতম সুযোগ পর্যন্ত নেই। যারা ব্লেক ও এমিলি ব্রন্টির মতো উচ্চমার্গের কবি নন, তাদের পক্ষে এমন পরিবেশে প্রকৃত সুখ লাভ করা অসম্ভব। এটি সম্ভব করতে হলে এমন কোনও পথ খুঁজে নিতে হবে, যার সাহায্যে জনমতের পীড়ন কমানো, না হয় এড়ানো যেতে পারে এবং যার দ্বারা বুদ্ধিমান সংখ্যালঘুরা নিজেদের জানতে পারবে এবং পরস্পরের সমাজকে উপভোগ করতে পারবে।

অনেক ক্ষেত্রেই অকারণ ভীরুতা অনাবশ্যকভাবে ঝামেলা বাড়িয়ে তোলে। জনমতকে যারা ভয় করে, জনমত তাদেরই ওপর বেশি অত্যাচার করে, যারা ভয় করে না তাদের কিছুই করে না। যারা কুকুর দেখে ভয় পায় কুকুর তাদের ওপর বেশি ঘেউ ঘেউ করে এবং তাদের কামড়াতে তৎপর হয়। কিন্তু যারা কুকুরকে উপেক্ষা করে তাদের সে কিছু করে না। মানুষের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যও অনেকটা এইরকম। যদি তাদের দেখে আপনি ভয় পান তাহলে তারা বুঝবে আপনি তাদের ভাল শিকার, আর আপনি যদি নির্লিপ্ততা দেখান তাহলে তারা নিজেদের ক্ষমতা বিষয়ে সন্দিহান হবে এবং আপনাকে ছেড়ে দেওয়াই ভাল বলে মনে করবে। আমি অবশ্য চরম অবজ্ঞা প্রকাশের কথা চিন্তা করছি না, আপনি যদি রাশিয়ার প্রাচীন মতবাদ কেনসিংটনে ধরে রাখেন অথবা কেনসিংটনে প্রচলিত মতবাদ রাশিয়ায় বসে ধারণ করেন, তবে তার পরিণাম অবশ্যই আপনাকে মেনে নিতে হবে। আমি এরকম চরম অবস্থার কথা ভাবছি না। আমি ভাবছি প্রচলিত রীতিনীতি থেকে সামান্য বিচ্যুতি, যেমন যথাযথভাবে পোশাক না পরা কিংবা কোনও গীর্জার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখা অথবা বুদ্ধিদীপ্ত বই পড়া থেকে বিরত থাকা। এসব ত্রুটি যদি খেলার ছলে এবং উদাসীনতার কারণে ঘটে, কোনও জেদ থেকে নয়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা হলে খুব রক্ষণশীল সমাজেও তা সহ্য করা হবে। এমন কি সর্বজনস্বীকৃতভাবে পাগলের পদলাভও সম্ভব হয়ে উঠতে পারে এবং অন্য ক্ষেত্রে যা সহ্য করা হয় না তার ক্ষেত্রে সে ধরনের কাজ করার অনুমতি দেওয়া হবে। এটি এক বিশেষ ধরনের ভাল প্রকৃতি এবং সৌহার্দ্যের বিষয়। রক্ষণশীল লোকেরা প্রচলিত রীতিনীতির ব্যতিক্রম দেখলে ক্রুদ্ধ হয় প্রধানত এই কারণে যে এটা তাদের কাছে নিজেদের সমালোচনা বলে মনে হয়। চলিত রীতিনীতি

অনেক স্খলনকে তারা ক্ষমা করতে পারে যদি দেখে সেই লোক প্রফুল্ল মেজাজে এবং বন্ধুত্বের সাথে নির্বোধতম লোকটিকেও বুঝিয়ে দিতে পারে যে সে তাদের সমালোচনা করবে না।

কিন্তু যাদের পছন্দ এবং মতো দলের লোকদের প্রতি সহানুভূতিশীল নয়, তাদের ভর্ৎসনা এড়িয়ে চলার এই রীতি অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। তাদের সহানুভূতিহীনতা তাদের জন্যে অস্বস্তির কারণ হয় এবং বাইরে বড় ধরনের ঝামেলা সামলে নিতে কিংবা এড়াতে পারলেও তাদের মনে কলঙ্কপ্রিয়তা জাগিয়ে তোলে। যেসব লোক নিজের গোষ্ঠীর সাথে রীতিনীতির ব্যাপারে মানিয়ে চলতে পারে না তাদের মনে খোঁচা লাগে এবং অস্বস্তি হয় এবং তাদের বিস্তৃত সরস মনোভাব থাকে না। এই একই লোক যদি আর এক দলে রপ্তানী হয়, যেখানে তার মতকে কেউ অদ্ভুত মনে করবে না, তাহলে মনে হবে যেন তার সম্পূর্ণ চরিত্রই বদলে গেছে। আগে ছিল গম্ভীর, সংকুচিত এবং নিভৃতচারী; এখন লক্ষ্যময় এবং আত্মবিশ্বাসী। আগে ছিল কৌণিকতাযুক্ত, এখন সরল ও মসৃণ, আগে ছিল আত্মকেন্দ্রিক, এখন সামাজিক এবং বহির্মূখী।

সুতরাং যেখানেই সম্ভব, তরুণেরা, যারা নিজেদের পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারছে না, তাদের এমন পেশা বেছে নিতে চেষ্টা করা উচিত, যা তাদের সুযোগ দেবে মনের মতো পরিবেশ পেতে। এতে যদি উপার্জনের দিক থেকে অনেকটা ক্ষতি হয়, তবুও, অনেক সময় এরা জানেই না এরকম সম্ভব। কারণ বিশ্ব সম্পর্কে তাদের জ্ঞান খুবই সীমিত এবং তারা সহজেই মনে করতে পারে তারা বাড়িতে যেসব কুসংস্কারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে তা ছড়িয়ে আছে বিশ্বময়। এ বিষয়ে বয়স্ক লোকেরা তরুণদের অনেক সহায়তা দিতে পারেন, কারণ এতে মানুষ সম্পর্কে বিশদ অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন।

যখন কোনও তরুণ তার পরিবেশে বেমানান হয়, তখন মনস্তাত্ত্বিক গণ্ডগোলই তার কারণ এটা অনুমান করা বর্তমান সময়ের মনোবিশ্লেষণ রীতি। আমার মনে হয় এটা সম্পূর্ণরূপে ভুল। ধরা যাক, কোনও তরুণের বাবা-মা বিবর্তনবাদকে মনে করে অগ্রহণযোগ্য মতবাদ। অন্য কিছু নয় শুধুমাত্র বুদ্ধিমত্তাই এই ধরনের ঘটনায় প্রয়োজন হয় তরুণটির সাথে তার বাবা-মার সহানুভূতির বন্ধন ছিন্ন করতে। নিজের পারিপার্শ্বিকতার সাথে মানিয়ে নিতে পারা অবশ্যই প্রশংসার। কিন্তু তা এমন দুর্ভাগ্য নয় যে, যে কোনও মূল্যে তাকে এড়াতে হবে। পরিবেশ যেখানে বুদ্ধিহীন, পক্ষপাতমূলক সংস্কারাচ্ছন্ন অথবা নিষ্ঠুর, যেখানে তাকে মেনে নিতে না পারা যোগ্যতারই পরিচয়বাহী। প্রায় প্রত্যেক পরিবেশেই

কিছু পরিমাণে হলেও এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। গ্যালিলিও[৩] এবং কেপলারের[৪] ছি "বিপদজনক মতবাদ" (জাপানে যেমন বলা হয়)। আজকের দিনেও তেমন না রয়েছেন। এ রকম বরেণ্য ব্যক্তি তাঁদের মতবাদের জন্যে সামাজিক শত্রুতার মু পড়বেন যাকে তাঁদের বিরুদ্ধ মতবাদীরা প্ররোচিত করে। সামাজিক বোধ মাত্রায় বেড়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। যেটা কামনীয় তা হচ্ছে এই ধরনের শ যতটা সম্ভব কমিয়ে ফেলা এবং অকার্যকর করার পথ খুঁজে বের করা।

বর্তমান বিশ্বে এই সমস্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি উদয় হয় বয়সে। কোনও ব্যক্তি যদি একবার উপযুক্ত পরিবেশে উপযুক্ত পেশাটি করতে পারে, তাহলে সে সামাজিক অত্যাচার প্রায়ক্ষেত্রেই এড়িয়ে চলতে পারে কিন্তু তার যখন বয়স কম এবং যোগ্যতাও পরীক্ষিত হয় নি, তখন তার সম্পূর্ণ অজ্ঞ লোকের হাতে গিয়ে পড়তে পারে। যারা তাদের অজানা বিষয়ে মতামত দেওয়ারও যোগ্য বলে মনে করে নিজেদের এবং বিশ্ব সম্বন্ধে এত বিপুল অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও তাদের চেয়ে বয়সে অনেক কম এক তরুণ তাদের চেয়ে বেশি জ্ঞানী, এই রকম কোনও ধারণায় নিজেদের চূড়ান্ত অপমানিত মনে করে অনেকে যারা শেষ পর্যন্ত অজ্ঞতার অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়েছে তাদের এমন কঠিন যুদ্ধ করতে হয়েছে এবং দীর্ঘদিন অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে, শেষ পর্যন্ত তাদের মন তিক্ত হয়ে উঠেছে এবং তাদের শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। একটি সহজ মতবাদ রয়েছে যে, প্রতিভা তার পথ খুঁজে নেবেই আর এই মতবাদকে বিশ্বাস করে অনেকেই মনে করে তরুণ প্রতিভা নির্যাতিত হলেও তার খুব বেশি ক্ষতি হয় না। এই মতবাদকে স্বীকার করে নেওয়ার তেমন কোনও যুক্তি নেই। 'যা জানাজানি হবেই' অনেকটা এই মতবাদের তুল্য। মনে হয়, আমরা যতগুলি খবর জানতে পারি, তা সবই ধরা পড়ার পর। কিন্তু আমরা জানি না এমন আরো কত খুনের কথা, যাদের খবর আমাদের কানেও আসেনি। এইভাবে যাঁদের কথা আমরা শুনেছি, সেসব প্রতিভা প্রতিকূল পরিবেশকে জয় করেই দীপ্ত হয়েছেন।

---

৩. গ্যালিলিও, Galileo, (১৫৬৪-১৬৪২)। ইতালির বিখ্যাত গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তাঁর বিপজ্জনক মতবাদ হল, 'Eppar si move'— পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। এই মতবাদ বাইবেল-বিরোধী। সেজন্যে বৃদ্ধবয়সে তাঁকে নির্যাতিত হতে হয়, ভোগ করতে হয় কারাদণ্ড। ১৯৯৪ সালে তাঁর মৃত্যুর ৩৫২ বছর পর ভ্যাটিকান চার্চ তাঁর মতবাদ মেনে নেয়।

৪. কেপলার, Johaunes Kepler (১৫৭১-১৬৩০), জার্মান গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ এবং প্রকৃতি-দার্শনিক।

কিন্তু তাতে একথা অনুমান করার কোনও কারণ নেই যে, অনেক প্রতিভা ... হতে পারেনি। অধিকন্তু এই কথা প্রতিভাবানদের বেলায় নয়, সাধারণ ... ব্যক্তিদের বেলায়ও বলা চলে। কারণ তাঁরাও সমাজের পক্ষে সমভাবে ... । এটা কোনও ভাবে নির্যাতন থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপার নয়। ... মন এবং অক্ষতিগ্রস্ত শক্তি নিয়েও বেরিয়ে আসার ব্যাপার। এইসব ... তরুণদের চলার পথ অতি দুর্গম করে তোলা উচিত নয়।

বয়োবৃদ্ধরা তরুণদের সব ইচ্ছাকে সম্মান দেখাবেন এটা অবশ্যই কামনীয়, ... তরুণরা বয়োবৃদ্ধদের ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখাবে, সেটা অবশ্য কামনীয় ... । এর কারণ খুব সহজ। উভয় ক্ষেত্রেই তা তরুণদের জীবনের ব্যাপার, ... বৃদ্ধদের নয়। তরুণরা যখন বৃদ্ধদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করে, যেমন ... বা বিপত্নীক মা-বাবার পুনর্বিবাহে আপত্তি জানায়, তাহলে তারা ততটুকু ... করে, বড়রা ঠিক ছোটদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে যতটুকু অন্যায় ... । বড় হোক কিংবা ছোট বিচারশক্তি অর্জন করার বয়সে পৌঁছে গেলে ... নিজেদের পছন্দে চলার অধিকার স্বীকার করতে হবে। এমন কী অন্যায় ... হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তুমি একজন তরুণ, তোমার ইচ্ছা নাট্যমঞ্চে ... দেওয়ার; কিন্তু তোমার বাবা-মার এতে আপত্তি, এই কারণে যে, তারা ... অনৈতিক বা নিচুস্তরের সামাজিক কাজ বলে মনে করেন। তাঁরা যতদূর ... তোমার ওপর চাপ প্রয়োগ করবেন, হয়তো বলবেন তাদের কথা না শুনলে ... তোমাকে পরিত্যাগ করবেন, বলবেন এমন কাজ করলে তুমি কিছুদিনের ... অনুতাপে দগ্ধ হবে, যতরকম খারাপ হবে সব একে একে তোমাকে বলবেন ... বোঝাবেন তুমি যা করতে চাও তা করে বহু তরুণের সর্বনাশ হয়েছে। তাঁরা ... ঠিকই মনে করেছেন, তোমার পক্ষে নাট্যমঞ্চ উপযুক্ত নয়। হতে পারে ... তেমন অভিনয় দক্ষতা নেই অথবা তোমার কণ্ঠস্বর খুব খারাপ। যদি তাই ... কথা তুমি অল্পদিনের মধ্যেই জানতে পারবে থিয়েটার শিল্পীদের কাছ ... । তারপরও অন্য একটা পেশা নির্বাচন করার যথেষ্ট সময় তুমি পাবে। ... যুক্তি তোমার চেষ্টা থেকে দূরে থাকার যথেষ্ট কারণ হতে পারে না। ... এত সব যুক্তি সত্ত্বেও তুমি নিজের ইচ্ছায় দৃঢ় থাক, তাহলে তাঁরা ... মধ্যেই শান্ত হয়ে যাবেন। এমন কী, তোমার বা তাঁদের অনুমানের ... আগেই। অন্যদিক যদি পেশাদারদের অভিজ্ঞ মতামত তোমাকে ... নিরুৎসাহিত করে তো আলাদা ব্যাপার। কারণ পেশাদারদের অভিমত ... কারীদের মেনে নেওয়া উচিত।

আমার মনে হয়, সাধারণভাবে, বিশেষজ্ঞদের মতামত না ধরে যে কোন বিষয়ে ছোট বা বড় যাই হোক, অন্যদের মতামতের ওপর একটু বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। জনমতকে ততটাই সম্মান জানানো উচিত যতটা নিয়মসংখ্যা অনাহার এড়ানো বা কারাগারের বাইরে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয়। নিয়ম অতিক্রম করে গেলে এটা হবে অহেতুক নির্যাতনের কাছে মাথা নত করা। সুখের সব রকম পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। খরচের ব্যাপার ধরা যেতে পারে অনেক লোককে দেখা যায়, তারা নিজেদের পছন্দ যা অনুমোদন করেন, ও ভিন্ন বিষয়ে অর্থ খরচ করেন, কারণ তাদের ধারণা ভাল একটা গাড়ি থাকা অথবা সুন্দর নৈশভোজ খাওয়াবার ক্ষমতা থাকলেই তারা প্রতিবেশীদের সম্মান অর্জন করতে পারবেন। বাস্তব ব্যাপার হল, যে কোনও ব্যক্তি, যার গাড়ি কেনার ক্ষমতা আছে অথচ মনের দিক থেকে দেশভ্রমণ বা একটি ভাল গ্রন্থাগার করেন, শেষ পর্যন্ত অন্যেরা যেভাবে চলতে চান সেভাবে না চলেন, তাহলে তিনি বেশি মর্যাদা পাবেন। অবশ্য জোর করে জনমতকে অস্বীকার করার মধ্যে কোন কৃতিত্ব নেই, সেটাও জনমতের আধিপত্য মেনে নেওয়ার মত, যদিও তা ঘুরপথে। কিন্তু যদি আন্তরিকভাবে তার প্রতি নিস্পৃহ থাকা যায় তা শান্তি পরিচায়ক এবং সুখের উৎস হয়ে উঠবে। যে সমাজে নারীপুরুষ সকলেই একই ধরনের আচরণ করে, তার চেয়ে যে সমাজে তারা প্রচলিত প্রথার কাছে খুব মাথা নোয়ায় না, সেই সমাজ অনেক বেশি মনোহর। যেখানে প্রতিটি মানুষ চরিত্র ব্যক্তিগতভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়, সেখানেই মানুষের বৈচিত্র্য রক্ষিত হয় এবং নতুন মানুষের সাথে দেখা হওয়াটা উপকারী হয়। তারা যাদের সাথে একবার দেখা হয়েছে তাদের পদমর্যাদা তাদের জন্যে নির্ভরশীল, তারা নিজের খেয়ালখুশী মতো ব্যবহারের সুযোগ পায়। আধুনিক বিশ্বে আমরা সামাজিক স্বাধীনতার উৎসটি হারাতে চলেছি। সুতরাং সমাজ একাকার হয়ে যাওয়ার বিপদ সম্পর্কে সুচিন্তিত ধারণা কামনীয়। আমি বলতে চাই না মানুষ ইচ্ছা করে খামখেয়ালি হয়ে উঠুক, কারণ তা রীতি মেনে চলার মতো অপ্রীতিকর। আমি বলতে চাই মানুষ স্বাভাবিক হোক এবং তাদের স্বাভাবিক ইচ্ছামূলক পছন্দ অনুসরণ করে চলুক যতক্ষণ পর্যন্ত তা নিশ্চিত করে অভিজাতদের মতো না হয়। বর্তমান বিশ্বে দ্রুত চলাচল ব্যবস্থার সুযোগে আর আগের মতো নিকটতম ভৌগোলিক প্রতিবেশীদের ওপর নির্ভরশীল নয়। যাদের গাড়ি আছে তারা বিশ মাইলের ভিতর বাস করে এমন যে কোনও লোককে প্রতিবেশি মনে করতে পারেন। তাই তাদের সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষমতাও

তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। যে কোন জনাকীর্ণ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যে মানুষ বিশ মাইলের মধ্যে মনের সঙ্গী খুঁজে পায় না, তাকে নিশ্চিতভাবেই হতভাগ্য বলা যায়। নিকট প্রতিবেশীদের সাথে পরিচিত হওয়া উচিত, এই ধারণা ঘনবসতিপূর্ণ নগরে আর বেঁচে নেই, কিন্তু ছোট শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে এখনো রয়ে গেছে। সামাজিকতার জন্যে নিকটতম প্রতিবেশীদের ওপর নির্ভরশীলতা যখন অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে, তখন এই ধারণাও অর্থহীন হয়ে পড়েছে। শুধুমাত্র কাছে থাকা লোকের মধ্যে সঙ্গী খুঁজে নেওয়ার পরিবর্তে মনের মতো সঙ্গী নির্বাচন করার সুবিধা বেড়ে গেছে। সমজাতীয় পছন্দ ও সমমতের মানুষের সঙ্গলাভ সুখ বাড়িয়ে তোলে। এই পথেই সামাজিক সম্পর্ক নানাভাবে গড়ে উঠবে এটা আশা করা যায় এবং এই পথেই যে নিঃসঙ্গতা এখনো বহু মানুষকে বেদনায় ভরে তুলছে তা কমে যাবে বলে আশা করা যায় এবং তা প্রায় শূন্যেই অন্তর্লীন হবে। এতে পারস্পরিকভাবে তাদের সুখ বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত পথে চলা লোকদের কাছে পেয়ে তারা যে বর্বর আনন্দ উপভোগ করে তার সম্ভাবনা অনেকখানেই কমে যাবে। আমি মনে করি না এটা এমন কোনও আনন্দ নয় যাকে রক্ষা করার জন্যে কোনওরূপ ভাবনার প্রয়োজন আছে।

অন্যান্য ভয়ের মতো জনমতের মতো ভয় যন্ত্রণাদায়ক এবং বিনাশের পথে ধাবমানরূপ। এ রকম ভয় প্রবল হলে কোনও বড় কিছু করাই সম্ভব নয় এবং যে আত্মস্বাধীনতায় আসল সুখ পাওয়া যায়, তা অসম্ভব হয়ে ওঠে। কারণ আমাদের বহির্উৎসারিত চিত্তবৃত্তি থেকে যে জীবনধারা গড়ে ওঠে তাই হল সুখের মূল উৎস। আমাদের প্রতিবেশী বা আপনজনদের কাছ থেকে পাওয়া আকস্মিক কোনও পছন্দ বা চিন্তা থেকে আহরিত জীবনধারা নয়। নিকটতম প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ভয় পাওয়া কারণে আগের তুলনায় কমে গেছে সেটা ঠিক, কিন্তু নতুন এক ভয়ের কারণ দেখা দিয়েছে, তা হচ্ছে সংবাদপত্র কী বলবে সেই মতামত নিয়ে ভয়। মধ্যযুগের ডাইনী শিকারের মতো ভয়ংকর ভয়ের ঘটনার সাথেই শুধু এর তুলনা করা যায়। যখন কোনও সংবাদপত্র কোনও নিরীহ লোককে অন্যের দোষের ভারবাহী ব্যক্তি হিসাবে বেছে নেয় তার পরিণাম হয় ভয়ংকর। সৌভাগ্যক্রমে অধিকাংশ মানুষ অখ্যাত হওয়ার জন্যে এই পরিণাম এড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু প্রচার রীতি যতই নিখুঁত হতে থাকবে, এই ব্যাপারে ততই সামাজিক নির্যাতনের এই অভিনব কৌশলটির সাহায্যে আরও বেশি বিপদের কারণ হয়ে উঠবে। যিনি একবার এর শিকার বলি হয়েছেন, তার পক্ষে কোনভাবেই এই গুরুতর বিষয়টি উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার স্বপক্ষে যত কথাই বলা হোক, আমি মনে করি,

বর্তমান মানহানির আইনে যেভাবে রয়েছে সেই সীমারেখা তার চেয়ে বেশি স্পষ্ট করে টানা উচিত এবং নিরীহ মানুষদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে এমন যে কোনো বিষয় সংবাদপত্রে প্রকাশ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। এমন কী তারা এমন কিছু যদি করে থাকে বা বলে থাকে, যা বিদ্বেষপূর্ণভাবে প্রকাশ করলে তাদের জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তারও প্রকাশ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। এই অন্যায়ের একমাত্র চূড়ান্ত প্রতিকার হচ্ছে জনগণের দিক থেকে আরও বেশি সহনশীল হতে অভ্যস্ত হওয়া। সুখের সন্ধানে সহনশীলতা বৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ পথ হচ্ছে সুখী মানুষের সংখ্যা বাড়ানো যাতে তারা তাদের সহচরদের বেদনাহত করাকেই জীবনের প্রধান সুখ বলে মনে না করে।

১০

সুখলাভ কি তবু সম্ভব?

এ পর্যন্ত আমরা অসুখী মানুষদের সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখন আমরা সুখী মানুষদের নিয়ে আরো মনোরম আলোচনা করব। আমরা কয়েকজন বন্ধুর সাথে মত বিনিময় করে এবং তাঁদের বই পড়ে আমাকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়েছে যে, বর্তমান পৃথিবীতে সুখলাভ অসম্ভব ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আমি গভীরভাবে চিন্তা করে, বিদেশে ভ্রমণ করে এবং উদ্যানপালকের সাথে আলোচনা করে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেছি এই ধারণার কোনও অস্তিত্ব নেই। এর আগের একটি অধ্যায়ে আমার সাহিত্যিক বন্ধুদের নিয়ে আমি কিছু বলেছি। এই অধ্যায়ে আমি জীবনে যে সব সুখী মানুষের সংস্পর্শে এসেছি তাদের নিয়ে সমীক্ষা করব।

সুখ দু'রকমের, যদিও এই দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থানে বেশ কটা পর্যায় রয়েছে। যে দু'রকমের সুখের কথা বলছি, তা হচ্ছে রূপহীন এবং রূপময় অথবা দৈহিক এবং আত্মিক অথবা হৃদয়-উৎসারিত এবং মস্তিষ্ক-জাত। এতসব বিকল্পের কোন্‌টা নির্ণয় করা নির্ভর করবে কী প্রমাণ করতে চাওয়া হচ্ছে তার ওপর। আমি কোনও পূর্বপরিকল্পিত বিশ্বাস প্রমাণ করতে যাচ্ছি না, আমি শুধু বলে যাব। দু'রকমের সুখের পার্থক্য বর্ণনার সহজতম উপায় হচ্ছে— একটি যে কোন ব্যক্তি লাভ করতে পারেন, অন্যটি শুধু যারা লিখতে পড়তে পারেন তাদের জন্যেই এই কথাটি বলা। আমি যখন বালক ছিলাম, তখন আমি আনন্দে ভরপুর একটি লোককে জানতাম যার কাজ ছিল কূপ খনন করা। অতি দীর্ঘ দেহ, অবিশ্বাস্য রকম পুষ্ট পেশী, সে পড়তে বা লিখতে জানত না। ১৮৮৫ সালে যখন সে পার্লামেন্টের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার পেল তখন প্রথম জানতে পারল এই ধরণের একটি প্রতিষ্ঠানের কথা। তার সুখ মস্তিষ্ক উৎসারিত কোন কিছুর ওপর নির্ভরশীল ছিল না। এই সুখ, প্রকৃতির আইন অথবা প্রাণীজগতের ওপর মানুষের পূর্ণতা প্রাপ্তির সম্ভাবনা অথবা সাধারণের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির ওপর সাধারণ নিয়ন্ত্রণ স্বত্ব অথবা যীশুখ্রিস্টের পুনরাবির্ভাবে বিশ্বাসীদের জয়, অথবা বিশ্বাসীদের কাছে জীবনকে উপভোগ করতে অন্য যেসব মতবাদ প্রয়োজন তার কোনটার ওপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়নি। তার সুখের ভিত্তি ছিল দৈহিক শক্তি, ভাল কাজ এবং পাথরের অলঙ্ঘনীয় বাধাকে পরাজিত করা। আমার উদ্যানপালকের সুখের প্রজাতি একই। ছোট জাতের খরগোশের সাথে তার চিরন্তন সংগ্রাম, আর তাদের সম্বন্ধে সে বলশেভিকদের সম্পর্কে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দারা যেভাবে বলে সেও ঠিক সেভাবেই বলে। সে মনে করে ঐ

খরগোশগুলি কুটিল, চতুর এবং হিংস্র এবং তার মতে ওদের সমান ধূর্ততা থাকলে ওদের সাথে পেরে ওঠা কঠিন। নরওয়ের উপকথায় বর্ণিত ভ্যানখা নায়কেরা প্রতিদিন একটি বিশেষ বন্যবরাহ শিকার করত এবং প্রতি সন্ধ্যায় তার হত্যা করত। কিন্তু কোনও অলৌকিক কারণে সে প্রতিদিন সকালে প্রাণ ফিরে পেত। আমার উদ্যানপালকও ঠিক একইভাবে একদিন তার শত্রুকে বধ করতে পারে নির্ভয়ে কারণ পরদিন সে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যাবে এমন ভয় তার নেই। তার বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে তবু সে সারাদিন কাজ করে এবং এই কাজের জন্যে সাইকেলে ষোল মাইল পাহাড়ি পথ প্রতিদিন তাকে আসা-যাওয়া করতে হয়। কিন্তু তার আনন্দের উৎস নিঃশেষ হয় না কখনো, আর তা যোগান দেয় খরগোশ।

কিন্তু আপনারা বলতে পারেন, আমাদের মতো উচ্চপর্যায়ের মানুষের এইরূপ সহজ আনন্দ উন্মুক্ত নয়। খরগোশের মতো একটি ক্ষুদ্র প্রাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমরা আর কতটুকু আনন্দ পেতে পারি? আমি মনে করি এটা খুব দুর্বল যুক্তি। পীত জ্বরের জীবাণু থেকে খরগোশ অনেক বড় কিন্তু তবুও উচ্চস্তরের লোক তার সাথে যুদ্ধ করে আনন্দ পেতে পারে। আনন্দের মধ্যে আবেগের যে উপাদান সেখানে আমার উদ্যানপালক এবং একজন উচ্চশিক্ষিতের যে আনন্দ তা আলাদা করা যায় না। যেসব কাজের ভিতর দিয়ে আনন্দ পাওয়া যায় শিক্ষা শুধু সেখানে পার্থক্য তৈরী করে। কোনও কিছুতে সার্থকতা লাভের আনন্দ এমনই যে, যার সাফল্য অনিশ্চিত বলে মনে হয়, যদিও শেষ পর্যন্ত তাতে সফলতা লাভ হয়। এই কারণে সম্ভবত নিজের ক্ষমতার ব্যাপারে অতিরিক্ত ধারণা পোষণ না করাই সুখের একটি উৎস। যে মানুষ নিজের ক্ষমতাকে কম করে দেখে সে সবসময় সাফল্যে অবাক হয়, আর যে তার ক্ষমতাকে বেশি করে দেখে, সে সবসময় ব্যর্থতায় অবাক হয়। প্রথম রকমের অবাক হওয়া আনন্দের, পরেরটি বেদনার। তবে নিজের সম্বন্ধে অহংকার পোষণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, যদিও নিচু ধারণা পোষণ করে উৎসাহহীন হওয়াও উচিত নয়।

সমাজের উচ্চশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে বর্তমানে যে বিজ্ঞানসেবকরা সবচেয়ে সুখী তাঁদের মধ্যে যাঁরা অতি বিখ্যাত তাঁদের অনেকেই আবেগের দিক থেকে খুব গরীব। তাঁরা তাঁদের কাজের ভিতর যে তৃপ্তি পান, তা এতই গভীর যে, ভোজনে এমন কি বিবাহ থেকেও আনন্দ লাভ করতে পারেন। শিল্পী এবং সাহিত্যিকরা বিবাহে বাধ্য হওয়াকে পালনীয় কর্তব্য বলে ভাবেন। কিন্তু বিজ্ঞানসেবীরা প্রায়ই পুরানো প্রথার মধ্যে জীবনে পরম সুখ লাভ করেন। এর কারণ হচ্ছে তাঁদের বুদ্ধিমত্তার শ্রেষ্ঠ অংশ তাঁদের নির্দিষ্ট কাজে নিমগ্ন থাকে এবং যেখানে তার কোনও কাজ নেই, সেখানে

অনধিকার প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। কারণ আধুনিক পৃথিবীতে বিজ্ঞান প্রগতিশীল এবং ক্ষমতাশীল। এবং তার গুরুত্বে তাঁরা অথবা সাধারণ লোক, কারো সন্দেহ নেই। সুতরাং তাঁদের কাছে জটিল আবেগের কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই, কারণ সরল আবেগ কোনও পথেই বাধা পায় না। আবেগের জটিলতা নদীর জলের ফেনার মত। ফেনার জন্ম হয় নদীর চলমান স্রোতধারা বাধা পেলে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত মূল শক্তি অব্যাহত থাকে ততক্ষণ উপরিভাগে কোনও আলোড়ন থাকে না এবং অনভ্যস্ত দৃষ্টিতে সে শক্তি ধরাও পড়ে না।

বিজ্ঞানীর জীবনে সুখের সকল শর্তই পাওয়া যায়। তাঁর কাজেই তাঁর পূর্ণশক্তি ব্যবহৃত হয় এবং তিনি যে সাফল্য অর্জন করেন তার গুরুত্ব শুধু তাঁর নিজের কাছেই নয়, জনসাধারণের কাছেও গৃহীত হয়। এমনকী তাদের কাছে তা বিন্দুমাত্র বোঝার মতো না হলেও। এক্ষেত্রে তিনি শিল্পী অপেক্ষা বেশি ভাগ্যবান। জনসাধারণ যখন কোনও ছবি বা কবিতা বুঝতে না পারে, তখন তারা ধরেই নেয় যে ছবিটি খারাপ বা কবিতাটি ভাল নয়। যখন তারা বিজ্ঞানের আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব বুঝতে না পারে, তখন তা মনে করে (ঠিকই করে) যে তাদের শিক্ষা অপ্রতুল। কাজেই আইনস্টাইন[১] সম্মানিত হন এবং শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা তাদের চিলেকোঠায় অনাহারে, অবহেলায় পড়ে থাকেন এবং সেজন্যে বিজ্ঞানীরা সুখী এবং চিত্রশিল্পীরা অসুখী। খুব কম মানুষই যথার্থ সুখী যাঁকে অবিরাম জনসাধারণের সংশয়বাদের বিরুদ্ধে নিজের বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সংগ্রাম করতে হয়। যদি না তিনি নিজেকে একটি গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ করে বাইরের জগতের শীতলতাকে ভুলে থাকতে পারেন। বিজ্ঞানীদের এই ধরনের দল গঠনের প্রয়োজন হয় না কারণ তাঁর সহকর্মী ছাড়া আর সকলেই তাঁকে সম্মান করেন। অপরদিকে, চিত্রশিল্পী নিন্দিত হবেন না নিন্দার্হ হবেন, এই দুইয়ের মাঝখানে এক বেদনাময় পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে থাকেন। তাঁর ক্ষমতা যদি প্রথম শ্রেণীর হয়, তা হলে তাঁকে এটা বা অপরটা যে কোনও একটা দুর্ভাগ্যে ভুগতেই হবে। যদি তিনি তাঁর ক্ষমতা ব্যবহার করেন তা হলে নিন্দিত হবেন এবং যদি না করেন তা হলে নিন্দার্হ হবেন। অবশ্য সবসময় সব জায়গায় এরকম ঘটেনি।

---

[১] আইনস্টাইন, Albert Einstein (১৮৭৯-১৯৫৫)। অপেক্ষিকতাবাদের (Theory of Relativity) জনক। দক্ষিণ জার্মানীতে জন্ম। তাঁর তত্ত্ব প্রভাবিত করেছে আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞানের সব শাখাকে। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সাথে 'বোস-আইনস্টাইন' সংজ্ঞার জন্মদাতা। তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রিয় মানুষ ছিলেন, শান্তি আন্দোলনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান ছিল দ্বিধাহীন ও সুস্পষ্ট। এই বিজ্ঞান সাধক বলেছেন, 'The most beautiful thing we can experience is teh mysterious.'

এমন সময় ছিল যখন গুণী শিল্পীরা তাঁদের তরুণ বয়সে পর্যন্ত প্রশংসা পেয়েছেন। দ্বিতীয় জুলিয়াস[২] মাইকেল এঞ্জেলোর[৩] প্রতি দুর্ব্যবহার করলেও তিনি যে দক্ষ শিল্পী নন, তা কখনো ভাবেন নি। বর্তমান যুগের ধনপতিরা প্রবীণ শিল্পীদের তাদের সৃজন ক্ষমতা চলে গেলে তাঁদের প্রচুর অর্থ দান করতে পারেন কিন্তু কখনো তাঁদের সৃষ্টিকে নিজের চেয়ে বড় বলে ভাবেন না। সম্ভবত শিল্পীরা গড়ে বিজ্ঞানীদের চেয়ে যে কম সুখী তার পিছনে এইসব ঘটনার অবদান রয়েছে।

আমার নিশ্চিত ধারণা, পশ্চিমের স্বদেশের তরুণরা তাদের শ্রেষ্ঠ ক্ষমতার উপযুক্ত প্রয়োগক্ষেত্র না পাওয়ার কারণে অসন্তোষে ভুগছে। পূর্বদেশসমূহে অবশ্য কিন্তু এরকম নয়। বর্তমানে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় সম্ভবত রাশিয়ার তরুণরা বেশি সুখী। সেখানে তারা এক নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করছে এবং তা করার জন্যে তাদের রয়েছে এক উদ্দীনাময় বিশ্বাস। প্রাচীনদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, অনাহারে রাখা হয়েছে, নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে অথবা অন্য কোনওভাবে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে যাতে প্রত্যেক পশ্চিম দেশে তারা তরুণদের ক্ষতি করার অথবা ক্ষতি না করার মধ্যে একটাকে বেছে নিতে বাধ্য করে, তেমন কিছু করতে না পারে। জ্ঞানাভিমানী পাশ্চাত্যবাসীদের কাছে তরুণ রাশিয়ানদের বিশ্বাস অমার্জিত মনে হতে পারে, কিন্তু এর বিরুদ্ধেই বা বলবার কী আছে? সে সত্যি নতুন এক পৃথিবী সৃষ্টি করছে, তার মনের মতো পৃথিবী। যখন তার কাজ শেষ হবে, তখন রাশিয়ার মানুষ বেশি সুখী হবে। পশ্চিমের অভিজাত বুদ্ধিজীবীরা এই নতুন পৃথিবীতে সুখী না হতে পারেন, কিন্তু তাদের তো সেখানে বাস করতে হবে না, তাই যে কোনো বাস্তবধর্মী বিচারে তরুণ রাশিয়ানদের বিশ্বাসকে সমর্থন করা যায় এবং তত্ত্বগত কারণ ছাড়া একে অমার্জিত বলে নিন্দা করাকে কোনওভাবেই সমর্থন করা যায় না।

ভারত, চীন এবং জাপানে রাজনৈতিক অবস্থার ওপর বাইরের প্রভাব তাদের শিক্ষিতদের সুখে অন্তরায় হয়, কিন্তু সেখানে ভিতরের কোনও বাধা নেই যা

---

২. দ্বিতীয় জুলিয়াস, Pope Julius II (১৪৪৩-১৫১৩)। তিনি বিখ্যাত রোমান রাজা এবং ধর্মগুরু ছিলেন। তখনো চার্চ এবং রাষ্ট্র আলাদা হয়নি। তাঁর বীরত্বের খ্যাতি এবং রোমান পোপের জন্যে তিনি 'Papa Terrible' নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

৩. মাইকেল এঞ্জেলো, Michael Angelo (১৪৭৫-১৫৬৪)। ইটালির নবজাগরণ যুগের (Renaissance) বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পী, তাঁর চিত্রকলা আধুনিক মানুষদেরও বিস্ময়।

রয়েছে পশ্চিমের দেশে। এমন অনেক কাজ রয়েছে যা তরুণদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় এবং এইসব যতটা সফল হয় ততটাই তারা সুখী হয়। তারা মনে করে জাতীয় জীবনে তাদের একটা গুরুত্ববহ ভূমিকা রয়েছে এবং এমন সব লক্ষ্য রয়েছে যা অনুসরণ করা কঠিন হলেও তা অর্জন করা অসম্ভব নয়। পাশ্চাত্যের উচ্চশিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের মধ্যে এক ধরনের বিশ্বনিন্দুকতা বোধ দেখা যায়, যার সৃষ্টি আরাম এবং ক্ষমতাহীনতার যোগফল থেকে। ক্ষমতাহীনতা মানুষকে অনুভব করতে শেখায় যে, কোনও কিছুই কাজের নয় এবং আরাম এইসব বেদনাদায়ক অনুভূতিকে কোনওভাবে সহনশীলতার মধ্যে ধরে রাখে। অন্য দেশসমূহে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা জনমতের ওপর আরো বেশি প্রভাব বিস্তার করার আশা করে, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের ছাত্ররা তা পারে না। কিন্তু পাশ্চাত্যের ছাত্রের মতো প্রচুর উপার্জন করার সুযোগ তাদের অনেক কম। ক্ষমতাহীন অথবা অসচ্ছল হওয়ার কারণে সে হয় সংস্কারক অথবা বিপ্লবী, কিন্তু বিশ্বনিন্দুক হয় না। জনগণের ব্যাপার কোন পথে চলবে তার ওপর সংস্কারক অথবা বিপ্লবীর আনন্দ নির্ভর করে। কিন্তু সম্ভবত সে যখন ফাঁসির দড়ি পরতে যাচ্ছে, তখন একজন স্বাচ্ছন্দ্যভোগী বিশ্বনিন্দুকের চেয়ে বেশি বাস্তব আনন্দ অনুভব করে। এক চীনা যুবকের কথা মনে পড়ছে আমার যে আমার স্কুল দেখতে এসেছিল। সে চীনের প্রগতিবিরোধী অঞ্চলে এইরকম একটি স্কুল স্থাপন করবে বলে দেশে ফিরে যাচ্ছে। সে জানে এর ফলে তার হয়তো শিরচ্ছেদ হবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে এমন এক শান্ত আনন্দ অনুভব করছিল যার জন্যে আমি তাকে ঈর্ষা করি।

আমি এমন মন্তব্য করতে চাই না যে এ ধরনের আড়ম্বরপূর্ণ সুখই হচ্ছে বাঞ্ছনীয় একমাত্র সুখ। বাস্তবে এই সুখের পথ যাদের জন্যে খোলা, তারা হচ্ছে সংখ্যালঘু কারণ তার জন্যে প্রয়োজন এক ধরণের বিশেষ দক্ষতা এবং স্বার্থের প্রসারতা, যা খুব সাধারণ নয়। প্রখ্যাত বিজ্ঞানীরাই শুধু তাঁদের কাজে আনন্দ পেতে পারেন তা নয়। নেতৃত্বদানকারী রাষ্ট্রনেতারাও যে শুধু কোনও মতকে সমর্থনের ভিতর আনন্দ পেতে পারেন তাও নয়। কাজের আনন্দ যে কোনও মানুষের জন্যে উন্মুক্ত, যদি তিনি বিশেষ দক্ষতার অধিকারী হন, যদি না তিনি সাধারণের প্রশংসা পাওয়ার জন্যে তা করেন তাহলে তিনি তাঁর দক্ষতা প্রয়োগের মধ্যেই তৃপ্তি পেতে পারেন। আমি একজনকে জানতাম, যিনি শৈশবেই দুই পায়ের ব্যবহার-ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু তবু তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবন অবিচলিত সুখে অতিবাহিত করেছেন। এই সুখ তিনি লাভ করেছিলেন পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ একটা গ্রন্থ রচনা করে, যার বিষয়বস্তু ছিল গোলাপের কীট। এই বিষয়ে সবসময় তাঁকেই আমি প্রধান

বিশেষজ্ঞ বলে মনে করি। অনেক সংখ্যক শঙ্খ-বিজ্ঞানীর সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ আমি পাইনি। কিন্তু যাদের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে, তাদের কাছে সব সময় শুনেছি যারা শঙ্খ বিষয়ে গবেষণা করেন তাঁরা এর মধ্যে একধরণের পরিতৃপ্তি খুঁজে পান। একসময় আমি একজনকে জানতাম প্রেসের কম্পোজিটর হিসাবে পৃথিবীতে তাঁর তুলনীয় কেউ ছিল না এবং যারা সুন্দর সুন্দর হরফ তৈরী করতেন তারা তাঁর সাহায্য চাইতেন। তিনি সবার কাছ থেকে আন্তরিক শ্রদ্ধা পেতেন। যাদের শ্রদ্ধাকে কখনো কোনও ভাবে লঘু করে দেখা যায় না। কিন্তু তিনি যে আনন্দ লাভ করতেন তা সেই শ্রদ্ধালাভ থেকে ততটা নয়, যতটা পেতেন তাঁর নিজের নৈপুণ্য প্রয়োগ থেকে এবং এই সেই আনন্দ যা লাভ করেন একজন দক্ষ নৃত্যশিল্পী তাঁর নৃত্য থেকে, যার সাথেই শুধু তুলনীয় তা কাজ থেকে পাওয়া আনন্দ। আমি আরো অনেক কম্পোজিটরকে জানি যারা গণিতবিদ্যার বিভিন্ন হরফ, প্রাচীন নেস্টোরিয়ান হরফ অথবা কিউনিফর্ম হরফ এবং যা কিছু ভিন্নধর্মী এবং কঠিন তা সাজিয়ে দিতে পারদর্শী ছিলেন। তাদের পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত জীবন সুখের ছিল কিনা তা আমি জানতে পারিনি। কিন্তু কাজের সময় তাদের সৃজনদক্ষতা পূর্ণ চরিতার্থতা লাভ করত।

এটা বলা একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে পুর্বে শিল্পীরা তাদের কাজের দক্ষতায় যে আনন্দ পেতেন আমাদের এই যন্ত্র-যুগে শিল্পীরা সেই আনন্দ পাবার তেমন সুযোগ নেই। একথা সত্য যে মধ্যযুগের শিল্পীমহল যে ধরনের কাজ করতেন, বর্তমানের কারিগরদের কাজের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু যান্ত্রিকযুগের অর্থনীতিতে তাদের গুরুত্ব এবং প্রয়োজন রয়েছে। একদল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং সূক্ষ্ম কলকব্জা তৈরী করে, একদল নকসা তৈরী করে, একদল বিমান যান্ত্রিকের কাজ করে, একদল গাড়ি চালায় এবং আরো নানা ধরনের কাজে নানা কারিগর নিয়োজিত। যাদের ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রকাশ একেবারেই সীমিত অপেক্ষাকৃত প্রাচীন যুগে ফসলের মাঠে মজুর এবং কৃষক, যতদূর আমি দেখেছি মোটরচালক অথবা ইঞ্জিন চালকের মতো সুখী নয়। তবে একথা সত্যি যে কৃষক নিজের জমি আবাদ করে, তার কাজে বৈচিত্র্য আছে। সে নিজে চাষ করে, বীজ বোনে, ফসল কাটে, কিন্তু সে প্রকৃতির অধীন এবং এ বিষয়ে সে সচেতন। অন্যদিকে যে মানুষ আধুনিক যন্ত্র চালায় সে নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন। সে জানে মানুষই হল প্রকৃতির প্রভু, দাস নয়। তবে একথাও অবশ্য সত্যি যে তাদের যারা যান্ত্রিক মনের, যারা দিনের পর দিন বৈচিত্র্যহীন একই যান্ত্রিক ক্রিয়া পুনরাবৃত্তি করে চলেছে তাদের কাজে কোনও স্বাদ নেই এবং সেই কাজ যত স্বাদহীন হোক, ততই তা যন্ত্রের সাহায্যে করা যাবে। যান্ত্রিক উৎপাদনের

শক্ত। এ কথা সত্যি যা থেকে আমরা অনেক দূরে, সেটা হচ্ছে একটা পদ্ধতি যাতে মানুষকে অনাকর্ষণীয় কাজ যন্ত্রের সাহায্যে করা যাবে। আর সেখানে যে কাজে বাধ্যতা এবং প্রেরণা আছে সে কাজের জন্যে মানুষকে আলাদা করা যেতে পারে। এইরকম পৃথিবীতে কাজে একঘেয়েমি কম হবে এবং অবসাদও কমে যাবে যা কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে কখনো হয়নি। চাষব্যবস্থা গ্রহণ করে মানুষ অনাহারের কবল থেকে বাঁচার জন্যে একঘেয়েমি ও ক্লান্তিকে মেনে নিয়েছে। যখন শিকারের সাহায্যে মানুষ খাদ্য সংগ্রহ করত এবং তখন কাজই ছিল তার কাছে আনন্দ। তার প্রমাণ ধনবানরা এখনও আনন্দ উপভোগের জন্যে আদিপুরুষদের এই শিকার বৃত্তিকে অনুসরণ করে চলেছে। কিন্তু কৃষিকাজ আবিষ্কারের পর থেকে মানুষ নীচতা, দুর্ভোগ এবং উন্মত্ততার এক সুদীর্ঘ যুগে প্রবেশ করেছে। যা থেকে মাত্র এখন তারা মুক্ত হয়ে যন্ত্রের কল্যাণময় কাজের সাথে যুক্ত হতে চলেছে। মাটির স্পর্শের যে অনুভূতি তা শুনতে ভাল লাগে অনুভূতিপ্রবণদের কাছে, ভাল লাগে হার্ডির[৪] সৃষ্টি, দার্শনিক কৃষকদের পক্ক জ্ঞানের কথা, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটি তরুণের একমাত্র কামনা শহরে কাজ পাওয়া, যেখানে সে পাবে জল-হাওয়ার দাসত্ব এবং আলোহীন দীর্ঘ শীতের সন্ধ্যার একাকীত্ব থেকে এবং কলকারখানা এবং প্রেক্ষাগৃহের মানবিক পরিবেশে প্রবেশ করতে পারবে। সাধারণ মানুষের সুখের প্রথম উপাদান হল সাহচর্য এবং সহযোগিতা যা কৃষি থেকে শিল্পে অনেক পূর্ণতার সাথে পাওয়া যায়। আমি শুধু নির্যাতিত শ্রেণীসমূহের বিপ্লবী, সমাজতন্ত্রী ও জাতীয়তাবাদীদের কথা বলছি না, আমি অনেক সাধারণ ধরণের বিশ্বাসের কথাও চিন্তা করছি। আমি এমন কয়েকজন লোককে জানি যারা বিশ্বাস করতেন ইংরেজরা ইফ্রেইম ও মানাস[৫] উপজাতির বংশধর, তাদেরও আনন্দের কোনও সীমা নেই। আমি এই কথা বলছি না যে পাঠক এইসব ধারণা বিশ্বাস করুন, কারণ যে বিশ্বাসের কোনও ভিত্তি নেই, যা আমার কাছে ভুল বিশ্বাস বলে মনে হয় তা থেকে সুখ লাভ করতে। এই একই কারণে আমি

---

৪. হার্ডি, Thomas Hardy (১৮৪০-১৯২৯)। ভিক্টোরীয় যুগের কবি এবং ঔপন্যাসিক। তাঁর সাহিত্যে নিষ্ঠুর নিয়তি এবং জীবনের গভীর দুঃখবাদের প্রতিফলন দেখা যায়। তাঁকে 'English Author of the naturalist movement' রূপে অভিহিত করা হয়।

৫. ইফ্রেইম ও মানাস, Ephraim and Manasseh, বাইবেলের পুরাতন নিয়ম (Old Testament) - এ বর্ণিত যোসেফের দুই পুত্র। সুসমাচারের (Gospel) অন্তর্লীন সত্যের একটা, যাতে নির্দেশিত হয়েছে খ্রিস্টবাদীদের জীবনযাপনের বিধি এবং অনন্ত জীবনের

পাঠককে এই কথা বিশ্বাস করতে জোর দিচ্ছি না যে, মানুষ একমাত্র [illegible] ওপর নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকুক। যদিও যতদূর পর্যন্ত আমার [illegible] পৌঁছায়, আমি দেখেছি এই ধরণের বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত আনন্দ লাভ হয়, যা [illegible] সুখের জন্যে কোনও কোনও বিশ্বাসে যাদের উৎসাহ যথার্থ, তারা এর [illegible] তাদের অবসর সময়ের একটা কাজ পেয়ে যান এবং জীবনটা শূন্য— এই [illegible] অনুভূতি তারাও তাদের মনোরোগের এক পূর্ণ প্রতিকার পেয়ে যান। [illegible] একটা শখে ডুবে থাকা, অজ্ঞাত বিশ্বাসে আনুগত্য পোষণ করা থেকে খুব [illegible] নয়। একজন প্রখ্যাত জীবিত গণিতবিদ তাঁর সময়কে গণিত চর্চা এবং ডাকটিকিট সংগ্রহ এই দুই কাজের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন। আমি মনে [illegible] প্রথমটাতে যখন তিনি অগ্রসর হতে পারেন না, সেইসব মূহূর্তে দ্বিতীয়টার [illegible] তিনি সান্ত্বনা পেতেন। গণিতের প্রতিপাদ্য প্রমাণে দূরূহতা একমাত্র দুঃখ [illegible] ডাকটিকিট সংগ্রহ দূর করতে পারে অথবা ডাকটিকিটই একমাত্র জিনিস [illegible] সংগ্রহ করা যায়। একবার বিবেচনা করে দেখুন, পুরোনো চিনেমাটির [illegible] নস্যির কৌটো, রোমান মুদ্রা, তীরের ফলা, প্রস্তরযুগের যন্ত্রপাতি সংগ্রহের [illegible] ভিতর কী বিশাল উচ্ছ্বাস ফুটে ওঠে মানসপটে। একথা সত্যি যে আমাদের [illegible] অনেকেই এত উচ্চস্তরের যে এইসব সরল আনন্দে কোনও মূল্য পায় না। [illegible] আনন্দ আমরা সকলেই ছোটবেলায় উপভোগ করেছি, কিন্তু যে কোনও কারণে [illegible] হোক এসবকে এখন বয়স্কদের জন্যে অনুপযুক্ত মনে করছি। এই ধারণা [illegible] ভুল, অপরের পক্ষে অনিষ্টকর নয়, এমন যে কোনও আনন্দকেই মর্যাদা [illegible] উচিত। আমি নিজে নদীর তথ্য সংগ্রহ করি। ভলগা নদীর ভাটি এবং [illegible] নদীর উজান বেয়ে চলার পথে আনন্দ পেয়েছি এবং আমাজন ও ওরিনোকো [illegible] কখনো দেখিনি বলে আমার খুব দুঃখ। এই ধরণের সব আনন্দের অনুভূতি [illegible] সরল। আমি তার জন্যে লজ্জিত নই। অথবা বেসবল খেলায় উৎসাহীদের [illegible] বিবেচনা করুন, প্রবল আগ্রহের সাথে তারা সংবাদপত্র পড়েন আর রেডিওতে [illegible] বর্ণনা তাদের মনে দারুণ রোমাঞ্চ জাগায়। আমেরিকার এক বিখ্যাত সাহিত্যিক [illegible] সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তাঁর বই পড়ে আমার মনে হয়েছিল তাঁর [illegible] বিষাদময়তায় ভরা, কিন্তু ঘটনাচক্রে সেই সময়ে রেডিওতে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বেসবল খেলার ফল ঘোষিত হচ্ছিল। তিনি সেই মুহূর্তে আমার কথা ভুলে [illegible] ভুলে গেলেন সাহিত্য এবং আমাদের জাগতিক জীবনের সব দুঃখ-যন্ত্রণা। [illegible] প্রিয় দলের জয়লাভে তিনি আনন্দে চিৎকার করতে লাগলেন। এই ঘটনার [illegible] থেকে তাঁর বই পড়ার সময়, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রদের দুর্ভাগ্যে আর কষ্ট পাইনি।

খেয়াল এবং শখ অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবত অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৌল আনন্দের উৎস নয়, কিন্তু শুধু বাস্তবতা থেকে পালিয়ে বেড়ানোর একটা উপায়। কোনও কোনও কঠিন বেদনার মুখোমুখি হওয়াকে মুহূর্তের জন্যে ভুলে থাকা, মৌল আনন্দ সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল যার ওপর, যাকে বলা হয় মানুষ এবং বস্তুর ওপর সৌহার্দ্যপূর্ণ কৌতূহল।

মানুষের বিষয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ কৌতূহল স্নেহময় আবেগের একটি ধরণ। কিন্তু সব রূপে নয়, যার মধ্যে কর্তৃত্ব বা অধিকারের ভাব থাকে অথবা কাছ থেকে জোর করে পাওয়ার প্রত্যাশা। শেষোক্ত ধরণটি প্রায় ক্ষেত্রে দুঃখের কারণ হয়। যে ধরণটি সুখের কারণ ঘটায় তা হচ্ছে মানুষকে গভীরভাবে লক্ষ্য করা, তা ব্যক্তিগত সাহচর্য্যে আনন্দ পাওয়া, যারা সংস্পর্শে আসবে তাদের কৌতূহল বা আনন্দ প্রকাশের সুযোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করা, তাদের ওপর প্রভাব খাটাতে না চাওয়া অথবা তাদের কাছ থেকে উৎসাহজনক প্রশংসা পাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করা। যে ব্যক্তি অন্যদের সম্পর্কে আন্তরিকভাবে এইরকম ভাবেন তিনি যেমন অন্যদের কাছে আনন্দের উৎস, বিপরীতভাবে তাঁরাও তার কাছে মমতার গ্রাহক। তার সঙ্গে অন্যদের সম্পর্ক হালকা অথবা গভীর হোক তার কৌতূহল এবং মমতা সবারই জন্যে তৃপ্তিকর, অকৃতজ্ঞতায় বিষময় নয়। কারণ অকৃতজ্ঞতা তিনি পাবেন না এবং পেলে তা খুব কম লক্ষ্য করবেন যে মেজাজ-বৈশিষ্ট্য অন্য লোকের স্নায়ুর ওপর চাপ দিয়ে তাকে প্রায় ক্রুদ্ধ করে তোলে, সেই একই মেজাজ-বৈশিষ্ট্যতার কাছে মৃদু আমোদের উৎস হয়ে উঠবে। অন্য লোক কঠিন পরিশ্রম করেও যা পান না, তা তিনি বিনা শ্রমে পেয়ে যাবেন। নিজেকে নিয়েই নিজে সুখী থাকাতে তিনি একজন মনোরম সঙ্গী হবেন এবং এতে তাঁর সুখ আরো বেড়ে যাবে। কিন্তু এর ফলে যেন নির্ভেজাল হয়,এসব যেন কর্তব্যবোধের তাগিদ থেকে এক ধরণের আত্মত্যাগের ধারণা থেকে না আসে। কর্তব্যবোধ কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্কে আক্রমণাত্মক, মানুষ অন্যের কাছে পছন্দের হতে চায়, কর্তব্যের পাত্র হতে চায় না, অনেক লোককে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং চেষ্টাবিহীন আনন্দ করা মনে হয় ব্যক্তিগত আনন্দের সব উৎসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

পূর্ব অনুচ্ছেদে আমি বিভিন্ন জিনিসে সৌহার্দ্যপূর্ণ কৌতূহলের কথা বলেছি। কথাটি আরোপিত মনে হতে পারে। কোনও জিনিসের বন্ধুত্বপূর্ণ অনুভব করা অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু ভূতত্ত্ববিদ পাথর নিয়ে, পুরাতত্ত্ববিদ ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন কীর্তি নিয়ে যে বন্ধুত্বভাব ধারণ করেন তা ঐ কৌতূহলের অনুরূপ। আর এই কৌতূহল ব্যক্তি বা সমাজের যে মনোভাব তারই একটি উপাদান হতে পারে। কোনও জিনিস যদি বন্ধুভাবাপন্ন না হয়ে শত্রু ভাবাপন্ন হয়, তাহলে তার প্রতিও

কৌতূহল বজায় রাখা সম্ভব। কোনও মানুষ মাকড়সার স্বাভাবিক বাসস্থান বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন কারণ তিনি মাকড়সাকে ঘৃণা করেন এবং সেখানে বাস করতে চান যেখানে তারা সংখ্যায় কম। এই কৌতূহল সে তৃপ্তি দেবে না, যা লাভ করেন ভূতত্ত্ববিদ পাথর থেকে। আমাদের চতুষ্পার্শ্বের অবস্থানরত জীবদের চেয়ে অব্যক্তিগত জিনিসে কৌতূহল দৈনন্দিন সুখের উপকরণ হিসাবে সম্ভবত কম মূল্যবান, তবুও এর গুরুত্ব কম নয়। পৃথিবীর বিস্তৃতির যেন সীমা নেই কিন্তু আমাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। যদি আমাদের সুখ ব্যক্তিগত বিষয়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ রাখা যায়, তাহলে জীবন যেটুকু দিতে পারে তার থেকে বেশি না করাটা কঠিন হয়ে পড়ে। এবং বেশি দাবি করার অর্থই হল যা পাওয়া সম্ভব তার চেয়ে কম পাওয়া। যে মানুষ নিজের দুঃখ ভুলে থাকতে পারেন, খ্রিস্টিয় ট্রেন্টের কাউন্সিল বা নক্ষত্রের জন্ম ইতিহাস নিয়ে খাঁটি কৌতূহলের কারণে, তিনি যখন নৈর্ব্যক্তিক পৃথিবী-পরিক্রমণ শেষে নিজের পরিবেশে ফিরে আসেন তখন তিনি দেখতে পান এমন একটি ভারসাম্য ও প্রশান্তি তিনি লাভ করেছেন যাতে সব দুঃখকে জয় করা সহজতম পথেই সম্ভব হয়েছে এবং এর মধ্যেই নশ্বর হলেও তিনি এক নির্ভেজাল আনন্দ লাভ করেছেন।

সুখলাভের গোপন সূত্রটি হচ্ছে এই— আপনার কৌতূহলকে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর সীমায় ছড়িয়ে দিন। আপনার যেসব ব্যক্তি বা বিষয়ে কৌতূহল তাদের প্রতি আপনার প্রতিক্রিয়া বৈরীভাবাপন্ন না হয়, বন্ধুসুলভ হোক। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে সুখলাভের সম্ভাব্য উপায়গুলির এই প্রাথমিক সমীক্ষাটি আরো বিস্তারিত করা হবে এবং তার সাথে দুঃখের মনস্তাত্ত্বিক উৎসসমূহের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় এবং সে ব্যাপারে আলোচনা করা হবে।

১১
উদ্দীপনা

এই অধ্যায়ে, যাকে সুখী মানুষের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং বিশ্বজনীন [illegible] বলে মনে করি, সেই উদ্দীপনা নিয়ে আলোচনা করব।

এই উদ্দীপনা বলতে কী বোঝায় সম্ভবত তা বুঝিয়ে বলার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে [illegible] ভোজনের সময় বিভিন্নভাবে যে আচরণ প্রকাশ করেন তা নিয়ে আলোচনা করা। আহারের বস্তু যত ভালই হোক, অনেকের কাছে আহার শুধুই বিরক্তিকর, [illegible] এতে কোনও স্বাদ পান না। আগে তারা উৎকৃষ্ট খাদ্য খেয়েছেন সম্ভবত [illegible] আহারের সময়। ক্ষুধা অতি কাতর না হওয়া পর্যন্ত না খেয়ে থাকার [illegible] অভিজ্ঞতা তাদের নেই এবং তারা যে সমাজে বাস করেন সেই সমাজের [illegible] রীতি হিসাবেই তারা খাদ্যকে দেখেছেন। অন্যান্য সব কিছুর মতো [illegible] তাদের কাছে ক্লান্তিকর। কিন্তু এটা নিয়ে অকারণ ব্যস্ত হওয়া অর্থহীন। [illegible] অন্য কোনও কিছুই এর চেয়ে কম ক্লান্তিকর নয়। তারপর ধরুন [illegible] হীনদের কথা, তারা কর্তব্যবোধ থেকে খান, কারণ চিকিৎসকের নির্দেশ হল [illegible] পুষ্টির জন্যে কিছু তাদের খেতেই হবে। তারপর ভোজনবিলাসীদের কথা, [illegible] খুব আশা নিয়ে শুরু করেন, কিন্তু তারপর দেখেন রান্না যতটা ভাল হওয়া [illegible] ছিল তা হয় নি। তারপর পেটুকদের কথা। যারা খাওয়ার আয়োজন [illegible] লোলুপের মতো খেতে থাকে এবং বেশি খেয়ে ফেলেন। তারপর [illegible] ভোজনের অস্বস্তিতে ভুগতে থাকেন। সবার পরে যাদের কথা বলছি তারা [illegible] ক্ষুধা নিয়ে খেতে বসেন, আনন্দের সঙ্গে যতটা প্রয়োজন ততটাই খান এবং [illegible] করেন। আর যারা জীবনের ভোজে বসেছেন, জীবনের যা কিছু সুন্দর তার [illegible] তাদের আগ্রহ সমতুল্য। ভোজনকারীদের মধ্যে সবার শেষে যার কথা [illegible] লাম, তিনি সুখী মানুষের অনুরূপ। ক্ষুধার সাথে খাদ্যের যে সম্পর্ক, জীবনের [illegible] উদ্দিপনারও তাই। যে মানুষ আহারে বিরক্তিবোধ থেকে আহার করেন তিনি [illegible] সমতুল্য। আর পেটুক ইন্দ্রিয়বিলাসীর সগোত্র। পেটুক ছাড়া অন্য [illegible] যে ব্যক্তি স্বাভাবিক ক্ষুধা বোধ করে তাকে ভালভাবে দেখে না এবং [illegible] তার অপেক্ষা উচ্চস্তরের মনে করেন। ক্ষুধার খাদ্যকে উপভোগ করা [illegible] কাছে অমার্জিতসুলভ আচরণ এবং জীবনকে উপভোগ করাও তাই। কারণ [illegible] বিভিন্ন মনোমুগ্ধকর ঘটনায় পূর্ণ এবং বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার উৎস। যাদের [illegible] সাধারণ মানুষ বলে তুচ্ছ করেন তাদের মোহমুক্তির উচ্চতা থেকে নিচের [illegible] মানুষরূপেই দেখেন। আমি এই দৃষ্টি ভঙ্গীকে মোটেই সমর্থন করি না।

সবরকম মোহমুক্তিকেই আমি একটি রোগ বলে মনে করি। কোনও বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ কোনও বিষয়ে অনিবার্যরূপে মোহমুক্তি ঘটতে পারে, এটা সত্যি; কিন্তু যখনই ঘটুক অবিলম্বে সেই রোগটা সারিয়ে নেওয়া উচিত এবং তাকে জ্ঞানের উচ্চতর পর্যায়রূপে ভাবা ঠিক নয়। ধরা যাক কোনও একজন লোক স্ট্রবেরি ফল খেতে পছন্দ করেন, অন্যজন পছন্দ করেন না, তাহলে কোন্ দিক থেকে পরের লোকটি আগের জনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হন? সেইসব স্ট্রবেরি ভাল অথবা ভাল নয় তার কোনও বস্তু বা ব্যক্তিনিরপেক্ষ প্রমাণ নেই। যিনি স্ট্রবেরি পছন্দ করেন তার কাছে ওটা ভাল, যিনি করেন না তার কাছে ওটা ভাল নয়। কিন্তু যিনি পছন্দ করেন, তিনি তার থেকে একটা আনন্দ পান, অন্যে তা পান না। তাই যিনি আনন্দ পান, তার কাছে ততটুকু উপভোগ্য এবং যে পৃথিবীতে দুইজনকেই বাস করতে হয়, সেখানে তিনিই বেশি মানিয়ে নিতে পারবেন। এই তুচ্ছ বিষয়ে যা সত্যি, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও তাই সত্যি। যে ব্যক্তি ফুটবল খেলা দেখে আনন্দ পান আর যিনি পান না, তার চেয়ে সেই পরিমাণ বড়, যে ব্যক্তি বই পড়ে আনন্দ পান আর যিনি পান না, তার চেয়ে আরো বেশি বড়, কারণ বই পড়ার সুযোগ অনেক বেশি পাওয়া যায় ফুটবল খেলা দেখার চেয়ে। যিনি যত বেশি জিনিসে উৎসাহী তার জন্যে আনন্দের উপকরণ ততটাই বেশি। কারণ ভাগ্যের দয়ার ওপর তিনি নির্ভরশীল নন। কারণ তিনি একটা হারালে অন্যটা খুঁজে নিতে পারেন। মানুষের জীবনায়ু বড় কম, তাই সব বিষয়ে উৎসাহী হওয়া যায় না। কিন্তু সময়কে ভরিয়ে রাখার জন্যে যত বেশি বিষয়ে উৎসাহী হওয়া যায় তত ভাল। আমরা সকলেই অন্তর্বৃত রোগের প্রবণতার দিকে ঝুঁকে থাকি, যিনি তার সামনে পৃথিবীর বিচিত্র সব দৃশ্য ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও দৃষ্টিকে ফিরিয়ে অন্তর্শূন্যতার দিকে তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু আমরা যেন এমন কিছু কল্পনা না করি যে এই অন্তর্বৃত মানুষটি অসন্তোষের মধ্যে চমকপ্রদ কিছু রয়েছে।

সসেজ তৈরীর দুটি যন্ত্রের গল্প বলি। একদা কুশল হাতের তৈরী দুটি উৎকৃষ্ট যন্ত্র ছিল, যাদের কাজ ছিল শূকর মাংস থেকে সুস্বাদু সসেজ তৈরী করা। প্রথমে একটি যন্ত্র সসেজ তৈরীতে খুবই উৎসাহী ছিল এবং প্রচুর পরিমাণে তৈরী করল। অন্য যন্ত্রটি বলল, "শুকর মাংসে আমার কী হবে, আমার নিজের কাজ ওর থেকে অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক এবং বিস্ময়কর।" সে এরপর শূকর মাংস নিতে অস্বীকার করে নিজের ভিতরকার সব কিছু পরীক্ষা করতে আরম্ভ করল, এইভাবে স্বাভাবিক খাদ্য বিহীনতায় তার ভিতরের সব কলকব্জা অকেজো হয়ে পড়ল এবং যতই তা নিয়ে সমীক্ষা করতে লাগল ততই তা তার কাছে শূন্য এবং তুচ্ছ মনে হতে লাগল। এই উৎকৃষ্ট যন্ত্রটার শুকর-মাংসের লোভনীয় রূপান্তর ঘটাবার যে ক্ষমতা

... ছিল তা নষ্ট হয়ে গেল, সে জানতেই পারল না তার ক্ষতির পরিমাণ। যে ... জীবনের উদ্দীপনা হারিয়েছেন তার সাথে তুলনা করে চলে এই দ্বিতীয় ... টির আর যিনি তা ধরে রেখেছেন তার সাথে তুলনা চলে প্রথম যন্ত্রটির। ... মন এক অদ্ভুত যন্ত্র। যেসব পদার্থ তাকে দেওয়া হয়, অত্যন্ত ... ভাবে সে তাদের সংযুক্ত করে দেয়, কিন্তু বাইরের পৃথিবী থেকে ... না পেলে সে শক্তিহীন হয়ে যায়। তবে মনকে তার প্রয়োজনীয় উপকরণ ... সংগ্রহ করে নিতে হয়, সসেজ-যন্ত্রকে যা করতে হয় না। ঘটনার প্রতি ... যে আগ্রহ, তার মাধ্যমেই তারা অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হয়। যদি তারা ... আগ্রহ সৃষ্টি করতে না পারে তাহলে তারা আমাদের কাজে লাগে না। ... মনোযোগ অন্তর্মুখী তিনি দৃষ্টিকে আকর্ষণ করার মতো কিছু দেখতে ... না, পক্ষান্তরে যার মনোযোগ বহির্মুখী, নিজের ভিতর তিনি খুঁজে পান, ... দুর্লভ মুহূর্তে বিচিত্র রকমের সব উপকরণ খণ্ডিত হয়ে আবার মিশে গিয়ে, ... এবং শিক্ষণীয় কত নতুন নতুন রূপে ফুটে উঠেছে।

... রকম অসংখ্য। শারলক হোমসের[১] কথা মনে করুন। তিনি পথ ... একটা টুপি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, তিনি এই টুপির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ... বলেছিলেন, এই টুপির মালিক মদ্য পানের ফলে অধঃপতন ডেকে এনেছে ... তার পত্নী আর আগের মতো তাকে ভালবাসে না। এইভাবে হঠাৎ পাওয়া ... যার মনে এত গভীর উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারে তার কাছে জীবন ... নিরক্তিকর হতে পারে না। গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করার সময় কত রকমের ... লক্ষ্য করা যেতে পারে একবার চিন্তা করে দেখুন। কেউ হয়তো পাখিদের ... উৎসাহী, কেউ গাছপালায়, কেউ ভূতত্ত্বে, কেউ কৃষিতে, কেউবা অন্য ... । এর মধ্যে যে বিষয়ে আপনার আগ্রহ তাই আপনাকে আনন্দ দেবে, অন্য ... কিছু যদি সমান হয় এবং এর একটিতে যদি আগ্রহী হয়ে থাকেন তিনি, ... সবদিকে আগ্রহহীন ব্যক্তির চেয়ে তিনি এই বিশ্বের সাথে নিজেকে মানিয়ে ... পক্ষে উপযুক্ত।

... মানুষের সহচরদের প্রতি আচরণ কত বিচিত্র রকমভাবে আলাদা, দীর্ঘ ... একজন যাত্রী তার সহযাত্রীদের একজনকেও লক্ষ্য করলেন না। অথচ

... হোমস, Sherlock Homes। আর্থার কোনান ডয়েল, Sir Arthur Conan ... (১৮৫৯-১৯৩০) রহস্য উপন্যাসের জন্যে বিশ্ববিখ্যাত, পেশায় ছিলেন ... । লন্ডনের ২২১, বেকার স্ট্রীট ছিল গোয়েন্দা শারলক হেমসের ঠিকানা ... ১৮৮৪)।

অন্য একজন তাদের সবার সম্পর্কে একটা ধারণা গঠন করে নিলেন, তাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করলেন, তাদের কার কেমন অবস্থা তা নিয়েও অনুমান তৈরী করে নিলেন, এমন কী তাদের অনেকের গোপন কথাও, মনে হয় তিনি জেনে নিলেন। অন্যদের সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তির আচরণের মধ্যে যতটুকু পার্থক্য, অন্যান্য ব্যাপারে ধারণা-গঠনেও ততটুকু পার্থক্য। কারো কারো কাছে আবার প্রত্যেক মানুষই বিরক্তিকর, অন্যেরা কারো সাথে পরিচিত হলে খুব সহজেই এবং অল্প সময়ে তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরী করে নেন, যদি তাকে অন্যরকম ভাবার নিশ্চিত কোনও কারণ না থাকে। আবার একই বিষয় ভ্রমণের কথা ধরা যাক। কিছু মানুষ আছেন যারা দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করেন, সবসময় সেরা হোটেলে ওঠেন, বাড়িতে যেমন খাবার খান ঠিক তেমন খান। দেশে যেমন অলস ধনীদের সাথে আড্ডা দিতেন, সেখানেও তাই করেন। বাড়িতে নিজেদের ডিনার-টেবিলে যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন সেখানেও সেই একই বিষয়ে চর্বিত চর্বণ করেন। যখন তারা ফিরে আসেন অনেক ব্যয়বহুল ভ্রমণের একঘেয়েমি যে সৃষ্টি হল, সেটাই হয় তাদের কাছে একমাত্র আরামের অনুভূতি। অন্য এক ধরনের লোক তারা যেখানেই যান, সেখানকার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন; স্থানীয় লোকদের সাথে ভাব জমান, স্থানীয়ভাবে সামাজিক বা ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ দেখে নেন, সেখানকার বিশেষ খাওয়া খান, সেখানকার রীতিনীতি এবং স্থানীয় ভাষা শিখে নেন এবং যখন বাড়ি ফিরে আসেন তখন বয়ে আনেন সুখকর কিছু ভাবনা যা উপভোগ করবেন দীর্ঘ শীতের সন্ধ্যায়।

এইসব আলাদা আলাদা পরিস্থিতিতে যে ব্যক্তির জীবনে ভোগের উদ্দীপনা আছে, তার সুবিধা যার নেই তার চেয়ে বেশি। এমনকি অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতাও তার কাজে লাগে। আমি খুব খুশী যে চীনের জনতা এবং সিসিলির একটি গ্রামের ঘ্রাণ আমি পেয়েছি, যদিও আমি বলছি না যে সে সময় আমার তা অত ভাল লেগেছিল। দুঃসাহসী লোক জাহাজডুবি, বিদ্রোহ, ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড এবং সবরকম তিক্ত অভিজ্ঞতা উপভোগ করে যতক্ষণ তা স্বাস্থ্য হানির সীমা ছাড়িয়ে না যায়। ভূমিকম্প হলে তারা নিজেকে হয়তো বলে : 'এই হল ভূমিকম্প!' এতে খুশি হয় এই নতুন একটি বিষয়ে পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞান সমৃদ্ধ হল বলে। এইসব লোক যে ভাগ্যের হাতে বিড়ম্বিত হন না, একথা বললে সত্য বলা হবে না, যদি তাদের স্বাস্থ্যের অবনতি হলে তাদের উদ্দীপনাও কমে যেত, যদিও নিশ্চিত সে কথা বলা যায় না। এমন এমন লোকদের জানি যাদের বছরের পর বছর ধীরে যন্ত্রণা দেওয়ার ফলে তাদের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত তারা উদ্দীপনা হারান নি। কোনও কোনও রোগ উদ্দীপনা নষ্ট করে দেয়,

করে না। আমি জানি না জৈব রসায়নবিদরা এই দুয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তার সন্ধান পেয়েছেন কিনা, সম্ভবত জৈব রসায়নবিদ্যা আরো উন্নত হলে এমন ট্যাবলেট আবিষ্কৃত হবে যা খেলে প্রত্যেকটি জিনিসে নিশ্চিতরূপে আমাদের আগ্রহ জন্মাবে। কিন্তু সেদিন না আসা পর্যন্ত কিছু লোক সব বিষয়ে আগ্রহী হন কেন এবং কিছু লোক কোনও বিষয়েই আগ্রহী নন কেন, সে ব্যাপারে আমাদের সাধারণ-জ্ঞান থেকে প্রাপ্ত অনুমানের ওপরেই নির্ভর করে থাকতে হবে।

উদ্দীপনা কখনো সাধারণ, কখনো বৈশিষ্ট্য সূচক। এটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণও হতে পারে। বরো লিখিত 'রোমানি রাই'[২] উপন্যাসের একটি চরিত্রের কথা পাঠকদের মনে থাকতে পারে। তিনি স্ত্রীকে হারানোর পর, যার প্রতি ছিল তার অবিচল নিষ্ঠা, সাময়িকভাবে তার মনে হয়েছিল জীবন যেন শূন্য হয়ে গেছে। কিন্তু ক্রমে আগ্রহী হয়ে উঠলেন চায়ের পাত্রে এবং চায়ের বাক্সে লেখা চীনা লিপিতে এবং একটি ফরাসী-চীন ব্যাকরণের সাহায্যে এবং সেই উদ্দেশ্যে ফরাসী ভাষা শিখে ধীরে ধীরে তার পাঠোদ্ধার করতে সমর্থ হলেন। এর ফলে জীবনের প্রতি তার একটা নতুন উৎসাহ জন্মাল, যদিও তিনি এই চীনা ভাষার জ্ঞান অন্য কোনও কাজে ব্যবহার করেন নি। আমি এমন লোকদের জানি যারা খ্রিস্টান অতীন্দ্রিয়বাদীদের প্রচলিত মতো সম্পর্কে যা কিছু জানবার তা নিয়ে নিবিষ্ট থাকতে এবং অন্যদের দেখেছি হব্‌স[৩]-এর গ্রন্থাবলীর প্রথম দিককার সংস্করণ এবং পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ এবং সেগুলি মিলিয়ে দেখা নিয়ে নিবিষ্ট থাকতো কোথায়, কীসে কোন্ মানুষের আকর্ষণ তা আগে বলা অসম্ভব। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কোনও কোনও বিষয়ে অতি আগ্রহী হতে পারে এবং একবার যদি তেমন কোনও আগ্রহ জাগে তা হলে তাদের জীবন একঘেয়েমির কবল থেকে মুক্তি পেতে পারে। বিশেষ কোনও বিষয়ের ওপর আগ্রহ, জীবনের সাধারণ উদ্দীপনার চেয়ে কম তৃপ্তিদায়ক সুখের উৎস, কারণ তা মানুষের সময়ের সবটুকু পূর্ণ করতে পারে না। তাছাড়া যে বিশেষ বিষয়ে তার উৎসাহ, সে বিষয়ে সব জানতে পারার বিপদও আছে।

---

১. রোমানি রাই, Romany Rye, ঔপন্যাসিক জর্জ বরো, George Borrow (১৮০৫-১৮৮১) এর বিখ্যাত উপন্যাস, রচিত হয় ১৮৫৭-তে। এই উপন্যাস লেখকের আত্মজৈবনিক বলে মনে করা হয়। শুধু উপন্যাস নয় জর্জ বরো ইংরেজি সাহিত্যে ভ্রমণ কাহিনী রচনার জন্যেও বিখ্যাত। সেসব কাহিনীতে চিত্রিত হয়ে আছে পথ চলার বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং যাযাবর জীবনের ভিন্ন সুর।

২. হবস, Thomas Hobbes (১৫৮৮-১৬৭৯)। বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক এবং রাষ্ট্রনীতিবিদ। তাঁর রাজনৈতিক দর্শন সংক্রান্ত কাজের জন্যে এখনো তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়।

নিশ্চয় আপনাদের মনে আছে ভোজের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ধরনের যেসব মানুষের কথা উল্লেখ করেছিলাম তার মধ্যে পেটুকও ছিল, কিন্তু আমরা তাদের প্রশংসা করতে পারিনি। পাঠক ভাবতে পারেন যে সব উদ্দীপ্ত লোককে প্রশংসা করা হয়েছে তাদের সাথে পেটুকের পার্থক্য সুনির্দিষ্ট নয়। কিন্তু আরো নির্দিষ্টভাবে দু'ধরনের মানুষের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরার সময় এখন এসেছে।

প্রত্যেকেই জানেন প্রাচীনরা সংযমকে চরিত্রের একটা আবশ্যকীয় গুণ বলে মনে করতেন। রোমান্টিকতা এবং ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে অনেকে এই ধারণা পরিত্যাগ করেন এবং প্রবল প্রবৃত্তি উৎসারিত সব আবেগকে প্রশংসা করেন, এমন কী যদি তারা বায়রনের নায়কদের মতো ধ্বংসাত্মক এবং সমাজবিরোধী হন তবুও। প্রাচীনদের মতো স্পষ্টভাবে উৎকৃষ্টও সৎ জীবনে বিভিন্ন কাজের মধ্যে একটা সমন্বয় থাকা খুব প্রয়োজন এবং এসবের মধ্যে কোনও একটাকে এত দূরে টেনে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়, যাতে অন্যসব কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। পেটুক লোক ভোজনের কাছে আর সব আনন্দকে বিসর্জন দিয়েছে আর তার ফলে জীবনের সমগ্র আনন্দকে কমিয়ে দিয়েছে। ভোজনের মতো অন্যান্য প্রবৃত্তিও চরমের দিকে টেনে নিয়ে যায়। পোশাকের ব্যাপারে সম্রাজ্ঞী জোসেফিন[৪] ছিলেন পেটুকদের মত, প্রথমদিকে নেপোলিয়ন জোসেফিনের পোশাক তৈরীর বিল নিজে মিটিয়ে দিতেন, যদিও ক্রমাগত প্রতিবাদের মাত্রা বাড়িয়ে চলতেন। অবশেষে তিনি জোসেফিনকে বললেন, তাঁর সংযম-শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং ভবিষ্যতে বিলের অংক যুক্তিসংগত মনে হলে তবেই তিনি তা পরিশোধ করবেন। যখন তাঁর পরবর্তী পোশাক তৈরীর বিল আসে, তখন কিছু সময়ের জন্যে তিনি বোধের শেষপ্রান্তে চলে যান, কিন্তু পরক্ষণেই মনে মনে একটা পরিকল্পনা তৈরী করে নেন। তিনি যুদ্ধমন্ত্রীর কাছে গিয়ে দাবি জানালেন যুদ্ধের তহবিল থেকে তাঁর পোশাকের বিল পরিশোধ করতে হবে। মন্ত্রী জানতেন তাঁকে বরখাস্ত করার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে, সুতরাং তিনি তাই করলেন। এরই ফলে জেনোয়া ফরাসীদের হাতছাড়া হয়ে যায়। কোনও কোনও বইতে আমি এরকম পড়েছি তবে এই কাহিনী কতটুকু সত্যি তা আমি বলতে পারব না। সত্যি হোক বা অতিরঞ্জিত

---

৪. সম্রাজ্ঞী জোসেফিন, Empress Josephine (১৭৬০-১৮১৪), অভিজাত বংশে জন্ম। অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন। ১৮০৪-এ সম্রাজ্ঞী হন ফ্রান্সের। ফরাসী বিপ্লবের সময় সম্রাটসহ কারারুদ্ধ হন। স্বামীর গিলোটিনে মৃত্যু হলেও, তিনি মুক্তি পান। দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন বিশ্ববিখ্যাত নেপোলিয়নকে। যিনি পরে ফ্রান্সের সম্রাট হন। নেপোলিয়ন তাঁকে যে ঘড়িটি উপহার দিয়েছিলেন সেটি 'Empress Josephine Clock' নামে বিখ্যাত।

হোক, আমাদের উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে দুই-ই সমান উপযোগী, কারণ এই কাহিনী আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে কোনও নারীর পোশাকের প্রতি আসক্তি তাকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে যদি তার সুযোগ থাকে তাকে প্রশ্রয় দেওয়ার। পানাসক্ত পুরুষ এবং কামাসক্ত নারীকে একই জিনিসের উদাহরণরূপে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এইসব ব্যাপারে মুল নীতি খুবই স্পষ্ট। আমাদের আলাদা সব রুচি এবং বাসনা জীবনের সাধারণ কাঠামোর মধ্যে মানিয়ে নেয়। এরা যদি সুখের উৎস হতে চায়, তবে তাদের, আমাদের স্বাস্থ্যের সাথে, আমাদের প্রিয়জনদের স্নেহের সাথে এবং যে সমাজে আমরা বাস করি তার শ্রদ্ধার সাথে সুসঙ্গত হতেই হবে। কোনও কোনও প্রবৃত্তিকে এইসব সীমা অতিক্রম না করিয়েও অনেক দূর পর্যন্ত টেনে নেওয়া চলে, অন্যদের নয়। কোনও ব্যক্তি, ধরা যাক দাবা খেলা পছন্দ করেন, তিনি যদি অবিবাহিত হন এবং পরনির্ভরশীল না হন, তা হলে তার প্রবৃত্তিকে কোনও বিশেষ সীমায় বেঁধে রাখার প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি তার স্ত্রী এবং সন্তান থাকে এবং স্বাধীন আয়ের উৎস না থাকে তাহলে এই প্রবৃত্তিকে অনেকেই কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সামাজিক দায়বদ্ধতা না থাকলেও পানাসক্ত এবং পেটুককে নিজেদের স্বার্থের দিক থেকে বিবেচনা করলে বুদ্ধিহীন বলা যেতে পারে, কারণ তাদের অসংযম স্বাস্থ্যের ক্ষতিকারী এবং তারা কয়েক মিনিটের আনন্দের বিনিময়ে কয়েক ঘণ্টার দুঃখ ভোগ করে। কতকগুলি নির্দিষ্ট জিনিস দিয়ে যে কাঠামোটা তৈরী, বেদনার কারণ হতে দিতে না চাইলে যে কোনও বিশেষ প্রবৃত্তিকে সেই কাঠমোর মধ্যেই থাকতে হবে। সেই জিনিসগুলি হল স্বাস্থ্য, মানসিক ও দৈহিক কর্মক্ষমতার সাধারণ অধিকার, প্রয়োজনীয় খরচ মেটানোর জন্য উপযুক্ত উপার্জন এবং সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সামাজিক কর্তব্য যেমন স্ত্রী এবং সন্তানদের প্রতিপালন। দাবা খেলার জন্যে যে ব্যক্তি এইসব দায়িত্বত্যাগ করেন তিনি নিশ্চিতভাবেই পানাসক্তের মতো নিন্দনীয়। আমাদের এমন লোকের অপরাধ চোখে পড়ে না তার কারণ এমন লোক সংখ্যায় খুব কম এবং অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী না হলে দাবা খেলার মতো বুদ্ধিমত্তার খেলায় সহজে কেউ ডুবে থাকবেন না। সংযমের জন্যে গ্রীকদের যে অনুমোদিত বিধি রয়েছে এই লোকের আচরণ তার মধ্যেই পড়ে। দাবাকে যথেষ্ট ভালবেসে যে লোক দিনে কাজ করতে করতে সন্ধ্যায় দাবা খেলার জন্যে অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করে থাকেন তিনি সাধারণ। কিন্তু যে লোক সারাদিন দাবা খেলার জন্যে কাজ বন্ধ রাখেন তিনি ক্রোধের মতো গুণ হারিয়ে ফেলেন। টলস্টয়[৫] সম্পর্কে জানা যায়, তিনি যখন

---

৫ টলস্টয়, Leo Tolstoy (১৮২৮-১৯১০)। রাশিয়ার বিশ্বনন্দিত সাহিত্যিক। তাঁর 'ওয়ার অ্যান্ড পীস', 'আনা করোনিনা' এবং 'রেজারেকসন' বিশ্ব সাহিত্যে অমর সৃষ্টি। ৬ বিশাল পটভূমিকায় বিরচিত "ওয়ার অ্যান্ড পীস"-কে বলা হয় গদ্যে মহাকাব্য।

তরুণ ছিলেন, তাঁর খ্যাতির পূর্বের যুগে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের জন্যে [illegible] সামরিক ক্রস পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পুরস্কার গ্রহণের দিন তিনি [illegible] খেলায় এমনই ডুবে ছিলেন যে খেলা ছেড়ে পুরস্কার গ্রহণ করা হয়নি। সে [illegible] টলস্টয়কে তেমন দোষ দেওয়া যায় না। কেননা সামরিক পদক লাভ করলেন [illegible] করলেন না তাঁর মতো ব্যক্তির পক্ষে উদাসীন থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু [illegible] কোনও লোকের পক্ষে এ কাজ করা অবশ্যই নির্বুদ্ধিতা হত।

যে নীতির কথা বলা হল, তার ব্যতিক্রম হিসাবে বলা যায়, কোনও কোনও কাজ এমনই মহৎ যে, যার জন্যে অন্যসব কাজকে পরিত্যাগ করাটা যুক্তিযুক্ত মনে করা যায়। যদি কোনও ব্যক্তি স্বদেশ রক্ষায় জীবন দান করেন, তবে স্ত্রী সন্তানদের কপর্দকশূন্য অবস্থায় রেখে যাওয়ার জন্যে কেউ তার নিন্দা করবে না। যদি কোনও বিজ্ঞানী কোনও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের জন্যে গবেষণা করেন এবং শেষ পর্যন্ত তার প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করে, তা হলে পরিবারকে দারিদ্রের যন্ত্রণা সহ্য করিয়েছেন বলে কেউ তার নিন্দা করবে না, কিন্তু যদি তার সেই আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের চেষ্টা কখনো সফল না হয়, তাহলে জনমত তাকে বাতিকগ্রস্ত বলবে। কিন্তু এরকম বলা অন্যায়, কারণ এরকম কাজে সাফল্য আসবে কিনা তা পূর্বেই নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। খ্রিস্ট যুগের প্রথম সহস্রাব্দে কোনও ব্যক্তি যদি সন্ন্যাস গ্রহণের জন্যে পরিবার ত্যাগ করে যেতেন তা হলে লোকে প্রশংসা করত। আজকাল কেউ এ কাজ করলে বলা হবে পরিবারের জন্যে বাঁচার সংস্থান করে তবেই তার তা করা উচিত।

আমার মনে হয় পেটুক আর স্বাভাবিক ক্ষুধাতুর মানুষের মধ্যে সবসময়েই একটা গভীর মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য থেকে যায়। যে মানুষের কোনও বাসনা অতিমাত্রায় ধাবমান হয়, অন্যসব বাসনার বিনিময়ে, সে সাধারণত এমন লোক যার মনের গভীরে লুকিয়ে রয়েছে কোনও বেদনা। আর সেইজন্যেই সে যেন এক ছায়ামূর্তির কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াবার চেষ্টা করছে। পানাসক্তের বেলায় এটা স্পষ্ট দেখা যায়। ভুলে থাকবার জন্যে লোকে মদ খায়, তাদের জীবনে যদি এ রকম অপচ্ছায়ার উৎপাত না থাকত, তাহলে তারা মাতলামিকে কখনও মিতাচার থেকে বেশি গ্রহণীয় মনে করত না। লোক কাহিনীর চীনা বলেছিল, 'আমি মদ খাওয়ার জন্যে মদ খাই না। মাতাল হওয়ার জন্যে মদ খাই।' এই হচ্ছে একদিকে এবং অত্যধিক সব প্রবৃত্তির পরিচিত রূপ। বস্তুর অন্তর্নিহিত আনন্দ খুঁজে দেখা হয় না, খোঁজা হয় তাকে উপলক্ষ্য করে বিস্মৃতি। যদিও মদাসক্তির ফলে যে বিস্মৃতি চাওয়া হয় তার সাথে এর বিস্তর পার্থক্য। বরোর বন্ধু, যিনি স্ত্রীকে হারাবার [illegible]

পড়া করার জন্যে চীনা ভাষা শিখেছিলেন, তিনিও বিস্মৃতিই চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা এমন একটা উপায়ে যা অনিষ্টকর নয় বরং তা তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছিল। এই রকম পলায়নী মনোভাবের বিরুদ্ধে বলবার কিছু নেই, কিন্তু যে লোক সুরাপান, জুয়াখেলা অথবা অন্য কোনও অলাভজনক উত্তেজক কাজের মধ্যে বিস্মৃতিকে খুঁজে বেড়ায়, তার কথা আলাদা। এটা সত্যি এই দুই সীমারেখার মধ্যবর্তী অবস্থানের উদাহরণও আছে। ক্লান্তিকর জীবন থেকে রেহাই পেতে যে লোক বেপরোয়াভাবে গাড়ি বা বিমান চালায় অথবা পর্বতশীর্ষে ওঠে, তার বিষয়ে কী বলা উচিত? তার এই জীবন নিয়ে ঝুঁকি যদি জনগণের উপকার করত, তা হলে তাকে প্রশংসা করা যেত। কিন্তু তা যদি না হয় তা হলে আমরা তাকে মাতাল অথবা জুয়াড়ি থেকে সামান্য ওপরে ছাড়া আর কী ভাবতে পারি?

অকৃত্রিম উদ্দীপনা, বিস্মৃতি সন্ধানের উদ্দীপনার যে ধরণ তার চেয়ে আলাদা, তা মানবিক সত্ত্বার এক স্বাভাবিক অংশ, যদি তা দুর্ভাগ্যবশত নষ্ট হয়ে না যায়। ছোট শিশুরা যা দেখে, যা শোনে তাতেই আকৃষ্ট হয়। তাদের কাছে পৃথিবী বিস্ময়ে ভরা। তারা সব সময় নতুন নতুন বিষয়ে খুব উৎসাহের সাথে জানবার কাজে ব্যস্ত থাকে, যদিও সে জানা পণ্ডিতদের জানা নয়। তারা শুধু যেসব জিনিস তাদের উদ্দীপনা সৃষ্টি করে শুধু তার সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেতে চায়। পশুরা, যখন তারা বয়স্ক হয়, যদি সুস্থ থাকে উদ্দীপনা ধরে রাখে। কোনও বিড়াল অপরিচিত ঘরে থাকলেও চুপ করে থাকবে না। সে চারিদিকে শুঁকে শুঁকে দেখবে যদি হঠাৎ করে কোনও ইঁদুরের সন্ধান পাওয়া যায়। কোনও মানুষ যদি তার জীবনের মৌলিক উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ না হন, তাহলে তিনি বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে স্বাভাবিক উৎসাহ বজায় রাখতে পারেন এবং যতকাল তা বজায় রাখবেন ততকাল জীবন তার কাছে আনন্দময় হয়ে থাকবে যদি না অন্যায়ভাবে তার স্বাধীনতা খর্ব করা হয় যা আমাদের জীবনপথে চলতে প্রয়োজনীয়। এই নিষেধাজ্ঞার কারণেই সভ্য সমাজের উদ্দীপনা নষ্ট হয়ে যায়। আদিম মানুষ যখন শিকার হয় তখন সে শিকার করে এবং এই কাজে সে প্রত্যক্ষ প্রেরণাকেই মান্য করে। যে লোক প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে কাজে যায়, সেও মৌলভাবে একই জায়গা থেকে তা করে যেমন তার স্থায়ী জীবিকার তাগিদ থেকে। কিন্তু তার কাজের প্রেরণা প্রত্যক্ষভাবে কাজ থেকে আসেনা এবং যখন তা অনুভূত হয় তখনো নয়। এই প্রেরণা কাজ করে গৌণভাবে বিমূর্ততা, বিশ্বাস এবং ইচ্ছার মাধ্যমে। যে সময় লোকটি কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে সে ক্ষুধার্ত থাকে না, কারণ সে কিছুক্ষণ আগে মাত্র তার প্রাতঃরাশ খেয়ে নিয়েছে। সে জানে আবার

তার ক্ষুধা পাবে এবং কাজে যাওয়ার অর্থ ভবিষ্যৎ ক্ষুধা-নিবৃত্তির এক উপায়মাত্র। প্রেরণা অনিয়মিত, কিন্তু সভ্য সমাজে অভ্যাসকে নিয়মিত হতে হয়। আদিম মানুষদের মধ্যে দলবদ্ধ কাজও যতটুকুই রয়েছে, তা স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রেরণাসঞ্চারী। যখন তারা দলবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করতে যায়, তখন ঢোলের বাদ্য তাদের মনে যুদ্ধের উদ্দীপনা জাগায় এবং তারা যখন উত্তেজিত হয়ে ওঠে তখন দলের প্রত্যেকটি মানুষ যুদ্ধের কাজে অনুপ্রাণিত হয়। বর্তমানের কোনও উদ্যোগ এইভাবে পরিচালিত করা যায় না। যখন রেলগাড়িকে কোনও নির্দিষ্ট সময়ে যাত্রা করতে হবে, তখন মোটরবাহকদের অথবা ইঞ্জিনচালকদের অথবা সিগন্যালম্যানদের আদিম সমাজের সঙ্গীত শুনিয়ে অনুপ্রাণিত করা অসম্ভব। কাজ তাদের করতে হবেই বলে তারা সকলে নিজের নিজের কাজ করবে। অথচ তাদের উদ্দেশ্য গৌণ। এই কাজে তাদের প্রেরণা স্বতঃস্ফূর্ত নয়। কিন্তু এই কাজের জন্যে তারা যে মূল্য পাবে তার জন্যেই শুধু প্রেরণা আছে। সামাজিক জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই এই ধরনের ভুল দেখা যায়। লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করে তার মধ্যে তাদের কোনও ইচ্ছার প্রতিফলন থাকে না। তারা তা করে সেই আশায়, পরে এই আলাপ থেকে তাদের কোনও উপকার হলেও হতে পারে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রেরণার সীমাবদ্ধতা সভ্য মানুষকে জড়িয়ে রেখেছে। মনে খুব আনন্দ হলে সে প্রকাশ্য পথে নাচতে অথবা গান করতে পারে না, আবার দুঃখ পেলেও পথের পাশে বসে কাঁদতে পারে না। কেননা তাতে পথচারীদের চলাচলে বাধা সৃষ্টি হতে পারে। প্রথম বয়সে স্কুলে তাদের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, প্রাপ্তবয়স্ক জীবরে যতক্ষণ কাজ,ততক্ষণের জন্যে তার স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত। এই কারণে উদ্দীপনাকে বাঁচিয়ে রাখা বেশ কঠিন, কারণ এর অবিরাম নিয়ন্ত্রণ থেকে জন্ম নেয় ক্লান্তি এবং একঘেয়েমির বিরক্তি। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা সুবিবেচনার সাথে নিয়ন্ত্রণ না করলে সভ্য সমাজ অস্তিত্ব সংকটে পৌঁছে যায়। কারণ এই প্রেরণা সরলতম সামাজিক সহযোগিতামূলক কাজের জন্য দিতে পারলেও কিন্তু সেসব অতি জটিল কাজ করতে পারে না, যা আধুনিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান দাবী করে। উদ্দীপনাকে এতসব বাধার ওপরে তুলতে হলে এমন লোকের প্রয়োজন সুন্দর স্বাস্থ্য এবং অফুরন্ত প্রাণশক্তি অথবা তার ভাগ্য যদি ভাল থাকে তাহলে সে এমন কাজ পাবে যা তার নিজের পক্ষেই আগ্রহজনক। তথ্য যা পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে বিগত শতবর্ষে সব সভ্য দেশেই জনস্বাস্থ্য ক্রমশ উন্নত হচ্ছে, কিন্তু শক্তিকে মাপা কঠিন কাজ। স্বাস্থ্য উন্নত হলেও দৈহিক শক্তি পূর্বে যা ছিল তেমনটাই রয়েছে, তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। সমস্যা হল

অতিমাত্রায় সামাজিক, তাই স্বাস্থ্যের সমস্যা নিয়ে এই গ্রন্থে আমি কোনোও আলোচনায় যাব না। কিন্তু এই সমস্যার একটা ব্যক্তিগত এবং মনস্তত্ত্বমূলক দিক রয়েছে, যে বিষয়ে আমি পূর্বে অবসাদ নিয়ে আলোচনার সময় করেছি। সভ্য সমাজের শত বাধার মুখেও কোনও কোনও ব্যক্তি উদ্দীপনা বজায় রাখতে সক্ষম হয়, আরো অনেকে তা করতে পারত যদি তারা অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত থাকতে পারত যেখানে তাদের শক্তির অনেক অংশ ব্যয় হয়ে যায়। কাজের জন্যে যতটুকু শক্তি দরকার, উদ্দীপনা তার চেয়ে অতিরিক্ত দাবি করে এবং ফলে মনোযন্ত্রটি যাতে বাধাহীনভাবে চলে সেই দাবি উঠে আসে। যেসব কারণে এই চলা মসৃণতর হয় সে বিষয়ে আমি পরের অধ্যায়গুলিতে আরও কিছু বলব।

সম্মানবোধ সম্বন্ধে ভুল ধারণার জন্যে নারীদের মধ্যে উদ্দীপনা আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে। নারীরা পুরুষদের বিষয়ে আগ্রহী হবে, অথবা জনসমক্ষে প্রফুল্লতা প্রকাশ করবে এটা অবাঞ্ছিত ছিল। পুরুষদের বিষয়ে তারা আগ্রহী হবে না এই শিক্ষা থেকে তারা সব বিষয়েই আগ্রহ হারিয়ে ফেলে শুধুমাত্র এক বিশেষ ধরনের বিশুদ্ধ আচরণ ছাড়া। নিষ্ক্রিয়তার মনোভাব তৈরীর শিক্ষা এবং জীবন থেকে পালানোর মনোভাব উদ্দীপনার প্রবল বিরোধী এবং নারীদের আত্মমগ্ন হতে উৎসাহিত করা, যা মহা সম্মানিত নারীদের বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে যদি তারা শিক্ষাহীন হয়। সাধারণ পুরুষদের খেলাধুলায় যে উৎসাহ থাকে তা তাদের থাকে না। তারা রাজনীতি নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না। পুরুষদের প্রতি তাদের মনোভাব প্রথাগত নিস্পৃহতা, অন্য নারীদের প্রতি প্রচ্ছন্ন বৈরীভাবাপন্ন এবং তার কারণ অন্যেরা তাদের চেয়ে কম সম্মানিতা, এই বোধ থেকে। তাদের অহংকার তারা নিজেরাই নিজেদের নিয়ে থাকে অর্থাৎ তাদের সহনারীদের প্রতি আগ্রহহীনতাকে তারা গুণ বলে মনে করে, অবশ্য এর জন্যে তাদের দোষ দেওয়া যায় না। নারীদের সম্পর্কে হাজার হাজার বছর ধরে যে নৈতিকতার শিক্ষা প্রচলিত, তাই শুধু তারা মেনে চলে। তারা একটি অবদমন নীতির কাছে নিজেদের উৎসর্গ করেছে যার ভিতরের অন্যায়টি তারা বুঝতে পারেনি বলেই করুণার পাত্রী হয়ে হয়েছে। এইসব নারীদের কাছে যা অনুদার তাই ভাল মনে হয় এবং যা উদার তা মনে হয় খারাপ। তারা নিজেদের সামাজিক চক্রের মধ্যে আনন্দকে রক্ষা করতে যথাসাধ্য চেষ্টা চালায়। তারা রাজনীতিতে নির্যাতনমূলক আইনকে ভালবাসে। সৌভাগ্যবশত এই ধরনের নারীর সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে, যদিও যারা চিন্তার জগতে মুক্তিলাভ করেছে। তারা সেইসব নারীর সংখ্যা যতটা কমেছে বলে ভাবছেন, তার চেয়ে এখনও সেই সংখ্যা অনেক বেশি। কেউ যদি

আমার কথায় সন্দেহ প্রকাশ করেন, তবে বলি, তিনি যেন একলা বাসাবাড়িগুলিতে একটা থাকার জায়গা খুঁজতে বেরিয়ে পড়েন এবং যেসব গৃহকর্ত্রীর সাথে তাঁর দেখা হবে তাদের আচরণ লক্ষ্য করেন, তা হলে দেখতে পাবেন— তারা এমন একটা নারীসুলভ উৎকর্ষতার ধারণা নিয়ে কাজ করছে, যা জীবনের সকল উদ্দীপনাকে ধ্বংস করার একটি প্রয়োজনীয় অংশ। ফলেই তাদের মন এবং হৃদয় সংকীর্ণ এবং বৃদ্ধি স্তব্ধ হয়ে যায়। নারী পুরুষের উৎকর্ষের মধ্যে যথার্থভাবে ধারণা করলে কোনও পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যাবে না, অন্ততপক্ষে প্রচলিত ধারণায় যে পার্থক্য তা নেই। নারীর পক্ষে যেমন পুরুষের পক্ষেও তেমন, উদ্দীপনাই হচ্ছে সুখ এবং মঙ্গলের জন্যে গোপন মন্ত্র।

GRONTHO.COM

১২
স্নেহ-ভালবাসা

উদ্দীপনাহীনতার একটি প্রধান কারণ হল, আমাকে কেউ ভালবাসে না এই অনুভূতি। পক্ষান্তরে বিপরীতভাবে, সকলেই আমাকে ভালবাসে এই অনুভূতি উদ্দীপনা বাড়াতে যত সাহায্য করে, অন্য কোনও কিছু তা করে না। কেউ তাকে ভালবাসে না, এই অনুভূতির বিভিন্ন রকমের কারণ থাকতে পারে। তিনি নিজেকে হয়তো ভয়ংকর একটি মানুষ ভাবতে পারেন, যার জন্যে কারো পক্ষে তাকে ভালবাসা সম্ভব নয়। শৈশবে তিনি হয়তো অন্যান্য শিশুদের তুলনায় কম স্নেহ পেয়েছেন অথবা তিনি এমন লোক যাকে সত্যিই কেউ ভালবাসেন না। এইসব কারণ কিন্তু প্রথম জীবনের দুর্ভাগ্যের জন্যে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলাও এর কারণ হতে পারে। ভালবাসা না পাওয়ার অনুভূতি থেকে নানারকম মনোভাবের উদ্ভব হতে পারে। এরকম লোক হয়তো মরিয়া হয়ে ভালবাসা পাওয়ার জন্যে নানা অসাধারণ দয়াশীলতার কাজ করতে পারেন। কিন্তু এমন হলে তার কাজে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ যারা তার দয়াশীলতায় উপকৃত হবেন তারা কখনই তার উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারবেন। মানুষের প্রকৃতি এমনভাবে গঠিত যে, যারা ভালবাসা দাবি করেন না বলে মনে হয়, তাদেরই তা সহজে দেয়। তাই যে কোনও কল্যাণকর কাজ করে ভালবাসা কিনতে চান, তিনি মানুষের অকৃতজ্ঞতার অভিজ্ঞতা থেকে মোহমুক্ত হন, তার কখনো মনে হয় না যে ভালবাসা তিনি পেতে চান তার মূল্য, তার জন্যে যে বস্তুগত সুবিধা তিনি দান করছেন তার চেয়ে অনেক বেশি। তবুও তার অনুভূতি তা মেনে নিতে পারে না। অন্য একজন মানুষ, অন্যেরা তাকে ভালবাসে না, এটা জেনে যুদ্ধ বাধিয়ে অথবা বিদ্রোহ সৃষ্টি করে অথবা ডীন সুইফটের[১] মতো বিষে কলম ডুবিয়ে পৃথিবীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে পারে। দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে এই হল বীরের প্রতিক্রিয়া, এতে পৃথিবীর সকলের বিরুদ্ধে একা দাঁড়াবার মতো চরিত্রবল থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এই উচ্চতায় উঠতে কজন সক্ষম হন? নারী বা পুরুষের অধিকাংশই যদি নিজেদের ভালবাসার ক্ষেত্রে অক্ষম মনে করেন, তাহলে তারা এক ভীরু নৈরাশ্যের মধ্যে ডুবে যান, যেখানে অন্ধকার আর সেখানে মাঝে মাঝে ঈর্ষা আর বিদ্বেষের ঝলক ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। নিয়মানুযায়ী এই ধরণের লোকের জীবন অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক

১। সুইফট, Dean Jonathan Swift (১৬৬৭-১৭৪৫) আয়ার‍্যাণ্ডে জন্ম ইংরেজী সাহিত্যে বিখ্যাত বিদ্রূপাত্মক সাহিত্যের রচয়িতা (Satirist)।

হয়ে পড়ে এবং ভালবাসার অভাব থেকে তাদের মনে নিরাপত্তাহীনতা নেয় আর তাকে মুক্তি পেতে তারা অভ্যাসের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পন করে যারা বৈচিত্র্যহীন কর্মধারার দাসত্ব স্বীকার করেন তাদের এই কাজের প্রেরণা বাইরের শীতল পৃথিবীর ভয় থেকে এবং তারা মনে করে, পূর্বের চলা পথেই তারা আবার চলে তা হলে তারা আর আঘাত পাবেন না।

যারা নিরাপত্তার অভাববোধ নিয়ে জীবন শুরু করেন, তাদের চেয়ে বেশি সুখী হন যারা নিরাপত্তার বোধ নিয়ে জীবন শুরু করেন। অন্ততপক্ষে যা না নিরাপত্তা বোধ তাদের বিপদের মধ্যে না ফেলে। সব ক্ষেত্রে না হলেও অনে ক্ষেত্রে যে বিপদে একজন নিমজ্জিত হয়ে পড়েন, নিরাপত্তাবোধই সেই বি থেকে অন্যজনকে উদ্ধার করেন। এক গভীর গহ্বরের ওপরে অবস্থিত একটা কাঠের ওপর দিয়ে হাঁটতে গেলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ভয় পেলেই বেশি থাকে ভয় না পেলে নয়। জীবনযাপনের ক্ষেত্রেও একই রীতি। ভয়হীন মানুষ অনে হঠাৎ করে বিপদে পড়তে পারেন। কিন্তু অনেক বিপদসংকুল অবস্থার ভি থেকে অক্ষত অবস্থায় তিনি বেরিয়ে আসতে পারবেন, তবে একজন মানু পক্ষে তা সম্ভব নয়। এইরকম প্রয়োজনীয় আত্মপ্রত্যয়ের অসংখ্য ধরণ আছে কেউ আত্মবিশ্বাসী পাহাড়ে, কেউ বা সমুদ্রে আবার অন্যজন হয়তো আকাশে কিন্তু জীবনের প্রতি সাধারণ আত্মবিশ্বাস আসে সেই যথার্থ প্রয়োজনীয় ভালবাসা পেতে অভ্যস্ত হলে, অন্য কিছু থেকে নয়। উদ্দীপনার উৎসরূপে মনো অভ্যাস, তা নিয়েই আমি এই অধ্যায়ে আলোচনা করব।

ভালবাসা যা দেওয়া হয় তা থেকে নয়, যা পাওয়া যায় তা থেকেই নিরাপ বোধ জন্ম নেয়। এই বোধ আরো বেশি জন্মায় যদি ভালবাসা পারস্পরিক হ জোর দিয়ে বলতে হলে বলতে হয়, শুধু স্নেহ ভালবাসা নয়, তার সাথে শ্রদ্ধা প্রশংসাও মিশে থাকে। অভিনেতা, ধর্মপ্রচারক, বক্তা, রাজনীতিক যাদের কাজ হল জনগণের প্রশংসা কুড়িয়ে পাওয়া, তাঁরা ক্রমেই এদের সমর্থনের ওপর নো করে নির্ভরশীল হয়ে ওঠেন। যখন তাঁরা জনসাধারণের কাছ থেকে যোগ্য পুরস্কা পেয়ে যান, তখন তাঁদের জীবন উদ্দীপনায় ভরে ওঠে। কিন্তু যখন তা পান তাঁরা অসন্তুষ্ট হন এবং আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েন। বহুজনের কেন্দ্রীভূত ভালবা অন্যদের জন্যে তাই করে। যে শিশু বাবা-মার প্রিয়পাত্র, সে তাদের স্নে প্রকৃতির বিধান হিসাবে গ্রহণ করে। এই বিষয়ে সে বিশেষভাবে কিছু চিন্তা না, যদিও তার সুখের জন্যে এর গুরুত্ব অনেক। সে পৃথিবীকে নিয়ে চিন্তা যেসব উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা তার জীবনে ঘটেছে এবং আরো সব দুঃসাহসিক তার ঘটতে পারে, যখন সে বড় হবে তা নিয়েও ভাবে। বাইরের নানা

যে উৎসাহ, তার পিছনে রয়েছে সেই অনুভূতি যে, যত বিপদই আসুক বাবা-মার স্নেহ তাকে সবকিছু থেকে রক্ষা করবে। যদি কোনও কারণে কোনও শিশু বাবা মার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয় তবে সে শিশু সাধারণভাবে ভীরু এবং দুঃসাহসিক কাজে অনুৎসাহী হয়। তার মন ভয়ে ভয়ে থাকে। নিজেকে সে করুণা করে এবং আনন্দময় অনুসন্ধিৎসার মনোভাব নিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এ রকম শিশু অবাক হওয়ার মতো কম বয়সে জীবন, মৃত্যু এবং অন্যান্য জীবনের পরিণাম নিয়ে ধ্যান করতে শুরু করে। সে অন্তর্মুখী হয়ে ওঠে। আসলে বিষাদময়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনও বিশেষ দর্শনবিদ্যা বা ধর্মতত্ত্বের মধ্যে অপ্রাকৃত সান্ত্বনা খুঁজে বেড়ায়। জগৎ বিশৃঙ্খল স্থান, এখানে আনন্দের জিনিস যেমন আছে নিরানন্দের জিনিসও আছে কিন্তু শৃঙ্খলাহীন পরমার্থ নিয়ে—এবং এই কামনার একটি বোধগম্য অবস্থা অথবা প্রতিরূপ সৃষ্টি মূলত ভয় থেকেই জাত, যাকে বলা হয় মুক্তস্থানাতঙ্ক বা এক ধরনের উন্মুক্ত স্থান সম্পর্কে ভীতি। নিজের শোবার ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে ভীরু ছাত্রটি নিজেকে নিরাপদ মনে করে। এই একই সমরূপ শৃঙ্খলাপূর্ণ এই অনুভূতি যদি সে নিজের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারে, তা হলে পথে বের হওয়ার পরও সে নিজেকে নিরাপদ মনে করবে। সে যদি আরো বেশি স্নেহ পেত, তা হলে বাস্তব পৃথিবীকে আরো কম ভয় পেতে পারত এবং মনে এক আদর্শ পৃথিবী আবিষ্কার করতে হত না যা স্থান করে নিয়েছে তার বিশ্বাসে।

একথা কখনো সঠিক নয় যে, সব স্নেহ-ভালবাসা একই ধরনের সাহসিক অভিযানের পথে চলতে উৎসাহিত করে। যে স্নেহ দেওয়া হয়েছে তা যেন নিজেই লক্ষ্য না হয়ে শক্তিশালী হয় এবং স্নেহের পাত্রের নিরাপত্তার চেয়েও তার উৎকর্ষতা বাড়িয়ে তোলে, যদিও তার নিরাপত্তা নিয়ে উদাসীন হতে হবে তা নয়। ভীরু ধাত্রী অথবা ধাত্রী যদি সবসময় শিশুদের সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সাবধান করতে থাকে এবং মনে করে প্রত্যেকটি কুকুরই তাদের কামড়াবে অথবা প্রত্যেকটি গরুই একটা শিং ষাঁড়, তা হলে তারা নিজেদের মনের ভীরুতাকেই শিশুদের মনে সঞ্চারিত করবেন এবং তা হলে শিশুরা ভাববে মা কিংবা ধাত্রীর কাছাকাছি না থাকলেই বিপদ। যে জননী সবসময় সন্তানকে চোখে চোখে রাখতে চান তার পক্ষে সন্তানের এইরকম অনুভূতিই পছন্দনীয়। সন্তান পৃথিবীর সব কিছুর সাথে মিশে যাক, এই ইচ্ছার চেয়েও সে সবসময় তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকুক, এ ইচ্ছাটা তার বেশি হতে পারে। এরকম অবস্থার পরিণামকে সে স্নেহ না পেলে যা হত, তার চেয়েও বেশি খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা। শৈশবে মনের যে ছাপ গড়ে ওঠে, সারা জীবন তার ছাপ থেকে যায়। অনেকের কাছে প্রেমে পড়া

হল পৃথিবী থেকে পালিয়ে গিয়ে এমন একটা ছোট নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান যেখানে তারা নিশ্চিতভাবে শ্রদ্ধা এবং প্রশংসা পায় তার যোগ্য না হয়েও, সা[illegible] থেকে দূরে সরে যাওয়া মানুষের আরেক আশ্রয় তার নিজের বাড়ি, ভীতি এ[illegible] ভীরুতাই তাদের এই সাহচর্যের সন্ধান দেয় যা উপভোগ করলে সেই অনুভূ[illegible] অক্রিয় হয়ে যাবে। তারা পত্নীদের কাছে তাই চান, যা আগে তারা পেয়েছে[illegible] অবিজ্ঞ মায়েদের কাছে, কিন্তু তারা অবাক হয়, যদি পত্নীরা তাদের বয়ঃপ্রাপ্ত শি[illegible] মনে করে।

কোন্ স্নেহ শ্রেষ্ঠ তার সংজ্ঞা নির্ণয় করা খুব সহজ নয়। কারণ তার মধ্যে কিছু মাত্রায় রক্ষণাত্মক বস্তু থাকা উচিত, যাদের আমরা ভালবাসি তারা কোন[illegible] আঘাত পেলে আমরা উদাসীন থাকতে পারি না। কিন্তু আমি মনে করি, দুর্ভাগ্যের আশঙ্কা যা দুর্ভাগ্যের প্রতি সহানুভূতির, যে দুর্ভাগ্য ঘটে গেছে তার বিপরীত[illegible] ভালবাসা যতটুকু সম্ভব, অল্প হলেও একটা ভূমিকা রাখতে পারে। নিজের সম্পর্কে ভয় অন্যের সম্পর্কে ভয়ের চেয়ে আংশিক ভাল। তার ওপর প্রায় সময়েই এই বোধ অধিকার-বাসনার ছদ্মবেশ। আশা করা হয় ভয় জাগিয়ে অন্যের ওপর আরো বেশি প্রভাব প্রতিষ্ঠা করা যাবে। পুরুষ ভীরু নারীকে যে পছন্দ করে এটাও তার একটা কারণ, তাহলে তাদের রক্ষা করে দখল করা যায়। নিজের ক্ষতি না করে কোনও মানুষ অন্যের জন্যে কতটা উৎকণ্ঠার কারণ হতে পারে, তা নির্ভর করে তার চরিত্রের ওপর। যে মানুষ শক্তিমান এবং দুঃসাহসী, নিজের ক্ষতি ছাড়াও অনেক কিছু সহ্য করতে পারে। কিন্তু ভীরু মানুষ এইভাবে যেন বেশি কিছু না করে সেই ব্যাপারে তাকে উৎসাহিত করা উচিত।

প্রাপ্ত স্নেহ-ভালবাসার কাজ দ্বিধাবিভক্ত। এর আগে নিরাপত্তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এ বিষয়ে কিছু বলা হয়েছে। কিন্তু পূর্ণ বয়সে এর মধ্যে আরেকটু গৌণ জৈবিক উদ্দেশ্যের সন্ধান পাওয়া যায় এবং তা হচ্ছে পিতৃত্ব এবং মাতৃত্ব। যৌনতা-সম্পর্কিত ভালবাসার প্রেরণা জাগাতে না পারা যে কোনও নারী বা পুরুষের জন্যে চরম দুর্ভাগ্য। কেন না এতে তারা বঞ্চিত হয়, জীবন যে শেষ আনন্দ তাদের দান করে, তা থেকে। এই বঞ্চনা এখন হোক বা পরে হোক উদ্দীপনাকে ধ্বংস করে এবং অন্তর্মুখীতা তৈরি করে। শৈশবের কোনও আশা বিপর্যয় চরিত্রে এমন ত্রুটির কারণ হতে পারে যার জন্যে উত্তর-জীবনে ভালবাসা পাওয়া তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না, যে ধরনের ঘটনা প্রায় ঘটে থাকে। এ নারীদের তুলনায় সম্ভবত পুরুষের ক্ষেত্রে বেশি বাস্তব, কারণ নারীকে আকর্ষণ করে সম্ভবত পুরুষের চরিত্র, আর পুরুষের আকর্ষণ থাকে নারীর রূপে। এখানে অবশ্যই বলা উচিত যে, এ বিষয়ে পুরুষরা নারীদের তুলনায় নিজেদের

করে, কারণ নারীরা পুরুষদের যেসব গুণে খুশী হয়, তার থেকে পুরুষরা নারীদের যেসব গুণে খুশী হয় তা কম কাম্য। আমি নিশ্চিত নই, উন্নত চরিত্র গঠন করা সুন্দর রূপ তৈরী করার চেয়ে সহজতর কিনা। কিন্তু যে কোনও ভাবে পরের ধাপটি ভালভাবে বোঝা বেশি প্রয়োজনীয় এবং নারীরা সহজেই তা অবলম্বন করে, কিন্তু আগের ধাপটি অর্জন করার জন্যে পুরুষদের যা করা দরকার তারা তা করে না।

কোনও মানুষ যে স্নেহ-ভালবাসা পেয়ে থাকে তা নিয়েই এতক্ষণ আমরা আলোচনা করছিলাম। এখন আমি, যে স্নেহ ভালবাসা দেওয়া হয় তার কথা বলব। এটা আবার দুই প্রকার। এর একটি সম্ভবত জীবনের উদ্দীপনার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান প্রকাশ, অন্যটা হল ভয়ের প্রকাশ। আমার কাছে প্রথমটা পুরোপুরি প্রশংসাযোগ্য, আর পরেরটা খুব বেশি হলে একটি সান্ত্বনা। আপনি যদি খুব সুন্দর দিনে মনোরম বেলাভূমির পাশ দিয়ে জাহাজে চলেন, আপনি সাগর-বেলার প্রশংসা করবেন এবং এতে আপনি আনন্দ পাবেন। এই আনন্দ সম্পূর্ণরূপে পাঠকের দৃষ্টি থেকে লাভ করা এবং মনের কোনও তীব্র প্রয়োজনের সাথে তা সম্পর্কহীন। অন্যদিকে যদি আপনার জাহাজটা ডুবে যায় এবং বিকল হয়ে পড়ে এবং আপনি সাঁতার কেটে তীরে এসে ওঠেন, তখন তার প্রতি আপনার নতুন ধরনের ভাললাগা জন্মাবে। তখন এই তীর হয়ে উঠবে তরঙ্গের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা এবং এর সৌন্দর্য্য অথবা কুৎসিত রূপ অবান্তর ব্যাপারে পরিণত হবে। নিরাপদ জাহাজের যাত্রীর মনে যে অনুভূতি, সুন্দর ভালবাসার সমগোত্রীয় তা, ধ্বংস হয়ে যাওয়া জাহাজ থেকে সাঁতার কেটে তীরে উঠে আসা যাত্রীর অনুভূতির সাথে যা মেলে তা সুন্দর ভালবাসা নয়। এদের মধ্যে প্রথম ধরনের ভালবাসা সম্ভব সে মানুষের পক্ষে যে নিজেকে নিরাপদ বোধ করে। পক্ষান্তরে নিরাপত্তার অভাববোধ থেকে দেখা দেয় ভালবাসার পরের রূপটি। নিরাপত্তাবোধের অভাবের কারণে যে অনুভূতি তুলনায় তা অনেক বেশি বস্তুগত এবং আত্মকেন্দ্রিক কারণ ভালবাসার মানুষ এখানে মূল্যবান কারণ তার কাছ থেকে পরিষেবা পাওয়া যায় বলে সহজাত কোনও গুণের জন্যে নয়। একথা আমার বলার উদ্দেশ্য নয় যে, জীবনে এ ধরনের ভালবাসার কোনও বৈধ ভূমিকা নেই। প্রকৃতপক্ষে সকল নির্ভেজাল ভালবাসার মধ্যেই এই দুইয়ের কিছু কিছু অংশ যুক্তভাবে রয়েছে এবং ভালবাসা যতটুকু নিরাপত্তা বোধহীনতাকে দূর করতে সক্ষম ততটুকু তা একজন মানুষকে তার অনুভূতি ফিরিয়ে দেয়। যে অনুভূতি থেকে সে আবার সেই মুহূর্তে বিপন্ন এবং আর্ত জগতের সব অন্ধকার যে দূর হয়ে গেছে তা অনুভব করতে পারে। এই ধরনের ভালবাসার যে ভূমিকা জীবনে, তাকে স্বীকৃতি জানিয়েও আমাদের বলতে হয় এটা অন্যটার তুলনায় কম সুন্দর, কারণ এটা ভয়ের ওপর নির্ভর করে এবং

ভয় একটি ক্ষতিকর জিনিস এবং আরো বেশি আত্মকেন্দ্রিক। সবচেয়ে সুন্দর ভালবাসায় মানুষ আশা করে নতুন সুখের, পুরোনো অ-সুখ থেকে পালাতে না।

সুন্দরতম ভালবাসা যে দেয় এবং যে পায়, দুজনের জন্যেই জীবন-প্রাপ্তি। প্রত্যেকেই পরমানন্দের সাথে ভালবাসা গ্রহণ এবং দান করে এবং পারস্পরিক সুখের কারণে সম্পূর্ণ পৃথিবীটাকে আরো বেশি চিত্তহারী মনে করে। এ ছাড়া আরো এক ধরনের ভালবাসা আছে যেটা খুব যে কম তা নয় তাতে একজন অন্যজনের প্রাণশক্তি শুষে নেয়। একজন যা দেয় অন্যজন তা গ্রহণ করে কিন্তু প্রতিদানে প্রায় কিছুই দেয় না। এই ধরনের রক্তশোষণকারীর দলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ লোক আছে। তারা একের পর এক হতভাগ্যকে ধরে এবং বলিপ্রদত্ত প্রাণীর মতো জীবনীশক্তি নিংড়ে নেয়। এবং নিজেদের উন্নতি করে নেয় এবং আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু যাদের তা শুষে নিয়েছে তারা হয়ে পড়ে নিষ্প্রভ, ম্লান এবং শক্তিহীন। এই ধরনের লোক নিজেদের স্বার্থের জন্যেই শুধু অন্যদের ব্যবহার করে কিন্তু তাদের সত্তাকে কখনো স্বীকৃতি জানায় না। তারা কিছু সময়ের জন্যে যাদের ভালবাসে বলে মনে করে, মৌলভাবে তাদের প্রতি কোনও উৎসাহ থাকে না। তারা শুধু নিজেদের কাজের প্রেরণার বিষয়ে আগ্রহী এবং সম্ভবত তা নৈর্ব্যক্তিক ধরনের। বোঝা যায় এটা তাদের স্বভাবের ত্রুটি। কিন্তু তা এমন একটা রোগ যাকে সঠিকভাবে নির্ণয় করা এবং নিরাময় করা খুব সহজ নয়। প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে প্রায়ই যুক্ত থাকতে দেখা যায়, এবং আমার মনে হয় মানুষের সুখ উৎপাদন অর্থে যে ভালবাসা, যা দুজনের আলাদা মঙ্গলের জন্যে নয়, বরং যা দুজনের মিলিত মঙ্গলের জন্যে, তাই হল প্রকৃত সুখের সবচেয়ে মূল্যবান উপকরণ। যে মানুষের অহমিকা ইস্পাতের দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ সেখানে ভালবাসার এই বিস্তার সম্ভব নয় এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ দান থেকে বঞ্চিত, তা পেশা যে যত সফলই হোক। যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভালবাসাকে তার সীমানা থেকে দূরে রাখে তা সাধারণত প্রথম জীবনের দুঃখ, পরবর্তীকালে অবিচার অথবা এমন কোনও কারণ যা নির্যাতন বাতিকে পরিণত হয়েছে, তা মানব সমাজের প্রতি রাগ বা ঘৃণা থেকে জন্ম নেয়। পৃথিবীকে সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করতে হলে অতি-অহমিকা, যা একটি কারাগার, থেকে যে কোনও মানুষকে বের হয়ে আসতে হবে। কোনও মানুষ এই আত্ম-কাব্য থেকে বের হয়ে আসতে পেরেছে কিনা তার লক্ষণ দেখা যাবে তার যথার্থ ভালবাসার ক্ষমতা আছে কিনা তার মধ্যে। ভালবাসা পাওয়া কোনও ভাবেই যথেষ্ট নয়, ভালবাসা যা পাওয়া গেল তাকে মুক্ত করে আনা ফিরিয়ে দিতে হবে এবং যেখানে দুই একমাত্রায় বিরাজ করে সেখানেই ভালবাসা শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনা খুঁজে পায়।

পারস্পরিক ভালবাসা বিকাশের মনস্তাত্ত্বিক অথবা সামাজিক বাধা সবক্ষেত্রেই [illegible] ক্ষতিকর। এর জন্যে পৃথিবী সর্বকালেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এখনো [illegible]। যদি ভুল লোকের কাছে পড়ে, সেই ভয় থেকেই মানুষ সহজে কারো [illegible]া করতে চায় না, তারা সহজে ভালবাসাও দিতে চায় না। যদি তা অপাত্রে [illegible] করা হয় এই ভয়ে যদি তার কাছ থেকে অথবা সমালোচনাময় পৃথিবী থেকে [illegible] পায়। নৈতিকতা এবং বৈষয়িকতা এই দুয়ের নামেই সতর্ক থাকার নির্দেশ [illegible]া হয় এবং তার ফলে যেখানেই ভালবাসার সম্পর্ক, সেখানেই উদারতা এবং [illegible]াত্মকতাকে নিরুৎসাহ করা হয়। এইসব উপদেশ-নির্দেশ মানবসমাজের [illegible]দ্ধে ভীরুতা এবং ক্রোধ তৈরী করে। কারণ অনেক মানুষ জীবনভর জানতেই [illegible] না কী তার মৌলিক চাহিদা এবং তা থেকে সে বঞ্চিতই থেকে যায় এবং [illegible] দশজন মানুষের মধ্যে নয় জনেরই বিশ্বের প্রতি সুখী ও উদার মনোভাব গড়ে [illegible]ার অপরিহার্য পূর্বশর্ত। এটা মনে করার কোনও কারণ নেই যে, যাদের [illegible]াতিক বলা হয়, তারা যাদের বলা হয় না তাদের চেয়ে উন্নত। যৌনতা সম্পর্কে [illegible]াংশ সময়ে যাকে বিশুদ্ধ ভালবাসা বলা হয়, তা প্রায় থাকেই না। থাকলেও [illegible] কম, বরং সেখানে দেখা যায় মৌলিক বিরূপতা, প্রত্যেকেই অন্যের কাছে [illegible]া না দেওয়ার চেষ্টা করে, প্রত্যেকেই নিজেদের একাকীত্বকে রক্ষা করে চলে। [illegible]কেই অস্পৃষ্ট থাকে এবং সে জন্যেই তারা ব্যর্থ হয়। এ ধরনের অভিজ্ঞতার [illegible] বাস্তব মূল্য নেই। আমি বলি না, তাদের সযত্নে এড়িয়ে যেতে হবে, কারণ [illegible] করতে গেলে যেখানে আরো মূল্যবান এবং গভীর ভালবাসা জন্মাবার সম্ভাবনা, [illegible] পথেও অন্তরায় সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু আমি বলতে চাই, যে যৌন সম্পর্কের [illegible] মূল্য আছে তা এমন, যেখানে কোনও বাক-সংযম নেই, যার মধ্যে দুজনের [illegible] ব্যক্তিত্ব একসাথে মিলিত হয়ে নতুন এক সংযুক্ত ব্যক্তিত্বে রূপ লাভ করবে [illegible] রকমের সতর্কতার মধ্যে। ভালবাসায় সতর্কতা সম্ভবত যথার্থ সুখের পক্ষে [illegible]য়ে বেশি মারাত্মক।

১৩
পরিবার

অতীতের উত্তরাধিকাররূপে আমরা যতগুলি প্রতিষ্ঠান লাভ করেছি, [illegible] মধ্যে, বর্তমানে পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটি যেভাবে বিশৃঙ্খল এবং লাইনচ্যুত হ[illegible] পড়েছে, এমন আর কোনওটি হয়নি। সন্তানের প্রতি বাবা-মার স্নেহ এবং বাবা-মার প্রতি সন্তানের ভালবাসা সুখের একটি শ্রেষ্ঠ উৎস। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে বর্তমানে বাবা-মা ও সন্তানদের মধ্যে সম্পর্ক দশের মধ্যে নয়টি ক্ষেত্রেই উভয়পক্ষে দুঃখের উৎস হয়ে পড়েছে এবং শতকরা নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে অন্তত একপক্ষে দুঃখের কারণ হয়েছে। নীতিগতভাবে পরিবারের পক্ষে মৌলিক তৃপ্তি দিতে [illegible] ব্যর্থতা, আধুনিক যুগের অসন্তোষের একটি গভীর কারণ, যে পূর্ণবয়স্ক পুরুষ নারী নিজের সন্তানদের সাথে সুখের সম্পর্ক রাখতে চায় অথবা তাদের একটা [illegible] জীবনে রাখতে চায়, তার পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব নিয়ে গভীরভাবে ভেবে দেখা উচি[illegible] এবং ভাবনার পর বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করা উচিত। পারিবারিক বিষয় [illegible] ব্যাপক বিশাল যে এই গ্রন্থে আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমরা শুধু এর সা[illegible] জড়িত বিশেষ সমস্যার সাথে সুখের সন্ধান-এর সম্পর্ক রয়েছে তা নিয়ে [illegible] আলোচনা করব। যে সমস্যা নিয়ে আমরা ভাবছি তার মধ্যেও পরিবার সম্প[illegible] শুধু সেটুকুই আলোচনা করতে পারি, যেখানে সামাজিক কাঠামো পরিবর্তন [illegible] করেও পরিবারের উন্নতি বিধানের ক্ষমতা প্রত্যেকটি ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকে।

এই সীমাবদ্ধতা অবশ্যই অত্যন্ত গুরুতর, কারণ আমাদের কালে পারিবা[illegible] অসন্তোষের কারণ বিচিত্র ধরনের— মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, সামাজি[illegible] শিক্ষাবিষয়ক এবং রাজনৈতিক। ধনী সমাজের নারীদের কাছে এখন মাতৃত্ব পূর্বের তুলনায় দুটি কারণে অনেক বোঝা বলে মনে করা হয়। এই দুটি [illegible] হচ্ছে— একদিকে অবিবাহিতা মেয়েদের নিজস্ব জীবিকার পথ খুলে যা[illegible] অন্যদিকে গৃহ-পরিষেবার জন্যে লোকের অভাব। আগের দিনের মে[illegible] চিরকুমারী জীবনের অসহনীয় অবস্থার কথা চিন্তা করে বিয়ে করতে বাধ্য [illegible] অবিবাহিতা মেয়েদের বাড়িতে অর্থনৈতিক নির্ভরতার ওপর বাঁচতে হত [illegible] জীবনে বাবার ওপর, পরে অনিচ্ছুক ভাইদের ওপর। দিন যাপনের মতো [illegible] কাজ ছিল না তাদের এবং বাড়ির চার দেয়ালের বাইরে আনন্দ উপভোগের [illegible] স্বাধীনতাও ছিল না। তাদের যৌনজীবনে উৎসাহিত হওয়ার কোনও সুযোগ [illegible] না, আসক্তিও ছিল না। তাছাড়া বিবাহ-বহির্ভূত প্রেম ঘৃণ্য বলেই তারা [illegible] করত। তবু এমন সব পারিবারিক রক্ষা-ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও যদি কোনও [illegible]

লুব্ধকের ছলাকলায় পড়ে তার চরিত্র নষ্ট হত, তাহলে তার দুর্দশার সীমা থাকত না। 'ভিকার অফ ওয়েকফিল্ড'[১] বইয়ে এরকম অবস্থায় একটি নির্ভুল বর্ণনা আছে।

"তার অপরাধ লুকাবার
তার লজ্জা সবার দৃষ্টি থেকে ঢেকে রাখার
তার দয়িতের অন্তরে অনুতাপ জাগাবার,
এবং তার অন্তর ভাঙার একটাই পথ—
তার মৃত্যুকে আলিংগন।"

আধুনিক কুমারী মেয়েরা এই পরিস্থিতিতে মৃত্যুকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করে না, যদি তার ভাল শিক্ষা থাকে তাহলে সাধারণভাবে সুখে থাকার মতো একটা জীবিকার ব্যবস্থা করা কঠিন নয় এবং সে বাবা-মার অধীনতা থেকে মুক্ত হতে পারে। বাবা-মা কন্যাদের ওপর অর্থনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে বলে তারা এখন কন্যাদের নৈতিকতা অনুমোদন না করার ব্যাপারে অনেক বেশি সাবধান হয়েছে। যে মেয়ে গঞ্জনা সহ্য করার জন্যে অপেক্ষা করবে না, তাকে গঞ্জনা দিয়ে লাভ নেই। উচ্চপেশাজীবী অবিবাহিতা তরুণী তাই বর্তমানকালে বুদ্ধিমত্তা এবং আকর্ষণীয়তায় যদি সাধারণ মানের নিচে না হয়, যতদিন সে সন্তানলাভের কামনা থেকে মুক্ত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত সে সম্পূর্ণভাবে নিজের মতো করে জীবনকে উপভোগ করতে পারবে। কিন্তু সন্তানকামনা প্রবল হলে সে বিয়ে করতে বাধ্য হয় এবং তার কাজটিও হারাবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এতদিন যে আরামের জীবনে সে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল সে তার থেকে অনেক নিচের স্তরে নেমে যায়, কারণ তার স্বামীর উপার্জন, সে আগে যা উপার্জন করত কোনওভাবে তার চেয়ে বেশি নয়। যে আয় থেকে এখন সংস্থান করতে হয় একটি পরিবারের, শুধুমাত্র একজন রমণীর নয়। স্বাধীনভাবে চলার পর এখন প্রয়োজনীয় খরচের জন্যে প্রতিটি পয়সা অন্যের কাছে চেয়ে নেওয়া তার জন্যে পীড়াদায়ক। এইসব কারণে এইরকম নারী মাতৃত্বলাভে দ্বিধাগ্রস্ত।

---

১ 'ভিকার অব ওয়েকফিল্ড (Vicar of Wakefield), অলিভার গোল্ডস্মিথ, Oliver goldsmith (১৭৩০-১৭৭৪), রচিত কালজয়ী উপন্যাস। এই উপন্যাসের রচনাকাল ১৭৬১-৬২ এবং প্রকাশিত হয় ১৭৬৬ সালে। অলিভার গোল্ডস্মিথ এ্যাংলো আইরিশ লেখক এবং কবি। পেশায় চিকিৎসক।

কোনও নারী তবুও যদি সব দ্বিধা-সংকোচ কাটিয়ে উঠে মা হতে চায়, সে আগের প্রজন্মের নারীদের তুলনায় একটি নতুন এবং আতঙ্কজনক সমস্যার মুখোমুখি হয় এবং তা হল গৃহ পরিষেবার অভাব অথবা নিম্নমানের পরিষেবা। এর ফলে সে বাড়ির সাথে বাঁধা পড়ে যায়, হাজাররকম সব তুচ্ছ কাজ করতে সে বাধ্য হয়, যা তার দক্ষতা এবং প্রশিক্ষণের পক্ষে অনুপযুক্ত। অথবা এসব যদি সে নিজে নাও করে তবু কাজে অবহেলাকারী পরিচারিকাদের তিরস্কার করতে করতে নিজের মেজাজ নষ্ট করে। সন্তানদের লালন-পালনের ভার কার ওপর দেওয়া হবে সে বিষয়ে যদি তার ভাল জ্ঞান থাকে, তবে নার্সদের হাতে তাদের সপে দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। কারণ তাতে দুর্ঘটনার ঝুঁকি থেকে যায়, তার ওপর পরিচ্ছন্নতা এবং শিশুর স্বাস্থ্য নিয়ে সাধারণ সতর্কতার ব্যাপার তো রয়েছেই। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে উচ্চ প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যাপক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন নার্স রাখতে সমর্থ হয়। এইসব ছোট-বড় তুচ্ছ নানা বিষয়ের চাপে যদি সে তার সমস্ত লাবণ্য এবং কমনীয়তা এবং বুদ্ধিমত্তার তিন-চতুর্থাংশ হারিয়ে না ফেলে, তবে তাকে ভাগ্যবতী বলতে হবে। এইসব কর্তব্য পালন করতে গিয়ে প্রায়ই দেখা যায় যে, এরকম নারী তাদের স্বামীদের কাছে ক্লান্তিকর এবং সন্তানদের কাছে বিরক্তিকর হয়ে পড়ে। সন্ধ্যায় কাজ শেষ করে স্বামী যখন বাড়ি ফিরে আসে, স্ত্রী তখন সারাদিনের কষ্টের কাহিনী বলতে শুরু করে, তখন তা বিরক্তিকর। কিন্তু যে স্ত্রী এসব বলে না সে অন্যমনস্ক থাকে। সন্তানদের সম্পর্কে, সে তাদের পাওয়ার জন্যে যেসব স্বার্থত্যাগ তাকে করতে হয়েছে সে বিষয়ে সবসময় সে এমনই সচেতন, যার ফলে সে এর জন্যে আশার-অতীত যে পুরস্কার তা দাবি করবেই। সব সময়ে নানা তুচ্ছ বিষয়ে মনোসংযোগ করতে হয়েছে বলে সে ব্যস্তবাগীশ এবং সংকীর্ণমনা হয়ে গেছে। সে যতরকম অবিচার ভোগ করেছে তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে ক্ষতিকর। কারণ পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সে তাদের ভালবাসা হারিয়েছে। কিন্তু যদি সে তাদের অবহেলা করত এবং মনের আনন্দ ও দেহের লাবণ্য ধরে রাখত তাহলে তারা সম্ভবত তাকে ভালবাসত।

এইসব দুর্ভোগ প্রধানত অর্থনৈতিক, তাছাড়া আরও একটা সমস্যা রয়েছে যা সমান গুরুতর। সেটা হচ্ছে গৃহসমস্যা। বড় বড় নগরে অনেক লোক কেন্দ্রীভূত হওয়ায় এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। মধ্যযুগে শহর এখনকার গ্রামাঞ্চলের মতোই ছিল। শিশুরা এখনো যে শিশু-ভোলানো ছড়াটি গায়,

"পলের গির্জার কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটি গাছ
গাছটি একেবারে আপেলে ভরা

লন্ডন শহরের ছোট ছেলেরা
তারা লাঠি নিয়ে ছুটছে সেগুলি পাড়তে
ছুটে চলেছে বেড়ার পর বেড়া পার হয়ে
যতক্ষণ না তারা পৌঁছে লন্ডন ব্রিজের কাছে।"

পলের গীর্জা আর নেই। আমি জানি না সেন্ট পল গীর্জা ও লন্ডন ব্রিজের মধ্যে [illegible] বেড়া ছিল কখন তা অদৃশ্য হয়েছে। বহু শতাব্দী আগে লন্ডন শহরের ছোট [illegible] ছোট ছেলেরা এরকম আনন্দ উপভোগ করতে পারত। এই শিশুতোষ ছড়া তাই নির্দেশ করে। কিন্তু খুব বেশি দিনের কথা নয় যখন অধিকাংশ মানুষ পল্লীঅঞ্চলে বাস করত, শহরগুলি এত বড় ছিল না। শহর ছেড়ে আসা যেত খুব সহজে এবং শহরের অনেক বাড়ির সাথে বাগান দেখা খুব সাধারণ দৃশ্য ছিল, কিন্তু এখন ইংল্যান্ডে শহরের লোকসংখ্যা গ্রামের তুলনায় অনেকগুণ বেশি বেড়েছে। আমেরিকাতে এই বৃদ্ধি এখনো কম, কিন্তু খুব দ্রুত তা বেড়ে চলেছে। লন্ডন এবং নিউইয়র্কের মতো নগর এতই বড় যে, সেখান থেকে বের হয়ে আসতে প্রচুর সময় লাগে। নগরে যারা বাস করে তারা সাধারণভাবে একটি ফ্ল্যাট নিয়েই তৃপ্ত থাকে, তার সাথে অবশ্য এক বর্গ ইঞ্চি মাটিও সংলগ্ন থাকে না। মধ্যবিত্তদের খুশী থাকতে হয় ন্যূনতম জায়গা নিয়ে। ছোট ছোট শিশুরা থাকলে ফ্ল্যাটে জীবন কাটানো কঠিন। সেখানে তাদের খেলার জায়গা নেই। তাদের কোলাহল থেকে দূরে যাওয়ার কোনও জায়গা নেই তাদের বাবা-মার। এজন্যে উচ্চপেশাজীবীরা [illegible] শহরতলিতে থাকার দিকে ঝুঁকছে। শিশুদের কথা বিবেচনা করলে নিঃসন্দেহে এটা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু এতে মানুষের ক্লান্তি আরো বেড়ে যায় এবং [illegible] জন্যে যতটুকু ভূমিকা সে পালন করতে পারত ততটুকু করার ক্ষমতা [illegible] থাকে না।

এ ধরনের বড় বড় অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা আমরা [illegible] সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে চাই, তার বাইরে। আমরা আলোচনা করছি [illegible] কালে সুখী হওয়ার জন্যে কী করতে হতে পারে তা নিয়ে। বর্তমান কালে [illegible] মা ও সন্তানদের সম্পর্কের ভিতর যেসব মনস্তাত্ত্বিক বাধা রয়েছে সেইখানে [illegible] পারলে আমরা এই সমস্যার কাছাকাছি চলে আসব। এই সমস্যা [illegible] পক্ষে গণতন্ত্র থেকে জাত সমস্যাসমূহের একটি অংশ। প্রাচীনকালে ছিল [illegible] এবং দাস। মালিক ঠিক করত কী করতে হবে এবং মোটামুটিভাবে তাদের [illegible] পছন্দ করত। কারণ তারাই ছিল তাদের সুখ-বৃদ্ধির যন্ত্র। দাস সম্ভবত [illegible] মালিককে ঘৃণা করত। যদিও গণতান্ত্রিক মতবাদ এই ঘৃণা যতটা ব্যাপক ও [illegible] বলে আমাদের বিশ্বাস করাতে চায়, ততটা ছিল না। কিন্তু তবু তারা

মালিকদের ঘৃণা করত এটা সঠিক হলেও, মালিকরা তা বুঝতে পারত না এবং কোনও ভাবেই হোক মালিকরা সুখী ছিল। গণতান্ত্রিক মতবাদ সাধারণভাবে গৃহীত হওয়ায় এর সব কিছু পরিবর্তিত হয়ে গেছে। যেসব দাস আগে মালিকদের নীতি মেনে চলত, তারাই এখন আর মালিকদের মানে না। যেসব মালিকদের নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ ছিল না, তারা এখন দ্বিধা এবং অনিশ্চয়তার দোলায় দুলছে। ফলে সংঘর্ষ বেধেছে এবং উভয়পক্ষই অসুখী হয়েছে। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এসব আমি যুক্তি হিসাবে তুলে ধরছি না, কারণ যেসব অসুবিধার কথা তোলা হচ্ছে তা যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ পালাবদলে অনিবার্যভাবে দেখা দেয়। যে সময় পৃথিবী থেকে সুখ যে বিদায় নেয়, সে বিষয়ে চোখ বুজে থাকা অর্থহীন।

বাবা-মা ও সন্তানদের মধ্যে সম্পর্কের যে পরিবর্তন সাধারণভাবে তা গণতন্ত্র প্রসারের একটি উদাহরণ। বাবা-মা সন্তানদের ওপর তাদের অধিকার বিষয়ে আগের মতো আর নিশ্চিত নয়। সন্তানেরা বাবা-মাকে যে শ্রদ্ধা করতেই হবে তেমন করে আর অনুভব করে না। বাধ্যতা নামে গুণটি আগের দিনে প্রশ্নহীনভাবে আদায় করে নেওয়া হত। এখন তা রীতি-বিরুদ্ধ হয়েছে এবং ঠিকই হয়েছে। শিক্ষিত বাবা-মাকে মনোবিশ্লেষণ ভীত করে তুলছে, যদি তারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোনও ক্ষতি করে ফেলে সন্তানদের। তাদের চুম্বন করলে তাদের মনে 'ইডিপাস গূঢ়ৈষণা' জাগতে পারে, আর না করলে তাদের মনে প্রবল ঈর্ষা সৃষ্টি হতে পারে। যদি তারা সন্তানদের আদেশ করে কাজ করতে বলে, তা হলে তাদের মনে নানা ধরনের পাপবোধ জন্মাতে পারে, যদি তা না করা হয় তাহলে তাদের সন্তানেরা এমনসব অভ্যাসের অধীন হবে যা বাবা-মার কাছে বাঞ্ছনীয় নয়। শিশুকে বুড়ো আঙুল চুষতে দেখলে তারা তার ভয়ংকর পরিণামের কথা ভাবে, কিন্তু তারা জানে না কী করে তা বন্ধ করতে হয়। যে পিতৃত্ব-মাতৃত্ব একসময় ছিল শক্তির সুখময় প্রয়োগ, তা এখন হয়ে পড়েছে ভীরু, উদ্বিগ্ন এবং বিবেকতাড়িত সন্দেহ। পুরোনো দিনের নির্মল আনন্দ হারিয়ে গেছে, ঠিক এমন সময়ে যখন অবিবাহিতা মেয়েরা নতুন পাওয়া স্বাধীনতার জন্যে, মাতৃত্ব লাভের সিদ্ধান্ত নিতে আগের চেয়ে অনেক বেশি স্বার্থত্যাগ করছে। এই পরিস্থিতিতে সচেতন জননীরা সন্তানের কাছ থেকে খুব বেশি কিছু আশা করে না। কিন্তু অসচেতন জননীদের আশা অনেক বেশি। সচেতন জননীরা তাদের প্রকৃতিদত্ত স্নেহকে সংযত করে এবং সতর্ক হয়। অসচেতন জননীরা তাদের সন্তানের জন্যে যে আনন্দকে ত্যাগ করতে হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ পেতে চায়। এক ক্ষেত্রে সন্তানদের স্নেহ উপবাসী থাকে অন্য ক্ষেত্রে তা আর্ত উদ্দীপক হয়। কোনও ক্ষেত্রেই এখানে পরিবার তার সবচেয়ে ভালোটা দিতে পারত, যা ছিল নির্মল এবং স্বাভাবিক আনন্দ তা পাওয়া যাবে না।

এইসব অসুবিধার জন্যে জন্মহার যদি নেমে যায়, তাতে আশ্চর্য হওয়ার মতো কিছু নেই। মানুষের জন্মহার সাধারণভাবে কমতে কমতে এমন জায়গায় পৌঁছেছে যাতে মনে হচ্ছে অল্পদিনের মধ্যেই জনসংখ্যা হ্রাস পেতে শুরু করবে। সে সীমারেখা সচ্ছল লোকেরা অনেকদিন আগেই পার করে গেছে এবং তা শুধু কোনও একটা দেশে নয়, বিশেষভাবে সব উন্নতিপ্রাপ্ত সভ্য দেশসমূহে। সচ্ছল শ্রেণীতে জন্মহারের পরিসংখ্যান খুব বেশি পাওয়া যায় না। কিন্তু পূর্বে উল্লেখিত জীন আইলিনের[২] গ্রন্থ থেকে দুটি বিষয় উদ্ধৃত করা যেতে পারে। দেখা যায় কলোরাডো নগরে ১৯১৯ থেকে ১৯২২ সালের ভিতর পেশাজীবী মহিলাদের উৎপাদিকা শক্তি সাধারণ জনসংখ্যার হিসাবে মাত্র একতৃতীয়াংশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েলেসলি কলেজের চার হাজার স্নাতকদের মধ্যে ১৮৯৬ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত নবজাত শিশুদের মোট সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। অথচ জনসংখ্যাকে হ্রাস পাওয়ায় হাত থেকে বাঁচাতে আট হাজার শিশুর প্রয়োজন ছিল, যাদের মধ্যে এটাও কম সময়ে মারা যায়নি। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, এ সভ্যতা শ্বেতকায়দের হাতে সৃষ্ট, তার একক একটি বৈশিষ্ট্য হল, তাদের নারী-পুরুষেরা যে অনুপাতে আত্মভূত করে সেভাবেই তারা বন্ধ্যাত্বপ্রাপ্ত হয়। সবচেয়ে যারা বেশি সভ্য, সবচেয়ে বন্ধ্যা তারা। সবচেয়ে কম সভ্য যারা সবচেয়ে বেশি উর্বর তারা। অবশ্য এদের মধ্যবর্তী অনেকগুলি স্তর রয়েছে। বর্তমানে পাশ্চাত্য জাতিদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমত্তায় সবচেয়ে অগ্রবর্তী, তারা বিদায় নিচ্ছে। অল্প কয়েক বছরের ভিতর তারা সামগ্রিকভাবে সংখ্যায় কমে যাবে, যদি অবশ্য তাদের কম সভ্য অঞ্চল থেকে লোকজন অভিবাসন নিয়ে এসে সেই ঘাটতি পূরণ করে। আবার অভিবাসিতরা যখন পাশ্চাত্যের সভ্যতাকে পুরোপুরি আত্মস্থ করে নেবে তাদেরও বন্ধ্যাত্ব লাভের পালা চলে আসবে। এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে কোনও সভ্যতার যদি এটাই বিশেষত্ব হয়, তাহলে তা স্থায়ী হয় না। এদের মধ্যে সন্তান বাড়াতে যদি প্রেরণা সৃষ্টি করা না যায়, তা হলে কিছু আগে না হয় পরে তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং স্থান নেবে অন্য আরেক সভ্যতা, যেখানে পিতৃত্ব-মাতৃত্ব নারীর ভিতরেই এমন শক্তি থাকবে যা জনসংখ্যা কমতে দেবে না।

---

২ জীন আইলিন, Jean Ayling (১৮৯৪-১৮৭৬)। তাঁর আসল নাম Dorothy Mand Ayling মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাসেক্সে জন্ম, বিখ্যাত গবেষক। তাঁর গবেষণা গ্রন্থে, 'The Woman Retreat from Parenthood' উচ্চবিত্ত, পেশাজীবীদের মাতৃত্ব বা পিতৃত্বের সমস্যাকে দৃষ্টি দিয়ে দেখা হয়েছে।

প্রত্যেক পাশ্চাত্য দেশের পেশাদার নীতিবাগীশরা এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন ধর্মোপদেশ এবং ভাবপ্রবণতার সাহায্যে। একদিকে তাঁরা বলেন প্রত্যেক বিবাহিত দম্পতির কর্তব্য হল ততগুলি সন্তানলাভ করা, ঈশ্বর যা ইচ্ছা করেন। সন্তানদের স্বাস্থ্য ও সুখ নিয়ে তাদের কিছু ভাবার প্রয়োজন নেই। অপরদিকে পুরুষ ধর্মতাত্ত্বিকেরা মাতৃত্বের পবিত্র আনন্দের কথা প্রচার করে থাকেন এবং ভনিতা করে বলেন, রুগ্ন দারিদ্রপীড়িত বড় পরিবার হল সুখের আকর। রাষ্ট্র তাঁদের সাথে যোগ দেয় এই যুক্তিতে যে কামানের জন্যে প্রচুর খাদ্য চাই, নইলে এমন চমৎকার নিখুঁত সব মারণাস্ত্র যদি হত্যার জন্যে প্রচুর লোক না পায় তা হলে তাদের উদ্ভাবনী দক্ষতা বহাল থাকবে কীভাবে। আশ্চর্য হওয়ার কথা, ব্যক্তিগতভাবে কোনও বাবা-মা এই যুক্তি যদি অন্যের প্রযুক্ত বলে যদিওবা মেনে নেয় নিজেদের বেলায় পুরোপুরি বধির হয়ে থাকে। ধর্মতাত্ত্বিক ও দেশপ্রেমিকদের মনস্তত্ত্ব ভ্রমে ভরা। ধর্মতাত্ত্বিকরা যতক্ষণ নরকানলের ভয় দেখাতে পারবেন ততক্ষণ সফল হবেন। কিন্তু বর্তমানে খুবই কম লোক এই ভয়কে গুরুত্ব দেয় এবং এই রকম কোনও ভয়ই যে আচরণ, একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার তা নিয়ন্ত্রণ করতে যথেষ্ট নয়। আর রাষ্ট্রের সম্পর্কে বলা যায় তাদের যুক্তি অত্যন্ত হিংস্র। জনগণ একমত হতে পারে যে, অন্যেরা কামানের খাদ্য হোক, কিন্তু নিজেদের সন্তানদের এভাবে ব্যবহার করা হোক তা তারা চায় না। সুতরাং রাষ্ট্র যা করতে পারে তা হচ্ছে দরিদ্র লোকদের অজ্ঞতার অন্ধকারে রাখার চেষ্টা করা। কিন্তু পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় এই চেষ্টা একমাত্র অনুন্নত পাশ্চাত্য দেশ ছাড়া অন্য জায়গায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। খুব কম নর-নারীই জনগণের প্রতি কর্তব্যবোধ থেকে সন্তান লাভ করতে চাইবে। এই বিষয়ে তাদের ধারণা যত স্পষ্টই হোক যখন কোনও দম্পত্তি সন্তান লাভ করে তখন তারা হয় এই বিশ্বাস থেকে করে যে সন্তান তাদের সুখের সাথে যুক্ত হবে, না হয় কী করে জন্মনিরোধ করা যায় তা তারা জানে না। শেষের কারণটাই এখনো বেশি কার্যকর কিন্তু ক্রমশ তার শক্তি কমে যাচ্ছে। রাষ্ট্র অথবা গীর্জা যাই করুক এই কমানো আটকানো যাবে না। সুতরাং শ্বেত জাতিদের যদি অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তাহলে পিতৃত্ব মাতৃত্ব যাতে পিতা-মাতাকে আবার সুখ দিতে পারে তা করা প্রয়োজন।

বর্তমানের পরিস্থিতির কথা না ভেবে যদি মানব-প্রকৃতির কথা ভাবা যায় তাহলে আমার মনে হয়, একথাটা সকলে বুঝতে পারবেন যে পিতৃত্ব-মাতৃত্ব মনস্তত্ত্বের দিক থেকে জীবনকে দান করতে পারে শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা স্থায়ী আনন্দ। এটা অবশ্য পুরুষ অপেক্ষা নারীর ক্ষেত্রে বেশি সত্যি। আধুনিক যুগের প্রায় সব সাহিত্যেই এই ধারণাকে গ্রহণ করা হয়েছে। হেক্যুবা ইফিগেনিয়া

অপেক্ষা তার সন্তানদের বেশি যত্ন নেন। ম্যাকডাফ তার স্ত্রী অপেক্ষা সন্তানদের প্রতি বেশি যত্নশীল। ওল্ড টেস্টামেন্টে নারী-পুরুষ উভয়েই বংশধর রেখে যাওয়ার জন্যে অত্যন্ত উদগ্রীব। চীনে এবং জাপানে এখনো পর্যন্ত এই মনোভাব টিকে রয়েছে। অনেকে বলতে পারেন এই কামনা এসেছে পূর্বপুরুষ পূজা থেকে। আমি কিন্তু এর বিপরীতটাকেই সত্যি বলে মনে করি। বলা যায় মানুষের অন্তরে পরিবারের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখার যে কামনা থাকে, পূর্বপুরুষ তারই প্রতিফলন। পেশাজীবী মহিলাদের কথা কিছু আগেই বলা হয়েছে। আবার বলি, তাদের মধ্যেও সন্তান লাভের কামনা প্রবল, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, কেননা তা না হলে তারা সেই কামনা পূর্ণ করতে যে পরিমাণ আত্মত্যাগ করে তা কেউ করত না। আমার দিক থেকে ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি যে, যত অভিজ্ঞতাই আমি অর্জন করি, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুখ পেয়েছি পিতৃত্ব-লাভে। আমার বিশ্বাস পারিস্থিতির কারণে কোনও নারী অথবা পুরুষকে সন্তানলাভ থেকে যদি বঞ্চিত থাকতে হয়, তখন তাদের একটি গভীর অভাব অপূর্ণ থাকে আর তা থেকে এমন এক অতৃপ্তি ও উদাসীনতা জন্ম নেয় যার কারণ সম্পূর্ণ অজানা থেকে যায়। এই পৃথিবীতে সুখী হতে হলে, বিশেষ করে যৌবন অতিক্রান্ত হলে নিজেকে একজন নিঃসঙ্গ মানুষ, যার দিন খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে, এইভাবে না ভেবে ভাবা উচিত সৃষ্টির প্রথম বীজ থেকে যে জীবনধারা প্রবাহিত হয়ে এক অজ্ঞাত এবং সুদূর ভাবীকালের দিকে এগিয়ে চলেছে সে তারই অংশ। নির্দিষ্ট ভাষায় প্রকাশিত এই সচেতন অনুভূতি জগতের প্রতি অতি সভ্যতাসূলভ এবং মননশীল দৃষ্টিভংগীর সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু একটি অস্পষ্ট, সহজাত আবেগরূপে এটি আদিম এবং প্রকৃতিজাত এবং এর অভাবটাই উচ্চসভ্যতা-সূলভ। যে মানুষ এমন কোনও মহৎ এবং উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব অর্জন করতে সমর্থ, যার অবদান প্রসারিত হবে আগামীকালে, তিনি তার কাজের ভিতর দিয়েই তৃপ্ত করতে পারেন তাঁর অনুভূতিকে। কিন্তু যেসব পুরুষ ও নারীর এমন অসাধারণ প্রকৃতির দাবিয়া উপহার নেই, তাদের তৃপ্তির একমাত্র পথ সন্তানলাভ। যারা তাদের সৃজনীশক্তিকে নষ্ট হতে দিয়েছে তারা জীবনপ্রবাহ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছে এবং তা করতে গিয়ে তারা নিজেদের শুকিয়ে যাওয়ার এক প্রবল ঝুঁকির সম্ভাবনাকে বেছে নিয়েছে। তাদের জন্যে, যদি তারা বিশেষভাবে নৈর্ব্যক্তিক হতে না পারে, মৃত্যু অবধারিত। যে পৃথিবীটা তাদের পরে আসবে তা নিয়ে তাদের কোনও মাথাব্যথা নেই আর এই কারণে তাদের নিজেদেরই কাছে নিজেদের যা কিছু কাজ সব তুচ্ছ এবং মূল্যহীন মনে হবে। যেসব নর-নারীর সন্তান এবং সন্তানের সন্তানরা রয়েছে এবং তাদের সহজাত স্নেহের উৎস থেকে ভালবাসেন,

তাহলে আগামী দিনগুলি তাদের কাছে মূল্যবান মনে হবে, অন্তত তারা যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন এবং শুধু কোনও নৈতিকতা বা কল্পনার প্রয়াসে নয়, সহজাত এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এবং যে ব্যক্তির সব প্রভাব তাঁর ব্যক্তিজীবন ছাড়িয়ে যতদূর বিস্তৃত হয়েছে সেই প্রভাবের পরম্পরা আরো অনেক দূর প্রসারিত হতে পারে। আব্রাহামের মত, যিনি এই ভাবনা থেকে তৃপ্তিলাভ করবেন যে তাঁর ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীরা প্রতিশ্রুত সেই ভূমির অধিকার লাভ করবে, যদি তা পরে বহু প্রজন্মে নাও ঘটে এই অনুভূতি থেকেই তিনি ব্যর্থতাবোধের যন্ত্রণা থেকে বেঁচে যাবেন, না হলে তাঁর সব আবেগ নষ্ট হয়ে যাবে।

পরিবারের ভিত্তি হল বাবা-মার তাদের সন্তানদের জন্যে এক বিশেষ রকমের স্নেহের অনুভূতি। তারা পরস্পরকে যেভাবে ভালবাসে, বা অন্যের সন্তানদের, তার চেয়ে আলাদা। এটা সত্যি যে কোনও কোনও বাবা-মার সন্তানদের প্রতি স্নেহের অনুভূতি কম থাকে অথবা থাকেই না। কিন্তু একথাও সত্যি কোনও কোনও মা নিজের সন্তানের প্রতি যে প্রবল বাৎসল্য অনুভব করে, ঠিক অনুরূপ বাৎসল্য অন্যের সন্তানের জন্যে অনুভব করে। এই ব্যাপারে সহজ করে বলা যায়, বাৎসল্য এক বিশেষ ধরনের অনুভূতি, যা সাধারণ মানুষ নিজের সন্তানের প্রতি অনুভব করে, অন্য কোনও মানুষের প্রতি নয়। এই আবেগ আমরা পেয়েছি আমাদের পূর্বপুরুষ প্রাণীদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে। এই বিষয়ে ফ্রয়েডের দৃষ্টিভঙ্গী আমার কাছে খুব বেশি জৈব-বিজ্ঞান সম্মত বলে মনে হয় না, কারণ যে কোনও লোক কোনও মা-প্রাণীকে দেখলেই বুঝতে পারবে তার শাবকদের জনকের প্রতি তার যে আচরণ তা তার শাবকদের সাথে তুলনায় একেবারেই আলাদা। মানুষের মধ্যে যা দেখতে পাওয়া যায় তা একই সহজাত প্রবৃত্তির পরিবর্তিত এবং কম নিবিড় রূপ। এই বিশেষ সহজাত আবেগের জন্যে তা না হলে প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিবার সম্পর্কে আর কিছুই প্রায় বলার প্রয়োজন হত না। কারণ তা হলে সন্তানদের লালন-পালনের ভার পেশাদার পালকের হাতে ছেড়ে দেওয়া যেত। কিন্তু যে জিনিস রয়েছে অর্থাৎ সন্তানদের প্রতি বাবা-মার বিশেষ স্নেহ, তাহলে বাবা-মার সহজাত আবেগ নষ্ট হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত, তাদের কাছে এবং সন্তানদের কাছে সমান মূল্যবান। সন্তানের প্রতি বাবা-মার স্নেহের মূল্য প্রধানত এটা যে, তা অন্য যে কোনও স্নেহের চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। বন্ধু বন্ধুকে ভালবাসে তার গুণের জন্যে প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরকে ভালবাসে মোহনীয় শক্তির জন্যে। এই গুণ এবং শক্তি যদি কমে যায় তা হলে বন্ধু ও প্রেমিক পালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু একমাত্র বিপদের সময়েই জনক-জননীর পর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করা যায়। অসুস্থ হলে, এমন কি সম্ভ্রম বিনষ্ট হলেও, যদি বাবা-মা আদর্শবান হন। আর

[illegible] জন্যে প্রশংসিত হই, তখন আনন্দ নাই, যদি আমরা অনেকেই যথেষ্ট [illegible] বলে মনে মনে অনুভব করি যে এমন প্রশংসা বিপদজনক। বাবা-মা [illegible] ভালবাসেন কারণ আমরা তাঁদের সন্তান এবং এই ঘটনা অপরিবর্তনীয়। [illegible] তাঁদের কাছেই আমরা অন্যের তুলনায় সবচেয়ে বেশি নিরাপদ বোধ [illegible]। সাফল্য পাওয়া গেলে এই জিনিস মূল্যবান মনে হতে পারে, কিন্তু ব্যর্থ হলে [illegible] এমন সান্ত্বনা এবং নিরাপত্তা যা কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

[illegible] মানবিক সম্পর্কের মধ্যে সাধারণভাবে এক পক্ষের সুখ পাওয়া সহজ। [illegible] দুপক্ষের জন্যে তা অনেক কঠিন। কারারক্ষক কয়েদিকে পাহারা দিয়ে সুখ [illegible] পারে, মনিব তার অধীনস্থ কর্মীকে ভয় দেখিয়ে সুখ পেতে পারে, শাসক [illegible] শক্ত হাতে শাসন করে সুখ পেতে পারে এবং রক্ষণশীল পিতাও যে তাঁর [illegible] নীতিশিক্ষা দেওয়ার জন্যে বেতের ব্যবহার করে সুখ পান, তা নিয়ে [illegible] সংশয় নেই। কিন্তু এইসব কিছু হল একপক্ষের সুখ, এর সাথে জড়িত [illegible] অপরপক্ষের তাতে অসন্তোষ ছাড়া অন্য কিছু নেই। এই ধরনের পক্ষপাতমূলক [illegible] যে ভুল আছে আমরা তা বুঝি। আমরা বিশ্বাস করি সুস্থ মানবিক সম্পর্ক [illegible] রাখতে হলে উভয়পক্ষের যাতে তৃপ্তি তাই হওয়া উচিত। এই কথা [illegible] ভাবে বাবা-মা এবং সন্তানদের সম্পর্কে প্রযোজ্য। কিন্তু তার ফলে মা-[illegible] আগে যেমন সন্তানদের কাছ থেকে আনন্দ পেতেন এখন তা পান না, [illegible] সন্তানেরা আগে যেমন মা-বাবার কাছ থেকে দুঃখ-যন্ত্রণা পেত এখন তা [illegible] না। আমি মনে করি না, আগের দিনের তুলনায় মা-বাবা কেন এখন কম [illegible] পাচ্ছে তার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে, যদিও বর্তমানে একথা বাস্তব, [illegible] বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমি এটাও মনে করি না, কেন মা-বাবা [illegible] আনন্দকে বাড়াতে পারবেন না তার কোনও কারণ আছে। আধুনিক [illegible] সমসম্পর্কতার যেটা উদ্দেশ্য অর্থাৎ মননীয়তা এবং সুন্দর আচরণ, অন্যের [illegible] প্রতি কিছু শ্রদ্ধা, তা এখানেও প্রয়োজন। আর এটাই বর্তমানে সাধারণ [illegible] কলহপ্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করে। পিতৃত্ব এবং মাতৃত্বের সুখ নিয়ে [illegible] আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমে জৈবিক উপাদান থেকে তারপর সমতায় [illegible] বিশ্বের পক্ষে অন্যের প্রতি যে মনোভাব থাকা প্রয়োজনীয় বলে আমরা [illegible] করি তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে তা বাবা-মা কীভাবে গ্রহণ করে সেইদিক থেকে।

পিতৃত্ব বা মাতৃত্বের যে আনন্দ তার মৌল উৎস দ্বিধাবিভক্ত। তার একটি হচ্ছে [illegible] সন্তানসন্ততির ভিতর নিজেরই দৈহিক বিস্তারের অনুভূতি, যা বেঁচে থাকবে নিজের [illegible] মৃত্যু হলেও এবং তা সম্ভব তার যখন পালা আসবে সেও ঠিক একইভাবে [illegible] বিস্তার করবে পরবর্তী প্রজন্মের ভিতর এবং এইভাবেই সে তার

বংশধারার প্রাণ-বীজকে অমরত্ব দিয়ে যাবে। অপরটি হচ্ছে ক্ষমতা ও কোমলতার ঘনিষ্ঠ মিশ্রণ। নবাগত শিশুটি অসহায়, তার অভাব পূরণের জন্যে রয়েছে সহজাত আবেগ এবং তা শুধু সন্তান স্নেহকে তৃপ্ত করে না, মা-বাবার প্রয়োজন করার ইচ্ছাকেও তৃপ্ত করে। যতদিন শিশুকে অসহায় মনে হবে ততদিন তার প্রতি যে স্নেহ বর্ষিত হয় তাকে স্বার্থহীন মনে করা যায় না, কেন না এর মধ্যে থাকে নিজেরই দুর্বল অংশকে রক্ষা করার আবেগ। কিন্তু সন্তানের শৈশব থেকেই মা বাবার মনে মাতৃ-পিতৃসুলভ স্নেহ এবং সন্তানের মঙ্গল। এই দুইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়, সন্তানের ওপর ক্ষমতা বিস্তার কিছুটা সহজাত প্রকৃতিপ্রদত্ত হলেও সন্তান যত দিক থেকে সম্ভব স্বাধীন হতে শিখুক এটাই চাওয়া উচিত, কিন্তু যদি মা-বাবার ক্ষমতা বিস্তারের প্রবৃত্তি থাকলে অপ্রীতিকর মনে হবে। কোনও কোনও মা-বাবা এই দ্বন্দ্ব নিয়ে সচেতন নন এবং সন্তানেরা বিদ্রোহ না করা পর্যন্ত তাদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে যান। কিন্তু অন্যেরা এই বিষয়ে সচেতন বলেই পরস্পর বিরোধী আবেগের শিকার হন। এই দ্বন্দ্বে তাদের পিতৃ-মাতৃত্বের সুখ হারিয়ে যায়। সন্তানের ওপর সব যত্ন মমতা ঢেলে দেওয়ার পর তারা দুঃখের সাথে বুঝতে পারেন তাঁরা যা আশা করেছিলেন, সন্তান তার চেয়ে একেবারেই অন্যরকম হয়েছে। তাঁরা চেয়েছিলেন ছেলে সৈনিক হোক, কিন্তু দেখেন সে যুদ্ধবিরোধী হয়ে উঠেছে। অথবা টলস্টয়ের মতো তাঁরা ছেলেকে যুদ্ধবিরোধী হবে বলে মনে করেছিলেন, কিন্তু সে যোগ দিয়েছে ব্ল্যাক হানড্রেডস সেনাদলে। কিন্তু পরিণতির জন্যে মোটেই নয়, যে শিশু নিজেই খেতে শিখেছে তাকে যদি আপনি খাইয়ে দেন তাহলে শিশুর কল্যাণের ওপর আপনি নিজের ভালবাসার ক্ষমতাকে চাপিয়ে দিচ্ছেন যদিও আপনি ভাবছেন স্নেহবশত আপনি তার কষ্ট কমিয়ে দিচ্ছেন। যদি আপনি বিপদ সম্পর্কে তাকে খুব বেশি সচেতন করে দেন তা হলে মনে হবে সম্ভবত আপনি তাকে আপনার ওপর নির্ভরশীল রাখার কামনা থেকে এ করছেন। আপনি যে প্রতিপাদক স্নেহ তাকে দিয়ে থাকেন, আপনি তাতে যা চান, তাহলে মনে হবে আপনি সম্ভবত তার আবেগের সাহায্যে তাকে ধরে রাখতে চান। হাজার রকমভাবে ছোট অথবা বড়, মা-বাবার অধিকারবোধের চেতনা তাদের বিপথে চালিত করে, যদি না তারা খুব সতর্ক এবং মনের দিক থেকে নির্ভেজাল হয়। আধুনিক মা-বাবারা এ বিষয়ে সচেতন। তবুও মাঝে মাঝে সন্তানদের সাথে আচরণে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন, তার ফলে তাদের খুব বেশি উপকারে আসতে পারতেন না। কিন্তু যদি তাঁরা তাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভুল করতে দিতেন তাহলে বেশি উপকারে আসতে পারেন। কারণ প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে যদি তারা নিশ্চয়তা এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখে তা হলে তাদের মনে যে দুশ্চিন্তা

আসে, অন্য কিছুতে তা আসে না। সতর্ক হওয়ার চেয়ে অন্তরে পবিত্র হওয়া অনেক ভাল। মা-বাবা যথার্থই সন্তানের ওপর তাদের প্রভাবের চেয়ে ওদের কল্যাণ কামনাই বেশি করেন। তা হলে তাঁদের কী করা উচিত বা কী করা উচিত তার জন্যে মনোবিশ্লেষণের লেখা পাঠ্য বই পড়ার প্রয়োজন নেই। তাঁরা নিজেদের অন্তরের সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে তার নির্দেশ খুঁজে পাবেন এবং এসব ক্ষেত্রে মা-বাবার সাথে সন্তানের সম্পর্ক প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মধুর থাকবে এবং কোনো সন্তানের মনে বিদ্রোহ তৈরী হবে না এবং বাবা-মার মনেও হতাশার বোধ জন্মাবে না। সন্তানের ব্যক্তিত্বকে সম্মান দেখানোর জন্যে প্রথম থেকে মা-বাবার কাছে যে দাবি, যা শুধুমাত্র একটা নীতি নয় তা নৈতিক অথবা বুদ্ধিবৃত্তিক যাই হোক। এর গভীরে আছে একটা অনুভূতি যা অতীন্দ্রিয় বিশ্বাসের সমতুল্য, যা অধিকার-মনোভাব এবং নির্যাতনকে অসম্ভব করে তুলবে। এই মনোভাব শুধুমাত্র সন্তানদের ক্ষেত্রেই আচরণীয় তা নয়, এটা সমভাবেই প্রযোজ্য বিবাহের ক্ষেত্রে এবং বন্ধুত্বেও। যদিও বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে এটা তত কঠিন নয়। সুন্দর পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে এই মনোভাব খুবই প্রয়োজনীয়। কিন্তু এটা এমন একটা দুরাশা যে এই সম্বন্ধে আর কোনও আলোচনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু জীবনের সর্বক্ষেত্রে যখন এই বিশ্বজনীন মনোভাবের প্রয়োজন, তাই এর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি শিশুদের ক্ষেত্রে কারণ তাদের অসহায়তার জন্যে, কারণ তাদের ছোট আকার এবং ক্ষীণ শক্তির জন্যে অমার্জিত লোকেরা তাদের অবজ্ঞা করে।

কিন্তু এই গ্রন্থে আলোচিত সমস্যাগুলির দিকে আবার ফিরে তাকানো যেতে পারে। আধুনিক বিশ্বে মাতৃত্ব-পিতৃত্বের পূর্ণ আনন্দ একমাত্র তাঁরাই পেতে পারেন যারা, আমি এতক্ষণ ধরে যা বলে আসছি, অর্থাৎ সন্তানদের প্রতি সম্মানের মনোভাবকে গভীরভাবে অনুভব করেন। তাহলে তাঁদের আর ক্ষমতা প্রীতিকে কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে না এবং সন্তানেরা স্বাধীনতা পেলে উৎপীড়ক মা বাবা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তার তিক্ত মোহমুক্তির যে আতংক তার কোনও প্রয়োজন নেই। যে মা-বাবার এই মনোভাব তাঁরা বাৎসল্যে অনেক বেশি আনন্দ পান, যে আনন্দ মাতৃত্ব-পিতৃত্বের ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশের দিনে উৎপীড়ক মা বাবার পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। এই পিচ্ছিল ভুবনে যিনি এখনো নিজের ক্ষমতা বজায় রাখতে সংগ্রাম করে চলেছেন, তাঁর পক্ষে যে আবেগ সম্ভব তার চেয়ে তিনি ভালবাসাকে কোমলতার সাহায্যে উৎপীড়ন থেকে মুক্ত করেছেন তিনি অনেক বেশি আনন্দ পেতে পারেন যা আরো বেশি সুন্দর, আরো বেশি কোমল যা জীবনের সস্তা ধাতুকে অতীন্দ্রিয় আনন্দের বিশুদ্ধ সোনায় রূপান্তরিত করতে পারে।

মাতৃ-পিতৃসুলভ হৃদয়াবেগকে খুব উচ্চ মূল্য দিলেও আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই না, যা প্রায় সকলেই করে থাকেন, যে জননীরাই তাদের সন্তানের জন্যে নিজেরাই যথাসাধ্য করবেন। এই বিষয়ে কিছু প্রচলিত রীতিনীতি রয়েছে বহু প্রাচীনকাল থেকে। তখনকার যুগে প্রাচীনারা নবীনাদের যে কয়েকটি অবৈজ্ঞানিক ভালমন্দ উপদেশ দিয়ে যেতেন, তার বাইরে সন্তান পালন সম্পর্কে আর বেশি কিছু জানা ছিল না। বর্তমান কালে সন্তান পালনের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে এবং যিনি এই বিষয়ের কোনও বিশেষ বিভাগে যে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তার হাতেই এই ভার তুলে দিলে সবচেয়ে ভাল হয়। তাদের শিক্ষার যে বিভাগ সমাজে 'শিক্ষা' কথাটি ব্যবহার করা হয় সেখানে তা অনুমোদিত। মা ছেলেকে ক্যালকুলাস শেখাবে এটা আশা করা যায় না, তা সে ছেলে মায়ের যত প্রিয়ই হোক। বই-পড়া শিক্ষা বিষয়ে এটা মোটামুটিভাবে স্বীকৃত যে, যে মা এই বিষয়ে কিছু জানেন না, তার চেয়ে যারা এই বিষয়ে অভিজ্ঞ তাদের কাছেই ও বেশি শিখতে পারে। কিন্তু সন্তান বিষয়ে অন্যান্য অনেক বিভাগে এটি অনুমোদিত নয়, কেন না তার জন্য যে অভিজ্ঞতা প্রয়োজন তা এখন পর্যন্ত স্বীকৃতি পায় নি। নিঃসন্দেহে কিছু জিনিস মা-ই ভাল করতে পারে, কিন্তু সন্তান যত বড় হতে থাকে ততই তাকে আরো বেশি জিনিস শেখাতে হয় যা অন্যেরা ভাল শেখাতে পারেন। সাধারণভাবে যদি সকলে স্বীকার করত, তা হলে মায়েরা অনেক পরিশ্রম থেকে বেঁচে যেত যা তাদের জন্যে ক্লান্তিকর, কারণ এটা এমন বিষয় নয় যাতে তাদের পেশাগত দক্ষতা রয়েছে। যে নারী নিজের জন্যে অথবা তার সমাজের জন্যে কোনও বিশেষ রকম পেশাগত দক্ষতা অর্জন করেছে তা মাতৃত্বলাভ করার পরও যাতে সেই দক্ষতা কাজে লাগাতে পারে সেই স্বাধীনতা তার থাকা উচিত। গর্ভধারণের শেষ কটি মাস এবং শিশুকে স্তন্যপান করানোর সময় সেই কাজে অসুবিধা হতে পারে। কিন্তু শিশুর বয়স যখন নয় মাস হয়ে যায় তখন সেই শিশু মায়ের পেশাগত কাজে অলঙ্ঘনীয় বাধা হতে পারে না। সমাজ যখনই মায়ের ওপর তার সন্তানের জন্যে যুক্তির অতিরিক্ত ত্যাগ স্বীকারের দাবি তুলে ধরে তখন মা, যদি তিনি অস্বাভাবিক ধরনের সাধু স্বভাবের না হন, তাহলে সন্তানের কাছে তাঁর যা প্রাপ্য তার অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রত্যাশা করবেন। যে জননীকে চালু রীতিতে আত্মত্যাগী বলা হয়, তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্তানের পক্ষে অস্বাভাবিকরকম স্বার্থপর, কারণ মাতৃত্ব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হওয়াতে তাকে জীবনের সবটুকু মনে করলে তৃপ্তি পাওয়া যাবে না এবং এর ফলে জনক-জননীর আবেগের দিক থেকে সন্তানের ওপর অধিকারি-বিস্তারী হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

অতএব এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, সন্তান ও তার জননী— উভয়ের স্বার্থে মাতৃত্ব যেন জীবনের অন্যসব স্বার্থ এবং কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়, তা দেখতে হবে যদি শিশুপালনের প্রকৃত প্রশিক্ষণ তিনি গ্রহণ করে থাকেন এবং যদি তাঁর নিজের সন্তানদের পালন করার ক্ষেত্রেও পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর এই দক্ষতা আরো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হওয়া উচিত এবং শিশুপালনকে তাঁর পেশা হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। যে শিশুদের মধ্যে তাঁর নিজের সন্তানও অন্তর্ভুক্ত হবে বলে আশা করা যায়। বাবা-মার কাছ থেকে রাষ্ট্র ন্যূনতম যেটুকু তা যদি তারা গ্রহণ করে তাহলে তাদের সন্তানদের কীভাবে বড় করে তুলবে এবং কে করবে, এ বিষয়ে প্রশ্ন করার অধিকার তাদের থাকা উচিত। অবশ্য ধরে নিতে হবে যে, সন্তানেরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকদের তত্ত্বাবধানের বাইরে যাবে না। কিন্তু এমন রীতি চালু হওয়ার দাবি জানানো উচিত নয়। অন্য নারীরা যে কাজ খুব ভালভাবে করতে পারে প্রত্যেক জননী নিজেই তা করবে। যেসব মা সন্তানপালনে ব্যর্থতা ও অক্ষমতা অনুভব করে, যেমন অনেক মা করে থাকে তাদের উচিত যারা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পেয়েছে এবং যাদের স্বাভাবিক দক্ষতা রয়েছে কোনও দ্বিধা না করে তাদের হাতে সন্তানের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া। সন্তানদের মঙ্গলের জন্যে ঠিক কী করা উচিত, তা মেয়েদের শিখিয়ে দেওয়ার জন্যে স্বর্গ-প্রেরিত কোনও ধারণা নেই। মানসিক উদ্বেগ যখন একটা নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে তখন তা অধিকার-প্রবণতার ছদ্মবেশ হয়ে যায়। জননীর ভাবাবেগপূর্ণ ব্যবহারে এবং অক্ষমতার কারণে অনেক শিশুরই মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয় ঘটে। বাবারা যে শিশুর জন্যে খুব বেশি কিছু করতে পারে না এটা সবসময় স্বীকৃত হয়ে এসেছে, তবু সন্তানেরা মাকে যতটা ভালবাসতে পারে, বাবাকেও ততটাই পারে। যদি নারীদের জীবনকে অপ্রয়োজনীয় দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে হয় এবং শিশুদের মন এবং দেহ সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান যেভাবে বাড়ছে, তার সুবিধা যদি শিশুদের দিতে হয়, তা হলে সন্তানের সাথে জননীর সম্পর্ক আগামী দিনে ক্রমেই সন্তানের সাথে জনকের সম্পর্কের তুল্য করতে হবে।

১৪
কাজ

কাজকে সুখের কারণ রূপে স্থাপন করা উচিত না দুঃখের কারণরূপে, মনে হয় তা বিবেচনা করা হচ্ছে একটা সন্দেহজনক প্রশ্নরূপে। এমন অনেক কাজ আছে যা খুবই ক্লান্তিকর এবং অতিরিক্ত কাজ করা সব সময়েই খুব কষ্টকর। কিন্তু আমি মনে করি অধিকাংশ লোকের কাছে কাজটা যদি অতিরিক্ত না হয়, সেই কাজ সবচেয়ে নীরস হলে অলসতার চেয়ে কম দুঃখের। কাজের সবরকম শ্রেণী আছে। কাজের প্রকৃতি এবং কর্মীর দক্ষতা অনুযায়ী সেসব শ্রেণীর একপ্রান্তে যেমন থাকে একঘেয়েমির হাত থেকে মুক্তি, অন্যপ্রান্তে থাকে গভীরতম আনন্দ। অধিকাংশ লোক যেসব কাজ করে তার উল্লেখযোগ্য অংশই শুধু কাজ বলেই তা আকর্ষণীয় তা নয়। তবু এমন কাজেরও কয়েকটি বড় সুবিধার দিক রয়েছে। কাজে শুরুতে কী করা উচিত তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন বোধ না করেই দিনের অনেকটা সময় কাজ করা যায়। অধিকাংশ লোকই যখন তারা নিজের পছন্দ অনুযায়ী কাজে সময় কাটাবার স্বাধীনতা পায়, তখন কোন কাজে তারা প্রচুর আনন্দ পাবে সে চিন্তা করতে পারে না এবং যখন একটা কিছু ঠিক করে, তখন ভাবে অন্য কাজটা করলে হয়তো বেশি আনন্দের হত। অবসর সময় কীভাবে বুদ্ধিমত্তার সাথে কাটানো যায় সেটা স্থির করাই হচ্ছে সভ্যতার শেষ কাজ এবং এখন পর্যন্ত কম লোকই সেই স্তরে পৌঁছাতে পেরেছে। তাছাড়া, পছন্দ করার কাজটাও ক্লান্তিকর। অসাধারণ উদ্যোগী ছাড়া, অন্যদের উপদেশ দেওয়া যদি খুব বেশি অসন্তোষজনক না হয়, তা হলে দিনের প্রতিটি ঘণ্টা কী করতে হবে তা বলে দেওয়া হয় তাহলে ভালই লাগে। অধিকাংশ কর্মহীন ধনীরা অবর্ণনীয় রকমের একঘেয়েমিতে ভোগে, যা থেকে মুক্তির জন্যে অনেক কঠিন মূল্য তাদের দিতে হয়। কখনো তারা মুক্তি খোঁজে আফ্রিকায় পশু শিকার করে, কখনও আকাশযানে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু এ ধরনের উত্তেজনাময় কাজের সংখ্যা সীমিত, বিশেষ করে যখন যৌবন অতিক্রান্ত হয়। সে জন্যে যেসব ধনীব্যক্তি বুদ্ধিমান তারা যদি গরীব হতেন তখন যেমন পরিশ্রমের কাজ করতেন, প্রায় তেমন পরিশ্রম করেন। আর ধনী মহিলারা এমন সব অসংখ্য নগণ্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, যা মাটি-কাঁপানো গুরুত্ব বিষয়ে তাদের ধারণাকে কেউ বদলাতে পারবে না।

সুতরাং বিরক্তির প্রতিষেধক হিসাবে প্রথম এবং প্রধান স্থান হল কাজের। কারণ প্রয়োজনীয় অথচ নীরস কাজ করতে গিয়ে যে বিরক্তি জাগে তা কোনো কাজ না থাকার বিরক্তির তুলনায় কিছুই নয়। কাজের এই সুবিধার সাথে আর

একটা সুবিধা যুক্ত আছে তা হল ছুটির দিন যখন আসে তা অনেক বেশি আনন্দময় হয়ে ওঠে। যদি অবশ্য এমন কঠিন কাজ কোনও মানুষকে করতে না হয়, যা তার চিন্তাশক্তি নষ্ট করে দেয়, তাহলে সে অলস লোকের কাজের চেয়ে ছুটির সময়ে বিশ্রাম স্বাদ পেতে অনেক বেশি উদ্দীপনা খুঁজে পাবে।

পারিশ্রমিক পাওয়া অধিকাংশ কাজের এবং বিনা পারিশ্রমিকের কিছু কাজের একটা সুবিধা এই যে, তা উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্যে সাফল্য এবং সম্ভাবনা এনে দেয়। অধিকাংশ কাজের সাফল্য পরিমাপ করা হয় উপার্জন দিয়ে এবং যতদিন আমাদের বাণিজ্যিক সমাজ থাকবে তাকে লঙ্ঘন করা যাবে না। একমাত্র শ্রেষ্ঠ কাজের ক্ষেত্রেই এই পরিমাপ প্রয়োগ করা হয় না। মানুষের উপার্জন বাড়ানোর ইচ্ছা যতটুকু সাফল্যের ইচ্ছাও ততটুকু কারণ অতিরিক্ত উপার্জনেই শুধু অতিরিক্ত আরাম পাওয়া যাবে। কাজ যত নীরসই হোক তাতে যদি সুনাম প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তা সহ্য করাও যায়— তা সেই প্রতিষ্ঠা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ুক অথবা নিজের বন্ধুবান্ধব চক্রের মধ্যেই থাকুক। উদ্দেশ্যের অবিচ্ছিন্নতাই হচ্ছে আগামী দিনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণের মধ্যে একটি এবং প্রায় অধিকাংশ লোকের জীবনে তা আসে কাজের ভিতর দিয়ে। এই বিষয়ে সেসব রমণীদের গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকতে হয়, তারা পুরুষদের তুলনায় অথবা যেসব রমণী বাইরে কাজ করে তাদের চেয়ে কম ভাগ্যবতী। যে নারী সংসারের কাজ করে তার জন্যে কোনও পারিশ্রমিক পায় না। তার নিজের অবস্থা ভাল করার কোনও উপায় নেই, স্বামী তাকে স্বীকার করে নেয় (সে কী করে তা প্রায় দেখেই না)। কিন্তু গৃহকর্মের তার কোনও মূল্য নেই, যদি অন্য কোনও গুণ থাকে তবে সে তার মূল্য পায়। যেসব রমণী অবশ্য যথেষ্ট স্বচ্ছল তাদের বেলায় তা প্রযোজ্য নয়। তারা চমৎকারভাবে ঘর সাজাতে পারে, সুন্দর বাগান করতে পারে এবং ক্রমে প্রতিবেশীদের ঈর্ষার পাত্রী হয়। কিন্তু তাদের সংখ্যা বড় কম। অধিকাংশ রমণীর পক্ষেই গৃহকর্ম সেই পরিমাণ তৃপ্তি দেয় না, যা পুরুষদের এবং পেশাজীবী নারীদের অন্যসব কাজ দেয়। সময় কাটাবার এবং যত অল্পই হোক, উচ্চাকাঙ্ক্ষা সার্থক করে তোলার জন্যে কিছু পথ খুলে দেওয়ার মূল্য কাজের মধ্যেই বেশি পাওয়া যাবে এবং যার কাজ বিরক্তিকর, তাকেও কর্মহীনের তুলনায় বেশি তৃপ্তি দেবে। কিন্তু কাজ যখন আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে তখন তা শুধুমাত্র একঘেয়েমি থেকে যা দেয় চেয়ে অনেক ওপরের স্তরের তৃপ্তি দিতে পারে। আমি যেসব কাজের আকর্ষণ কোমল, তা থেকে শুরু করে একজন মহান ব্যক্তির সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করে রাখার মতো উপযুক্ত কাজ দিয়ে এই সাজানোটা শেষ করব।

দুটি প্রধান উপকরণ কাজকে আকর্ষণীয় করে : প্রথম, দক্ষতার প্রয়োগ এবং দ্বিতীয় নির্মাণ।

অসাধারণ দক্ষতার অধিকারী প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের দক্ষতা প্রয়োগ করতে ভালবাসে যতক্ষণ পর্যন্ত না তা সহজ হয়ে আসে অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের দক্ষতার আরও উন্নতি করতে পারে। শৈশবের প্রথম থেকেই কাজে প্রেরণা শুরু হয়। যে বালক মাথায় ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে, সে পায়ের উপর দাঁড়াতে অনিচ্ছুক হয়। একটা বড় কাজে যে আনন্দ পাওয়া যায়, দক্ষতার খেলা থেকেও তা লাভ করা যায়। একজন আইনজীবী বা একজন রাজনীতিকের কাজের মধ্যে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা তাসের ব্রীজ খেলা থেকে পাওয়া আনন্দের সমতুল্য। অবশ্য এখানে শুধু দক্ষতার প্রয়োগ নয়, দক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে দেওয়ার আনন্দও আছে। কিন্তু যেখানে এই প্রতিযোগিতার উপাদানটি অনুপস্থিত সেখানেও কঠিন কৃতিত্ব প্রদর্শন করা সম্ভব। যে ব্যক্তি আকাশে বিমান নিয়ে নানারকম কৌশল দেখাতে পারে এবং তাতে যে গভীর আনন্দ পায় তার জন্যে জীবনের ঝুঁকি নিতে পারে। আমি কল্পনা করতে পারি একজন দক্ষ শল্যচিকিৎসক যে অবস্থায় কাজ করেন তা বেদনাদায়ক হলেও তিনি তাঁর নিখুঁত সফল অস্ত্রোপচারের পর তৃপ্তি লাভ করেন। একই রূপ আনন্দ তীক্ষ্ণতার কিছু কম হলেও সাধারণ মানের কাজ থেকেও পাওয়া যায়। আমি প্লাম্বার কারিগরের কথা শুনেছি যে তার কাজ থেকে আনন্দ পায়, যদিও এমন কারো সাথে দেখা হওয়ার সুযোগ আমার হয় নি। নৈপুণ্যের সব কাজই আনন্দজনক হতে পারে যদি অবশ্য সেই নৈপুণ্য প্রয়োজনে পরিবর্তনশীল হয় অথবা তাতে সেই সুযোগ থাকে যার সীমা বেঁধে দেওয়া নেই। এইসব শর্ত যদি অনুপস্থিত থাকে তা হলে যে ব্যক্তি নৈপুণ্যের উচ্চতম ধাপে পৌঁছেছে তার কাছে কাজ আর আকর্ষণীয় থাকবে না। যে ধাবক তিন মাইলের দৌড়ে প্রতিযোগিতা করে, যখন এই পেশায় যোগ দেওয়ার বয়স পার হয়ে যাবে তখন আর এই প্রতিযোগিতায় আনন্দ পাবে না। সৌভাগ্যের কথা অনেক কাজ আছে যার নতুন অবস্থায় নতুন রকম নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয় এবং যে ব্যক্তি কর্মরত তার পক্ষে মধ্য বয়সে ক্রমে ক্রমে উন্নতির ধাপে উঠে যাওয়া সম্ভব হয়। কিছু দক্ষতার কাজ আছে যেমন রাজনীতি, তাতে সফল হওয়ার উপযুক্ত বয়স হল ষাট থেকে সত্তর, তার কারণ হচ্ছে এ ধরনের কাজে অন্য লোক সম্পর্কে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অতি প্রয়োজনীয়। এইজন্যে সত্তর বছর বয়সের সফল রাজনীতিক সম বয়সের অন্যান্য লোকের চেয়ে বেশি সুখী। এই বিষয়ে তাদের একমাত্র প্রতিযোগী হচ্ছে বড়বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধাররা।

উৎকৃষ্ট কাজের আরো একটি উপকরণ আছে যা সুখের উৎসরূপে দক্ষতা প্রয়োগের চেয়েও বেশি মূল্যবান, তা হচ্ছে সৃষ্টি করার কাজ। কিছু কাজে অবশ্য তবে অধিকাংশ কাজেই নয়, কিছু নির্মাণ করা যায় এবং কাজের শেষে

প্রতিত্বের স্তম্ভরূপে থেকে যায়। কাজের গুণগত মানে কোনটি সৃষ্টি আর কোনটি ধ্বংস তা আলাদা করা যায়। সৃষ্টির কাজে প্রথমদিকে অবস্থাটি কিছু বিশৃঙ্খল থাকলে, কাজ শেষ হওয়ার পর লক্ষ্যটা বোঝা যায়। ধ্বংসের কাজে এর বিপরীতটাই ঠিক। এর প্রথম দিকে থাকে লক্ষ্য এবং শেষের দিকে হয়ে পড়ে বিশৃঙ্খল। সুতরাং বলা যায় ধ্বংসকারীর লক্ষ্যই হচ্ছে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করা, যার ভিতর কোন উদ্দেশ্য ফুটে উঠবে না। কোনও দালান নির্মাণ করা বা ভেঙ্গে ফেলার কাজে এটি সবচেয়ে স্পষ্ট এবং এই গুণমান আক্ষরিক অর্থে প্রয়োগ করা যায়। দালান নির্মাণে পূর্বে রচিত পরিকল্পনার বাস্তবায়িত করতে হয়। কিন্তু সেটি ভেঙ্গে ফেলতে হলে তার সব উপকরণ কীভাবে থাকবে তা নিয়ে কেউ সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, পরবর্তী নির্মাণের জন্যে অনেক ক্ষেত্রেই প্রাথমিক বিনষ্টি প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে এটি সম্পূর্ণ কাজের একটি অংশমাত্র, আলাদা নয়। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় পরবর্তী নির্মাণের কথা মনে না রেখেই লোকে প্রথমে ধ্বংসের কাজ শুরু করে। দেখা যায় এই কথাটা সে এই বিশ্বাসে নিজের কাছেও গোপন রাখে যে, নতুন নির্মাণের জন্যেই সে সব কিছু ভেঙে পরিষ্কার করছে। কিন্তু এটা যদি ছলনা হয়, তবে তার সেই ছলনার মুখোশ খুলে ফেলা সাধারণত অসম্ভব নয়, শুধু তাকে প্রশ্ন করতে হয়, এর পরবর্তী নির্মাণের কাজটা কী। এই বিষয়ে এটা পরিষ্কার হবে যে, উত্তরে সে স্পষ্ট কিছু বলতে পারছে না এবং বলার মতো উৎসাহও নেই তার। অথচ প্রাথমিক ধ্বংসের কাজে সে খুব নির্দিষ্টভাবে এবং উদ্দীপনার সাথে সব বলেছিল। অনেক বিপ্লবী, যুদ্ধবাদী এবং হিংসার দূতদের সম্পর্কে একথা বলা যায়, তবে কর্মপ্রেরণার উৎস হল ঘৃণা করে তাদের ধ্বংস করা। কিন্তু তারপর কী হবে সে বিষয়ে তাদের কোনও ধারণা নেই। আমি একথা অস্বীকার করতে পারি না যে সৃষ্টির মতো ধ্বংসের মধ্যেও আনন্দ আছে। এই আনন্দ ভয়ংকর এবং কোনও কোনও মুহূর্তে আরো তীব্র, কিন্তু তাতে কোনও গভীরতা নেই কারণ ধ্বংসের যা পরিণাম তার মধ্যে তৃপ্তির স্থান থাকে না। আপনি আপনার শত্রুকে হত্যা করলেন, তখন সে মারা গেল আপনার সব কাজ শেষ এবং বিজয় থেকে যে তৃপ্তি পেলেন তা অতি দ্রুত মিলিয়ে যাবে। অন্যপক্ষে নির্মাণের কাজ যখন সমাপ্ত হয়, তখন তা নিয়ে ভাবতেও আনন্দ। তা ছাড়া পরে আর কিছুই করার প্রয়োজন হবে না এমন পূর্ণাঙ্গভাবে তা কখনও শেষ হয় না। সবচেয়ে তৃপ্তিজনক উদ্দেশ্য তাই, যা একের পর এক সাফল্যের পথ খুলে দেয় যা কখনও থামে না। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে ধ্বংসের তুলনায় নির্মাণই সুখের বড় উৎস। আরো বিশুদ্ধভাবে বলা যায়, যারা সৃষ্টির কাজে যে আনন্দ পায়, আর ধ্বংসের কাজে যারা আনন্দ পায়, তাদের কোনও তুলনা চলে না। কারণ মনে

একবার ঘৃণা জাগলে নির্মাণকাজে অন্য লোক যে আনন্দ পায়, তেমন আনন্দ সহজলভ্য নয়।

একথাও বলা যায়, গুরুত্বপূর্ণ কোনও রকম নির্মাণ কাজের সুযোগ পেলে ঘৃণার অভ্যাস যত সহজে দূর করা যায়, অন্য কিছুতে তা সম্ভব নয়।

বড় কোনও সৃষ্টিধর্মী কাজের সাফল্যে যে তৃপ্তি পাওয়া যায় তা জীবনে প্রাপ্তব্য সেরা আনন্দসমূহের মধ্যে অন্যতম। যদিও দুর্ভাগ্যবশত এই শ্রেষ্ঠ আনন্দ শুধু বিশেষভাবে দক্ষ লোকদের জন্যেই উন্মুক্ত। গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাফল্য থেকে যে আনন্দ তা থেকে কোনও মানুষকে কেউ বঞ্চিত করতে পারে না, যদি না দেখা যায় শেষ পর্যন্ত যে তার কাজই ছিল বিশেষভাবে খারাপ। এই তৃপ্তির অনেক প্রকারভেদ আছে। যে লোকটি একটি সেচ প্রকল্পের সাহায্যে তার পতিত জমিকে একটি গোলাপের মতো প্রস্ফুটিত করে তুলেছে সে তাকে অত্যন্ত স্পষ্ট স্পর্শনযোগ্য রূপেই উপভোগ করবে। কোনও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ হতে পারে। যে অল্প কজন রাষ্ট্রনায়ক বিশৃঙ্খল পরিবেশকে নতুন শৃঙ্খলায় রূপায়নে জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের কাজও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এঁদের মধ্যে এ যুগে লেনিন একটি মহৎ উদাহরণ। শিল্পী এবং বিজ্ঞানীরা সবচেয়ে প্রত্যক্ষ উদাহরণ। শেক্সপীয়র তাঁর কবিতা সম্পর্কে বলেছেন : 'যতদিন মানুষের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস থাকবে, চোখে থাকবে দৃষ্টি, ততদিন এইগুলি বেঁচে থাকবে।' এবং এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে এই ভাবনা তাঁকে দুর্ভাগ্যে সান্ত্বনা জুগিয়েছিল। তাঁর সনেটের ভিতর দিয়ে তিনি বলেছেন তাঁর বন্ধুর সম্বন্ধে ভাবনা তাঁকে জীবনের সাথে আপোস করে চলতে সক্ষম করে তুলেছে। কিন্তু যেসব সনেট তিনি বন্ধুর উদ্দেশ্যে রচনা করেছিলেন সেসব যে তাঁর বন্ধুর চেয়ে তাঁর এই উদ্দেশ্যপূরণে বেশি কার্যকর হয়েছিল, এমন একটি সন্দেহ আমার রয়ে গেছে। বড় শিল্পী এবং বড় বিজ্ঞানসেবকরা যে কাজ করেন তা নিজেই আনন্দপূর্ণ। যতক্ষণ তাঁরা এই কাজ করবেন ততক্ষণ তাঁরা যোগ্য লোকের কাছ থেকে শ্রদ্ধা পেয়ে যাবেন। এবং তাঁরা সর্বাপেক্ষা মৌলিক ধরনের ক্ষমতার অধিকারী হন, যে ক্ষমতা হচ্ছে মানুষের চিন্তা এবং চেতনার ওপর প্রভাব। নিজেদের সম্পর্কে ভাল চিন্তা করার সবচেয়ে শক্তিশালী কারণ তাঁদের রয়েছে। মনে হয় এইসব সুন্দর ঘটনার মিলন যে কোনও ব্যক্তিকে সুখী করার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তবু এরকম ঘটে না। উদাহরণস্বরূপ মাইকেল এঞ্জেলোর নাম করা যেতে পারে। তিনি খুব অসুখী মানুষ ছিলেন এবং বলতেন (না, আমি নিশ্চিত, তিনি সত্যি বলতেন না) যে, যদি তাঁকে তাঁর দরিদ্র আত্মীয়দের ঋণ পরিশোধ করতে না হত, তাহলে তিনি ছবি আঁকার কষ্টটা আদৌ সহ্য করতেন না। সবসময়ে না হলেও, অধিকাংশ সময়েই মহৎ শিল্পসৃষ্টি

ক্ষমতার সাথে মেজাজগত একটা অশান্তির যোগ থাকে এবং তা এতই প্রবল যে, শিল্পী তাঁর কাজ থেকে আনন্দ খুঁজে না পেলে বাধ্য হয়ে তাঁকে আত্মহত্যার পথে যেতে হয়। তাই আমরা মনে করতে পারি না যে মহৎ সৃষ্টি হলেই তা মানুষকে সুখী করবে, আমরা শুধু বলতে পারি এটি তাকে কম অসুখী করবে। বিজ্ঞানসেবীরা কিন্তু শিল্পীদের তুলনায় মেজাজগতভাবে অনেক কম সুখী এবং সাধারণভাবে যাঁরা বিজ্ঞান নিয়ে মহৎ কাজ করেন তাঁরা সুখী মানুষ। মূলত এই সুখ তাঁরা লাভ করেন তাঁদের কাজ থেকে।

বর্তমানে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সুখহীনতার একটা কারণ হল, বিশেষ করে যাদের সাহিত্যে দক্ষতা আছে, তাদের অনেকেই স্বাধীনভাবে নিজেদের মেধাকে কাজে লাগানোর সুযোগ পান না। তাঁরা শিক্ষাদীক্ষাহীন লোকদের দ্বারা পরিচালিত বৃহৎ সব সংস্থায় কর্মীরূপে কাজ করেন। সেসব পরিচালকদের নির্দেশে তাদের এমন সব জিনিস লিখতে হয়, যা তাঁরা নিজেদের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে মনে করেন। যদি ইংল্যান্ড অথবা আমেরিকার সাংবাদিকদের কাছে অনুসন্ধান করা যায়, তাঁরা যে পত্রিকায় কাজ করেন তার নীতিমালায় তাদের বিশ্বাস রয়েছে কিনা, তাহলে জানা যাবে খুব কম সংখ্যক সাংবাদিকই মালিকদের নীতিতে বিশ্বাসী। বাকি অন্য সকলে শুধুমাত্র জীবিকার প্রয়োজনে নিজেরা যে নীতিকে ক্ষতিকর মনে করে তার কাছেই তাদের দক্ষতা বিক্রি করে দেয়। এই ধরনের কাজে কখনও আসল তৃপ্তি থাকে না এবং কাজের সাথে আপোস করতে গিয়ে যাদের মন এমন বিষময় হয়ে ওঠে যে, সেই মন আর কোনও কিছু থেকেই মাত্রিকভাবে কোনও তৃপ্তি খুঁজে নিতে পারে না। এরকম কাজ যাদের দায়ে পড়ে করতে হয় তাদের আমি নিন্দা করতে পারি না, কারণ এর যা বিকল্প তা হল অনাহার, যা আরো ভয়ানক। কিন্তু আমি মনে করি যেখানে কোনও ব্যক্তির সৃজনি শক্তির পক্ষে তৃপ্তিকর কাজ করা সম্ভব এবং সম্পূর্ণ অনাহারও এড়ানো যায়, সেখানে তাকে এই পরামর্শ দেওয়া চলে, সেখানে উচ্চ সাম্মানিক হলেও তা বর্জন করে নিজের সুখ এবং তৃপ্তিদায়ক কাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে গ্রহণ করা উচিত। আত্মসম্মানকে বিসর্জন দিয়ে যথার্থ সুখ লাভ করা সম্ভবই নয় বলতে হবে। যে লোক নিজের কাজের জন্যে সংকুচিত সে খুব কমই আত্মসম্মান লাভ করে।

সৃষ্টিশীল কাজের তৃপ্তি, এখন অল্প কিছুসংখ্যক লোকের বিশেষ সুবিধা হলেও অনেক লোকের পক্ষে এই বিশেষ সুবিধা পাওয়া সম্ভব নয়। যে লোক নিজেই নিজের কাজের নিয়ন্তা সে এটা অনুভব করতে পারে। অথবা যে লোকের কাছে যার কাজ প্রয়োজনীয় মনে হবে এবং সেই কাজে যথেষ্ট দক্ষতা প্রয়োজন, সেও তা অনুভব করতে পারবে। মনের মতো সন্তানকে গড়ে তোলা একটি কঠিন

সৃষ্টিমূলক কাজ। যা গভীর তৃপ্তি দিতে পারে। যে মা এটি সম্ভব করতে পেরেছে সে অবশ্যই অনুভব করতে পারবে যে তার পরিশ্রমের ফলে পৃথিবী এমন কিছু মূল্যবান জিনিস পেয়েছে যা অন্যভাবে পাওয়া যেত না।

জীবনকে সামগ্রিকরূপে দেখার প্রবণতার মধ্যে মানুষে-মানুষে বিস্তর পার্থক্য। কিছু লোকের পক্ষে এরকম দেখা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার এবং কিছু কাজ তাদের সাথে করতে পারলেও তা তাদের সুখের জন্যে প্রয়োজনীয়। আবার কিছু লোকের কাছে জীবন হল পরপর ঘটে যাওয়া বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমাবেশ, তাদের নিজের কোনও গুগতি নেই, পরস্পরের মধ্যে কোনও ঐক্যসূত্রও নেই। আমার মনে হয় প্রথমে যাদের কথা বললাম তারা অন্যদের তুলনায় বেশি সুখলাভ করতে সক্ষম, কারণ তারাই ক্রমশ সেইরকম অবস্থা তৈরী করে নেবে যা থেকে তারা আনন্দ এবং আত্মসম্মান পেতে পারবে। অপরদিকে অন্যেরা, একবার এদিক, আরেকবার ওদিক করে বিশৃঙ্খল ঘটনার আবর্তে ঘুরপাক খাবে। কখনো কোনও বন্দরে গিয়ে পৌছাবে না। জীবনকে সামগ্রিকভাবে দেখার অভ্যাস হল, জ্ঞান এবং বিশুদ্ধ নৈতিকতা— এই দুয়েরই অপরিহার্য অঙ্গ এবং আর যা প্রাধান্য পাওয়া উচিত, তা হল শিক্ষা। সঙ্গতিপূর্ণ উদ্দেশ্য জীবনকে সুখী করার জন্যে যথেষ্ট নয়। তবুও জীবনের জন্যে তাই হল অপরিহার্য অঙ্গ। আর সঙ্গতিপূর্ণ উদ্দেশ্য প্রধানত কাজের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

১৫

নৈর্ব্যক্তিক আকর্ষণ

যেসব বড় রকমের আকর্ষণকে ঘিরে মানুষের জীবন গড়ে উঠেছে এই অধ্যায়ে আমি তা নিয়ে আলোচনা না করে, ছোট রকমের আকর্ষণ যা তার অবসরকে ভরে রাখে এবং যেসব গুরুত্বপূর্ণ কাজে সে পূর্ব থেকেই নিয়োজিত তার চাপ থেকে মুক্ত করে, তা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। সাধারণ লোকের জীবনে তার পত্নী, সন্তান, তার কাজ এবং আর্থিক অবস্থা এসব কিছু তার উদ্বেগ এবং গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার প্রধান অংশ দখল করে থাকে। এমনকী তার যদি বিবাহ-বহির্ভূত কোনও প্রেমের সম্পর্ক থাকে, তবু তার জন্যে মনে হয় ততটা গভীর দুশ্চিন্তা হয় না, যতটা হয় তার পারিবারিক জীবনে তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে। যে আকর্ষণ তাকে কাজের সাথে জড়িত করেছে, তাকে আমি আপাতত নৈর্ব্যক্তিক আকর্ষণ বলতে চাই না। যেমন একজন বিজ্ঞানসেবীকে তাঁর বিষয় সংক্রান্ত সব ধরনের গবেষণার সাথে সমতা রেখে চলতেই হয়। এই ধরনের গবেষণায় তাঁর ভালোভাবে যে উদ্দীপনা এবং প্রাণশক্তি দেখা যায় তা তাঁর বৃত্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত আন্তরিকতা। কিন্তু যদি তিনি তাঁর বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন বিজ্ঞানের অন্য কোনও শাখার গবেষণার কথা পড়েন, তাহলে তিনি তা পড়বেন ভিন্ন ধরনের আগ্রহ নিয়ে। বৃত্তিগত মন নিয়ে নয়, নিবিড়ভাবেও নয় এবং আরো আকর্ষণীয়ভাবে। সেখানে যা বলা হয়েছে তা যদি তিনি নির্দিষ্ট মনেও পড়েন তবু তা হত তাঁর কাছে একটি আরামের ব্যাপার। কারণ সেই গবেষণাপত্র তাঁর পেশাগত সাথে সম্পর্কিত নয়। যদি সেই বই তাঁর কাছে আকর্ষণীয় বোধ হয়, তবে তা নৈর্ব্যক্তিক, যা তাঁর নিজের বিষয়ের ওপর বই হলে বলা যেত না। মানুষের জীবনের মূল কাজের বাইরে যেসব আকর্ষণ আছে, এই অধ্যায়ে সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই।

অসন্তোষ, অবসাদ এবং স্নায়ুপীড়ার একটি কারণ হচ্ছে জীবনের পক্ষে বাস্তব গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন জিনিসে আকৃষ্ট হওয়ার অক্ষমতা। এর ফলে সচেতন মন কিছু বাজে ধরনের ব্যাপার থেকে বিশ্রাম পায় না এবং সে সবের প্রত্যেকটিতে সম্ভবত কিছু উদ্বেগ এবং কিছু দুশ্চিন্তার উপাদান যুক্ত আছে। একমাত্র ঘুমের সময় সচেতন মন নিষ্ক্রিয় কিন্তু অবচেতন মন পুরোপুরি সক্রিয় থাকে এবং জ্ঞানের পথে বিকশিত হয়। এর ফল হল উত্তেজনা বৃদ্ধি, বিচক্ষণতার অভাব, অসহিষ্ণুতা এবং আত্মজ্ঞানের অভাব দেখা দেয়। এই সবই হল অবসাদের কারণ এবং প্রক্রিয়া। মানুষ যখন অতিমাত্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন তার বাইরের আকর্ষণ কমে যায়,

যতই তা কমতে থাকে ততই বাইরের আকর্ষণ তাকে যে মুক্তির স্বাদ দিচ্ছে হারিয়ে যায় এবং সে আরও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই দুষ্টচক্রের শেষ পরিণতি একেবারে ভেঙ্গে পড়া। বাইরের আকর্ষণ বিশ্রাম দেয় এই জন্যে যে কোনও কাজের আহ্বান থাকে না। কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং পরিচালনার কাজ খুব ক্লান্তিকর, বিশেষ করে যখন তা খুব তাড়াতাড়ি এবং অবচেতন মনের সাহায্য ছাড়া করতে হয়। যারা মনে করে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে মনকে বিশ্রাম দিতে হবে, তারা সঠিকভাবেই করে। অবচেতন মনের ক্রিয়া শুধু ঘুমন্ত অবস্থাতেই চলে না, সচেতন মন কোথাও ব্যস্ত থাকলে তার ক্রিয়া সচল থাকে। যে মানুষ কাজ শেষ করে কথা ভুলে যেতে পারে এবং পরদিন কাজ শুরুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত ভুলে থাকে এবং যে লোক মধ্যবর্তী সময়েও কাজ নিয়ে দুশ্চিন্তা করে, তার চেয়ে লোক অনেক ভালভাবে কাজ করতে পারে। নিজের কাজ ছাড়া কোনও যদি অন্য বিষয়ে আগ্রহ থাকে তার পক্ষে যার কাজ ছাড়া অন্য কোনও আগ্রহ নেই, তার তুলনায় যখন কাজের কথা ভুলে থাকা প্রয়োজন হয়, ভুলে থাকা সহজতর হয়। তবে যে শক্তি সমস্ত দিনের কাজের শেষে অন্য বিষয়ে আকর্ষণ থাকার জন্যে তা যেন আবার প্রয়োজন না হয়। এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাও যেন তাতে না থাকে। আগা মতো অর্থ বিনিয়োগের কোনও ঝুঁকি যেন না থাকে। তা ছাড়া সে সব অবসাদগ্রস্ত হতে পারে এমন কোনও উত্তেজনা যেন না থাকে, যা আমার সচেতন বা অবচেতন মনকে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে।

এমন অনেক আমোদ রয়েছে যা এইসব শর্ত পূরণ করতে পারে। দেখা, থিয়েটার দেখা, গলফ খেলা এই বিষয়ে অনিন্দনীয়। যার বই আছে তার পক্ষে নিজের পেশা সম্পর্কিত বই বাদ দিয়ে অন্য বই তৃপ্তিদায়ক হতে পারে। দুশ্চিন্তার কারণ যত জরুরী হোক সমস্ত দিনের মধ্যে মুহূর্তে তা নিয়ে ভাবা উচিত নয়।

এই বিষয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। সাধারণ পুরুষেরা নারীদের তুলনায় সহজে কাজ ভুলে থাকতে পারে। মোটামুটি যেহেতু গৃহের মধ্যে তাই তাদের পক্ষে এটা স্বাভাবিক। কারণ তাদের স্থান পরিবর্তন হয় না, কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে তা নয়। অফিসের কাজ পুরুষেরা বাড়ি ফিরে মনকে নতুন করে তুলতে সাহায্য করে। যদি তাই করে থাকি, তাহলে বলা যায়, যেসব মহিলার কাজ বাড়ির বাইরে তারা পুরুষের চেয়ে প্রায় ততটুকু আলাদা, যতটুকু আলাদা যার বাড়ির

। কাদের কাছে যেসব জিনিসের ব্যবহারিক মূল্য নেই, তাতে উৎসাহিত
। । শক্তি তাদের পক্ষে। তাদের উদ্দেশ্যেই তাদের ভাবনা এবং কাজকে
। করে এবং সম্পর্ক দায়িত্বহীন কোনও বিষয়ে তারা কখনো আগ্রহী হয় না।
। থাকতে পারে সেকথা আমি অস্বীকার করি না, আমি শুধু সাধারণ
। কথা বলছি। মেয়েদের কলেজে যদি কোনও পুরুষ শিক্ষক না থাকে
। । শিক্ষকরা সন্ধ্যায় বাজার করার গল্প করে। কিন্তু ছেলেদের কলেজে
। শিক্ষকরা তা করে না। এই বৈশিষ্ট্য মেয়েদের কাছে পুরুষদের তুলনায়
। সচেতনতা বলে মনে হয়। কিন্তু আমার মনে হয় না শেষ পর্যন্ত এদের
। । মান কিছুমাত্রায় বাড়ে। বরং এতে দৃষ্টিভঙ্গী কিছুটা সংকীর্ণ হয়ে
। । থেকে জন্ম নেয় রক্ষণশীলতার।

। । নৈর্ব্যক্তিক আকর্ষণই মানসিক চাপ থেকে মুক্তির গুরুত্ব ছাড়াও
। । কাজে লাগে। প্রথমেই বলতে হয়, তারা মানুষকে পরিমিতিবোধ বজায়
। । করে। আমরা পেশাগত কাজে, নিজেদের সমাজের পরিমণ্ডলে
। । কাজের অনুরূপ কাজে ডুবে থাকি, যা এতই সহজ যে আমরা ভুলেই
। । মানবজাতির কাজের তুলনায় এই অংশটুকু কত ক্ষুদ্র। আমরা যা
। বিশ্বের কত শত জিনিস তার প্রভাবের বাইরে থাকে। কেন কোনও মানুষ
। । এর অনেকগুলি উত্তর আছে। প্রথমত প্রয়োজনীয় কাজের সাথে
। । রাখা যায় জগৎ সম্পর্কে ততটুকু আসল ধারণা অর্জন করা ভাল।
। । আমাদের অবস্থান বেশিদিনের জন্যে নয়। এই সময়ের মধ্যে এই অদ্ভুত
। । তার স্থান কোথায় তা নিয়ে যতটা সম্ভব জ্ঞানলাভ করতে হয়।
। । অসম্পূর্ণ, তাই তা লাভ করার সুযোগকে অবহেলা করা আর
। । নাটকের সংলাপ না শোনা একইরকম। এই বিশ্ব বহু বিয়োগান্ত
। । বীরোচিত অথবা উদ্ভট অথবা আশ্চর্যময় ঘটনায় পরিপূর্ণ। যে
। । দৃশ্যের প্রতি কোনও আকর্ষণ নেই সে জীবনের একটি বড়
। । বঞ্চিত।

। । পরিমিতিবোধ থাকাটা খুব মূল্যবান এবং তা অনেক সময়েই অত্যন্ত
। । । আমরা পৃথিবীর যে ক্ষুদ্র কোণায় বাস করি এবং জীবন ও মৃত্যুর
। । মুহূর্ত পাওয়া,তা নিয়ে অকারণ উত্তেজিত হওয়া, স্নায়ুকে পীড়িত
। । অযথা বাড়িয়ে দেখার দিকে আমাদের সকলেরই একটা প্রবণতা
। । এবং নিজেদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণার মধ্যে এমন কিছু নেই
। । । সত্যি যে এই ভাবনা আমাদের আরো কঠিন পরিশ্রম করাতে
। । । আমাদের কাজের দক্ষতা বাড়াতে পারে না। খারাপ উদ্দেশ্যে

অনেক বেশি কাজ, ভাল উদ্দেশ্যে অল্প কাজ অনেক ভাল। যদিও যারা জীবনে কঠিন পরিশ্রমে বিশ্বাসী তারা এর বিপরীতটাকেই সমর্থন করবেন। কাজ নিয়ে যারা অতিরিক্ত ব্যস্ত তাদের সবসময় অন্ধ গোঁড়ামিতে পড়ে যাওয়ার বিপদ থাকে, যার মূল কথা হচ্ছে সবকিছু ভুলে গিয়ে একটি বা দুটি মনের মতো বিষয় মনে রাখা আর এই একটি বা দুটি বিষয় অনুসরণ করতে পারলে আর যা থাকে তা থেকে যে ক্ষতি হতে পারে তাকে তুচ্ছ মনে করা। মানুষের বিরাট জীবন কল্পনা এবং এই পৃথিবীতে তার স্থান সম্পর্কে উদারতর ধারণা তৈরী করাই হচ্ছে এই ধরনের গোঁড়ামির বড় প্রতিষেধক। এই ব্যাপারে এমন বৃহৎ প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়ত কিছু মনে হতে পারে। কিন্তু এই ছোট ব্যাপার না ধরলেও সেই বৃহৎ প্রসঙ্গটির নিজেরই একটি বড় মূল্য রয়েছে।

বর্তমান উচ্চশিক্ষার একটি গলদ এই যে, এতে কোনও একটি নির্ধারিত বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্যে অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা আছে কিন্তু হৃদয় মন যাতে উদার হয়, তার জন্যে নিরপেক্ষ সমীক্ষায় পৃথিবীকে দেখার কোনও ব্যবস্থা নেই। ধরুন আপনি কোনও রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত আছেন এবং নিজেদের দলের জয়লাভের জন্যে কঠিন পরিশ্রম করছেন, এই পর্যন্ত সবই ভাল, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলাকালীন এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে, যাতে সবার মনে ঘৃণা হিংসা এবং সন্দেহ বেড়ে যায়, এমন পথে গেলে জয়লাভের পথ কিছুটা সুগম হয়। যেমন, আপনি বুঝতে পারবেন জয়লাভের পথ অনেক সহজ হবে যদি কোনও বিদেশী জাতিকে অপমান করা যায়। আপনার মানসিক প্রসারতা যদি বর্তমানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে অথবা যদি আপনি এই মতে দীক্ষা নিয়ে থাকেন যে যাকে কর্মদক্ষতা বলা হয় তা ছাড়া আর সব কিছু প্রয়োজনহীন, তা হলে আপনি এই ধরনের সন্দেহজনক পথ অবলম্বন করতে পারেন। এইভাবে আপনি আপনার তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্যে জয়লাভ করবেন, কিন্তু তার সুদূরপ্রসারী ফল হবে মারাত্মক। যদি অন্যদিকে মানুষের অতীত যুগ, তার বর্বর অবস্থা থেকে ধীর গতিতে আংশিক উন্মেষ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবে অকল্পনীয় কালের তুলনায় মানুষের সমগ্র অস্তিত্বের অতি-সংক্ষিপ্ততা— এইসব ধারণা আপনার মনের অঙ্গ হয়, আমি বলি, যদি এই চিন্তাধারা আপনার সাধারণ অনুভূতিকে ছাঁচে ঢালা করে, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে, যে ক্ষণস্থায়ী যুদ্ধে আপনি রত আছেন তা এমন জরুরী নয়, যাতে আমরা যে অন্ধকার থেকে এত দীর্ঘ সময় ধরে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসেছি, তাহলে সেই ফেলে আসা পথে আবার এক ধাপ ফিরে যাওয়ার ঝুঁকিকে স্বীকার করে নেওয়া। শুধু তাই নয়, যদি আপনি তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্যে পরাজিতও হন তাহলে তার ক্ষণস্থায়িত্ব নিয়ে সেই একই বোধ আপনার

কোন অস্ত্রধারণ করতে দেবে না। তাৎক্ষণিক সব কার্যকলাপকে অতিক্রম করে আপনার মনে উদিত হবে সেই লক্ষ্য যা অনেক দূরে এবং খুব ধীরে প্রস্ফুটিত হবে, যেখানে পৌছানোর চেষ্টায় আপনি সবার থেকে বিচ্ছিন্ন একজন মানুষ নন এবং মানজাতিকে যে বিশাল বাহিনী সভ্যতার অস্তিত্বময় জীবনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, আপনি সেই বাহিনীরই একজন। আপনি যদি এই দৃষ্টিভঙ্গী পেয়ে থাকেন, আপনার ব্যক্তিগত ভাগ্য যাই হোক এক গভীর সুখ কখনো আপনাকে ছেড়ে যাবে না। সর্ব যুগের মহামানবদের সাথে আপনার আত্মিক বন্ধন তৈরী হবে এবং কোনও ব্যক্তির মৃত্যুকে মনে হবে একটি তুচ্ছ ঘটনা।

আমার ইচ্ছানুযায়ী যদি উচ্চশিক্ষা সংগঠনের ক্ষমতা থাকত আমি তাহলে প্রাচীন রক্ষণশীল ধর্মসমূহের, তরুণদের মনে যার আবেদন খুব কম এবং যেসব তাদের অনুযায়ী সবচেয়ে কম বুদ্ধিদীপ্ত এবং দুর্বোধ্য ও সংস্কার বিরোধী, বদলে এমন কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসতাম যাকে ঠিক ধর্ম বলা যায় না— কারণ তা হত শুধু কিছু নির্ধারিত সত্যের প্রতি মনোসংযোগ করা। আমি চেষ্টা করতাম তরুণরা যাতে অতীতকে প্রাণবন্তরূপে জানতে পারে এবং স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে যে মানুষের ভবিষ্যৎ তার অতীত থেকে অনেক অনেক দীর্ঘ, যা পরিমাপের যোগ্য নয়। যাতে তারা গভীরভাবে বুঝতে পারে, যে গ্রহে আমরা জীবন কাটাচ্ছি তা অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং এই গ্রহে যে জীবনের আবির্ভাব হয়েছে তা একটি সাময়িক ঘটনা ছাড়া অন্য কিছু নয়। একই সাথে আমি ঐ ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রতাবোধের পাশাপাশি আরেক গুচ্ছ তথ্য তুলে ধরতাম, তরুণদের মনকে প্রভাবিত করতে যে মানুষ কত মহৎ হতে পারে, তার জ্ঞান কত অসীম হতে পারে। সমগ্র মহাবিশ্বে এমন কিছু নেই যা তার সমান মূল্য বহন করে। স্পিনোজা[১] বহুকাল আগে মানুষের বন্ধন এবং মানুষের মুক্তির কথা বলে গেছেন। তাঁর লেখার ধরণ এবং ভাষা এত কঠিন দর্শনশাস্ত্রের ছাত্র ছাড়া অন্যদের পক্ষে সহজবোধ্য নয়। কিন্তু আমি যা বলতে চাই তার সারমর্ম, তিনি যা বলে গেছেন তার সাথে প্রায় অভিন্ন।

---

১. স্পিনোজা, Benedict de Spinoza (১৬৩২-১৬৭৭)। জাতিতে ইহুদী, তাঁর বাবা-মা ইনকুইজিসনের ভয়ে পর্তুগাল থেকে অভিবাসন নিয়ে নেদারল্যান্ডে বসতি স্থাপন করেন। তিনি সর্বেশ্বরবাদী মুক্ত দার্শনিক, ধর্মীয় চিন্তাবিদ। তিনি সর্বেশ্বরবাদী অদ্বৈতবাদে (pantheistic monist) বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ঈশ্বর এবং পৃথিবীর মধ্যে কোনও বিবাদ থাকতে পারে না। পাশ্চাত্য দর্শনে তিনি অতীন্দ্রিয়বাদের নতুন তত্ত্বের প্রবর্তন করেন। 'Ethic' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।

মানুষ একবার যদি বুঝতে পারে যত অস্থায়ী বা সংক্ষিপ্ত ভাবেই হোক, [illegible] আত্মা মহান হয়, তা হলে সে আর নিজেকে ক্ষুদ্র এবং স্বার্থপর হতে দেবে [illegible] তুচ্ছ দুর্ভাগ্যে বিচলিত বা ভবিষ্যতের ভাবনায় ভীত হতে দেবে না, যদি তাহলে কখনো সে আর সুখী হতে পারবে না। যে মানুষ আত্মার মহত্বে সক্ষম [illegible] মনের বাতায়ন সম্পূর্ণ খুলে দেবে, যাতে সেই পথ বেয়ে বিশ্বের সর্ব অংশ [illegible] মুক্ত সমীর প্রবাহিত হতে পারে। সে তখন নিজেকে এবং জীবনকে এবং [illegible] মানুষের সীমার মধ্যে যতটুকু সম্ভব সত্যরূপে দেখতে পাবে। মানুষের [illegible] ক্ষণস্থায়ী এবং অণু প্রমাণ, এ কথা বুঝতে পেরে সে অনুভব করতে পারবে [illegible] পরিচিত এই বিশ্ব, মূল্যবান যা কিছুই ধারণ করুক তা প্রতিটি মানুষের [illegible] কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে। এবং সে দেখবে যে মানুষের মনের দর্পণে বিশ্ব প্রতিবিম্বিত [illegible] সে এক অর্থে বিশ্বের মতোই বৃহৎ। যে মানুষ অবস্থার দাস তার মনকে যেসব [illegible] তাড়িত করে তা থেকে বেরিয়ে এসে সে এক গভীর আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করবে এবং তার বাইরের জীবনের সকল ভাগ্য পরিবর্তনের মধ্যেও সুখী মানুষ বলে আনন্দের গভীরে ডুবে থাকবে।

এইসব বড় বড় দূর কল্পনা ছেড়ে আমরা যে অব্যবহিত প্রসঙ্গে কথা উত্থাপন করেছিলাম, সেখানে ফিরে যেতে পারি যেমন নৈর্ব্যক্তিক আকর্ষণের কথায়। অন্য একটা দিক থেকে এইসব আকর্ষণ সুখের পথে সাহায্য করতে পারে। খুব সৌভাগ্যের জীবনেও অনেক সময় দুর্ভোগ নেমে আসতে পারে। খুব কম মানুষ আছে, অবিবাহিতরা ছাড়া যে নিজের স্ত্রীর সাথে কখনো ঝগড়া করেনি, খুব কম বাবা-মা আছে যারা নিজেদের সন্তানের অসুস্থতায় উদ্বিগ্ন হয়নি, খুব কম ব্যবসায়ী আছে যারা আর্থিক সংকট এড়াবার চেষ্টা করেনি, খুব কম পেশাদার ব্যক্তি আছে যারা কখনো ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়নি। এইরকম সময়ে উদ্বেগের বাইরে অন্য কিছুতে উৎসাহী হওয়া বিরাট মঙ্গল। এই সময়ে উদ্বেগ সত্ত্বেও যখন করার মতো কিছু থাকে না, তখন কেউ দাবা খেলে, কেউ গোয়েন্দা কাহিনী পড়ে, কেউ জনপ্রিয় জ্যোতির্বিদ্যায় ডুবে থাকে। অন্য একজন হয়তো ক্যালডি'র উর নামক স্থানের পুরাতাত্ত্বিক খনন বিষয়ে বই পড়ে সান্ত্বনা পায়। এই চারজনের প্রত্যেকেই বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছে। বরং যে লোকটি মনকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে কিছুই করেনি এবং তার কষ্টকে তার ওপর প্রভুত্ব করার সুযোগ করে দিয়েছে সে বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেনি। এবং প্রয়োজনে নিজেকে যখন সময় আসবে বিপদের মুখোমুখি হওয়ার পক্ষে অনুপযুক্ত করে তুলেছে। অত্যন্ত প্রিয়জনের মৃত্যুতে সান্ত্বনার বাইরে যে বেদনা তার সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। এ ধরনের পরিস্থিতিতে যে নিজেকে দুঃখের হাতে তুলে দেয় তার ভাল কিছু হয় না। সে

অনিবার্য এবং তা আসবেই, তার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত রাখা উচিত, তা কমানোর যে রকম পথ আছে অবলম্বন করা উচিত, কোনও কোনও লোক যেমন করে, বলা যায়, দুর্ভাগ্য থেকে দুর্দশার শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত নিংড়ে বের করে নিতে চায় তাকে শুধুমাত্র ভাবপ্রবলতা ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। আমি একথা অস্বীকার করি না যে কোনও মানুষ দুঃখে ভেঙ্গে পড়তে পারে, কিন্তু তবুও আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে এই ভাগ্য থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে প্রত্যেকটি মানুষের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত এবং যে কোনও উপায়ে হোক, সে উপায় যত তুচ্ছ হোক, যদি তা নিজেই ক্ষতিকর অথবা মর্যাদাহানিকর না হয়। যে সব উপায় আমি ক্ষতিকর এবং মর্যাদাহানিকর মনে করি, তার মধ্যে আমি মাতলামি এবং মাদকাসক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করি। এদের উদ্দেশ্যই হল চিন্তার শক্তিকে নষ্ট করে দেওয়া। অন্তত সাময়িকভাবে হলেও, চিন্তাশক্তিকে নষ্ট করে দেওয়া এর প্রতিকার নয়, প্রতিকার হল নতুন নতুন খাতে প্রবাহিত করা অন্তত যে কোনও মূল্যে বর্তমান দুর্ভাগ্যের খাত থেকে দূরের কোনও খাতে প্রবাহিত করা। কিন্তু জীবন যদি সামান্য কটা জিনিসে সব আকর্ষণকে কেন্দ্রীভূত থাকে এবং সেই সামান্য কটাও যদি দুঃখে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে তা থেকে বেরিয়ে আসা খুব শক্ত। দুর্ভাগ্য এলে তাকে বহন করতেই হয় তাহলে সুখের সময়ে আগেই আকর্ষণের বিষয়বৈচিত্র্য এবং সংখ্যার প্রসারণ করে নেওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। তাহলে যে মনের ভাব একজনকে বহন করতে পারছে না, তার চেয়ে ভিন্ন মনোভাব এবং আলাদা আকর্ষণ যেখানে আছে সেই শান্তিপূর্ণ স্থানে যাওয়ার জন্যে মন প্রস্তুত থাকবে।

যার প্রাণপ্রাচুর্য এবং উদ্দীপনা যে মানুষের আছে, সে প্রতি আঘাতের পর নতুন আকর্ষণের দ্বারা সব দুর্ভাগ্যকে লঙ্ঘন করে যাবে। তার কাছে পৃথিবী এত ছোট হয়ে যাবে না যাতে একটি মাত্র ক্ষতি ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে। এক বা একাধিক ক্ষতির কাছে হার মানা এমন ঘটনা নয় যা কোমলতার প্রমাণরূপে চিহ্নিত হতে পারে। বরং একে প্রাণপ্রাচুর্যের ব্যর্থতা বলেই ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত। যাদের স্নেহ-মমতা-প্রেম মৃত্যুর দয়ার ওপর নির্ভরশীল আমাদের প্রিয়জনদের যে কোনও সময় চরম আঘাত হানতে পারে। তাই আমাদের জীবনে সেই একাগ্রতা থাকা উচিত নয়, যা আমাদের জীবনের সকল অর্থ এবং উদ্দেশ্যকে একজনের অধীন করে রাখতে পারে।

এইসব কারণে যে মানুষ বুদ্ধিমত্তার সাথে সুখের অন্বেষণ করছে তার পক্ষে যে মূল আকর্ষণের ওপর তার জীবন গড়ে উঠেছে, তার বাইরেও আরো কিছু আকর্ষণ থাকা প্রয়োজন।

GRONTHO.COM

১৬

প্রচেষ্টা ও সমর্পণ

সুবর্ণ মধ্যম মতবাদ হিসাবে চিত্তাকর্ষক নয়, আমি মনে করতে পারি আমি তরুণ ছিলাম ঘৃণা এবং অবজ্ঞার সাথে এই মত বর্জন করেছিলাম। সেসব দিনে বীরোচিত চরম কিছুই ছিল আমার কাছে বরণযোগ্য। যা হোক সবসময় উৎসাহব্যঞ্জক হয় না এবং যে সব জিনিসকে বিশ্বাস করি উৎসাহব্যঞ্জক বলে, বাস্তবে তাদের অনুকূলে তেমন কিছু প্রমাণ মেলে না। মধ্যম যে অনুৎসাহব্যঞ্জক মতবাদ এটা হয়তো একটি উদাহরণ, কিন্তু অনেক ব্যাপারে এটা সত্য নীতি।

একদিকে প্রচেষ্টা, অন্যদিকে সমর্পণ— এই দুইয়ের ভারসাম্য রাখতে মধ্যমকে প্রয়োজনীয় বলে গ্রহণ করতে হবে। এই দুটি নীতিরই চরম সমর্থক রয়েছেন। সমর্পণ বা ভাগ্যকে বরণ করার নীতি প্রচার করেছেন সাধুসন্ত অতীন্দ্রিয়বাদীরা। আর প্রচেষ্টা বা উদ্যমশীলতার নীতি প্রচার করেছেন দার্শনিক এবং পৌরুষদীপ্ত খ্রিস্টানেরা। এই দুই বিপরীত মতের প্রবক্তাদের নীতিতে সত্য আছে, পুরো সত্য নেই। আমি এই অধ্যায়ে একটা ভারসাম্য আনয়নের চেষ্টা করব এবং প্রচেষ্টার পক্ষকে সমর্থন করে শুরুটা করব।

সুখ, কয়েকটি দুর্লভ ক্ষেত্র ছাড়া, এমন জিনিস নয় যা শুধুমাত্র শুভ যোগাযোগ ছাড়া পাকা ফলের মতো মুখে এসে পড়বে। আর এই কারণেই এই বইয়ের নাম রেখেছি 'সুখের সন্ধানে'। কারণ পরিহারযোগ্য এবং অপরিহার্য দুর্ভাগ্যে, রোগ এবং মানসিক জটিলতায়, সংগ্রাম এবং দারিদ্র্যে এবং বিদ্বেষে এই পৃথিবীতে যে পুরুষ ও নারী সুখী হতে চায়, তাকে প্রত্যেক মানুষ যে রকম পথে সুখ খুঁজে বেড়ায় তার জন্যে সংগ্রাম করে যেতে হবে। খুব কম এর জন্যে বড় রকমের উদ্যোগ প্রয়োজন হতে পারে। সহজ স্বভাবের যে উত্তরাধিকার সূত্রে অনেক ধন-সম্পদ অর্জন করেছে, যার স্বাস্থ্য ভাল, যার সে জীবনকে খুব আরামের সাথে উপভোগ করতে পারে এবং যারা জীবনসংগ্রামের গোলমা দেখে অবাক হয়ে তার কারণ খুঁজে বেড়ায়। আরামপ্রিয় রমণী যদি এমন কোন ধনবান পতিকে বরণ করে, যে কোনও আয়াসসাধ্য কাজ চাইবে না এবং বিয়ের পর যদি চর্বি বৃদ্ধিতে আপত্তি না করে, তাহলে সেও এক ধরনের অলস আরাম উপভোগ করবে অবশ্য তার সন্তানের বিষয়ে সৌভাগ্য থাকে। অধিকাংশ লোক ধনী বা ভাল স্বভাব নিয়ে জন্মায় না, অনেকের অস্বস্তিজনক সব প্রবৃত্তি থাকে,

[illegible] এবং সুনিয়ন্ত্রিত জীবন অসহনীয় রকমের একঘেয়ে মনে হয়। স্বাস্থ্য হচ্ছে [illegible] কিন্তু তা রক্ষা করা যাবেই এ বিষয়ে কেউ নিশ্চিত হতে পারে না। বিয়ে [illegible] ভাবে পরম সুখের উৎস নয়। এইসব কারণে অধিকাংশ নারী-পুরুষের [illegible] সুখ অবশ্যই একটি সফল অর্জন। দেবতার দান নয় এবং এই অর্জনে [illegible] এবং বহির্মুখী উভয়েরই প্রচেষ্টা একটা বড় ভূমিকা রেখেছে। অন্তর্মুখী [illegible] মধ্যে সমর্পণের প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, তাই আপাতত [illegible] বহির্মুখী প্রচেষ্টার কথা বিবেচনা করেছি।

[illegible] কোনও মানুষের ক্ষেত্রে, পুরুষ অথবা নারী, যাদের জীবিকার জন্যে কাজ [illegible] হয় তাদের এ সম্পর্কে প্রচেষ্টার প্রয়োজন এমনই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে [illegible] জোর দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এটা সত্য যে ভারতীয় ভিক্ষুকরা বিনা [illegible] ধর্মভীরু মানুষের সামনে শুধু ভিক্ষাপাত্রটি এগিয়ে দিয়েই জীবিকার [illegible] করতে পারে, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশসমূহে শাসক-কর্তৃপক্ষ এ ধরনের [illegible] কে ভাল দৃষ্টিতে দেখে না। তা ছাড়া এই কাজটিকে উষ্ণ এবং শুষ্ক [illegible] দেশে যেমন আরাম দেয়, সেসব দেশে তা নয়। শীতকালে, যে [illegible] ভাবে খুব কম লোক পাওয়া যাবে যারা গরম ঘরের কাজ ফেলে বাইরে [illegible] ঘুরে বেড়াবে। সুতরাং পশ্চিমী দেশে শুধু সমর্পণ সৌভাগ্যের অনেক [illegible] মধ্যে একটি নয়।

[illegible] পাশ্চাত্যের দেশসমূহে অনেক মানুষের সুখের জন্যে যা প্রয়োজন তার চেয়ে [illegible] অতিরিক্ত অর্থের চাহিদা থাকে। কারণ তা তাদের কাছে সাফল্যের অনুভূতি [illegible] করে। কোনও কোনও পেশায় যেমন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এই অনুভূতি [illegible] উপার্জনশীল নয় এমন লোকের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু অধিকাংশ [illegible] উপার্জনের পরিমাণকে সাফল্যের মানদণ্ডরূপে ধরা হয়। এইখানে আমরা [illegible] একটি প্রসঙ্গকে স্পর্শ করেছি যার সম্পর্কে প্রায় ক্ষেত্রেই কিছু সমর্পণের [illegible] বাঞ্ছনীয়। কারণ এই প্রতিযোগিতামূলক পৃথিবীতে বড় ধরনের সাফল্য [illegible] সংখ্যক লোকের পক্ষেই মাত্র সম্ভব।

[illegible] এমন একটা বিষয় যার সম্পর্কে প্রচেষ্টার প্রয়োজন হতেও পারে অথবা [illegible] পারে। যেখানে একটি লিঙ্গ যদি সংখ্যালঘু হয়, যেমন ইংল্যান্ডে পুরুষ [illegible] অস্ট্রেলিয়ায় নারী, তা হলে সেই সংখ্যালঘুদের ইচ্ছানুযায়ী বিবাহের ব্যাপারে [illegible] ভাবেই কম প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। আর যে লিঙ্গের সদস্যরা সংখ্যাগুরু [illegible] বেলায় বিপরীতটাই সত্যি। মেয়েরা সংখ্যাগুরু হলে তারা যে পরিমাণ [illegible] চিন্তা এই বিষয়ে ব্যয় করে, তা নারী বিষয়ক সাময়িকীতে যেসব [illegible] প্রকাশিত হয় তা চর্চা করলেই সহজে বোঝা যাবে। যেখানে পুরুষরা

সংখ্যাগুরু সেখানে তারা প্রায়ই খুব তাড়াতাড়ি কাজ হয় এমন পথ খুঁজে নেয়, যেমন রিভলবার চালনায় দক্ষতা। এটা খুব স্বাভাবিক, কারণ সংখ্যাগুরু মানুষ এখন সভ্যতার প্রান্তসীমায় রয়ে গেছে। যদি কোনও মহামারী পক্ষপাতিত্ব ইংল্যান্ডের পুরুষদের সংখ্যাগুরুতে পরিণত করে, তাহলে তারা কী করবে? না, হয়তো তারা প্রাচীন প্রেমিক বীরদের পথ অবলম্বন করবে।

সন্তানদের যথার্থভাবে মানুষ করে তুলতে যে পরিমাণ প্রচেষ্টার প্রয়োজন তা এমনই সুস্পষ্ট যে কেউ তা অস্বীকার করবে না। যেসব দেশ সমর্পণে নিম্ন এবং যাকে ভুল করে জীবনের প্রতি আধ্যাত্মিক দর্শন বলা হয়ে থাকে, যেসব শিশু মৃত্যুর হার খুব বেশি, ওষুধ, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, নির্বীজকরণ, উপযুক্ত পথ্য এসব জিনিস পার্থিব বিষয়ে মনোযোগ না দিলে পাওয়া যায় না। এসব লাভ করতে যে প্রয়োজন বস্তুগত পরিবেশের দিকে শক্তি ও বুদ্ধিচালনা। যারা মনে করে বস্তুগত মায়া, তারা আবর্জনাকেও তাই মনে করে এবং এভাবে চিন্তা করতে গিয়ে শিশু মৃত্যুর কারণ ঘটায়।

আরো সাধারণভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যাদের স্বাভাবিক বাসনা ক্ষুধা অভাবে শুকিয়ে যায়নি, তাদের প্রত্যেকের স্বাভাবিক এবং ন্যায্য উদ্দেশ্যের পিছনে রয়েছে কোনও শক্তি। মানুষ কোন্ শক্তিটি কামনা করবে তা নির্ভর করে তার সবচেয়ে প্রাধান্যকারী আসক্তির ওপর। কোনও মানুষ শক্তি কামনা করে অন্য মানুষের কাজের ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্যে। আরেকজন কামনা করে অন্যের চিন্তার ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্যে, তৃতীয়জনের কামনা অন্যের আবেগের ওপর। একজন চাইছে বস্তুগত পরিবেশকে পরিবর্তন করতে, অন্যজনের কাম্য বুদ্ধিবৃত্তিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ। জনকল্যাণকর প্রতিটি কাজের সাথে কোনও একটি মুক্তির কামনা বিজড়িত, যদি না এই উদ্দেশ্য সামলে রেখে দুর্নীতির সাহায্যে অর্থলাভ করা একমাত্র লক্ষ্য না হয়, তা হলে এই কথা সত্যি যে কোনও মানুষের দুর্দশার অকৃত্রিম মানবতাবোধ জাত বেদনা থেকে কর্ম প্রেরণা লাভ করছে, তার দুঃখবোধ যদি বিশুদ্ধ হয়, তা হলে সে মানুষের দুর্দশা লাঘবের জন্যে ক্ষমতা কামনা করবে। একমাত্র যে মানুষ ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন সে সহমানুষ সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ উদাসীন। সুতরাং যেসব মানুষের সহযোগিতায় সমাজ গঠন করতে হবে, তাদের কর্মপদ্ধতির ভিতর কোনও কোনও ক্ষমতার জন্যে কামনা থাকবেই এবং এটাকে স্বীকার করে নিতে হবে। সব কামনার প্রত্যেকটি ধরণ যেখানে জড়িত, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা ব্যর্থ হয়, পারস্পরিক সমন্বয়ের একটি প্রচেষ্টা। পাশ্চাত্য দেশের মানসিকতার উপসংহার খুব সাধারণ মনে হতে পারে, কিন্তু পাশ্চাত্যে এমন লোকের

...ই যারা ভান করছে, যাকে বলা হয় 'প্রাচ্যবিজ্ঞতা' তা পাওয়ার জন্যে যে মুহূর্তে ...চ্যই তা পরিত্যাগ করেছে। সম্ভবত তাদের কাছে আমরা যা বলছি তা ...দেহমুক্ত নয় এবং তাই যদি হয় তা হলে আমাদের বলাটা যথার্থ।

সুখের অধিকার অর্জনে সমর্পণেরও একটা ভূমিকা আছে। প্রচেষ্টার ভূমিকার ...য়ো তার গুরুত্ব কম নয়। বুদ্ধিমান লোক পরিহারক দুর্ভাগ্যের সামনে বসে না ...াকলেও অবধারিত দুর্ভাগ্য এড়াতে সময় এবং আবেগ নষ্ট করবে না এবং যেসব দুর্ভাগ্য নিজে থেকেই পরিহারযোগ্য, তা পরিহার করতে যদি আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে নির্দ্ধারিত সময় নষ্ট হয়, তা হলে তা পরিহার না করে বরং তা সহ্য করে যাবে। এমন অনেক লোক আছে যারা পছন্দ না হলে প্রত্যেকটি তুচ্ছ জিনিস নিয়ে ঝামেলা করে এবং যে শক্তি প্রয়োজনীয় কাজে লাগানো যেত তা এইভাবে নষ্ট করে। এমনকী কাজ অত্যন্ত ব্যর্থতার চিন্তা সবসময় মনের শান্তিকে বিনষ্ট করতে থাকে। খ্রিস্টান ধর্ম ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের কাছে নিজেকে অর্পণ করার কথা বলেছে। এমনকী যারা এই বাগ-বৈশিষ্ট্য মেনে নিতে পারে না তাদের জন্যেও ...দের সবরকম কাজকে ব্যাপ্ত করে ঐরকম কিছু থাকা উচিত। কোনও ব্যবহারিক কাজে যে কর্মদক্ষতা প্রয়োজন তার অনুপাত, যে পরিমাণ আবেগ তাতে দেওয়া ...য় তার সমান নয়। প্রকৃতপক্ষে আবেগ অনেক সময় কর্ম দক্ষতার প্রতিবন্ধক। ...ে মনোভাব দরকার তা হল নিজের সাধ্যমত চেষ্টা করব কিন্তু ফল ছেড়ে দেব ...গ্যের হাতে। সমর্পণ বা ভাগ্য বরণ দুরকমের— একটির মূলে হতাশা, অন্যটির ...লে অদম্য আশা। প্রথমটি খারাপ, দ্বিতীয়টি ভাল ; চরমভাবে পরাজিত হয়ে যে ...ক বড় কিছু লাভ করার আশা পরিত্যাগ করেছে সে হতাশাজনিত সমর্পণ ...খাতে পারে এবং যদি সে তা করে তাহলে সে সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছেড়ে দেবে। ...তার হতাশাকে ধর্মীয় নীতিকথায় ঢেকে রাখতে পারে অথবা তার হতাশাকে, ...ভাবনাই মানুষের যথার্থ লক্ষ্য—এই নীতির ছদ্মবেশে আড়াল করতে পারে। কিন্তু সে তার অন্তর্স্থিত পরাজয়কে যেভাবেই আড়াল করুক সে সাধারণভাবে অনুপযুক্ত এবং নীতিগতভাবে অসুখী হয়ে থাকবে। যে মানুষের সমর্পণ অদম্য আশার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে তার কর্মধারা আলাদা। যে আশা অপরাজেয় তাকে ...ক্ত এবং নৈর্ব্যক্তিক হতে হবে। আমার ব্যক্তিগত কার্যসূচি যাই হোক, আমি ...র হাতে পরাজিত হতে পারি অথবা কোনও রোগের কাছে। আমার শত্রুরা ...আমাকে পরাস্ত করতে পারে। কাজ করতে গিয়ে হয়তো দেখা গেল এমন একটা ...মানতার পথে আমি এগিয়েছি যাতে সফল হতে পারব না। এইভাবে হাজার ...ম উপায়ে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত আশার ব্যর্থতা অবধারিত হতে পারে কিন্তু যদি ...গত আশা, মানবজাতির কোনও বড় আশার অংশ হয়, তা হলে ব্যর্থ হলেও

তাতে সম্পূর্ণ পরাজয়ের ভাব থাকবে না। যে বৈজ্ঞানিক নিজে কোনও ... আবিষ্কারের কামনা করেন এবং বিষয়টির ওপর তাঁর ব্যক্তিগত অবদান বড় ... হয়, তা হলে নির্ভেজাল অহংভাবপূর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে যিনি গবেষণা করেন, ... নৈরাশ্যের তুলনায়, সম্পূর্ণ অন্যরকম হবে। বহু প্রয়োজনীয় কোনও সংস্ ... সাধনের কাজ শেষ হল না এবং তিনি হয়তো এই কথাটি মেনে নিতে বাধ্য হবে ... যে, তাঁর জীবদ্দশায় আর একাজ তিনি করতে পারবেন না। কিন্তু যদি তাঁর নি ... অংশগ্রহণ ছাড়াও মানবজাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর আগ্রহ থাকে তাহলে ... অসম্পূর্ণতার জন্যে পুরোপুরি নৈরাশ্যে ডুবে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

যেসব বিষয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করছি তাতে সমর্পণ অত্যন্ত কঠিন অন্য অনেক বিষয় আছে যাতে তা সহজ। এই বিষয়গুলি হচ্ছে যেখানে শুধু গৌণ উদ্দেশ্যগুলি বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু জীবনের প্রধান লক্ষ্যসমূহের সাফল্যের সম্ভাবনা বজায় থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনও লোক গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েও দাম্পত্য জীবনে অসুখী হওয়ার জন্যে মন বিক্ষিপ্ত থাকে, ... হলে তার পক্ষে বাঞ্ছিত সমর্পণ মেনে নিতে ব্যর্থতা দেখা দেবে। যদি তাঁর কা ... সত্যি মন ভরে রাখার মতো হয়, তাহলে তাঁর উচিত এই ধরনের সব আপা ... বাধাকে বৃষ্টির দিনের মতোই বিরক্তিকর মনে করা, কারণ এইরকম বিরক্তিক ... বিষয় নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হওয়া বোকামি।

কোনও কোনও লোক ধৈর্যের সাথে সেইসব অসুবিধা সহ্য করতে পারে না যা বাধা না পেলে আমাদের জীবনের একটা বড় অংশকে দখল করে রাখে এরকম লোক গাড়ি ধরতে না পারলে ক্ষেপে যায় নৈশাহারের রান্না খারাপ হলে প্রচণ্ড রেগে যায়, চিমনি থেকে ধোঁয়া বের হলে হতাশায় ডুবে যায়, পোশাক পরিচ্ছদ সময়মত স্টীমলন্ড্রি থেকে ফিরে না আসলে সমস্ত শিল্প জগতের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার শপথ করে বসে। এইসব তুচ্ছ ব্যাপারে যে শক্তি নষ্ট হয়, ... যদি বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজে লাগাতে পারলে একটা সাম্রাজ্য গড়া এবং ভাঙার জন্যে যথেষ্ট। গৃহ পরিচারিকা যে ধুলা পরিষ্কার করেনি, রন্ধনকারী যে আলু সিদ্ধ করেনি, ঝাড়ুদার যে ঠিকমত ঝুল ঝাড়েনি বুদ্ধিমান লোক তা দেখেও দেখেন না। আমি বলতে চাই না যে তিনি এর প্রতিবিধান করেন না, সময় পেলে অবশ্যই করেন। আমি বলতে চাই যে, তিনি এসব আবেগ বর্জন করে করেন। উদ্বেগ বিরক্তি ও উত্তেজনা এসব হল আবেগ যা কোনও উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করে না। এসব যিনি প্রবলভাবে অনুভব করেন, তিনি হয়তো বলবেন, এসব আবেগ দমন করা ... তিনি অপারগ এবং আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে, পূর্বে উল্লেখিত মৌলিক সমর্পণের চেয়ে অন্যকোনও কম প্রয়োজনীয় কিছুতে তাকে দমন করা যে ...

...। বড় নৈর্ব্যক্তিক আশা যা মানুষকে তার কাজে ব্যক্তিগত ব্যর্থতা অথবা ...ত জীবনের দুঃখকে সহ্য করতে সক্ষম করে, তার সম্বন্ধে সেই একই প্রকার ...যোগ তাকে গাড়ি ধরতে না পারার বা কাদায় ছাতা পড়ে যাওয়ার দুঃখেও ...ধারণ করার শিক্ষা দেবে। তিনি যদি বদমেজাজি হন, তা হলে এর চেয়ে কম ...তে তার রোগ সারবে কিনা বলা কঠিন।

যে মানুষ সারাক্ষণ উত্তেজিত থাকেন, তাকে যদি উদ্বেগের সাম্রাজ্য থেকে ...র করা যায়, তাহলে তিনি জীবনকে অনেক বেশি আনন্দময় বলে নতুন করে ...া পাবেন। পরিচিত বক্তিদের নিজস্ব যেসব আচরণ-বৈশিষ্ট্য এতকাল তাকে ...ক করে তুলত, এখন তার কাছে তা কৌতুকপ্রদ মনে হয়। যখন মিস্টার এ, ...া টিয়েরা ডেল ফিউয়েগোর বিশপের পুরানো সত্য কাহিনীটি তিনশ সাতান্ন ...র বিবৃত করা শেষ করবেন, তখন আর রেগে না গিয়ে শুধু কবার বলা হল তার ...খা শুনে মজা পাবেন এবং পূর্বের মতো নিজের জানা কোনও কাহিনী বলার ...া করে বিষয় পরিবর্তনের বৃথা চেষ্টা করবেন না। যখন ভোরের গাড়ি ধরার ...ার সময় তার জুতোর ফিতে ছিঁড়ে যায়, তখন তা ঠিক করে নিয়ে তিনি ...বেন এই বিপুলা পৃথিবীর ইতিহাসে এই ঘটনার বিশেষ কোনও গুরুত্ব নেই। ...খন তিনি বিয়ের প্রস্তাবকালীন বিরক্তিকর কোন প্রতিবেশির আগমনে বাধাপ্রাপ্ত ..., তখন তিনি ভাবেন মানুষমাত্রই এই ধরনের বিপত্তির সীমা নেই, যা আসে ...ত এবং বিচিত্র সাদৃশ্য এবং সমান্তরাল ঘটনা থেকে। আমার ধারণা প্রত্যেক ...নারীর মনে নিজের সম্পর্কে একটা ছবি তৈরী হয়ে আছে এবং যদি কোনও ...া সেইসব নষ্ট করে তারা বিরক্ত হয়। এই বিরক্তি থেকে মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায় ...শুধু একটি ছবি নয়, একটি পুরো চিত্রশালা তৈরী করে রাখা যাতে প্রয়োজনে ...ঘটনা উল্লেখ করা হল, তার উপযুক্ত একটিকে নির্বাচন করা যায়। যদি কোনও ...া হাস্যকর মনে হয়, তবে আরো ভাল। নিজেকে সবসময় বিয়োগান্ত নাটকের ...কের মতো দেখা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়, নিজেকে সর্বক্ষণ কৌতুক নাটকের ...ক রূপে দেখার কথাও আমি বলছি না, কারণ যারা এমন করে তারা আরো ...শ যন্ত্রণাদায়ক। অবস্থানুযায়ী উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করতে সামান্য কৌশল ...াজন। অবশ্য যদি নিজেকে বিস্মৃত হয়ে আদৌ কোনও ভূমিকা গ্রহণ না করা ...া সেটা প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু কোনও ভূমিকায় অভিনয় করা যদি দ্বিতীয় স্বভাব ...া দাঁড়ায়, তা হলে মনে করতে হবে স্থায়ী অভিনয়কারী কোনও নাট্যদলের ...নেতারূপে এবং তাতেই একঘেয়েমিকে এড়ানো যাবে।

অনেক সক্রিয় লোকের মত হল, তাঁরা যে কর্মশক্তি এবং দৃঢ় সংকল্পের ...য্যে সফল হন বলে মনে করেন, সেখানে তা বিন্দুমাত্র সমর্পণ এবং

হাস্যরসের সামান্য ঝলকও তা নষ্ট করে দিতে পারে, এটা তাঁদের বিশ্বাস। এসব লোকেরা আমার মতে ভ্রান্ত। কাজের মূল্য আছে এমন কাজ তাঁরাও করতে পারেন, যারা কাজের গুরুত্ব অথবা সহজ-সাধ্যতার ধারণা নিয়ে আত্মপ্রতারণা করেন না। যারা শুধু আত্মপ্রতারণার সমর্থন পেলেই কাজ করতে পারেন, তাদের উচিত পেশাগত কাজ শুরু করার আগে সত্যকে সহ্য করার শিক্ষা আয়ত্ত করা। কারণ এখন না হয় পরে কোনও সময়, এই যে অবাস্তব ধারণার কারণে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা, তা তাদের কাজকে হিতকর না করে ক্ষতিকর করবে। কাজ করার তুলনায় কিছু না করা ভাল। পৃথিবীর অর্ধেক প্রয়োজনীয় কাজ শুধু ক্ষতিকর কাজের সাথে যুদ্ধ করতেই নষ্ট হয়। বাস্তবের মূল্য বুঝতে কিছু সময় নষ্ট হলে প্রকৃতপক্ষে তা নষ্ট হয় এবং এরপর যে কাজ করা হবে তা যাদের কাজে বিরামহীন অহমিকার প্রেরণার প্রয়োজন হয় তার চেয়ে কম ক্ষতিকর। নিজের সম্পর্কে সত্যের মুখোমুখি হওয়ার ইচ্ছার সাথে এক ধরণের সমর্পণ বা ভাগ্যবরণ জড়িয়ে আছে। এই ধরনের যদিও প্রথমদিকে কিছু বেদনা থাকতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটি একটি প্রতিরক্ষাব্যবস্থা এবং সম্ভাব্য একমাত্র রক্ষাকবচ। যা আত্মপ্রতারকদের নৈরাশ্য এবং মোহমুক্তির হাত থেকে বাঁচাতে পারে। যা প্রতিভাকে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় তাকে বিশ্বাস করার মতো ক্লান্তিকর এবং শুধু তাই নয়, শেষ পর্যন্ত তার মতো চরম বিরক্তিকর আর কিছু হতে পারে না। এইরকম প্রচেষ্টা থেকে মুক্ত হওয়াই হল নিরাপদ এবং স্থায়ী সুখের অপরিহার্য শর্ত।

১৭

সুখী মানুষ

একথায় কোনও দ্বিধা নেই যে, সুখের কিছু অংশ বাইরের ঘটনাবলী এবং কিছু অংশ নিজের ওপর নির্ভরশীল। এই বইতে আমি যে অংশ আমাদের নিজের ওপর নির্ভরশীল তা নিয়ে আলোচনা করেছি এবং তার ফলে, এই মতে উপনীত হয়েছি যে, এই অংশ সম্পর্কিত যে সমস্যা তার সমাধানের ব্যবস্থাপত্র অত্যন্ত সহজ। অনেকে মনে করেন, যার মধ্যে আমরা অবশ্যই মিস্টার ক্রাচকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি, যাঁর কথা আমরা পূর্বের কোনও অধ্যায়ে তুলে ধরেছি, কোনও না কোনও ধর্মবিশ্বাস ছাড়া সুখ অসম্ভব। অনেকে মনে করেন, যাঁরা নিজেরা অসুখী, তাঁদের দুঃখের কারণ খুব জটিল এবং উচ্চ বুদ্ধিবৃত্তিসূত্রজাত। আমি বিশ্বাস করি না এসব জিনিস সুখের অথবা দুঃখের কারণ হতে পারে। আমার মনে হয় সেসব শুধুই লক্ষণ। যে ব্যক্তি অসুখী তিনি সাধারণত এমন এক ধর্মীয় মতবাদে বিশ্বাসী হবেন যা দুঃখের, পক্ষান্তরে যিনি সুখী তিনি সুখের কোনও ধর্ম বিশ্বাসে বিশ্বাসী হবেন। প্রত্যেকেই তাদের সুখের এবং দুঃখের জন্যে দায়ী করেন তাঁদের বিশ্বাসকে। কিন্তু আসলে কার্যকারণ ঠিক এর বিপরীত। কিছু জিনিস অধিকাংশ লোকের সুখের জন্যে অপরিহার্য। কিন্তু এসব খুব সহজ জিনিস : খাদ্য এবং বাসস্থান, স্বাস্থ্য, ভালবাসা, সফল কাজ এবং নিজেদের সমাজের শ্রদ্ধা, কারো কারো কাছে সন্তানলাভও প্রয়োজন। যেখানে এসবের অভাব সেখানে একমাত্র ব্যতিক্রমী ব্যক্তি সুখ পেতে পারেন। কিন্তু যেখানে এসবের ভোগ করা যাবে অথবা সুপরিচালিত প্রচেষ্টায় পাওয়া সম্ভব, সেখানেও যদি মানুষ অসুখী থাকে তবে বুঝতে হবে তিনি কোনও মনস্তাত্ত্বিক সমন্বয়হীনতায় ভুগছেন এবং তা যদি খুব গভীর হয় তাহলে তাঁকে মনোচিকিৎসকের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু তা যদি সাধারণ হয়, তবে সঠিক পথ অনুসরণ করলে রোগী নিজেই তা সারাতে পারবেন। যদি বাইরের ঘটনাবলী নিশ্চিতভাবে দুর্ভাগ্যজনক না হয়, সেখানে সুখকে লাভ করা সম্ভব, যদি না তাঁর প্রবৃত্তি এবং আকর্ষণ অন্তর্মুখী না হয়ে বহির্মুখী হয়। সুতরাং শিক্ষা এবং পারিপার্শ্বিকতার সাথে মানিয়ে নেওয়ার সচেষ্টা থাকা উচিত আমাদের যাতে আমরা আত্মকেন্দ্রিক প্রবণতাকে এড়িয়ে যেতে পারি এবং সেই ভালবাসা এবং সেই আকর্ষণকে অর্জন করতে পারি যা আমাদের অবিরাম নিজের বিষয়ে ভাবনাকে দূরে রাখতে পারে। কোনও মানুষই কারাগারে থাকার সময় সুখী হয় না এবং সেসব প্রবৃত্তি যে আমাদের নিজেদের মধ্যেই বন্দী করে রাখে, তা যে কোনও খারাপ কারাগারের সমতুল্য। এইসব প্রবৃত্তির মধ্যে কিছু কিছু খুবই সাধারণ। যেমন ভয়, ঈর্ষা, পাপের চেতনা, আত্মকরুণা এবং

আত্মপ্রশংসা। এর সবগুলিতেই আমাদের কামনা নিজেকে ঘিরেই কেন্দ্রীভূত হয়, যার অর্থ বাইরের পৃথিবী নিয়ে যথার্থ কোনও আকর্ষণ থাকে না, থাকে শুধু দুশ্চিন্তা। যদি এটি আমাদের কোনও ক্ষতি করে অথবা আমাদের অহংবোধ আঘাত রাখে। ভয় হচ্ছে প্রধান কারণ যার জন্যে মানুষ সত্যকে স্বীকার করতে চায় না এবং কল্পলোকের মিথ্যার আরামদায়ক আবরণে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে বাধ্য হয়। কিন্তু যে কাঁটা এসে সেই আবরণ ছিঁড়ে দেয় এবং সেই ছেঁড়া জায়গা দিয়ে ঠাণ্ডা ঝাপটা গায়ে লাগে এবং যে মানুষ এ ধরনের আরামে অভ্যস্ত সে অনেক বেশি কষ্ট পায় তার তুলনায় যে মানুষ প্রথম থেকে নিজেকে এসব বিষয়ে সতর্ক নিয়েছে। তার ওপর যারা নিজেদের প্রতারণা করে, তারা মনে মনে জানে তারা কি করছে এবং তারা সবসময় একটা আতঙ্কে থাকে। যদি কোনও বিরূপ ঘটনায় তারা অনভিপ্রেত সত্যকে মেনে নিতে বাধ্য হয়।

আত্মকেন্দ্রিক প্রবৃত্তির একটা বড় ত্রুটি হচ্ছে, তা জীবনে কোনও বৈচিত্র্য ঘটায় না। যে মানুষ শুধু নিজেকেই ভালবাসে, সে কারো প্রতি আসক্তির দিক থেকে উচ্ছৃঙ্খল হয় না এ কথা সত্যি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার একাগ্রতা একই জিনিসের ওপর অপরিবর্তনীয় থাকার জন্যে তাকে বাধ্য হয়ে অসহনীয় একঘেয়েমিজনিত ক্লান্তিতে ভুগতে হয়। যে মানুষ পাপ-চেতনায় পীড়িত হয়, মনে করতে হবে সে একধরনের আত্মপ্রেমে ভুগছে। এই বিশাল পৃথিবীতে তার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যবোধ হচ্ছে নিজেকে পাপহীন রাখা। প্রচলিত কয়েকটি ধর্মমতের একটি বড় ত্রুটি হচ্ছে তারা এই বিশেষ ধরনের আত্মমগ্নতায় উৎসাহিত করে।

সেই মানুষ সুখী, যে বস্তুগতভাবে বাঁচেন যার স্নেহ ভালবাসা অবারিত, আকর্ষণ ও উৎসাহ বিস্মৃত, যে এর ভিতর দিয়ে এবং বিপরীতভাবে নিজেও বহু লোকের স্নেহ-ভালবাসা এবং আকর্ষণ-উৎসাহের পাত্র হয়ে ওঠে, তার ভিতর দিয়েও সুখের সন্ধান করে। ভালবাসার পাত্র হওয়া সুখের একটি প্রবল কারণ। কিন্তু যে মানুষ ভালবাসা দাবি করে তার ওপর তা বর্ষিত হয় না। সহজভাবে বলতে গেলে যে মানুষ ভালবাসা দেয় সেই ভালবাসা পায়। কিন্তু সুদে অর্থ ধার দেওয়ার হিসাবের সাথে ভালবাসা দেওয়ার তুলনা অর্থহীন। যে পায় সেও তাকে নিখাদ ভালবাসা বলে মনে করে না।

যে মানুষ আপন খাঁচায় বন্দী থাকার জন্যে অসুখী, সে তাহলে কী করবে? যতদিন সে নিজের দুঃখের কারণ নিয়ে চিন্তা করবে, ততদিন সে আত্মকেন্দ্রিক হয়েই থাকবে, সুতরাং সে এই আবর্ত-চক্র থেকে বাইরে আসতে পারবে না। যদি তাকে এর বাইরে আসতে হয়, তাহলে বাইরের আকর্ষণ যথার্থ হওয়া চাই, কৃত্রিম উপায়ে ওষুধের মতো কোনও আকর্ষণকে প্ররোচকরূপে প্রয়োগ করা চলবে না।

যদি এই অসুবিধা বাস্তব হয় এবং তার সঠিক কারণ নির্ণয় করা যায়, তাহলে তার বিশেষ কিছু করার নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি তার কষ্ট কোনও সচেতন অথবা অচেতন পাপবোধ থেকে আসে, সে প্রথমে নিজের সচেতন মনকে এই বলে প্রবোধিত করবে যে তার নিজেকে পাপকারী বলে ভাবার কোনও কারণ নেই। তারপর, আমরা আগের অধ্যায়সমূহে যেভাবে পথের নির্দেশ দিয়েছি, সেইভাবে তার যৌক্তিক বিশ্বাসকে অচেতন মনে রোপিত করার দিকে এগিয়ে যাবো। এইসময় সে কম হোক বা বেশি মনকে প্রভাবিত করে এমন কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। যদি সে পাপবোধ মন থেকে দূর করতে পারে, তা হলে সম্ভবত স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার মনে বস্তুগত যথার্থ আকর্ষণ জাগরিত হবে। যদি আত্মকরুণাই তার কষ্টের কারণ হয়, তাহলে তার প্রতিকারও সে একইভাবে করতে পারে, কিন্তু প্রথমে তাকে ভেবে নিতে হবে তার ক্ষেত্রে এই ব্যাপারে অসাধারণ দুর্ভাগ্যের কিছুই নেই। যদি কষ্টটা ভয় থেকে জন্ম নেয়, তাহলে তার এমন কিছু অনুশীলন করা উচিত যাতে সাহস বৃদ্ধি পায়। স্মরণাতীত কাল থেকে যুদ্ধে সাহস দেখানো একটা বড় গুণ বলে বিবেচিত হচ্ছে এবং বালক ও যুবকদের প্রশিক্ষণের একটি বড় অংশ এমন চরিত্র গঠনের চেষ্টা করে আসছে যা যুদ্ধে নির্ভীকতা প্রদর্শন করতে পারে। কিন্তু নৈতিক সাহস এবং বুদ্ধিমত্তার সাহস এই দুটি অনেক কম চর্চিত হয়েছে, কিন্তু এদেরও নিজস্ব কৌশল রয়েছে। আপনি প্রতিদিন অন্তত নিজের কাছে একটি করে বেদনাদায়ক সত্যকে স্বীকার করুন যা বয়স্কাউটদের প্রতিদিনের একটি করে ভাল কাজ করার মতোই প্রয়োজনীয়। এই কথাটি নিজেকে অনুভব করাতে শেখান যে, সৎগুণে এবং বুদ্ধিমত্তায় আপনি আপনার সব বন্ধুদের চেয়ে অপরিসীম না হলেও, যদিও আপনি সত্যি তাঁদের চেয়ে উন্নত, তারপরও জীবন সুন্দর। কয়েক বছর ধরে এইভাবে অনুশীলন করতে পারলে আপনি শেষ পর্যন্ত দেখবেন সত্য কথা স্বীকারে আপনার আর কোনও কুণ্ঠা নেই এবং এই অবস্থায় আপনি একটি বিস্তীর্ণ ভীতির সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন।

আত্মমগ্নতা দূর হলে বস্তুগত আকর্ষণ কীসে কীসে হবে তার ভার ছেড়ে দিতে হবে আপনার মনের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত কাজ এবং বাইরের সামগ্রিক অবস্থার ওপর। আগে থেকেই মনে করবেন না, "ডাকটিকিট সংগ্রহে মনোনিবেশ করলে সুখী হতে পারতাম।" এবং তারপর ডাকটিকিট সংগ্রহ করতে শুরু করলেন, কিন্তু এমনও হতে পারে যে, এ কাজটা আপনার কাছে মোটেই আনন্দদায়ক হল না। যাতে যথার্থভাবেই আপনার আকর্ষণ, একমাত্র তাই আপনার কোনও কাজে লাগাতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন আত্মমগ্নতা ছাড়ার সাথে সাথে যথার্থ বস্তুগত আকর্ষণ জন্ম নেবে।

সুখী জীবন উন্নত জীবনের এক অসাধারণ বিস্তৃতি। বৃত্তিজীবী নীতিবাদীরা আত্মবঞ্চনা নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করেছেন এবং তা করতে গিয়ে ভুল জায়গায় গুরুত্ব দিয়েছেন। সচেতন আত্মবঞ্চনা মানুষকে আত্মমগ্ন হতে শেখায় এবং সে যা ত্যাগ করেছে সে বিষয়ে অতিরিক্ত সচেতন করে তোলে। যার ফলে সে প্রায়ই নির্দ্ধারিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারে না এবং প্রায় চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছাতে ব্যর্থ হয়। যা প্রয়োজন তা আত্মবঞ্চনা নয়। কিন্তু কোনও মানুষকে নিজের সদগুণের সাধনায় রত থেকে বাইরের আকর্ষণের দিকে নিয়ে চলা, যাতে প্রয়োজন সচেতন আত্মবঞ্চনা। আমি এই বইটি রচনা করেছি সুখবাদীর ভূমিকা নিয়ে; অর্থাৎ যে মানুষ সুখকেই মঙ্গল মনে করে, তার ভূমিকা নিয়ে। কিন্তু সুখবাদীর দৃষ্টিতে যেসব পথের কথা বলা হয়, তা সাধারণভাবে স্থির মস্তিষ্ক নীতিবাদীর পথের অনুরূপ। নীতিবাদীরা অধিকাংশ সময়, সবক্ষেত্রে সত্য না হলেও, মনের অবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ না করে কাজের ওপর গুরুত্ব দেন। যে কাজ করে তার ওপর কাজের যে প্রতিক্রিয়া হয় তা সেই সময়ের তার মানসিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। তাই ভিন্ন ভিন্ন মানসিক অবস্থায় কাজের প্রতিক্রিয়া এক নয়। যদি আপনি কোনও শিশুকে ডুবে যেতে দেখেন এবং সাহায্যের সহজাত প্রবৃত্তি থেকে তাকে উদ্ধার করেন তাহলে নৈতিকভাবে আপনাকে খারাপ ভাবা চলবে না। পক্ষান্তরে যদি আপনি ভাবেন : 'অসহায়কে উদ্ধার করবে", তাহলে আপনি আগে যা ছিলেন তার চেয়ে নিকৃষ্ট হয়ে যাবেন। এই চরম উদাহরণের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য, সে কথা অনেক সহজ-সরল এবং সাধারণ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। জীবনের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গী আমি অনুমোদন করছি এবং প্রচলিত নীতিবাদীরা যা অনুমোদন করেন তার মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে এবং সে পার্থক্য আরো সূক্ষ্ম। উদাহরণস্বরূপ, প্রথাগত নীতিবাদী বলবেন, ভালবাসায় স্বার্থহীন হওয়া উচিত। একদিক থেকে দেখলে কথাটা যথার্থ। বলা যায় একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত তাতে কোনও স্বার্থ থাকবে না। কিন্তু এটা নিঃসন্দেহে এমন প্রকৃতির হবে যাতে এর সাফল্যের সাথেই জড়িয়ে থাকে নিজের সুখ। যদি কোনও পুরুষ আন্তরিকভাবে কোনও নারীকে বিয়ে করতে চান তাঁর সুখ কামনা করে এবং সেই সাথে এটাও ইচ্ছা করেন যে সেই নারী খুশী হবেন কিনা তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। নিঃসন্দেহে আমরা যাদের ভালবাসি তাদের সুখী দেখতে চাই। কিন্তু তা আমাদের সুখের বিকল্প হতে পারে না। বাস্তব সত্য হচ্ছে, যে বিরোধাভাস অহং এবং অবশিষ্ট পৃথিবীর মধ্যে বিরাজমান, যা রূপায়িত আত্মত্যাগ নীতির মধ্যে, তা শুধু বিলীন হয়ে যাবে যখন আমরা নিজেদের বাইরে অন্য মানুষ এবং জিনিসের মধ্যে যথার্থ আকর্ষণ খুঁজে পাব। এইসব আকর্ষণের মধ্যেই মানুষ বুঝতে পারে জীবন

...ের একটা অংশ, যা বিলিয়ার্ড বলের মতো কঠিন কোনও আলাদা জিনিস ...। যে বল অন্য বলের সাথে সংঘর্ষ ছাড়া অন্য কোনও সম্পর্ক রাখতে পারে না। ... মুখ কোনও না কোনও বিচ্ছিন্নতা অথবা অবিচ্ছিন্নতার অভাবের ওপর ...শীল। চেতন এবং অচেতন মনের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব হলে নিজের সাথে ...ের যে সংহতি তা নষ্ট হয়ে যায়। তখন বাইরের আকর্ষণ এবং ভালবাসা ... দুটিকে এক সূত্রে বেঁধে রাখা যায় না। সেই মানুষই সুখী মানুষ যে এই ...টির ঐক্য সাধনে ব্যর্থ হয় না, যাঁর ব্যক্তিত্ব নিজের বিরুদ্ধেও খণ্ডিত হয়নি, ...ীর বিরুদ্ধেও প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে নি। এই মানুষই নিজেকে বিশ্বের নাগরিক ... অনুভব করেন এবং এই বিশ্বের সব দৃশ্য এবং আনন্দ মুক্তভাবে ভোগ করেন, ... মানুষ মৃত্যুর ভয়ে ভীত নন, কারণ তিনি কখনো পরবর্তী প্রজন্ম থেকে ...কে বিচ্ছিন্ন মনে করেন না। জীবন ধারার সাথে এই ধরনের অন্তর্নিহিত ...কে যুক্ত করার মধ্যেই পরম সুখ পাওয়া যায়।

বার্ট্রান্ড রাসেল

বার্ট্রান্ড রাসেল সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সব চিন্তাবিদদের মধ্যে একজন। তাঁর পাওয়া যায় বহুমুখী প্রতিভার এক সমন্বিত রূপ। তিনি ছিলেন একাধারে বৈজ্ঞানিক, গণিতজ্ঞ, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, সমাজতত্ত্ববিদ ও শিক্ষাবিদ। তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং অনুপম লিখনশৈলীর জন্য মননশীল মানুষরা তাঁকে চিরকাল স্মরণ করবেন। বর্তমান পৃথিবীর তিনি একজন শ্রেষ্ঠ দর্শনিক।

ইংল্যান্ডের এক উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৮৭২ সালে ১৮ মে বার্ট্রান্ড রাসেল জন্মগ্রহণ করেন। ইংল্যান্ডের রাসেল পরিবার ছিল উদারনৈতিক রাজনীতির সাথে যুক্ত। রাসেলের পিতামহ লর্ড জন রাসেল দু'বার ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন উদারপন্থী। বার্ট্রান্ড রাসেলের পিতা ছিলেন ভাইকাউন্ট অ্যামরারলে রাসেল। তিনিও ছিলেন একজন রাজনীতি সচেতন মানুষ। মুক্ত চিন্তাবিদ হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। পিতামহ এবং পিতার জীবনের গভীর প্রভাব পড়েছিল রাসেলের জীবনে।

আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত বাড়িতেই গভর্নেস এবং শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে রাসেলের পড়াশোনা চলেছিল। তখনকার অভিজাত পরিবারে সেটাই ছিল রীতি। কৈশোরে গণিতশাস্ত্রের ওপর রাসেলের তীব্র আগ্রহ দেখে তাঁর গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। পাঠ্যবইয়ের বাইরেও প্রবল অধ্যয়নস্পৃহা কৈশোর থেকেই দেখা গিয়েছিল। রাসেলের পিতামহের ছিল বিশাল ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার। বালক রাসেলের সেখানে ছিল অবাধ বিচরণ। আঠারো বছর বয়সে তিনি কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকেই তিনি স্নাতক হন। ইংরেজি ছাড়াও ফরাসী ও ইতালীয় ভাষায় তিনি তখনই বিশেষভাবে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। স্নাতক হওয়ার পর তিনি ফ্রান্সের ব্রিটিশ দূতাবাস, প্যারিসে কিছুদিন কাজ করেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই লন্ডনে ফিরে আসেন। মাত্র বাইশ বছর বয়সে তিনি এলিস স্মিথকে বিয়ে করেন।

বিয়ের পর রাসেল পত্নীকে নিয়ে সানেবক্সে বসবাস করতে থাকেন। এখানে তিনি বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েন দর্শনশাস্ত্রে ও গণিতশাস্ত্রে। উনবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর বিদগ্ধ সমাজ তাঁকে এই দুই বিষয়ে অসামান্য অবদানকারীরূপে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এই সময়ে আরও দুটি বিষয়ের প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। নারী ও পুরুষের সমানাধিকার এবং সমাজতন্ত্রবাদ বিষয়ক আন্দোলন। ফেবিয়ান পার্টির ম্যানিফেস্টো তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। কার্ল মার্কসের অর্থনৈতিক

...ক দর্শন রাসেলকে অনুপ্রাণিত করে। মানুষের জীবনের উৎকর্ষতার ... ধর্ম নয়— জ্ঞান এবং বিজ্ঞান। তখন থেকেই এটাই হয়ে ওঠে তাঁর ...।

...শ বছর বয়সে রাসেল তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ...। তিনি স্বেচ্ছায় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ... করেন। তিনি মনে করতেন যে সম্পদ তিনি নিজে অর্জন করেননি তা ... করার কোনও অধিকার তাঁর নেই। তিনি সেইসব সম্পত্তি দিয়ে দেন ... মানবকল্যাণব্রতী সংস্থায়। এরপরে তিনি জীবন কাটান তাঁর লেখা এবং ... থেকে লব্ধ উপার্জন থেকে। সেই তরুণ বয়স থেকেই তিনি যুদ্ধবিরোধী ... গ্রহণ করেন। সেই যুদ্ধে যদি তাঁর স্বদেশও যুক্ত থাকে তবুও তিনি মত ...। স্বদেশের অন্যায় অত্যাচারকে দেশপ্রেমের নামে কখনও তিনি সমর্থন ...।

...শ বছর বয়সে রাসেলের রাজনীতি সংক্রান্ত বই 'A Study মত ... Social Democracy' প্রকাশিত হয়। তারপর প্রকাশিত হয় জ্যামিতি ... বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ। এই সময় তাঁর লেনিনের দর্শনবিদ্যা সম্পর্কিত ... বইও প্রকাশিত হয়। এই সময় তিনি একটি গবেষণাপত্রও রচনা করেন। ... গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল গণিত ও ন্যায়শাস্ত্রের মধ্যে সাদৃশ্য তুলে ধরা। ... গণিত বলতে বুঝতেন তার কঠোর নৈর্ব্যক্তিকতা এবং বস্তুময়তাকে। ... বয়স যখন আটত্রিশ বছর তখন তিনি হোয়াইট হেডের সহযোগিতায় ... 'Principia Mathematica' নামক বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থের রচনা শেষ করেন। ... প্রকাশিত এই বিপুলায়তন গ্রন্থ বিশ্বের গণিতের ইতিহাসে ক্লাসিকরূপে ... হয়ে থাকে। এই গ্রন্থ রচনায় সাত বছর বিপুল পরিশ্রম করতে হয়েছিল ...কে। এই গ্রন্থের জন্যেই বার্ট্রান্ড রাসের নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

...নের প্রথম দিকে তিনি উদারনৈতিক রাজনীতির সমর্থক থাকলেও পরে ... হয়েছিলেন সমাজবাদী। তিনি অজ্ঞেয়বাদী বা নিরীশ্বরবাদী তা নিয়েও বিতর্ক ... সময়। তবে তিনি যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন না, সে কথা ... বলে গেছেন তাঁর অনেক গ্রন্থে-প্রবন্ধে-নিবন্ধে।

...১৪ সালে শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। রাসেল ছিলেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং ... পক্ষে। তাঁর স্বদেশ ইংল্যান্ড তখন যুদ্ধে অংশগ্রহকারী দেশ। রাসেলের ... এবং শান্তির জন্য প্রচারকার্য তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল নিজের ... থেকে। তবে তাঁর সাথে ছিলেন বিখ্যাত ওয়েবদ দম্পর্তি, বার্নার্ড শ, ... এবং হারবার্ট স্যামুয়েল প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীরা। আরো যে কজন মনীষী

এইসময় যুদ্ধবিরোধী মনোভাবের জন্যে বিশ্বখ্যাত (সেইসময় নিন্দিত) রয়েছেন তাঁরা হলেন রোঁমা রোঁলা (১৮৬৬-১৯৬৫), অ্যালবার্ট আইন্স্টাইন (১৯৭৯-১৯৫৫) এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)।

যুদ্ধবিরোধী মনোভাব এবং শান্তিবাদী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য স্বদেশবাসীর কাছে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন রাসেল। তাঁকে কারাবাস এবং অর্থদণ্ড দুই দণ্ডই ভোগ করতে হয়েছিল। এমন কী কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ট্রিনিটি কলেজে তিনি অধ্যাপনা করতেন তারাও রাসেলকে কর্মচ্যুত করেন। পরে অবশ্য তিনি আবার সেখানে আমন্ত্রিত হন। ১৯১৭ সালের শেষভাগে ব্রিক্সটন কারাগারে ছয় মাস কাটিয়েছিলেন তিনি। কারাগারে বসেই তিনি তিনটি বই রচনা করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর যুগান্তকারী ঘটনা হল রুশ বিপ্লব। রাসেল ঘটনাকে অভিনন্দিত করেছিলেন। কারণ রুশ বিপ্লবের বাণী ছিল 'Power to the Soviets, land to the Peasants, breads to the Hungry and peace to the People.' সোভিয়েট ইউনিয়ন রাসেলকে আমন্ত্রণ জানান একজন শান্তির প্রতিনিধিরূপে। সেখানে তিনি লেনিনের সাথে সমাজতন্ত্র নিয়ে মূল্যবান আলোচনা করার সুযোগ পান। রাশিয়া পরিভ্রমণ শেষ করে তিনি গিয়েছিলেন চীনে। সেখানে তিনি সান-ইয়াৎ-সেনের সাথে আলোচনা করার সুযোগ পান। সান-ইয়াৎ-সেন তাঁকে প্রভাবিত করেন। কিছুদিন সেখানে তিনি অধ্যাপনা করেন আমন্ত্রিত হয়ে। এই দুই দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা তাঁর দুটি বই 'The Practice and Theory of Bolshevism" এবং "The Problem of China"।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সক্রিয় বিরোধী ছিলেন রাসেল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে করেছিলেন সমর্থন। অনেকেই সেজন্যে রাসেলকে ভুল বুঝেছিলেন। কিন্তু মধ্যে কোনও দ্বিচারিতা ছিল না। রাসেলের বিশ্বাস ছিল হিটলারের ফ্যাসিবাদ মানবতার শত্রু। সেই শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করতে যুদ্ধকে সমর্থন করা ছাড়া কোন পথ নেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের মধ্যে সংঘর্ষ, যা ছিল মানব সভ্যতার বিপক্ষে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানব কল্যাণের স্বার্থে। সেখানে কোনও নিরপেক্ষতারও সুযোগ নেই।

উদারপন্থী থেকে সমাজবাদীতে রূপান্তরিত হওয়ার পর লেনিনের রুশ বিপ্লব তাঁর মনে নতুন আশার সঞ্চার করেছিল।

রাসেলের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি যা লিখতেন বা বলতেন তা একান্তভাবে বিশ্বাস করতেন এবং নিজের জীবনে প্রয়োগ করতেন। ১৯৩৯ সালে রাসেল ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের করলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। ১৯৪০'র প্রথমে নিউইয়র্কের সিটি কলেজে দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেওয়ার জন্যে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি সেই আমন্ত্রণ গ্রহনও করেন। কিন্তু নিউইয়র্কের ধর্মযাজকরা রাসেল ধর্ম এবং নৈতিকতা সম্বন্ধে ভিন্নমতাবলম্বী ছিলেন বলে তার প্রবল বিরোধীতা করেন। রাসেলকে শেষ পর্যন্ত সেই পদে যোগদান করতে দেওয়া হয় নি। ১৯৪০ সালেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মতন্ত্রের এই ছিল রূপ।

রাসেলের জীবনের শেষ বিশ বছর ছিল সবচেয়ে কর্মময়। তাঁর বয়স যখন পঁচাশি তখন তিনি গড়ে তোলেন 'Campaign for Nuclear Disarmament' নামে একটি বড় আন্দোলন। তিনি চেয়েছিলেন পৃথিবীতে পারমানবিক মারণাস্ত্র উৎপাদন বন্ধ হোক। পারমানবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করার পক্ষে জনমত গঠনে তিনি শুরু করেন সত্যাগ্রহ শুরু করেন। তিনি নেতৃত্ব দেন সেই সত্যাগ্রহে। নব্বই ছুঁই ছুঁই এই জ্ঞানতাপসকে কারাগারে প্রেরণ করেন ব্রিটিশ সরকার। রাসেল দম্পতির সাত মাস কারাবাস হয়েছিল। পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে যখন সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে, রাসেল তার কারণ অনুসন্ধান করে অন্যায়কে প্রতিরোধ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি দ্বিধাহীনভাবে ধিক্কার দিয়েছেন অন্যায়কারী রাষ্ট্র এবং সরকারকে। সেই রাষ্ট্র পুঁজিবাদী বা সাম্যবাদী যে মতবাদেরই হোক না কেন। তাঁর শেষ জীবনের অধিকাংশ সময় অধিকার করে নিয়েছিল ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন সংগঠনে। তাঁর 'War Crimes in Vietnam' পুস্তিকাতে রাসেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার সহযোগী রাষ্ট্রগুলিকে মানবতার শত্রু রূপেই চিহ্নিত করেছেন।

সমগ্র বিশ্ব ছিল রাসেলের কর্মক্ষেত্রের পরিমণ্ডল। যেখানে অন্যায় দেখেছেন সেখানেই তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠকে দেখা গেছে। পৃথিবীর সব নির্যাতিত মানুষের পাশে তিনি বিচলিত হয়েছেন। ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামকে তিনি সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেছেন। "India League'-র সভাপতি ছিলেন তিনি। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন মানব কল্যাণে। সবরকম নিষ্ঠুরতা, হীনতা, কুসংস্কার, অন্ধতা থেকে মানবতার শত্রুদের তিনি ধিক্কার দিয়েছেন। তাঁর কাছে ভাল জীবনের সংজ্ঞা ছিল : "The good life is one inspired by love and guided knowledge." দেশের এবং বিদেশের সরকারের বিরাগভাজন হতে হয়েছিল তাঁকে অনেকবার। তবুও তিনি তাঁর পথ এবং মত নিয়ে কোনওদিন আপোষ

করেন নি। 'প্রতিবাদই জীবন, মেনে নেওয়াই মৃত্যু'— এই বিশ্বাসে অটল ছি সারাজীবন। তাঁর মতো কর্মীপুরুষ এবং অনবদ্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ পৃথিবী হয়ত আর জন্ম নেবে না। আবার তাঁর মতো অকৃত্রিম মানবদরদীও কোথা শেষ। তিনি যে সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখতেন, যে সমাজ-ভাবনা ছিল তা তিনি তুলে ধরেছেন "The Conquest of happiness" গ্রন্থে। বর্তমান জগতের কাছে এটা তাঁর উত্তরপুরুষরা যতদিন তা দীপ্যমান রাখতে পারা ততদিন তাদের কাছে সেই শিখা আলোকিত মশাল হয়েই থাকবে। রাসেল জীবন এবং চিন্তাধারা কোনও দিন পৃথিবী থেকে মুছে যাবে না।

১৯৭০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি তাঁর মহাজীবনের অবসান। পৃথিবীর মানু চিরকাল তাঁকে অসীম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

অপেক্ষবাদের অ. আ. ক. খ.

১

দৃষ্টি ও স্পর্শ : পৃথিবী এবং নভোমণ্ডল

সবাই জানেন আইনস্টাইন বিস্ময়কর একটা কিছু করেছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে কি সে সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অল্প লোকেরই আছে। ভৌত জগৎ সম্পর্কে আমাদের ধারণায় তিনি বিপ্লব এনেছিলেন—এ তথ্য সাধারণভাবে জানা। কিন্তু নতুন ধারণাগুলি গাণিতিক প্রয়োগকৌশলে আবৃত। অপেক্ষবাদ সম্পর্কে সাধারণের জন্য অসংখ্য লেখা রয়েছে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা যেখানে শুরু হয়, ঠিক সেখানেই সেগুলি দুর্বোধ্য। এর জন্য লেখকদের দোষ দেওয়া যায় না। নতুন ধারণাগুলির অনেকটাই গণিতের ভাষা ছাড়া প্রকাশ করা যায়। কিন্তু তাহলেও তারা কম দুর্বোধ্য নয়। প্রয়োজন আসলে আমাদের বিশ্বসম্পর্কীয় ধারণার পরিবর্তন। এ কল্পন আমরা পেয়েছি আমাদের অতি প্রাচীন পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকে—যে পূর্ব-পুরুষেরা হয়তো প্রাক-মানবিক—আর শিখেছি আমরা প্রথম শৈশবে। আমাদের চিন্তাজগতের পরিবর্তন সবচাইতে কঠিন—বিশেষ করে আমরা যখন আর তরুণ নই তখন। একই ধরনের পরিবর্তনের দাবী করে কোপার্নিকাসের। তিনি শিখিয়েছিলেন পৃথিবী নিশ্চয় নয়, নভোমণ্ডল পৃথিবীর চারপাশে দৈনিক একবার ঘুরছে এ কথাও সত্য নয়। আমাদের মনের অভ্যাস তৈরী হওয়ার আগেই এ তথ্য আমরা শিখেছি। সেইজন্য এই কল্পনে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। যে প্রজন্মের মানুষ আইনস্টাইনের চিন্তাধারার সঙ্গেই বেড়ে উঠবে একই কারণে তাদের কাছে সহজতর হবে এই কল্পন। কিন্তু কল্পনের প্রশিক্ষণের চেষ্টায় খানিকটা পরিশ্রম এড়ানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

আবিষ্কারের জন্য ধরাপৃষ্ঠ পর্যবেক্ষণ করতে হলে আমরা সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যবহার করি। বিশেষ করে ব্যবহার করি দর্শন এবং স্পর্শনেন্দ্রিয়। প্রাক্‌বৈজ্ঞানিক যুগে দৈর্ঘ্য মাপতে হলে ব্যবহার করা হয় দেহের কোনো একটা অংশ; হাত, গজ, পা (ফুট) এই ভাবেই সংজ্ঞিত (defined) হয়। দূরত্ব বেশি হলে আমরা আন্দাজ করি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় হেঁটে যেতে কত সময় লাগে। ক্রমে আস্তে আমরা চোখের দৃষ্টি দিয়ে দূরত্ব আন্দাজ করতে শিখি কিন্তু নির্ভুল হতে হলে আমরা নির্ভর করি স্পর্শের উপর। তাছাড়া স্পর্শ থেকেই আমাদের বস্তুর বোধ আসে। কিছু কিছু জিনিস ছোঁয়া যায় না: রামধনু, আয়নার ছায়া ইত্যাদি। এগুলি দেখে শিশুরা ধাঁধায় পড়ে। আয়নায় দেখা জিনিস বাস্তব নয় এ

সংবাদে তাদের 'অধিবিদ্যক কল্পন' (metaphysical speculations) বাদ দিয়ে ম্যাকবেথের ছোরাটা ছিল অবাস্তব, কারণ, 'দৃষ্টিগোচর হলেও অনুভূতিগোচর ছিল না।' শুধুমাত্র জ্যামিতি এবং পদার্থবিদ্যাই নয় আমাদের অস্তিত্বের সমগ্র কল্পনের ভিত্তিই স্পর্শবোধ। রূপকেও আমরা এ ধারণা প্রয়োগ করি। ভাল বক্তৃতা জমে (solid), মন্দ বক্তৃতা শুধুই গ্যাস (gas), এরা কাজে আমাদের বোধে বায়বীয় পদার্থ (গ্যাস) ঠিক বাস্তব নয়।

নভোমণ্ডল পর্যবেক্ষণে আমরা দৃষ্টি ছাড়া কোনো জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যবহার করতে পারি না। সূর্য আমরা স্পর্শ করতে পারি না, পারি না ফুটরুল দিয়ে কৃত্তিকা নক্ষত্র (Pleiades) মাপতে। তা সত্ত্বেও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিনা দ্বিধায় জ্যামিতি আর পদার্থবিদ্যা প্রয়োগ করেছেন। তাঁরা দেখেছেন ভূ-পৃষ্ঠে এ বিদ্যাগুলি কাজে লাগে। তাছাড়া এগুলির ভিত্তি ছিল বিচরণ ও স্পর্শ। এ রকম কাজ করতে গিয়ে তাঁরা বিপদ ডেকে এনেছেন। অপেক্ষবাদ আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত সে বিপদ কাটানো দেখা গেল, স্পর্শ বোধের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানের অনেকটাই অবৈজ্ঞানিক সংস্কার। সত্যকারের বিশ্বচিত্র লাভ করতে হলে এ সংস্কার অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে।

ধরাপৃষ্ঠে অবস্থিত বস্তুগুলি নিয়ে যার কাজ তার তুলনায় একজন জ্যোতির্বেত্তার (Astronomer) পক্ষে অসম্ভাব্যের পরিমাণ কত বেশি, তার উদাহরণে সে তথ্য বোঝা যাবে। মনে করা যাক একটা ওষুধ দিয়ে আপনাকে কিছুক্ষণের জন্য অজ্ঞান করা হয়েছে। আপনি জেগে উঠবার পর আপনার স্মৃতি নষ্ট হয়েছে কিন্তু যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা যায়নি। আর মনে করা যাক এমন অবস্থায় আপনাকে একটা বেলুনে তুলে দেওয়া হয়েছিল। আপনার জ্ঞান হওয়ার সময়ে বেলুনটা অন্ধকারে হাওয়ায় ভাসছে। আপনি ইংল্যান্ডে থাকলে তা হোক নভেম্বর মাসের পাঁচ তারিখ আর আমেরিকায় থাকলে হোক জুলাইয়ের চার তারিখ*। আপনি দেখতে পাবেন ট্রেন থেকে, অ্যারোপ্লেন থেকে এবং মাটি থেকে বাজি ছাড়া হচ্ছে। বাজিগুলি সবদিকে ছুটছে। বাজি আপনি দেখতে পাবেন, কিন্তু অন্ধকারের জন্য মাটি, অ্যারোপ্লেন কিংবা ট্রেন দেখতে পাবেন না। এ বিষয় সম্পর্কে কি রকম মানসচিত্র তাহলে আপনি গঠন করবেন? আপনি ভাববেন বিশ্ব স্থায়ী নয়। অস্তিত্ব রয়েছে শুধু ক্ষণস্থায়ী আলোর ঝলকের। ঝলকগুলি স্বল্পস্থায়ী অস্তিত্বকালে শূন্যস্থানে নানারকম উদ্ভট বক্ররেখা আঁকছে। এই আলোর ঝলক আপনি ছুঁতে পারবেন না, শুধুমাত্র দেখতে পারেন।

---

* নভেম্বরের পাঁচ তারিখের রাত্রে ইংল্যান্ডের আর জুলাইয়ের চার তারিখের রাত্রে আমেরিকায় বাজি পোড়ানো হয়। অনেকটা আমাদের দেওয়ালীর মতো।—অনুবাদক

আপনার জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা এবং সাধারণ নশ্বর জীবদের জামিতি. পদার্থবিদ্যা এবং অধিবিদ্যায় অনেক পার্থক্য হবে; এ তথ্য স্বতঃপ্রতীয়মান। সাধারণ কোনো নশ্বর জীব আপনার সঙ্গে বেলুনে থাকলে তার ভাষা আপনি বুঝতে পারবেন না। কিন্তু আইনস্টাইন যদি আপনার সঙ্গে থাকতেন তাহলে আপনার পক্ষে তাঁকে বোঝা যে কোনো নশ্বর জীবের আইনস্টাইনকে বোঝার চাইতে অনেক বেশি সহজ হতো। তার কারণ বহু পূর্ব-কল্পন থেকে আপনি মুক্ত থাকতেন। অধিকাংশ লোকের ক্ষেত্রে এই পূর্ব-কল্পনগুলিই (pre-conceptions) আইনস্টাইনকে বোঝার বাধা।

যে ধারণাগুলি ওষুধ খাওয়া বেলুন-আরোহীর কাছে প্রয়োজন নয় অথচ সাধারণ জীবনে প্রয়োজন, অপেক্ষবাদ অনেকটাই নির্ভর করে সেই ধারণাগুলি থেকে মুক্ত হওয়ার উপর। কম বেশি আকস্মিক কিছু কারণে ধরাপৃষ্ঠের পরিবেশ আকাশিক কল্পন নির্দেশ করে। সে কল্পন চিন্তাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হলেও দেখা যায় সেগুলি নির্ভুল নয়। জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ধরাপৃষ্ঠের অধিকাংশ বস্তুই বেশ অটল এবং প্রায় স্থিতিশীল। ধরাপৃষ্ঠের পরিবেশের ভিতরে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এটাই। ব্যাপারটা এরকম না হলে ভ্রমণ সম্পর্কীয় ধারণা যতটা নিশ্চিত মনে হয়, ততখানি নিশ্চিত মনে হতো না। আপনি যদি কিংস ক্রস্ থেকে এডিনবরা যেতে চান তাহলে আপনার জানা থাকবে চিরকাল যেখানে ছিল, কিংস ক্রস থাকবে সেখানেই। রেললাইনের গতিপথ শেষ বারে যাওয়ার সময় যেমন ছিল তেমনি থাকবে আর এডিনবার ওয়েভার্লি স্টেশনও কেল্লা অবধি হেঁটে যাবে না। আপনি বলবেন আপনি এডিনবরা গিয়েছেন। বলেনও সেকথা। এডিনবরা আপনার কাছে যায়নি একথা বলেন না! কিন্তু একথাও একই রকম নির্ভুল। সাধারণ বুদ্ধিভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির এই সাফল্য এমন কতগুলি জিনিসের উপর নির্ভর করে যেগুলি আসলে অনেকটাই ভাগ্য নির্ভর। অনুমান করা যাক লন্ডনের বাড়িগুলি এক ঝাঁক মৌমাছির মতো অবিরাম চলমান, রেলপথগুলি চলে আর আকার বদলায় হিমবাহের মতো এবং সবশেষে অনুমান করা যাক বাস্তব পদার্থগুলি মোমের মতো অবিরাম গঠিত ও বিগঠিত (dissolution) হয়ে চলেছে। এই সমস্ত অনুমানে অসম্ভব কিছু নেই। কিন্তু যাকে আমি এডিনবরা যাত্রা বলি তার কোনো অর্থ এ জগতে থাকবে না এ কথা স্বতঃপ্রতীয়মান। সন্দেহ নেই—সকালে আপনি শুরু করবেন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে, 'কিংস ক্রস্টা আজ সকালে কোথায়?' স্টেশনে আপনার এডিনবরা সম্পর্কে একই ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে। কিন্তু টিকিট ঘরের কেরানী আপনাকে উত্তর দেবেন, 'এডিনবরার কোন অংশ সম্পর্কে বলছেন

আপনি? প্রিন্সেস স্ট্রিট গিয়েছে গ্ল্যাসগোতে, কেল্লাটা উঠেছে পাহাড়ে। ওয়েভার্লি স্টেশন রয়েছে ফোর্থ খাঁড়ির জালের নিচে।' তাছাড়া পথে স্টেশনগুলি স্থিরাবস্থায় থাকবে না। কোনোটা চলবে উত্তরে, কোনোটা দক্ষিণে, কোনোটা পূর্বে আবার কোনোটা পশ্চিমে। তাদের বেগ হয়তো ট্রেনের চাইতে বেশি। এ অবস্থায় কোন মুহূর্তে কোথায় আপনার অবস্থান সেটাও আপনি বলতে পারবেন না। আমাদের ব্যক্তির অবস্থান কোনো একটি নিশ্চিন্ত 'স্থানে' এই ধারণার কারণ ভাগ্যক্রমে ধরাপৃষ্ঠে অধিকাংশ বৃহৎ বস্তুর অচলাবস্থা। স্থান সম্পর্কীয় ধারণা শুধু একটি মোটামুটি কার্যকর আসন্নতা (rough practical approximation)। এর পিছনে যৌক্তিক প্রয়োজন কিছু নেই এবং এ ধারণাকে সর্বাংশে সঠিক করা সম্ভব নয়।

আমরা যদি ইলেকট্রনের চাইতে বেশি বড় না হতাম তাহলে স্থিরত্ব সম্পর্কীয় এ ধারণা আমাদের থাকত না। এ ধারণার কারণ শুধুমাত্র আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্থূলত্ব (grossness)। কিংস ক্রসকে আমাদের মনে হয় ঘনবস্তু (solid)। আমাদের আকার ইলেকট্রনের মতো ছোট হলে কিংস ক্রস্‌কে ধারণাতীত শূন্য মনে হতো। দু-একজন উৎকেন্দ্রিক গণিতবিদ (eccentric mathemticians) ছাড়া আর কারো পক্ষে এ সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব হতো না। আমাদের দৃষ্টিপথে যেগুলি আসত সেগুলি অতি ক্ষুদ্র বস্তুবিন্দু। পরস্পরের সংস্পর্শে তারা কখনোই আসে না। অকল্পনীয় দ্রুত ব্যালে নাচের মতো তারা পরস্পরের সবদিকে অবিরাম ঘুরছে। এডিনবরার বিভিন্ন অংশ যদি ভিন্ন ভিন্ন দিকে হাঁটা দিত, আমরা ইলেকট্রনের মতো ক্ষুদ্র হলে আমাদের অভিজ্ঞতা- লব্ধ জগৎও হতো সেই রকম উন্মত্ত। আমরা যদি বিপরীত প্রান্ত বিচার করি, অর্থাৎ আপনার আকার যদি সূর্যের মতো বড় হতো, আপনার জীবনকাল যদি হতো ঐরকম দীর্ঘ এবং অনুভূতি যদি হতো অনুরূপ মন্থর তাহলে আপনি দেখতেন বিশৃঙ্খল, স্থিরত্বহীন এক মহাবিশ্ব। গ্রহ-তারকা আসত এবং যেত ভোরের কুয়াশার মতো। কোনো বস্তু সাপেক্ষে কোনো বস্তুর স্থির অবস্থান থাকত না। তুলনামূলক স্থিরত্বসম্পর্কীয় ধারণা আমাদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির অংশ। সে দৃষ্টিভঙ্গির কারণ আমাদের আকার এবং এমন একটি গ্রহে বাস যার পৃষ্ঠতল (surface) খুব উত্তপ্ত নয়। তা না হলে আপেক্ষবাদ পদার্থবিদ্যা থেকে আমরা বৌদ্ধিক পরিতৃপ্তি পেতাম না। আসলে আমরা এই ধরনের তত্ত্ব আবিষ্কারই করতাম না। হয় আমরা এক ধাপে অপেক্ষবাদী পদার্থবিদ্যায় পৌঁছে যেতাম নয়তো আমরা বৈজ্ঞানিক বিধি সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যেতাম। আমাদের কপাল ভাল। এই বিকল্পের মুখোমুখি আমাদের হতে হয়নি। তার কারণ একটি মানুষ, ইউক্লিড, গ্যালিলিও, নিউটন এবং

আইনস্টাইনের কাজ করতে পারত : এক এক অসম্ভব কল্পন। অথচ যে বিশ্বে মানব-নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ ছাড়াই সদা পরিবর্তনশীল ব্রহ্মাণ্ড স্বতঃপ্রতীয়মান সে বিশ্বে এই রকম অবিশ্বাস্য প্রতিভা ছাড়া পদার্থবিদ্যা আবিষ্কার প্রায় অসম্ভব হতো।

চাঁদ, সূর্য, তারকার অস্তিত্ব রয়েছে বছরের পর বছর। তবুও জ্যোতিষীয় জগতের সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের পার্থক্য অনেক আগেই বলেছি এ ক্ষেত্রে আমরা শুধু দৃষ্টির উপরেই নির্ভর করি। মহাকাশের বস্তুপিণ্ড স্পর্শ করা, লালন করা, আঘ্রাণ করা কিংবা আস্বাদন করা সম্ভব নয়। মহাকাশের সব জিনিসই অন্য সব জিনিস সাপেক্ষ চলমান। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে পৃথিবী ঘুরছে। সূর্য হারকিউলিস নক্ষত্রপুঞ্জের (constcillation) একটি বিন্দু অভিমুখে এক্সপ্রেস ট্রেনের চাইতেও অনেক বেশি বেগে ধাবমান। স্থির তারকাগুলি নানা অভিমুখে নানা চলমান। কিংস ক্রস্ কিংবা এডিনবরার মতো কোনো সুচিহ্নিত স্থান মহাকাশে নেই। পৃথিবীতে ভ্রমণের সময় আপনি বলেন, ট্রেন চলছে কিন্তু স্টেশনগুলি চলছে না; তার কারণ স্টেশনগুলি পরস্পরের সঙ্গে এবং পারিপার্শ্বিক স্থানের সঙ্গে সাংস্থানিক (topographical) সম্পর্ক রক্ষা করে। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানে কাকে আপনি ট্রেন বলবেন আর কাকে আপনি স্টেশন বলবেন সেটা যাদৃচ্ছিক (arbitrary)। এ প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে শুধুমাত্র সুবিধা আর খুশির উপর।

এই প্রসঙ্গে আইনস্টাইন এবং কোপার্নিকাসের বৈপরীত্য বিচার আকর্ষণীয়। কোপার্নিকাসের আগে লোকে ভাবত পৃথিবী স্থিরভাবে দণ্ডায়মান এবং নভোমণ্ডল তাকে বেষ্টন করে দিনে একবার ঘুরছে। কোপার্নিকাস শেখালেন, আসলে পৃথিবীটাই দৈনিক একবার ঘুরছে এবং সূর্য-তারকার দৈনন্দিন ঘূর্ণন শুধু বাহ্যত প্রতীয়মান (apparent)। গ্যালিলিও এবং নিউটন এবং দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করেছেন। এ মত প্রমাণ করার জন্য অনেক কিছু চিন্তা করা হয়েছে। উদাহারণ : পৃথিবীর মেরুদুটির চ্যাপ্টা হওয়া, মেরুপ্রদেশের তুলনায় বিষুবরেখায় বস্তুপিণ্ডগুলির ওজন বেশি হওয়া। কিন্তু আধুনিক তত্ত্ব অনুসারে কোপার্নিকাস এবং তাঁর পূর্বতন জ্যোতিবিজ্ঞানীদের ভিতরে উপস্থাপিত প্রশ্ন শুধুমাত্র অসুবিধা সুবিধার ব্যাপার! সমস্ত গতিই আপেক্ষিক।'পৃথিবীর দৈনিক একবার চক্রাকারে আবর্তিত হয় এবং নভোমণ্ডল দৈনিক একবার পৃথিবীকে চক্রাকারে প্রদক্ষিণ করে' এই দুটি বিবৃতির ভিতর কোনো পার্থক্য নেই। বিবৃতি দুটি নির্ভুলভাবে একই তথ্য প্রকাশ করে। একটি দৈর্ঘ্যকে ছয় ফুট কিংবা দু'গজ বলার মতোই আগের বিবৃতি দুটিতে প্রকাশিত হয়েছে ঠিক একই তথ্য। দশমিক মুদ্রায় হিসাব রাখা যেরকম সহজ ঠিক

তেমনি পৃথিবীর বদলে সূর্যকে স্থিররূপে গ্রহণ করলে জ্যোতির্বিজ্ঞান সহজ হয়। কিন্তু কোপার্নিকাস সম্পর্কে এর বেশি বললে পরম গতি (absolute motion) অনুমান করতে হয়। সে অনুমান অলীক। সমস্ত গতি আপেক্ষিক। একটি বস্তুপিণ্ডকে স্থিররূপে গ্রহণ করা চলিত প্রথা মাত্র। এই রকম সমস্ত প্রথা একরকম বিধিসম্মত। অবশ্য সমস্ত প্রথা একরকম সুবিধাজনক নয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞান শুধুমাত্র দৃষ্টিশক্তির উপর নির্ভর করে। এই জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে জাগতিক পদার্থবিদ্যার (terrestrial physics) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আর একটি পার্থক্য রয়েছে। সাধারণ চিন্তাধারা এবং প্রাচীনপন্থী পদার্থবিদ্যা উভয়েই বল (force) সম্পর্কিত ধারণা ব্যবহার করেছে। পরিচিত অনুভূতির সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার দরুন মনে হয়েছে এ ধারণা বোধগম্য। হাঁটবার সময় আমাদের মাংসপেশী সম্পর্কিত অনুভূতি হয় কিন্তু বসে থাকলে সে বোধ হয় না। যান্ত্রিক চালিকাশক্তি যখন ছিল না তখনও মানুষ গাড়িতে চড়ে যাতায়াত করতে পারত। কিন্তু তখনও, মানুষ দৃশ্যত যেরকম বল (force) প্রয়োগ করে ঘোড়াকেও সেরকম বল (force) প্রয়োগ করতে দেখত। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সকলেই জানত কাকে টানা কিংবা ঠেলা বলে, কাকে বলে আকর্ষিত হওয়া কিংবা ধাক্কা খাওয়া। বল (force)' গতিবিদ্যার স্বাভাবিক ভিত্তি হয়েছিল অত্যন্ত পরিচিত এই তথ্যগুলি থেকে। নিউটনীয় মহাকর্ষ বিধি (Newtonian Law of Gravitation) কিন্তু একটি সঙ্কট উপস্থিত করেছিল। দুটি বিলিয়ার্ড বলের অন্তবর্তী বল (fotce) বোঝা যায়—কারণ আর একজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে কিরকম লাগে সেটা আমাদের জানা, কিন্তু পৃথিবী এবং সূর্যের দূরত্ব 93 মিলিয়ন মাইল। তাদের অন্তর্বর্তী বল ছিল রহস্যজনক। এই দূরবর্তী ক্রিয়া (action at a distance) নিউটনও অসম্ভব ভাবতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল : এযাবৎ অনাবিষ্কৃত এমন কোনো সাধনী (Mechanism) আছে যার সাহায্যে সূর্যের প্রভাব গ্রহগুলিতে প্রেরিত হয়। এরকম কোনো সাধনী (Mechanism) কিন্তু আবিষ্কার হয়নি। সুতরাং মহাকর্ষ (gravitation) ছিল একটি ধাঁধা। আসলে মহাকর্ষীয় দল (gravitational force) সম্পর্কিত সম্পূর্ণ কল্পনই ভুল। অপেক্ষবাদের মহাকর্ষীয় নিয়ম (Gravitational Law) অনুসারে সূর্য গ্রহগুলির প্রতি কোনো বলই প্রয়োগ করে না। গ্রহদের মনোযোগ শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব সান্নিধ্যের প্রতি! এর কর্মপদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হবে পরের একটি অধ্যায়ে। আপাতত 'মহাকর্ষীয় বল' সম্পর্কিত ধারণা পরিত্যাগের প্রয়োজনীয়তাই আমাদের বিবেচ্য। এ ধারণা আহরণ করা হয়েছিল স্পর্শবোধ থেকে উদ্ভূত ভুল কল্পন থেকে।

পদার্থবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে ক্রমশঃই বেশি করে দেখা গিয়েছে : পদার্থ সম্পর্কে মূলগত ধারণার উৎস হিসাবে স্পর্শের চাইতে দৃষ্টি, ভুল পথের নিশানা দেয়া অনেক কম। বিলিয়ার্ড বলের সংঘর্ষের আপাতদৃষ্ট সারল্য শুধুই মায়া। আসলে দুটি বিলিয়ার্ড বল কখনোই স্পর্শ করে না। যা ঘটে সেটা অকল্পনীয় জটিল, এর সঙ্গে সাধারণ বুদ্ধিকৃত অনুমানের চাইতে ধূমকেতুর সৌরমণ্ডলে প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের সময় যা ঘটে তার সাদৃশ্য বেশি।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যা বলেছি অপেক্ষবাদ আবিষ্কারের আগেই পদার্থবিদরা তা সমস্ত উপলব্ধি করেছিলেন। গতি যে শুধুমাত্র একটি অপেক্ষিক পরিঘটনা ও কথা সাধারণত মেনে নেওয়া হতো। অর্থাৎ দুটি বস্তুপিণ্ড যখন তাদের অপেক্ষিক অবস্থান (relative position) পরিবর্তন করে তখন একটি স্থিতিশীল, অপরটি চলমান একথা আমরা বলতে পারি না। কারণ ঘটনাটি শুধুমাত্র তাদের অপেক্ষিক অবস্থানের পরিবর্তন। কিন্তু পদার্থবিদ্যার বাস্তব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এই নতুন বিশ্বাসের সামঞ্জস্য বিধান করতে অনেক পরিশ্রম প্রয়োজন হয়েছিল। মহাকর্ষীয় বল এবং পরম স্থান এবং কাল সম্পর্কীয় ধারণা (absolute space & time) ছিল প্রাচীন পদার্থবিদ্যার প্রয়োগপদ্ধতির অঙ্গীভূত। প্রয়োজন হয়েছিল প্রাচীন অনুমান থেকে মুক্ত একটি নতুন প্রয়োগবিদ্যার। এ কার্য করতে হলে স্থান (space) এবং কাল (time) সম্পর্কীয় প্রাচীন ধারণার মূলগত পরিবর্তন করতে হতো। কিন্তু ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার আগে কিছু প্রাথমিক আলোচনা আবশ্যিক। সেই বিষয় নিয়েই এর পরের দুটি অধ্যায়।

২

কি ঘটে এবং কি পর্যবেক্ষণ করা হয়

এক ধরনের উঁচুদরের মানুষ জোরের সঙ্গে 'সবই আপেক্ষিক' বলতে ভালবাসেন। কথাটা একেবারেরই অর্থহীন। কারণ, সবই যদি আপেক্ষিক হতো তাহলে আপেক্ষিক সম্পর্ক স্থাপন করার মতো কিছু থাকত না। অধিবিদ্যক অসাধ্যের (metaphysical absurditiies) ভিতর না গিয়েও কিন্তু বলা যায় যে ভৌত জগতের সবকিছুই একজন পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ আপেক্ষিক (relative to an observer)। এ দৃষ্টিভঙ্গি সত্য কিংবা মিথ্যা যাই হোক না কেন 'অপেক্ষবাদ' (theory of relativity) কিন্তু এ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেনি। নামটার হয়তো ভাগ্য খারাপ। এ নাম দার্শনিকদের এবং অশিক্ষিত লোকদের গোলমালে ফেলেছে। যারা কল্পনা করেন নতুন তত্ত্ব প্রমাণ করেছে ভৌতজগতের সবকিছুই আপেক্ষিক।

অথচ ও তত্ত্বের একমাত্র প্রচেষ্টা-যা আপেক্ষিক সেটা বাদ দিয়ে ভৌতবিধি সম্পর্কে এমন জ্ঞাপনীতে (statement) পৌছানো যে জ্ঞাপনী কোনোক্রমেই পর্যবেক্ষকের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করবে না। দেখা গিয়েছে পর্যবেক্ষক যা দেখতে পান তার উপরে এই সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব আগে যা ভাবা গিয়েছিল তার চাইতে বেশি। একথা সত্য হলেও পারিপার্শ্বিকের এই ক্রিয়া কি করে সংশোধন দূর করা যায় অপেক্ষাবাদ সেটাই দেখায়। এ তত্ত্বে বিস্ময়কর যা কিছু আছে এটাই তার উৎস।

এককরূপে কল্পিত একটি ঘটনা যখন দুজন পর্যবেক্ষক অনুভব করেন তখন তাঁদের অনুভূতির ভিতর কিছু মিল থাকে আবার কিছু অমিলও থাকে। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে এ পার্থক্য ঢাকা পড়ে। কারণ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে সর্বক্ষেত্রেই এ পার্থক্য গুরুত্বহীন। কিন্তু পদার্থবিদ্যা এবং মনস্তত্ত্ব তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটি ঘটনা সম্পর্কে একের অনুভূতির সঙ্গে অপরের অনুভূতির পার্থক্যের উপর জোর দিতে বাধ্য হয়। এই পার্থক্যগুলির খানিকটা কারণ পর্যবেক্ষকদের মস্তিষ্কের পার্থক্য, খানিকটার কারণ তাদের বোধেন্দ্রিয়ের পার্থক্য এবং খানিকটার কারণ ভৌত পরিস্থিতির পার্থক্য, এই তিন প্রকার পার্থক্যের নাম দেওয়া যেতে পারে—মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য, শারীরবিদ্যাভিত্তিক পার্থক্য এবং ভৌত পার্থক্য। আমাদের জানিত কোনো ভাষায় যদি কোনো মন্তব্য করা হয় তাহলে সেটা শোনা যাবে, কিন্তু একই রকম উচ্চগ্রামের মন্তব্য অজানা ভাষায় করা হলে হয়তো একেবারেই গ্রাহ্য করা হবে না। আল্পস্ পর্বতে দুজন ভ্রমণকারীর একজন দৃশ্যের সৌন্দর্য উপভোগ করেন, অন্যজন বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য জলপ্রপাত লক্ষ্য করেন। এ পার্থক্য মনস্তাত্ত্বিক। হ্রস্বদৃষ্টি-সম্পন্ন (short-sighted) এবং দীর্ঘদৃষ্টি সম্পন্ন (long sighted) লোকদের ভিতরের পার্থক্য কিংবা বধির ব্যক্তি এবং শ্রুতিশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিদের ভিতরের পার্থক্য শারীরবিদ্যাভিত্তিক, এই দুরকম পার্থক্যের কোনোটি নিয়েই আমার মাথা ব্যথা নেই। এগুলির প্রসঙ্গ বাদ দেওয়ার জন্যই শুধু আমি এগুলি উল্লেখ করেছি। শুদ্ধ ভৌতিক পার্থক্য নিয়েই আমাদের বিচার। পর্যবেক্ষণের স্থানে যদি ক্যামেরা কিংবা রেকর্ড করার যন্ত্র (recording macchine) প্রতিস্থাপন করা যায় এবং ফিল্ম কিংবা গ্রামোফোনে সেগুলি পুনরুৎপাদন করা যায় তাহলে দুজন পর্যবেক্ষকের ভিতরকার ভৌত পার্থক্য রক্ষিত হবে। দুই ব্যক্তি যদি তৃতীয় এক ব্যক্তির কথা বলা শোনে এবং তাদের ভিতরে একজন যদি অন্যজনের তুলনায় বক্তার নিকটতর হয় তাহলে নিকটতর ব্যক্তি অপরের তুলনায় উচ্চগ্রামে শুনবে এবং সামান্য আগে শুনবে। দুই ব্যক্তি যদি

একটি গাছ পড়তে দেখে তাহলে তারা দেখবে ভিন্ন ভিন্ন কোণ থেকে। এই দুরকম পার্থক্য নথিভুক্ত করার যন্ত্রে সমভাবে দেখা যাবে। পর্যবেক্ষকদের বৈশিষ্ট্য কোনোক্রমেই এ পার্থক্যের কারণ হতে পারে না। এ পার্থক্য আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ ভৌত প্রকৃতি প্রবাহের অংশ।

সাধারণ মানুষের মতো পদার্থবিদ্যাবিদরাও বিশ্বাস করেন : তাঁদের অনুভূতি শুধু তাঁদের নিজস্ব একান্ত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জ্ঞান দান করে তাই নয়, ভৌত জগতে বাস্তবে যা ঘটেছে, অনুভূতি (perceptions) সে সম্পর্কেও তাঁদের জ্ঞান দান করে। পেশাগতভাবে তাঁরা ভৌত জগৎকে বাস্তব (real) মনে করেন শুধুমাত্র মানুষের স্বপ্নভিত্তিক কিছু ভাবেন না। উদাহারণ : উপযুক্ত অবস্থান থেকে যে কোনো ব্যক্তি সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করতে পারে এবং এই উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত ফটোগ্রাফের প্লেটও পর্যবেক্ষণ করতে পারে। যারা সূর্য কিংবা তার ফটো দেখেছে তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়াও বাস্তবে আরো কিছু ঘটেছে, পদার্থবিদ্যাবিদরা একথা বিশ্বাস করেন। স্বতঃপ্রতীয়মান মনে হলেও এ বিষয়ে আমি জোর দিয়েছি। তার কারণ অনেকে মনে করেন অপেক্ষবাদ এ বিষয়ে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। আসলে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করেনি।

কিন্তু একই ভৌত ঘটনা কিছু সংখ্যক লোক পর্যবেক্ষণ করতে পারে, পদার্থবিদ্যাবিদদের এ বিশ্বাসের যদি কোনো যৌক্তিকতা থাকে তাহলে ঘটনার যে অবয়বগুলি সমস্ত পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ 'সমরূপ' পদার্থবিদ্যাবিদ সেগুলি নিয়েই কারবার করবেন : এ তথ্য স্পষ্ট। কারণ, অন্য অবয়বগুলি ঘটনার সঙ্গে স্বতত সংযুক্ত এরকম বিচার চলে না। যে সমস্ত' একই রকম উত্তম' পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ সমরূপ' বস্তুত তারই ভিতর পদার্থবিদ্যাবিদদের সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। যে সমস্ত পর্যবেক্ষক অনুবীক্ষণ যন্ত্র কিংবা দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করেন। তার কারণ পথমোক্তরা যা দেখতে পান না, তাঁদের যাঁরা এগুলি ব্যবহার করেন। তার কারণ পথমোক্তরা যা দেখতে পান না, শেষোক্তরা সেগুলি দেখতে পান এবং দেখতে পান তার চাইতে বেশি আরো কিছু। সুবেদী (sensitive) ফটোগ্রাফিক প্লেট হয়তো তারও বেশি 'দেখতে' পায়। তখন যে কোনো চোখের চাইতে সেগুলিকে বেশি পছন্দ করা হয়। কিন্তু দর্শনানুপাতে (perspective) পার্থক্য কিংবা দূরত্বের ক্ষীণতার দরুণ আকারের বৈসাদৃশ্য ইত্যাদি সেই সেই বস্তুতে আরোপ করা যায় না। এগুলির জন্য দায়ী শুধুমাত্র দ্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গি। বস্তু বিচারকালে সাধারণ বুদ্ধি এ বৈসাদৃশ্যগুলিকে পরিত্যাগ করে। একই পদ্ধতিকে পদার্থবিদ্যা আরো অনেক দূর অবধি এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু মূল নীতি অভিন্ন।

আমি পরিষ্কার বলতে চাই : যাকে যথাযথ বলা যায় না সেরকম কোনো বিষয় নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আমার বিচার এমন কতকগুলি সঙ্ঘটনের (occurrences) সত্যকারের ভৌত পার্থক্য নিয়ে, যেগুলির প্রতিটি একটি বিশেষ ঘটনার নির্ভুল সাক্ষ্য। এ বিচার আমি করতে চাই ঘটনার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। একটা কামান যখন দাগা হয়, তখন যারা খুব কাছে না থাকে তারা আগে দেখতে পায় আলোর ঝলক, পরে শুনতে পায় আওয়াজ। তাদের বোধেন্দ্রিয়ের কোনো দোষ এ ঘটনার জন্য দায়ী নয়। এর কারণ শব্দের গতি আলোর গতির তুলনায় মন্থর। আলোর গতি এত দ্রুত যে, ভূ-পৃষ্ঠের অধিকাংশ পরিঘটনার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোক চলাচলকে তাৎক্ষণিক মনে করা যেতে পারে। পৃথিবীতে ঘটমান যা কিছু আমরা দেখতে পাই কার্যত সে সমস্তই ঘটে আমরা যে মুহূর্তে সেগুলি দেখতে পাই সেই মুহূর্তে। আলোকের গতি সেকেন্ডে ৩,০০,০০০ কিলোমিটার (প্রায় ১,৮৬,০০০ মাইল)। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসতে আলোকের প্রায় ৮ মিনিট সময় লাগে আর তারাগুলি থেকে আসতে সময় লাগে ৪ থেকে কয়েক হাজার মিলিয়ন বছর পর্যন্ত। আমরা অবশ্য, সূর্যে একটা ঘড়ি বসিয়ে সেখান থেকে গ্রিনউইচ মধ্যক সময় (Greenwich Mean Times) ১২ টাতে আলোর ঝলক পাঠিয়ে গ্রিনউইচে সেই আলোর ঝলককে ১২টা ৮ মিনিটে ধরতে পারি না। আলোকের দ্রুতি নির্ধারণে আমাদের পদ্ধতি শব্দের ক্ষেত্রে প্রতিধ্বনি ব্যবহারের মতো। আমরা আলোকচ্ছটা (flash of light) আয়নার দিকে পাঠাতে পারি এবং পর্যবেক্ষণ করতে পারি প্রতিফলনের আমাদের কাছে আসতে কত সময় লাগে। তাহলে আমরা পাই আয়না অবধি যাতায়াতের সময় অর্থাৎ ভ্রমণকালের দ্বিগুণ। আয়নার দূরত্ব যদি মাপা যায় তাহলে আলোকের দ্রুতিও (speed) গণনা করা সম্ভব।

কাল মাপনের পদ্ধতি আজকাল এত নির্ভুল (precise) যে এ পদ্ধতি এখন ব্যবহার করা হয় দূরত্ব নির্ধারণের জন্য—আলোকের দ্রুতি মাপনের জন্য নয়। ১৮৯৩ সালের একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসারে 'এক সেকেন্ডের ১,২৯৯৭৯২৪৫৮ সেকেন্ডে শূন্যস্থানে আলোক যে পথ অতিক্রম করে সেটাই এক মিটার।' পদার্থবিদ্যাবিদদের দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোকের দ্রুতি এখন রূপান্তর গুণকে (conversion factor) পরিণত হয়েছে। ঠিক যেমন গুণক ০.৯১৪৪ ব্যবহার করা হয় গজ-হিসাবে দূরত্বকে মিটার হিসাবে-দূরত্বে রূপান্তরিত করার জন্য তেমনি আলোকের দ্রুতিতে ব্যবহার করা হয় দূরত্বকে সময়ে রূপান্তরিত করার জন্য। যা আট মিনিট দূরে কিংবা নিকটতম বাস স্টপ ১ সেকেন্ডের ১০ লক্ষ ভাগ দূরে এ সমস্ত কথাই আজকাল নির্ভুল অর্থবহ।

দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গি অনুমোদন এমন একটি সমস্যা, যে সম্পর্কে পদার্থবিদ্যা [illegible] সম্পূর্ণ সনচেতন : একথা বলা যেতে পারে। আসলে কোপার্নিকাসের [illegible] থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে (astronomy) এই সমস্যা প্রাধান্য বিস্তার করেছে [illegible] সত্য। কিন্তু অনেক সময় ফল সম্পূর্ণ আহরণের আগেই নীতিগুলি গৃহীত [illegible]। [illegible]দও তত্ত্বের দিক দিয়ে এ নীতি সমস্ত পদার্থবিদ্যাবিদই মেনে নিয়েছিলেন [illegible] চিরায়ত পদার্থবিদ্যার অনেকাংশের সঙ্গে এই নীতির সঙ্গতি ছিল না।

[illegible]গুচ্ছ বিধান (rule) ছিল। সেগুলি ছিল দার্শনিক মনোভাবাপন্নদের [illegible] কারণ। প্রয়োগক্ষেত্রে কিন্তু এগুলি ছিল কার্যকর। সুতরাং [illegible]দ্যাবিদরা বিধানগুলি মেনে নিতেন। লক্ (Locke) 'অপ্রধান' গুণগুলিকে [illegible]ndary qualities) ব্যক্তিনিষ্ঠ (subjective) গুণ আখ্যা দিয়ে পৃথক [illegible]ছলেন, যেমন : রঙ (colour) কোলাহল (noise) স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদি। [illegible]কে আকার (shape) অবস্থান (position) এবং আয়তনকে (size) [illegible]ছলেন প্রধান গুণ (primary quality)। তাঁর মতে এগুলি ভৌত বস্তুর [illegible] ধর্ম। পদার্থবিদ্যাবিদ্দের বিধানগুলি ছিল এই মতবাদের ফলস্বরূপ। রঙ [illegible] কোলাহল ব্যক্তিনিষ্ঠ হওয়ার অনুমোদন পেল কিন্তু তার কারণ ছিল নির্দিষ্ট [illegible] গতিতে চলমান তরঙ্গ। ক্ষেত্র অনুসারে শব্দ কিংবা আলোকতরঙ্গ উৎস [illegible] বোদ্ধা (percpien) পর্যন্ত চলমান। বাহ্যত ঃ প্রতীয়মান আকারের পরিবর্তন [illegible] দর্শনানুপাতের বিধি (law of perspective) অনুসারে। এ বিধিগুলি কিন্তু [illegible] ফলে বাহ্যত ঃ প্রতীয়মান কয়েকটি চাক্ষুষ আকার থেকে বাস্তব (real) [illegible] অনুধাবন করা সহজ। তাছাড়া বস্তুপিণ্ডগুলি নিকটস্থ হলে স্পর্শের [illegible]মাণেও 'বাস্তব' আকার নির্ণয় করা যায়। আমাদের বোধের কাল এবং প্রেরণার [illegible] (velocity of transmission) বিচার করে একটি ভৌত ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ [illegible] নির্ণয় করা সম্ভব। পরিস্থিতি অনুসারে প্রেরণের গতি হতে পারে আলোকের, [illegible] কিংবা স্নায়ুবিক প্রবাহের (current)। পেশাবহির্ভূত সময়ে তাদের বিবেক [illegible] যে রকমই হোক না কেন, কার্যক্ষেত্রে পদার্থবিদ্যাবিদরা এই দৃষ্টিভঙ্গিই [illegible] করতেন।

[illegible]তদিন পর্যন্ত পদার্থবিদ্যাবিদরা ভূ-পৃষ্ঠে প্রচলিত গতির তুলনায় অতি বৃহৎ [illegible] নিয়ে কাজ না করেছেন ততদিন পর্যন্ত এ দৃষ্টিভঙ্গিতে ভালই কাজ চলেছে। [illegible] এক্সপ্রেস ট্রেন মিনিটে দু-মাইল যায়, একটি গ্রহ যায় সেকেন্ডে কয়েক [illegible]। সূর্যের কাছে থাকলে ধূমকেতুগুলি অনেক বেশি দ্রুতগামী কিন্তু [illegible]ভাবে আকারের পরিবর্তন হওয়ার দরুণ খুব নির্ভুলভাবে তাদের অবস্থান

নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কার্যক্ষেত্রে, ঠিকভাবে গতিবিদ্যা প্রয়োগ করা বস্তুপিণ্ডগুলির ভিতরে গ্রহই ছিল সবচাইতে দ্রুতগামী। তেজস্ক্রিয়তা, মহাজাগতিক রশ্মি আবিষ্কার এবং অধুনা উচ্চশক্তিসম্পন্ন ত্বরণ যন্ত্র (accelerating machine) আবিষ্কারের ফলে পর্যবেক্ষণকে নতুন অঞ্চলে (new range) প্রসার করা সম্ভব হয়েছে। একক ঊনপারমাণবিক বস্তুকণা এখন পর্যবেক্ষণ করা যায়। তাদের গতি আলোকের গতির চাইতে খুব কম নয়। প্রাচীন তত্ত্বগুলি প্রত্যাশ্যার পথিকৃৎ এই বিরাট দ্রুতিতে চলমান বস্তুপিণ্ডগুলির আচরণ নয়। একটা ব্যাপার : দ্রুতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নির্ভুল, নিশ্চিত, নির্দিষ্টভাবে পায়। অতিদ্রুত চলমান একটি ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, : তার একটি নির্দিষ্ট বলের ক্রিয়া স্বল্প গতিসম্পপন্ন অবস্থার তুলনায় বেশি বেগের অবস্থায় কম। একটি বস্তুপিণ্ডের আয়তন তার গতি দ্বারা প্রভাবিত হয় চিন্তনের যুক্তি খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। উদাহরণ : একটি ঘনককে (cube) আপনি অতি দ্রুত চালনা করেন তাহলে তার সঙ্গে চলমান নয়—এরকম সাপেক্ষ ঘনকটির দৈর্ঘ্য গতির অভিমুখে হ্রস্বতর হবে। কিন্তু তার নিজের দিক থেকে (অর্থাৎ ঘনকের সঙ্গে চলমান পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ) ঘনকটি একই থাকবে। আরো বিস্ময়কর আবিষ্কার ছিল : কালাতিপাত (lapse of time) এর উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ দুটি সম্পূর্ণ নির্ভুল ঘড়ির একটি যদি অন্যটি সাপেক্ষে চলমান হয় এবং ভ্রমণ সমাপ্ত করে ঘড়ি দুটি যদি আবার একত্রিত হয় তা তারা একই সময় প্রদর্শন করবে না। এ অভিক্রিয়া (effect) এত ক্ষুদ্র যে এ পরীক্ষা করা যায়নি। কিন্তু আন্তঃতারকা ভ্রমণ বিকাশে যদি আমরা কখনো লাভ করি তাহলে এ তথ্য পরীক্ষা সম্ভভ হবে। কারণ তখন আমরা দাবি করতে পারব যে যাকে এই কাল শ্লথন (time dilatation)বলা হয়-সেটা বোধগম্য হবে।

কাল শ্লথনের কয়েকটি প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য রয়েছে কিন্তু সে সাক্ষ্য পাওয়া একটু অন্যভাবে। এ সাক্ষ্য আসে মহাজাগতিক (cosmic) রশ্মি থেকে। এ রশ্মিগুলি নানারকম পারমাণবিক বস্তুকণা দিয়ে গঠিত। যখন বায়ুমণ্ডলের ভিতরে এদের গতি অত্যন্ত দ্রুত। এর ভিতরে মেসন (Meson) কতগুলি কণা উড়ন্ত অবস্থায় বহুভাগে ভেঙে যায়। এই বিভাজন পর্যবেক্ষণ সম্ভব। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে মেসনের গতি যত দ্রুত তার বিভাজন সময় লাগে তত বেশি। এই ধরনের পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত : যাকে ব্যক্তিনিরপেক্ষ বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা বলে মনে করতাম, ঘড়ি এবং

আলোচনা করা সেই আবিষ্কারগুলিও আংশিকভাবে আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত নিরীক্ষণের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ নির্ভরশীল পরিমাপ করা বস্তুপিণ্ড সাপেক্ষ আমাদের গতির চরিত্রের উপর।

এ থেকে বোঝা যায়, কতটা পর্যবেক্ষকের অধিকারে এবং কতটা যে ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে তার অধিকারে—এ সম্পর্কে প্রচলিত সীমারেখার বদলে ভিন্ন একটি সীমারেখা আঁকতে হবে। নীল চশমা পরলে আপনি বুঝতে পারেন, আপনার দেখা সবকিছুর নীল রঙের কারণ ঐ চশমা। আপনি যা দেখছেন রঙটা তার অংশ নয়। আপনি যদি দুটি বিদ্যুৎচমক পর্যবেক্ষণ করেন, আপনার পর্যবেক্ষণ দুটির অন্তবর্তী সময় যদি আপনার জানা থাকে, বিদ্যুৎচমকের স্থানগুলি যদি আপনি জানেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে আলোকের আপনার কাছে আসতে কতটা সময় লাগে সেটা যদি বিচারের ভিতর গ্রহণ করেন, আপনার কালমাপক যন্ত্র যদি নির্ভুল হয়, তাহলে যে ক্ষেত্রে দুটি বিদ্যুৎচমকের অন্তবর্তীকাল আপনি আবিষ্কার করেছেন, একথা আপনার পক্ষে ভাবা স্বাভাবিক। তাছাড়া এও ভাবতে পারেন এ আবিষ্কার আপনার একান্ত ব্যক্তিগত কিছু নয়। অন্যান্য যে সমস্ত সতর্ক পর্যবেক্ষকের সংবাদ আপনার জানা সম্ভব, তাঁরা যদি আপনার অনুমানের সঙ্গে একমত হন, তাহলে এই দৃষ্টিভঙ্গি আপনার কাছে সত্য বলে প্রতিপন্ন হবে। আসলে এর কারণ, আপনারা সবাই পৃথিবীবাসী এবং পৃথিবীর গতির অংশীদার। এমনকি বিপরীত অভিমুখগামী দুটি মহাকাশযানে অবস্থিত দুজন পর্যবেক্ষকের আপেক্ষিক বেগ (relative velocity) হবে ঘণ্টায় প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার মাইল। সেকেন্ডে ১,৮৬.০০০ (আলোকের বেগ) মাইলের তুলনায় এ বেগ অতি অল্প। সেকেন্ডে ১,৭০.০০০ মাইল বেগসম্পন্ন একটি ইলেকট্রন দুটি চমকের অন্তবর্তীকাল মাপলে, আলোকের বেগ গণনার ভিতর গ্রহণ করেও তার অনুমান হতো সম্পূর্ণ পৃথক। পাঠক জিজ্ঞাসা করতে পারেন : আপনি কি করে জানলেন? আপনি ইলেকট্রন নন, এই রকম ভয়ঙ্কর দ্রুত আপনি চলতে পারেন না, আপনার বিবৃতির সত্যতা প্রমাণ করার জন্য কোনো বৈজ্ঞানিকও পর্যবেক্ষণ করেননি। তা সত্ত্বেও এই দৃঢ় ঘোষণার সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে এবং পরের অংশে সে যুক্তি আমরা দেখব। প্রথম যুক্তি পরীক্ষাভিত্তিক, দ্বিতীয়টি তাত্ত্বিক। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার: এ যুক্তির ভিত্তি যে কোনো সময়েই করা যেত কিন্তু সেদিন পর্যন্ত পরীক্ষায় না দেখা গিয়েছে যে আগেকার যুক্তি নিশ্চয়ই ভুল ততদিন পর্যন্ত সে ভিত্তি তৈরি হয়নি।

অপেক্ষবাদের আবেদন একটি সাধারণ নীতির কাছে। দেখা গিয়েছে যে, কোনো লোকের অনুমানের চাইতে সে নীতি বেশি ক্ষমতাশালী। আপনি যদি

জানেন, এক ব্যক্তি অন্য একজনের চাইতে দ্বিগুণ ধনী তাহলে তাদের সম্পদ পাউন্ড, ডলার, ফ্রাঁ কিংবা অন্য যে কোনো মুদ্রায়ই মাপুন না, কেন ব্যাপারটা একই রকম দেখাবে। সম্পদের পরিমাণজ্ঞাপক রাশির পরিবর্তন হবে, কিন্তু দুটো রাশি সব সময়ই হবে অন্যটির দ্বিগুণ পদার্থবিদ্যায় হয়েছে একই রকম ব্যাপারের পুনরাবির্ভাব তবে আরো জটিলভাবে। যে কোনো গতিই আপেক্ষিক সুতরাং আপনি যে কোনো বস্তুপিণ্ডকেই প্রমাণ নির্দেশক বস্তুপিণ্ডরূপে (standard bodies of reference) গ্রহণ করে সমস্ত গতিকে সেই বস্তুপিণ্ড সাপেক্ষ গণনা করতে পারেন। আপনি যদি একটি ট্রেনে থাকেন এবং খাবার ঘরে হেঁটে যান তাহলে স্বাভাবিক কারণেই আপনি ট্রেনটাকে স্থির ভাবেন এবং আপনার গতি মাপেন ট্রেন সাপেক্ষ। কিন্তু আপনি যখন নিজের ভ্রমণের কথা চিন্তা করেন তখন আপনার বিচারে পৃথিবীটা স্থির। সে সময় বলেন-আপনি চলেছেন ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে। যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীর চিন্তন সৌরতন্ত্র নিয়ে তাঁর বিচারে সূর্য স্থির এবং আপনি আবর্তনশীল (rotating) এবং ঘূর্ণায়ন (revolving)। এই গতির তুলনায় ট্রেনের গতি এত ধীর যে হিসাবেই আসতে চায় না। তারকীয় মহাবিশ্বে যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীর আকর্ষণ তিনি হয়তো এর সঙ্গে তারকার গড় গতি সাপেক্ষ সূর্যের গতি যোগ করবেন। আপনার গতি নির্ধারণের এই পদ্ধতিগুলির ভিতরে একটির চাইতে অন্যটি বেশি নির্ভুল, একথা আপনি বলতে পারেন না। নির্দেশবস্তুগুলি যখনই আরোপিত হয় তখন প্রতিটি পদ্ধতিই বিশুদ্ধ নির্ভুল। অন্য সম্পদের সাপেক্ষে সম্পর্কের পরিবর্তন না করেও আপনি যেমন একটি সম্পদ বিভিন্ন মুদ্রায় গণনা করতে পারেন তেমনি বিভিন্ন নির্দেশ বস্তুপিণ্ডের সাহায্যে একটি বস্তুপিণ্ডের গতি নির্ধারণ করতে পারেন। এর ফলে সেই গতির সঙ্গে অন্য গতির সম্পর্কের কোনো পরিবর্তন হবে না। পদার্থবিদ্যার চিন্তনের সবটাই সর্ম্পক নিয়ে সুতরাং সংশ্লিষ্ট যে কোনো একটি বস্তুপিণ্ডকে প্রমাণ মাপক (standard রূপে গ্রহণ করে সমস্ত বস্তুপিণ্ডকে সেই মাপক সাপেক্ষ বিচার করে সম্পূর্ণ ভৌতবিধি প্রকাশ করা নিশ্চয়ই সম্ভব।

ব্যাপারটা অন্যভাবেও বলা যেতে পারে। পদার্থবিদ্যার উদ্দেশ্য ভৌতজগতে বাস্তবে কি ঘটেছে সে সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া। শুধুমাত্র একাধিক বিভিন্ন পর্যবেক্ষকের একান্ত (privarte) অনুভূতি সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া পদার্থবিদ্যার উদ্দেশ্য নয়। সুতরায় পদার্থবিদ্যার অবশ্যই ভৌত পদ্ধতির সেই সমস্ত অংশ নিয়ে চিন্তা করতে হবে যে অবয়বগুলি সমস্ত পর্যবেক্ষকের ক্ষেত্রেই সমভাবে কারণ একমাত্র সেই অবয়বগুলিকেই ভৌতঘটনার নিজস্ব বলে ভাবা যেতে পারে।

...আলা প্রয়োজন , সে ঘটনা একজন পর্যবেক্ষকের কাছে কি রকম দেখায় কিংবা ...ারের কাছে কি রকম দেখায় সে তথ্য নির্বিশেষে পরিঘটনা সম্পর্কীয় বিধিগুলির ...া হওয়া। এই একটিমাত্র নীতিই সমগ্র অপেক্ষবাদের উদ্দেশ্য এবং এই ...শাই অপেক্ষবাদের জনক।

...তদিন পর্যন্ত আমরা যেগুলিকে ভৌতঘটনার স্থানিক এবং কালিক ধর্ম ...াম এখন দেখা যাচ্ছে সেটা অনেকাংশে নির্ভর করে পর্যবেক্ষকের উপর। ...যমান অবশিষ্ট অংশকেই ঘটনার নিজস্ব গুণ বলা যেতে পারে। যে ভৌতবিধির ...া হওয়া সম্ভাবনা পূর্বত সিদ্ধ (a prion), সে বিধিগুলি গঠনে শুধুমাত্র এই ...শার অংশই জড়িত হতে পারে। আইনস্টাইন হাতের কাছে শুদ্ধ গণিতের এই ...শার অংশই জড়িত হতে পারে। আইনস্টাইন হাতের কাছে শুদ্ধ গণিতের ...কটি সাধনী (instrument) পেয়েছিলেন, তার নাম টেন্সর (Tensor) তত্ত্ব। সে ...র সঙ্গে প্রাচীন বিধির আসন্ন (approximate) ঐক্য থাকবে। সে সব ক্ষেত্রে ...পক্ষবাদের ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে প্রাচীন বিধির পার্থক্য, সে সব ক্ষেত্রে ...পক্ষবাদের ভবিষ্যদ্বানীর সঙ্গে পর্যবেক্ষণের ঐক্য বেশি। এ তথ্য ইদানীংকাল ...ই প্রমাণিত হয়েছে।

...ভৌত জগতে যদি বাস্তবতা কিছু না থাকত, শুধুমাত্র যদি থাকত কিছু লোকের ...া কয়েকটি স্বপ্ন তাহলে একজনের স্বপ্নের সঙ্গে আর একজনের স্বপ্ন সংযুক্ত ...া কোনো বিধি আমাদের আশা করা উচিত হতো না। এক ব্যক্তির অনুভূতির ...ে অন্য ব্যক্তির অনুভূতির মোটামুটি তাৎক্ষণিক ঘনিষ্ঠ সর্ম্পক, বিভিন্ন অনুভূতির ...াধারণ বাহ্যিক উৎপত্তি সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস সৃষ্টি করে। আমরা যাকে একই ...া বলি সে সম্পর্কে পদার্থবিদ্যা বিভিন্ন ব্যক্তির অনুভূতির ঐক্য এবং অনৈক্যের ...রণ প্রদর্শন করে। এ কাজ করতে গেলে পদার্থবিদ্যাবিদদের প্রথম প্রয়োজন ...কাগুলি ঠিক কি সেটা নির্ধারণ করা। সেগুলি ঠিক ঐতিহ্যগত অনুমান নয়। ...রণ এককভাবে স্থান কিংবা কালকে সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ বলে গ্রহণ করা যায় না। ...ুমাণ বলা যায় 'স্থান-কালের' এক ধরনের মিশ্রণকে। এর ব্যাখ্যা সহজ নয় ...ু চেষ্টা করতেই হবে। সে চেষ্টা শুরু হবে পরের অধ্যায়ে।

৩

আলোকের বেগ

অপেক্ষবাদের অধিকাংশ অদ্ভূত ব্যাপারই আলোকের বেগের সঙ্গে জড়িত। যে সমস্ত কারণে প্রাচীনতন্ত্র ভেঙে পড়েছে সে সম্পর্কে খানিকটা ধারণা থাকলে পাঠক এই গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক পুনর্গঠনের কারণ বুঝতে পারবেন না।

আলোক নির্দিষ্ট নিশ্চিত বেগে প্রেরিত হয় এ তথ্য প্রথম প্রমাণিত হয়েছে জ্যোতিষীয় (astronomical) পর্যবেক্ষণের সাহায্যে বৃহস্পতি গ্রহের চন্দ্রগুলো অনেক সময় বৃহস্পতি নিজেই গ্রহণ সৃষ্টি করে। এ ঘটনার সম্ভাব্যকাল গণনা করা সহজ। দেখা গিয়েছিল, বৃহস্পতি যখন পৃথিবীর কাছাকাছি তখন একটি চন্দ্রের গ্রহণ দেখা যাবে প্রত্যাশিত সময়ের কয়েক মিনিট আগে, আর বৃহস্পতি যখন দূরে তখন সেই গ্রহণ দেখা যাবে প্রত্যাশিত সময়ের কয়েক মিনিট পর। দেখা গেল আলোকের একটি বিশেষ বেগ রয়েছে : এই অনুমানের ভিত্তিতে এই সমস্ত বিচ্যুতি ব্যাখ্যা করা যায়। অর্থাৎ বৃহস্পতিতে ঘটমান যা কিছু আমরা লক্ষ্য করি সেগুলি ঘটেছে কিছুক্ষণ আগে। বৃহস্পতি যখন কাছে তখনকার তুলনায় বৃহস্পতি যখন দূরে তখন একটু বেশি সময় আগে ঘটনাগুলি ঘটেছে। দেখা গেল সৌরজগতের অন্যান্য অংশ বিষয়ে সমরূপ ঘটনার ব্যাখ্যাও আলোকের এই বেগের সাহায্যে করা সম্ভব। সুতরাং মেনে নেওয়া হল, শূন্যস্থানে আলোক সব সময়ই একটি নির্দিষ্ট বেগে চলে। সে বেগ সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার (এক কিলোমিটার = এক মাইলের আট ভাগের প্রায় পাঁচ ভাগ)। এ রাশি প্রায় নির্ভুল। তরঙ্গ দিয়ে আলোক গঠিত এ তথ্য যখন প্রতিষ্ঠিত হল তখন এটা ছিল ইথারের তরঙ্গ বিস্তারের যুগ। তখন অন্তত তরঙ্গ ছিল ইথারে। কিন্তু এখন ইথারকে পরিত্যাগ করা হয়েছে কিন্তু তরঙ্গ রয়ে গিয়েছে। একই বেগ বেতার তরঙ্গের (এগুলি আলোকতরঙ্গের মতো শুধু দীর্ঘতর) এবং এক্সরে-র (এগুলি আলোকতরঙ্গের মতো তবে হ্রস্বতর)। এখনকার বিশ্বাস একই বেগে মহাকর্ষও বিস্তার লাভ করে (অপেক্ষবাদের আবিষ্কারের আগে ভাবা হতো মহাকর্ষের বিস্তার তাৎক্ষণিক। কিন্তু এখন এ দৃষ্টিভঙ্গি অচল)।

এ পর্যন্ত সবটাই সহজ সরল। কিন্তু নির্ভুলতর মাপন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এল সঙ্কট জমতে লাগল। অনুমান করা গিয়েছিল তরঙ্গগুলি ইথারের সুতরাং আলোর বেগও হওয়া উচিত ইথার সাপেক্ষ। কিন্তু স্পষ্টতই ইথার (যদি তার অস্তিত্ব থাকে) নভোমণ্ডলের বস্তুপিণ্ডগুলির গতিতে কোনো বাধাদান করে না। সুতরাং তারা তাদের গতিতে অংশ গ্রহণ করে না, একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক

জাহাজকে যেরকম তার সামনে অনেকটা জল ঠেলতে হয় পৃথিবীকেও যদি সেরকম ইথার ঠেলে এগোতে হতো তাহলে জাহাজকে যেরকম জল বাধা দেয় পৃথিবীর ক্ষেত্রেও সেরকম ইথারের বাধা প্রত্যাশা করা উচিত ছিল। সুতরাং সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল : মোটা ছ্যাঁদাওয়ালা ছাঁকনির ভিতর দিয়ে যেরকম বাতাস সহজেই যাতায়াত করতে পারে ইথারও সেরকম বস্তুপিণ্ডগুলির ভিতর দিয়ে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে। পার্থক্য শুধু : এ ক্ষমতা ইথারের বেশি। ব্যাপারটা যদি সত্য হয় তাহলে নিশ্চয়ই কক্ষস্থিত পৃথিবীর সঙ্গে ইথারের একটা আপেক্ষিক বেগ থাকা উচিত। এরকম যদি হতো যে, কক্ষের কোনো এক বিন্দুতে পৃথিবী নির্ভুল সমবেগে ইথারের সঙ্গে চলমান তাহলে অন্য বিন্দুতে তার চলন নিশ্চয়ই দ্রুততর হবে। আপনি যদি একটা চক্রাকার পথে ঝড়ের দিনে হাঁটেন তাহলে বাতাস যেদিক থেকেই আসুক না কেন খানিকটা পথ আপনাকে বায়ুস্রোতের বিরুদ্ধে যেতে হবে। পৃথিবী এবং ইথারের ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম। এর ফলস্বরূপ : আপনি যদি ছ'মাস ব্যবধানে দুটি দিন নির্ধারণ করেন তাহলে পৃথিবী তার কক্ষে একদিনের তুলনায় অন্যদিন নির্ভুল বিপরীত দিকে চলমান হবে। সুতরাং এর ভিতরে কোনো একদিন নিশ্চয়ই পৃথিবী ইথার স্রোতের বিরুদ্ধগামী হবে।

এখন এ তথ্য স্পষ্ট যে ইথারের স্রোত যদি থাকে এবং পৃথিবীতে যদি একজন পর্যবেক্ষক থাকে তাহলে তার মনে হবে স্রোতকে আড়াআড়িভাবে অতিক্রমের সময়ের চাইতে স্রোতের অভিমুখে গমনের সময় আলোক সঙ্কেতের গতি দ্রুততর আবার স্রোতের বিপরীতে যাওয়ার সময়ের তুলনায় স্রোতকে আড়াআড়িভাবে অতিক্রমের সময়ে আলোকসঙ্কেতের গতি দ্রুততর মনে হবে। মিচেলসন (Michelson) এবং মর্লি (Morley) তাঁদের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় এই ব্যাপারটাই জানতে চেয়েছিলেন। তাঁরা দুটি অভিমুখে দুটি আলোকসঙ্কেত পাঠিয়েছিলেন। অভিমুখ দুটি একটি অন্যটির সমকোণে। প্রতিটি সঙ্কেতই একটা আয়না থেকে প্রতিফলিত হয়ে যেখান থেকে প্রেরিত হয়েছিল সেখানেই ফিরে আসে। পরীক্ষা কিংবা সামান্য গণিতের সাহায্যে যে কোনো লোকই যাচাই করে দেখতে পারেন। একটি নদী আড়াআড়ি পেরিয়ে ফিরে আসতে যে সময় লাগে তার চাইতে একই দূরত্ব স্রোতের বিপক্ষে গিয়ে আবার ফিরে আসতে বেশি সময় লাগে। আলোকসঙ্কেতগুলি ইথার তরঙ্গ দিয়ে গঠিত। সুতরাং ইথার প্রবাহ যদি থাকত তাহলে দুটি আলোকসঙ্কেতের ভিতরের একটির আয়না গিয়ে ফিরে আসার গড় হার (average rate) অন্যটির তুলনায় মন্থরতর হতো (slower average rate)। মিচেলসন এবং মর্লি এ পরীক্ষা করেন, বিভিন্ন অবস্থান থেকে এ পরীক্ষা

করেন, পরে আবারও পরীক্ষা করেন। তাঁদের যন্ত্রপাতি যথেষ্ট নির্ভুল ছিল। [illegible] দ্রুতির প্রত্যাশিত পার্থক্য কিংবা তার চাইতে কম পার্থক্য ধরতে পারার উপযুক্ত। যদি অবশ্য কোনো পার্থক্য কিংবা তার চাইতে কম পার্থক্য ধরতে পারা উপযুক্ত—যদি অবশ্য কোনো পার্থক্য থাকত। কিন্তু ক্ষুদ্রতম পার্থক্য [illegible] পড়েনি। এই পরীক্ষার ফল তাঁদের কাছে এবং সবার কাছেই ছিল একটা [illegible] কিন্তু একাধিক সযত্ন পুনরাবৃত্তি করার ফলে সন্দেহ করা ছিল অসম্ভব। এ পরীক্ষা প্রথম করা হয় অনেক আগে— ১৮৮১ সালে। আরো বিস্তৃত ব্যবস্থাপনা [illegible] দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করা হয় ১৮৮৭ সালে। কিন্তু এ পরীক্ষার সঠিক ব্যাখ্যা [illegible] বহু বছর পর।

পৃথিবী তার গতির সঙ্গে নিজ সান্নিধ্যের ইথার বহন করে— অনেকগুলি কারণে এ অনুমান ছিল অসম্ভব। সুতরাং একটি যৌক্তিক অচলবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়। কতকগুলি অতীব যাদৃচ্ছিক প্রকল্পের সাহায্যে পদার্থবিদগণ এ অবস্থা থেকে মুক্তির চেষ্টা করেন। এগুলির ভিতরে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ [illegible] ছিল ফিট জারাল্ডের (Fit Zerald)। এ প্রকল্প লোরেঞ্জের (Lorentz) [illegible] বিকাশ লাভ করে এবং এখন লোরেঞ্জ সঙ্কোচন প্রকল্প (Lorentz Contraction Hypothesis) নামে পরিচিত।

এই প্রকল্প অনুসারে একটি বস্তুপিণ্ড যখন গতিশীল তখন গতির অভিমুখে তার সঙ্কোচন হয়। সঙ্কোচনের অনুপাত তার বেগের উপর নির্ভরশীল। সঙ্কোচনের পরিমাণ মিচেলসন-মর্লি পরীক্ষার অপরা ফল (negative result) ব্যাখা করার পক্ষে পর্যাপ্ত মাত্র। স্রোতের মুখে যাতায়াত আসলে [illegible] আড়াআড়ি যাতায়াতের তুলনায় হ্রস্বতর ভ্রমণ এবং এই হ্রস্বতা হতো তত্টুকু যতটুকু দূরত্ব ধীরতর আলোকতরঙ্গ একই সময়ে অতিক্রম করতে পারে। এই সঙ্কোচন অবশ্য মাপনের সাহায্যে কখনোই ধরা যেত না কারণ আমাদের মাপনদণ্ডও একই সঙ্গে সঙ্কুচিত হতো। পৃথিবীর গতিরেখার অভিমুখে স্থাপিত একটি ফুটরুলের দৈর্ঘ্য গতিরেখার সমকোণে স্থাপিত একই ফুটরুলের চাইতে কম হবে। এ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে 'হোয়াইট নাইটের' দৃষ্টিভঙ্গির যতটা [illegible] রয়েছে আর কিছুর সঙ্গে ততটা সাদৃশ্য নেই 'এমন ফন্দি যে, সবার গোঁফই [illegible] রঙ করা হবে কিন্তু সব সময় এত বড় একখানা পাখা চালানো হবে যে [illegible] দেখা যাবে না।' কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হল এ ফন্দিতে কাজ ভালই চলছিল, যখন আইনস্টাইন তাঁর বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ উপস্থাপন করলেন (১৯০৫) · দেখা গেল প্রকল্পটি একটি বিশেষ অর্থে নির্ভুল, কিন্তু শুধুমাত্র একটি [illegible]

অর্থেই। অর্থাৎ অনুমিত সঙ্কোচন কোনো ভৌত বাস্তবতা নয়, শুধু কয়েকটি মাপন রীতির ফল মাত্র। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি একবার খুঁজে পেলে দেখা যায় সে রীতি গ্রহণ করতে আমরা প্রায় বাধ্য। কিন্তু এ ধাঁধার আইনস্টাইনের করা সমাধান এখন আমি প্রকাশ করতে চাই না। আপাতত আমি শুধু চাই ধাঁধার নিজস্ব চরিত্রটা স্পষ্ট করে বলতে।

আপাতদৃষ্টিতে তদর্থক (ad hoc) প্রকল্পটি ছাড়াও মিচেলসন-মর্লি (অন্যান্য পরীক্ষার সংযোগে) দেখিয়েছেন—পৃথিবী সাপেক্ষ আলোকের গতি সবদিকেই অভিন্ন এবং সূর্য প্রদক্ষিণের সময় যদিও পৃথিবীর গতি অভিমুখ সবসময়ই পরিবর্তিত হচ্ছে তবুও বৎসরের সবসময় এ তথ্য সমভাবে সত্য। তাছাড়া দেখা গেল ব্যাপারটা শুধু পৃথিবীরই বিশেষত্ব নয়, সমস্ত বস্তুপিণ্ড সাপেক্ষই এ তথ্য সত্য। একটি বস্তুপিণ্ড থেকে যদি আলোকসঙ্কেত প্রেরিত হয় তাহলে সে বস্তুপিণ্ডটি যেভাবেই চলমান হোক না কেন— সবসময়ই তার স্থিতি হবে বহির্মুখে বিস্তারমান আলোকতরঙ্গের কেন্দ্রে। অন্ততপক্ষে বস্তুপিণ্ডটির সঙ্গে চলমান পর্যবেক্ষকের সেই ধারণাই হবে। এটাই ছিল পরীক্ষাগুলির সরল এবং স্বাভাবিক অর্থ। আইনস্টাইন লাফল্যের সঙ্গে যে তত্ত্বটি আবিষ্কার করেন, সে তত্ত্ব এই তথ্যকে মেনে নিয়েছে। কিন্তু প্রথমে মনে হয়েছিল এই সরল স্বাভাবিক অর্থ মেনে নেওয়া যুক্তির দিক থেকে অসম্ভব।

কয়েকটি উদাহরণ দিলে পরিষ্কার হবে তথ্যগুলি কিরকম অদ্ভুত। কামান দাগলে গোলাটা শব্দের চাইতে আগে যায়, যাদের লক্ষ্য করে কামানা দাগা হল তারা প্রথমে দেখতে পায় আলোর ঝলক, তারপর (যদি কপাল ভাল হয়) গোলাটাকে যেতে দেখে এবং সবচাইতে শেষে শুনতে পায় শব্দ ! স্পষ্ট বোঝা যায়, গোলার সঙ্গে যারা যেতে পারত তারা শব্দটা কখনোই শুনতে পেত না কারণ শব্দটা গোলা অবধি আসবার আগেই গোলার বিস্ফোরণে তাদের মৃত্যু হতো। কিন্তু শব্দের কর্মপদ্ধতি যদি আলোকের মতো হতো তাহলে তারা স্থিতাবস্থায় থাকলে যেরকম শুনত, কামানের গোলার সঙ্গে চলমান অবস্থাতেও শুনত সেইভাবেই। সে ক্ষেত্রে শব্দ প্রতিধ্বনিত করার ক্ষমতাসম্পন্ন একটা পর্দা যদি কামানের গোলার সঙ্গে সংযুক্ত থাকত এবং সঙ্গে চলমান হতো—ধরুন একশ গজ সামনে—তাহলে তারা পর্দা থেকে প্রতিধ্বনিত কামানের আওয়াজ যে কাল ব্যবধানে শুনতে পেত সে ব্যবধান হতো তারা আর কামানের গোলা স্থিতাবস্থায় থাকার সময়কার কাল ব্যবধানের সমান। এ পরীক্ষা অবশ্য করা সম্ভব নয় কিন্তু সম্ভাব্য কতগুলি পরীক্ষা থেকে পার্থক্যটা বোঝা যাবে। আমরা একটা রেলপথের

উপর এমন একটি স্থান জোগাড় করতে পারি যেখানে ঐ রেলপথেরই উপর দূরস্থিত একটি জায়গা থেকে প্রতিধ্বনি আসে—ধরুন এমন একটি জায়গা যেখানে রেললাইনটি একটি সুড়ঙ্গের (tunnel) ভিতর দিয়ে গিয়েছে। ট্রেনটি যখন চলমান তখন লাইনের ধার থেকে কেউ একটা বন্দুকের আওয়াজ করুক। ট্রেনের গতি যদি প্রতিধ্বনির অভিমুখী হয় তাহলে ট্রেনের আরোহীরা প্রতিধ্বনি শুনতে পাবে লাইনের পাশের লোকটির চাইতে অনেক আগে কিন্তু অভিমুখ যদি বিপরীত হয় তাহলে তারা শুনতে পাবে পরে। কিন্তু এ পরিস্থিতি ঠিক মিচেলসন-মর্লি পরীক্ষার পরিস্থিতির মতো নয়। ঐ পরীক্ষার আয়নাগুলি প্রতিধ্বনির অনুরূপ এবং আয়নাগুলি পৃথিবীর সঙ্গে চলমান, তাহলে প্রতিধ্বনিরও ট্রেনের সঙ্গে চলমান হওয়া উচিত ছিল। অনুমান করা যায়, বন্দুকের আওয়াজ করা হয়েছে গার্ডের গাড়ি থেকে এবং প্রতিধ্বনি এসেছে ইঞ্জিনের উপরের একটি পর্দা থেকে। আমাদের অনুমান হবে গার্ডের গাড়ি থেকে ইঞ্জিনের দূরত্ব, শব্দ এক সেকেন্ডে যতদূর যেতে পারে ততটা (এক মাইলের পাঁচ ভাগের এক ভাগের মতো) এবং ট্রেনের দ্রুতি শব্দের দ্রুতির বারো ভাগের এক ভাগ (ঘণ্টায় প্রায় ষাট মাইল)। এখন, এমন একটি পরীক্ষা আমাদের রয়েছে যেটা ট্রেনের আরোহীরা করতে পারে। গাড়িটা স্থিতিশীল থাকলে গার্ড দু সেকেন্ডে প্রতিধ্বনি শুনবে। এমনিতে (as it is) আসলে সময় লাগবে ২/১৪৩ সেকেন্ডে। শব্দের বেগ জানা থাকলে এই পার্থক্য থেকে বাড়ির বেগ গণনা করা সম্ভব। এমনকি, রাত যদি কুয়াশাচ্ছন্ন হয় যদি পার দেখা না যায় তাহলেও। কিন্তু শব্দের আচরণ যদি আলোকের মতো হয় তাহলে ট্রেনের গতি যত দ্রুতই হোক না কেন গার্ড দু সেকেন্ড পরেই প্রতিধ্বনি শুনবে।

ঐতিহ্য এবং সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোকের বেগ বিষয়ক তথ্য বিশেষ অসাধারণ, সেটা বুঝতে কয়েকটা দৃষ্টান্ত আমাদের সাহায্য করবে। সবাই জানে একটা এস্‌কালেটরে (Escalator—চলমান সিঁড়ি) উঠে হাঁটলে তাড়াতাড়ি উপরে উঠা যায়— চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে সময় বেশি লাগে কিন্তু এস্‌কালেটর যায় আলোকের বেগে চলে (এমনকি নিউ ইয়র্কেও এস্‌কালেটর এ বেগে চলে না)। তাহলে আপনি হাঁটুন কিংবা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকুন, পৌছাবেন একই সময়ে। আবার . আপনি যদি একটা রাস্তা দিয়ে ঘণ্টায় চার মাইল বেগে হাঁটেন, আর একটি মোটরগাড়ি যদি একই অভিমুখে ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে পাশ দিয়ে আপনাকে ছাড়িয়ে যায় এবং আপনি এবং মোটরগাড়ির দুইই যদি চলতে থাকেন তাহলে একঘণ্টা বাদে আপনার সঙ্গে মোটরগাড়ির দূরত্ব হবে ছত্রিশ মাইল। কিন্তু

আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় মোটর গাড়িটা যদি বিপরীত অভিমুখে চলতে থাকত তাহলে একঘণ্টা বাদে আপনার সঙ্গে মোটরগাড়ির দূরত্ব হতো চুয়াল্লিশ মাইল। কিন্তু মোটরগাড়িটা যদি আলোকের বেগে যেত তাহলে গাড়িটার সঙ্গে আপনার দেখা হওয়া কিংবা গাড়িটা আপনাকে ছাড়িয়ে যাওয়াতে কোনো পার্থক্যই হতো না। দুটি ক্ষেত্রেই এক সেকেন্ড বাদে আপনার সঙ্গে তার দূরত্ব হতো ১,৮৬,০০০ মাইল। আগের সেকেন্ডে যদি অন্য কোনো কম দ্রুতগামী গাড়ির সঙ্গে আপনার দেখা হতো কিংবা সে গাড়ি যদি আপনাকে ছাড়িয়ে যেত তাহলে সে গাড়ির সঙ্গেও ঐ আলোকের দূরত্ব হতো ১,৮৬,০০০ মাইল। ব্যাপারটা অসম্ভব মনে হয় : গাড়িটা কি করে রাস্তার উপরে বিভিন্ন বিন্দু থেকে একই দূরত্বে থাকতে পারে?

আর একটি দৃষ্টান্ত বিচার করা যাক। একটা মাছি স্থির একটা জলাশয় স্পর্শ করলে ছোট ছোট ঢেউ সৃষ্টি করে। ঢেউগুলি ক্রমপ্রসারমান বৃত্তে বহির্মুখে যেতে থাকে। যে কোনো মুহূর্তেই বৃত্তের কেন্দ্র হবে সেই বিন্দুটি—যে বিন্দুতে মাছি জলাশয় স্পর্শ করেছিল। মাছিটা যদি জলাশয়ের উপর চলতে থাকে তাহলে সে আর ঢেউয়ের কেন্দ্রে থাকে না। কিন্তু ঢেউগুলি যদি আলোকতরঙ্গ হতো আর মাছিটা যদি কুশলী পদার্থবিদ্যাবিদ হতো তাহলে দেখতে পেত সে যতই চলাচল করুক না কেন তার অবস্থান তরঙ্গের কেন্দ্রে। এই সময় জলাশয়ের পাশে উপবিষ্ট একজন কুশলী পদার্থবিদ্যাবিদ ভাবতেন সাধারণ তরঙ্গের ক্ষেত্রের মতো কেন্দ্র সেখানে মাছি নয় : জলাশয়ের যে বিন্দু মাছিটা স্পর্শ করেছিল সেটাই কেন্দ্র। আবার অন্য একটি মাছি যদি একই মুহূর্তে একই বিন্দুতে জল স্পর্শ করত তাহলে সে দেখত প্রথম মাছিটা থেকে বহুদূরে সরে গেলেও সে তরঙ্গের কেন্দ্রেই অবস্থান করছে। মিচেলসন-মর্লি পরীক্ষার সঙ্গে ব্যাপারটার পুর্ণ সাদৃশ্য রয়েছে। জলাশয় ইথারের অনুরূপ, মাছিটি পৃথিবীর অনুরূপ, মাছি এবং জলাশয়ের সংযোগ, মিচেলসন এবং মর্লি মহাশয়েরা যে আলোকসঙ্কেত পাঠিয়েছিলেন তার অনুরূপ এবং ঢেউগুলি অনুরূপ আলোকতরঙ্গের।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় এরকম ব্যাপার সম্পূর্ণ অসম্ভব। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে : মিচেলসন-মর্লি পরীক্ষা যদিও ১৮৮১ সালে হয়েছিল তবুও সে পরীক্ষার নির্ভুল ব্যাখ্যা ১৯০৫ সালের আগে হয়নি। দেখা যাক আমরা ঠিক কি বলছি। সাধারণ আর মোটরগাড়ির দৃষ্টান্তটা বিচার করুন। অনুমান করা যাক রাস্তার একটি বিন্দুতে কয়েকজন রয়েছে, কেউ হাঁটছে, কেউ চলেছে মোটরগাড়িতে। অনুমান করা যাক তাদের বেগের হারও বিভিন্ন, তাদের কেউ চলেছে একদিকে,

কেউ চলেছে অন্যদিকে। আমি বলছি : এই মুহূর্তে যদি ওরা সবাই যেখানে আ সেখান থেকে একটা আলোর ঝলক পাঠানো যায় তাহলে ভ্রাম্যমাণ প্রত্যেকে ঘড়ি অনুসারেই এক সেকেন্ড পরে আলোকতরঙ্গগুলি প্রত্যেকের কাছ থে ১,৮৬,০০০ মাইল দূরে থাকবে। অথচ ভ্রাম্যমাণ সবাই কিন্তু আর এক বি থাকবে না"। আপনার ঘড়িতে এক সেকেন্ড হওয়ার পর আলোকতরঙ্গ আপনার কাছ থেকে ১,৮৬,০০০ মাইল দূরবর্তী হবে আবার আলোকতরঙ্গ পে করার সময় যাদের সঙ্গে আপনাদের দেখা হয়েছিল তাদের ঘড়িতে এক সে কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর ঐ তরঙ্গগুলি তাদের কাছ থেকেও ১,৮৬,০০০ মাই দূরবর্তী হবে। এমনকি, তাদের গতি বিপরীতমুখী হলেও। অবশ্য দুটো ঘ নির্ভুল এ অনুমান করলে। একরকম ব্যাপার কি করে হতে পারে?

এরকম তথ্য ব্যাখ্যা করার একটিই উপায় হল, ঘড়ির চলন গতি দ্বা প্রভাবিত হয় : এই অনুমান করা। আমার কথার অর্থ এই নয় যে—প্রভাবিত এমনভাবে, যা ঘড়ির আরো নির্ভুল গঠনের সাহায্যে শোধরানো সম্ভব। আমা বক্তব্য আরো মূলগত। আমার বক্তব্য : আপনি যদি বলেন দুটি ঘটনার মধ্যে এ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়েছে এবং আপনার এই সজোর বক্তব্যের ভিত্তি যদি হয় আদর্শ নির্ভুল ঘড়ির সাহায্যে আদর্শ সময় মাপন, তাহলেও আপনি সাপেক্ষ দ্রুত চলমান একই রকম নির্ভুল অন্য এক ব্যক্তি বলতে পারেন ঐ কাল এক ঘণ্টার কম কিংবা বেশি ছিল। যেমন একটি ঘড়িতে যদি নিউ ইয়র্কের সময় দেখা যায় এবং আ একটি যদি গ্রিনউইচের সময় দেখায় তাহলে আপনি একটিকে ভুল এবং অন্যটিকে শুদ্ধ বলতে পারেন না, ঠিক তেমনি এক্ষেত্রেও পারেন না একজনকে ভুল এবং অপরকে শুদ্ধ বলতে। কি করে এটা হয় সে ব্যাখ্যা আমি পরের অধ্যায়ে করব।

আলোকের গতিবেগ সম্পর্কিত আরো অনেক অদ্ভুত ব্যাপার রয়েছে। একটি যত বিশাল বল যত বেশিক্ষণ ধরে ক্রিয়া করুক না কেন, কোনো জড়পিণ্ড (material body) কখনোই আলোকের মতো দ্রুত চলতে পারে না। একটা দৃষ্টান্ত হয়তো এ তথ্য স্পষ্ট করতে সাহায্য করবে। প্রদর্শনীতে অনেক সময় চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান চলমান মঞ্চের শ্রেণী দেখা যায়। বাইরেরটা চলে ঘণ্টায় চার মাইল, তার পরেরটা ঘণ্টায় চার মাইল বেশি, পরপর এই রকম। একটা মঞ্চ থেকে আপনি পরের মঞ্চে যেতে পারেন—শেষ পর্যন্ত দেখবেন আপনি বিরাট গতিতে চলেছেন। এখন, আপনি ভাবতে পারেন প্রথম মঞ্চটি যদি ঘণ্টায় চার মাইল চলে এবং দ্বিতীয়টি যদি প্রথমটির তুলনায় ঘণ্টায় চার মাইল বেশি চলে তাহলে নীচের জমি সাপেক্ষ দ্বিতীয় মঞ্চটি চলেছে ঘণ্টায় আট মাইল : এটা কিন্তু ভুল। দ্বিতীয়টি

...ল একটু কম। যদিও এত কম যে, সর্বাপেক্ষা সযত্ন মাপনেও এ পার্থক্য ধরা ...ড়বে না। আমার বক্তব্য আমি বেশ স্পষ্ট করে বলতে চাই। অনুমান করা যাক ...কালবেলা যন্ত্রটি চলতে শুরু করার ঠিক আগে আপনি জমির উপরে একটা সাদা ...খা আঁকলেন এবং প্রথম দুটি মঞ্চের প্রতিটিতে এ দাগের মুখোমুখি (opposite) ...াদা রেখা আঁকলেন। এরপর আপনি প্রথম মঞ্চের সাদা দাগের পাশে দাঁড়িয়ে ...ক্ষণ সঙ্গে চলতে লাগলেন। প্রথম মঞ্চ ভূমি সাপেক্ষ ঘণ্টায় চার মাইল চলে ...বং দ্বিতীয় মঞ্চ প্রথম মঞ্চ সাপেক্ষ ঘণ্টায় চার মাইল চলে। ঘণ্টায় চার মাইলের ...র্থ মিনিটে ৩৫২ ফুট। আপনার ঘড়ির এক মিনিট বাদে আপনি আপনার ...ঞ্চগুলোর জমিতে সাদা দাগের মুখোমুখি (opposite) মঞ্চের উপর অবস্থান চিহ্নিত ...রুন এবং চিহ্নিত করুন আপনার সামনে দ্বিতীয় মঞ্চের সাদা দাগের মুখোমুখি ...ায়গা উপরের এবং আপনার মঞ্চের উপরের অবস্থান। তারপর আপনি আপনার ...ক্ষণ উপর দুদিকে দুটি অবস্থান পর্যন্ত দূরত্ব মাপুন। আপনি দেখবেন প্রতিটি ...ত্র ৩৫২ ফুট। এইবার আপনি প্রথম মঞ্চ থেকে মাটিতে নেমে আসুন, ...াস্তায় জমির উপরে যে সাদা চিহ্ন দিয়ে আপনি শুরু করেছিলেন সেখান থেকে ...রণ করে এক মিনিট ভ্রমণের পর দ্বিতীয় মঞ্চের সাদা দাগের মুখোমুখি যে ...বস্থান চিহ্নিত করেছিলেন সেই অবধি মাপুন। সমস্যা : তাদের দূরত্ব কত? ...াপনি বলবেন ৩৫২ ফুটের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৭০৪ ফুট। আসলে মাপটা কিন্তু একটু ...ম হবে। কমের পরিমাণ এত ক্ষুদ্র যে বোঝাই যায় না। গরমিলের কারণ : ...পক্ষবাদ অনুসারে চিরায়ত (traditional) নিয়মে একাধিক বেগ যোগ করা যায় ...। আপনার যদি এইরকম চলমান মঞ্চের দীর্ঘমালা (Series) থাকত, প্রতিটি ...ঞ্চ যদি আগের মঞ্চটির চাইতে ঘণ্টায় চার মাইল বেশি বেগে চলত তবুও এমন ...কোনো বিন্দুতে আপনি পৌঁছাতে পারতেন না যে বিন্দু ভূমি সাপেক্ষ আলোকের ...গ চলমান। আপনার যদি বহু মিলিয়ন মঞ্চ থাকত তাহলেও না। ক্ষুদ্র ...ারণের ক্ষেত্রে যে গরমিল অতি ক্ষুদ্র, গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সে গরমিল বৃহত্তর ...য়। ফলে আলোর গতিবেগ একটি অপ্রাপ্য সীমা হয়ে দাঁড়ায়। এটা কি করে হয় ...ই আলোচ্য বিষয় সেটাই। এখন আমাদের সেই আলোচনাই করতে হবে।

ঘড়ি আর ফুটবল

দুটি ভিন্ন স্থানে দুটি ঘটনা একই কালে ঘটেছে : এ বিবৃতিতে অনিশ্চ[illegible] থাকতে পারে, বিশিষ্ট অপেক্ষবাদের আবির্ভাবের আগে একথা কেউ ভাবেনি। স্থান দুটি যদি পরস্পর সাপেক্ষ বহু দুরস্থিত হয় তাহলে ঘটনা দুটি [illegible] যুগপৎকিনা সে তথ্য নির্ধারণে অসুবিধা থাকতে পারে : এ কথা মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু সবাই ভেবেছে এ প্রশ্নের অর্থ সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট নিশ্চিত। কিন্তু দেখা গেল এ ধারণাও ছিল ভুল। ত্রুটিশূন্যতা নিশ্চিত করার জন্য যে পর্যবেক্ষকটি সবচেয়ে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন (বিশেষ করে আলোকের বেগ বিচার করেছেন) [illegible] কাছে দুটি ঘটনা যুগপৎ মনে হতে পারে, আবার একই রকম সতর্ক অন্য একজন পর্যবেক্ষকের বিচারে মনে হতে পারে প্রথম ঘটনা ঘটেছে দ্বিতীয়টির আগে। [illegible] তৃতীয় আর এক পর্যবেক্ষকের যদি পরস্পর সাপেক্ষ দ্রুত চলমান হন [illegible] এরকম হতে পারে। একজন নির্ভুল এবং অন্য দুজন ভুল করেছেন— ব্যাপারটা এরকম নয়। তারা প্রত্যেকে একই রকম নির্ভুল। ঘটনার কালবিন্যাস (time order) আংশিক পর্যবেক্ষক নির্ভর এবং সব সময় ঘটনাগুলির সঙ্গে স্বতঃ [illegible] অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কযুক্ত নয়। অপেক্ষবাদ দেখিয়েছে : এ দৃষ্টিভঙ্গি শুধু পরিঘটনা [illegible] করে তাই নয়— এই দৃষ্টিভঙ্গির হওয়া উচিত ছিল প্রাচীন উপাত্তের ভিত্তিতে [illegible] যুক্তি প্রয়োগের ফলস্বরূপ। আসলে কিন্তু যতদিন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় [illegible] (odd) ফলগুলি মানুষের যুক্তিকে সজোরে ধাক্কা না দিয়েছে ততদিন পর্যন্ত [illegible] অপেক্ষবাদের যৌক্তিক ভিত্তি লক্ষ্য করেনি।

ভিন্ন স্থানের দুটি ঘটনা যুগপৎ কিনা সে সম্পর্কে আমরা স্বাভাবিকভাবে [illegible] করে সিদ্ধান্ত নেব? স্বভাবতই লোকে বলবে নির্ভুলভাবে মধ্যবর্তী কোনো [illegible] যদি ঘটনা দুটি যুগপৎ দেখতে পায়— তাহলে সে দুটি ঘটনা যুগপৎ (একই [illegible] দুটি ঘটনার যৌগপদ্যায় কোনো অসুবিধা নেই, উদাহরণ : আলো দেখা এবং [illegible] শোনা)। ধরুন দুটি ভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎ চমকেছে। অনুমান করুন গ্রীন [illegible] মানমন্দির এবং কিউ মানমন্দির (Greenwich Observatory এবং [illegible] Observatory)। অনুমান করা যাক সেন্ট পল্‌স্—দুটি মানমন্দিরের মাঝা[illegible] এবং সেন্ট পল্‌সের গম্বুজের উপরের একজন পর্যবেক্ষকের কাছে দুটি [illegible] যুগপৎ মনে হয়েছে। সে ক্ষেত্রে কিউয়ের লোক কিউয়ের বিদ্যুৎ চমক [illegible] দেখবে আর গ্রিনউইচের লোক প্রথম দেখবে গ্রিনউইচের বিদ্যুৎ চমক। এর [illegible] অন্তর্বর্তী দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজনীয় কাল। আর্দ নির্ভুল [illegible]

হলে তিনজনই বিচার করবেন বিদ্যুৎ চমক দুটি ছিল যুগপৎ। কারণ আলোক প্রেরণের জন্য প্রয়োজনীয় সময়কে তাঁরা স্বীকৃতি দেবেন। (নির্ভুলতার এমন মান আমি অনুমান করছি যা মানুষের পক্ষে অসম্ভব)। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠের ঘটনা নিয়ে আমরা বিচার করছি ততক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীর পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ যুগপত্তার সংজ্ঞা যথেষ্ট কার্যকর হবে। এ সংজ্ঞার প্রদত্ত ফল পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং যে সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা পৃথিবীর গতিকে অগ্রাহ্য করতে পারি সে সমস্ত ক্ষেত্রে পার্থিব পদার্থবিদ্যার সমস্ত সমস্যাতেই এ সংজ্ঞা ব্যবহার সম্ভব।

কিন্তু যেখানে দুইদল পর্যবেক্ষক পরস্পর সাপেক্ষ দ্রুত চলমান সেখানে এ সংজ্ঞা অতটা সন্তোষজনক নয়। অনুমান করা যাক, আলোকের স্থলে শব্দকে প্রতিস্থাপন করলে কি হয় আমরা তাই দেখছি এবং দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী কেউ যখন যুগপৎ শুনতে পাচ্ছে তখন আমরা ঘটনা দুটিকে যুগপৎ বলে সংজ্ঞিত করছি। নীতিগতভাবে এতে কোনো পরিবর্তন হয় না কিন্তু শব্দের গতিবেগ তুলনায় অনেক কম হওয়াতে ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যায়। অনুমান করা যাক, এক কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রিতে দুজন ডাকাত ট্রেনের গার্ড আর ড্রাইভারকে গুলি করেছে। গার্ড রয়েছে গাড়ির পিছনে, ডাকাতরা লাইনের উপরে এবং তারা নিহতদের গুলি করেছে খুব কাছ থেকে। গাড়ির ঠিক মাঝখানের একজন যাত্রী দুটি গুলির শব্দই যুগপৎ শুনতে পেল। সুতরাং আপনি হয়তো বলবেন দুটি গুলিই ছিল যুগপৎ। কিন্তু একজন স্টেশ মাস্টার ছিলেন দুটো ডাকাতেরই ঠিক মাঝখানে। তিনি প্রথমে শুনতে পেলেন যে গুলিতে গার্ড মরেছে সেই গুলির আওয়াজ। গার্ড এবং ড্রাইভারের (এরা দুজন মাসতুত ভাই) কোটিপতি এক অস্টেলিয়ান মাসী (.....) তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছেন গার্ডকে। কিন্তু গার্ড যদি আগে মারা যায় তাহলে সম্পত্তি পাবে ড্রাইভার। কে আগে মারা গিয়েছে সে প্রশ্নের সঙ্গে বিরাট সম্পত্তি জড়িত। মামলা উঠেছে লর্ড সভায়। দু'পক্ষের উকিলরাই অক্সফোর্ডে শিক্ষা নিয়েছেন এবং তাঁরা এ বিষয়ে এক মত যে, হয় যাত্রীটি ভুল করেছে নয়তো ভুল করেছে সেই স্টেশন মাস্টার। আসলে দুজনেই কিন্তু একদম সঠিক হতে পারে। গাড়িটা চলেছে গার্ডের প্রতি গুলি থেকে দূরের এবং ড্রাইভারের প্রতি গুলির অভিমুখে। সুতরাং যাত্রীর কাছে পৌছাতে ড্রাইভারের অভিমুখে নিক্ষিপ্ত গুলির শব্দের তুলনায় গার্ডের অভিমুখের নিক্ষিপ্ত গুলির শব্দের বেশি সময় লাগবে। সুতরাং যাত্রীটি যখন বলছে সে শব্দ দুটি যুগপৎ শুনেছে, তখন সে ঠিকই বলছে। স্টেশন মাস্টার যখন বলছে সে গার্ডের অভিমুখে নিক্ষিপ্ত গুলির শব্দ আগে শুনেছে তখন সে নিশ্চয়ই ঠিক কথা বলছে।

এরকম ক্ষেত্রে আমরা পৃথিবীবাসীরা একজন ট্রেন যাত্রীর দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় পৃথিবীতে স্থিতিশীল ব্যক্তির যুগপত্তা সম্পর্কীয় দৃষ্টিভঙ্গি বেশি পছন্দ করব। কিন্তু তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় এরকম সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ সংস্কার অনুমোদনীয় নয়। যুগপত্তা সম্পর্কীয় দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে একজন পৃথিবীবাসী পদার্থবিদ্যাবিদের যতটা অধিকার ধূমকেতুবাসী একজন পদার্থবিদ্যাবিদের অধিকারও ততটাই : অবশ্য ধূমকেতুবাসী যদি কোনো পদার্থবিদ্যাবিদ থাকেন। তবে আমাদের গুলি এবং ট্রেনের দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছিল এক্ষেত্রেও তেমনি ফলের পার্থক্য হবে। গতির ব্যাপারে পৃথিবীর তুলনায় ট্রেন এমন কিছু বেশি 'বাস্তব' (real) নয়—এ ব্যাপারে কোনো 'বিশেষ বাস্তবিকতা'-ই নেই। আপনি কল্পনা করতে পারেন : একটি খরগোশ বা একটি জলহস্তী তর্ক করছে মানুষ 'বাস্তবিকই' (realy) বৃহৎ জন্তু কিনা। প্রত্যেকেই ভাববে তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গিটাই স্বাভাবিক আর অন্যেরটা শুধু কল্পনাবিলাস মাত্র। পৃথিবী আর ট্রেনের ভিতরে কোনটা 'বাস্তবিকই' গতিশীল এ তর্কের ভিতরেও সারবস্তু (substance) একইরকম অল্প। সুতরাং দূরে সংঘটিত একাধিক ঘটনার যুগপত্তার সংজ্ঞা নির্ণয়ের সময় মধ্যবর্তী বিন্দু নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন বস্তুপিণ্ডের ভিতর থেকে একটিকে বেছে নেওয়া কিংবা নির্বাচন করার কোনো অধিকার আমাদের নেই। সমস্ত বস্তুপিণ্ডেরই নির্বাচিত হওয়ার অধিকার সমান। কিন্তু সংজ্ঞা অনুসারে যদি একটি বস্তুপিণ্ড সাপেক্ষ দুটি ঘটনা যুগপৎ হয় তাহলে অন্য বস্তুপিণ্ড থাকবে যেগুলি সাপেক্ষ প্রথম ঘটনা দ্বিতীয়টির পূর্বগামী এবং আরো অন্য বস্তুপিণ্ড থাকবে যেগুলি সাপেক্ষ দ্বিতীয়টি প্রথমটির পূর্বগামী। সুতরাং দূরের দুটি ঘটনা যুগপৎ একথা আমরা নিশ্চিন্তভাবে বলতে পারি না। এখানে বিবৃতির নির্দিষ্ট নিশ্চিত অর্থ শুধুমাত্র হতে পারে নির্দিষ্ট নিশ্চিত পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ। এ বিবৃতি আমাদের ভৌত পরিঘটনা পর্যবেক্ষণের ব্যক্তিনিষ্ঠ অংশ বস্তুনিষ্ঠ অংশ নয়। এই বস্তুনিষ্ঠ অংশই ভৌত বিধির উপাদান।

বিভিন্ন স্থানের কাল বিষয়ক এই প্রশ্নই বোধহয় কল্পনের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত সবচাইতে কঠিন দিক। সবকিছুরই একটা তারিখ থাকতে পারে : এ ধারণায় আমরা অভ্যস্ত। ৭৭৬ খ্রিস্ট পূর্ব অব্দের ২৭শে আগস্ট চীনে একটি সূর্যগ্রহণ দেখা গিয়েছিল এ তথ্য ইতিহাসবেত্তারা ব্যবহার করেন। উত্তর চীনের একটি নির্দিষ্ট স্থানে সূর্যগ্রহণ কখন পূর্ণগ্রাসে পরিণত হতে শুরু করেছিল সে তথ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ঘণ্টা মিনিট মেপে নির্ভুলভাবে বলতে পারতেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।*

---

* একটি সমকালীন চীনাগাঁথায় গ্রহণের সাল তারিখ নির্ভুলভাবে উল্লেখ করে লেখা হয়েছে চাঁদের গ্রহণ একটা সাধারণ ব্যাপার সূর্যও এখন রাহুগ্রস্ত কী যে মন্দ ঘটনা।

া তথ্যও স্পষ্ট প্রতীয়মান যে আমরা নির্দিষ্ট মুহূর্তে গ্রহগুলির অবস্থান বলে ' ' পারি। নিউটনীয় তত্ত্বের সাহায্যে আমরা গ্রিনউইচ ঘড়ি অনুসারে ' কালে পৃথিবী আর (ধরা যাক) বৃহস্পতি থেকে পৃথিবীতে পৌঁছাতে কত ' লাগে। ধরুন আধঘণ্টা লাগে। তাহলে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি : এখন ' বৃহস্পতিকে যেখানে দেখছি আধ ঘণ্টা আগে বৃহস্পতি সেখানে ছিল : এ ' স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু আসলে প্রয়োগক্ষেত্রে এটা কার্যকর কারণ ' লোকের গতিবেগের তুলনায় গ্রহগুলির গতিবেগ অত্যন্ত অল্প। আপনার বিচারে ' বৃহস্পতি গ্রহের একটি ঘটনা এবং পৃথিবীর একটি ঘটনা যুগপৎ ঘটেছে— ' উদাহরণ : গ্রিনউইচ সময়ের মধ্যরাত্রি বারোটায় বৃহস্পতির একটি চাঁদে গ্রহণ ' পৃথিবী সাপেক্ষ দ্রুত চলমান কোনো ব্যক্তির বিচারে তখন ব্যাপারটা ' রকম হবে। যদি অনুমান করা যায় দুজনেই আলোকের গতিবেগকে ' ভাবে হিসাবের ভিতরে নিয়েছেন তা সত্ত্বেও এ পার্থক্য থাকবে। স্বভাবতই ' সম্পর্কীয় মতানৈক্য সময়ের পর্যায়কাল (periods of time) সম্পর্কীয় ' নৈক্যের সঙ্গে যুক্ত। আমাদের বিচারে যদি মনে হয় বৃহস্পতি গ্রহের দুটি ' অন্তবর্তীকাল চব্বিশ ঘণ্টা, বৃহস্পতি এবং পৃথিবী সাপেক্ষ দ্রুতগামী আর ' কের বিচারে মনে হতে পারে অন্তবর্তীকাল দীর্ঘতর।

সুতরাং যে সর্বগত ব্রহ্মাণ্ডীয় কালকে (Universal Cosmic Time) মেনে ' হতো সে কাল আর গ্রহণীয় নয়। প্রতিটি বস্তুপিণ্ড সাপেক্ষ সান্নিধ্যের ' সম্পর্কে নির্দিষ্ট নিশ্চিত কালবিন্যাস রয়েছে। এর নাম দেওয়া যেতে ' সেই বস্তুপিণ্ডের 'বিশিষ্ট' কাল (proper time)। আমাদের নিজ দেহের ' (proper) কাল আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার নিয়ামক, যেহেতু আমরা ' উপরে প্রায় স্থিরভাবে অবস্থান করি সেইজন্য বিভিন্ন মানুষের বিশিষ্ট ' ভিতরে ঐক্য রয়েছে এবং সেগুলিকে একসঙ্গে বলা যেতে পারে পার্থিব ' (terrestrial time)। কিন্তু এ কাল শুধুমাত্র পৃথিবীর 'বৃহৎ' (large) ' গুলির উপযুক্ত। ল্যাবরেটরির ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অন্য কাল ' । যেহেতু আমরা নিজস্ব কাল ব্যবহারের জন্য জিদ করি সেই জন্যই ' মনে হয় দ্রুতগতির সঙ্গে সঙ্গে এদের ভর বৃদ্ধি পায়, তাদের দৃষ্টিতে ' ভর অপরিবর্তিত থাকে বরং আমরাই হঠাৎ রোগা কিংবা মোটা হয়ে যাই। ' পদার্থবিদ্যাবিদের ইতিহাস যদি একটি ইলেকট্রন পর্যবেক্ষণ করে তাহলে ' গালিভারের ভ্রমণকাহিনীর সঙ্গে সাদৃশ্য দেখতে পাবে।

এখন প্রশ্ন : ঘড়ি আসলে কি মাপে? অপেক্ষবাদে যখন আমরা ঘড়ির কথা ' তখন আমরা শুধুমাত্র মানুষের তৈরি ঘড়ির কথাই বলি না— যা কিছু নিয়মিত

পর্যাবৃত্ত ক্রিয়া (regular periodic performance) করে তাকেই আমরা বলি। পৃথিবী তেইশ ঘণ্টা ছাপ্পান্ন মিনিটে একবার আবর্তিত হয় সুতরাং তা একটি ঘড়ি। পরমাণুও ঘড়ি কারণ পরমাণু থেকে অত্যন্ত নির্দিষ্ট নিশ্চিত (frequency) সম্পন্ন আলোকতরঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়। পরমাণুর বর্ণালীতে আলোকতরঙ্গ দেখা দেয় উজ্জ্বল রেখা রূপে। বিশ্ব পূর্ণ রয়েছে পর্যাবৃত্ত (periodic occurences) এবং পরমাণুর মতো মূলগত ক্রিয়াবিধান (Fundamental mechanism) অসাধারণ সমরূপত্ব দেখা যায় মহাবিশ্বের বিভিন্ন অংশে। এই পর্যাবৃত্ত ঘটনাগুলির যে কোনো একটিকে কাল মাপনের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব। মানুষের তৈরি ঘড়ি পর্যবেক্ষণ করা বিশেষভাবে সুবিধাজনক, এটাই সে ঘড়ির একমাত্র সুবিধা। অন্য অনেক ঘড়ি কিন্তু তার চাইতে নির্ভুল। আধুনিক কালের মাপকের ভিত্তি সিসিয়াম পরমাণুর (coesium atom) একটি বিশেষ দোলনের (particular oscilation) স্পন্দাঙ্ক। মাপনের এই ভিত্তি আগের আবর্তননির্ভর ভিত্তির চাইতে অনেক বেশি সুষম (uniform)। কিন্তু প্রশ্ন করা যায় : ব্রহ্মাণ্ডীয় কাল যদি পরিত্যাগ করা হয় তাহলে শব্দটির উপর এক্ষণে আমরা যে ব্যাপক অর্থ আরোপ করলাম সেই অর্থে ঘড়ি আসলে কি মাপে?

প্রত্যেকটি ঘড়ি তার নিজস্ব 'বিশিষ্ট' (proper) কালের নির্ভুল মাপ মাপ করে। আমরা এখনই দেখতে পাব এই নির্ভুল মাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভৌত রাশি (quantity)। কিন্তু একটি ঘড়ি সাপেক্ষ দ্রুত চলমান বস্তুপিণ্ডগুলির সঙ্গে যুক্ত ঘটনাবলীর কোনো ভৌত রাশির নির্ভুল মাপন আমরা ঘড়ির সাহায্যে পাই না। এরকম ঘটনাবলীর সঙ্গে সংযুক্ত ভৌতরাশি আবিষ্কারের একটি উপায় আমরা ঘড়ির সাহায্যে পাই কিন্তু আর একটি উপায় প্রয়োজন। সে উপায় আবিষ্কার করতে হবে স্থানে (space) দূরত্ব মাপনের সাহায্যে। স্থানে দূরত্ব (distance in space) কালের পর্যাবৃত্তির মতো, সাধারণত বস্তুনিষ্ঠ কোনো ভৌত (personal time) তথ্য নয়, এগুলি আংশিকভাবে পর্যবেক্ষক নির্ভর। ব্যাপারটা কি করে এখন অবশ্যই সে ব্যাখ্যা করতে হবে।

প্রথমত আমাদের ভাবতে হবে দুটি ঘটনার দূরত্ব— দুটি বস্তুপিণ্ডের দূরত্ব নয়। কাল বিষয়ে আমরা যা জেনেছি তা থেকেই এ তথ্য তৎক্ষণাৎ আহরণ করা যায়। দুটি বস্তুপিণ্ড যদি পরস্পর সাপেক্ষ চলমান হয়—আসলে ব্যাপারটা সব সময় এইরকম হয়— তাহলে তাদের পারস্পরিক দূরত্ব সম্ভবত (continuously) পরিবর্তনশীল। সুতরাং তাদের দূরত্ব উল্লেখ করতে হলে একটি বিশেষ ক্ষণে দূরত্বই বলতে হয়। আপনি যখন ট্রেনে এডিনবরা চলেছেন তখন এডিনবরা থেকে

আপনার দূরত্ব একটি বিশেষ সময়কার দূরত্ব। কিন্তু আগেই আমরা বলেছি এডিনবরার একটি ঘটনা এবং ট্রেনের একটি ঘটনার 'সমকাল' (same time) সম্পর্কে বিভিন্ন পর্যবেক্ষক বিভিন্ন বিচার করবেন। এর ফল : ঠিক যেমন দেখা গেছে কালের মাপন আপেক্ষিক তেমনি দূরত্বের মাপনও আপেক্ষিক। আমরা সাধারণত ভাবি দুটি ঘটনার ভিতরে আলাদা দু'রকম অন্তর (interval) আছে : স্থানের অন্তর এবং কালের অন্তর। আপনার লন্ডন থেকে রওনা হওয়া এবং এডিনবরায় পৌছানোর ভিতরে রয়েছে চারশ মাইল আর দশ ঘণ্টা। আমরা আগেই দেখেছি অন্য পর্যবেক্ষকরা সময় বিচার করেন পৃথকভাবে এবং তাঁরা যে দূরত্বও পৃথকভাবে বিচার করবেন সে তথ্য আরও স্পষ্ট। সূর্যের উপরের একজন পর্যবেক্ষক আপনার গতিকে অত্যন্ত তুচ্ছ মনে করবেন। তাঁর বিচারের আপনার চলার পরিমাণ পৃথিবীর নিজ কক্ষে ভ্রমণ এবং পৃথিবীর আহ্নিক আবর্তনের পরিমাণের সমফলের সমান। আবার রেলগাড়ির একটি মাছি ভাববে আপনি স্থানে কোনো পরিবর্তনই করেননি কিন্তু তাকে আপনি কিছুকালের জন্য আনন্দ দান করেছেন। তবে সে কালটা সে গ্রিনউইচ মানমন্দির দিয়ে মাপবে না, মাপবে তার নিজস্ব 'বিশিষ্ট' কাল দিয়ে। আপনি কিংবা সূর্যবাসী কিংবা মাছি কেউ ভুল করেছে বলা চলবে না। প্রত্যেকেরই চিন্তা একই রকম যুক্তিসঙ্গত। একমাত্র ভুল হল— ব্যক্তিনিষ্ঠ মাপনের ওপর বস্তুনিষ্ঠ সত্যতা আরোপ করা। সুতরাং দুটি ঘটনার ভিতরের স্থানিক দূরত্ব নিজে একটি ভৌত ঘটনা (physical fact) নয়। এর পরে কিন্তু আমরা দেখব যে ঘটনা একটি আছে এবং কালিক দূরত্ব আর স্থানিক দূরত্ব থেকে ঘটনা জানা যায় পারে। একেই বলা হয় স্থান-কাল 'অন্তর' (interval)।

ব্রহ্মাণ্ডের (Universe) যে কোনো দুটি ঘটনা বিচার করলে তাদের ভিতরে তিনটি পৃথক সম্পর্কের সম্ভাবনা দেখা যায়। ভৌতভাবে একটি বস্তুপিণ্ডের পক্ষে এমন হওয়া সম্ভব হতে পারে যে দুটি ঘটনাস্থলেই তার উপস্থিত হওয়া সম্ভব কিংবা সম্ভব নয়। এটা নির্ভর করে এই তথ্যের উপর : কোনো বস্তুপিণ্ডই আলোর মতো দ্রুত যেতে পারে না। উদাহরণ : ধরুন একটি আলোর ঝলক পৃথিবী থেকে চাঁদে প্রেরিত হয়েছে এবং প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এসেছে। আলোক প্রেরণ এবং আলোকনের প্রত্যাবর্তনের অন্তবর্তী কাল হবে প্রায় আড়াই সেকেন্ডে। এই আড়াই সেকেন্ডের ভিতরে কোনো এক সময় পৃথিবীতে উপস্থিত থাকা এবং আলোকের ফিরে পৌছানোর মুহূর্তে চাঁদে উপস্থিত থাকার মতো দ্রুতগতি কোনো বস্তুপিণ্ডের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তা করতে হলে বস্তুপিণ্ডটিকে আলোকের চাইতে দ্রুততর যেতে হবে, কিন্তু তাত্ত্বিক দিক থেকে একটি বস্তুপিণ্ডের ঐ আড়াই

সেকেন্ডের আগে কিংবা পরে যে কোনো সময়ে পৃথিবীতে উপস্থিত থাকা এবং সম্ভব আলোর ঝলক পৌছাবার সময় চাঁদে উপস্থিত থাকা। যখন একটি বস্তুপিণ্ডের দুটি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকার মতো চলন ভৌতভাবে সম্ভব নয় তখন আমরা বলি দুটি ঘটনার 'অন্তর'* (interval) স্থানানুরূপ (space like)। যখন বস্তুপিণ্ডটির দুটি ঘটনাস্থলেই উপস্থিত থাকা ভৌত ভাবে (physically) সম্ভব তখন আমরা বলব দুটি ঘটনার অন্তর কালানুরূপ (time like)। অন্তর 'স্থানানুরূপ' তখন একটি বস্তুপিণ্ডের পক্ষে এমন ভাবে চলা সম্ভব যে উপরিস্থিত একজন পর্যবেক্ষকের বিচারে দুটি ঘটনা যুগপৎ হবে। সে ক্ষেত্রে রকম একজন পর্যবেক্ষকের বিচারে দুটি ঘটনার 'অন্তর' হবে স্থানে দুটি দূরত্ব (distance in space)। অন্তর যখন স্থানানুরূপ একটি বস্তুপিণ্ড তখন দুটি ঘটনাস্থলেই উপস্থিত থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে বস্তুপিণ্ডের উপরিস্থিত পর্যবেক্ষকের বিচারে দুটি ঘটনার অন্তর হবে তাদের অন্তবর্তীকাল অর্থাৎ দুটি ঘটনার অন্তবর্তী বিশিষ্ট কাল। কিন্তু এ দুটির মাঝে একটি সীমক ঘটনা (limiting case) রয়েছে : যখন দুটি ঘটনা একটি আলোক ঝলকের অংশ। আমরা বলতে পারি যখন একটি ঘটনা অন্যটির দর্শন (seeing of the other) সে ক্ষেত্রে দুটি ঘটনার অন্তর হবে শূন্য (zero)।

তাহলে ঘটনা রয়েছে তিনটি। (১) একটি আলোকরশ্মির দুটি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা সম্ভব হতে পারে। এ ব্যাপার ঘটে যখন একটি ঘটনা অন্য ঘটনার দর্শন। এক্ষেত্রে দুটি ঘটনার অন্তর শূন্য (zero)। (২) হতে পারে একটি বস্তুপিণ্ড কোনোক্রমেই একটি ঘটনাস্থল থেকে অন্য ঘটনাস্থলে যেতে পারে না– সে ক্ষেত্রে তার চলন আলোকের চাইতে দ্রুত হতে হবে। সে ক্ষেত্রে এমন বস্তুপিণ্ডের সব সময়ই এমন ভাবে চলার ভৌত সম্ভাবনা রয়েছে যে সেই বস্তুপিণ্ডের উপরিস্থিত একজন পর্যবেক্ষকের বিচারে দুটি ঘটনা হবে যুগপৎ। পর্যবেক্ষকের বিচারে দুটি ঘটনার স্থানিক দূরত্ব হবে অন্তর (interval)। এই রকম অন্তরের নাম স্থানানুরূপ। (৩) একটি বস্তুপিণ্ডের পক্ষে এমন চলন ভৌতভাবে সম্ভব হতে পারে যে সে দুটি ঘটনাতেই উপস্থিত থাকবে। সে ক্ষেত্রে ঐরকম বস্তুপিণ্ডের উপর অবাস্থিত একজন পর্যবেক্ষকের বিচারে তাদের অন্তবর্তী কাল হবে তাদের অন্তর। এইরকম অন্তরের নাম কালানুরূপ (time like)।

দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী অন্তর সেগুলি বিষয়ে ভৌত তথ্য। এ তথ্য পর্যবেক্ষকের বিশেষ পরিবেশের উপর নির্ভরশীল নয়।

---

* অন্তর শব্দের সংজ্ঞা আমি এখনই দেব।

অপেক্ষবাদের দুটি অবয়ব (form)— বিশিষ্ট এবং ব্যাপক। পূর্বোক্তটি সাধারণত আসন্নমাত্র (only approximate) কিন্তু মহাকর্ষ সৃষ্টি করে এরকম পদার্থ (gravitating matter) থেকে বহুদূরে থাকলে এ তত্ত্ব প্রায় নির্ভুল হতে পারে। মহাকর্ষ যেখানেই অগ্রাহ্য করা যায়। সেখানেই বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ প্রয়োগ করুন এবং দুটি ঘটনার অন্তবর্তী স্থানিক দূরত্ব এবং কালিক দূরত্ব যদি কোনো পর্যবেক্ষকের গণনা থেকে আমরা জানতে পারি তাহলে দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী অন্তর আমরা গণনা করতে পারি। স্থানিক দূরত্ব যদি আলোক ঐ কালে যতদূর যেতে পারত তার চাইতে বেশি হয়, বিচ্ছিন্নতা (separation) তাহলে স্থানানুরূপ। তাহলে দুটি ঘটনার অন্তর পাওয়া যায় নিম্নলিখিত গঠন থেকে : একটি রেখা AB কল্পনা করুন। ঐ কালে আলোক যতদূর গমন করতে পারত রেখার দৈর্ঘ্য হবে সেটা। A-কে কেন্দ্র করে এবং স্থানে দুটি ঘটনার দূরত্বকে ব্যাসার্ধ করে একটি বৃত্ত অঙ্কন করুন। B-থেকে BC লম্ব আঁকুন। BC-এর সঙ্গে AB- এর লম্ব সম্পর্ক থাকবে, লম্বটি C-তে এসে বৃত্তের সঙ্গে মিলিত হোক। তাহলে BC হবে দুটি ঘটনার অন্তরের দৈর্ঘ্য।

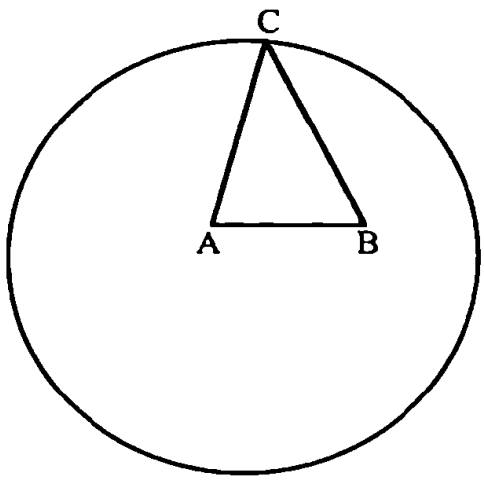

দূরত্ব যখন কালানুরূপ তখন একই চিত্র ব্যবহার করুন। কিন্তু তখন কালে আলোক যে দূরত্ব অতিক্রম করত সেটা হোক AC, এবং AB হবে স্থানে দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী দূরত্ব। এখন তাদের অন্তর হবে BC দূরত্ব অতিক্রম করতে আলোকের যে সময় লাগে সেই সময়।

ভিন্ন ভিন্ন পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ AB এবং AC ভিন্ন হলেও ব্যাপক অপেক্ষবাদকৃত সংশোধন সাপেক্ষ সমস্ত পর্যবেক্ষকের ক্ষেত্রেই BC অভিন্ন। প্রাচীন পদার্থবিদ্যার স্থান এবং কাল বিষয়ক দুটি অন্তরের স্থলে 'স্থান-কাল' অন্তর প্রতিস্থাপিত হয়েছে : এটা তারই প্রতিরূপ। আপাতত অন্তর সম্পর্কীয় এই

দৃষ্টিভঙ্গি একটু রহস্যজনক মনে হতে পারে। কিন্তু আমরা অগ্রসর হওয়ার [illegible] সঙ্গে এ বোধ কমবে এবং বস্তুর স্বভাবের ব্যাপারে এর যুক্তি ক্রমশ প্রকাশ পাবে।

৫

স্থান কাল

অপেক্ষবাদ সম্পর্কে যাঁরা কখনো শুনেছেন তাঁদের সবাই 'স্থান-কাল' কথা জানেন, এবং এও জানেন যে এই কথাটাই শুদ্ধ এবং আগেকার দিনে আমাদের বলতে হতো 'স্থান এবং কাল'। কিন্তু যাঁরা গণিতবিদ নন তাঁদের ভিতরে খুব কম লোকেরই বাগ্বিধির এই পরিবর্তন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আছে। বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ নিয়ে আর অগ্রসর হওয়ার আগে এই নতুন শব্দসমষ্টি 'স্থান-কালের' সঙ্গে যা জড়িত রয়েছে সেটাই আমি পাঠকদের কাছে উপস্থিত করার চেষ্টা করব। [illegible] আইনস্টাইন যে সমস্ত নতুনত্ব উপস্থাপন করেছেন সেগুলির ভিতরে দর্শন (philosophical) এবং কল্পনের (imaginatics) দিক থেকে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এটাই।

অনুমান করা যাক একটি ঘটনা—যেমন বিমানে একটি বিস্ফোরণ— কোথায় কখন ঘটেছে— আপনি সেটা বলতে চান, তাহলে আপনাকে উল্লেখ করতে হবে চারটি রাশি—অক্ষাংশ (Latitude), দ্রাঘিমা (Longitude), জমি থেকে উচ্চতা এবং কাল। চিরায়ত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে এগুলির ভিতরে প্রথম তিনটি প্রকাশ করে স্থানে অবস্থান এবং চতুর্থটি প্রকাশ করে কালে অবস্থান। যে তিনটি রাশি (quantity) স্থানে অবস্থান প্রকাশ করে সেগুলিকে নানাভাবে আরোপ করা সম্ভব। উদাহরণ : আপনি বিষুবরেখার তল (plane) গ্রহণ করতে পারেন, গ্রিনউইচের মধ্যরেখার (meridian) তল গ্রহণ করতে পারেন, গ্রহণ করতে পারেন নর্দাম্পটনের মধ্যরেখার তল এবং এর প্রতিটি তল থেকে বিমানটি কতদূরে ছিল সেটা আপনি বলতে পারেন। দেকার্তের (Descartes) নাম অনুসারে যাকে 'কার্তেজীয় স্থানাঙ্ক' (Cartesian Co-ordinate) বলা হয়, এই তিনটি দূরত্ব হল তাই [illegible] সমকোণ সম্পর্কযুক্ত অন্য যে কোনো তিনটি তল (plane) আপনি নিতে পারেন তখনো আপনি কার্তেজীয় স্থানাঙ্ক পাবেন। কিংবা আপনি নিতে পারেন [illegible] থেকে উল্লম্বভাবে বিমানের নিচের বিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব, এই দূরত্বের অভিমুখ (উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম কিংবা যাই হোক) এবং মাটি থেকে বিমানের উচ্চতা। স্থানে অবস্থান নির্দিষ্ট করার এরকম পদ্ধতি সংখ্যা অসীম এবং প্রত্যেকটি পদ্ধতি একই রকম বিধিসঙ্গত (legitimate)। এগুলির ভিতর থেকে একটিকে নির্বাচনের কারণ শুধুমাত্র সুবিধা।

লোকে যখন বলত স্থানের তিনটি মাত্রা তখন তাদের কথার অর্থ ছিল ঠিক স্থানে একটি বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করতে তিনটি রাশি প্রয়োজন। কিন্তু রাশিগুলি আরোপ করার পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ যাদৃচ্ছিক।

কাল বিষয়ে ভাবা হতো : ব্যাপারটা সম্পূর্ণ পৃথক। কাল গণনার একমাত্র গাণিতিক উপাদান ছিল কালের একক এবং কাল গণনার আরম্ভ বিন্দু। গ্রিনউইচের কাল, প্যারিসের কাল কিংবা নিউ ইয়র্কের কাল অনুসারে গণনা করা যেত—এতে পার্থক্য হতো প্রস্থান বিন্দুর (point of departure)। সেকেন্ডে, ঘণ্টায়, দিনে কিংবা বছরে গণনা করা যেত— সে ক্ষেত্রে পার্থক্য হতো এককের। এ ব্যাপারগুলো কিন্তু ছিল স্বতঃপ্রতীয়মান এবং তুচ্ছ। অবস্থান নির্দিষ্ট করার পদ্ধতির ব্যাপারে স্থানের অনুরূপ কোনো নির্বাচনের স্বাধীনতা ছিল না। তাছাড়া বিশেষ কিছু ভাবা হতো স্থানে অবস্থান নির্দিষ্ট করার পদ্ধতি এবং কালে অবস্থান নির্দিষ্ট করার পদ্ধতি—এ দুটিকে পরস্পর সাপেক্ষ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করা সম্ভব। এই সমস্ত কারণে লোকে ভাবত—স্থান এবং কাল সম্পূর্ণ পৃথক।

এ বিষয়ে পরিবর্তন এনেছে অপেক্ষবাদ। কালে অবস্থান নির্দিষ্ট করার এখন গাণিতিক বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। পদ্ধতিগুলির ভিতরে পার্থক্য শুধু একক এবং প্রস্থান বিন্দুর নয়। আসলে আগে আমরা দেখেছি এরকম গণনায় যদি একটি ঘটনা আর একটি ঘটনার সঙ্গে যুগপৎ হয় তাহলে অন্য গণনায় সেটা অগ্রবর্তী হবে এবং অন্য একটি গণনায় সেটা হবে পশ্চাদ্বর্তী। তাছাড়া স্থান এবং কাল গণনা এখন আর পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র নয়। আপনি যদি স্থানে অবস্থান গণনা করার পদ্ধতি পরিবর্তন করেন তাহলে হয়তো আপনি দুটি ঘটনার কাল অন্তরও পরিবর্তন করবেন। আপনি যদি কাল গণনার পদ্ধতির পরিবর্তন করেন তাহলে হয়তো আপনি স্থানে দুটি ঘটনার দূরত্বেরও পরিবর্তন করতে পারেন। সুতরাং স্থান এবং কাল এখন আর স্বতন্ত্র নয়। স্থানের তিন মাত্রায় যে স্বাতন্ত্র্য তার চাইতে বেশি স্বাতন্ত্র্য কালের নেই। একটি ঘটনার অবস্থান নির্ণয় করতে এখনো আমাদের চারটি রাশিই লাগে কিন্তু আগের মতো এখন আমরা একটিকে অন্য তিনটে থেকে আলাদা ভাবতে পারি না।

স্থান এবং কালে কোনো পার্থক্য আর নেই এ বিবৃতি কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। আমরা আগে দেখেছি কালানুরূপ অন্তর এবং স্থানানুরূপ অন্তরের অস্তিত্ব রয়েছে। এ যেরকম অনুমান করা হতো এ পার্থক্যটা তার চাইতে অন্যরকম। বিশ্বের সর্ব অংশে প্রযোজ্য কোনো দ্ব্যর্থবোধহীন (Without ambiguity) স্থানের অস্তিত্ব নেই। শুধুমাত্র রয়েছে মহাবিশ্বের নানা বস্তুপিণ্ড সাপেক্ষ

নানা 'বিশিষ্ট' (proper) কাল। যে দুটি বস্তুপিণ্ড দ্রুত চলমান নয়-- তাদের
কালের ভিতরে আসন্ন (approximate) ঐক্য রয়েছে। কিন্তু যে
পরস্পর সাপেক্ষ সম্পূর্ণ স্থিতিশীল সেগুলির ক্ষেত্রে ছাড়া এ ঐক্য কখনো
হতে পারে না।

ঘটনাবলীর এই পরিপ্রেক্ষিতে যে বিশ্বচিত্র প্রয়োজন তার রূপ এইরকম
আমাতে একটি ঘটনা E ঘটেছে এবং যুগপৎ আমার কাছ থেকে সর্বদিকে
আলোর ঝলক বহির্গত হয়েছে। আলোর ঝলক একটি বস্তুপিণ্ডে পৌছানো
বস্তুপিণ্ডে যাই ঘটুক না কেন সেগুলি ঘটেছে নিশ্চিতভাবে ঘটনা E এর
গণনা যে তন্ত্র হিসাবে হোক না কেন (any system of reckoning), এ
হবে। আমার ভিতরে ঘটনা E ঘটবার আগে আমি যদি যে কোনো জায়গায়
কোনো ঘটনা দেখে থাকি তাহলে সে ঘটনা নিশ্চিতভাবে E এর আগে ঘটেছে
গণনার যে কোনো তন্ত্র অনুসারে এ তথ্য সত্য। কিন্তু অন্তবর্তীকালে সংঘটিত
ঘটনা নিশ্চিতভাবে E ঘটনার আগে কিংবা পরে নয়। ব্যাপারটাকে আরো
নিশ্চিত করার জন্য উদাহরণ : অনুমান করা যাক আমি সিরিয়াসের (Sirius)
ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ করতে পারি এবং সেই সিরিয়াসবাসীও আমাকে পর্যবেক্ষণ
পারে। আমাতে ঘটনা E ঘটনার আগে সিরিয়াসবাসী করেছে এরকম যা আমি
পাই সেগুলি নিশ্চিতভাবে E এর পূর্ববর্তী। ঘটনা E দেখবার আগে সিরিয়াস
করা যা কিছু আমি E ঘটবার পর দেখতে পাই সেগুলি নিশ্চিতভাবে E
কিংবা পরে নয়। আলোকের সিরিয়াস থেকে পৃথিবীতে পৌছাতে সাড়ে
লাগে সুতরাং এ থেকে সিরিয়াসে আমরা সতের বছর সময় পাই যে সময়কে
বলতে পারি E এর সমসাময়িক (contemporary)-কারণ এ ঘটনাগুলি নিশ্চিত
E-এর আগে কিংবা পরে নয়।

ডা. এ. এ. রব (Dr. A. A Robb) তাঁর 'স্থান এবং কাল বিষয়ক তত্ত্ব' (The
of time and space) পুস্তকে একটি দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছেন— সে দৃষ্টিভঙ্গি
শাস্ত্রের দিক থেকে মূলগত হতে পারে, নাও হতে পারে। সেই যা
ব্যাপারটার বিবরণ দিতে আমরা চেষ্টা করছি সেটা বুঝতে এ দৃষ্টিভঙ্গি
সাহায্য করবে। তাঁর মতে একটি ঘটনাকে অন্য একটি ঘটনার নিশ্চিত পূর্ববর্তী
যায় তখনই যখন সে ঘটনা অন্য ঘটনাটিকে কোনোভাবে প্রভাবিত করে। এক
থেকে প্রভাব বিস্তৃত হয় নানা হারে। লন্ডন থেকে উদ্ভূত সংবাদপত্রের প্রভাব
কুড়ি মাইল হারে বিস্তার লাভ করে-- দূরত্ব দীর্ঘতর হলে এর চাইতে
হারেও করে।

সংবাদপত্রে প্রবন্ধ পাঠের ফলে একটি লোক যা কিছু করে সেগুলি স্পষ্টতই সংবাদপত্র মুদ্রণের পরবর্তী। শব্দ অনেক বেশি দ্রুতগামী। রাজপথ বরাবর লাউডস্পিকারের সার বসিয়ে কাগজের খবর একটা থেকে পরেরটায় চেঁচিয়ে বলা সম্ভব। কিন্তু টেলিগ্রাফ যায় আরো তাড়াতাড়ি আর রেডিও সঙ্কেত চলে আলোর বেগে সুতরাং এর চাইতে দ্রুত কিছু আশা করা যায় না। কোনো ব্যক্তি বেতার বার্তা পাওয়ার ফলে যে কাজ করে সে কাজ করা হয় বার্তা প্রেরণের পর; এক্ষেত্রে পরবর্তী শব্দের অর্থ কাল মাপনের রীতি নিরপেক্ষ। কিন্তু বার্তা যখন চলার পথে তখন যা করা হয় সেগুলি বার্তা প্রেরণের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে না এবং বার্তা প্রেরণের সামান্য কাল পরে ছাড়া বার্তা প্রেরককে প্রভাবিত করতে পারে না। সেই সময় অতিবাহিত হওয়ার আগে যা ঘটে সে ঘটনা দূরবর্তী বস্তুপিণ্ডকে প্রভাবিত করতে পারে না। দৃষ্টান্ত : অনুমান করা যাক সূর্যে একটি লক্ষণীয় ঘটনা ঘটেছে। ষোল মিনিট পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো ঘটনা সূর্যের সেই ঘটনাকে প্রভাবিত করতে পারে না কিংবা সে ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে না। ফলে পৃথিবীর ষোল মিনিট কালকে সূর্যের ঘটনার পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী না ভাববার বাস্তব যুক্তি রয়েছে।

বিশিষ্ট অপেক্ষবাদের স্ববিরোধগুলিকে (paradox) স্ববিরোধী মনে হয় শুধুমাত্র আমরা ঐ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত নই বলে : এবং যে সমস্ত তথ্যকে সত্য বলে মেনে নেওয়ার কোনো অধিকার আমাদের নেই, সেই সমস্ত তথ্যকে সত্য বলে গ্রহণ করার অভ্যাসের দরুন। দৈর্ঘ মাপন ব্যাপারে এ তথ্য বিশেষভাবে সত্য। দৈনন্দিন জীবনে আমাদের দৈর্ঘ্য মাপনের পদ্ধতি ফুটরুল (foot rule) কিংবা অন্য কোনো মানদণ্ড প্রয়োগ করা। প্রয়োগের মুহূর্তে ফুটরুলটি যে জিনিসটিকে মাপা হচ্ছে সেটি সাপেক্ষ স্থিতিশীল। সুতরাং মাপনের সাহায্যে যে দৈর্ঘ্য পাওয়া যায় সেটাই 'সঠিক' (proper) দৈর্ঘ্য। অর্থাৎ সে দৈর্ঘ্য স্থির করেছেন এমন একজন পর্যবেক্ষক যিনি ঐ বস্তুপিণ্ডের গতির অংশীদার। সাধারণ জীবনে আমাদের কখনোই অবিরাম চলমান বস্তুপিণ্ড মাপনের সমস্যা সমাধান করতে হয় না। পৃথিবীর বেগের তুলনায় পৃথিবীতে অবস্থিত দৃশ্যমান বস্তুপিণ্ডগুলির বেগ এত কম যে আমাদের যদি সে সমস্যার সমাধান করতে হতো তাহলেও অপেক্ষবাদ যে সমস্ত অসঙ্গতি নিয়ে বিচার করেছে সেগুলি প্রকাশ পেত না। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানে কিংবা আণবিক গঠন অনুসন্ধানে আমরা এমন কতগুলি সমস্যায় পড়ি যেগুলির সমাধান এভাবে সম্ভব নয়। আমরা যোশুয়া (Joshua) নই সুতরাং মাপবার সময় সূর্যকে আমরা স্থিতিশীল করতে পারি না। সূর্যের আয়তন পরিমাপ

করতে হলে করতে হবে সূর্য যখন পৃথিবী সাপেক্ষ চলমান তখনই। ইলেকট্রন সাপেক্ষও ব্যাপারটা একই। ইলেকট্রন মাপতে হবে দ্রুত চলমান অবস্থায়। কারণ ইলেকট্রন মুহূর্তের জন্যও স্থির থাকে না। এই রকম সমস্যা নিয়ে অপেক্ষবাদের চিন্তন। ফুটরুল দিয়ে যখন মাপা সম্ভব তখন মাপনফল সবসময়ই এক হয়। কারণ এ পদ্ধতিতে আমরা পাই বস্তুপিণ্ডের 'সঠিক' (proper নিজস্ব) দৈর্ঘ্য। এ পদ্ধতি যখন সম্ভব নয় বিশেষ করে যে বস্তুপিণ্ডকে মাপতে হবে সেটা যখন পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ দ্রুত চলমান তখন অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটে। ব্যাপারটা বুঝতে হলে আগের অধ্যায়ের শেষের চিত্রটির মতো একটা চিত্র আমাদের সাহায্য করতে পারে।

অনুমান করা যাক যে বস্তুপিণ্ডের দৈর্ঘ্য আমরা মাপতে চাই সেটা আমার সাপেক্ষ চলমান এবং সেটি এক সেকেন্ডে OM দৈর্ঘ্য অতিক্রম করে। O কে কেন্দ্র করে একটি বৃত্ত আঁকা যাক। আলোক এক সেকেন্ডে যে দূরত্ব অতিক্রম করে সেটা হবে বৃত্তের ব্যাসার্ধ। M থেকে OM এর উপর MP লম্ব আঁকুন। লম্বটি বৃত্তের সঙ্গে মিলিত হবে P বিন্দুতে। তাহলে OP হবে আলোক এক সেকেন্ডে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তার সমান। OP এর সঙ্গে OM -র অনুপাত তাহলে আলোকের বেগের সঙ্গে বস্তুপিণ্ডের বেগের অনুপাত। গতির ফলে আপাতদৃশ্য দৈর্ঘ্যের যে পরিবর্তন হয় সেটা হল OP এর সঙ্গে MP -র অনুপাত। অর্থাৎ একজন পর্যবেক্ষকের বিচারে একটি চলমান বস্তুপিণ্ডের গতিরেখার দুটি বিন্দুর পারস্পরিক দূরত্বের প্রতিরূপ যদি MP হয় তাহলে ঐ বস্তুপিণ্ডের সঙ্গে চলমান একটি ব্যক্তির বিচারে ঐ দূরত্বে প্রতিরূপ (একই মাপক্রমে scale) হবে OP। চলমান বস্তুপিণ্ডের উপর গতিরেখার সমকোণীয় দূরত্ব গতিদ্বারা প্রভাবিত হয় না। পুরো ব্যাপারটাই পারস্পরিক (reciprocal)। অর্থাৎ বস্তুপিণ্ডটির সঙ্গে চলমান একজন পর্যবেক্ষক যদি আগের পর্যবেক্ষকের বস্তুপিণ্ডের উপরের দৈর্ঘ্য মাপেন তাহলে তার পরিবর্তন হবে একই অনুপাতে। দুটি বস্তুপিণ্ড যখন পরস্পর সাপেক্ষ চলমান তখন একটির উপরের দৈর্ঘ্য নিজেদের তুলনায় অপরের কাছে হ্রস্ব বলে মনে হয়। এরই নাম লোরেঞ্জ সঙ্কোচন (Loreniz contraction)। মিচেলসন-মর্লি পরীক্ষাফল ব্যাখ্যা করার জন্য এ তথ্য প্রথম আবিষ্কৃত হয়। যগপত্তা সম্পর্কে দু'জন পর্যবেক্ষকের বিচার এক হয় না। এই তথ্য থেকে লোরেঞ্জ সঙ্কোচন তত্ত্বের আবির্ভাব স্বাভাবিক।

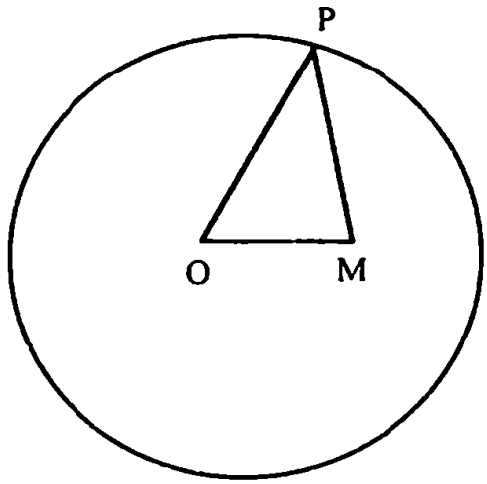

যুগপত্তা আসছে এইভাবে : যখন আমরা একটি বস্তুপিণ্ডের দুটি বিন্দুর একটিতে ফুটরুলের একপ্রান্ত এবং অন্যটিতে ফুটবলের অন্যপ্রান্ত 'যুগপৎ' প্রয়োগ করতে পারি তখন আমরা বলি বিন্দু দুটির দূরত্ব এক ফুট। কিন্তু দুটি ব্যক্তির যদি যুগপত্তা বিষয়ে মতানৈক্য থকে এবং বস্তুপিণ্ডটি যদি চলমান হয় তাহলে তাদের মাপনের মাপনফল ভিন্ন ভিন্ন হবে এ তথ্য স্বতঃপ্রতীয়মান। সুতরাং দূরত্ব বিষয়ক সঙ্কটের মূলে রয়েছে কাল বিষয়ক সঙ্কট।

এই সমস্ত বিষয়ের মূলে রয়েছে (essential thing) OP-এর সঙ্গে MP -এর অনুপাত। আলোচ্য বস্তুপিণ্ড যখন পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ চলমান তখন কাল, দৈর্ঘ্য এবং ভর এই অনুপাতে পরিবর্তিত হয়। দেখা যাবে OM যদি OP -এর তুলনায় খুব ছোট হয় অর্থাৎ বস্তুপিণ্ডের গতি আলোকের তুলনায় অত্যন্ত অল্প হলে MP এবং OP হবে প্রায় সমান সুতরাং গতির ফলে পরিবর্তনের পরিমাণ হবে অত্যন্ত অল্প। কিন্তু OM যদি OP-এর সমান হয় অর্থাৎ বস্তুপিণ্ডটির গতি যদি প্রায় আলোকের সমান হয় তাহলে OP-এর তুলনায় MP হয় অত্যন্ত ছোট এবং পরিমাফল (effect) হয় অত্যন্ত বেশি। দ্রুতগামী বস্তুকণাগুলির ভরের আপাতদৃষ্ট বৃদ্ধি আগেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল এবং বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ আবিষ্কারের আগেই গাণিতিক সঙ্কেতও (formula) আবিষ্কৃত হয়েছিল। লোরেঞ্জ রূপান্তর (Lorentz transformation) নামক সঙ্কেত লোরেঞ্জ আবিষ্কার করেছিলেন। আসলে বিশিষ্ট আপেক্ষবাদের গাণিতিক সারাংশের (mathematical essence) সবটাই এ সঙ্কেতের অঙ্গীভূত। কিন্তু আইনস্টাইনই দেখিয়েছিলেন পুরো ব্যাপারটাই তাত্ত্বিকরূপ ; বিস্ময়কর পরীক্ষাফল ব্যাখ্যা করার জন্য এক গুচ্ছ অস্থায়ী কৌশল

মাত্র নয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষলব্ধ ফলই ছিল সম্পূর্ণ তত্ত্বটির প্রাথমিক [illegible] একথা কিন্তু ভুললে চলবে না। ভুললে চলবে না, অপেক্ষবাদের সঙ্গে [illegible] বিরাট যৌক্তি পুনর্গঠনের দায় গ্রহণ করার কারণ ছিল এই পরীক্ষাফল।

এবার আমরা স্থান এবং কালের পরিবর্তে 'স্থান-কাল' প্রতিস্থাপন [illegible] প্রয়োজনগুলি পুনরাবৃত্তি করতে পারি, স্থান এবং কালের প্রাচীন বিচ্ছি[illegible] প্রতিষ্ঠিত ছিল এই বিশ্বাসের উপর ; দূরস্থিত দুটি ঘটনা একই কালে ঘটে[illegible] এই কথার ভিতর দ্ব্যর্থবোধক কিছু নেই। সেই জন্য চিন্তা করা হতো যে [illegible] একটি বিশেষ মুহূর্তে ব্রহ্মাণ্ডের সংস্থান বিবরণ (topography of the Univ[illegible] শুদ্ধ স্থানিক বাগ্বিধিতে (purely spatial terms) প্রকাশ করা সম্ভব। কিন্তু [illegible] যুগপত্তার অর্থ দাঁড়িয়েছে একজন বিশেষ পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ যুগপত্তা, সুতরাং [illegible] পদ্ধতি এখন অচল। একজন পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ যেটা এক বিশেষ মুহূর্তে [illegible] অবস্থার বিবরণ আর একজন পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ যেটা এক বিশেষ মুহূর্তে [illegible] অবস্থার বিবরণ আর একজন পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ সেটা নানা ভিন্ন ভিন্ন [illegible] ঘটনার মালিকামাত্র। সে ঘটনাগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক শুধু স্থানিক [illegible] কালিকও বটে। সেই জন্যই আমাদের বিচার 'ঘটনা' (events) নিয়ে, [illegible] (body) নিয়ে নয়। আগেকার তত্ত্বে একই মুহূর্তে একাধিক বস্তুপিণ্ড সম্পর্কে [illegible] সম্ভব ছিল। প্রতিটি বস্তুপিণ্ড সাপেক্ষ কাল ছিল অভিন্ন সুতরাং কালকে অগ্রাহ্য [illegible] যেত। কিন্তু ভৌত ঘটনাগুলি সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ করতে হলে এখন [illegible] আমরা কালকে অগ্রাহ্য করতে পারি না। একটি বস্তুপিণ্ড বিচারের [illegible] আমাদের উল্লেখ করতে হবে, এইভাবে আমরা উপনীত হব ঘটনায় অর্থাৎ [illegible] বিশেষ কালে ঘটমান একটা কিছুতে। একজন পর্যবেক্ষকের গণনাপদ্ধতি অনুযা[illegible] একটি ঘটনার স্থান এবং কাল জানলে আমরা অন্য পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ সে [illegible] স্থান এবং কাল গণনা করতে পারি। আগের পর্যবেক্ষকের 'সমকালে' [illegible] time) পরের পর্যবেক্ষকের স্থান কোথায়? এ প্রশ্ন আর করা সম্ভব নয়। [illegible] আমাদের স্থান এবং কাল দুটোই জানতে হবে, বিভিন্ন পর্যবেক্ষক পরস্পর [illegible] স্থিতিশীল না হলে তাদের সবার 'একই' কালের কোনো অস্তিত্ব নেই। [illegible] অবস্থান নির্দিষ্ট করতে আমাদের চারটি মাপন প্রয়োজন। এই চারটি মাপন [illegible] কালে একটি ঘটনার অবস্থান নির্দিষ্ট করে— শুধুমাত্র স্থানে বস্তুপিণ্ডের [illegible] নির্দিষ্ট করে না। একটি অবস্থান নির্দিষ্ট করতে তিনটি মাপন যথেষ্ট নয়। [illegible] কালের স্থলে 'স্থান-কাল' প্রতিস্থাপনের অর্থের সারাংশ এটাই।

৬

বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ

বিদ্যুৎচুম্বকীয় তথ্য ব্যাখ্যা করার একটি পদ্ধতি রূপেই বিশিষ্ট অপেক্ষবাদের উদ্ভব। এই ইতিহাস বেশ অদ্ভূত। অষ্টাদশ শতাব্দী এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিদ্যুৎ বিষয়ক তত্ত্ব ছিল সম্পূর্ণভাবে নিউটনীয় তত্ত্বের সঙ্গে (Newtonian Analogy) সাদৃশ্যের প্রভাবাধীন। দুটি বৈদ্যুতিক আধান (electric charge) সমরূপের হলে অর্থাৎ একটি করা আধান (পজিটিভ্ আধান- Positive charge) এবং একটি অপরা আধান (নেগেটিভ আধান -Negative charge) হলে তারা পরস্পরকে আকর্ষণ করবে। আধান সমরূপের হলে তারা পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে। মহাকর্ষের ক্ষেত্রে যেমন হয় তেমনি এর প্রতিটি ক্ষেত্রে বল বিপরীত বর্গে (inverse square) পরিবর্তী। ফ্যারাডের পূর্বে এই বলকে দূরের ক্রিয়ারূপে কল্পনা করা হতো। ফ্যারাডে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষার সাহায্যে অন্তবর্তী মাধ্যমের ক্রিয়া প্রদর্শন করেন। ফ্যারাডে গণিতবিদ্ ছিলেন না। ক্লার্ক-ম্যাক্সওয়েলই প্রথম ফ্যারাডের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালব্ধ ফলকে গাণিতিক রূপ দিয়েছেন। তাছাড়া আলোক একটি বিদ্যুৎচুম্বকীয় পরিঘটনা এবং বিদ্যুৎচুম্বকীয় তরঙ্গ দিয়ে আলোক গঠিত এই চিন্তনের ভিত্তি এসেছে ক্লার্ক-ম্যাক্সওয়েলের কাছ থেকে। সুতরাং বিদ্যুৎচুম্বকীয় অভিক্রিয়া প্রেরণের মাধ্যম হিসাবে ইথারকে গ্রহণ করা যেত। ইথার আলোক প্রেরণের মাধ্যম এ অনুমান বহুকালের। বিদ্যুৎচুম্বকীয় তরঙ্গ তৈরি বিষয়ে হার্জ (Hertz)-এর পরীক্ষাগুলি ম্যাক্সওয়েলের আলোকতত্ত্বের নির্ভুলতা প্রমাণ করেছে। বেতার এবং রাডারের ভিত্তিও এই পরীক্ষাগুলি। এই পর্যন্ত রয়েছে আমাদের বিজয়োদ্ধত অগ্রগতির স্মারক (record of triumphant progress) তত্ত্ব এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা পর্যায়ক্রমে এই অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছে। হার্জের পরীক্ষার সময় মনে হয়েছে ইথার দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্ভব নয় এই রকম যে কোনো বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের (hypothesis) মতোই দৃঢ় ছিল ইথারের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু আবিষ্কার হতে শুরু করল নতুন তথ্যমালা এবং ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হল সম্পূর্ণ চিত্র।

সব জিনিসকে সন্তত (continuous) করার এই আন্দোলনকে সর্বোচ্চ স্তরে তুলে ধরেন হার্জ। ইথার ছিল সন্তত, ইথার তরঙ্গ ছিল সন্তত এবং আশা করা গিয়েছিল দেখা যাবে পদার্থের উপাদানেও রয়েছে ইথারের ভিতরের কয়েকটি সন্তত গঠন (structure)। কিন্তু তারপর আবিষ্কৃত হল পদার্থের পারমাণবিক গঠন আর পরমাণুগুলির নিজস্ব বিবিক্ত (discrete) গঠন। বিশ্বাস ছিল পরমাণুগুলি

ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন দিয়ে গঠিত। ইলেকট্রন— নির্দিষ্ট নিশ্চিত অপরা বৈদ্যুতিক আধান বহনকারী ক্ষুদ্র বস্তুকণা। প্রোটন বহন করে নির্দিষ্ট নিশ্চিত বৈদ্যুতিক আধান Positive electric charge)। নিউট্রনে কোনো বৈদ্যুতিক আধান নেই (ইলেকট্রনকে অপরা এবং প্রোটনকে পরা বলা হয়। উল্টোটা বলা হয় না শুধুমাত্র রীতির জন্য)। মনে হয়েছিল সম্ভবত ইলেকট্রন আর প্রোটনে আধান রূপে ছাড়া বিদ্যুৎ পাওয়া যায় না। সমস্ত ইলেকট্রনেই ঠিক একই অপরা বৈদ্যুতিক আধান রয়েছে এবং সমস্ত প্রোটনেই রয়েছে ঠিক সমান বিপরীতধর্মী পরা বিদ্যুৎ আধান। এরপর আরো ঊনপারমাণবিক কণা (sub-atomic particles) আবিষ্কৃত হয়। সমস্ত প্রোটনের ওজন অভিন্ন। এগুলি ইলেকট্রনের চাইতে প্রায় আঠার শত গুণ বেশি ভারী। সমস্ত নিউট্রনেরও ওজন ঠিক এক (exactly same weight) এগুলি প্রোটনের চাইতে সামান্য বেশি ভারী। মেসন অনেক ভিন্ন ভিন্ন রকমের রয়েছে। সেগুলির ওজন ইলেকট্রনের চাইতে বেশি কিন্তু প্রোটনের চাইতে কম। হাইপেরন প্রোটন কিংবা নিউট্রনের চাইতে ভারী।

কতগুলি কণায় বৈদ্যুতিক আধান রয়েছে আবার কতগুলিতে নেই। দেখা গিয়েছে পরা আধানযুক্ত কণাগুলির আধান একেবারেই প্রোটনের সমান আর অপরা আধানযুক্ত কণাগুলির আধান যথাযথভাবে ইলেকট্রনের সমান। অথচ তাদের অন্যান্য ধর্মগুলি একেবারেই পৃথক। পজিট্রন (positron) নামে এক বস্তুকণা ব্যাপারটাকে আরো গোলমেলে করে দিয়েছে। এই বস্তুকণা এক ইলেকট্রন অভিন্ন অথচ তার বৈদ্যুতিক আধান পরা, ইলেকট্রনের মতো অপরা নয়। পরীক্ষামূলকভাবে এমন কণা সৃষ্টি করা সম্ভব যা সর্ববিষয়ে প্রোটনের সঙ্গে অভিন্ন, শুধুমাত্র তার বৈদ্যুতিক আধান অপরা, এগুলির নাম এ্যান্টিপ্রোটন (antiproton)।

পদার্থের বিবিক্ত গঠন সম্পর্কীয় এই আবিষ্কারগুলিকে পরমাণুর বর্ণালীর উজ্জ্বল রেখাগুলির মতো অন্যান্য তথাকথিত কোয়ান্টাম পরিঘটনা আবিষ্কার থেকে পৃথক করা যায় না। মনে হয় যেখানেই যথেষ্ট নির্ভুল মাপন সম্ভব, প্রকৃতির সমস্ত পদ্ধতি সেখানেই মূলগত বিচ্ছিন্নতা প্রদর্শন করে।

পদার্থবিদ্যাকে এইভাবে হজম করতে হয়েছে নতুন নতুন তথ্য এবং মুখোমুখি হতে হয়েছে একাধিক নতুন সমস্যার। কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রায় আধুনিক অবয়বে বর্তমান রয়েছে ষাট বছর এবং বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ রয়েছে আশি বছর কিন্তু এই দুটির সংযুক্ত বিষয়ে ত্রিশ বছর আগে পর্যন্ত বিশেষ কোনো অগ্রগতি হয়নি

সাম্প্রতিক বিকাশের ফলে কোয়ান্টাম তত্ত্ব বিশিষ্ট অপেক্ষবাদের সঙ্গে আরো সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে। এই অগ্রগতি ঊনপারমাণবিক কণা বুঝতে আমাদের অনেক সাহায্য করছে কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ অসুবিধা রয়ে গিয়েছে।

কোয়ান্টাম তত্ত্ব ছাড়াও যে সমস্ত সমস্যা বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ নিজ কৃতিত্বে (in its own right) সমাধান করেছে মিচেলসন-মর্লি পরীক্ষা তার একটি জাতিরূপ (prototype)। ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎচুম্বকীয় তত্ত্বের সত্যতা মেনে নিলে ইথারের ভিতর কোনো আবিষ্কারযোগ্য ক্রিয়া থাকা উচিত ছিল কিন্তু কোনো কিছুই আসলে পাওয়া যায়নি। তাছাড়া অত্যন্ত দ্রুতগতিতে একটি বস্তুপিণ্ডের ভর বৃদ্ধি দেখা যায়; এ তথ্য পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এই বৃদ্ধি আগের অধ্যায়ের চিত্রের OP-এর সঙ্গে AP-এর অনুপাতের সমান। এই ধরনের তথ্য জমতে থাকে এবং প্রয়োজন হয় এমন একটি তত্ত্বের যে তত্ত্ব এই সমস্ত তথ্যকে ব্যাখ্যা করতে পারে।

ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব কতকগুলি সমীকরণে পরিণত হয়েছিল। সেগুলির নাম 'ম্যাক্সওয়েল সমীকরণ'। গত শতাব্দীতে পদার্থবিদ্যায় যে ক'টি বিপ্লব হয়েছে তার প্রতিটি অতিক্রম করেও ম্যাক্সওয়েল সমীকরণ বেঁচে আছে (remained standing)। আসলে এই সমীকরণগুলির গুরুত্ব এবং নিশ্চয়তা ক্রমশই বেড়েছে। এগুলির সপক্ষে ম্যাক্সওয়েলের যুক্তি ছিল এত দুর্বল যে এর নির্ভুলতার কৃতিত্ব প্রায় স্বজ্ঞার (intuition) উপরেই আরোপ করা উচিত সন্দেহ নেই। এই সমীকরণগুলির ভিত্তি ছিল পার্থিব গবেষণাগারে কৃত পরীক্ষা কিন্তু ইথারের ভিতর দিয়ে পৃথিবীর গতি অগ্রাহ্য করা যেতে পারে এই নীরব অনুমান ম্যাক্সওয়েল তত্ত্বে নিহিত ছিল। মিচেলসন-মর্লি পরীক্ষার মতো কতকগুলি ক্ষেত্রে মাপনযোগ্য ভুল ছাড়া এটা সম্ভব হওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু দেখা গেল ব্যাপারটা সব সময়ই সঠিক। পদার্থবিদ্যাবিদরা এক অদ্ভুত সঙ্কটে পড়েছিলেন : ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণগুলি ছিল যতটা হওয়া উচিত তার চাইতেও নির্ভুল। আধুনিক পদার্থবিদ্যার শুরুতে একই রকম এক সঙ্কট ব্যাখ্যা করেছিলেন গ্যালিলিও। অধিকাংশ লোকেরই ধারণা একটি ওজনকে পড়তে দিলে সেটা পড়বে উল্লম্বভাবে (vertically)। কিন্তু আপনি যদি একটি চলমান জাহাজের কেবিনে এই পরীক্ষা করেন তাহলে কেবিন সাপেক্ষ ওজনটির পতন এমনভাবে হবে যেন জাহাজটি দাঁড়িয়ে। উদাহরণ: ওজনটা ছাতের মাঝখান থেকে পড়তে শুরু করলে ঠিক মেঝের মাঝখানে এসে পড়বে। তীরের একজন পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ পতন কিন্তু লম্ব (vertical) নয় কারণ ওজনটা জাহাজের গতির অংশীদার। যতক্ষণ পর্যন্ত জাহাজের গতি অবিচলিত (steady) ততক্ষণ পর্যন্ত জাহাজের ভিতরের ঘটনাবলী

এমন ভাবে হবে যেন জাহাজটি চলমান নয়। ব্যাপারটা কি করে হয় সে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন গ্যালিলিও। অ্যারিস্টটলের শিষ্যরা তাতে খুব অপমানিত বোধ করেছিলেন, বেজায় রেগে গিয়েছিলেন। গ্যালিলিও থেকে আহরিত প্রাচীন পদার্থবিদ্যা অনুসারে ঋজুরেখায় সমরূপ গতির কোনো আবিষ্কারযোগ্য অভিক্রিয়া (discoverable effects) নেই। আজকের দিনে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা যে রকম বিস্ময়কর সে সময়ে গ্যালিলিওর আপেক্ষিকতাও (form of relativity) ছিল সেই রকম। বিশিষ্ট অপেক্ষবাদে আইনস্টাইনের কর্মপ্রচেষ্টা ছিল ইথারের ভিত্তি দিয়ে সমরূপ গতি দ্বারা কি করে বিদ্যুৎচুম্বকীয় পরিঘটনা অপ্রভাবিত থাকতে পারে সেটা দেখানো : অবশ্য ইথার বলে কিছু যদি থেকে থাকে তাহলে। এ সমস্যা ছিল আরো কঠিন। শুধুমাত্র গ্যালিলিওর নীতির ভিত্তিতে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব ছিল না।

এ সমাধানের সত্যিকারের কঠিন প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল কালিক সমস্যা বিষয়ে। প্রয়োজন ছিল বিশিষ্ট কাল সম্পর্কীয় ধারণা উপস্থাপন করা। এ বিষয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। আর প্রয়োজন ছিল এক ব্রহ্মাণ্ডীয় কাল সম্পর্কীয় প্রাচীন বিশ্বাস পরিত্যাগ করা। বিদ্যুৎচুম্বক পরিঘটনা সম্পর্কিত পরিমাণগত বিধি ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণে প্রকাশিত। দেখা যায় সমস্ত পর্যবেক্ষক সাপেক্ষই এই সমীকরণগুলি সত্য পর্যবেক্ষকের প্রযুক্ত মাপনের সাথে অন্য একজন পর্যবেক্ষকের প্রযুক্ত মাপনের পার্থক্য থাকবেই। তাদের আপেক্ষিক গতি সত্ত্বেও যদি তারা ঐ সমীকরণগুলির সত্যতা প্রমাণ করতে চায় তাহলে যে পার্থক্য নির্ণয় করা একটি প্রত্যক্ষ গাণিতিক সমস্যা মাত্র। এ সমস্যার উত্তর রয়েছে 'লোরেঞ্জ রূপান্তরে'। এটা একটা সঙ্কেতরূপে আবিষ্কার করেছিলেন লোরেঞ্জ (Lorentz) কিন্তু এর ব্যাখ্যা করেছিলেন আইনস্টাইন এবং একে বোধগম্য করেছিলেন তিনি।

একজন পর্যবেক্ষকের দূরত্ব এবং পরিব্যাপ্তিকাল আমাদের জানা থাকলে যার আপেক্ষিক গতি জানা আছে সেই রকম অন্য একজন পর্যবেক্ষকের প্রথমোক্ত পর্যবেক্ষকের দূরত্ব এবং পরিব্যাপ্তিকাল (Period of time) সম্পর্কে সম্ভাব্য অনুমান (estimate) প্রকাশ করেছে লোরেঞ্জ রূপান্তর।

আমরা অনুমান করতে পারি ঠিক পূর্বদিকগামী একটা রেলগাড়িতে আপনি রয়েছেন। যে স্টেশন থেকে আপনার যাত্রা শুরু সেই স্টেশনের ঘড়ি অনুযায়ী আপনার ভ্রমণকাল 't'। লাইনের উপরের লোকেদের মাপন অনুসারে আপনার যাত্রা বিন্দু থেকে x দূরত্বে এই মুহূর্তে একটা ঘটনা ঘটে— ধরুন লাইনে

...ল। সব সময়ই আপনি গতি 'V' তে ভ্রমণ করছিলেন। প্রশ্নটা হল : আপনার ...রে আপনার থেকে কতটা দূরে ঘটনাটা ঘটেছে বলে মনে হবে এবং ...গাড়িতে অবস্থিত একজন পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি আপনার ঘড়ি নির্ভুল ...মান করা হয় তাহলে সেই ঘড়ি অনুসারে আপনার যাত্রা শুরুর কতক্ষণ পর ...টনাটা ঘটেছে?

আমরা এই সমস্যার যে সমাধান করব সে সমাধানের কয়েকটি শর্ত পালন ...তে হবে। সমাধান ফল এমন হতে হবে যে গতির প্রকার নির্বিশেষে সমস্ত ...বেক্ষক সাপেক্ষই আলোকের বেগ অভিন্ন হবে। তাছাড়া বিভিন্ন ভৌত ...ঘটনা, বিশেষ করে বিদ্যুৎচুম্বকীয় পরিঘটনাগুলিকে, বিভিন্ন পর্যবেক্ষক ...পেক্ষ একই বিধি মানতে হবে। তাদের নিজস্ব গতির ফলে তাদের কাল এবং ...মাপনে যতই ভিন্নতা প্রদর্শিত হোক না কেন ভৌত পরিঘটনাগুলিকে, বিশেষ ...র বিদ্যুৎচুম্বকীয় পরিঘটনাগুলিকে এই বিধি মানতে হবে। তাছাড়া মাপনের ...রা নেই সমস্ত অভিক্রিয়াকে করতে হবে পারস্পরিক। অর্থাৎ আপনি যদি ট্রেনে ...কেন এবং আপনার গতি যদি ট্রেনের বাইরের সম্ভাব্য দূরত্ব সম্পর্কে আপনার ...মানকে প্রভাবিত করে তাহলে যাঁরা ট্রেনের বাইরে আছেন, ট্রেনের ভিতরকার ...ব্য দূরত্ব সম্পর্কে তাঁদের অনুমানকেও ঠিক একই রকম প্রভাবিত হতে হবে। ...শর্তগুলি সমস্যার সমাধান নির্দেশ করার পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু সমাধানের জন্য ...পরিমাণ গণিত প্রয়োজন এ পুস্তকে নিজেকে সে পরিমাণ গণিত ব্যবহারের ...মতি আমি দিইনি।

...্যাপারটা সাধারণভাবে আলোচনা করার আগে একটা উদাহরণ বিবেচনা ...া যাক। অনুমান করা যাক আপনি দীর্ঘ ঋজুমুখী রেললাইনের উপরে একটা ...ন রয়েছেন এবং আলোকের গতির পাঁচভাগের তিনভাগ গতিতে সঠিক পূর্ব ...ক চলেছেন। অনুমান করুন রেললাইনের দৈর্ঘ্য আপনি মেপেছেন এবং ...খছেন গাড়িটা একশ' গজ লম্বা। ধরুন— চলার পথে যারা আপনাকে এক ...ক দেখতে পেয়েছে এবং তারা পর্যবেক্ষণের দক্ষতাপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ...য়ে আপনার গাড়ির দৈর্ঘ্য গণনা করতে পেরেছে। তাদের গণনা নির্ভুল হলে ...া দেখতে পাবে গাড়ির দৈর্ঘ্য আশি গজ, তাদের কাছে রেলগাড়ির গতির ...মুখে গাড়ির ভিতরের প্রতিটি জিনিসেরই দৈর্ঘ্য আপনার যা মনে হয় তার ...কম মনে হবে। আপনার দৃষ্টিতে খাওয়ার থালাগুলি সাধারণ বৃত্তাকার কিন্তু ...রের লোকের দৃষ্টিতে সেগলিকে মনে হবে ডিম্বাকৃতি। গাড়ির প্রস্থের ...মুখের তুলনায় গাড়ির গতির অভিমুখে থালাগুলি মনে হবে চার-পঞ্চমাংশ

চওড়া। সমস্তই আবার পারস্পরিক। ধরুন—আপনি জানালা দিয়ে এক
ধরার ছিপ দেখতে পাচ্ছেন। যে লোকটি নিয়ে চলেছে সে দেখছে ছিপটা
গজ লম্বা। সেটা যদি খাড়া ভাবে (held upright) নেওয়া হয় তাহলে
দেখবেন ওটা পনের ফুট লম্বা। ছিপটাকে যদি আনুভূমিকভাবে এবং রেললাইনের
সঙ্গে সমকোণে বহন করা হয় (carried horizontally) তাহলেও ওটা পনের
লম্বাই মনে হবে। কিন্তু রেললাইনের অভিমুখী হলে মনে হবে ছিপটা মোটে
ফুট লম্বা। যা দেখা যাচ্ছে তার বিবরণ দেওয়ার সময় আমি অনুমান
প্রত্যেকেই দর্শনানুপাতের সমুচিত বিচার করেছেন (due allowance for per-
spective)। তা সত্ত্বেও বাইরের লোকের বিচারে রেলগাড়ির প্রত্যেক
দৈর্ঘ্যই গতির অভিমুখে শতকরা কুড়িভাগ কমবে। রেলগাড়িতে আপনার
বাইরের জিনিসগুলির একই অবস্থা হবে।

কিন্তু সময় সাপেক্ষ ক্রিয়াগুলি হবে আরো অদ্ভুত।

এ ব্যাপারটা প্রায় আদর্শ প্রাঞ্জলতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছিলেন
আমার উদাহরণের ভিত্তি তাঁরই একটা উদাহরণ :

এমন একটা মহাকাশযান কল্পনা করুন যেটা প্রতি সেকেন্ডে পৃথিবী
১,৫৬,০০০ মাইল দূরে অপসৃত হচ্ছে। যদি আপনি মহাকাশযানের
মানুষদের পর্যবেক্ষণ করতে পারতেন তাহলে আপনার সিদ্ধান্ত হতো ওদের
অস্বাভাবিক মন্থর। মহাকাশযানের অন্যান্য ঘটনার গতিও একই রকম মন্থর
হতো। মনে হতো সেখানে সংগঠিত সমস্ত ঘটনাই সাধারণের চাইতে দ্বিগুণ
নিয়েছে। সিদ্ধান্ত (infer) কথাটা আমি বিশেষ বিবেচনা করেই ব্যবহার
আপনি কালের আরো অনেক বেশি মন্থরগতি লক্ষ্য করবেন। ব্যাপারটা
করা কিন্তু সহজ। কারণ আপনার কাছ থেকে মহাকাশযানের দূরত্ব দ্রুত
এবং আলোকবাহিত অনুভূতি (light impression) আপনার কাছে পৌঁছাতে
বেশি সময় নিচ্ছে। আলোক প্রেরণের সময় বিচারের পর যা অবশিষ্ট থাকে
এর আগে স্বল্পতর মন্থরতারূপে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এখানেও পারস্পরি
ক্রিয়ার (reciprocity) প্রশ্ন আসে। মহাকাশযানের যাত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে
তাদের কাছ থেকে সেকেন্ডে ১,৫৬,০০০ মাইল দূরে অপসৃত হচ্ছেন
দিক হিসাব করার পর তারা দেখছে আপনিই মন্থর।

সময়ের এই প্রশ্নটা জটিল। তার কারণ যে সমস্ত ঘটনা একজনের
যুগপৎ অন্যের বিচারে সেগুলি কালিক ব্যবধান দিয়ে বিচ্ছিন্ন। সময়
প্রভাবিত হয় সে তথ্য স্পষ্ট করার জন্য আমি আলোকের বেগের পাঁচ

...ণ বেগে সঠিক পূর্বদিকগামী রেলগাড়ি প্রসঙ্গে ফিরে যাব। উদাহরণ দেওয়ার ...র্থে আমি অনুমান করব পৃথিবীটা বড় এবং চ্যাপ্টা—ছোট এবং গোলকাকৃতি ...।

আমরা যদি পৃথিবীর একটি স্থির বিন্দুতে সংঘটিত একাধিক ঘটনা বিচার করি ...ং নিজেদের প্রশ্ন করি ঘটনা শুরু করার কতক্ষণ পর যাত্রীরা সেগুলি বুঝতে ...রবে তাহলে তার উত্তর হবে : এডিংটন উল্লিখিত মন্থরতা এক্ষেত্রে থাকবে। ...র্থাৎ মাটিতে যাঁরা তাঁদের কাছে যে কাল একঘণ্টা মনে হবে, রেলগাড়ি থেকে ...রা পর্যবেক্ষণ করছেন তাঁদের বিচারে সে কাল মনে হবে সোয়া একঘণ্টা এবং ...াপারটা হবে পারস্পরিক। পারস্পরিকভাবে ট্রেনের লোকের জীবনে যে কাল ...কঘণ্টা মনে হবে বাইরের লোক পর্যবেক্ষণ করলে তাদের বিচারে মনে হবে সে ...াল সোয়া একঘণ্টা। প্রত্যেকেই অপরের জীবনের কালকে সে জীবন যারা যাপন ...রছে তাদের তুলনায় এক-চতুর্থাংশ বাড়িয়ে দেখে। কালের ক্ষেত্রের মতো ...ার ক্ষেত্রেও অনুপাত একই।

কিন্তু পৃথিবীর একই স্থানের বিভিন্ন ঘটনার ভিতরে তুলনা না করে বিরাট ...ব দ্বারা বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী তুলনা করলে ফল হয় আরো অদ্ভুত। এবার ...লাইন বরাবর সমস্ত ঘটনা বিচার করা যাক। পৃথিবীতে যাঁরা স্থিরাবস্থায় ...ছেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঘটনাগুলি ঘটছে একটি বিশেষ মুহূর্তে—ধরুন যে ...র্তে রেলগাড়িটা একটা বিশেষ সিগন্যাল অতিক্রম করছে। এই ঘটনাগুলির ...রে যেগুলির ঘটনাস্থল রেলগাড়ির গতির অভিমুখে কোনো বিন্দুতে—...াদের মনে হবে ঘটনাগুলি আগেই ঘটে গিয়েছে। আবার যেগুলির ঘটনাস্থল ...লগাড়ির পিছনে সে ঘটনাগুলি আগেই ঘটে গিয়েছে। আবার যেগুলির ঘটনাস্থল ...লগাড়ির পিছনে সে ঘটনাগুলিকে তখনো ভবিষ্যতের গর্ভে মনে হবে। যখন ...ম বলছি মনে হবে সম্মুখের ঘটনাগুলি আগেই ঘটেছে তখন কিন্তু আমার ...া সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়। কারণ ঘটনাগুলি তারা তখনো দেখেনি। ঘটনাগুলি ...া তারা দেখবে তখন আলোকের গতিবেগ হিসাব করে তাদের সিদ্ধান্ত হবে ...ঘটনাগুলি নিশ্চয়ই ঘটেছে আলোচ্য মুহূর্তের আগে। যে ঘটনা রেললাইন ...রা সম্মুখ অভিমুখে ঘটে এবং স্থির পর্যবেক্ষকদের বিচারে বর্তমান মুহূর্তে ...। কিংবা যখন তারা জানতে পারে তখন তাদের বিচারে বর্তমান মুহূর্ত (now) ...এবং যদি রেললাইন বরাবর এতটা দূরত্বে ঘটে থাকে যে দূরত্ব অতিক্রম ...তে আলোকের এক সেকেন্ড লাগে তাহলে যাত্রীরা ভাববে ঘটনাটি ঘটেছে এক ...ন্ডের তিন-চতুর্থাংশ ভাগ আগে। ঘটনাটি যদি এমন দূরত্বে ঘটে আলোকের

যে দূরত্ব অতিক্রম করতে পৃথিবীর লোকের বিচারে এক বছর লাগে
যাত্রীদের বিচারে (তারা যখন ঘটনাটি জানতে পারবে) ঘটনাটি ঘটে
পৃথিবীবাসীদের যে মুহূর্তে অতিক্রম করেছে তার নয় মাস আগে
সাধারণভাবে, তাদের নিজেদের কাছ থেকে, যে পৃথিবীবাসীদের তারা যে
অতিক্রম করছে তাদের কাছে আলোকের পৌছাতে যে সময় লাগে
বরাবর সম্মুখবর্তী স্থানে সংঘটিত ঘটনাবলীকে তারা তার তিন-চতুর্থাংশ
কালাঙ্কা আরোপ করবে। পৃথিবীবাসীরা কিন্তু বিশ্বাস করবে ঘটনাটি ঘটে
কিংবা তারা বরং বিশ্বাস করবে ঘটছে এখুনি অর্থাৎ ঘটনাস্থল থেকে আলো
তাদের কাছে পৌছাচ্ছে তখন। রেলগাড়ির পশ্চাতে রেললাইনে
ঘটনাগুলিকে নির্ভুল একই পরিমাণে পরবর্তী কালাঙ্কা দেওয়া হবে (post

সুতরাং পার্থিব পর্যবেক্ষকের কাছ থেকে যাত্রীদের কাছে উত্তরণে
কালাঙ্কের দু'রকম সংশোধন আমাদের করতে হবে। প্রথমে আমাদের নি
পৃথিবীবাসীদের গণনার পাঁচ চতুর্থাংশ (five-fourths)। তারপর
আমাদের বাদ দিতে হবে আলোচ্য ঘটনা থেকে আলোকের পৃথিবীবাসীদে
আসতে যে কাল লাগে তার তিন চতুর্থাংশ।

দুরে মহাবিশ্বে সংঘটিত একটি ঘটনা বিচার করুন। পৃথিবীবাসী
যাত্রীরা যখন পরস্পরকে অতিক্রম করছে ঘটনাটা দৃষ্ট হচ্ছে ঠিক সেই
ঘটনাটা কতদূরে ঘটেছিল সেটা যদি পৃথিবীবাসীদের জানা থাকে তাহলে
বিচার করতে পারে ব্যাপারটা যদি যাত্রীদের গতির অভিমুখে ঘটে থাকে
যাত্রীদের সিদ্ধান্ত হবে পৃথিবীবাসীরা যা ভেবেছে তার দ্বিগুণ আগে
ঘটেছিল। কিন্তু যাত্রীরা যেদিক থেকে আসছে ঘটনাটা সেদিকে ঘটে থাকলে
বলবে পৃথিবীবাসীরা যা ভেবেছে ঘটনাটা ঘটেছে তার অর্ধেক সময়
যাত্রীদের দ্রুতি ভিন্ন হলে এই অনুপাতগুলিও ভিন্ন হবে।

অনুমান করা যাক দু'টি তারকা হঠাৎ জ্বলে উঠেছে (মাঝে মাঝে
ঘটে) এবং যাত্রীরা যখন পৃথিবীবাসীদের অতিক্রম করছিল তখন দু'পক্ষ
দেখতে পেয়েছে। একটি হোক, রেলগাড়ি যেদিকে চলেছে সেদিকে এবং
হোক, রেলগাড়ি যেদিক থেকে আসছে সেদিকে। অনুমান করা যাক পৃথিবী
কোনো উপায়ে দু'টি তারকার দূরত্ব নির্ধারণ করতে পেরেছে এবং তারা
করেছে যেদিকে যাত্রীরা চলেছে সেদিককার তারকা থেকে তাদের কাছে
পৌছাতে পঞ্চাশ বছর লাগে এবং অন্য তারকা থেকে তাদের কাছে
আলোকের লাগে একশ বছর। তখন পৃথিবীবাসীদের যুক্তি হবে : যে দিকে

...ল সামনের তারকাটির জন্ম হয়েছে সেটা ঘটেছে পঞ্চাশ বছর আগে, আর যে ...স্ফোরণের ফলে নতুন তারকাটি জন্মেছে সেটা ঘটেছে একশ' বছর আগে। ...ীরা কিন্তু এ অঙ্ক উল্টে দেবে : তাদের সিদ্ধান্ত হবে সম্মুখের বিস্ফোরণ হয়েছে ...শ' বছর আগে আর পঞ্চাশ বছর আগে হয়েছে পিছনের বিস্ফোরণ। আমি ধরে ...ি উভয় পক্ষের যুক্তিই নির্ভুল এবং সে যুক্তির ভিত্তি নির্ভুল ভৌত উপাত্ত (data) ...াপারে উভয় পক্ষই নির্ভুল; অবশ্য যদি তারা মনে না করে যে অন্য পক্ষ নিশ্চয়ই ...ল করেছে। এটা মনে রাখতে হবে যে আলোর বেগ সম্পর্কে অনুমান (esti-...) উভয় পক্ষের একই ছিল তার কারণ বিস্ফোরণের পর সময় সম্পর্কে তাদের ...মানের পরিবর্তন এবং দুটি তারকার দূরত্ব সম্পর্কে তাদের অনুমানের পরিবর্তন ...ল একেবারে আনুপাতিক। আসলে সম্পূর্ণ তত্ত্বটার একটা প্রধান উদ্দেশ্য হল, ...বেক্ষকের নিজস্ব গতি নির্বিশেষে সমস্ত পর্যবেক্ষক সাপেক্ষই আলোকের বেগ ...ধ্রুব, এই তথ্য প্রতিষ্ঠা করা। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত এই তথ্যের সঙ্গে ...ীন তত্ত্বের সঙ্গতি ছিল না এবং চরম প্রয়োজন ছিল চমকপ্রদ একটা কিছু মেনে ...য়ার। অপেক্ষবাদ ঘটনার সঙ্গে যতটা সঙ্গতিপূর্ণ ঠিক ততটাই চমকপ্রদ। ...াপাতে কিছুদিন পর এ তত্ত্বকে মোটেই আর চমকপ্রদ মনে হয় না।

আমাদের আলোচ্য তত্ত্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর একটি অবয়ব রয়েছে। ...া হল : যদিও ভিন্ন ভিন্ন পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ দূরত্ব এবং কাল (time) ...ন্তর্ভিত হয় তবুও আমরা সেগুলি থেকে অন্তর (interval) নামক একটি ...রিমাণ (quantity) আহরণ করতে পারি। সে পরিমাণ প্রতিটি পর্যবেক্ষক ...পেক্ষ অভিন্ন। বিশিষ্ট অপেক্ষবাদে 'অন্তর' পাওয়া যায় নিম্নলিখিত উপায়ে: দুটি ...নার অন্তবর্তী দূরত্বের বর্গ (square) হিসাব করুন এবং দুটি ঘটনার অন্তবর্তী ...ল আলোক যে দূরত্ব অতিক্রম করে তার বর্গ হিসাব করুন। দুটির ভিতরে ...বর্গ থেকে ক্ষুদ্রতরটি বিয়োগ করুন। বিয়োগফল ঘটনাগুলির অন্তরের বর্গ বলে ...ায়িত (defined)। অন্তর সমস্ত পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ অভিন্ন এবং দুটি ঘটনার ...টি ভৌত সম্পর্কের আসল প্রতিরূপ। স্থান এবং কাল কিন্তু সে রকম প্রতিরূপ ...। চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে অন্তরের একটি জ্যামিতিক গঠন আমরা দিয়েছি। ঐ ...া উপরে লিখিত নিয়মের মতো একই ফল প্রদান করে। একটি ঘটনাস্থল ...ক অন্য ঘটনাস্থলে যেতে আলোকের যে কাল প্রয়োজন, দুটি ঘটনার অন্তবর্তী ...ল যখন তার চাইতে দীর্ঘ, অন্তর তখন কালানুরূপ। বিপরীত ক্ষেত্রে অন্তর ...ানুরূপ। যখন দুটি ঘটনার অন্তবর্তীকাল এবং আলোকের একস্থান থেকে অন্য ...ে গমনকাল নির্ভুল অভিন্ন, অন্তর যখন শূন্য (zero) তখন ঘটনা দুটি একই

আলোকরশ্মির বিভিন্ন অংশে অবস্থিত। অবশ্য ঐ পথে গমনশীল আলোকরশ্মি যদি না থাকে।

ব্যাপক অপেক্ষবাদে এসে আমাদের অন্তর সম্পর্কীয় ধারণার সাধারণী করতে হবে। বিশ্বের গঠনের যত গভীরে আমরা প্রবেশ করি এই কল্পনের ততই বৃদ্ধি পায়। আমাদের বলতে আকাঙ্খা হয় এটাই বাস্তব। দশ ব্যাপ্তিকাল সে বাস্তবের বিভ্রান্ত প্রতিরূপ মাত্র (confused representation অপেক্ষাবাদ বিশ্বের মূলগত গঠন সম্পর্কে আমাদের ধারণা বদলে দিয়েছে জন্যই এ তত্ত্ব দুরূহ, এ তত্ত্বের গুরুত্বও এই জন্য।

যে সমস্ত পাঠকের জ্যামিতি এবং বীজগণিতের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় তাঁরা এই অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশ বাদ দিতে পারেন। যাঁদের শিক্ষা অবহেলিত হয়নি তাঁদের জন্য সাধারণ সঙ্কেত (general formula) খানি ব্যাখ্যা করব। এ পর্যন্ত সে সঙ্কেতের কয়েকটি বিশেষ উদাহরণ মাত্র দিয়েছি। আলোচ্য সাধারণ সঙ্কেতের নাম লোরেঞ্জ রূপান্তর। এর বক্তব্য বস্তুপিণ্ড যখন অন্য একটি বস্তুপিণ্ড সাপেক্ষ নির্দিষ্ট প্রণালীতে চলমান তখন বস্তুপিণ্ডের সঠিক দৈর্ঘ্য এবং কালের ভিত্তিতে কি করে অন্য বস্তুপিণ্ডের সঠিক এবং কাল নির্ণয় করা যায়। বীজগণিতের সঙ্কেত দেওয়ার আগে আমি জ্যামিতিক গঠন উপস্থিত করব। আগের মতোই আমি দু'জন পর্যবেক্ষক ধরা করব, তাদের নাম দেব O এবং O'। এদের একজন পৃথিবীতে স্থিতিশীল অন্যজন একটি ঋজুরেলপথে সমরূপ গতিতে চলমান। বিচার্যকালের দু'জন পর্যবেক্ষকেরই অবস্থান ছিল রেলপথের একটি বিন্দুতে; কিন্তু এখন খানিকটা দূরত্বে বিচ্ছিন্ন। রেলপথের X বিন্দুতে একটি বাজ পড়েছে। বিচারে বাজ পড়ার মুহূর্তে রেলগাড়ির পর্যবেক্ষক O' বিন্দুতে পৌঁছেছে। হল : বিদ্যুতের চমক থেকে O' -এর দূরত্ব কত এবং O'-এর বিচারে হওয়ার (যখন O এবং O' একসঙ্গে ছিল) কতক্ষণ পর ঘটনাটা ঘটেছিল। অনুমান (estimate) আমাদের জানবার কথা এবং আমরা O' -এর অনুমান করতে চাই।

O-এর বিচারে যাত্রারম্ভের পর যে কাল অতিক্রান্ত হয়েছে সেইকালে বরাবর আলোক যে দূরত্ব অতিক্রম করত OC হোক সেই দূরত্ব। O কে করে OC কে ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত অঙ্কন করুন।

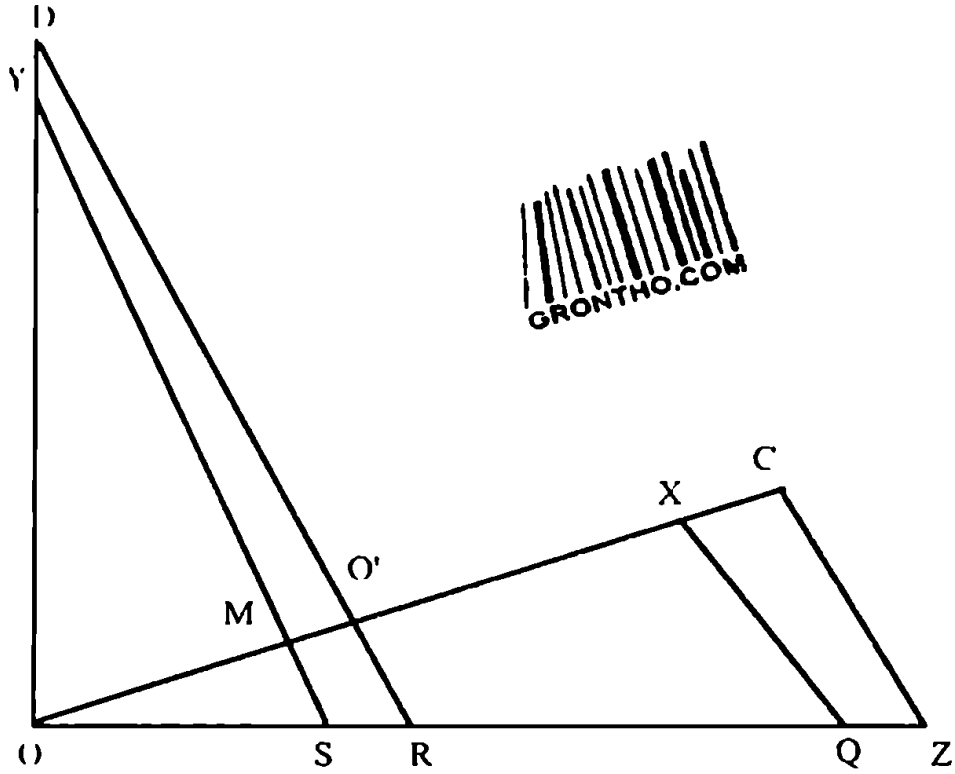

GRONTHO.COM

O'-এর ভিতর দিয়ে রেলপথের উপর একটি লম্ব আঁকুন। লম্বটি D বিন্দুতে [illegible] সঙ্গে মিলিত হোক। OD-এর উপরে এমন একটি বিন্দু Y নিন যাতে OY [illegible] OX সমান হয় (রেলপথের X বিন্দুতে বজ্রাঘাত হয়েছে)। রেলপথের উপর [illegible] লম্ব আঁকুন এবং OD এর উপর OS লম্ব আঁকুন। YM এবং OS, S বিন্দুতে [illegible] হোক। DO' এবং OS কে বাড়িয়ে R বিন্দুতে মিলিত করা হোক। X এবং [illegible] ভিতর দিয়ে রেলপথের উপর লম্ব আঁকুন। OS কে বাড়িয়ে দিন। লম্ব দুইটি [illegible] দেওয়া OS এর সঙ্গে Q এবং Z বিন্দুতে মিলিত হোক। তাহলে O' এর [illegible] O' থেকে বজ্রপাতের দূরত্ব (O এর মাপন অনুসারে) RQ। প্রাচীন ধারণা [illegible] দূরত্ব হওয়া উচিত ছিল OX। যেমন O ভাবছে যাত্রারম্ভ থেকে বজ্রপাত [illegible] আলোক OC দূরত্ব অতিক্রম করত। O' ভাবছে এই অতিক্রান্ত সময় [illegible] আলোকের SZ দূরত্ব (O এর মাপন অনুসারে) অতিক্রম করার সময় একই। [illegible] মাপনানুযায়ী অন্তর পাওয়া গিয়েছে OC এর উপর অঙ্কিত সমচতুর্ভুজ [illegible]) থেকে OX এর উপর অঙ্কিত সমচতুর্ভুজ বিয়োগ করে। O' এর [illegible] অনুযায়ী অন্তর পাওয়া গিয়েছে SZ এর উপর অঙ্কিত সমচতুর্ভুজ থেকে RQ [illegible] উপর অঙ্কিত সমচতুর্ভুজ বিয়োগ করে। সামান্য প্রাথমিক জ্যামিতি থেকে [illegible] যায় এ দুটি সমান।

উপরের গঠনক্রিয়ার অঙ্গীভূত (embodied) বীজগণিত সঙ্কেত নিম্নরূপ : O এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রেলপথ বরাবর X দূরত্বে এবং যাত্রা শুরু করার পর (যে O' ছিল O-তে) T কাল বাদে একটি ঘটনা ঘটুক O' এর দৃষ্টিভঙ্গিতে রেলপথ বরাবর X' দূরত্বে, যাত্রারম্ভের পর T' কাল বাদে একই ঘটনা ঘটুক।

আলোকের বেগ হোক C এবং O সাপেক্ষে O' এর বেগ হোক V। তাহলে করুন—

$$\beta \frac{c}{\sqrt{c_2 - v_2}}$$

$$\chi = \beta(x - vt)$$

$$t' = \beta\left(t \frac{VX}{c_2}\right)$$

তাহলে, এটাই লোরেঞ্জ রূপান্তর। এ থেকেই এ অধ্যায়ের সব কিছু উপপাদন করা।

৭
স্থান-কাল অন্তর

এতক্ষণ আমরা বিচার করেছি বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ। এ তত্ত্ব সম্পূর্ণ সমাধান করেছে নির্দিষ্ট নিশ্চিত বিশেষ একটি সমস্যা : দুটি বস্তুপিণ্ড যখন পরস্পর সাপেক্ষে সমরূপ আপেক্ষিক গতিসম্পন্ন তখন সাধারণ গতিবিদ্যা সংশ্লিষ্ট কিংবা বিদ্যুৎ চুম্বক সংশ্লিষ্ট পদার্থবিদ্যার সমস্ত বিধি দুটি বস্তুপিণ্ডেই নির্ভুলভাবে আছে। পরীক্ষামূলক এই তথ্যের কারণ। এ ক্ষেত্রে 'সমরূপ (uniform)' গতির অর্থ ধ্রুব (constant) ঋজুরেখ গতি। কিন্তু বিশিষ্ট তত্ত্ব একটি সমস্যার সমাধান করার সঙ্গেই অন্য সমস্যার আভাস দেখা দিল। দুটি বস্তুপিণ্ডের গতি যদি সমরূপ না হয়? উদাহরণ : ধরুন একটি বস্তুপিণ্ড পৃথিবী এবং অন্যটি পতনশীল প্রস্তর। প্রস্তরের গতি ত্বরিত (accelerated)[১] অর্থাৎ এর পতনের গতি নিয়ত বর্ধমান। বিশিষ্ট অপেক্ষবাদে এমন কিছু নেই যার সাহায্যে আমরা বলতে পারি যে, অবস্থিত পর্যবেক্ষক এবং পৃথিবীতে অবস্থিত পর্যবেক্ষক এবং পৃথিবীতে অবস্থিত পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ ভৌত পরিঘটনার বিধিগুলি অভিন্ন হবে। ব্যাপারটা আরো বেশি জটিল এইজন্য যে, বিস্তৃত অর্থে পৃথিবীটাই একটি পতনশীল বস্তু। প্রতিমুহূর্তেই এর সূর্যের অভিমুখে ত্বরিত গতি রয়েছে।

---

১. শুধু দ্রুতির (speed) বৃদ্ধিই নয়। গতি কিংবা অভিমুখের যে কোনো পরিবর্তনকেও ত্বরণ (acceleration) বলা হয়। একমাত্র স্থির দ্রুতিতে ঋজুরেখ গতিকেই অত্বরিত (unaccelerated) গতি বলা হয়।

এই গতির ফলেই পৃথিবী ঋতুরেখায় না গিয়ে সূর্যের চারপাশে আবর্তিত হয়। পৃথিবীভিত্তিক পরীক্ষা থেকে আমাদের পদার্থবিদ্যার জ্ঞান আহরিত সেইজন্য যে তত্ত্বে অনুমান করা হয় পর্যবেক্ষকের কোনো তরুণ নেই সে তত্ত্ব আমাদের সুতৃপ্ত করতে পারে না। ব্যাপক অপেক্ষবাদ এই বাধা দূর করেছে এবং এ তত্ত্ব পর্যবেক্ষকের ঋজু, বঙ্কিম, সমরূপ কিংবা ত্বরিত যে কোনোরকম গতিই অনুমোদন করে। এই বাধা দূর করতে গিয়ে আইনস্টাইন তাঁর নতুন মহাকর্ষীয় বিধি সৃষ্টির দিকে অগ্রসর হয়েছেন। সে বিধি সম্পর্কে আলোচনাও আমরা অচিরে করব। কাজটা ছিল অসাধারণ শক্ত। এ কাজে তাঁর দশ বছর লেগেছে। বিশিষ্ট অপেক্ষবাদের শুরু ১৯০৫ সালে, আর ১৯১৫ সালে শুরু হয়েছে ব্যাপক অপেক্ষাবাদ।

সমরূপ গতির তুলনায় ত্বরিত গতি বিচার অনেক বেশি কঠিন। আমাদের সবার অভিজ্ঞতাতেই এ তথ্য স্বতঃপ্রতীয়মান। স্থির গতিতে চলমান একটি রেলগাড়িতে যাওয়ার সময় জানালা দিয়ে বাইরে না তাকানো পর্যন্ত গতি বোঝা যায় না। কিন্তু হঠাৎ ব্রেক কষলে আপনি সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়েন। তখন বাইরের দিকে না তাকিয়েও আপনি বুঝতে পারেন একটা কিছু ঘটছে। লিফটেও তেমনি। যতক্ষণ পর্যন্ত লিফ্‌টটা সমরূপে চলমান থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যাপারটা মনে হয় স্বাভাবিক কিন্তু শুরুর সময় আর থামবার সময় পেটের ভিতরটা যেন কেমন করে ওঠে। [দ্রুততর হওয়া এবং ধীরতর হওয়া এই দু'ক্ষেত্রেই আমরা গতিকে 'ত্বরিত' (accelcrated) বলি। ধীরতর হওয়ার সময় ত্বরণ অপরা (negative)]। জাহাজের কেবিনে একটা ওজন পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রেও একই তথ্য প্রযোজ্য। যতক্ষণ পর্যন্ত জাহাজের গতি সমরূপ ততক্ষণ পর্যন্ত কেবিন সাপেক্ষ ওজনটার আচরণ এমন হবে যেন জাহাজটা স্থিরভাবে রয়েছে। ওজনটা যদি ছাতের মাঝখান থেকে পড়তে শুরু করে তাহলে সেটা পড়বে ঠিক মেঝের মাঝখানে। কিন্তু ত্বরণ থাকলে সবটাই বদলে যায়। জাহাজের গতি যদি দ্রুত বাড়তে থাকে তাহলে কেবিনের পর্যবেক্ষকের মনে হবে ওজনটা বক্রগতিতে পড়ছে; বক্রতার অভিমুখ জাহাজের পিছন দিকে। জাহাজের গতি যদি দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে তাহলে বক্রতার অভিমুখ হবে জাহাজের সামনের দিকে। এ সব তথ্যই পরিচিত। এই জন্যই গ্যালিলিও এবং নিউটন ত্বরিতগতির নিজস্ব চরিত্রকে সমরূপ গতির চাইতে সম্পূর্ণ পৃথক বলে বিচার করেছিলেন। কিন্তু গতিকে আপেক্ষিক না ভেবে পরম (absolute) ভাবলেই শুধুমাত্র এ পার্থক্য রক্ষা করা যায়। সমস্ত গতিই যদি আপেক্ষিক হয় তাহলে পৃথিবী সাপেক্ষ লিফ্‌টটা যে

রকম ত্বরিত, লিফট সাপেক্ষ পৃথিবীটাও তেমনি ত্বরিত। তবুও মাটিতে যারা রয়েছে লিফটটা উপরে উঠবার সময় তাদের পেটে কোনো অনুভূতি হয় না। আমাদের সমস্যাটা কত কঠিন এ তথ্য তার একটা দৃষ্টান্ত। আসলে আধুনিক যুগের খুব কম পদার্থবিদ্যাবিদই পরম গতিতে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু এ বিষয়ে নিউটনের বিশ্বাস গাণিতিক পদার্থবিদ্যার প্রযুক্তির অঙ্গীভূত ছিল এবং এ অনুমান থেকে মুক্ত একটি প্রযুক্তিবিদ্যা পেতে হলে প্রয়োজন ছিল একটা পদ্ধতিগত বিপ্লব। এই বিপ্লব সুসম্পন্ন হয়েছে আইনস্টাইনের ব্যাপক অপেক্ষবাদে।

আইনস্টাইন যে নতুন ধারণাগুলি উপস্থিত করেছিলেন, সেগুলির ব্যাখ্যা কোথা থেকে শুরু করব সেটা অনেকখানি নির্ভর করে আমাদের ইচ্ছার উপর, কিন্তু আমাদের পক্ষে বোধহয় সবচাইতে ভাল হবে 'অন্তর' (interval) সম্পর্কীয় কল্পন দিয়ে শুরু করা। এ কল্পন বিশিষ্ট অপেক্ষবাদে যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে সেটা আসলে স্থানিক এবং কালিক দূরত্ব সম্পর্কীয় চিরায়ত চিন্তনের সাধারণীকরণ, কিন্তু এ সাধারণীকরণের আরো বিস্তার প্রয়োজন। যাই হোক প্রথম আমাদের দরকার খানিকটা ইতিহাস ব্যাখ্যা করা। সেইজন্য আমাদের প্রয়োজন অতীতে পিথাগোরাস (Pythagoras) পর্যন্ত যাওয়া।

ইতিহাসের বহু চরিত্রের মতো পিথাগোরাস নামে কোনো লোকের অস্তিত্ব হয়তো ছিল না। স্ত্রীই হোন আর পুরুষই হোন পিথাগোরাস একটি অর্ধ পৌরাণিক চরিত্র। তিনি গণিতশাস্ত্র এবং পৌরোহিত্যবিদ্যা এক অনিশ্চিত অনুপাতে মিশিয়েছিলেন। যাই হোক— আমি অনুমান করব পিথাগোরাস নামক ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল এবং তাঁর নামে প্রচলিত উপপাদ্য ঐ নামের কেউ আবিষ্কার করেছিলেন। পিথাগোরাস মোটামুটি কনফুসিয়াস এবং বুদ্ধের সমসাময়িক। তিনি একটি ধর্মসম্প্রদায় স্থাপন করেছিলেন। সে সম্প্রদায়ের ধারণা ছিল সিম খাওয়া মহাপাপ। তাছাড়া তিনি একটি গাণিতিক গোষ্ঠী স্থাপন করেছিলেন। সমকোণী ত্রিভুজে ছিল তাদের বিশেষ আকর্ষণ। পিথাগোরাসের উপপাদ্য-এর (ইউক্লিডের ৪৭ তম প্রতিজ্ঞা) বক্তব্য : একটি সমকোণী ত্রিভুজের দুটি ক্ষুদ্রতর বাহুর বর্গের যোগফল সমকোণের বিপরীত বাহুর বর্গের তুল্য (equal—সমান) সমস্ত গণিতশাস্ত্রে কোনো প্রতিজ্ঞার (proposition) ইতিহাসই এরকম গৌরবান্বিত নয়। তরুণ বয়সে আমরা সবাই এ প্রতিজ্ঞা 'প্রমাণ' করতে শিখেছি। সে 'প্রমাণ' কিন্তু 'প্রমাণ' করেনি সে কথা সত্য—প্রমাণের একমাত্র পথ পরীক্ষা। তাছাড়া ঘটনা হল, প্রতিজ্ঞাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়— আসন্ন (approximate) সত্য মাত্র। কিন্তু সম্পূর্ণ জ্যামিতি এবং পরবর্তীকালে পদার্থবিদ্যা, পারস্পরিক সাধারণীকরণের

সাহায্যে এই প্রতিজ্ঞা থেকে আহরণ করা হয়েছে। এগুলির একটি হল ব্যাপক অপেক্ষবাদ।

যতদূর সম্ভব পিথাগোরাসের উপপাদ্য স্বতত মিশরীয়দের কার্যক্ষেত্রে চলিত একটি নিয়মের (rule of thumb) সাধারণকরণ। মিশরে বহুদিন ধরে জানা ছিল: যে ত্রিভুজের বাহু দৈর্ঘ্যে ৩, ৪ এবং ৫ একক সে ত্রিভুজ সমকোণী। মিশরীয়রা ব্যবহারিক কার্যক্ষেত্রে মাপার জন্য এই জ্ঞান প্রয়োগ করতেন। ত্রিভুজের বাহুগুলি যদি ৩, ৪ এবং ৫ ইঞ্চি হয় তাহলে সেগুলির উপরের বর্গের বর্গফল হবে যথাক্রমে ৯, ১৬ এবং ২৫ বর্গইঞ্চি এবং ৯ এবং ১৬ যোগ দিলে হয় ২৫। লিখবার সময় তিনের তিনগুণ ৩২, চারের চারগুণ ৪২, পাঁচের পাঁচগুণ ৫২, সুতরাং আমরা পাই:

$৩^২+ ৪^২=৫^২$

অনুমান করা হয়—যে ত্রিভুজের বাহুগুলি ৩, ৪ এবং ৫—সে ত্রিভুজে একটি সমকোণ থাকে এ তথ্য পিথাগোরাস মিশরীয়দের কাছ থেকে শিখেছিলেন এবং তারপর ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন। পিথাগোরাস দেখলেন এ তথ্যের সাধারণীকরণ সম্ভব এবং এইভাবে এলেন তাঁর বিখ্যাত উপপাদ্যে : একটি সমকোণী ত্রিভুজে, সমকোণের বিপরীত বাহুর উপরে গঠিত সমচতুর্ভুজ অন্য দু'টি বাহুর উপরে গঠিত সমচতুর্ভুজের যোগফলের সমান।

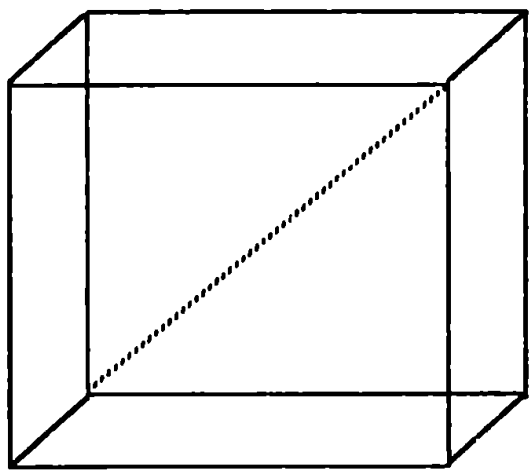

ত্রিমাত্রিকও ব্যাপারটা একই : যদি সমকোণী কঠিন ঘনক বিচার করেন তাহলে কর্ণের (diagonal) উপরের সমচতুর্ভুজ (চিত্রের বিচ্ছিন্ন রেখা) এবং তিনটি পার্শ্বের উপরের সমচতুর্ভুজের যোগফল সমান।

এ ব্যাপারে প্রাচীনেরা এই পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন।

এর পরের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ এসেছে দেকার্তের (Descartes) কাছ থেকে। পিথাগোরাসের উপপাদ্যকে তিনি তাঁর বৈশ্লেষিক জ্যামিতিক পদ্ধতির ভিত্তি করেছিলেন। ধরুন আপনি সুসম্বদ্ধভাবে (systematically) একটি সমতলের সর্বস্থানের মানচিত্র আঁকতে চান"। আমরা ধরে নেব জায়গটা এত ছোট যে পৃথিবীর বর্তুলাকৃতি অগ্রাহ্য করা সম্ভব। আমরা অনুমান করব আপনি সমতলের মাঝখানে বাস করেন। একটি জায়গায় অবস্থানের বিবরণ দেওয়ার সহজতম একটি উপায় হল এই কথা বলা : আমার বাড়ি থেকে প্রথমে পূর্ব দিকে এতটা দূরত্ব যাবেন তারপর যাবেন উত্তরে এতটা দূরত্ব। (কিংবা প্রথম ক্ষেত্রে এটা হতে পারে পশ্চিম এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হতে পারে দক্ষিণ)। এইভাবে জায়গার অবস্থান আপনি নির্ভুলভাবে জানতে পারছেন। আমেরিকার আয়তক্ষেত্রাকার (rectangular) শহরগুলিতে এই পদ্ধতি গ্রহণ করাই স্বাভাবিক : নিউ ইয়র্কে আপনাকে বলবে : এই কটা ব্লক (block) পূর্বে (কিংবা পশ্চিমে) যান তারপর উত্তরে (কিংবা দক্ষিণে) যান এই কটা ব্লক। পূর্বে আপনার যতটা দূরত্ব যেতে হচ্ছে তার নাম X এবং উত্তরে যতটা দূরত্ব আপনাকে যেতে হচ্ছে তার নাম Y। আপনার যদি পশ্চিমে যেতে হয় তাহলে X অপরা (negative) আর যদি দক্ষিণে যেতে হয় তাহলে Y অপরা। O হোক আপনার আরম্ভ বিন্দু (উৎপত্তি), পূর্বদিকে যাওয়া দূরত্ব হোক OM এবং উত্তর দিকে যাওয়া দূরত্ব হোক MP। আপনি যখন P-এতে পৌঁছেছেন তখন আপনি প্রত্যক্ষ রেখায় (direct lines) আপনার বাড়ি থেকে কত দূরে? এর উত্তর দেয় পিথাগোরাসের উপপাদ্য।

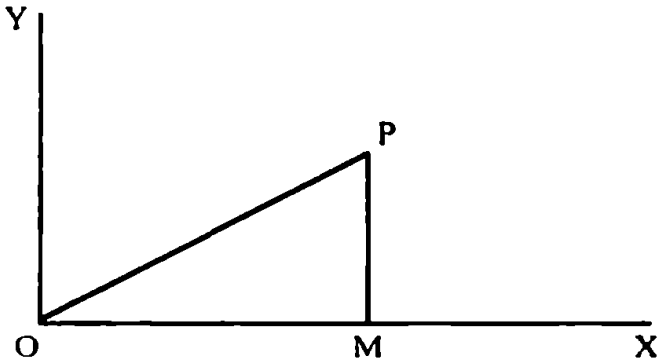

OP-এর উপরে বর্গ MP এবং OM-এর উপরের বর্গের যোগফলের সমান। OM যদি চার মাইল হয় এবং MP যদি তিন মাইল হয় তাহলে OP পাঁচ মাইল। OM যদি বারো মাইল হয় এবং MP যদি পাঁচ মাইল হয় তাহলে OP তেরো মাইল। তার কারণ $১২^২ ... ৫^২ ... ১৩^২$। সুতরাং আপনি যদি দেকার্তের

মানচিত্রাঙ্কন পদ্ধতি গ্রহণ করেন তাহলে স্থান থেকে স্থানান্তরে দূরত্ব নির্ধারণের জন্য পিথাগোরাসের উপপাদ্য অপরিহার্য্য। ত্রিমাত্রিকে (in three dimensions) ব্যাপারটা একেবারেই এক রকম। আপনি যদি শুধুমাত্র সমতলে স্থান স্থির না করে, উপরে আবদ্ধ বেলুনের অবস্থান নির্দিষ্ট করতে চান তাহলে আপনাকে তৃতীয় একটি রাশি যোগ করতে হবে : অর্থাৎ বেলুন যে উচ্চতায় থাকবে। উচ্চতা যদি z হয়, বেলুন থেকে o এর প্রত্যক্ষ (direct) দূরত্ব যদি r হয় তাহলে আপনি পাবেন—

$r^2 = x^2 + y^2 + z^2$

x, y এবং z জানা থাকলে এ থেকে আপনি r গণনা করতে পারবেন। উদাহরণ : আপনার যদি বেলুনের কাছে যেতে বারো মাইল পুর্বদিকে যাওয়ার পর চার মাইল উত্তরে গিয়ে তিন মাইল উপরে যেতে হয় তাহলে বেলুন থেকে ঋজুরেখায় আপনার দূরত্ব হবে তেরো মাইল। কারণ, ১২ × ১২ = ১৪৪, ৪ × ৪ = ১৬, ৩ × ৩ = ৯, ১৪৪ + ১৬+৯ = ১৬৯ = ১৩ × ১৩।

কিন্তু ধরুন ভূ-পৃষ্ঠের সামান্য অংশ না নিয়ে আপনি সম্পূর্ণ পৃথিবীর মানচিত্র আঁকবার কথা ভাবছেন। ভূ-পৃষ্ঠের সামান্য অংশকে সমতল ভাবা যেতে পারে। কিন্তু সমতল কাগজে পৃথিবীর নির্ভুল মানচিত্র আঁকা অসম্ভব। সবটাই মানক (scale) অনুসারে করা যায় এই জন্য একটা গোলক (globe) নির্ভুল হতে পারে কিন্তু সমতল মানচিত্র নির্ভুল হতে পারে না। ব্যবহারিক অসুবিধার কথা আমি বলছি না, আমি বলছি তাত্ত্বিক দিক দিয়ে ব্যাপারটা অসম্ভব। উদাহরণ : গ্রিনউইচ মধ্যরেখার (meridian of Greenwich) উত্তরাংশ এবং পশ্চিম দ্রাঘিমার নবতিতম মধ্যরেখা আর অন্তবর্তী বিষুবরেখার অংশ মিলিয়ে একটি ত্রিভুজ সৃষ্টি করে। এই ত্রিভুজের প্রত্যেকটি বাহু সমান এবং কোণগুলির প্রত্যেকটিই এক একটি সমকোণ। একটি সমতলে এ ধরনের ত্রিভুজ অসম্ভব। অন্যদিকে আবার সমতলে একটি বর্গক্ষেত্র (square) সৃষ্টি সম্ভব কিন্তু গোলকের উপর সম্ভব নয়। অনুমান করা যাক পৃথিবীপৃষ্ঠে আপনি চেষ্টা করছেন : পশ্চিমে একশ' মাইল গেলেন, তারপর উত্তরে গেলেন একশ' মাইল, পূবদিকে একশ মাইল তারপর, এবং তারপর গেলেন একশ' মাইল দক্ষিণে। আপনি ভাবতে পারেন এর ফলে একটি বর্গক্ষেত্র (square) তৈরি হবে। আসলে কিন্তু তা হবে না। কারণ যাত্রাশেষে আপনি আরম্ভ বিন্দুতে পৌছাবেন না। সময় না থাকলে এই পরীক্ষার সাহায্যে আপনি নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারেন; সময় না থাকলে আপনি সহজেই বুঝতে পারেন— এইরকমই হওয়ার কথা। আপনি যখন মেরুর নিকটতর তখন একশ'

মাইল যেতে বিষুবরেখার নিকটতর অবস্থার তুলনায় আপনাকে অনেক বেশি দ্রাঘিমা (more longitude) অতিক্রম করতে হবে। সুতরাং একশ' মাইল পূর্বদিকে গেলে (আপনার অবস্থান যদি উত্তর গোলার্ধে হয়) আপনি যে বিন্দুতে পৌছাবেন সে বিন্দু যাত্রারম্ভ বিন্দুর তুলনায় অনেক বেশি পূর্বদিকে; এরপর আপনি যখন সঠিক দক্ষিণে হাঁটছেন তখন আপনার অবস্থান আরম্ভ বিন্দুর তুলনায় আরো পূর্বদিকে এবং যাত্রা যেখানে শেষ করবেন সে স্থান আপনার আরম্ভ বিন্দু নয়। আর একটি উদাহরণ : অনুমান করা যাক আপনি শুরু করছেন গ্রিনউইচ মধ্যরেখার চার হাজার মাইল পূর্বদিকে বিষুবরেখার উপরে। তারপর আপনি চললেন গ্রিনউইচের ভিতর দিয়ে ঐ মধ্যরেখা বরাবর উত্তরদিকে চার হাজার মাইল এবং শেটল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি গেলেন। তারপর আপনি গেলেন পূর্বদিকে চার হাজার মাইল এবং সেখান থেকে গেলেন দক্ষিণে চার হাজার মাইল। এর ফলে আপনি বিষুবরেখার যে বিন্দুতে পৌছাবেন সে বিন্দু আপনার যাত্রারম্ভ বিন্দু থেকে আরো চার হাজার মাইল পূর্বদিকে।

আসলে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যা বলেছি সেটা ঠিক ন্যায্য কথা নয়। তার কারণ একমাত্র বিষুবরেখার উপরে ছাড়া কোথাও একস্থান থেকে সঠিক পূর্বদিকে অন্যস্থানে যাওয়ার হ্রস্বতম পথ সঠিক পূর্বমুখী নয়। নিউইয়র্ক থেকে লিসবন প্রায় সঠিক পূর্বদিকে। জাহাজে (ধরুন) নিউইয়র্ক থেকে লিসবন যেতে গেলে জাহাজটা যাত্রা শুরু করে খানিকটা উত্তর দিকে গিয়ে। জাহাজটা চলে 'বৃহৎ বৃত্তে' অর্থাৎ এমন বৃত্ত পৃথিবীর। কেন্দ্রেই যার নিজস্ব কেন্দ্র। এটাই ভূ-পৃষ্ঠে অঙ্কনসাধ্য ঋজুরেখার নিকটতম। বিষুবরেখা তথা দ্রাঘিমার মধ্যরেখাগুলি বৃহৎ বিন্দু অক্ষাংশের (latitude) অন্য সমান্তরালগুলি নয়। সুতরাং আমাদের অনুমান করা উচিত ছিল শেটল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জে পৌছানোর সময় আপনার চার হাজার মাইল ভ্রমণ করা হয়েছে তবে সঠিক পূর্বদিকে নয়, আপনি ভ্রমণ করেছেন এমন একটি বৃত্ত বরাবর যে বৃত্ত আপনাকে শেটল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের সঠিক পূর্বদিকে নিয়ে এসেছে। এ তথ্য কিন্তু আমাদের এই সিদ্ধান্তকেই দৃঢ়তর করে : আপনি আগের তুলনায় আপনার প্রারম্ভ বিন্দুর চাইতে আরো বেশি পূর্বদিকে যাত্রা শেষ করবেন।

সমতলের উপরের জ্যামিতি এবং গোলকের উপরের জ্যামিতিতে পার্থক্য নির্ণয় আপনি পৃথিবীর উপর যদি একটি ত্রিভুজ তৈরি করেন এবং তার বাহুগুলি যদি বৃহৎ বৃত্ত হয় তাহলে আপনি দেখতে পাবেন ত্রিভুজের কোণগুলির যোগফল দুই সমকোণ নয়। যোগফল তার চাইতে কিছু বেশি। দুই সমকোণের চাইতে আধিক্যের পরিমাণ ত্রিভুজের আকারের আনুপাতিক। ঘাসের উপর সুতো দিয়ে

বানানো ত্রিভুজ কিংবা ঐরকম ছোট একটি ত্রিভুজে, এমন কি, পরস্পর দৃশ্যমান তিনটি জাহাজ দিয়ে তৈরি ত্রিভুজের কোণগুলি যোগ দিলেও যোগফল দুই সমকোণের বেশি হবে। কিন্তু সে আধিক্য এত কম যে পার্থক্যটা আপনি ধরতে পারবেন না। কিন্তু আপনি যদি বিষুবরেখা, গ্রিনউইচ মধ্যরেখা এবং নবতিতম মধ্যরেখা দিয়ে ত্রিভুজ তৈরি করেন তাহলে কোণগুলির যোগফল হবে তিন সমকোণ। আপনি এমন ত্রিভুজও পেতে পারেন যার যোগফল হতে পারে ছয় সমকোণ পর্যন্ত যা কিছু। এগুলি আপনি ভূ-পৃষ্ঠে মাপনের সাহায্যেই আবিষ্কার করতে পারেন তার জন্য পৃথিবী বহির্ভূত স্থানে (space) অবস্থিত অন্য কিছু বিচার করার প্রয়োজন নেই।

গোলক পৃষ্ঠের দূরত্বের ব্যাপারে পিথাগোরাসের উপপাদ্যও বিফল হবে। পৃথিবীতে আবদ্ধ পথিকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দুটি স্থানের দূরত্ব হল তাদের বৃহৎ বৃত্ত দূরত্ব অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ ত্যাগ না করা পর্যন্ত ক্ষুদ্রতম দূরত্ব এটাই। অনুমান করা যাক বৃহৎ বৃত্তগুলির এমন তিনটি টুকরো আপনি নিয়েছেন যা দিয়ে একটা ত্রিভুজ বানানো সম্ভব। আরো অনুমান করা যাক তাদের ভিতরে একটি অন্য একটি সাপেক্ষ সমকোণে অবস্থিত। নিশ্চিতভাবে বলতে হলে একটা হোক বিষুবরেখা, আর অন্যটি হোক গ্রিনউইচ মধ্যরেখার বিষুবরেখা থেকে উত্তরগামী একটি অংশ। অনুমান করা যাক আপনি বিষুবরেখা বরাবর তিন হাজার মাইল গিয়েছেন তারপর সঠিক উত্তরে গিয়েছেন চার হাজার মাইল, তাহলে একটি বৃহৎ বৃত্ত বরাবর দূরত্ব হিসাব করলে আপনি আরম্ভ বিন্দু থেকে কতদূরে থাকবেন? আগে আমরা দেখেছি সমতলে থাকলে আপনার দূরত্ব হবে পাঁচ হাজার মাইল। আসলে কিন্তু আপনার বৃহৎ বৃত্ত দূরত্ব এর চাইতে অনেক কম হবে। গোলকপৃষ্ঠে একটি সমকোণী ত্রিভুজে সমকোণের বিপরীত বাহুর উপরের বর্গ অন্য দুটি বাহুর উপরের বর্গের যোগফলের চাইতে কম।

গোলক পৃষ্ঠের জ্যামিতি এবং সমতলের জ্যামিতির ভিতরে এই পার্থক্যগুলি অন্তর্কীয় (intrinsic) অর্থাৎ যে পৃষ্ঠে (surface) আপনি বসবাস করেন সেই পৃষ্ঠ গোলক তুল্য না সমতল তুল্য, জ্যামিতির এই পার্থক্যগুলি সে তথ্য আবিষ্কার করার ক্ষমতা আপনাকে দান করে। তার জন্য পৃষ্ঠ বহির্ভূত কিছু বিচারের প্রয়োজন হয় না। এই বিচারগুলি পরের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের পথিকৃৎ। এ কাজ করেছিলেন গাউস (Gauss)। তাঁর গৌরবময় কর্মজীবন 'দেড়শ' বছর আগেকার। গাউস তল (surface) সম্পর্কীয় তত্ত্বে মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন স্বতত বিভিন্ন তলগুলি মাপনের সাহায্যে এবং তলের বাইরে না

গিয়ে এ তত্ত্বের বিকাশ কি করে সম্ভব স্থানে একটি বিন্দুর অবস্থান স্থির করার জ... আমাদের তিনটি মাপন প্রয়োজন কিন্তু পৃষ্ঠতলে (surface) একটি বিন্দুর অবস্থান স্থির করার জন্য আমাদের প্রয়োজন দুটি। উদাহরণ : অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমা জানা থাকলে পৃথিবীর পৃষ্ঠতলে একটি বিন্দুর অবস্থান স্থির করা যায়।

গাউস দেখেছিলেন, মাপনের যে পদ্ধতিই আপনি গ্রহণ করুন না কেন এবং তলের চরিত্র যাই হোক না কেন, দুটি বিন্দুর অন্তবর্তী দূরত্ব মাপন সম্ভব। অবশ্য সে দূরত্ব যদি খুব বেশি না হয় এবং বিন্দুগুলির অবস্থান নির্দেশক রাশিগুলি যদি জানা থাকে। দূরত্বের সঙ্কেত পিথাগোরাসের সঙ্কেতের সাধারণীকরণ। এ সঙ্কেত আপনাকে বলবে : যে মাপনরাশিগুলি বিন্দুগুলির অবস্থান নির্দেশক সেগুলির পার্থক্যের বর্গের বাষ্টিধিতে দূরত্বের বর্গ এবং বলবে এই দুটি রাশির গুণফল। এই সঙ্কেত জানা থাকলে আপনি তলের স্বকীয় ধর্মের সবটাই আবিষ্কার করতে পারেন অর্থাৎ জানতে পারবেন সেই ধর্মগুলি যে ধর্ম তল বহির্ভূত কোনো বিন্দুর সঙ্গে তার সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল নয়। উদাহরণ : আপনি আবিষ্কার করতে পারেন একটি ত্রিভুজের কোণগুলির যোগফলের সমষ্টি দুই সমকোণ কিংবা বেশি কিংবা কম অথবা কোনো ক্ষেত্রে কম কোনো ক্ষেত্রে বেশি কিনা।

কিন্তু যখন আমরা 'ত্রিভুজের' কথা বলি তখন আমরা কি বোঝাতে চাইছি সেটা ব্যাখ্যা করতেই হবে। কারণ অধিকাংশ তলেই কোনো ঋজুরেখা নেই। একটি গোলকের বেলায় আমরা ঋজুরেখার বদলে বৃহৎ বৃত্ত প্রতিস্থাপন করব। বৃহৎ বৃত্তই ঋজুরেখার নিকটতম। এমনিতে ঋজুরেখার পরিবর্তে আমরা গ্রহণ করব সেই সমস্ত রেখা যে রেখা স্থান থেকে স্থানান্তরের হ্রস্বতম পথ। এই জাতীয় রেখার নাম ধরাকৃতি (geodesics)। বৃহৎ বৃত্তই (great circles) ভূ-পৃষ্ঠের ধরাকৃতি। আপনি যদি পৃষ্ঠ (surface) ত্যাগ করতে অসমর্থ হন তাহলে এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে যাওয়ার হ্রস্বতম পথ এগুলিই। একটি পৃষ্ঠের নিজস্ব (intrinsic) জ্যামিতিতে এগুলি ঋজুরেখার স্থান গ্রহণ করে। যখন আমরা প্রশ্ন করি একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের যোগফল দুই সমকোণ কিনা তখন আমরা এমন ত্রিভুজ বোঝাতে চাই যার বাহুগুলি ধরাকৃতি। এবং যখন আমরা দুটি বিন্দুর অন্তবর্তী দূরত্বের কথা বলি তখন আমরা বোঝাতে চাই ধরাকৃতি বরাবর দূরত্ব।

আমাদের সাধারণীকরণে পরের ধাপ একটু কঠিন : সে ধাপ হল অনিউক্লিডীয় জ্যামিতিতে উত্তরণ (transition)। আমরা এমন বিশ্বে বাস করি সেখানে স্থান ত্রিমাত্রিক (three dimensions)। স্থান সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতালব্দ জ্ঞানের ভিত্তি স্বল্প দূরত্ব এবং ক্ষুদ্র কোণ মাপন। (স্বল্প দূরত্ব বলতে

আমি বোঝাতে চাই সেই দূরত্বকে যে দূরত্ব জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যবহৃত দূরত্বের তুলনায় স্বল্প। এই অর্থে পৃথিবীর সমস্ত দূরত্বই স্বল্প)। আগে ভাবা হতো স্থান ইউক্লিডীয় : এ তথ্য পূর্বত সিদ্ধ (a priori)। উদাহরণ : একটি ত্রিভুজের কোণগুলির যোগফল দুই সমকোণ। কিন্তু বোঝা গেল যুক্তি দিয়ে এ তথ্য প্রমাণ করা যায় না। প্রয়োজনে এ তথ্য জানতে হবে মাপনের ফলরূপে। আইনস্টাইনের আগে চিন্তা করা হতো প্রাপ্তিযোগ্য নির্ভুলতা সাপেক্ষ মাপন ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সত্যতা প্রমাণ করে। এরকম চিন্তা এখন অচল। যাকে বলা যেতে পারে স্বাভাবিক কৌশল (natural artifice) তার সাহায্যে পৃথিবীর মতো একটি ক্ষুদ্র এলাকার জন্যও ইউক্লিডীয় জ্যামিতিকে সত্য মনে করানো যেতে পারে। কিন্তু মহাকর্ষ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আইনস্টাইন এই দৃষ্টিভঙ্গিতে পৌছালেন যে, পদার্থ যেখানে রয়েছে সেখানকার বিরাট বিরাট অঞ্চলে স্থানকে ইউক্লিডীয় ভাবা চলে না। এর কারণ জানার প্রয়োজন আমাদের এর পরে হবে। এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় গাউসীয় গবেষণার সাধারণীকরণের ফলে অনিউক্লিডীয় জ্যামিতি সৃষ্টির পদ্ধতি।

উদাহরণ : গোলক পৃষ্ঠে যে পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাই ত্রিমাত্রিক স্থানে সেই একই পরিস্থিতি না পাওয়ার কোনো কারণ নেই। এমন হতে পারে, ত্রিভুজের তিনটি কোণের যোগফল সব সময়ই দুই সমকোণের বেশি হবে এবং বৃদ্ধিটা হবে প্রায়সমই ত্রিভুজের আকারের আনুপাতিক। এমন হতে পারে, গোলকপৃষ্ঠ সম্পর্কে আমাদের যে সঙ্কেত রয়েছে তার অনুরূপ কোনো সঙ্কেতের সাহায্যে দুটি বিন্দুর দূরত্ব প্রকাশিত হবে। এরকম ঘটে কিনা সেটা আবিষ্কৃত হতে পারে, গোলকপৃষ্ঠ সম্পর্কে আমাদের যে সঙ্কেত রয়েছে তার অনুরূপ কোনো সঙ্কেতের সাহায্যে দুটি বিন্দুর দূরত্ব প্রকাশিত হবে। এরকম ঘটে কিনা সেটা আবিষ্কৃত হতে পারে শুধুমাত্র মাপাজোখ মাপনের সাহায্যে। তবে সেক্ষেত্রে দুটির স্থলে তিনটি বড় সংখ্যা জড়িত থাকবে। এ জাতীয় সম্ভাবনার সংখ্যা অনন্ত।

রিম্যানের (Riemann) 'জ্যামিতির পেছনে যে প্রকল্প রয়েছে—সেই সম্পর্কে' (১৮৫৪) নামক গবেষণামূলক প্রবন্ধে যুক্তির এই ধারণা বিকাশ লাভ করেছিল। এ প্রবন্ধে তিনি তল সম্পর্কীয় গাউসের গবেষণাকে নানা ধরনের ত্রিমাত্রিক স্থান বিষয়ে প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, এক রকমের একটা স্থান বিষয়ে প্রয়োজনীয় সমস্ত বৈশিষ্ট্যই ক্ষুদ্র দূরত্ব সম্পর্কীয় সঙ্কেত থেকে আহরণ করা সম্ভব। তিনি মনে করতেন : তিনটি অভিমুখের যে তিনটি ক্ষুদ্র দূরত্ব আপনাকে একেকটি বিন্দু থেকে স্বল্প দূরত্বে অবস্থিত অন্য বিন্দুতে পৌছে দেবে সেই দূরত্বগুলির সাহায্যে বিন্দু দুটির অন্তবর্তী দূরত্ব গণনা করা সম্ভব। উদাহরণ : যদি আপনার

জানা থাকে একটি বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুর দূরত্ব গণনা করার সামর্থ্য থাকা চাই। এ গণনার নিয়ম হবে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের বিস্তার (extension) অর্থাৎ দূরত্বের উপাদানগুলির (Component distances) বর্গের গুণিতকগুলি (multiples) যোগ করে এবং সম্ভবত তাদের গুণফলগুলির গুণিতকগুলিকে সঙ্গে নিয়ে। আপনি বলতে পারেন কি ধরনের স্থান নিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে বিন্দুগুলির অবস্থান নির্ণয় করার জন্য আপনি কোন বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তার উপরে এই বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ভর করে না।

অপেক্ষবাদের জন্য আমাদের যা দরকার সেটা পেতে হলে আমাদের আর একটি সাধারণীকরণ প্রয়োজন : বিন্দুগুলির অন্তর্বর্তী দূরত্বের স্থলে আমাদের প্রতিস্থাপন করতে হবে ঘটনাগুলির 'অন্তর' (interval)। এ হল স্থান-কালের (space-time) পথিকৃৎ। বিশিষ্ট অপেক্ষবাদে আমরা আগেই দেখেছি ঘটনাগুলির অন্তর্বর্তী কালে আলোক যে দূরত্ব অতিক্রম করবে তার বর্গফল (square) থেকে ঘটনাগুলির দূরত্বের বর্গফল (square) বিয়োগ করলে অন্তরের (interval) বর্গফল পাওয়া যায়। ব্যাপক অপেক্ষবাদে অন্তরের এই বিশেষ অবয়ব আমরা অনুমান করি না। শুরুতে দূরত্ব বিষয়ে রিম্যান যা ব্যবহার করেছিলেন সেইরকম একটা সাধারণ অবয়ব আমরা অনুমান করি। তাছাড়া, আইনস্টাইন রিম্যানের মতো শুধুমাত্র নিকটবর্তী (neghbouring) ঘটনাবলী সম্পর্কেই সঙ্কেতটা অনুমান করেছিলেন (assumed), অর্থাৎ অনুমান করেছিলেন সেই ঘটনাগুলি সম্পর্কে যেগুলির অন্তর ক্ষুদ্র। এই প্রাথমিক মাননাগুলি অতিক্রম করে যা ঘটে সেটা নির্ভর করে বস্তুপিণ্ডগুলির বাস্তব গতি পর্যবেক্ষণের উপর। সে পদ্ধতি আমরা ব্যাখ্যা করব এর পরের অধ্যায়গুলিতে।

এতক্ষণ পর্যন্ত যে পদ্ধতির বিবরণ আমরা দিয়েছি এবার আমরা সেগুলি সংক্ষিপ্তসার করতে পারি এবং সেগুলি আবার বলতে পারি। ত্রিমাত্রিকে, একটি স্থির বিন্দু (আরম্ভ—origin) সাপেক্ষ একটি বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় করা যায় তিনটি রাশি আরোপ করে (co-ordinate—স্থানাঙ্ক) উদাহরণ : আপনার গৃহসাপেক্ষে একটি বেলুনের অবস্থান নির্ণয় করা যায়— যদি আপনি জানেন সঠিক পূর্বে একটি বিশেষ দূরত্বে যাওয়ার পর উত্তরে আর একটি বিশেষ দূরত্ব অতিক্রম করে ঋজুভাবে সঠিক উর্ধ্বে আর একটি বিশেষ দূরত্ব অতিক্রম করলে আপনি সেই বেলুনে পৌছাবেন। এ ক্ষেত্রের মতো যেখানে পরস্পর সমকোণ সম্পর্কিত তিনটি দূরত্ব রয়েছে এবং যে ক্ষেত্রে আরম্ভ থেকে পরস্পরাক্রমে দূরত্বগুলি অতিক্রম করলে আপনি আলোচ্য বিন্দুতে পৌছে যাবেন। সে ক্ষেত্রে তিনটি স্থানাঙ্ক

ফল যোগ করলে প্রত্যক্ষ দূরত্বের বর্গফল পাওয়া যাবে। স্থান ইউক্লিডীয় কিংবা অ-ইউক্লিডীয় যাই হোক না কেন সর্বক্ষেত্রেই এটা পাওয়া যায় আরোপনযোগ্য একটি বিশেষ নিয়ম অনুসারে বর্গফলগুলির গুণিতক এবং স্থানাঙ্কগুলির গুণফল যোগের সাহায্যে। স্থানাঙ্কগুলি একটি বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করার মতো যে কোনো রাশিসমষ্টি হতে পারে তবে সন্নিকট বিন্দুগুলির স্থানাঙ্কও সন্নিকট রাশিসমষ্টিই হতে হবে। ব্যাপক অপেক্ষবাদে কালের জন্য আমরা একটি চতুর্থ স্থানাঙ্ক আরোপ করি। আমাদের সঙ্কেতে স্থানিক দূরত্বের বদলে আমরা পাই শূন্যের'। তাছাড়া শুধুমাত্র স্বল্প দূরত্বের ক্ষেত্রেই আমরা সঙ্কেতের ভ্রমহীনতা মানিনা কারণ।

এবার আমরা আইনস্টাইনের মহাকর্ষীয় তত্ত্ব আলোচনা করার মতো অবস্থায় পৌঁছেছি।

৮

আইনস্টাইনের মহাকর্ষীয় বিধি

আইনস্টাইনের বিধি আলোচনার আগে, যৌক্তিক ভিত্তি বিচারে নিউটনের মহাকর্ষীয় বিধি যে সম্পূর্ণ নির্ভুল হতে পারে না সে বিষয়ে আমাদের নিঃসন্দেহ হওয়া ভাল।

নিউটন বলেছেন পদার্থের যে কোনো দুটি কণার ভিতরে একটি বল (force) কাজ করে। এই বল ভর দুটির গুণফলের আনুপাতিক (proportional) এবং তাদের দূরত্বের বর্গের বিষমানুপাতিক (inversely proportional)। অর্থাৎ ভরের প্রশ্ন আপাতত অগ্রাহ্য করলে, বস্তুকণা দুটি এক মাইল দূরত্বে থাকলে তাদের ভিতরে যে বিশেষ আকর্ষণ থাকবে, দূরত্ব দু মাইল হলে আকর্ষণ হবে তার এক চতুর্থাংশ। যখন তারা তিন মাইল দূরত্বে তখন সেটা হবে ন' ভাগের একভাগ ... এই রকম। দূরত্বের বৃদ্ধির তুলনায় আকর্ষণের হ্রাস অনেক দ্রুত। নিউটন যখন দূরত্বের কথা বলছেন তখন অবশ্যই তিনি একটি নির্দিষ্ট কালে দূরত্ব বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি ভেবেছিলেন কাল বিষয়ে কোনো দ্ব্যর্থ থাকতে পারে না। কিন্তু আমরা দেখেছি এ ধারণা ভুল। একজন পর্যবেক্ষক পৃথিবীতে এবং সূর্যে যে মুহূর্তকে একই ভাববেন অন্য একজন সেটাকে ভাববেন দুটি ভিন্ন মুহূর্ত। সুতরাং 'একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তের দূরত্ব' এক ব্যক্তিনিষ্ঠ কল্পন, এ কল্পনের মহাজাগতিক বিধিতে প্রবেশের অধিকার সামান্যই আমরা অবশ্য গ্রিনউইচ পর্যবেক্ষণাগারের মাপন অনুসারে কাল মাপব একথা বলে আমাদের বিধিকে দ্ব্যর্থবোধহীন করতে পারি।

কিন্তু পৃথিবীর আকস্মিক পরিস্থিতি এত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য, এ তথ্য বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে কঠিন। দূরত্বের মাপও বিভিন্ন পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ পরিবর্তিত হবে। সুতরাং মহাকর্ষীয় বিধির নিউটনীয় অবয়ব একেবারে নির্ভুল এ কথা মানতে আমরা রাজি নই। তার কারণ একই রকম বিধিসম্মত বহু রীতির ভিতরে যেটা আমরা গ্রহণ করব ফলের পার্থক্য হবে সেই অনুসারে। খুনীর খুনের অপরাধ যদি নির্ভর করে সম্ভাব্য অপরাধীর পরিচয় তার নামে না পদবীতে, তাহলে ব্যাপারটা যেরকম অযৌক্তিক হবে মহাকর্ষীয় বিধির নিউটনীয় বিধির অবয়বও সেইরকমই অযৌক্তিক। দূরত্ব মাইলে মাপা হোক কিংবা কিলোমিটারে মাপা হোক বিধিগুলির অভিন্ন হতেই হবে এ তথ্য স্বতঃপ্রতীয়মান এবং মূলগতভাবে গণনীতির যা বিস্তার সেটাই আমাদের বিবেচ্য।

বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ যা মেনে নেয় আমাদের মাপন তার চাইতেও বেশি রীতিগত (conventional)। তাছাড়া প্রতিটি মাপনই ভৌত পদার্থের সাহায্যে করা একটি ভৌত পদ্ধতি। তার ফল নিশ্চয়ই হবে একটি পরীক্ষালব্ধ উপাত্ত। কিন্তু তার সরল অর্থ তার উপর আমরা আরোপ করি সে উপাত্তের ব্যাখ্যা অত সরল না হতে পারে। সুতরাং কোনো কিছু কি করে মাপতে হয় সেটা আমরা জানি, তবুও এ ঘোষণা আমরা করব না। আমরা ধরে নিচ্ছি অন্তর নামক একটি ভৌত রাশি রয়েছে, সে রাশি এমন দুটি ঘটনার সম্পর্ক প্রকাশ করে যে ঘটনা দুটির পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা অত্যন্ত বেশি নয়। কিন্তু সেটা মাপতে জানি এ মানতে আমরা আগে থেকে করছি না। তবে এর আগের অধ্যায়ে যেরকম বলা হয়েছে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের সেরকম কোনো একটি সাধারণীকরণ থেকে যদি পাওয়া যায় শুধুমাত্র এইটুকু আমরা মানছি।

তবে আমরা কিন্তু ঘটনাগুলির একটি ক্রম অনুমান করি (assume order) এবং অনুমান করি এ ক্রম চারমাত্রিক। অর্থাৎ আমরা অনুমান করছি : একটি ঘটনা তৃতীয় একটির তুলনায় অন্য একটির নিকটতর এ কথার অর্থ আমরা জানি সুতরাং নির্ভুল মাপনের আগে একটি ঘটনার সান্নিধ্য (neighbourhood) সম্পর্কে আমরা বলতে পারি। তাছাড়া আমরা অনুমান করছি স্থান-কালে একটি ঘটনার অবস্থান আরোপ করতে হলে চারটি রাশি (স্থানাঙ্ক) প্রয়োজন। যথা : আগে উল্লেখ করা বিমানে বিস্ফোরণের ব্যাপারে প্রয়োজন অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা, উচ্চতা এবং কাল। কিন্তু এই স্থানাঙ্কগুলি কি করে আরোপ করা হল সে সম্পর্কে কোনো মানতে আমরা করছি না। শুধুমাত্র আমরা মানছি সান্নিধ্যের ঘটনাগুলি সম্পর্কে সাপেক্ষে স্থানাঙ্কগুলি আরোপ করা হয়।

স্থানাঙ্ক নামক এই সংখ্যাগুলি আরোপের পদ্ধতি সম্পূর্ণ যাদৃচ্ছিকও নয় আবার [illegible] মাপনের ফলও নয়। এর অবস্থান মাঝামাঝি। আপনি যখন অবিচ্ছিন্ন [illegible] চলেছেন তখন আপনার স্থানাঙ্কগুলি অবশ্যই কখনো হঠাৎ লাফিয়ে [illegible] পরিবর্তিত হবে না। আমেরিকাতে দেখা যায় (ধরে নেওয়া যাক) চতুর্দশ রাস্তা [illegible] এবং পঞ্চদশ রাস্তার সব বাড়িগুলির নম্বর ১৪০০ থেকে ১৫০০ এর ভিতরে [illegible] হওয়ার সম্ভাবনা আবার পঞ্চদশ এবং ষোড়শ রাস্তার ভিতরকার নম্বর হওয়ার [illegible] সম্ভাবনা ১৫০০, ১৬০০, এমনকি চৌদ্দ শতকের সমস্ত সংখ্যা যদি ব্যবহৃত না [illegible] হয়ে থাকে তাহলেও। আমাদের কাজ এভাবে হবে না কারণ একটি ব্লক থেকে [illegible] পরের ব্লকে যাওয়ার সময় হঠাৎ লাফ দিতে হয়।

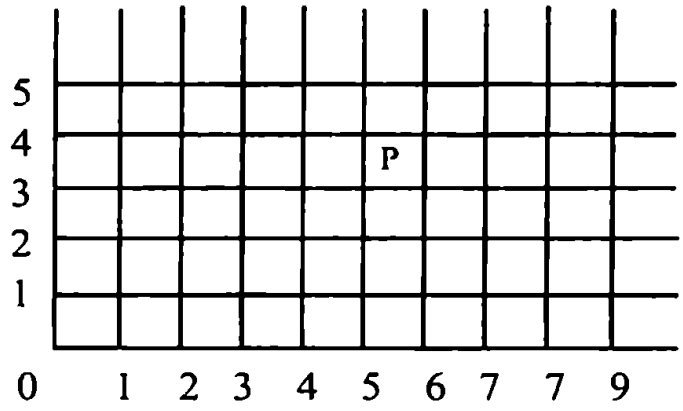

আবার কালিক স্থানাঙ্ক আমরা এইভাবে আরোপ করতে পরি : পরপর দুটি [illegible] স্মিথ নামক শিশুর জন্মের মধ্যবর্তী কাল বিচার করুন। ইতিহাসে জ্ঞাত ৩০০০ [illegible] এবং ৩০০১তম স্মিথের জন্মের মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত একটি ঘটনার স্থানাঙ্ক [illegible] অবস্থান করবে ৩০০০ থেকে ৩০০১-এর ভিতরে। বছরের যে অংশ ৩০০০তম [illegible] স্মিথের জন্মের পর গত হয়েছে সেটাই হবে স্থানাঙ্কের ভগ্নাংশ। (স্মিথ পরিবারে [illegible] পরস্পর দুটো জন্মের মধ্যবর্তী সময় পুরো এক বছর কখনোই হতে পারে না এ [illegible] কথা স্বতঃপ্রতীয়মান)। স্থানাঙ্ক আরোপের এই পদ্ধতি নির্ভুল নিশ্চিত কিন্তু [illegible] আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের উপযুক্ত নয়। কারণ একটি স্মিথের জন্মের ঠিক আগে [illegible] এবং ঠিক পরে ঘটনাগুলির মাঝে অকস্মাৎ উল্লম্ফন ঘটবে। সুতরাং অবিচ্ছিন্ন [illegible] যাত্রায় আপনার স্থানাঙ্ক অবিচ্ছিন্ন হবে না। অনুমান করা হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন যাত্রা [illegible] কাকে বলে সেটা মাপন নিরপেক্ষভাবে আমাদের জানা আছে। যখন স্থান-কালে [illegible] আপনার অবস্থান অবিচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়। তখন চারটি স্থানাঙ্কের প্রতিটি

অবশ্যই অবিচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়। স্থানাঙ্কগুলির একটি, দুটি কিংবা তিনটি কোনো পরিবর্তন না হতে পারে কিন্তু যে পরিবর্তন হবে সেটা হতে হবে মসৃণ। কোনো আকস্মিক উল্লম্ফন থাকতে পারবে না। স্থানাঙ্ক আরোপের ব্যাপারে অননুমোদনীয় কি রয়েছে সেটা এইভাবে ব্যাখ্যা করা হল।

আপনার স্থানাঙ্কগুলির ভিতরে কোন কোন পরিবর্তন বিধিসঙ্গত সে ব্যাপারে করার জন্য অনুমান করা যাক আপনি রবারের একটি বড় টুকরো নিয়েছেন। সেটাকে টেনে লম্বা করা হয়নি এরকম অবস্থায় রবারটির উপরে ছোট ছোট বর্গক্ষেত্র আঁকুন। বর্গক্ষেত্রগুলির (square) সবদিকই লম্বায় এক ইঞ্চি দশ ভাগের একভাগ। বর্গগুলির কোণে কোণে একটা করে খুব ছোট পিন লাগান। এই পিনগুলির যে কোনো একটির স্থানাঙ্কগুলির দুটি আমরা নির্ধারণ করতে পারি। একটি নির্দিষ্ট পিন থেকে ডান দিকে গিয়ে উল্লিখিত পিনের ঠিক নিচু অবধি যেতে আমরা যে কটি পিন অতিক্রম করি তার সংখ্যা এবং উপর দিকে ঐ পিন পর্যন্ত যেতে যে কটি পিন অতিক্রম করি তার সংখ্যা। চিত্রে O হোক আমাদের প্রারম্ভিক পিন এবং যে পিনের স্থানাঙ্ক আমরা আরোপ করতে চাই সেটা হোক P। P তাহলে P পঞ্চম সার (column) এবং তৃতীয় পঙ্‌ক্তি (row)। সুতরাং, রবারের তল (plane) O-এর স্থানাঙ্ক হবে ৫ এবং ৩।

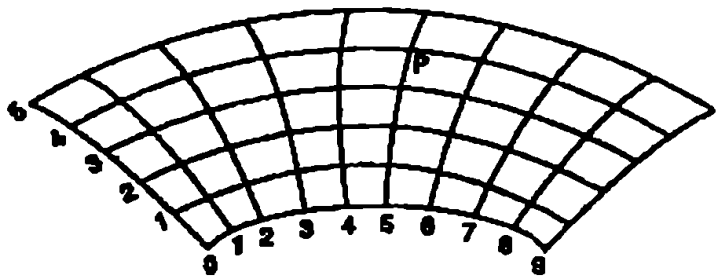

এবার রবারটা আপনি টেনে যত খুশী লম্বা করুন আর পাক দিন। পিনগুলি এবার দ্বিতীয় চিত্রে যেরকম আছে সেইরকম আকার নিক।

আমাদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে যা বুঝি ভাগগুলি এখন আর সেই অর্থে সমান প্রকাশ করে না। কিন্তু স্থানাঙ্কের কাজ ঐ ভাগগুলি দিয়ে একই রকম চলবে। আমরা এখনো বলতে পারি রবারের তলে P-এর স্থানাঙ্ক ৫ এবং ৩। রবারটাকে আমরা এমনভাবে মুড়িয়েছি যে সাধারণত যাকে তল (plane) বলা হয় এখন আর সেরকম নেই, তবুও কিন্তু এখনো আমরা রবারটিকে একটি তল বলে ভাবতে পারি। এইরকম অবিচ্ছিন্ন বিকৃতিতে কিছু এসে যায় না।

আর একটি উদাহরণ : আমাদের স্থানাঙ্ক নির্ধারণের জন্য লৌহদণ্ডের পরিবর্তে একটি জ্যান্ত ঈল মাছ* ব্যবহার করা যাক। মাছটা সবসময়ই তার দেহ মোচড়ায়। সেই মুহূর্তে মাছটা যে আকারই ধারণ করুক না কেন, স্থানাঙ্কের পরিভঙ্গিতে লেজ থেকে মাথা পর্যন্ত দূরত্বকে এক একক হিসাবে গণনা করা হবে। মাছটা অবিচ্ছিন্ন তার গা মোচড়ানোও অবিচ্ছিন্ন, সুতরাং, স্থানাঙ্ক আরোপের পদ্ধতির জন্য একে আমাদের দূরত্বের একক হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। স্থানাঙ্ক আরোপের পদ্ধতির জন্য প্রয়োজন অবিচ্ছিন্নতা। এ পদ্ধতির অন্যান্য অংশ নিছকই রীতিগত ব্যাপার। সুতরাং জীবন্ত ঈল আর ইস্পাতদণ্ড একই রকম কাজ করবে।

আমরা স্বভাবতই ভাবতে পারি সত্যিকারের সতর্ক মাপনের জন্য জীবন্ত মাছের চাইতে ইস্পাতদণ্ড ব্যবহার করা ভাল। এটা ঠিক নয়—তার কারণ এ নয় যে ইস্পাতদণ্ড যা বলে ভাবা হতো ঈলও সে কথা বলে—কারণ হল ঈলের যে বৈশিষ্ট্য স্বতঃপ্রতীয়মান ইস্পাতদণ্ড তার চাইতে বেশি কিছু বলে না। ব্যাপারটা আসলে এ নয় যে ঈল সত্যিই অনমনীয় আসলে ইস্পাতদণ্ডও গা মোচড়ায়। আমাদের দৃষ্টিতে যেমন মনে হয় ঈলটা গা মোচড়ায় তেমনি গতির সম্ভাব্য একটি অবস্থায় স্থিত একজন পর্যবেক্ষকের মনে হবে ঈল অনমনীয় এবং ইস্পাতদণ্ড গা মোচড়ায় (wriggle)। আমাদের এবং ঐ পর্যবেক্ষকের চাইতে পৃথকভাবে চলমান প্রত্যেকেরই মনে হবে ঈল এবং দণ্ড দুটোই গা মোচড়ায় এবং একজন পর্যবেক্ষক সঠিক এবং অন্য পর্যবেক্ষক ভুল একথা বলার কোনো উপায় নেই। এই সমস্ত ক্ষেত্রে যা দেখা যায় সেটা পর্যবেক্ষিত ভৌত পদ্ধতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নয়। সেটা পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গির উপরও নির্ভরশীল। দূরত্ব এবং কাল মাপন মাপিত বস্তুর ধর্ম প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করে না, প্রকাশ করে বস্তুর সঙ্গে মাপকের সম্পর্ক। সুতরাং ভৌত জগৎ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ যা বলতে পারে সেটা এতদিন পর্যন্ত আমরা যা বিশ্বাস করেছি তার চাইতে অনেক বেশি বিমূর্ত।

প্রাচীন গ্রীক আমল থেকে স্কুলে যে জ্যামিতি পড়ানো হয় তার পৃথক বিজ্ঞান হিসাবে অস্তিত্ব আর রইল না, সেটা মিশে গেল পদার্থবিদ্যার সঙ্গে। এ তথ্য বোঝার গুরুত্ব রয়েছে। প্রাথমিক জ্যামিতির দুটি মূলগত ধারণা ছিল ঋজুরেখা এবং বৃত্ত। আপনার কাছে যেটাকে মনে হয় একটা ঋজুদণ্ড, যার অংশগুলির অস্তিত্ব বর্তমানে আছে, আর একজনের কাছে সেটা মনে হতে পারে একটা রকেটের উড়ান অর্থাৎ অন্য ধরনের একটি বক্ররেখা যার অংশগুলি ক্রমান্বয়ে অস্তিত্বে উপনীত হচ্ছে।

---

* ঈল (Eel)-লম্বা সাপের মতো দেখতে একরকম মাছ।

বৃত্ত নির্ভরশীল দূরত্ব মাপনের উপর—কারণ বৃত্ত আসলে কেন্দ্র থেকে [illegible] একটি সমদূরত্বে অবস্থিত সমস্ত বিন্দুর সমষ্টি। আমরা দেখেছি দূরত্ব মাপন [illegible] ব্যক্তিনিষ্ঠ ব্যাপার। সেটা নির্ভর করে পর্যবেক্ষক কিভাবে চলমান তার [illegible] মিচেলসন-মর্লির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা বৃত্তের বস্তুনিষ্ঠ সত্যতার অভাব [illegible] করেছে। এক অর্থে এই পরীক্ষা সম্পূর্ণ অপেক্ষবাদের আরম্ভবিন্দু। আমাদের মাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অনমনীয় বস্তুপিণ্ড শুধুমাত্র কয়েকজন পর্যবেক্ষক সাপেক্ষই অনমনীয়, অন্য পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ তাদের মাত্রা (dimensions) অবিচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হতে থাকবে। শুধুমাত্র আমাদের পৃথিবীবদ্ধ গোঁয়ার (obstinate) কল্পনার জন্যই আমাদের পক্ষে জ্যামিতিকে পদার্থবিদ্যা থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করা সম্ভব হয়েছে।

সেইজন্যই শুরু থেকে আমরা আমাদের স্থানাঙ্কগুলিকে (co-ordinates) কোনো ভৌত গুরুত্ব দান করার ঝামেলায় থাকি না। আগে পদার্থবিদ্যায় [illegible] স্থানাঙ্কগুলিকে সযত্নে মাপা দূরত্ব বলে ভাবা হতো। এখন আমরা বুঝতে পারছি [illegible] প্রাথমিক প্রযত্ন পরিত্যক্ত হয়েছে। যত্নের প্রয়োজন পরের একটি ধাপে। আমাদের স্থানাঙ্কগুলি এখন একাধিক ঘটনার পঞ্জী গঠনে একটি নিয়মানুগত পদ্ধতি ছাড়া [illegible] কিছু নয়। গণিত শাস্ত্রের টেন্সর পদ্ধতি (tensor-প্রদিশ) বিরাট শক্তিশালী এক [illegible] এর সাহায্যে আপাতদৃষ্ট অযত্নে আরোপিত স্থানাঙ্কের জন্য সূক্ষ্ম এবং নির্ভুল মাপনের সমস্ত সাধনীই ব্যবহার করা হয়েছে। শুরুতে এলোমেলোভাবে কাজ করার সুবিধা হচ্ছে যে আমরা অজানা (surreptitious) ভৌত অনুমান এড়িয়ে যেতে পারি। প্রথম দিকে যদি ধারণা থাকে যে আমাদের স্থানাঙ্কগুলির কোনো ভৌত গুরুত্ব রয়েছে তাহলে [illegible] অজানা অনুমান এড়ানোর সম্ভাবনা অল্প।

পর্যবেক্ষণ করা সমস্ত ভৌত পরিঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞতা নিয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা করার কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই। কিছু কিছু জিনিস আমরা [illegible] আমরা জানি একটি বিশেষ পদ্ধতিতে স্থানাঙ্কগুলি নির্বাচন করা হলে [illegible] নিউটনীয় পদার্থবিদ্যা প্রায় নির্ভুল। আমরা জানি উপযুক্ত স্থানাঙ্ক সাপেক্ষ বিশেষ অপেক্ষবাদ নির্ভুলতার আরো নিকটতর। এই সমস্ত তথ্য থেকে আমরা আমাদের নতুন স্থানাঙ্কগুলি সম্পর্কে কয়েকটি জিনিস আহরণ করতে পারি। [illegible] যৌক্তিক (অবরোহী) আহরণের সাহায্যে নতুন তত্ত্বের স্বীকার্যরূপে প্রতিভাত [illegible]

এই জাতীয় স্বীকার্যরূপে আমরা গ্রহণ করি।

(১) সমীপবর্তী ঘটনাবলীর অন্তর্বর্তী অন্তর (interval), দূরত্ব সম্পর্কে [illegible] যেরকম ব্যবহার করেছিলেন সেই রকম সাধারণ অবয়ব গ্রহণ করে।

(২) যথোপযুক্ত (sufficiently), ক্ষুদ্র, হাল্কা এবং প্রতিসম (symmetrical) বস্তুপিণ্ডের স্থান-কালে যাত্রাপথ ধরাকৃতি (geodesic), ব্যতিক্রম হতে পারে শুধুমাত্র বস্তুপিণ্ডটির উপর অমহাকর্ষীয় বলের ক্রিয়ার দরুন।

(৩) আলোকরশ্মির যাত্রাপথ ধরাকৃতি— সেটা এমন যে তার যে কোনো দুটি অংশের অন্তর (interval) শূন্য (zero)।

এই স্বীকার্যগুলির প্রত্যেকটির কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

আমাদের প্রথম স্বীকার্যের প্রয়োজন : দুটি ঘটনা যদি ঘনিষ্ঠরূপে সমীপবর্তী হয় (কিন্তু অন্য রকমটা আবশ্যিক নয়— not necessarily otherwise) তাহলে তাদের ভিতরে একটি অন্তর থাকে। তাদের স্থানাঙ্কের পার্থক্যের সাহায্যে এ অন্তর গণনা করা সম্ভব। গণনার জন্য আগের অধ্যায়ে আলোচিত সঙ্কেতের মতো কোনো একটি সঙ্কেত ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ আমরা স্থানাঙ্কগুলির পার্থক্যের বর্গ এবং গুণফল নিয়ে তাকে যথোপযুক্ত রাশি দিয়ে (suitable amounts) গুণ করি (সাধারণত এগুলি স্থান থেকে স্থানান্তরে পরিবর্তিত হবে) এবং ফলগুলিকে যোগ করি। প্রাপ্ত যোগফল অন্তরের বর্গ। কি রাশি দিয়ে বর্গগুলি এবং গুণফলগুলিকে গুণ দিতে হবে সেটা আমরা আগে থাকতে অনুমান করি না। সেটা আবিষ্কার করা হবে ভৌত পরিঘটনা পর্যবেক্ষণ করে। কিন্তু আমরা জানি স্থান-কালের যে কোনো ক্ষুদ্র অঞ্চলে আমরা এমনভাবে স্থানাঙ্ক নির্বাচন করতে পারি যে আমরা বিশিষ্ট অপেক্ষবাদে যেরকম পেয়েছি অন্তর প্রায় নির্ভুলভাবে সেই বিশেষ অবয়ব গ্রহণ করে। তার কারণ ব্যাপারটা যে এইরকমই হবে গণিত শাস্ত্রের সাহায্যে সেটা বোঝা যায়। সীমিত অঞ্চলে বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ প্রয়োগের জন্য অঞ্চলটি মহাকর্ষবিহীন হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। সমগ্র অঞ্চলে মহাকর্ষের তীব্রতা যদি কার্যত এক হয় তাহলেই চলবে। এর সাহায্যে আমরা যে কোনো ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ প্রয়োগের ক্ষমতা লাভ করি। এটা কত ক্ষুদ্র হবে সেটা নির্ভর করে সন্নিহিত অঞ্চলের উপর। ভূ-পৃষ্ঠে এটা এমন ছোট হতে হবে যাতে পৃথিবীর বক্রতা অগ্রাহ্য করা যায়। গ্রহান্তবর্তী স্থানে এটা এমন ছোট হতে হবে যাতে সমগ্র অঞ্চলে সূর্য এবং গ্রহগুলির আকর্ষণ অবধারণীয়ভাবে অপরিবর্তিত থাকে (sensibly constant)। তারকাগুলির অন্তর্বর্তী স্থানে এটা হতে পারে বিরাট। ধরুন— দুটি তারকার দূরত্বের অর্ধেক এবং এতেও মাপনযোগ্য ভুল হবে না।

অর্থাৎ মহাকর্ষপ্রদায়ী পদার্থ (gravitating matter) থেকে বহুদূরে আমরা এমনভাবে স্থানাঙ্ক নির্বাচন করতে পারি যাতে প্রায় ইউক্লিডীয় স্থান পাওয়া যায়।

আসলে 'সেখানে বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ প্রযোজ্য' এই কথাই এখানে অন্যভাবে বলা হল। যদিও পদার্থের সান্নিধ্যে অতি ক্ষুদ্র অঞ্চলে আমরা স্থানকে প্রায় ইউক্লিডীয় করতে পারি তবুও যে অঞ্চলে মহাকর্ষ অবধারণীয়রূপে পরিবর্তিত হয় সে অঞ্চলের সম্পূর্ণ এলাকায় সেটা পারি না। যদি পারি তাহলে দ্বিতীয় স্বীকার্যে যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করা হয়েছে অন্ততপক্ষে সে দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে। স্বীকার্যটি হল ; মহাকর্ষীয় বলাধীন চলমান বস্তুপিণ্ডগুলি শুধুমাত্র ধরাকৃতি পথে চলে।

আমরা দেখেছি ধরাকৃতিই পৃষ্ঠতলে এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে অঙ্কিত হ্রস্বতম রেখা। উদাহরণ : পৃথিবী পৃষ্ঠে ধরাকৃতিগুলি বৃহৎ বৃত্ত। স্থান-কাল সম্পর্কে গণিত একই কিন্তু বাচনিক ব্যাখ্যা একটু অন্যরকম হতে হবে। ব্যাপক অপেক্ষবাদে শুধুমাত্র সন্নিহিত ঘটনাগুলিরই নির্দিষ্ট নিশ্চিত অন্তর রয়েছে। এ অন্তর একটি থেকে অন্যটিতে যাওয়ার গতিপথ নিরপেক্ষ। দূরস্থিত ঘটনাগুলির অন্তর নির্ভর করে যাত্রাপথের উপর। যাত্রাপথকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে তার অন্তরগুলি যোগ করে দূরস্থিত ঘটনাগুলির অন্তর গণনা করা হয়। অন্তর যদি স্থানানুরূপ হয় তাহলে একটি বস্তুপিণ্ড এক ঘটনা থেকে অন্য ঘটনায় যেতে পারে না। সুতরাং বস্তুপিণ্ডগুলি কিভাবে চলে সেই বিচার করার সময় আমরা আবদ্ধ থাকি কালানুরূপ অন্তরে। সন্নিহিত ঘটনাগুলি যখন কালানুরূপ তখন মনে হবে পর্যবেক্ষকদের একটি ঘটনা থেকে অন্য ঘটনায় যাওয়ার অন্তর্বর্তী কালই তাদের অন্তর। সুতরাং যাঁরা একটি ঘটনা থেকে অন্য ঘটনায় ভ্রাম্যমাণ তাঁদের বিচারে তাঁদের নিজেদের ঘড়িতে নির্দিষ্ট ভ্রমণকালই হবে দুটি ঘটনার সম্পূর্ণ অন্তর। কোনো কোনো পথে এই কাল হবে দীর্ঘতর আবার কোনো কোনো পথে হবে হ্রস্বতর। তাঁদের চলার গতি যত মন্থর হবে, ভ্রমণকালও তাঁদের কাছে ততই কম মনে হবে। এটাকে মামুলী বক্তব্য ভাবা কোনোক্রমেই উচিত নয়। আমি একথা বলছি না যে আপনি যদি লন্ডন থেকে এডিনবরা যান তাহলে আপনার গতি মন্থরতর হলে আপনার সময় বেশি লাগবে। আমি যা বলছি সেটা তার চাইতে অনেক বেশি অদ্ভুত। আমি বলছি : আপনি যদি সকাল দশটায় লন্ডন ছাড়েন এবং সন্ধ্যা সাড়ে ছটা-গ্রিনউইচ সময়ে এডিনবরা পৌছান তাহলে আপনার গতি যত মন্থর হবে সময়ও তত বেশি লাগবে— অবশ্য আপনি যদি নিজের ঘড়িতে সময় মাপেন এ বক্তব্য সত্যিই বেশ পৃথক। পৃথিবীতে স্থিত কোনো ব্যক্তির দৃষ্টিতে আপনার ভ্রমণকাল সাড়ে আট ঘণ্টা। কিন্তু আপনি যদি সৌরজগতে ভ্রাম্যমাণ একটি আলোকরশ্মি হতেন, যদি সকাল দশটায় লন্ডন থেকে যাত্রা শুরু করতেন

যদি বৃহস্পতি, শনি ইত্যাদি থেকে প্রতিফলিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত প্রতিফলিত হয়ে এডিনবরায় পৌছাতেন সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় তাহলে আপনার বিচারে এই ভ্রমণে একেবারে কোনো সময়ই লাগত না। আর আপনি যদি কোনো ঘোরাপথে যেতেন এবং দ্রুততর ভ্রমণের ফলে যদি আপনি ঠিক সময়ে পৌছাতেন তাহলে আপনার গতিপথ যত দীর্ঘ হতো, আপনার বিচারে—সময়ও তত কম লাগত। আপনার গতি আলোকের গতির যত নিকটতর হতো কাল-সংক্ষেপও অবিচ্ছিন্নভাবে সেই অনুপাতে হতো। এখন আমি বলছি : একটি বস্তুপিণ্ড যখন ভ্রমণ করে তখন তাকে নিজের উপর ছেড়ে দিলে সে সেই গতিপথই নির্বাচন করবে যে পথে দুটি পর্যায় (stage) অতিক্রম করতে সম্ভাব্য দীর্ঘতম কাল লাগবে। সে যদি একটি ঘটনা থেকে অন্য ঘটনায় অন্য কোনো পথে ভ্রমণ করত তাহলে তার নিজস্ব ঘড়ির মাপ অনুসারে সময় লাগত কম। এ কথার অর্থ : বস্তুপিণ্ডগুলিতে তাদের নিজের উপর ছেড়ে দিলে তাদের চলার গতি হবে যত মন্থর সম্ভব। এটা এক ধরনের মহাজাগতিক আলস্যবিধি (law of cosmic laziness)। এ তথ্যের গাণিতিক প্রকাশ হল : তাদের ভ্রমণপথ ধরাকৃতি। এ ক্ষেত্রে ভ্রমণের দুটি ঘটনার মোট অন্তর যে কোনো বিকল্প ভ্রমণ পথের চাইতে বেশি (এটা বৃহত্তর-ক্ষুদ্রতর নয়—এই ব্যাপারটার কারণ হল : যে ধরনের অন্তর আমরা বিচার করছি তার সাদৃশ্য দূরত্বের চাইতে কালের সঙ্গেই বেশি)। উদাহরণ : লোকে যদি পৃথিবীর বাইরে গিয়ে কিছুকাল ভ্রমণ করে আবার ফিরে আসতে পারত তাহলে তাদের গমনকাল এবং প্রত্যাবর্তন কালের মধ্যবর্তীকাল পৃথিবীবাসীদের তুলনায় যাত্রীদের ঘড়িতে কম হতো। সূর্য প্রদক্ষিণ করার সময় পৃথিবী তার যাত্রাপথে সেই পথই নির্বাচন করে যে পথের যে কোনো অংশ পরিভ্রমণ করতে তার নিজস্ব ঘড়ির অন্যপথে চলমান ঘড়ির তুলনায় বেশি সময় লাগবে। বস্তুপিণ্ডগুলিকে তাদের নিজেদের উপর ছেড়ে দিলে তারা স্থানকালে ধরাকৃতিতে চলমান হয়—এ কথার অর্থ এটাই।

স্থান-কালকে ইউক্লিডীয় বলে মাননা করা হয় না : এ তথ্য স্মরণে রাখা গুরুত্বপূর্ণ। ধরাকৃতিগুলি সাপেক্ষ এর ক্রিয়া হল : স্থান-কাল একটি গ্রাম্য পাহাড়ি এলাকার মতো। একখণ্ড পদার্থের সান্নিধ্যে যেন একটি স্থান-কালের পাহাড় রয়েছে। শীর্ষে না পৌছানো পর্যন্ত পাহাড়টা ক্রমশ দূরারোহ হতে থাকে—অনেকটা বোতলের গলার মতো। এটা শেষ হয় একটি খাড়া গিরিচূড়ায়। এর আগে মহাজাগতিক আলস্যবিধির উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিধি অনুসারে পাহাড়ের সন্নিধ্যে কোনো বস্তুপিণ্ড এলে সেটা ঋজুভাবে শিখরে যেতে চেষ্টা করবে না। চেষ্টা করবে ঘুরে যেতে। মহাকর্ষ সম্পর্কে আইনস্টাইনের দৃষ্টিভঙ্গির সারমর্ম

এটাই। একটি বস্তুপিণ্ড যা করে তার কারণ তার নিজ সান্নিধ্যের স্থান-কালের চরিত্র। দূরস্থিত একটি বস্তুপিণ্ড থেকে উৎসারিত রহস্যজনক কোনো বল তার কারণ নয়।

একটি উপমার সাহায্যে ব্যাপারটাকে সহজ করা যাবে। ধরুন একটা বিরাট সমতলে (plane) এক অন্ধকার রাতে হাতে লুণ্ঠন নিয়ে কয়েকজন লোক নানাদিকে ঘোরাফেরা করছিল। আরো অনুমান করুন সমতলের এক অংশে একটি পাহাড় ছিল আর পাহাড়ের মাথায় ছিল একটি জ্বলজ্বলে আলোকসঙ্কেত। যেমন বিবরণ দেওয়া হয়েছে আমাদের পাহাড়টা হতে হবে সেইরকম অর্থাৎ যার উপরে যাওয়া যায় তত দূরারোহ এবং শেষে একটা খাড়া গিরিশিখর। আরো অনুমান করব সমতলে বিন্দু বিন্দু কয়েকটা গ্রাম ছড়ানো রয়েছে এবং হাতে লণ্ঠন নিয়ে লোকেরা গ্রামের দিকে এবং গ্রাম থেকে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছে। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাওয়ার সহজতম রাস্তায় পথ তৈরি হয়েছে। পাহাড়ের উপর খুব বেশি দূর ওঠা এড়াবার জন্য সবকটা পথই কিন্তু কম-বেশি বাঁকা (curved)। গিরিশিখরের কাছাকাছি জায়গায় গিরিশিখর থেকে খানিকটা দূরের তুলনায় পথগুলির বক্রতা অনেক বেশি। এখন ধরুন একটা বেলুনে চড়ে খুব উঁচু থেকে যতটা সম্ভব ভাল করে এই জিনিসগুলি আপনি দেখছেন—জমিটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন না—দেখছেন শুধু লণ্ঠনগুলি আর আলোকসঙ্কেত। একটা পাহাড় রয়েছে কিংবা আলোকসঙ্কেতটা রয়েছে পাহাড়ের উপর, এ সমস্ত তথ্য আপনি জানতে পারবেন না। আপনি দেখতে পাবেন লোকে আলোক সঙ্কেতের কাছে এলে ঋজুপথ থেকে বাইরের দিকে সরে যায়। আপনার ভাবা স্বাভাবিক যে, এর কারণ ঐ আলোকসঙ্কেত। আপনি ভাবতে পারেন ওটা খুব গরম —লোকে পুড়ে যাওয়ার ভয় পাচ্ছে। কিন্তু আপনি যদি দিনের আলোক পর্যন্ত অপেক্ষা করেন তাহলে আপনি পাহাড়টা দেখতে পাবেন, বুঝতে পারবেন আলোকসঙ্কেতটা ঐ পর্বতশিখরটা নির্দেশ করছে— হাতে লণ্ঠন নিয়ে যারা ঘুরছে তাদের উপর কোনো প্রভাবই ওর নেই।

এই উপমার আলোকসঙ্কেতটা সূর্যের প্রতিরূপ, হাতে লণ্ঠন লোকেরা প্রতিরূপ গ্রহ এবং ধূমকেতুর। পথ প্রতিরূপ কক্ষপথের (orbit) আর দিবালোকের আবির্ভাব প্রতিরূপ আইনস্টাইনের আবির্ভাবের। আইনস্টাইন বলেছেন, সূর্য স্থানে অবস্থিত নয়— সূর্যের অবস্থান স্থান-কালে। (পাঠককে আমার পরামর্শ : এর কোনো মানসচিত্র সৃষ্টি করতে যাবেন না কারণ সেটা অসম্ভব)। প্রতিটি বস্তুপিণ্ড পরের মুহূর্তে সহজতম পথ অনুসরণ করতে চেষ্টা করে-কিন্তু পর্বতের অস্তিত্বের জন্য

সহজতম পথটি ঋজুরেখা নয়। মোরগ যেমন নিজের বিষ্ঠার ঢিবির উপর বসে থাকে তেমনি প্রতিটি বস্তুখণ্ডই তার নিজস্ব ক্ষুদ্র পাহাড়ের শিখর। পাহাড়টাই আমাদের জানা; শিখরের বস্তুখণ্ড অনুমান করা হয় সুবিধার জন্য। এ অনুমানের হয়তো কোনো প্রয়োজন নেই, শুধু পাহাড়েই আমাদের কাজ চলতে পারে। লড়য়া মোরগটা যেমন, আয়নায় দেখা যে মোরগটাকে দেখে মেজাজ বিগড়ে যায়- সেটার সঙ্গে লড়তে পারে না, তেমনি আমরাও আর কারো পাহাড়ে চড়তে পারি না।

আইনস্টাইনের মহাকর্ষীয় বিধির শুধুমাত্র গুণীয় (qualitative) বিবরণ আমি দিয়েছি। আমি নিজেকে যে পরিমাণ গণিত ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছি তার চাইতে বেশি পরিমাণ গণিত ব্যবহার না করে মাত্রিক (quantitative) বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। সব চাইতে আকর্ষণীয় ব্যাপার হলো এ বিধি আর দূরস্থিত ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। গ্রহগুলির উপর সূর্য কোনো বলই প্রয়োগ করে না। ঠিক যেমন জ্যামিতি পদার্থবিদ্যায় পরিণত হয়েছে তেমনি এক অর্থে পদার্থবিদ্যা পরিণত হয়েছে জ্যামিতিতে। মহাকর্ষীয় বিধি পরিণত হয়েছে এই জ্যামিতিক বিধিতে : প্রতিটি বস্তুপিণ্ড স্থান থেকে স্থানান্তরে গমনের জন্য সহজতম পন্থা অনুসরণ করে কিন্তু পথে যে সমস্ত পর্বত এবং উপত্যকার সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয় সেগুলি বস্তুপিণ্ডটির গতিপথকে প্রভাবিত করে।

আমরা অনুমান করে চলেছি যে বিচার্য বস্তুপিণ্ডটির উপর শুধুমাত্র মহাকর্ষীয় বলগুলিই ক্রিয়া করে। এখন আমাদের বিচার্য মহাকর্ষীয় বিধি। বিদ্যুৎচুম্বকীয় বল কিংবা উনপারমাণবিক (sub-atomic) কণামধ্যস্থ বল আমাদের বিচার্য নয়। এই সমস্ত বলগুলিকেই ব্যাপক অপেক্ষবাদের কাঠামোর ভিতরে নিয়ে আসবার অনেক চেষ্টা হয়েছে। এ প্রচেষ্টা আইনস্টাইন নিজে করেছেন। তাছাড়া করেছেন ওয়েইল (Weyl), কালুজা (Kaluza), ক্লাইন (klein) ইত্যাদি আরো অনেকে। কিন্তু এই প্রচেষ্টাগুলির কোনোটাই সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হয়নি। আপাতত আমরা এ গবেষণা অগ্রাহ্য করতে পারি। কারণ সমগ্রভাবে কোনো গ্রহের উপরই বিদ্যুৎচুম্বকীয় কিংবা উনপারমাণবিক বলগুলির উপলব্ধিযোগ্য কোনো ক্রিয়া নেই। তাদের গতির কারণ ব্যাখ্যার জন্য শুধুমাত্র মহাকর্ষই বিচার করতে হবে। এ অধ্যায়ে আমাদের এই কথাই বিচার্য।

আমাদের তৃতীয় স্বীকার্য : ভ্রাম্যমাণ আলোকশ্মির যে কোনো দুটি অংশের মধ্যবর্তী অন্তর শূন্য (zero)। এই স্বীকার্যের একটি সুবিধা এই যে, শুধুমাত্র স্বল্প পথের জন্য'—একথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই। অন্তরের প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশই

যদি শূন্য হয় তাহলে তাদের যোগফলও হবে শূন্য সুতরাং সেই আলোকরশ্মির দূরস্থিত অংশগুলিরও অন্তর শূন্য হবে। এই স্বীকার্য অনুসারে আলোকরশ্মির গতিপথও ধরাকৃতি। সুতরাং এখন স্থান-কালে ধরাকৃতি আবিষ্কারের দুটি প্রয়োগজ (empirical) পদ্ধতি আমাদের রয়েছে : আলোকরশ্মি এবং অবাধে চলমান বস্তুপিণ্ড। অবাধে চলমান বস্তুপিণ্ডগুলির ভিতরে রয়েছে সেগুলি, যেগুলি সামগ্রিক রূপে উপলব্ধিযোগ্যভাবে বিদ্যুৎচুম্বকীয় বল কিংবা ঊনপামাণবিক বলের প্রভাবাধীন নয়। অর্থাৎ সূর্য, তারকা, গ্রহ এবং উপগ্রহ এবং ভূপৃষ্ঠে পতনশীল বস্তুপিণ্ড-বিশেষ করে যখন শূন্যের ভিতর দিয়ে পড়েছে তখন। আপনি যখন পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে তখন আপনি বিদ্যুৎচুম্বকীয় বলের প্রভাবাধীন : আপনার পায়ের সান্নিধ্যের ইলেকট্রন প্রোটনগুলি আপনার পায়ের উপর একটি বিকর্ষণ বল প্রয়োগ করছে। এই বল পৃথিবীর মহাকর্ষকে পরাস্ত করার পক্ষে পর্যাপ্ত। এই বলই আপনাকে পৃথিবীর ভিতর দিয়ে পড়ে যেতে বাধা দেয়। পৃথিবীকে দেখতে ঘন (solid) হলেও আসলে তার অধিকাংশই শূন্যস্থান।

৯

আইনস্টাইনের মহাকর্ষীয় বিধির প্রমাণ

নিউটনের মহাকর্ষীয় বিধির স্থলে আইনস্টাইনের মহাকর্ষীয় বিধি গ্রহণ করার কারণ অংশত প্রয়োগজ (empirical) এবং অংশত যৌক্তিক (logical)। আমরা শুরু করব প্রথমটা দিয়ে।

গ্রহ এবং তাদের উপগ্রহগুলির কক্ষ গণনায় প্রয়োগ করলে নতুন মহাকর্ষীয় বিধি এবং পুরানো মহাকর্ষীয় বিধির ফল প্রায় একই। তা না হলে নতুন বিধি সত্য হতে পারত না, তার কারণ, দেখা গিয়েছে প্রাচীন বিধি থেকে আহরিত ফলাফল পর্যবেক্ষণের সাহায্যে প্রায় নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয়েছে। আইনস্টাইনের নতুন বিধি প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে। প্রাচীন বিধির তুলনায় তাঁর নতুন বিধি যে ভাল সেটা দেখানোর জন্য তখন তিনি পরীক্ষালব্ধ একটি তথ্যই উপস্থিত করতে পারতেন। সেটা হল : বুধ (Mercury) গ্রহের অনুসুরের (perihelion) গতি।

অন্যান্য গ্রহের মতো বুধগ্রহও উপবৃত্তাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্য থাকে উপবৃত্তের একটি নাভিতে (focus-ফোকাস)। এই কক্ষের কোনো কোনো বিন্দুতে সূর্য কক্ষের অন্য বিন্দুর তুলনায় নিকটতর। যে বিন্দুতে গ্রহটি সূর্যের নিকটতম সেই বিন্দুর নাম অনুসুর (perihelion)। পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছে

সূর্যের নিকটতম হওয়ার একটি ঘটনা থেকে ঐরকম পরের ঘটনায় যেতে বুধগ্রহ ঠিক নির্ভুলভাবে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে না, করে তার চাইতে একটু বেশি। এই গরমিল অতি সামান্য। এক শতাব্দীতে এর পরিমাণ বিয়াল্লিশ সেকেন্ডের একটি কোণ। এক শতাব্দীতে বুধগ্রহ সূর্য প্রদক্ষিণ করে চারশ বারের চাইতে একটু বেশি। সুতরাং তাকে একটি অনুসুর থেকে অন্য অনুসুরে যেতে একটি আবর্তনের চাইতে ১/১০ সেকেণ্ড কোণ বেশি পরিভ্রমণ করতে হবে। নিউটনীয় তত্ত্বের সঙ্গে অতি সামান্য এই গরমিল জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধাঁধায় ফেলত। অন্য গ্রহগুলির প্রভাবের অভিক্রিয়ার একটি হিসাব ছিল কিন্তু এই প্রভাবকে হিসাবের ভিতরে নিয়েও সেই সামান্য গরমিল অবশিষ্ট থেকে যায়। নতুন তত্ত্ব নির্ভুলভাবে সেই সামান্য গরমিলের হিসাব মিলিয়ে দিয়েছে। অন্য গ্রহগুলির ক্ষেত্রেও এই ধরনের অভিক্রিয়া রয়েছে কিন্তু সেটা আরো অল্প। তাছাড়া এখনো সেগুলি নিশ্চিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়নি। প্রথমে বুধগ্রহের গতির অনুসুর অভিক্রিয়াই ছিল পুরানো তত্ত্বের তুলনায় নতুন তত্ত্বের একমাত্র পরীক্ষালব্ধ সাফল্য।

দ্বিতীয় সাফল্য ছিল আরো বেশি চাঞ্চল্যকর। প্রাচীন মত অনুসারে, শূন্যস্থানে আলোকের সব সময়ই ঋজুরেখায় ভ্রমণ করা উচিত। পদার্থকণা দিয়ে গঠিত না হওয়ায় দরুন আলোকের মহাকর্ষ দিয়ে প্রভাবিত না হওয়াই উচিত। প্রাচীন চিন্তাধারার সঙ্গে কোনো বিশেষ বিরোধিতা না করেও কিন্তু একথা মেনে নেওয়া যেত যে সূর্যের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আলোক পদার্থকণা দিয়ে গঠিত বস্তুর মতো ঋজুপথ থেকে বিচ্যুত হতে পারে। নতুন তত্ত্ব অনুসারে কিন্তু আলোকের বিচ্যুতি এর দ্বিগুণ হতে হবে, অর্থাৎ একটি তারকার আলো যদি সূর্যের খুব কাছ দিয়ে যায় তাহলে তারকা থেকে বহির্গত আলোকরশ্মি পৌনে দুই সেকেন্ডের একটু কম পরিমাণ কোণের বাঁক সৃষ্টি করবে। প্রাচীনপন্থীরা এর অর্ধেক পরিমাণ মানতে রাজী ছিলেন। অসুবিধা হল, সূর্যের সঙ্গে সমরেখায় অবস্থিত তারকাগুলি শুধুমাত্র সূর্যগ্রহণের সময়ই দেখা যায়। এমনকি তখনো সূর্যের কাছাকাছি যথেষ্ট উজ্জ্বল তারকা না থাকতে পারে। এডিংটন (Eddington) দেখালেন এদিক থেকে বছরের সবচাইতে ভাল দিন ২৯শে মে। কারণ ঐ তারিখে সূর্যের কাছাকাছি অনেকগুলি উজ্জ্বল তারকা থাকে। এক অবিশ্বাস্য সৌভাগ্যের ফলে ১৯১৯ সালের ২৯শে মে সূর্যের পূর্ণগ্রহণ ছিল। দুটি ব্রিটিশ অভিযান এই গ্রহণের সময় সূর্যের নিকটবর্তী তারকাগুলির ফটো তোলে। ফটো নতুন তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণ করে। এর ফলে সে সময় বিরাট উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তবে পর্যবেক্ষণে অনেক ভুলের উৎস থাকতে পারত এবং পরীক্ষাফল দ্বন্দ্বের সম্পূর্ণ মীমাংসা করেছে একথা বলা যায়

না। পরবর্তী গ্রহণ পর্যবেক্ষণে তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণীর অর্ধেক থেকে দ্বিগুণ পর্যন্ত [illegible] পাওয়া গিয়েছে।

তবে ইদানীং আবিষ্কৃত হয়েছে কোয়াসার নামক এক তারকা জাতীয় শক্তিশালী বেতার তরঙ্গের উৎসগুলির কতকগুলি থেকে নির্গত তরঙ্গ সূর্যের খুব কাছ দিয়ে যায়। বছরের কোনো কোনো সময় ব্যাপারটা পৃথিবীর থেকে দেখা যায়। নতুন তত্ত্বে আলোকের বিচ্যুতি সম্পর্কীয় ভবিষ্যদ্বাণী বেতার তরঙ্গে বিচ্যুতি সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য। কুড়ি মাইল কিংবা তার কাছাকাছি দূরত্বে দুটি কিংবা বেশি সংখ্যক বেতার দূরবীক্ষণ (রেডিও টেলিস্কোপ) যন্ত্র ব্যবহার করে অতি নির্ভুলভাবে বিচ্যুতি মাপা সম্ভব। পরীক্ষাফলের সঙ্গে নতুন তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণীর ঘনিষ্ঠ ঐক্য রয়েছে।

নতুন তত্ত্বের তৃতীয় পরীক্ষামূলক ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতাও খুব নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য আইনস্টাইন পরীক্ষাটা প্রথমে যেভাবে করার প্রস্তাব করেছিলেন এখন আর সেভাবে পরীক্ষা করা হয় না। আলোচ্য অভিঘাতটা (effect) ব্যাখ্যা করার আগে কয়েকটি প্রাথমিক ব্যাখ্যা প্রয়োজন। একটি মৌলিক পদার্থ তাপদীপ্ত হলে তার বর্ণালীতে নানারকম রেখা থাকে-তাপদীপ্ত মৌলিক পদার্থ থেকে নির্গত আলোকের বর্ণালী নানা রঙের রেখা দিয়ে গঠিন। সেগুলিকে ত্রিপার্শ্ব (prism) কাচ দিয়ে পৃথক করা যায়। মৌলিক পদার্থটি পৃথিবী, সূর্য কিংবা তারকা যেখানেই থাকুক না কেন বর্ণালী তার একই থাকে (ঘনিষ্ঠ আসন্নতা পর্যন্ত to a close approximation)। প্রতিটি রেখাই একটি নির্দিষ্ট রঙের এবং তার তরঙ্গদৈর্ঘ্যও নির্দিষ্ট। দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যগুলি থাকে বর্ণালীর লাল প্রান্তের দিকে, হ্রস্বতরগুলি থাকে বেগুনি প্রান্তের দিকে। আপনি যখন বাতাসের বিপক্ষে চলেছেন তখন সমুদ্রের ঢেউগুলি দ্রুততর আসে। ঠিক তেমনি আপনার এবং আলোকের উৎসের ভিতরে দূরত্ব যখন কমতে থাকে আপাতদৃষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য তখন কমতে থাকে। এর সাহায্য আমরা বুঝতে পারি তারকাগুলি আমাদের নিকটতর হচ্ছে না আমাদের কাছ থেকে দূরতর হচ্ছে। দূরত্ব যদি কমতে থাকে তাহলে একটি মৌলিক পদার্থের বর্ণালীর সমস্ত রেখাগুলিই বেগুনির দিকে একটু সরে যাবে। দূরত্ব যদি বাড়তে থাকে তাহলে সরবে লালের দিকে। শব্দের ক্ষেত্রে একই ধরনের অভিক্রিয়া আপনি যে কোনো দিন লক্ষ্য করতে পারেন। আপনি যদি একটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং হুইস্‌ল দিতে দিতে একটা এক্সপ্রেস ট্রেন আসে। তাহলে ট্রেনটি আপনার কাছ থেকে চলে যাওয়ার সময়ের স্বরের তুলনায় ট্রেনটি যখন আপনার দিকে আসছে তখনকার স্বর অনেক বেশি তীক্ষ্ণ (shrill) শোনায়

...। অনেকে হয়তো ভাবেন স্বরের সত্যিই কোনো পরিবর্তন হয়েছে। আসলে ...শ্রুতির পরিবর্তনের কারণ ট্রেনটা প্রথমে আপনার দিকে আসছিল তারপরে ...আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। গাড়ির ভিতরের লোকের ক্ষেত্রে কিন্তু ...স্বরের কোনো পরিবর্তন হয়নি। যে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল এটা সে ...ঘটনা নয়। নতুন তত্ত্ব অনুসারে একটি পরমাণু যেখানেই থাকুক না কেন তার ...অভ্যন্তরে সংঘটিত যে কোনো পর্যাবৃত্ত ক্রিয়া (periodic process) একই কাল ...অন্তর' (interval) স্থায়ী। কিন্তু এক জায়গায় কাল অন্তর অন্য জায়গায় একই ...কাল অন্তরের নির্ভুল অনুরূপ হয় না। তার কারণ : যে স্থান-কাল মহাকর্ষ গঠন ...করে তার 'পাহাড়ি' (hilly) চরিত্র।

তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণী : ভূমিতলে অবস্থিত একটি পরমাণুর ভিতরে সংঘটিত ...একটি পর্যাবৃত্ত ক্রিয়ার (periodic process) হার (rate) খুব উঁচু একটা বাড়িতে ...ছাদে অবস্থিত একই পরমাণুর ভিতরে সংঘটিত একই পর্যাবৃত্ত ক্রিয়ার হারের ...চাইতে একটু মন্থরতর (silghtil slower rate)। আলোকরশ্মি উৎসর্জন (emis-...sion) আসলে একটি পর্যাবৃত্ত ক্রিয়া। এ ক্রিয়া যদি মন্থরতর হয় তাহলে দুটি ...তরঙ্গ শীর্ষের (wave crest) মধ্যবর্তী স্থান অধিকতর হওয়া অনুমোদিত হবে ...সুতরাং দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সম্পন্ন আলোক উৎপাদিত হবে। অতএব আলোক ...যখন ভূমিতল থেকে বাড়ির ছাদে প্রেরিত হয় তখন বাড়ির ছাদে অবস্থিত ...পর্যবেক্ষকদের মনে হবে সেই আলোকের বর্ণালীর একটি বিশেষ রেখা, ...আলোকটি যদি তাদের নিজেদের তল থেকে প্রেরিত হয় তাহলে তার বর্ণালীর ঐ ...রেখার তুলনায়, বর্ণালীর লাল প্রান্তের নিকটতর।

আইনস্টাইনের ভবিষ্যদ্বাণী সূর্যে অবস্থিত পরমাণুগুলি থেকে উৎসারিত ...আলোক তরঙ্গের সঙ্গে পৃথিবীতে অবস্থিত পরমাণুগুলি থেকে উৎসারিত ...আলোকতরঙ্গের তুলনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ভূ-পৃষ্ঠের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের তুলনায় ...সূর্যপৃষ্ঠের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র অত্যন্ত শক্তিশালী। সুতরাং ভূমিতল এবং ছাদের ক্ষেত্রে ...তরঙ্গদৈর্ঘ্য পার্থক্যের তুলনায় এ ক্ষেত্রে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পার্থক্য বৃহত্তর কিন্তু ...সূর্যালোকে মাপনের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই। সে ক্ষেত্রেও একই অভিক্রিয়া ...করা উচিত। প্রথম ভবিষ্যদ্বাণীর সময় পার্থিব (terrestrial) মাপন অসম্ভব ছিল। ...কিন্তু গত পঁচিশ বছরে আবিষ্কৃত নতুন পদ্ধতিগুলির সাহায্যে অতীব নির্ভুলভাবে ...মাপা তরঙ্গদৈর্ঘ্য আলোকসঙ্কেত প্রেরণ সম্ভব হয়েছে এবং যে অভিক্রিয়া সম্পর্কে ...ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল সে অভিক্রিয়া বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাহায্যে ...নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

নতুন মহাকর্ষীয় বিধি এবং প্রাচীন বিধির ভিতরে আরো অনেক পার্থক্য রয়েছে। তার অনেক গুলির সত্যতা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাহায্যে নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এর ভিতরে সবচাইতে নির্ভুল হল 'কাল বিলম্বী' (time delay) অভিক্রিয়া। এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ১৯৬৪ সালের আগের করা হয়নি। অর্থাৎ নতুন তত্ত্ব উপস্থাপনের প্রায় পঞ্চাশ বছর পর এই তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে।

এর কারণ বোধ হয় : আলোচ্য কাল বিলম্ব এক সেকেন্ডের দশ লক্ষ ভাগের কয়েক শত অংশ মাত্র (few hundred millionth of second)। তার বেশি নয় এবং এত ক্ষুদ্র কাল মাপন সম্ভব হয়েছে সম্প্রতি। ভবিষ্যদ্বাণীটি হল : নিকটে যখন মহাকর্ষীয় পাহাড় এই তখনকার তুলনায় মহাকর্ষীয় পাহাড় যখন রয়েছে তখন একটি নির্বাচিত স্থান থেকে অন্য নির্বাচিত স্থানে যেতে একটি আলোকসঙ্কেতের সময় বেশি লাগবে। রাডার (radar) সঙ্কেত সম্পর্কেও এ ভবিষ্যদ্বাণী সমভাবে প্রযোজ্য। এই পরীক্ষাগুলিতে পৃথিবী থেকে একটি রাডার সঙ্কেত অন্য একটি গ্রহ কিংবা একটি কৃত্রিম উপগ্রহে পাঠানো হয় এবং সঙ্কেতগুলি প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে। প্রতিফলকটি (reflecting agent) যখন সূর্যের দূরবর্তী পার্শ্বে অবস্থিত মাপন তখনই করা হয়। এক্ষেত্রে সূর্য মহাকর্ষীয় পাহাড়ের ভূমিকা পালন করে। পরীক্ষাফল অতি নির্ভুলভাবে ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা পালন করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভুলের পরিমাণ এক সহস্রাংশের চাইতেও কম।

মহকাশে বস্তুপিণ্ডগুলির গতি সম্পর্কে যে সমস্ত ক্ষেত্রে নতুন তত্ত্ব এবং পুরান তত্ত্বে মতভেদ হয় সেই সমস্তক্ষেত্রে নতুন তত্ত্বই নির্ভুল ফল প্রদান করে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এ তথ্য বিশ্বাস করাতে প্রাগুক্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলি যথেষ্ট। নতুন তত্ত্বের সপক্ষে পরীক্ষামূলক ভিত্তি যদি নিঃসঙ্গও হতো, তাহলেও সে ভিত্তি হতো প্রামাণ্য। নতুন বিধি নির্ভুল সত্যের প্রতিরূপ হোক কিংবা না হোক, প্রাচীন বিধির তুলনায় যে নতুন বিধি সত্যের নিকটতর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অথচ প্রাচীন বিধিতে ভুল ছিল অতীব সামান্য।

প্রথমে যে কারণগুলি ছিল নতুন বিধি আবিষ্কারের পথিকৃৎ সেগুলি কিন্তু ব্যাপ্তি বিস্তৃতি ছিল না। এমন কি বুধগ্রহের অনুসুর সম্পর্কীয় যে ফল সেটাও আহরণ করা সম্ভব ছিল শুধুমাত্র তত্ত্বটি সম্পূর্ণ হওয়ার পর এবং পূর্বেকার পর্যবেক্ষণের সাহায্যে। বুধগ্রহ সম্পর্কীয় তথ্য প্রমাণ করা যেত। তবুও এ তথ্য কোনোক্রমেই এরকম একটি তত্ত্ব আবিষ্কারের প্রাথমিত কারণের কোনো অংশ হতে পারে না। এ কারণগুলির চরিত্র ছিল আরো বিমূর্ত এবং যৌক্তিক। এ কথা আমি বলছি না যে এগুলি ছিল পূর্বত : নিরপেক্ষ (a priori) কল্পনা অর্থাৎ প্রাচীনকালে দার্শনিকরা যা করতেন সেইরকম। আমি বলতে

[illegible] : এগুলি আহরণ করা হয়েছিল ভৌত অভিজ্ঞতার কয়েকটি সাধারণ চরিত্র [illegible]। সেগুলি থেকেই বোঝা গিয়েছিল যে প্রাচীন বিধি নিশ্চয়ই ভুল এবং নতুন [illegible] মতো কিছু একটা প্রতিস্থাপন করতেই হবে।

আগের অধ্যায়গুলিতে আমরা দেখেছি গতির আপেক্ষিকতা সম্পর্কীয় [illegible]গুলি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী (quite conclusive)। দৈনন্দিন জীবনে যখন আমরা [illegible] একটা কিছু চলছে তখন আমরা বোঝাতে চাই সেটা চলছে পৃথিবী সাপেক্ষ। [illegible]গুলির গতি বিচারের সময় আমরা ভাবি সেগুলি চলছে সূর্য সাপেক্ষ কিংবা [illegible]রতন্ত্রের ভরের কেন্দ্র সাপেক্ষ। যখন আমরা বলি সৌরতন্ত্র নিজেই চলমান [illegible] আমরা বোঝাতে চাই-এটা চলছে তারকাপুঞ্জ সাপেক্ষ। এমন কোনো ভৌত [illegible] নেই যার নাম দেওয়া যেতে পারে পরম গতি (absolute motion)। [illegible]াং ভৌতবিধির বিচার্য হতে হবে আপেক্ষিক গতি। কারণ একমাত্র সেইরকম [illegible] বাস্তবে ঘটে।

এখন আমরা গতির আপেক্ষিকতাকে এই পরীক্ষামূলক তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে [illegible] করতে চাইছি ; দুটি বস্তুপিণ্ড যেভাবেই চলমান হোক না কেন আলোকে [illegible] একটি সাপেক্ষ যা অন্যটি সাপেক্ষও তাই। ঐ তথ্যই দূরত্ব এবং কালের [illegible]াপেক্ষিকতার পথিকৃৎ। এ তথ্যই আবার দেখিয়ে দেয় : এমন কোনো বস্তুনিষ্ঠ [illegible] ঘটনা নেই যাকে বলা যায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে দুটি বস্তুপিণ্ডের অন্তবর্তী [illegible]ত্ব। কারণ কাল এবং দূরত্ব দুটোই নির্ভর করে পর্যবেক্ষকের উপর। সুতরাং [illegible]ান মহাকর্ষীয় বিধি যৌক্তিক বিচারে গ্রাহ্য নয়। কারণ এ বিধি 'একটি নির্দিষ্ট [illegible] দূরত্ব' ব্যবহার করে।

এ থেকে বোঝা যায়-আমরা প্রাচীন বিধি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। কিন্তু তার [illegible]ায় কি প্রতিস্থাপন করতে হবে সেটা বোঝা যায় না। এখানে কয়েকটি বিষয় [illegible] পড়ে। প্রথমত আমাদের রয়েছে 'মহাকর্ষীয় ভর এবং জড়ত্বীয় ভরের সমতা'। [illegible] অর্থ হল : একটি বস্তুপিণ্ডের প্রতি একটি নির্দিষ্ট বল* প্রয়োগ করলে সেটা যদি [illegible]া হয় তাহলে তাকে যতটা ত্বরণ দান করা সম্ভব, ভারী হলে সেটাকে ততটা ত্বরণ [illegible]ান দান করতে পারেন না। একটি বিশেষ ত্বরণ দান করতে যে পরিমাণ বল [illegible]োজন হয় সেটাই একটি বস্তুপিণ্ডের জড়ত্বীয় ভরের মাপ (measure)।

[illegible]গেই দেখানো হয়েছে নতুন তত্ত্বে 'মহাকর্ষীয় বল'—কে আর গতিবিদ্যার (dynamics) মৌল [illegible]রূপে বিচার করা হয় না—একে ব্যবহার করা হয় বলার সুবিধার জন্য। ঠিক যেমন আমরা 'সূর্যোদয়' [illegible]' শব্দ ব্যবহার করি 'মহাকর্ষীয় বল'-ও তেমনি ব্যবহার করা যেতে পারে। অবশ্য আমাদের বুঝতে [illegible] আমরা কি বলতে চাইছি। অনেক সময় বল শব্দটি এড়ানোর জন্য অত্যন্ত ঘোরানো অনেক কথা [illegible]া করতে হয়।

ভূ-পৃষ্ঠের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে 'ভর' (mass) এবং 'ওজন' (weight) আনুপাতিক। দাঁড়িপাল্লা দিয়ে যেটা মাপা হয় সেটা ঠিক ওজন নয় সেটা আপে
ভর ওজনের সংজ্ঞা : একটি বস্তুপিণ্ডকে পৃথিবী যে বল দিয়ে আকর্ষণ ক
সেটাই ওজন। এ বল বিষুবরেখাতে যতটা, মেরু প্রদেশে তার চাইতে বেশি।
কারণ বিষুবরেখাতে পৃথিবীর আবর্তন একটি 'অপকেন্দ্র (centrifugal)' বল
করে। সেই বল আংশিকভাবে মহাকর্ষের বিরোধী। অতি উচ্চে কিংবা অতি
খনির তলদেশের তুলনায় ভূ-পৃষ্ঠে পৃথিবীর আকর্ষণী বল বৃহত্তর। দাঁড়িপাল্লা
কিন্তু এই পরিবর্তনগুলি বোঝা যায় না কারণ ওজন করার বাটখারা এবং
বস্তুপিণ্ড ওজন করা হবে দুইয়ের উপরই এই পরিবর্তনগুলি সমান ক্রিয়া করে
তবে স্প্রিং-এর ওজন কল ব্যবহার করলে পরিবর্তনগুলি বোঝা যায়। ওজনের
সমস্ত পরিবর্তনের সময় ভরের কোনো পরিবর্তন হয় না।

মহাকর্ষীয় ভরের সংজ্ঞা ভিন্ন। এর অর্থ দু'রকম হতে পারে। আমরা
করতে পারি—

(১) মহাকর্ষের তীব্রতা যেখানে জানা আছে সেখানে একটি বস্তুপিণ্ডের
প্রতিক্রিয়ার ধরন—উদাহরণ : ভূ-পৃষ্ঠে কিংবা সূর্য-পৃষ্ঠে।

(২) বস্তুপিণ্ডটি যে মহাকর্ষীয় বল সৃষ্টি করে তার তীব্রতা—উদাহরণ
পৃথিবীর তুলনায় সূর্য বেশি শক্তিশালী মহাকর্ষীয় বল সৃষ্টি করে। পুরানো
বলে: দুটি বস্তুপিণ্ডের অন্তর্বর্তী মহাকর্ষীয় বল তাদের ভরের গুণফলের
আনুপাতিক। এইবার বিচার করা যাক— একই বস্তুপিণ্ডের (ধরুন-সূর্য)
বিভিন্ন বস্তুপিণ্ডের আকর্ষণ। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বস্তুপিণ্ড যে বল দ্বারা আকর্ষিত
সে বল তাদের ভরের আনুপাতিক। সুতরাং সেই বলগুলি সবার
নির্ভুলভাবে একই ত্বরণ সৃষ্টি করে। অতএব আমরা যদি 'মহাকর্ষীয় ভর'
বোঝাতে চাই প্রথম অর্থ (১) অর্থাৎ মহাকর্ষ সাপেক্ষ একটি বস্তুপিণ্ডের প্রতিক্রিয়া
তাহলে আমরা দেখতে পাই 'জড়ত্বীয় এবং মহাকর্ষীয় ভরের সমতা'। কথাটা
শুনতে ভয়াবহ হলেও এর অর্থটা হল : একটি নির্দিষ্ট মহাকর্ষীয় পরিস্থিতিতে সমস্ত
বস্তুপিণ্ডের আচরণ নির্ভুলভাবে এক। ভূ-পৃষ্ঠ সাপেক্ষ গ্যালিলিও-র
আবিষ্কারগুলির ভিতরে এই আবিষ্কারটিও ছিল। অ্যারিস্টটল ভাবতেন
বস্তুপিণ্ডের তুলনায় ভারী বস্তুপিণ্ডের পতন হয় দ্রুততর। গ্যালিলিও দেখিয়েছিলেন
বাতাসের বাধা না থাকলে এ তথ্য সত্য নয়। শূন্যস্থানে একটি পালক এবং
সীসার মতোই তাড়াতাড়ি পড়ে। গ্রহ পুঞ্জ সম্পর্কে অনুরূপ তথ্য
করেছিলেন নিউটন। সূর্য থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থিত একটি ধূমকেতু

এবং একটি গ্রহের দূরত্ব এক হলেও সূর্যের অভিমুখে তারা একই রকম ত্বরণ অনুভব করবে। অথচ ধুমকেতুর ভর অত্যন্ত কম। সুতরাং একটি বস্তুপিণ্ডকে মহাকর্ষ কিভাবে প্রভাবান্বিত করে সেটা নির্ভর করে তার অবস্থানের উপর, কোনোরকমেই বস্তুপিণ্ডের ধর্মের (nature) উপর নির্ভর করে না। এ থেকে মনে হয় মহাকর্ষীয় অভিক্রিয়া অঞ্চলের চরিত্রের (characteristic of the locality)। আইনস্টাইন এই মতই প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন।

দ্বিতীয় অর্থে (২) মহাকর্ষীয় ভর বিষয়ে অর্থাৎ একটি বস্তুপিণ্ড যে বল উৎপন্ন করে তার তীব্রতা সম্পর্কে নতুন তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণী : প্রথম অর্থে মহাকর্ষীয় ভর এবং দ্বিতীয় অর্থে মহাকর্ষীয় ভর অভিন্ন। এ ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণ করে এরকম একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা অন্তত করা হয়েছে।

যদি একটি সান্নিধ্যের বৈশিষ্ট্য (characteristic of neighbourhood) হতে হয় তাহলে মহাকর্ষীয় বিধির কি রকম হওয়া আবশ্যিক (must be) সে সম্পর্কে আমাদের আর একটি ইঙ্গিত রয়েছে। কারণ, সান্নিধ্যের বৈশিষ্ট্য হতে পারে এ রকম অনুমান করার যুক্তি আমরা দেখেছি। এটা এমন একটা বিধিতে প্রকাশ করা উচিত যে বিধি আমরা অন্য রকম স্থানাঙ্ক গ্রহণ করলেও অপরিবর্তিত থাকে। আমরা আগেই দেখেছি—শুরু থেকে আমরা কখনোই আমাদের স্থানাঙ্কগুলির কোনো ভৌত গুরুত্ব আছে একথা মনে করব না, স্থানাঙ্কগুলি স্থান-কালের বিভিন্ন অংশের সুসম্বদ্ধ নামকরণের পদ্ধতিমাত্র। এগুলি শুধুমাত্র রীতিরক্ষা করে (conventional)। সেইজন্য এগুলি কোনো ভৌতবিধির অংশ হতে পারে না। একথা বলার অর্থ যদি এক গুচ্ছ (set) স্থানাঙ্ক সাপেক্ষও একই সঙ্কেতের (formula) সাহায্যে সে বিধিকে অবশ্যই প্রকাশিত হতে হবে। কিংবা আরো নির্ভুলভাবে বলা যায় : বিধিটিকে প্রকাশ করে এমন একটি সঙ্কেত অবশ্যই আবিষ্কার করা সম্ভব হতে হবে যে, স্থানাঙ্কের পরিবর্তন আমরা যে ভাবেই করি না কেন, সে সঙ্কেত অপরিবর্তিত থাকবে। সে রকম সঙ্কেত নিয়ে কাজকর্ম করার দায়িত্ব টেন্সর সম্পর্কীয় তত্ত্বের (theory of tensors)। টেন্সর তত্ত্ব দেখিয়েছে : সম্ভাব্য মহাকর্ষীয় বিধিরূপে এমন একটি সঙ্কেত রয়েছে যে সঙ্কেতকে অন্য সঙ্কেতগুলির চাইতে বেশি উপযুক্ত মনে হয়। পরীক্ষা করলে দেখা যায় এই সম্ভাব্যতাই সঠিক ফল দান করে। পরীক্ষামূলক সত্যতা নির্ধারণের প্রশ্ন আসে এখানেই। যদি দেখা যেত যে নতুন বিধির অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঐক্য নেই তাহলেও কিন্তু আমরা পুরানো বিধিতে ফিরে যেতে পারতাম না। যুক্তি আমাদের এমন একটি বিধি খুঁজে বার করতে বাধ্য করত— যে বিধিতে গতি, দূরত্ব এবং কালের আপেক্ষিকতা প্রথিত। এ বিধি

প্রকাশিত হতো টেন্সরের বাগ্বিধিতে। গণিত ছাড়া টেন্সর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। গণিত যিনি জানেন না তাঁকে এই জ্ঞান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে যে এটা প্রয়োগ এমন একটি পদ্ধতি যার সাহায্যে আমরা আমাদের মাপন এবং বিধি থেকে রীতিগত উপাদান বাদ দিতে পারি এবং এইভাবে এমন সমস্ত ভৌতবিধিকে খুঁজে পারি যে বিধি পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গির অধীন নয়। এই পদ্ধতির সবচাইতে চমৎকার উদাহরণ আইনস্টাইনের মহাকর্ষীয় বিধি।

১০
ভর ভরবেগ শক্তি এবং ক্রিয়া

পরিমাণগত নির্ভুলতার চেষ্টা যেমন কষ্টসাধ্য তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। ভৌত মাপন করা হয় অসাধারণ নির্ভুলতার সঙ্গে। মাপন ক্রিয়ায় কম যত্ন নেওয়া হলে যে সব ভুলগুলি অপেক্ষবাদের পরীক্ষামূলক উপাত্ত সেগুলি কখনোই প্রকাশিত হতো না। অপেক্ষবাদের আগে গাণিতিক পদার্থবিদ্যা যে কল্পনগুলি ব্যবহার করত সেগুলিকে মনে করা হতো ভৌত মাপনের মতোই নির্ভুল কিন্তু পরে দেখা গেল সেগুলি যৌক্তিক দোষদুষ্ট। এই দোষ প্রকাশ পেয়েছে গণনার ভিত্তিতে যা আশা করা গিয়েছিল তা থেকে সামান্য বিচ্যুতিতে। এই অধ্যায়ে আমি দেখাতে চাই অপেক্ষবাদের আগেকার ভিতরে কি পরিবর্তন আনতে হয়েছে।

ভর সম্পর্কে এর আগে আমরা বলেছি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে ভর এবং ওজন একই। আউন্স, গ্রাম ইত্যাদি ওজন করার সাধারণ বাটখারাগুলি আসলে ভরের মাপ। কিন্তু নির্ভুল মাপন শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভর এবং ওজনের পার্থক্য মানতে বাধ্য হই। ওজন করার দুটি পদ্ধতি সাধারণত ব্যবহার করা হয়— দাঁড়িপাল্লা আর স্প্রিং-এর ওজনকল। বাজার যাওয়ার সময় আপনার মালপত্র চাপানো হয় স্প্রিং-এর উপরে, দাঁড়িপাল্লায় না। ওজনের চাপে স্প্রিং খানিকটা নেমে যায়— আর সেটা দেখানো হয় ডায়াল (dial—মুখপট্ট) সূঁচ দিয়ে। আপনার ওজন দেখাবার জন্য যে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র আছে তাতেও একই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। স্প্রিং-এর ওজনকল দেখায় ওজন কিন্তু দাঁড়িপাল্লা দেখায় ভর। যতক্ষণ আপনি পৃথিবীর একই অংশে রয়েছেন ততক্ষণ এ পার্থক্যে কিছু এসে যায় না। কিন্তু আপনি যদি বিভিন্ন স্থানে দুই ধরনের দুটি ওজনকল ব্যবহার করেন এবং সেগুলি যদি নির্ভুল হয় তাহলে দেখবেন তাদের মাপনফল সব সময় এক হয় না। দাঁড়িপাল্লার মাপনফল সব জায়গায়ই এক হবে কিন্তু স্প্রিং-এর ওজনকলে ত হবে না। অর্থাৎ আপনার কাছে যদি দাঁড়িপাল্লা

যেমনে দশ পাউন্ড সিসা থাকে তাহলে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করলে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায়ই তার ওজন দশ পাউন্ড হবে। কিন্তু লন্ডনে যদি ওজন স্প্রিং-এর কলে দশ পাউন্ড হয় তাহলে উত্তর মেরুতে ওজন হবে বেশি, বিষুবরেখায় হবে কম, বিমানে উঁচুতে উঠলে হবে কম আর কয়লা খনির তলায়ও কম হবে—অবশ্য ঐ সমস্ত জায়গায় যদি একই স্প্রিং-এর কলে ওজন করা হয়। আসলে দুটি পদার্থ দুটি একেবারেই ভিন্ন পরিমাণ (quantity) মাপে। দাঁড়িপাল্লা যা মাপে তাকে বলা হয় [এখন আমরা যে পরিমার্জনা (refinement) বিচার করব সেটা বাদ দিলে] পদার্থের পরিমাণ। এক পাউন্ড সীসা আর এক পাউন্ড পালকে একই পরিমাণ পদার্থ রয়েছে। প্রমাণ 'ওজন' আসলে প্রমাণ 'ভর'। দাঁড়িপাল্লার অন্য দিকটায় যে কোনো বস্তু চাপিয়ে দিয়ে সেই বস্তুর ভর এগুলি দিয়ে মাপা হয়। ওজন কিন্তু এমন একটি ধর্ম যার কারণ পৃথিবীর মহাকর্ষ। এটা হল সেই পরিমাণ বল যা দিয়ে পৃথিবী একটি বস্তুপিণ্ডকে আকর্ষণ করে। স্থান থেকে স্থানান্তরে এই বলের পরিবর্তন হয়। প্রথমত পৃথিবীর বাইরে যে কোনো জায়গায় এই বল পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে তার দূরত্বের বর্গের ব্যস্তপরিবর্তী (varies inversely)। সুতরাং বেশি উঁচুতে এ বল কম। দ্বিতীয়ত, আপনি যখন কয়লা খনির তলায় যান পৃথিবীর খানিকটা অংশ থাকে আপনার উপরে এবং পদার্থকে নিচে আকর্ষণ না করে উপরে আকর্ষণ করে ফলে নিচের দিকে মোট আকর্ষণ ভূ-পৃষ্ঠের তুলনায় কম। তৃতীয়ত, পৃথিবীর আবর্তনের দরুন সৃষ্টি হয় 'অপকেন্দ্র' বল (centrifugal force)—সে বল মহাকর্ষের বিরুদ্ধে ক্রিয়া করে। অপকেন্দ্র বল সবচাইতে বেশি বিষুবরেখায় কারণ আবর্তনের ফলে সেখানেই বেগ সবচাইতে বেশি। মেরু প্রদেশে এ বলের অস্তিত্ব নেই কারণ মেরুগুলি আবর্তনের অক্ষে অবস্থিত। এই সমস্ত কারণে একটি বস্তুপিণ্ডকে যে বল দিয়ে পৃথিবী আকর্ষণ করে সে বল এক এক জায়গায় এক এক রকম। এবং এ পার্থক্য মাপনযোগ্য। স্প্রিং-এর মাপন যন্ত্র এই বলই মাপে। এই জন্যই স্প্রিং-এর যন্ত্রের মাপনফল এক এক জায়গায় এক এক রকম। দাঁড়িপাল্লায় যে বস্তুপিণ্ড ওজন করা হবে সেটা এবং প্রমাণ বাটখারা একই রকম পরিবর্তিত হয়। সুতরাং দাঁড়িপাল্লার ক্ষেত্রে মাপনফল সর্বত্রই সমান কিন্তু এই মাপনফল ওজন নয় আসলে এটা ভর। একটি প্রমাণ ওজনের ভর সবএই এক কিন্তু ওজন সর্বত্র এক নয়। আসলে এটা ভরের একক (unit) ওজনের নাম। একটি বিশেষ বস্তুপিণ্ডের ভর অপরিবর্তী (invariable)। তাত্ত্বিক উদ্দেশ্যে ভরের গুরুত্ব ওজনের চাইতে অনেক বেশি। পরিস্থিতি অনুসারে ওজনের পরিবর্তন হয়। শুরুতে ভরকে 'পদার্থের পরিমাণ' বলে ভাবা যেতে পারে। পরে

আমরা দেখব এ দৃষ্টিভঙ্গিও সম্পূর্ণ নির্ভুল নয় কিন্তু পরবর্তী পরিমার্জন (refinements) শুরু করার জন্য শুরুতে এই অর্থে আমাদের কাজ চলতে পারে।

তাত্ত্বিক উদ্দেশ্যে ভরের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয় একটি নির্দিষ্ট ত্বরণ সৃষ্টি করতে যে পরিমাণ বল প্রয়োজন হয় তাই দিয়ে : একটি বস্তুপিণ্ডের ভর যত বেশি হবে একটি নির্দিষ্ট কালে তার বেগের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পরিবর্তন আনতে তত তত বেশি বলের প্রয়োজন হবে। একটি হ্রস্ব রেলগাড়ির তুলনায় একটি দীর্ঘ রেলগাড়ির প্রথম আধ মিনিটে ঘণ্টায় দশ মাইল বেগ লাভ করতে অনেক বেশি শক্তিশালী ইঞ্জিন প্রয়োজন হবে। কিংবা আমাদের এমন পরিস্থিতি হতে পারে যেখানে বিভিন্ন বস্তুপিণ্ড সাপেক্ষ বল অভিন্ন। সেক্ষেত্রে আমরা সেগুলিতে উৎপন্ন ত্বরণ মেপে তাদের ভরের পারস্পরিক অনুপাত বলতে পারি : ভর যত বেশি ত্বরণ তত কম। এই পদ্ধতির দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা অপেক্ষবাদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ একটি উদাহরণ দিতে পারি। তেজস্ক্রিয় বস্তুপিণ্ডগুলি থেকে বিরাট বেগে ইলেকট্রন নির্গত হয়। জলীয় বাষ্পের ভিতর দিয়ে চালালে সেগুলি যাত্রাপথে মেঘ সৃষ্টি করে। এইভাবে আমরা তাদের যাত্রাপথ পর্যবেক্ষণ করতে পারি। একই সময়ে আমরা তাদের উপর জানিত বৈদ্যুতিক আর চৌম্বক বল প্রয়োগ করতে পারি এবং এই বলগুলির দ্বারা তারা ঋজুরেখা ছেড়ে কতটা বক্র হয়— সেটা পর্যবেক্ষণ করতে পারি। এইভাবে তাদের ভরের তুলনা করা সম্ভব হয়। নিশ্চল পর্যবেক্ষকের মাপ অনুসারে তাদের গতি যত দ্রুততর ভরও তাদের তত বৃহত্তর। এখন অন্যভাবে জানা আছে গতির অভিক্রিয়া বাদ দিলে সমস্ত ইলেকট্রনের ভরই এক।

অপেক্ষবাদ আবিষ্কারের আগে এ সমস্তই জানা ছিল কিন্তু অপেক্ষবাদ দেখিয়েছে চিরায়ত কল্পনে ভরের উপর যে নির্দিষ্ট নিশ্চিত অর্থ আরোপ করা হয়েছিল সত্যিই সে নিশ্চিতি তার ছিল না। ভরকে ভাবা হতো 'পদার্থের পরিমাণ' এবং মনে করা হতো ভর একেবারেই অপরিবর্তী (quite invariable)। এখন কিন্তু দেখা গেল দৈর্ঘ্য এবং কালের মতো ভরও পর্যবেক্ষক-নির্ভর (relative to the observer) এবং ঠিক একই অনুপাতে গতির দ্বারা পরিবর্তিত হয়। এরও নিশ্চয় প্রতিকার আছে, আমরা সঠিক ভর ঠিক করতে পারি। সেটা হবে বস্তুপিণ্ডের সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন পর্যবেক্ষকের মাপন অনুসারে। দৈর্ঘ্য এবং কালের ক্ষেত্রে যেমনটা সেই একই অনুপাতে নিয়ে মাপিত বল থেকে সহজেই এ অনুমিতি হয়েছিল (was easily inferred)।

কিন্তু আরো একটি অদ্ভুত ব্যাপার রয়েছে : এই সংশোধনের পরও আমরা এমন কোনো রাশি পাই না যেটা একই বস্তুপিণ্ড সম্পর্কে সর্বকালে এক

একটি বস্তুপিণ্ড যখন শক্তি শোষণ করে—উদাহরণ : তপ্ততর হয়ে —তখন তার 'সঠিক ভর' (proper mass) সামান্য বৃদ্ধি পায়। এ বৃদ্ধি অতি সামান্য। এ মাপা হয় শক্তির বৃদ্ধিকে আলোকের বেগের বর্গ দিয়ে ভাগ করে। অন্যদিকে আবার একটি বস্তুপিণ্ড শক্তি পরিত্যাগ করলে তার ভর হ্রাস পায়। এ বিষয়ে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল : চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু সংযুক্ত হয়ে একটি হিলিয়াম পরমাণু গঠন করে কিন্তু তাদের ভর হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের চারগুণের চাইতে কম। এই পরিঘটনার ব্যবহারিক গুরুত্ব সবচাইতে বেশি। মনে হয় তারকার অভ্যন্তরে এই ব্যাপারটা ঘটে। তার ফল—শক্তি—সে শক্তি আমরা দেখতে পাই তারকার আলোকরূপে। সূর্যের ক্ষেত্রে এই শক্তিই পার্থিব জীবনকে ধারণ করে। পার্থিব পরীক্ষাগারেও এ ক্রিয়া সম্ভব। তার ফলে আলোক এবং তাপরূপে বিরাট পরিমাণ শক্তি মুক্ত হয়। এইভাবেই সম্ভব হয় হাইড্রোজেন বোমা তৈরি। কার্যত এই বোমার আকার এবং ধ্বংস করার ক্ষমতা সীমাহীন। সাধারণ পারমাণবিক বোমা ক্রিয়া করে ইউরেনিয়াম বিঘটনের (disintegration) সাহায্যে। এ বোমার একটি স্বাভাবিক সীমা রয়েছে। এক জায়গায় খুব বেশি ইউরেনিয়াম জমা করলে বিস্ফোরিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা না করে বোমাটি নিজে নিজেই বিস্ফোরিত হতে পারে। সেইজন্য একটি বিশেষ বৃহত্তম আকারের চাইতে বড় ইউরেনিয়াম বোমা বানানো সম্ভব নয়। কিন্তু একটা হাইড্রোজেন বোমাতে আমাদের যতটা ইচ্ছা ততটা হাইড্রোজেন থাকতে পারে, কারণ হাইড্রোজেন নিজে নিজে বিস্ফোরিত হয় না। শুধুমাত্র যখন সাধারণ ইউরেনিয়াম বোমার সাহায্যে হাইড্রোজেনে বিস্ফোরণ ঘটানো হয় তখনই হাইড্রোজেন সংযুক্ত হয়ে শক্তি মুক্ত করে। তার কারণ শুধুমাত্র অত্যন্ত উচ্চতাপেই সংযুক্তি সম্ভব।

আর একটি সুবিধা আছে : এই গ্রহে (পৃথিবীতে) ইউরেনিয়ামের সরবরাহ সীমিত সুতরাং ভয় হতে পারে মনুষ্যজাতি ধ্বংস হওয়ার আগেই ইউরেনিয়াম শেষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু হাইড্রোজেনের সরবরাহ কার্যত সীমাহীন এবং এই হাইড্রোজেন ব্যবহার করা যায়। সুতরাং মনুষ্যজাতি নিজেকে ধ্বংস করবে এ আশা করার যথেষ্ট কারণ আছে। ফলে যে সমস্ত কম হিংস্র জীবের বাঁচার সম্ভাবনা তাদের বিরাট সুবিধা হবে।

কিন্তু এবার কম খুশীর খবরে ফিরে আসবার সময় হয়েছে।

আমাদের তাহলে দু'রকম ভর রয়েছে। তার একটিও পুরানো আদর্শের সঙ্গে মেলে না। আলোচ্য বস্তুপিণ্ড গতিশীল একজন পর্যবেক্ষকের মাপা ভর একটি আপেক্ষিক রাশি। বস্তুপিণ্ডের ধর্ম হিসাবে তার কোনো ভৌত গুরুত্ব নেই। 'আসল

ভর' (proper mass) বস্তুপিণ্ডের পর্যবেক্ষক নিরপেক্ষ একটি অকৃত্রিম ধর্ম। এটা কিন্তু যথাযথ অপরিবর্তী (strictly constant) নয়। শীঘ্রই আমরা দেখব ভর সম্পর্কিত ধারণা শক্তি সম্পর্কিত ধারণার অঙ্গীভূত হয়ে যায়। বলতে গেলে একটি বস্তুপিণ্ড প্রদর্শিত শক্তির বৈপরীত্যে তার নিজের অভ্যন্তরে যে শক্তি ব্যয় করে, তা তারই প্রতিরূপ।

ভরের নিত্যতা (conservation),ভরবেগের নিত্যতা এবং শক্তির নিত্যতা ছিল চিরায়ত বলবিদ্যার মহান নীতি। এইবার বিচার করা যাক ভরবেগের নিত্যতা।

বিশেষ অভিমুখে একটি বস্তুপিণ্ডের ভরবেগ হল সেই অভিমুখে তার বেগ এবং তার ভরের গুণফল। সুতরাং ধীর গতিতে চলমান একটি ভারী বস্তুপিণ্ড এবং দ্রুত গতিতে চলমান একটি হালকা বস্তুপিণ্ডের ভরবেগ একই হতে পারে। একাধিক বস্তুপিণ্ডের ভিতরে যখন যে কোনোরকম পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া হয়, যেমন সংঘাত কিংবা পারস্পরিক মহাকর্ষ, তখন যে কোনো অভিমুখে সবগুলি বস্তুপিণ্ডের মোট ভরবেগ একই থাকে। অবশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত বহিরাগত কোনো প্রভাব এর ভিতরে প্রবেশ না করে। অপেক্ষবাদেও এই বিধির সত্যতা স্বীকৃত। বিভিন্ন পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ ভর ভিন্ন ভিন্ন হবে কিন্তু পার্থক্য হবে বেগেরও। এই দুটি পার্থক্য পরস্পরকে অকেজো (neutralise) করে দেয়। ফলস্বরূপ : নীতিটির সত্যতা থেকে যায়।

একটি বস্তুপিণ্ডের ভরবেগ বিভিন্ন অভিমুখে বিভিন্ন। একটি বস্তুপিণ্ডের একটি নির্দিষ্ট দিকে গতিবেগের (পর্যবেক্ষকের মাপা) সঙ্গে তার ভরকে (পর্যবেক্ষকের মাপা) গুণ দিয়ে সাধারণত তার ভরবেগ মাপা হয়। বিশেষ অভিমুখে, এক একক কালে অতিক্রম করা দূরত্বকে বেগ বলে। ধরুন এর বদলে আমরা গ্রহণ করলাম বস্তুপিণ্ডটি এক একক অন্তর চলাকালে ঐ অভিমুখে অতিক্রান্ত দূরত্ব। [সাধারণ ক্ষেত্রে এ পরিবর্তন অতি সামান্য। কারণ বেগ আলোর বেগের চাইতে অনেক কম হলে অতিক্রান্ত কাল (lapse of time) এবং অন্তর প্রায় সমান] আর অনুমান করা যাক পর্যবেক্ষকের মাপা ভরের বদলে আমরা 'সঠিক ভর' (prpper mass) বিচার করছি। এই দুটি পরিবর্তনের ফলে একই অনুপাতে বেগ বাড়ে এবং ভর কমে। সুতরাং ভরবেগ একই থাকে। কিন্তু পর্যবেক্ষক অনুসারে পরিবর্তী রাশিগুলির স্থলে প্রতিস্থাপিত হয়েছে পর্যবেক্ষক নিরপেক্ষ স্থিরীকৃত রাশি—অবশ্য সেই নির্দিষ্ট অভিমুখে বস্তুপিণ্ড যে দূরত্ব অতিক্রম করেছে সেটা বাদে।

যখন আমরা কালের স্থলে স্থান-কাল উপস্থাপন করি তখন দেখতে পাই মাপিত ভর (আসল ভরের বৈপরীত্যে), নির্দিষ্ট অভিমুখে ভরবেগের মতো একই

ধরনের একটি রাশি। একে বলা যেতে পারে কালাভিমুখী ভরবেগ। অচর ভারকে (invariant mass) এক একক অন্তর অতিক্রম করার সময় অতিক্রান্ত কাল দিয়ে গুণ করে মাপিত ভর পাওয়া যায়। একই অচর ভরকে একক অন্তর ভ্রমণে অতিক্রান্ত দূরত্ব (in the given direction—এই নির্দিষ্ট অভিমুখে) দিয়ে গুণ করলে ভরবেগ পাওয়া যায়। স্থান-কালের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এগুলি স্বাভাবিক ভাবেই সমগোত্রীয় (belong together)।

যদিও, একটি বস্তুপিণ্ডের মাপিত ভর নির্ভর করে বস্তুপিণ্ডটি সাপেক্ষ পর্যবেক্ষক কিভাবে চলমান তার উপর, তবুও এই রাশিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাপিত ভরের নিত্যতা এবং শক্তির নিত্যতা অভিন্ন। ব্যাপারটা বিস্ময়কর মনে হতে পারে কারণ প্রথম দৃষ্টিতে শক্তি এবং ভর বস্তু হিসাবে খুবই পৃথক। কিন্তু দেখা গিয়েছে মাপিত ভর এবং শক্তি একই জিনিস। কি করে এটা হয় সে ব্যাখ্যা সহজ নয় কিন্তু আমরা চেষ্টা করব।

সাধারণের ভাষায় 'ভর' এবং 'শক্তি' কোনোক্রমেই এক অর্থ বহন করে না। আমাদের কাছে 'ভর' শব্দটা জড়িত চেয়ারে বসা একটি মোটা লোক সম্পর্কীয় ধারণার সঙ্গে আর 'শক্তি' শব্দ জড়িত ছিপছিপে, চটপটে, উৎসাহী একটি লোক সম্পর্কিত সাধারণ ভাষার দৃষ্টিভঙ্গি একপেশে (one sided)। সাধারণ ভাষায় এর অর্থের ভিতরে চলা শুরু করতে দেরী হওয়া রয়েছে কিন্তু থামতে দেরী হওয়া নেই অথচ জড়ত্বের সঙ্গে থামতে দেরী হওয়াও জড়িত।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিরাট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল 'শক্তির নিত্যতা' অথবা 'বলের স্থায়িত্বের' (persistence of force) উপর। হার্বার্ট স্পেন্সারের পছন্দ ছিল শেষেরটা। শক্তির রূপ নানারকম হওয়ার দরুন এ নীতি সরল ভাবে বলা সহজ নয় তবে এর সারার্থ হল : শক্তি রূপান্তরিত হতে পারে কিন্তু ধ্বংসও হতে পারে না, সৃষ্টও হতে পারে না, শুধুমাত্র রূপান্তরিত হতে পারে। জুলের 'তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক' (mechanical equivalent of heat) আবিষ্কারের মাধ্যমে এই নীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই আবিষ্কারে দেখা গিয়েছিল যে—একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্য এবং একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় একটি নির্দিষ্ট ওজনকে তুলবার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যের ভিতরে একটি অচর (constant) অনুপাত রয়েছে। আসলে যান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুসারে দুটির ভিতরে যে কোনো একটির উদ্দেশ্যে একই ধরনের কার্য ব্যবহার করা সম্ভব। যখন দেখা গেল তাপের উপাদান অণুগুলির গতি, তখন তাপ যে অন্য শক্তির সদৃশ এ তথ্য স্বাভাবিক মনে হয়েছিল। মোটামুটি বলতে গেলে একটি বিশেষ পরিমাণ তত্ত্বের

সাহায্যে শক্তির সমস্ত রূপকেই পরিণত করা হয়েছিল দুটোতে। সেগুলির নাম ছিল যথাক্রমে স্থৈতিক শক্তি (potential energy) এবং গতীয় শক্তি (kinetic energy)। তাদের সংজ্ঞা ছিল নিম্নরূপ :

একটি বস্তুকণার ভরের অর্ধেকের সঙ্গে বেগের বর্গের গুণফল সেই বস্তুকণার গতীয় শক্তি। কয়েকটি বস্তুকণার গতীয় শক্তি বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিটি বস্তুকণার গতীয় শক্তির যোগফলের সমান।

স্থৈতিক শক্তির সংজ্ঞা আরো শক্ত। শুধুমাত্র বল প্রয়োগের সাহায্যে যাকে রক্ষা করা যায় সেই রকম যে কোনো ততির অবস্থা (state of strain) স্থৈতিক শক্তির প্রতিরূপ। সহজতম উদাহরণ : একটি ওজনকে যদি একটি উচ্চতায় উঠিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয় তাহলে তার স্থৈতিক শক্তি রয়েছে। তার কারণ ছেড়ে দিলে সেটা পড়ে যাবে। যে উচ্চতায় তোলা হয়েছিল সেই দূরত্ব দিয়ে পড়ার সময় ওজনটি যে গতীয় শক্তি লাভ করবে এর স্থৈতিক শক্তি তার সমান। সেই রকম : একটি ধূমকেতু অত্যন্ত উৎকেন্দ্রিক একটি কক্ষে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার সময়, সূর্য থেকে যখন দূরে তখনকার তুলনায় সূর্যের যখন কাছে তখন দ্রুততর চলে। অর্থাৎ ধূমকেতুটি যখন সূর্যের নিকটতর তখন তার গতীয় শক্তি অনেক বেশি। অন্যদিকে : সূর্য থেকে যখন দূরতম তখন ওর স্থৈতিক শক্তি সবচাইতে বেশি। তার কারণ ধূমকেতুটির অবস্থা তখন উঁচুতে তোলা পাথরটির মতো। কোনো সংঘর্ষ না হলে কিংবা ধূমকেতুটি থেকে খানিকটা পদার্থ বিচ্ছিন্ন না হলে তার গতীয় শক্তি এবং তার স্থৈতিক শক্তির যোগফল অচর (constant)। এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে যাওয়ার সময়কার স্থৈতিক শক্তির পরিবর্তন আমরা নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করতে পারি কিন্তু এ শক্তির মোট পরিমাণ খানিকটা যাদৃচ্ছিক। তার কারণ : শূন্য স্তর (zero level) আমরা স্থির করতে পারি নিজেদের ইচ্ছামতো। উদাহরণ : আমাদের পাথরটি ভূপৃষ্ঠে পতনের সময় কিংবা একটি কূপ দিয়ে পৃথিবীর কেন্দ্রে পতনের সময় কিংবা আরোপিত যে কোনো স্বল্পতর দূরত্বে পতনের সময় যে গতীয় শক্তি সংগ্রহ করবে আমরা মনে করতে পারি সেটাই তার স্থৈতিক শক্তি। আমাদের সিদ্ধান্তে যতক্ষণ আমরা আসা ততক্ষণ পর্যন্ত কোনটা আমরা গ্রহণ করছি তাতে কিছু এসে যায় না। আমরা করছি একটা লাভ ক্ষতির হিসাব সুতরাং কি পরিমাণ সম্পদ নিয়ে শুরু করলাম তাতে কিছু এসে যায় না।

নির্দিষ্ট একগুচ্ছ বস্তুপিণ্ডের গতীয় শক্তি এবং স্থিতীয় শক্তি দুটোই ভিন্ন পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ ভিন্ন হবে। চিরায়ত গতিবিদ্যা অনুসারে পর্যবেক্ষকের গতি

অবস্থা অনুসারে গতীয় শক্তির পার্থক্য হতো কিন্তু পার্থক্যজ্ঞাপক রাশিটি হতো অচর"। স্থিতীয় শক্তির কোনো পার্থক্য হতো না। সুতরাং সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষকরা নিজেরা ঋজুরেখায় সমবেগে চলমান এই অনুমান করলে কিংবা তা না হলে, এইভাবে চলমান কোনো বস্তুপিণ্ডকে তাদের গতি আরোপ করতে পারেন এই অনুমান করলে, প্রতিটি পর্যবেক্ষক সাপেক্ষই মোট শক্তি ছিল অচর (constant)। কিন্তু অপেক্ষবাদের গতিবিদ্যায় ব্যাপারটা আরো জটিল। গতীয় শক্তি এবং স্থৈতিক শক্তি সম্পর্কীয় নিউটনীয় ধারণাকে বিশেষ কোনো অসুবিধা ছাড়াই বিশিষ্ট অপেক্ষবাদের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু স্থৈতিক শক্তির ধারণাকে ব্যাপক অপেক্ষবাদের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে বিশেষ সুবিধা হয় না। একক বস্তুপিণ্ডের ক্ষেত্রে ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে স্থৈতিক শক্তি সম্পর্কীয় ধারণার সাধারণীকরণও সম্ভব নয়। সুতরাং সাধারণ নিউটনীয় অর্থে শক্তির নিত্যতা সম্পর্কীয় ধারণার যথার্থতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। তার কারণ একটি বস্তুপিণ্ডতন্ত্রের গতীয় এবং স্থৈতিক শক্তি, স্থান-কালের বিস্তৃততর অঞ্চলে আরোপিত সহজাত কল্পন। অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা করা, স্থানাঙ্ক নির্বাচনের অতি বিরাট স্বাধীনতা (latitude) এবং স্থানকালের পাহাড়ি চরিত্র যুক্তভাবে ব্যাপাক অপেক্ষবাদে এই ধরনের কল্পন উপস্থাপনকে অতীব বেমানান করে তোলে। ব্যাপক অপেক্ষবাদে একটি নিত্যতা বিধি রয়েছে কিন্তু এ বিধি নিউটনীয় বলবিদ্যার এবং বিশিষ্ট অপেক্ষবাদের নিত্যতা বিধিগুলির মতো অতটা কার্যকর নয়। তার কারণ, এ বিধি স্থানাঙ্ক নির্বাচনের এমন পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল যে পদ্ধতি বোঝা খুবই কঠিন। আমরা দেখেছি স্থানাঙ্ক নির্বাচনের স্বাধীনতা ব্যাপক অপেক্ষবাদের একটি নির্দেশক নীতি। এই নীতির সঙ্গে দ্বন্দ্বের জন্যই নিত্যতাবিধি সন্দেহভাজন। এর অর্থ : এতদিন যা ভাবা হতো নিত্যতাবিধির মূলগত গুরুত্ব তার চাইতে কম কিনা অথবা তত্ত্বের গাণিতিক জটিলতার ভিতরে আরো সন্তোষজনক নিত্যতাবিধি এখনো লুকিয়ে আছে কিনা— এ সমস্যার সমাধান এখনো হয়নি। আপাতত ব্যাপকতত্ত্বে আমাদের শুধুমাত্র একক একটি বস্তুকণার গতীয় শক্তি সম্পর্কীয় কল্পন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। পরবর্তী বিচারে শুধু এটাই আমাদের প্রয়োজন। এ কথা মনে রাখা উচিত যে শক্তির নিত্যতা সম্পর্কে এই সমস্ত অসুবিধা ব্যাপকতত্ত্বেই দেখা যায়, বিশিষ্ট তত্ত্বে নয়। যেখানে মহাকর্ষকে অগ্রাহ্য করা যায় এবং বিশিষ্ট তত্ত্ব প্রয়োগ সম্ভব সেখানেই শক্তির নিত্যতা রক্ষা সম্ভব।

কার্যক্ষেত্রে নিত্যতার অর্থ এবং তত্ত্বক্ষেত্রে নিত্যতার অর্থ ঠিক এক নয়। একটি জিনিসের পরিমাণ যখন যে কোনো এক সময় এবং যে কোনো অন্য সময়

একই থাকে তত্ত্বে তখন আমরা বলি রাশিটি (quantity) নিত্য। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমরা সারা পৃথিবী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করতে পারি না সুতরাং আমা একটু সহজ কোনো অর্থ আমাদের মেনে নিতে হবে। আমরা বোঝাতে চাই একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে পরিমাণজ্ঞাপক রাশিটির যদি পরিবর্তন হয়, তাহলে তা কারণ, কিছুটা পরিমাণের সীমান্ত অতিক্রম করা। যদি কোনো জন্ম কিংবা মৃত্যু না হয় তাহলে জনসংখ্যা নিত্য হবে। সে ক্ষেত্রে একটি দেশের জনসংখ্যার পরিবর্তনের কারণ হতে পারে দেশবাসীর বিদেশ গমন কিংবা বিদেশীর সে দেশে আগমন অর্থাৎ সীমান্ত অতিক্রম করা। আমরা হয়তো চীন কিংবা মধ্য আফ্রিকার নির্ভুল আদম-শুমারী করতে পারি না সুতরাং আমরা হয়তো পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা নির্ধারণ করতে পারি না। কিন্তু যেখানেই পরিসংখ্যান সম্ভব সেখানেই যদি দেখা যায় লোকের সীমান্ত অতিক্রমের জন্য যে পরিবর্তন হয় সে পরিবর্তন ছাড়া জনসংখ্যার কোনো পরিবর্তন হয় না তাহলে জনসংখ্যাকে অচর মনে করা যুক্তিসঙ্গত হবে। আসলে অবশ্য জনসংখ্যা নিত্য নয়। আমার পরিচিত একজন শারীরবিদ (Physiologist) একবার একটা থার্মোস (thermos) চারটে ইঁদুর রেখেছিলেন। কয়েক ঘণ্টা বাদে সেগুলিকে বার করতে গিয়ে তিনি দেখলেন রয়েছে এগারোটা ইঁদুর। কিন্তু ভরের এরকম পরিবর্তন হয় না। শেষকালের এ এগারোটা ইঁদুরের ভর শুরুর চারটে ইঁদুরের ভরের চাইতে একটুও বেশি ছিল না।

যে সমস্যার জন্য আমরা শক্তি নিয়ে আলোচনা করছিলাম এ তথ্য আমাদের সেই সমস্যাতে ফিরিয়ে নিয়ে এল। আমরা বলেছিলাম অপেক্ষবাদে মাপিত ভর এবং শক্তিকে একই বস্তুরূপে বিচার করা হয় এবং দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম তার কারণ ব্যাখ্যা করার। এবার সেই ব্যাখ্যা শুরু করার সময় হয়েছে। কিন্তু ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষাংশের মতো এখানেও গণিতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ পাঠক এই জায়গাটা বাদ দিয়ে পরবর্তী অনুচ্ছেদ থেকে শুরু করলে ভাল করবেন।

আলোকের বেগকে বেগের এককরূপে গ্রহণ করা যাক। অপেক্ষবাদে এটাই সবসময় সুবিধাজনক। m হোক বস্তুকণাটির সঠিক ভর এবং পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ বেগ হোক v।

তাহলে এর মাপিত ভর হবে :

$$\frac{m}{\sqrt{1-v^2}}$$

সাধারণ সঙ্কেত অনুসারে এর গতীয় শক্তি কিন্তু হবে :

$$\frac{1}{2}mv^2$$

আমরা আগে দেখেছি শক্তির হিসাব শুধুমাত্র লাভ-ক্ষতির হিসাবের মতো। সুতরাং আমরা এর সঙ্গে খুশীমতো যে কোনো অচর সংখ্যা যোগ করতে পারি। সুতরাং আমরা বলতে পারি শক্তি :

$$m + \frac{1}{2}mv^2$$

v যদি আলোকের বেগের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ হয় তাহলে m + mv2 প্রায় নির্ভুলভাবে

$$\frac{m}{\sqrt{1-v^2}}$$

এর সমান। সুতরাং বৃহৎ বস্তুপিণ্ডগুলির যেরকম বেগ থাকে সেই রকম ক্ষেত্রে দেখা যায় মাপনযোগ্য নির্ভুলতার সীমার ভিতরে শক্তি এবং ভরের পার্থক্য করা সম্ভব নয়। আসলে আমাদের শক্তির সংজ্ঞা পরিবর্তন করা ভাল। সেটা হওয়া উচিত—

$$\frac{m}{\sqrt{1-v^2}}$$

তার কারণ নিত্যতার সদৃশ বিধি সাপেক্ষ এই রশি সত্য; এবং বেগ যখন খুব বেশি তখন চিরায়ত সঙ্কেতের তুলনায় এই রাশি শক্তির মাপন অনেক ভালভাবে প্রকাশ করে। সুতরাং চিরায়ত সঙ্কেতকে অবশ্যই আসন্ন ভাবা উচিত। নতুন সঙ্কেত তার নির্ভুল রূপ। এইভাবেই শক্তি এবং মাপিত ভর অভিন্ন হয়ে যায়।

এখন আমি কর্ম (action) সম্পর্কীয় ধারণা নিয়ে আলোচনা করছি। সাধারণ মানুষের কাছে এ শব্দ শক্তির চাইতে কম পরিচিত। কিন্তু আপেক্ষিক পদার্থবিদ্যা এবং কোয়ান্টাম তত্ত্বে এর গুরুত্ব বেড়েছে। (কোয়ান্টাম হল : অল্প পরিমাণ কর্ম)। শক্তি এবং কালের গুণফল প্রকাশ করার জন্য কর্ম শব্দ ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ একটি তন্ত্রে যদি এক একক শক্তি থাকে তাহলে এক সেকেন্ডে সে এক একক কর্ম প্রয়োগ করবে। একশ' সেকেন্ডে প্রয়োগ করবে একশ' একক কর্ম... ইত্যাদি। যে তন্ত্রে একশ' একক শক্তি আছে সে তন্ত্র এক সেকেন্ডে ১০০ একক কর্ম প্রয়োগ করবে আর ১০০ সেকেন্ডে প্রয়োগ করবে ১০,০০০ একক কর্ম...ইত্যাদি। সুতরাং যথাযথভাবে প্রকাশ করলে 'কর্ম' শব্দের অর্থ কতটা কাজ করা হয়েছে তার

একটি মাপ। অধিকতর শক্তি প্রকাশ করলে কিংবা দীর্ঘতর কাল কার্য করলে ভর বৃদ্ধি পায়। যেহেতু শক্তি এবং মাপিত ভর অভিন্ন সুতরাং কর্মকে আমরা মাপিত ভর এবং কালের গুণফল রূপেও প্রকাশ করতে পারি। চিরায়ত বলবিদ্যায় কোনো অঞ্চলে পদার্থের 'ঘনত্ব' নির্ণয় করা হয় ভরকে আয়তন দিয়ে ভাগ করে। অর্থাৎ একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলের ঘনত্ব যদি আপনার জানা থাকে তাহলে ঘনত্বকে ঐ অঞ্চলের আয়তন দিয়ে গুণ করলে আপনি মোট পদার্থের পরিমাণ জানতে পারবেন। আপেক্ষিক বলবিদ্যায় আমরা সবসময়ই স্থানের জায়গায় স্থান-কাল প্রতিস্থাপন করি। সুতরাং একটি অঞ্চলকে কিছুতেই আর শুধুমাত্র আয়তনাকারে বিচার করা যায় না, বিচার করা হয় কিছুকাল স্থায়ী আয়তনরূপে। একটি ঐ অঞ্চল হবে স্বল্পকাল স্থায়ী একটা ক্ষুদ্র আয়তন। এর ফল : ঘনত্ব জানা থাকলে নতুন অর্থে একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে শুধুমাত্র ক্ষুদ্র ভরই রয়েছে তাই নয়, রয়েছে ঐ ভর এবং স্বল্পকালের গুণফল। অর্থাৎ স্বল্প পরিমাণ 'কর্ম'। আপেক্ষিক বলবিদ্যায় 'কর্ম' কেন মূলগত গুরুত্ব লাভ করবে বলে আশা করা যায়—তার ব্যাখ্যা এটাই। আসলে ঘটনাও তাই।

অবাধে চলমান একটি বস্তুকণা একটি ধরাকৃতি অনুগমন করে (follows a geodesic)। এই স্বীকার্যের স্থলে বস্তুকণার 'কর্ম' সম্পর্কীয় তুল্য একটি অনুমান প্রতিস্থাপন করা যায়। এরকম একটি অনুমানে নাম 'ন্যূনতম ক্রিয়ার সূত্র' (principle of least action)। এ নীতির বক্তব্য : একটি বস্তুপিণ্ড এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যেতে হলে সেই পথই নির্বাচন করবে যে পথে সামান্য পৃথক অন্য পথের তুলনায় কম কর্ম প্রয়োজন —আবারও মহাজাগতিক আলস্যবিধি (law of cosmic laziness)! ন্যূনতম ক্রিয়ার সূত্রগুলি শুধুমাত্র একক বস্তুপিণ্ডগুলিতে সীমাবদ্ধ নয়। এমন সমরূপ অনুমান সম্ভব যে অনুমান পর্বত এবং উপত্যকা সমেত সম্পূর্ণ স্থান-কাল বিবরণের পথিকৃৎ অনুমানও। এই নীতিগুলি অপেক্ষবাদ এবং কোয়ান্টাম তত্ত্বে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া এই নীতিগুলি বলবিদ্যার শুদ্ধ প্রথানুসারী (formal) অংশগুলি বর্ণনা করার বৃহত্তম ব্যাপ্তিসম্পন্ন উপায় (most comprehensive means)।

১১

প্রসারমান মহাবিশ্ব

এ পর্যন্ত আমরা প্রধানত পৃথিবী কিংবা সৌরতন্ত্রের সঙ্গে জড়িত পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। শুধুমাত্র মাঝে মাঝে আমাদের তাকানো

পর্যন্ত যেতে হয়েছে। এই অধ্যায়ে আমাদের সীমার বিস্তার হবে দূরতর : আমরা দেখব সম্পূর্ণ মহাবিশ্ব সম্পর্কে অপেক্ষবাদের কি বক্তব্য।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে সমস্ত পর্যবেক্ষণফল নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেগুলি মোটামুটি সুপ্রতিষ্ঠিত বলে বিশ্বাস করা হয়। কিন্তু নুতন প্রযুক্তি নিয়ে আসছে নতুন পর্যবেক্ষণের সম্ভাবনা। ফলে সুপ্রতিষ্ঠিত পর্যবেক্ষণফলগুলি অবিরত পরিমার্জিত হচ্ছে। তাছাড়া এই পর্যবেক্ষণফলগুলির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার চরিত্র যথেষ্ট পরিমাণে কল্পনাভিত্তিক (speculative)। সুতরাং এ অনুমান করা ঠিক হবে না যে এখন আমরা যে সমস্ত তাত্ত্বিক ব্যাপার পর্যলোচনা করছি তার স্থিরত্ব (solidity) এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে আলোচনা করেছি তারই মতো। সেগুলির উন্নতি অবশ্যই প্রয়োজন। কোনো অপরিবর্তনীয় সত্য কিংবা কোনো চিরস্থায়ী অযৌক্তিক মত (eternal dogma) প্রতিষ্ঠা করা, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নয়। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য: পারম্পরিক আসন্নতার (successive approximation) সাহায্যে সত্যের সমীপবর্তী হওয়া। কিন্তু চরম এবং সার্বিক নির্ভুলতা লাভ হয়েছে এ দাবী বিজ্ঞান কোনো স্তরেই করবে না।

মহাবিশ্বের সাধারণ রূপ সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক ব্যাখ্যা প্রয়োজন। অত্যন্ত বিরাট মাপায় (on a large scale) পদার্থের বণ্টন সম্পর্কে অনেক কিছুই এখন জানা। আমাদের মত বহু মিলিয়ন (১০,০০,০০০—দশ লক্ষ) তারকার একটি তন্ত্রের ভিতরের একটা তারকা। এগুলির নাম ছায়াপথ বা গ্যালাক্সি (galaxy)। গ্যালাক্সির আকার একটি বিরাট ক্যাথেরিন চক্রের* (Catherin Wheel) মতো। এই চক্রের উজ্জ্বল কেন্দ্র থেকে তারকা দিয়ে গঠিত বহু সর্পিল বাহু (spiral arms) বেরিয়ে এসেছে।

তারকা দিয়ে গঠিত এইরকম একটি সর্পিল বাহুতে সূর্যের অবস্থান। ছায়াপথের চক্রকেন্দ্রের কেন্দ্র থেকে এর দূরত্ব বোধহয় ২৮,০০০ আলোক বর্ষের কাছাকাছি। ছায়াপথের মাপনীয় অধিকাংশ মাপনের মতো এই মাপনও নিশ্চিত করা শক্ত এবং ভবিষ্যতে এ মাপন সংশোধিত হতে পারে (ছায়াপথের ব্যাপারে দূরত্ব প্রায়শই আলোকবর্ষে মাপা হয়। এক বৎসরে আলোক যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে এক আলোকবর্ষ বলে। পৃষ্ঠা ১৮-তে দেওয়া আলোকের বেগকে এক বছরে যে ক'টি সেকেন্ডে হয় সেই রাশি দিয়ে গুণ করে আপনি এই দূরত্ব গণনা করতে পারেন। এক বছরে সেকেন্ডের সংখ্যা ৩,১৫,৩৬,০০০। সংখ্যাটিকে মাইলে রূপান্তরিত করলে দাঁড়ায়—ছ মিলিয়ন, মিলিয়ন মাইল)।

---

* Catherine Wheel-a wheel with spikes projecting from the rim- এমন একটি চাকা যার পরিধি বেড় থেকে সূচীমুখ কঠিন কীলক বেরিয়ে এসেছে। (Webster).

আকাশ পরিষ্কার থাকলে, একদিক থেকে অন্যদিক পর্যন্ত বিস্তৃত তারার মালার মতো, ছায়াপথকে দেখতে পাওয়া যায়। আমরা সর্পিল [illegible] আমাদের অবস্থান থেকে দেখি শুধুমাত্র বাকী ছায়াপথের কিনারার দৃশ্য।

ছায়াপথের সীমারেখাগুলি কিন্তু মোটেই স্পষ্ট নয়। মূল তারকাপুঞ্জ [illegible] একপাশ থেকে অন্যপাশের বিস্তার প্রায় ১,২০,০০০ আলোক বৎসর। [illegible] তারকা ছাড়াও ছায়াপথে প্রচুর পরিমাণ বায়বীয় পদার্থ রয়েছে। এর [illegible] বেশির ভাগই হাইড্রোজেন, তাছাড়া আছে ধূলি এবং আরো কিছু পদার্থ [illegible] সেগুলিকে শনাক্ত করা যায়নি। এই অজানিত পদার্থ একটি গোলকাকৃতি মেঘ [illegible] করে বলে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা। এই মেঘ দৃশ্যমান তারাকাপুঞ্জ থেকে [illegible] বিস্তৃত। এই মেঘ প্রত্যক্ষ দেখা যায় না, তারকা এবং অন্যান্য পর্যবেক্ষণযোগ্য [illegible] পদার্থের উপর এর মহাকর্ষীয় অভিক্রিয়া থেকে এর অস্তিত্ব অনুমিত হয়। [illegible] মেঘের বিস্তার হয়তো পাঁচ লক্ষ থেকে ছয় লক্ষ আলোক বৎসর।

তারকা বায়বীয় পদার্থ, ধূলি এবং শনাক্ত না করা এই পদার্থের সমস্ত [illegible] চক্রকেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে ধীরগতিতে আবর্তিত হয়। এই আবর্তনের [illegible] থেকেই শনাক্ত না করার পদার্থের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। আবর্তনের [illegible] চক্রকেন্দ্রের কেন্দ্র থেকে দূরত্ব অনুসারে এমনভাবে পরিবর্তিত হয় বলে [illegible] হয় যে ঐ পদার্থ ছাড়া সে আবর্তনকে ব্যাখ্যা করা যায় না।

চক্রকেন্দ্র সাপেক্ষ সূর্যের অনুমিত দ্রুতি সেকেন্ডে প্রায় ২২০ কিলোমিটার। [illegible] যদি দ্রুতি এবং কেন্দ্র থেকে দূরত্বের অনুমান সঠিক হয় তাহলে কেন্দ্রকে [illegible] প্রদক্ষিণ করতে সূর্যের প্রায় ২৪০ মিলিয়ন বৎসর লাগে।

পরিবেষ্টনীর মেঘের ভিতরকার ছায়াপথের পদার্থের ভর মনে হয় [illegible] মিলিয়ন মিলিয়ন গুণ।

জানা যায় ছায়াপথের একদল অনুগামী (retinu of statellites) [illegible] সেগুলির ভিতরে ম্যাগেলানিক (Magellanic) মেঘই সবচাইতে পরিচিত [illegible] নিকটতম। এর অবস্থান চক্রকেন্দ্র থেকে দুই লক্ষ আলোক বৎসর দূরে।

এই ছায়াপথ কিন্তু মহাবিশ্বে একেবারেই নিঃসঙ্গ নয়। যে অঞ্চল দূরবীক্ষণে [illegible] যায় তার ভিতরে বহু মিলিয়ন এই ধরনের তন্ত্র ছড়িয়ে আছে। অন্য তারাপুঞ্জ [illegible] ছায়াপথ বলা হয় (কিংবা কখনো কখনো বলা হয় নীহারিকা -Nebulae)। [illegible] ছায়াপথ চ্যাপ্টা—আমাদের ছায়াপথের মতো তাদেরও সর্পিল বাহু রয়েছে। [illegible] ফুটবলের মতো গোলকাকার, আবার কতকগুলি রাগবী বলের মতো ডিম্বাকৃতি। [illegible] কতকগুলি আছে যারা গঠনে অসমাঙ্গ (irregular)।

ছায়াপথগুলির পুঞ্জীভূত (groups) হওয়ার একটা স্পষ্ট প্রবণতা দেখা যায়। এই পুঞ্জগুলিকে বলা হয় গুচ্ছ (cluster)। একক একটি গুচ্ছের ভিতরে লক্ষ লক্ষ একক ছায়াপথ থাকতে পারে। তাদের প্রত্যেকটির ভিতরে আমাদেরটির মতো শত মিলিয়ন তারকা থাকতে পারে। আমাদের ছায়াপথ একটি ক্ষুদ্র গুচ্ছের অংশ। তার নাম আঞ্চলিক পুঞ্জ (local groups)। এই আঞ্চলিক পুঞ্জের সদস্যের সংখ্যা নিশ্চিত নয়—তার কারণ সম্ভাব্য কয়েকটি সদস্য অতি অস্পষ্ট। কিন্তু মনে হয় এগুলির সংখ্যা কুড়িটির বেশি নয়। আঞ্চলিক পুঞ্জের ভিতরে সবচাইতে পরিচিত এবং সর্পিলের নিকটতম ছায়াপথের নাম এ্যান্ড্রোমিডা ছায়াপথ (Andromeda galaxy)। এর নাম হয়েছে যে গুচ্ছে একে দেখা যায় তার নাম থেকে। এটা প্রায় ২ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে। খালি চোখে একে অস্পষ্ট দেখা যায়। আঞ্চলিক পুঞ্জের বিস্তার প্রায় তিন মিলিয়ন আলোকবর্ষ হতে পারে।

দেখা যায় ছায়াপথের গুচ্ছগুলি আবার বৃহত্তর সত্ত্বায় গোষ্ঠীভূত। এগুলির নাম অতিগুচ্ছ (super cluster)। একটি অতিগুচ্ছের বিস্তার ত্রিশ মিলিয়ন থেকে একশ মিলিয়ন আলোকবর্ষ পর্যন্ত হতে পারে এবং এর ভর হতে পারে পুরো ছায়াপথের দশ হাজার গুণ। আধুনিক বিশ্বাস অনুসারে অতিগুচ্ছই মহাবিশ্বে পদার্থের শনাক্ত করার মতো বৃহত্তম সমাহার (aggregation)।

একক একটি গুচ্ছের অঙ্গীভূত ছায়াপথগুলি মহাকর্ষীয় বলের জন্যই পরস্পর সংযুক্ত থাকে এরকম চিন্তন থাকলেও অতিগুচ্ছগুলির ক্ষেত্রে এ তথ্য সত্য কিনা এটা এখনো স্পষ্ট নয়। অতিগুচ্ছগুলির অস্তিত্ব এখন পর্যবেক্ষণের সাহায্যে মোটামুটি সুপ্রমাণিত কিন্তু তাদের বিকাশ সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

আধুনিক পর্যবেক্ষণে মনে হয় অতিগুচ্ছগুলির অন্তর্বর্তী স্থানে দৃশ্যমান কোনো পদার্থ নেই, থাকলেও রয়েছে অতি সামান্য। এই স্থান বোধহয় অতিগুচ্ছের চাইতেও বড়।

তারকার সমষ্টি ছায়াপথ, ছায়াপথের সমষ্টি গুচ্ছ, গুচ্ছের সমষ্টি অতিগুচ্ছ কিন্তু এগুলি সত্ত্বেও অনুমান করা হয় যথেষ্ট বড় মাত্রায় বিচার করলে মহাবিশ্ব প্রায় সুষম (uniform) এবং বর্তমান যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে অংশ পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব সে অংশই হয়তো সমগ্র মহাবিশ্বের জাতিরূপ (typical)।

পর্যাপ্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানভিত্তিক সাক্ষ্য প্রমাণের আগেই এ কল্পন ছিল যে বিরাট মাত্রার (large scale) বিচারে মহাবিশ্ব সুষম। এ কল্পনই এখন মূলগত স্বীকার্যের মর্যাদা পেয়েছে। সাধারণত একে বলা হয় 'মহাজাগতিক তত্ত্বের সূত্র' (cosmological principle)। মহাজাগতিক তত্ত্বের সূত্র আসলে কোপার্নিকাসের চিন্তনের

বিস্তার। সমস্ত বস্তুর কেন্দ্রে পৃথিবীর অবস্থান এই অহংবাদী ধারণা পরিত্যাগ ক
সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝতে পারব যে সূর্য একটি সাধারণ তারকামাত্র ও
মহাবিশ্বের বিবরণ একটি বিশেষ স্থানের দাবী পৃথিবীর চাইতে বে
কোনোক্রমেই বেশি নয়। যখন আমরা দেখব যে আমাদের ছায়াপথ এব
গুচ্ছের অংশ আমাদের ছায়াপথ—এ সমস্তই জাতিরূপ নমুনা (typical spe
mens) তখন যৌক্তিক বিচারে এগুলিকেও অন্যান্য সমরূপ বস্তুর সঙ্গে সমা
প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। পদার্থবিদ্যার বিধি একটি ছায়াপথগুচ্ছ থেকে
ছায়াপথগুচ্ছে নিয়মিতভাবে পরিবর্তিত হয় এ অনুমান করার কোন
পরীক্ষাভিত্তিক যুক্তি নেই।

এর নিহিতার্থ একটু অন্যভাবেও প্রকাশ করা যায়। ধরুন : আপনাকে এক
বাক্সে ভর্তি করা হয়েছে। বাক্সটির কোনো জানালা নেই। এই অবস্থায় আপনাকে
মহাবিশ্বের সুদূর এক অংশে চালান করা হয়েছে। বাক্স থেকে ছাড়া পেলে আপ
নিশ্চয়ই পৃথিবী থেকে তারকা এবং ছায়াপথের যে বিশেষ বণ্টন দেখা যায়
বণ্টন দেখতে পাবেন না—আপনার নতুন পরিবেশের ভৌগোলিক খুঁটিনাটি
(details) পার্থক্য থাকবে—কিন্তু মহাবিশ্বতত্ত্বের সূত্র অনুসারে মহাবিশ্বের সমগ্র
বাহ্যরূপ একই থাকবে। খুঁটিনাটিগুলি বাদ দিলে আপনি বলতে পারবেন
মহাবিশ্বের কোন অংশে আপনার অবস্থান।

আমাদের ছায়াপথের আঞ্চলিক গুচ্ছের মহাবিশ্বে একটা বিশেষ স্থান নিশ্চয়
রয়েছে : এই অনুমানের পথিকৃৎ বোধহয় একটি লক্ষণীয় পরিঘটনা।
পরিঘটনা হল—দূরের ছায়াপথগুলির বর্ণালীর তথাকথিত 'লাল প্রান্তে
স্থানচ্যুতি' (red shift)। এবার আমরা বুঝতে পারব—এই পরিঘটনার
মহাবিশ্বকে প্রসারমান বলা হয়।

এখন আমরা যে অভিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করছি সে অভিক্রিয়া
অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সে অধ্যায়ে অবশ্য আমরা প্রত্যক্ষভাবে এর
জড়িত ছিলাম না। শব্দের সঙ্গে যে সাদৃশ্য তখন উল্লেখ করা হয়েছিল সে
আপনার মনে পড়বে : একটি ট্রেন যখন আপনার অভিমুখে আসে তখন
বাঁশির স্বর ট্রেনের স্থির অবস্থার স্বরের তুলনায় তীক্ষ্ণতর হয়। কিন্তু ট্রেনটি
আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যায় তখন তার বাঁশির স্বরের তীক্ষ্ণতা কমে
আলোর ক্ষেত্রে অভিক্রিয়া অতীব সমরূপ (very similar)। আলোকের উৎস
আপনার অভিমুখে চলমান হয় তাহলে আলোকের সম্পূর্ণ বর্ণলীটা বেগুনি
দিকে স্থানচ্যুত হয়। আর উৎস আপনার কাছ থেকে দূরে অপসরণশীল

বর্ণালীর স্থানচ্যুতি হবে লালের দিকে, বর্ণালীর এই স্থানচ্যুতি ট্রেনের বাঁশির স্বরের তীক্ষ্ণতার পরিবর্তনের অনুরূপ। স্থানচ্যুতির পরিমাণ আপনি এবং আলোকের উৎসের মধ্যবর্তী দূরত্বের পরিবর্তনের হারের উপর নির্ভরশীল। (এর সঙ্গে আলোকের নিজস্ব দ্রুতির কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা দেখেছি এই দ্রুতি উৎসের গতি নিরপেক্ষ)। বর্ণালীর স্থানচ্যুতি তারকা এবং ছায়াপথগুলির দ্রুতি নির্ধারণের একটি উপায়। সেটা করা হয় তারকা থেকে নির্গত আলোকের বর্ণালীর সঙ্গে গবেষণাগারে উৎপন্ন সমরূপ বর্ণালীর তুলনা করে। এইভাবে মাপলে দেখা যায় আঞ্চলিক পুঞ্জের (local group) ছায়াপথগুলির দ্রুতি সেকেন্ডে তিনশ মাইল পর্যন্ত হতে পারে। দৈনন্দিন মাপকাঠিতে এ দ্রুতি খুবই বেশি। কিন্তু ছায়াপথগুলির অন্তবর্তী দূরত্ব অতি বিশাল হওয়ার দরুন তাদের অবস্থানের লক্ষণীয় পরিবর্তন হতে বহু মিলিয়ন বৎসর লাগবে।

আঞ্চলিক পুঞ্জের কিছু কিছু ছায়াপথ চলমান আমাদের অভিমুখে আবার কিছু কিছু চলমান আমাদের বিপরীত মুখে। এই গতির ভিতরে বিরাট বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। এর তুলনা করা চলে একটি ঝাঁকের মৌমাছির গতির সঙ্গে। মৌমাছিগুলি পরস্পর সাপেক্ষ চলমান, পুরো ঝাঁকটা কিন্তু একসঙ্গে থাকে। আমাদের নিজেদের গুচ্ছের (cluster) বাইরে পরীক্ষা করলে দেখা যায় পরিস্থিতিটা অন্যরকম। এখানেও প্রতিটি গুচ্ছের ভিতরে অভ্যন্তরীণ গতি আছে কিন্তু দৃশ্যত অন্য প্রতিটি গুচ্ছই আমাদের গুচ্ছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আমাদের কাছ থেকে তারা যত দূরে, তারা চলমান তত দ্রুত। এই লক্ষণীয় পরিঘটনাই প্রসারমান মহাবিশ্বের ভিত্তি।

যেহেতু দৃশ্যত সমস্ত গুচ্ছই আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে সেই জন্য আমাদের মনে হতে পারে আঞ্চলিক পুঞ্জের অবস্থান প্রসারমান মহাবিশ্বের কেন্দ্রে। এটা কিন্তু ভুল হবে, তার কারণ, এ চিন্তন গতির আপেক্ষিকতাকে অগ্রাহ্য করে। আগেই বইয়ে বারবার সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মৌমাছির ঝাঁকের সঙ্গে তুলনাটা আবার বিচার করুন। ধরে নেওয়া যাক ঝাঁকগুলি সুশিক্ষিত। সেগুলি পশ্চিম থেকে পূর্ব বরাবর রেখায় দশ গজ দূরে দূরে মাটির উপরে উড়ছে। আরো ধরা যাক একটি ঝাঁক ভূমি সাপেক্ষ স্থিতিশীল, এর দশ গজ পূর্বদিকের ঝাঁক মিনিটে এক গজ করে পূর্বদিকে চলেছে। পূর্বদিকে কুড়ি গজ দূরে ঝাঁক পূর্ব অভিমুখে মিনিটে দু'গজ চলছে... ইত্যাদি। আবার পশ্চিমদিকের ঝাঁকগুলি ঐ একই ভাবে পশ্চিম অভিমুখে চলেছে। তাহলে যে কোনো ঝাঁকের যে কোনো চলমান কিংবা স্থিতিশীল মৌমাছির মনে হবে অন্য ঝাঁকগুলি তাদের দূরত্বের

অনুপাতে দূরে সরে যাচ্ছে। স্থিতির মাপকরূপে যদি ভূমি না পাওয়া যেত তাহলে কোনো একটি ঝাঁক বিশেষভাবে নির্বাচিত এ অনুমান করার কোনো যুক্তি থাকত না।

ছায়াপথের গুচ্ছগুলির আচরণ একেবারেই একরকম। আমাদের সুশিক্ষিত মৌমাছির ঝাঁকগুলির মতো লাইন করে না থেকে তারা সর্বদিকে অনিয়মিতভাবে ছড়িয়ে আছে, সন্দেহ নেই কিন্তু ঝাঁকগুলির মতো এ ক্ষেত্রেও যে কোনো একটি গুচ্ছের একজন পর্যবেক্ষকের মনে হবে অন্যগুলি তার কাছ থেকে দূশ্যত সরে যাচ্ছে। মহাবিশ্বে স্থিতির কোনো পরম মানক (absolute standard) নেই, সুতরাং দৃশ্যত প্রসারণ সমস্ত গুচ্ছের ক্ষেত্রেই সমরূপ।

যে সমস্ত গুচ্ছ নিয়ে অনুসন্ধান করা হয়েছে তার ভিতরে যেটা দূরতম সেটার লাল অভিমুখী স্থানচ্যুতি, দূর অপসরণের যে গতির অনুরূপ সে গতি আলোকের বেগের প্রায় অর্ধেক। (এই বিরাট পরিমাণ লাল অভিমুখী স্থানচ্যুতির অনুরূপ দূর অপসরণের গতি গণনা করতে হলে অবশ্যই তার ভিত্তি হবে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত লোরেঞ্জ রূপান্তর সঙ্কেত)।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে এ পর্যন্ত সবচাইতে বেশি লাল অভিমুখী বিচ্যুতি যে ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে সেগুলি দূরের গুচ্ছ নয়—সেগুলি তথাকথিত কোয়াসার (quasi-stellar objects-তারকাকল্প বস্তু)। এগুলির লালমুখী বিচ্যুতি আলোকের বেগের নয় দশমাংশ বেগে অপসরণের অনুরূপ। এদের চরিত্র কিন্তু এখনো বোঝা যায়নি। সেইজন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপাত্ত (data) যখন তাত্ত্বিক প্রতিরূপ (model) গঠনের জন্য ব্যবহার করা হয় তখন এগুলিকে ঠিকভাবে গণনার ভিতরে আনা যায় না।

এইবার দেখা যাক মহাকর্ষ সম্পর্কীয় এই সংবাদগুলিকে কিভাবে ব্যাপক অপেক্ষবাদের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায়। আমরা দেখেছি সূর্যের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের বিবরণ স্থান-কালে একটি পাহাড়ের বিবরণের মতো দেওয়া যায়। একটি ছায়াপথ, একটি গুচ্ছ কিংবা একটি অতিগুচ্ছের প্রতিরূপও এইভাবে হতে পারে। তবে ভর অনেক বেশি হওয়ার দরুন পাহাড়টাকে অনেক বড় হতে হবে। এর সঙ্গে যদি আমরা প্রতিটি ছায়াপথের তারকা এবং প্রতিটি গুচ্ছের ছায়াপথ যুক্ত করতে চাই তাহলে বহু পর্বত শৃঙ্গ আর উপত্যকা মিলিয়ে অত্যন্ত জটিল একটা পাহাড় হবে। সে ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করতে পারি বিবরণ এমনভাবে দিতে যাতে পুরো মহাবিশ্বের প্রতিরূপ। এইরকম প্রতিরূপ গণিতের দিক থেকে হবে খুবই জটিল কারণ তার ভিতরে থাকবে নানারকম 'ভৌগোলিক' খুঁটিনাটি। কিন্তু মহাবিশ্বের পূর্ণাঙ্গ রূপের বিবরণের জন্য সেগুলি আবশ্যিক নয়। বিবরণ যত

করার জন্য আমরা এমন প্রতিরূপ দিয়ে শুরু করব যে প্রতিরূপে দৃশ্যত মূলগত বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষিত হবে অথচ ভৌগোলিক খুঁটিনাটি বাদ পড়বে। অবয়বের যে বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা রক্ষা করতে চাই সেগুলি হল : বিরাট মাত্রার বিচারে (large scale uniformity) সমরূপত্ব এবং সম্প্রসারণ (expansion)। যেগুলি আমরা রাখতে চাই না সেগুলি হল : সঠিক অবস্থান, আকার (size), গঠন (composition), একক ছায়াপথ, গুচ্ছ এবং অতিগুচ্ছের।

সুতরাং আমরা মহাবিশ্বকে প্রায় (approximate) সমরূপ না ভেবে সম্পূর্ণ সমরূপ অনুমান করে প্রতিরূপ গঠনের (to represent) জন্য স্থান-কালের আদল (model) তৈরি করতে পারি। এই সমস্ত সরলীকৃত প্রতিরূপে পদার্থ জমে জমে পুঞ্জ পুঞ্জ হয়েছে এবং তাদের মাঝে মাঝে বিরাট বিরাট স্থান রয়েছে—এরকম না করে আমরা কল্পনা করি পদার্থ মসৃণ হয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে বণ্টিত।

ঠিক যেরকম সঞ্চিত পদার্থ পুঞ্জে পরিণত এই বিবরণ দেওয়ার জন্য বলা যায়, স্থান-কালে একটা বড় পাহাড় আছে যেখানে পুঞ্জ দেখা যায় কিংবা বলা যায় স্থান-কাল সেই পুঞ্জের নিকটে বক্র ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের মসৃণ আদলে পদার্থের অবিচ্ছিন্ন বণ্টনের বর্ণনা দেওয়া যায় স্থান-কাল সমরূপে বক্র এই ঘোষণার সাহায্যে। বিভিন্ন পদার্থ গঠনকারী পদার্থকে মসৃণ করার ফল হবে অনুরূপ বক্রতাকে মসৃণ করে সামগ্রিক সামান্য বক্রতা সৃষ্টি করা। মহাবিশ্বের এই সামগ্রিক বক্রতাকে পৃথিবীর বক্রতা খানিকটা সাধারণ স্থানে একটি গোলকের বক্রতার সদৃশ। কিন্তু স্থান-কালের সঙ্গে গোলকের এই সাদৃশ্যকে আরো এগিয়ে নিয়ে স্থান-কালের সামগ্রিক বক্রতাকে পৃথিবীর গোলকের সঙ্গে তুলনা করা সঠিক নয়, তার কারণ এ পদ্ধতি সহজেই আমাদের ভুল পথে নির্দেশ করবে এরকম আশঙ্কা রয়েছে।

অপেক্ষবাদের মহাকর্ষীয় বিধি এবং মসৃণ হওয়া অনুমান অর্থাৎ নির্ভুল সমরূপত্ব অনুমান এই দুইয়ের সহযোগে আমরা মহাবিশ্বের নানারকম প্রতিরূপ' গঠনের অনুমোদন পেতে পারি। সেই প্রতিরূপগুলিতে সামগ্রিক বক্রতা নানারকম ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব গ্রহণ করে। এই সামগ্রিক বক্রতার প্রধান ক্রিয়া : কোনো কোনো রূপে আমরা এই ইঙ্গিত পাই যে, দূরস্থিত বস্তুর বর্ণালী লাল অভিমুখে স্থানচ্যুত হবে। এই লাল অভিমুখে স্থানচ্যুতির কারণ দূরাপসরণ গতি না স্থান-কালের বক্রতা—সে নির্বাচন নেহাতই রুচির ব্যাপার। যে কোনো একটা বেশে এই অভিক্রিয়া দেখা দেবে। সেটা নির্ভর করবে মহাবিশ্বের বর্ণনায় কোন্ স্থানাঙ্কতন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে তার উপর। অপেক্ষবাদের ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্য স্থানাঙ্কতন্ত্র নির্বাচনের উপর নির্ভরশীল নয়।

মহাবিশ্বের যে প্রতিরূপ আমরা বিচার করছি তার সঙ্গে আমাদের মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণ করা সামগ্রিক ধর্মের কমবেশি মিল রয়েছে। নতুন বিধি এবং সমস্ত অনুমানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একাধিক অন্য প্রতিরূপও রয়েছে। প্রতিরূপগুলিতে লাল অভিমুখী স্থানচ্যুতির স্থলে রয়েছে মহাবিশ্বের সঙ্কোচন (contraction) অনুরূপ নীল অভিমুখী স্থানচ্যুতি। এইরূপ একাধিক প্রতিরূপের অস্তিত্ব কিন্তু নতুন তত্ত্বকে পরিত্যাগ করার সপক্ষে কোনো যুক্তি নয়। এর কারণ : তত্ত্বটি সম্পূর্ণ নয়, প্রয়োজন বাড়তি আরো কিছু অনুমান— যার সাহায্যে অবাঞ্ছিত প্রতিরূপগুলিকে বহিষ্কার করা যায়। নানারকম অনুমানের ইঙ্গিত আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ সন্তোষজনক কোনো অনুমান এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

সম্প্রসারণে আরো একটু দূরতর ফল বিচার করা যাক। এ কাজে অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, আমরা যা বলি প্রয়োজন হলে সব সময়েই সেটা স্থান কাল বক্রতার বাগ্বিধিতে নতুন করে প্রকাশ করা যাবে। সবচাইতে সহজ প্রতীয়মান ফল হল : ছায়াপথের স্তম্ভগুলি যদি দূরতর হতে থাকে তাহলে অতীতে তারা নিশ্চয়ই এখনকার তুলনায় নিকটতর ছিল। ধরে নেওয়া যাক, সম্প্রসারণের সমস্ত ইতিহাস নথিভুক্ত করার জন্য সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের বহু মিলিয়ন বৎসরব্যাপী একটি চলচ্চিত্র তোলা হয়েছে। এই রকম একটি চলচ্চিত্র যদি অতীত অভিমুখে চালানো হয় তাহলে সে চিত্র মহাবিশ্বের ইতিহাস উল্টোভাবে দেখাবে। দেখা যাবে ছায়াপথের সমস্ত গুচ্ছ পরস্পর থেকে দূরে অপসারণ করে তারা পরস্পরের অভিমুখে ধাবমান। চলচ্চিত্রটি যত বেশি অতীতে যাবে এগুলি ততই নিকটতর হতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত তারা এত কাছাকাছি হবে যে তাদের ভিতরে আর কোনো ব্যবধান থাকবে না। আমরা অনুমান করতে পারি আরো অল্প সময়ে তারাগুলির অন্তবর্তী স্থানও পূরিত হবে। প্রাপ্তিযোগ্য সমস্ত স্থান অত্যন্ত ঘনীভূত তপ্ত বায়বীয় পদার্থে পূর্ণ থাকবে। এই বায়বীয় পদার্থ থেকেই তারকাপুঞ্জ বিবর্তিত হয়ে থাকতে পারে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইদানীংকার হ্রস্বতরঙ্গ পর্যবেক্ষণের ফল—এই অতীব ঘনীভূত অবস্থার অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে। পৃথিবীতে অবস্থিত গ্রাহকযন্ত্রে (receiver) যে রেডিও শক্তি উপনীত হয় তার একটি অংশ আন্তঃতারকা বায়বীয় পদার্থ কিংবা তারকা থেকে নির্গত নয় বরং আদিম যুগে সমগ্র মহাবিশ্ব যখন অতীব ঘনীকৃত অবস্থায় ছিল তখনকার বিকিরণের যতটুকু এখনো দৃশ্যমান বলে আশা করা যেত তার সমান অংশের মিল রয়েছে এ তথ্যই যুক্তিযুক্ত।

তাত্ত্বিক প্রতিরূপের ঘনীভূত অবস্থা সম্পর্কীয় ভবিষ্যদ্বাণী কিন্তু খুব বেশি নির্ভুল করা যায় না। পদার্থের কোয়ান্টাম ধর্ম সম্পর্কে যতটা জানা যায় তা থেকে মনে হয়

যথেষ্ট আদিম কালে এই ধর্মগুলির গুরুত্বপূর্ণ অভিক্রিয়া থাকবার কথা। কখন এটা হওয়ার কথা ছিল সে সম্পর্কে কোনো সাধারণ মতৈক্য নেই তবে কোনো ক্ষেত্রেই অপেক্ষবাদের একার পক্ষে এই ধরনের অভিক্রিয়ার বিবরণ দানের ক্ষমতা নেই। একটি সন্তোষজনক বিবরণ দানের জন্য অপেক্ষবাদ এবং কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিকাশের দিকেতে ইদানীং বিরাট প্রচেষ্টা চলেছে। কিন্তু বিকাশগুলির কোনোটির কোনো স্থায়ী গুরুত্ব থাকবে কিনা সেটা এখনো স্পষ্ট নয়।

এ সমস্তই দূর কল্পনা। খুব সম্ভব অতীব ঘনীকৃত অবস্থা থেকে মহাবিশ্ব বিবর্তিত হয়েছে এবং আরো বেশি সম্ভব—যে কাল সম্পর্কে কখনো কোনো বৈজ্ঞানিক সংবাদ পাওয়া যাবে তার ভিতরে আদিমতম কালের প্রতিরূপ এই অতীব ঘনীকৃত অবস্থান। এরকম অবস্থা সত্যই ঘটেছিল কিনা তা নিয়ে এখন কোনো দ্বন্দ্ব নেই ; এই অতীব ঘনীকৃত অবস্থাই 'মহাবিশ্বের শুরু' কিংবা 'মহাবিশ্ব সৃষ্টির লগ্ন' কিংবা এইরকম কিছু মতবাদের দিকে অনেকে ঝুঁকছেন। এটা দুর্ভাগ্য। এ মতগুলির অর্থ : 'এই হল আদিমতম কাল যার সম্পর্কে কখনো কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্য পাওয়া সম্ভব'— এর বেশি কোনো অর্থ এ সমস্ত শব্দগুচ্ছের নেই। সেগুলিকে এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। কারণ এ থেকে হতে পারে অবাঞ্ছিত অধিবিদ্যক ফল (metaphysical implications)।

এখনকার অবস্থানুসারে, অপেক্ষবাদ থেকে আহরিত মহাবিশ্বের কিছু প্রতিরূপ এবং অতীব ঘনীকৃত অবস্থা থেকে সম্প্রসারণকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপাত্তের সঙ্গে সহজেই মানিয়ে নেওয়া যায়। এগুলির প্রতিটিরই দোষ রয়েছে, তার ভিতর সবচাইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান দোষ : এগুলি প্রকাশ করে মসৃণীকৃত চিত্র। সে চিত্র থেকে ছায়াপথ এবং গুচ্ছের আকার এবং গঠন সম্পর্কে কোনো কারণ পাওয়া যায় না।

সম্পূর্ণ সন্তোষজনক প্রতিরূপ গঠন নির্ভর করে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক সমস্যা সমাধানের উপর। একটি বিশেষ সময়ে প্রাপ্তিসাধ্য প্রতিরূপগুলির ভিতর কোন্‌টি পছন্দ হবে সেটা অবশ্যই নির্ভর করবে গাণিতিক উপাত্তের উপর।

১২

প্রচলিত রীতি এবং প্রাকৃতিক বিধি

যেকোনো বিতর্কে শব্দ (word) বিষয়ক দ্বন্দ্ব এবং বাস্তব ঘটনা (facts) বিষয়ক দ্বন্দ্ব পৃথক করা কঠিনতম বিষয়গুলির ভিতর একটি। কঠিন হওয়া উচিত না হলেও কার্যক্ষেত্রে ব্যাপারটা কঠিন। এ তথ্য অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে যেমন সত্য তেমনি সত্য পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে। সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রচণ্ড বিতর্ক হয়েছিল : 'বল'

(force) কাকে বলে তাই নিয়ে। এখন আমাদের কাছে এটা স্বতঃপ্রতীয়মান যে তর্কটা ছিল বল (force) শব্দটা কি করে সংজ্ঞিত (defined) হবে তাই নিয়ে কিন্তু সে কালের চিন্তন ছিল : বিতর্কের বিষয়টা এর চাইতে অনেক বড় অপেক্ষবাদের গণিতে টেন্সর (tensor) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। টেন্সর পদ্ধতি ব্যবহারের একটি উদ্দেশ্য ছিল ভৌতিবিধি (physical laws) থেকে শুদ্ধ শাব্দিক (purely verbal)-কে (বিস্তৃত অর্থে) বিযুক্ত করা। এটা অবশ্য স্বতঃপ্রতীয়মান যে স্থানাঙ্ক নির্বাচনের উপর যা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট অর্থে সেটা শাব্দিক (verbal) একটি লোক লগি ঠেলে নৌকা বরাবর হাঁটছে কিন্তু লগিটা না তোলা পর্যন্ত সে নদীতল সাপেক্ষ তার অবস্থান অপরিবর্তিত রাখছে। যে লোকটা লগি ঠেলছে সে হাঁটছে না স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এ নিয়ে একজন লিলিপুট সীমাহীন তর্ক করতে পারে। তর্কটা হবে শব্দ বিষয়ে— বাস্তব ঘটনা বিষয়ে নয়। আমরা যদি নৌকা সাপেক্ষ স্থির স্থানাঙ্ক নির্বাচন করি তাহলে লগি ঠেলা লোকটা হাঁটছে আর যদি নদীতল সাপেক্ষ স্থির স্থানাঙ্ক নির্বাচন করি : তাহলে লগি ঠেলা লোকটি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ভৌতবিধি আমরা এমনভাবে প্রকাশ করতে চাই যাতে দুটি বিভিন্ন স্থানাঙ্কতন্ত্রে আরোপ করলেও আমরা এই বিধি প্রকাশ করছি এটা স্বতঃপ্রতীয়মান হবে। তাহলে যখন আমরা একটি মাত্র বিধি ভিন্ন বাগ্বিধিতে প্রকাশ করছি তখন ভুলক্রমেও অনুমান করব না যে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন বিধি রয়েছে। এ কাজ করা যায় টেন্সর পদ্ধতিতে। কতগুলি বিধি একটি ভাষায় সম্ভাব্য মনে হলেও অন্য ভাষায় অনুবাদ করা যায় না। প্রাকৃতিক বিধিরূপে এগুলি গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যে বিধিগুলি যে কোনো স্থানাঙ্কের বাগ্বিধিতে অনুবাদ করা সম্ভব সে বিধিগুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। অপেক্ষবাদ যেগুলিকে সম্ভাব্য মনে করে, প্রাকৃতিক বিধিগুলির ভিতর থেকে সেগুলি খুঁজতে হলে এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রচুর সাহায্য করে। সম্ভাব্য বিধিগুলির ভিতরে যেগুলি বস্তুপিণ্ডের সত্যকার গতি সম্পর্কে নিভুল ভবিষ্যদ্বাণী করে সেগুলির ভিতরে সরলতম বিধিই আমরা নির্বাচন করি। এই নির্বাচনের যুক্তি এবং অভিজ্ঞতা সমপরিমাণে সাহায্য করে।

কিন্তু সত্যকারের প্রাকৃতিক বিধি প্রাপ্তির সমস্যা শুধুমাত্র টেন্সর পদ্ধতির দ্বারাই সমাধান করা যাবে না। তার সঙ্গে প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণ সতর্ক চিন্তন। এর ভিতরে খানিকটা করা হয়েছে কিন্তু অনেকটাই বাকী আছে।

এক.ি সরল উদাহরণ : অনুমান করা যাক একটি অভিমুখের দৈর্ঘ্য অন্য অভিমুখের দৈর্ঘ্যের তুলনায় কম অর্থাৎ লোরেঞ্জ সঙ্কোচনের প্রকল্পে যে রকম আছে সেইরকম। ধরে নেওয়া যাক উত্তর অভিমুখী একটি ফুটরুলের দৈর্ঘ্য পূর্বমুখী এরূপ

ফুটরুলের দৈর্ঘ্যের অর্ধেক এবং এ তথ্য সমস্ত বস্তুপিণ্ড সাপেক্ষই সত্য। এইরকম প্রকল্প কি অর্থবহ? আপনার একটি মাছ ধরার ছিপ পশ্চিমমুখী ঘোরালেও তার দৈর্ঘ্য যদি পনের ফুট হয়, সেটা উত্তরমুখে ঘোরালেও তার দৈর্ঘ্য পনের ফুটই থাকবে। তার কারণ মাপনদণ্ডটিও হ্রস্ব হয়ে যাবে। এটা হ্রস্বতর দেখাবে না কারণ আপনার চক্ষুও প্রভাবিত হবে একই ভাবে। পরিবর্তনটা যদি খুঁজে বার করতে চান তাহলে সাধারণ মাপনে চলবে না। এর জন্য চাই মিচেলসন-মর্লি পরীক্ষার ধরনের কোনো পদ্ধতি। মিচেলসন-মর্লি পরীক্ষায় আলোকের বেগকে দৈর্ঘ্য মাপার জন্য ব্যবহার করা হয়। তারপরও দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন অনুমান করা সহজতর, না আলোকের বেগের পরিবর্তন অনুমান করা সহজতর, এ বিষয়ে আপনাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষামূলক তথ্য হবে ; আপনার ফুটরুল যে দূরত্ব নির্দেশ করে সে দূরত্ব অতিক্রম করতে এক অভিমুখের চাইতে অন্য অভিমুখে আলোকের বেশি সময় লাগছে কিংবা মিচেলসন-মর্লি পরীক্ষার মতো : বেশি সময় লাগা উচিত কিন্তু লাগছে না। এই রকম তত্যের সঙ্গে আপনার মাপনকে আপনি নানা ভাবে মানিয়ে নিতে পারেন। যে পদ্ধতিই আপনি গ্রহণ করুন না কেন চলতি রীতির খানিকটা তার ভিতরে থাকবে। মাপন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আপনার বিধিগুলি গঠনের পরও এই চিরাচরিত রীতির খানিকটা থেকে যায়। অনেক সময়ই এ অস্তিত্বের রূপ সূক্ষ্ম এবং কপট (elusive)। চিরাচরিত রীতিকে বিযুক্ত করা আসলে অসাধারণ কঠিন ব্যাপার। ব্যাপারটা যত বিবেচনা করা যায় কাঠিন্য ততই বেশি মনে হয়।

ইলেকট্রনের আকারের প্রশ্ন আরো গুরুত্বপূর্ণ একটি উদাহরণ। পরীক্ষায় দেখা যায় সমস্ত ইলেকট্রনের একই আকার, এর কতটা পরীক্ষালব্ধ অকৃত্রিম বাস্তব সত্য এবং কতটা মাপনের চিরাচরিত রীতির ফলস্বরূপ, এ ক্ষেত্রে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন দুটি তুলনা করতে হয় : (১) বিভিন্ন কালে একটি ইলেকট্রন বিষয়ে, (২) একই কালে দুটি ইলেকট্রন বিষয়ে। তারপর আমরা প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়টিকে সংযুক্ত করে বিভিন্ন কালে দুটি ইলেকট্রনের তুলনা করতে পারি। সমস্ত ইলেকট্রনকে একইভাবে প্রভাবিত করবে এরকম প্রকল্প আমরা পরিত্যাগ করতে পারি। উদাহরণ একটি স্থান-কাল অঞ্চলের সমস্ত ইলেকট্রনের চাইতে বড় এইরকম কোনো প্রকল্প। এই রকম কোনো পরিবর্তন আমাদের মাপন যন্ত্র এবং মাপিত বস্তুকে সমানভাবে প্রভাবিত করবে সুতরাং আবিষ্কারযোগ্য কোনো পরিঘটনা এর ফলে পাওয়া যাবে না। এ কথা বলা এবং কোনো পরিবর্তন হবে না বলা সমার্থক। কিন্তু উদাহরণস্বরূপ বলা যায় : দুটি ইলেকট্রনের একই ভর এই বাস্তব ঘটনাকে শুদ্ধ রীতিগত বলা যায় না। যথেষ্ট

সূক্ষ্মতা এবং নির্ভুলতা থাকলে, তৃতীয় একটি ইলেকট্রনের উপর দুটি ইলেকট্রনের ক্রিয়ার তুলনা আমরা করতে পারি। সমরূপ পরিবেশে যদি তারা অভিন্ন হয় তাহলে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি অভিন্নতা শুধুমাত্র শুদ্ধ রীতিগত নয়।

অপেক্ষবাদের উচ্চতর পর্যায়ের (advanced portions) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পদ্ধতিকে এডিংটন 'বিশ্বগঠন' (World Buildings) আখ্যা দিয়েছিলেন। যে অবয়ব গঠন করতে হবে সেটা হল আমাদের জানা ভৌত বিশ্ব। হিসাবী স্থপতি চেষ্টা করেন সম্ভাব্য স্বল্পতম সামগ্রীর সাহায্যে গঠন করতে। এটা যুক্তি আর গণিতের প্রশ্ন। এই দুই বিষয়ের প্রযুক্তিতে আমাদের দক্ষতা যত বেশি হবে অবয়বের গঠনও হবে তত বেশি বাস্তব এবং শুধুমাত্র পাথরের স্তূপে আমাদের সন্তুষ্টি তত কমবে। কিন্তু প্রকৃতি আমাদের যে পাথরগুলি দিয়েছেন অবয়ব গঠনের আগে সেগুলিকে সঠিক আকারের কাটতে হবে। এ সমস্তই গঠনক্রিয়ার অংশ। এ কাজ সম্ভব হতে হলে কাঁচালেরও গঠন থাকা প্রয়োজন [একে আমরা কাঠের জমিনের (grain) সদৃশরূপে কল্পনা করতে পারি]। কাজ কিন্তু প্রায় যে কোনো গঠনেই চলবে। পারস্পরিক গাণিতিক পরিমার্জনার সাহায্যে আমাদের প্রাথমিক প্রয়োজনকে ছাঁটকাট করে কমাতে থাকি। শেষ পর্যন্ত তার পরিমাণ থাকে অতি অল্প। প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন এই গঠন (grain) কাঁচামালে থাকলে আমরা দেখতে পাই—তা থেকে আমরা এমন একটি গাণিতিক অভিব্যক্তি গঠন করতে পারি, যে অভিব্যক্তির আমাদের অনুভূত বিশ্বের বিবরণ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গুণ থাকবে। বিশেষ করে থাকবে নিত্যতা ধর্মের বিবরণ দেওয়ার মতো গুণ। এই ধর্মই ভরবেগ এবং শক্তির (কিংবা ভরের) বৈশিষ্ট্য। শুধুমাত্র ঘটনাগুলি ছিল আমাদের কাঁচামাল। কিন্তু যখন দেখতে পাই এর সাহায্যে আমরা এমন কিছু গঠন করতে পারি যা কখনো সৃষ্টি হয়েছে কিংবা ধ্বংস হয়েছে বলে প্রতিভাত হয় না তখন আমরা 'বস্তুপিণ্ডে' বিশ্বাস করতে শুরু করি—এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এগুলি আসলে ঘটনা থেকে তৈরি গাণিতিক গঠন, কিন্তু স্থায়িত্বের (premanence) দরুন সেগুলির ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে। আমাদের বোধেন্দ্রিয়গুলি (হয়তো জৈব প্রয়োজনই সেগুলির বিকাশের কারণ) তাত্ত্বিক দিক দিয়ে অধিক মূলগত কিন্তু অমার্জিত (crude) অবিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর স্থলে সেগুলি লক্ষ্য করার জন্য অভিযোজিত (adopted)। তবে তাত্ত্বিক দিক থেকে অমার্জিত অবিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীই বেশি মূলগত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ভৌত বিজ্ঞান বাস্তব বিশ্বের কত সামান্য অংশ যে প্রকাশ করতে পারে সেটা বিস্ময়কর : শুধুমাত্র প্রথাগত উপাদানের দ্বারাই নয়, বোধেন্দ্রিয়ের নির্বাচনীবৃত্তির দ্বারাও (selectiveness) আমাদের জ্ঞান সীমিত।

বোধেন্দ্রিয়ের নির্বাচনী বৃত্তির ফলে উদ্ভূত আমাদের সীমিত জ্ঞানের একটি উদাহরণ : শক্তির অবিনশ্বরতা। এ তথ্য পরীক্ষার সাহায্যে ক্রমান্বয়ে আবিষ্কার

হয়েছে। মনে হয়েছিল এটা দৃঢ়ভিত্তিক পরীক্ষালব্ধ প্রাকৃতিক বিধি। এখন দেখা যাচ্ছে আমাদের প্রাথমিক স্থান-কাল সাংতত্যক (continuum) থেকে আমরা এমন একটি গাণিতিক অভিব্যক্তি গঠন করতে পারি যার গুণে এটা হবে দৃশ্যত অবিনশ্বর। তাহলে শক্তি অবিনশ্বর এই প্রস্তাব পদার্থবিদ্যার প্রতিজ্ঞারূপে (proposition) আর থাকে না— হয়ে দাঁড়ায় ভাষাতত্ত্ব আর মনস্তত্ত্বের প্রতিজ্ঞা। ভাষাতত্ত্বের প্রস্তাব অনুসারে : শক্তি আলোচ্য গাণিতিক অভিব্যক্তির নাম। মনস্তত্ত্বের প্রস্তাবরূপে : আমাদের বোধেন্দ্রিয় এমন যে আমরা আলোচ্য গাণিতিক অভিব্যক্তিটি মোটামুটি লক্ষ্য করি এবং আমাদের অমার্জিত বোধকে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ দ্বারা সংস্কার করতে করতে ক্রমশ ঐ গাণিতিক অভিব্যক্তির নিকটতর হই। পদার্থবিদরা শক্তি বিষয়ে নিজেদের জ্ঞান সম্পর্কে যা মনে করতেন এটা তার চাইতে অনেক কম।

পাঠক বলতে পারেন : পদার্থবিদ্যার তাহলে বাকি রইল কি? পদার্থময় জগৎ (world of matter) সম্পর্কে আসলে আমরা কি জানি? এক্ষেত্রে আমরা পদার্থবিদ্যার তিনটি বিভাগকে পৃথক করতে পারি। প্রথমত, সম্ভাব্য বিস্তৃতম সাধারণীকৃত অপেক্ষবাদের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি, দ্বিতীয়ত, যে বিষয়গুলিকে অপেক্ষবাদের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তৃতীয়ত রয়েছে সেইগুলি, যেগুলিকে ভূগোল বলা চলে। এগুলিকে পরপর বিচার করা যাক।

প্রচলিত রীতি বাদ দিলে, অপেক্ষবাদ আমাদের বলে মহাবিশ্বের ঘটনাগুলির একটি চারমাত্রিক ক্রম (order) আছে এবং এই ক্রমে পরস্পর নিকটবর্তী হলে যে কোনো দুটি ঘটনার ভিতরে একটি সম্পর্ক রয়েছে, তার নাম 'অন্তর' (interval)। উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করলে এই অন্তর মাপা সম্ভব। অপেক্ষবাদ আরো বলে 'পরম গতি' (absolute motion), 'পরম স্থান' (absolute space) এবং 'পরম কালের' (absolute time) কোনো ভৌত গুরুত্ব থাকতে পারে না। এই সমস্ত কল্পনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পদার্থবিদ্যার বিধিগুলি গ্রহণযোগ্য নয়। এগুলি স্বতত ঠিক কোনো ভৌত বিধি নয় বরং এগুলি কিছু প্রস্তাবিত ভৌত বিধিকে সন্তোষজনক নয় এই কারণে পরিত্যাগ করার সামর্থ্য আমাদের দান করার জন্য একটি প্রয়োজনীয় নিয়ম।

ভৌতবিধিরূপে পরিচিত হওয়ার মতো এছাড়া যা অপেক্ষবাদে রয়েছে তা অতি সামান্য। তাছাড়া গণিত রয়েছে প্রচুর। তাতে দেখানো হয়েছে গাণিতিকভাবে গঠিত কিছু রাশিকে অবশ্যই আমাদের অনুভূত বস্তুর মতো আচরণ করতে হবে এবং রয়েছে পদার্থবিদ্যা এবং মনস্তত্ত্বের ভিতরে একটি সেতুর ইঙ্গিত। সে ইঙ্গিত হল : আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় যা বোধ করবার জন্য অভিযোজিত

সেগুলি এবং গাণিতিকভাবে গঠিত এই রাশিগুলি অভিন্ন। কিন্তু কঠোরভাবে বিচার করলে এর কোনোটিই পদার্থবিদ্যা নয়।

পদার্থবিদ্যার যে অংশ বর্তমানে অপেক্ষবাদের আওতায় আনা যায় না অংশ বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ। অপেক্ষবাদে এমন কিছু নেই যা দেখাতে পারে যে ইলেকট্রন আর প্রোটন থাকবে। পদার্থের কেন ক্ষুদ্র পিণ্ডরূপ অস্তিত্ব থাকবে সম্পর্কেও কোনো যুক্তি অপেক্ষবাদ দেখাতে পারে না। এ অঞ্চল কোয়ান্টাম অধিকারে এ তত্ত্ব ক্ষুদ্র অবস্থাগত পদার্থের বহুধর্মের কারণ দেখাতে পারে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের সঙ্গে বিশিষ্ট অপেক্ষবাদের সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে কোয়ান্টাম তত্ত্বের সঙ্গে ব্যাপক অপেক্ষবাদের সংশ্লেষণের (synthesis) সমস্ত চেষ্টা। পদার্থবিদ্যার এই অংশকে ব্যাপক অপেক্ষবাদের কাঠামোর ভিতরে নিয়ে আসার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন কিছু সমস্যা রয়েছে, কোয়ান্টাম তত্ত্বের নিজের ভিতরেও রয়েছে একই রকম কঠিন সমস্যা এবং অনেক পদার্থবিদের ধারণা কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং ব্যাপক অপেক্ষবাদের সংশ্লেষণ (synthesis) হয়তো এই সমস্যাগুলির ভিতরে কয়েকটির সমাধান করতে পারবে। আমরা দেখেছি এখানকার পরিস্থিতি হল : অতি বৃহৎ মানে (matter on a very large scale) পদার্থের ধর্ম সম্পর্কে ব্যাপক অপেক্ষবাদ বেশ সন্তোষজনক বিবরণ (accounts? কারণ) দান করে, আর কোয়ান্টাম তত্ত্ব দান করে অতি ক্ষুদ্র মানের পদার্থের ধর্ম সম্পর্কে বেশ সন্তোষজনক বিবরণ। দুটি তত্ত্বের ভিত্তিতে কিছু প্রমাণ রয়েছে কিন্তু এ দুটিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য যে গবেষণা করা হয়েছে এখনো সেগুলিকে দূরে কল্পনাভিত্তিক (speculative) রূপেই বিচার করা উচিত। অনেকে মনে করেন ব্যাপক অপেক্ষবাদকে এমনভাবে বিস্তৃত করা সম্ভব যে, কোয়ান্টাম তত্ত্ব যে সমস্ত ফল (result) ব্যাখ্যা করে সেগুলিও ব্যাখ্যাত হবে এবং সে ব্যাখ্যা হবে বর্তমান কোয়ান্টাম তত্ত্বেরও ব্যাখ্যার চাইতে অনেক বেশি সন্তোষজনক। এই চিন্তাধারা যাঁদের ছিল, মৃত্যুর আগে আইনস্টাইনও ছিলেন তাঁদের একজন। বর্তমানের বহু পদার্থবিদ্যাবিদই কিন্তু ভাবেন এ দৃষ্টিভঙ্গি ভ্রান্ত।

ব্যাপক অপেক্ষবাদ পারস্পরিক (next-to-next) পদ্ধতির চরম উদাহরণ। মহাকর্ষের কারণ গ্রহের উপর সূর্যের ক্রিয়া, একথা ভাববার আর প্রয়োজন নেই। বরং ভাবা যায় গ্রহটি যে অঞ্চলে রয়েছে মহাকর্ষ সেখানকার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তি। অনুমান করা হয় স্থান-কালের এক অংশ থেকে অন্য অংশে যাবার সময় এই বৈশিষ্ট্যগুলির পরিবর্তন হয় অল্পে অল্পে, ক্রমান্বয়ে (gradually) অবিচ্ছিন্নভাবে—সহসা উল্লম্ফনের (sudden jumps) সাহায্যে নয়।

বিদ্যুৎচুম্বকত্বের ক্ষেত্রে ক্রিয়াগুলিকেও এইভাবে বিচার করা যায় কিন্তু বিদ্যুৎচুম্বকত্বের সঙ্গে যখনই কোয়ান্টাম তত্ত্বের সামঞ্জস্য বিধান করা যায় তখনই হয় এর চরিত্রের আমূল পরিবর্তন। অবিচ্ছিন্ন অবয়ব (continuous aspect) অদৃশ্য হয় এবং তার স্থলে প্রতিস্থাপিত হয় বিচ্ছিন্ন আচরণ (discontinuous behaviour)। আগেই আমরা দেখেছি এটাই কোয়ান্টাম তত্ত্বের জাতিরূপ (typical)। কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্বের এই ধারণাগুলিকে যদি আমরা মহাকর্ষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চাই তাহলে আমরা দেখতে পাব এ দুটি ঠিক মতো খাপ খায় না এবং দুটি তত্ত্বের যে কোনো একটির কিংবা দুটি তত্ত্বেরই যথেষ্ট পরিবর্তন প্রয়োজন। কি পরিবর্তন প্রয়োজন সেটা এখনো জানা যায়নি।

এ সঙ্কটকে একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী যখন সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করেন পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষ সূর্যের ঔদাসীন্য তখন রাজকীয়। কিন্তু একজন পদার্থবিজ্ঞানী যখন অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করেন একটা পরমাণুতে কি ঘটছে, তখনকার ব্যবহৃত যন্ত্রটি যা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে তার চাইতে অনেক ছোট না হয়ে বরং অনেক বড়। সুতরাং যন্ত্রটির পরমাণুর উপর ক্রিয়া থাকার সম্ভাবনা। দেখা গিয়েছে একটি পরমাণুর অবস্থান নির্ণয়ের জন্য যে ধরনের যন্ত্র সবচাইতে উপযুক্ত, সে যন্ত্র পরমাণুর বেগকে প্রভাবিত করতে বাধ্য এবং বেগ নির্ণয়ের জন্য যে যন্ত্র সবচাইতে উপযুক্ত সে যন্ত্র পরমাণুর অবস্থান প্রভাবিত করতে বাধ্য। পারমাণবিক কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং বিশিষ্ট অপেক্ষবাদের সমন্বয় করলে এ অসুবিধাগুলি হয় না। কারণ তখন মহাকর্ষকে অগ্রাহ্য করা হয় এবং কাছাকাছি পরমাণু থাকুক কিংবা না থাকুক স্থান-কালকে ভাবা হয় সমতল (flat)। কিন্তু আমরা যখন কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং ব্যাপক অপেক্ষবাদের সমন্বয় সাধন করতে চেষ্টা করি মহাকর্ষকে তখন অগ্রাহ্য করা হয় না সুতরাং স্থান-কালের বক্রতা নির্ভর করবে পরমাণুর অবস্থিতির উপর। এইমাত্র কিন্তু আমরা দেখেছি কোয়ান্টাম তত্ত্ব স্পষ্টভাবে বলে পরমাণুর অবস্থান কোথায় সেটা আমরা সব সময় জানতে পারি না। সঙ্কটের একটা উৎস এখানে।

শেষে আমরা আসি ভূগোলের প্রসঙ্গে। এর ভিতরে আমরা ইতিহাসকেও অন্তর্ভুক্ত করেছি। ইতিহাসের সঙ্গে ভূগোলের বিচ্ছিন্নতার ভিত্তি, স্থানের সঙ্গে কালের বিচ্ছিন্নতা। যখন আমরা স্থান-কালে এই দুটিকে একত্রিত করি তখন আমাদের প্রয়োজন হয় ইতিহাস ভূগোলের সমন্বয়ের জন্যও এতটি শব্দ। সারল্যের খাতিরে, বিস্তৃত অর্থে আমি একটি শব্দ ভূগোলেই ব্যবহার করব।

স্থান-কালের এক অংশ থেকে অন্য অংশের পার্থক্য নির্ণয় করে এরকম অসংস্কৃত বাস্তব তথ্য যত কিছু আছে, এ অর্থে তার সবটাই ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত।

এক অংশ সূর্যের অধিকারে, এক অংশ পৃথিবীর, মধ্যবর্তী অঞ্চলে রয়েছে আলোকতরঙ্গ, কিন্তু কোনো পদার্থ নেই (এখানে ওখানে সামান্য পরিমাণ ছাড়া)। বিভিন্ন বাস্তব ভৌগোলিক ঘটনার ভিতরে কিছু পরিমাণ তাত্ত্বিক সম্পর্ক রয়েছে। ভৌত বিধির উদ্দেশ্য এ সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠিত করা।

এখনই আমরা সৌরতন্ত্রের অতীতে আর ভবিষ্যতে ব্যাপ্ত বিশাল কালের যে ঘটনাগুলির গণনা করতে সক্ষম। কিন্তু এই জাতীয় সমস্ত গণনার জন্য আমাদের অসংস্কৃত বাস্তব ঘটনার ভিত্তি প্রয়োজন। বাস্তব ঘটনাগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু বাস্তব ঘটনাগুলির অনুমিতি (inference) একমাত্র অন্য বাস্তব ঘটনা থেকেই সম্ভব, শুধু সাধারণ বিধি থেকে নয়। সুতরাং পদার্থবিদ্যায় ভৌগোলিক বাস্তব ঘটনাবলীর একটি অন্য নিরপেক্ষ স্থান রয়েছে; যদি আমাদের অনুমতির জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত হিসাবে অন্য বাস্তব ঘটনা আমরা না জানি তাহলে ভৌত বিধি যতই থাকুক না কেন ভৌত ঘটনা অনুমানের সামর্থ্য আমাদের হবে না। এ থেকে যখন আমি বাস্তব ঘটনাবলীর কথা বলছি তখন আমি ভাবছি ভূগোলের কোনো বিশিষ্ট বাস্তব ঘটনার কথা। ভূগোল শব্দ আমি যে বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করেছি এখানে সেই অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হল।

অপেক্ষবাদে আমাদের রিচার্য অবয়ব (structure) কিন্তু যে পদার্থ দিয়ে অবয়ব গঠিত সেটা বিচার্য নয়। অন্যদিকে ভূগোলে ঐ পদার্থ প্রাসঙ্গিক। একটি স্থানের (place) সঙ্গে অন্য একটি স্থানের যদি পার্তক্য থাকতে হয় তাহলে হয় একটি স্থানের পদার্থের সঙ্গে অন্য স্থানের পদার্থের পার্থক্য থাকবে কিংবা কোনো স্থানে পদার্থ থাকবে এবং কোনো স্থানে থাকবে না। এই দুটি বিকল্পের ভিতরে প্রথমটিকেই বেশি সন্তোষজনক মনে হয়। আমরা বলতে চেষ্টা করতে পারি ইলেকট্রন, প্রোটন এবং অন্যান্য উনপারমাণবিক কণা (sub-atomic particles) রয়েছে—বাকিটা শূন্য। কিন্তু শূন্য অঞ্চলে আলোকতরঙ্গ রয়েছে সুতরাং সেখানে কিছু নেই একথা আমরা বলতে পারি না। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে, এমন কি বস্তুগুলি কোথায় আছে সে কথাও আমরা নির্ভুলভাবে বলতে পারি না। শুধুমাত্র বলতে পারি—একটি স্থানের তুলনায় অন্য একটি স্থানে ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারও কারও মতে আলোকতরঙ্গ এবং কণিকাগুলি ইথারের বিক্ষোভ মাত্র, অন্যরা শুধুমাত্র বিক্ষোভ বলেই খুশি। কিন্তু সে যাই হোক যেখানেই আলোকতরঙ্গ কিংবা কণিকা থাকবার সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানেই ঘটনা ঘটছে। যেখানেই কোনো রূপে মুক্তি থাকার সম্ভাবনা সে স্থান সম্পর্কে আমাদের বলার ক্ষমতা এই পর্যন্ত, তার কারণ শক্তি এখন একাধিক ঘটনার ভিত্তিতে গড়ে

গাণিতিক গঠনের রূপ নিয়েছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি স্থান-কালের ঘটনা গুলো রয়েছে কিন্তু যে অঞ্চল নিয়ে আমরা বিচার করছি সে অঞ্চলে একটি ইলেকট্রন কিংবা প্রোটন থাকবার খুব বেশি সম্ভাবনা আছে, না সে অঞ্চল সাধারণত আমরা যাকে শূন্যস্থান বলি সেরকম—ঘটনাগুলির পার্থক্য হবে সেই অনুসারে। কিন্তু শুধুমাত্র যে ঘটনাগুলি নিজেদের জীবনকালের ভিতর সংঘটিত হয় সেই ঘটনাগুলি ছাড়া অন্যগুলির স্বকীয় চরিত্র (intrinsic nature) আমরা কিছুই জানতে পারি না। যে অসংস্কৃত ঘটনাগুলিকে পদার্থবিদ্যা একটি ছকে সাজায় আমাদের অনুভূতি এবং বোধ নিশ্চয়ই তার একটি অংশ কিংবা বলা যেতে পারে পদার্থবিদ্যা সেগুলিকে একটি ছকে সাজানো অবস্থায় আবিষ্কার করে। যে ঘটনাগুলি আমাদের জীবনের অংশ নয়, সেগুলির ছক পদার্থবিদ্যা আমাদের কাছে প্রকাশ করে কিন্তু ঘটনাগুলি স্বতত (in themselves) কি রকম সে কথা প্রকাশ করতে পদার্থবিদ্যা একেবারেই অক্ষম। অন্য কোনো পদ্ধতিতে এগুলি আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না।

১৩
বল এর অবলুপ্তি

নিউটনীয় তন্ত্র অনুসারে কোনো বলের ক্রিয়াধীন না হলে বস্তুপিণ্ড ঋজুরেখায় সমবেগে চলমান থাকে। বস্তুপিণ্ড এভাবে না চললে তাদের গতির পরিবর্তনের কারণ আরোপ করা হয় একটি 'বলের' (force) উপর। কিছু কিছু বল আমাদের কল্পনায় বোধগম্য মনে হয় : দড়ি কিংবা তারের প্রয়োগ করা বল, একাধিক বস্তুপিণ্ডের সংঘর্ষ কিংবা যে কোনোরকম স্বতঃপ্রতীয়মান ঠেলা (push)। পূর্বতন একটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে আমাদের এই সমস্ত পদ্ধতির আপাতদৃষ্ট কাল্পনিক উপলব্ধি দোষদুষ্ট (fallacious-হেত্বাভাসমূলক)। আসলে এর একমাত্র অর্থ : গাণিতিক হিসাব ছাড়াই কি ঘটতে যাচ্ছে সেটা অতীত অভিজ্ঞতার সাহায্যে আগে থেকেই আমরা কম বেশি আঁচ করতে পারি। কিন্তু মহাকর্ষের সঙ্গে জড়িত 'বল' কিংবা স্বল্প পরিচিত বৈদ্যুতিক ক্রিয়া আমাদের কল্পনার কাছে এরকম স্বাভাবিক মনে হয় না। পৃথিবীটা শূন্যে ভাসতে পারে এটা এক অদ্ভুত ব্যাপার, স্বাভাবিক অনুমান হওয়া উচিত পৃথিবীটা নিশ্চয়ই পড়ে যাবে। সেইজন্য প্রাচীনকালে যাঁরা দূরকল্পনা করেছেন তাঁদের মতে পৃথিবীকে রাখতে হয়েছে একটা হাতীর উপর, হাতীটাকে রাখতে হয়েছে একটা কচ্ছপের উপর। সুদূরে ক্রিয়া (action at a distance) ছাড়াও নিউটনীয় তত্ত্ব দুটি কল্পনাশক্তিপূর্ণ নতুনত্ব উপস্থাপন করেছিল। প্রথম, মহাকর্ষ সব সময় মূলত নিম্নমুখী অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্রমুখী

নয়। দ্বিতীয় : 'সমরূপে চলমান' এই শব্দসমষ্টি কোনো বলাধীন নয় এরকম [illegible] গতি সম্পর্কে যে অর্থে প্রয়োগ করা হয় সে অর্থে সমরূপ বেগে বারংবার [illegible] চলমান একটি বস্তুপিণ্ড সমরূপে চলমান নয়। বস্তুপিণ্ডটি ঋজুরেখা থেকে [illegible] বৃত্তের কেন্দ্রমুখের বিচ্যুত হচ্ছে। এইজন্য প্রয়োজন সেই অভিমুখে আকর্ষণকারী [illegible] বল। সুতরাং নিউটন এই সিদ্ধান্তে এলেন যে গ্রহগুলি একটি বলের দ্বারা সূর্যের [illegible] আকর্ষিত হচ্ছে। এই বলের নাম মহাকর্ষ।

আমরা দেখেছি— অপেক্ষবাদ এই দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণটাই বাতিল [illegible] প্রাচীন জ্যামিতিক অর্থে ঋজুরেখার অস্তিত্ব আর নেই। রয়েছে 'সন্নিকর্ষ ঋজুরেখা' কিংবা ধরাকৃতি (geodesic)। কিন্তু এগুলি সঙ্গে স্থান এবং কাল [illegible] জড়িত। ধূমকেতু সৌরতন্ত্রে যে রকম কক্ষ রচনা করে সৌরতন্ত্রের ভিতর [illegible] চলমান একটি আলোকরশ্মি জ্যামিতিক অর্থে সেই রকম কক্ষ রচনা করে [illegible] দুটোই কিন্তু চলে ধরাকৃতিতে। ঐ কল্পনের মানসচিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্তিত [illegible] একজন কবি বলতে পারেন, জল নিম্নমুখী তার কারণ জলের আকর্ষণ সমুদ্রের দিকে। কিন্তু একজন পদার্থ বিজ্ঞানী কিংবা একজন নশ্বর মানুষ বলবে [illegible] বিন্দুতেই জল যেমন যাওয়ার তেমনি যায়। এর কারণ ঐ বিন্দুতে জমির ঢালের সামনে কি আছে জল তা গ্রাহ্য করে না। ঠিক যেমন জলের সমুদ্রের [illegible] আসার কারণ সমুদ্র নয় তেমনি গ্রহগুলির সূর্যকে চক্রাকারে প্রদক্ষিণ [illegible] কারণও সূর্য নয়। গ্রহগুলি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে তার কারণ সেটাই সহজ কাজ। প্রায়োগিক অর্থে (technical sense) এটাই 'সর্বনিম্ন ক্রিয়া' (least action)। যে অঞ্চলে তাদের অবস্থান সে অঞ্চলের চরিত্রের জন্য এটাই সহজ কাজ। সূর্য থেকে নির্গত কোনো প্রভাব এর কারণ নয়।

মহাকর্ষের কারণ সূর্যের প্রতি গ্রহগুলিকে আকর্ষণকারী একটি 'বল' অনুমানের প্রয়োজনের উদ্ভব যে কোনো মূল্যে ইউক্লিডীয় জ্যামিতিকে রক্ষা করার দৃঢ়সংকল্প থেকে। আমাদের স্থান আসলে ইউক্লিডীয় নয়, তা সত্ত্বেও যদি আমরা অনুমান করি আমাদের স্থান ইউক্লিডীয় তাহলে জ্যামিতির ভুল সংশোধনের জন্য আমাদের পদার্থবিদ্যাকে ডাকতে হবে। আমরা দেখতে পাই বস্তুপিণ্ডগুলি [illegible] রেখায় চলে সেগুলি ঋজুরেখা নয় অথচ আমরা সেগুলিকে ঋজুরেখা ভাবার ভুল করি তখন আমরা এই আচরণের একটা কারণ দাবী করি। এডিংটন এ ব্যাপারে প্রশংসা করার মতো স্পষ্টভাবে বলেছেন। পরবর্তী ব্যাখ্যার ভিত্তি তাঁরই দেওয়া একটা ব্যাখ্যা। ধরুন আপনি বিশিষ্ট অপেক্ষবাদে ব্যবহৃত অন্তর (interval) সম্পর্কীয় সঙ্কেত গ্রহণ করেছেন। আপনার স্থান ইউক্লিডীয়—এই নীরব [illegible]

া সঙ্কেতে রয়েছে। পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে অন্তরগুলিকে তুলনা সম্ভব। আপনি কাজে আবিষ্কার করবেন আপনার সঙ্কেতের সঙ্গে পরীক্ষাফলের সঙ্গতি রক্ষা করা যাচ্ছে না। তখন আপনি নিজের ভুল বুঝতে পারবেন। এ সত্ত্বেও যদি আপনি ইউক্লিডীয় সঙ্কেতের সঙ্গে যুক্ত থাকবার জন্য জিদ ধরেন তাহলে সঙ্কেত এবং পর্যবেক্ষণের ভিতরে অসঙ্গতির দায় এমন কোনো প্রভাবের উপর আপনার আরোপ করতে হবে যার অস্তিত্ব বর্তমান এবং যে প্রভাব পরীক্ষার্থ পিণ্ডগুলির (test bodies) আচরণ প্রভাবিত করে। আপনি বাড়তি আর একটি নিমিত্ত উপস্থিত করবেন এবং তার উপর আপনার ভুলের ফলের দায়িত্ব আরোপ করবেন। বলের নিউটনীয় সংজ্ঞা অনুসারে ঋজুরেখায় সমরূপ গতিতে যে নিমিত্ত (agency) বিচ্যুতি সৃষ্টি করে তার নাম 'বল'। সুতরাং অন্তর সম্পর্কীয় ইউক্লিডীয় সঙ্কেতের পক্ষে আপনার জিদের জন্য যে নিমিত্তকে আপনি ডেকে এনেছেন তাকে বলা হয় 'বলের ক্ষেত্র' (field of force)।

'বল' সম্পর্কীয় প্রাচীন ধারণা পরিত্যাগ করে মানুষ যদি নতুন ধারায় বিশ্বকে উপলব্ধি করতে শেখে তাহলে শুধু তার ভৌত কল্পন পরিবর্তিত হবে তাই নয় হয়তো পরিবর্তন হবে তাদের নীতি এবং রাজনীতিরও। শেষের অভিক্রিয়াটি বেশ অযৌক্তিক কিন্তু সে জন্য তার সম্ভাবনা কম নয়। সৌরতন্ত্র সাপেক্ষ নিউটনীয় তত্ত্ব অনুসারে সূর্যের আচরণ রাজার মতো—গ্রহগুলি তার আজ্ঞা পালন করতে বাধ্য। নিউটনীয় বিশ্বের তুলনায় আইনস্টাইনের বিশ্বে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বেশি এবং শাসন কম (less government)। সে বিশ্বে কর্মব্যস্ততাও কম; আমরা দেখেছি আইনস্টাইনের মহাবিশ্বে মূলগত বিধি আলস্য। সংবাদপত্রের ভাষায় 'গতিময়' (dynamic) শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'সক্রিয় এবং শক্তিমান' (energetic & forceful) কিন্তু এর অর্থ যদি হতো 'গতিবিদ্যার নীতিগুলির দৃষ্টান্ত' তাহলে এ শব্দমালা প্রয়োগ করা উচিত ছিল এমন লোক সম্পর্কে যে মুখের ভিতরে ফল পড়ার আশায় গাছতলায় বসে থাকে। আমার আশা : ভবিষ্যতে সাংবাদিকরা যখন গতিশীল সক্রিয়া ব্যক্তিত্বের (dynamic personality) কথা বলবেন তখন বোঝাতে চাইবেন এমন ব্যক্তিকে যিনি সেই মুহূর্তে সব চাইতে কম কাজ করেন এবং ভবিষ্যতে কি হবে তা ভাবেন না। এই ফলপ্রাপ্তিতে যদি আমি সাহায্য করতে পারি তাহলে বুঝব আমার লেখা ব্যর্থ হয়নি।

মনে হয় 'বলের' অবলুপ্তির সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে ভৌতকল্পনের উৎস রূপে স্পর্শের স্থলে দৃষ্টিতে প্রতিস্থাপন করা। প্রথম অধ্যায়ে এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। আয়নাতে যখন একটি প্রতিবিম্বকে নড়তে দেখি তখন সেটাকে কেউ ঠেলেছে বলে

আমরা ভাবি না। মুখোমুখি দুটো বড় আয়না থাকলে আপনি হয়তো [illegible] অসংখ্য প্রতিবিম্ব দেখতে পাবেন। আয়না দুটোর মাঝখানে কেউ যদি টুপি [illegible] দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে আপনি প্রতিবিম্বে কুড়ি ত্রিশটি টুপি দেখতে [illegible] কেউ যদি এসে ডাণ্ডা মেরে টুপিটাকে ফেলে দেয় তাহলে একই মুহূর্তে [illegible] ত্রিশটি টুপি নিচে পড়বে। আমরা ভাবি আসল টুপিটা ফেলে দিতে [illegible] প্রয়োজন কিন্তু ভাবি বাকি কুড়ি ত্রিশটা টুপি নিজে নিজে পড়ে যায় কিংবা [illegible] পড়ে যায় শুধুমাত্র নকল করার একটা আবেগের দরুন। ব্যাপারটা এবার গুরুত্বের সঙ্গে ভাবা যাক।

আয়নায় যখন ছায়া নড়ে তখন কিছু একটা ঘটে এ তথ্য স্বতঃপ্রমাণ। দৃষ্টির দিক থেকে ব্যাপারটা এত বাস্তব মনে হয় যেন ঘটনাটা আয়নায় ঘটেছে। কিন্তু স্পর্শ কিংবা শ্রুতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিছুই ঘটেনি। আসল টুপিটা সময় একটা শব্দ হয় কিন্তু কুড়ি ত্রিশটা প্রতিবিম্ব পড়ে নিঃশব্দে। টুপিটা আপনার পায়ে পড়লে আপনি অনুভব করেন কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি আয়নায় যে [illegible] ত্রিশজন লোক রয়েছে টুপিটা তাদের পায়ে পড়লেও তারা অনুভব করবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগৎ সম্পর্কেও কিন্তু এ তথ্য সমভাবে সত্য। কোনো শব্দ [illegible] না কারণ শূন্যস্থান দিয়ে শব্দ যেতে পারে না। আমরা যতদূর [illegible] জ্যোতির্বিজ্ঞানের ঘটনা কোনো 'বোধ' সৃষ্টি করে না কারণ 'বোধ' করার [illegible] কেউ সেখানে নেই। জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগৎও তাহলে আয়নার জগতের [illegible] এমন কিছু 'বাস্তব' কিংবা 'ঘন' (solid) নয় এবং সে জগৎকে চালনার জন্য [illegible] প্রয়োজনও একইরকম অল্প।

পাঠক মনে করতে পারেন আমি অলস কুতর্ক করছি। তিনি বলতে [illegible] 'আয়নার ছায়া একটি কঠিন বস্তুর প্রতিবিম্ব। আয়নার টুপিটা পড়ার কারণ [illegible] টুপিটার উপর প্রয়োগ করা বল। আয়নার টুপি নিজের খুশিমতো আচরণ করতে [illegible] না, ওর নকল করতে হবে আসল টুপিটাকে। এতেই বোঝা যায় আয়নার [illegible] সঙ্গে সূর্য আর গ্রহের কতটা পার্থক্য। চিরকাল তারা একটি আদিরূপকে (prototype) নকল করতে বাধ্য নয়। সুতরাং একটি প্রতিবিম্ব এবং অন্তরীক্ষের একটি [illegible] (heavenly bodies) একই রকম বাস্তব—এ ভড়ং আপনি ছাড়ুন'।

এতে খানিকটা সত্য নিশ্চয়ই আছে। বিচার্য বিষয় হল : ঠিক [illegible] প্রথমত প্রতিবিম্ব 'কাল্পনিক' নয়। আপনি প্রতিবিম্ব দেখবার সময় নিঃসন্দেহে বাস্তব আলোকতরঙ্গ আপনার চোখে পৌঁছায়। আয়নার উপর একটা [illegible] ঝুলিয়ে দিলে এই আলোকতরঙ্গগুলির আর অস্তিত্ব থাকে না। প্রতিবিম্ব

...রণের ভিতরে একটা শুদ্ধ আলোকীয় পার্থক্য কিন্তু রয়েছে। আলোকীয় পার্থক্য ...ছে এই অনুকরণের প্রশ্নের সঙ্গে। আয়নায় যখন আপনি কাপড় ঝোলান তখন ...ন' পদার্থটিতে কোনো পরিবর্তন হয় না কিন্তু বাস্তব পদার্থটি সরিয়ে নিলে ...বিম্বটিও মিলিয়ে যায়। এর ফলে আমরা বলতে পারি : যে আলোকতরঙ্গগুলি ...বিম্ব গঠন করে, সেগুলি আয়নার উপরিতল থেকে প্রতিফলিত এবং সেগুলি ...গে পশ্চাতের কোনো বিন্দু থেকে আসে না; আসে 'বাস্তব' পদার্থটি থেকে। ...া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সাধারণ নীতির উদাহরণ। বিশ্বের অধিকাংশ ঘটনাই ...কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয় তারা অনেকগুলি সমরূপ ঘটনাগোষ্ঠীর সদস্য। ...ধি এমন যে, প্রতিটি গোষ্ঠীই আরোপযোগ্যরূপে বিশেষ একটি ক্ষুদ্র স্থান-...াল অঞ্চলের সঙ্গে জড়িত। ঐ আলোকতরঙ্গগুলির ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা এই। এই ...লোকতরঙ্গের জন্যই আমরা বস্তু এবং আয়নায় তার প্রতিবিম্ব দেখতে পাই। ...তাদের প্রত্যেকেরই উৎসকেন্দ্র ঐ বস্তুটি। আপনি যদি ঐ বস্তুটিকে ঘিরে ...কটি বিশেষ দূরত্বে একটি অস্বচ্ছ (opaque) গোলক রাখেন তাহলে গোলকের ...রে কোনো বিন্দু থেকেই আর ঐ বস্তুটি দৃশ্য হয় না। আমরা দেখেছি ...াকর্ষকে যদিও এখন দূরে সংঘটিত ক্রিয়ারূপে বিচার করা হয় না তবুও মহাকর্ষ ...কটি কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। এই কেন্দ্রের শিখরের চারপাশে যেন প্রতিসমরূপে ...ymmetrically) সজ্জিত একটি পাহাড় রয়েছে। আলোচ্য মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের ...ঙ্গে সংযুক্ত যে সম্ভাব্য বস্তুপিণ্ড আমরা কল্পনা করি তার অবস্থান ঐ শিখরে। ...ল্যের জন্য, সাধারণ বুদ্ধিতে ঐ অর্থে এক গোষ্ঠীর সমস্ত ঘটনাই একত্রে ...ীকৃত হয় (lump together)। দুজন লোক যখন একই বস্তু দেখে, তখন দুটি ...ভিন্ন ঘটনা ঘটে কিন্তু তারা একই গোষ্ঠীর ঘটনা এবং একই কেন্দ্রের সঙ্গে ...যুক্ত। দুটি লোক (আমরা যে রকম বলি) যখন একই গোলমাল শোনে তখনো ...কই কথা প্রযোজ্য। সুতরাং, এমন কি আলোকীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও প্রতিবিম্বিত ...স্তুটির তুলনায় প্রতিবিম্বটির বাস্তবতা স্বল্পতর। তার কারণ প্রতিবিম্বটি যেখানে ...য়েছে বলে মনে হয় সেখান থেকে সমস্ত দিকে আলোক বিস্তৃত হয় না। বিস্তৃত ...া শুধুমাত্র দর্পণের সম্মুখে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিবিম্বিত বস্তুটি স্বস্থানে থাকে ...তিবিম্বিত হয় শুধুমাত্র ততক্ষণ পর্যন্ত। এতক্ষণ আমরা যে রকম বলছিলাম, সেই ...াবে একটি কেন্দ্রের চারপাশে সংযুক্ত ঘটনাগুলিকে গোষ্ঠীভুক্ত করার সুবিধার ...টা একটা উদাহরণ।

ঐ রকম এক গোষ্ঠী বস্তুর ভিতরে পরিবর্তন পরীক্ষা করলে আমরা দেখতে পাই পরিবর্তন দু'রকম : কতগুলি পরিবর্তন ঐ গোষ্ঠীর কয়েকটি মাত্র সদস্যকে

প্রভাবিত করে আর কতগুলি পরিবর্তন আসে সংযুক্তভাবে গোষ্ঠীর সমস্ত সদস্যের ভিতরে। একটি আয়নার সামনে একটি মোমবাতি রেখে যদি আপনি আয়নার উপর একটি কালো কাপড় ঝুলিয়ে দেন তাহলে আপনি শুধু মোমবাতির নিজ জায়গা থেকে দৃশ্যমান প্রতিফলনের পরিবর্তন করবেন। আপনি যদি চোখ বন্ধ করেন তাহলে নিজ সাপেক্ষ এর দৃষ্টিগোচরতার পরিবর্তন করছেন কিন্তু আপনি যদি এক ফুট দূরত্বে একে বেষ্টন করে একটি লাল গোলক স্থাপন করেন তাহলে এক ফুটের বেশি দূরত্বে যে কোনো জায়গাতে এর রূপের পরিবর্তন করবেন কিন্তু এ ফুটের কম দূরত্বে কোনো পরিবর্তন করবেন না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে মোমবাতির স্বতত কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলে আপনি মনে করেন না, আসলে আপনি প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখতে পান একটি ভিন্ন কেন্দ্র কিংবা একাধিক ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত কতগুলি পরিবর্তনের গোষ্ঠী রয়েছে। দৃষ্টান্ত : আপনি যখন চোখ বন্ধ করেন তখন অন্য পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে আপনার চোখই অন্যরকম দেখায় মোমবাতিটি নয়। যে পরিবর্তনগুলি ঘটছে তার কেন্দ্র রয়েছে আপনার চোখে কিন্তু মোমবাতিটা আপনি নিভিয়ে দিলে তার চেহারার পরিবর্তন হয় সর্বত্র। এ ক্ষেত্রে আপনি বলেন পরিবর্তনটা হয়েছে মোমবাতিতে। একটি বস্তুকে কেন্দ্র করে যে ঘটনাগোষ্ঠী থাকে তার সবগুলিকে যে পরিবর্তন প্রভাবিত করে সেটাই বস্তুতে সংঘটিত পরিবর্তন। এ সমস্তই সাধারণ বুদ্ধির ব্যাখ্যা এবং আয়নার ভিতরকার মোমবাতির প্রতিবিম্ব মোমবাতিটার চাইতে কম বাস্তব এ কথা বলার অর্থ ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা। ঐ জায়গার চতুর্দিকে সংশ্লিষ্ট এমন কোনো ঘটনাগোষ্ঠী নেই যেখানে ঐ প্রতিবিম্ব আছে বলে মনে হয়। প্রতিবিম্বের পরিবর্তনগুলির কেন্দ্র আসলে মোমবাতি, আয়নার পিছনের কোনো বিন্দু সে কেন্দ্র নয়। এ থেকে 'প্রতিবিম্বটি প্রতিফলন মাত্র' এই বিবৃতির নিখুঁত প্রমাণযোগ্য অর্থ পাওয়া যায়। অন্তরীক্ষের বস্তুপিণ্ডগুলি যদিও আমরা স্পর্শ করতে পারি না, শুধুমাত্র দেখতে পারি, তবুও একই সঙ্গে আমরা সেগুলিকে আয়নায় দেখা প্রতিবিম্বের চাইতে বেশি বাস্তব মনে করার সামর্থ্য লাভ করি।

এখন আমরা একটি বস্তুপিণ্ডের উপর অন্য একটি বস্তুপিণ্ডের ক্রিয়া সম্পর্কে সাধারণ বুদ্ধিজাত ধারণার ব্যাখ্যা শুরু করতে পারি। বলের অবলুপ্তি কথার অর্থ যদি আমরা সত্যিই বুঝতে চাই তাহলে এ ব্যাখ্যা আমাদের অবশ্য প্রয়োজন। ধরুন আপনি একটি অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করে ইলেকট্রিক আলোর সুইচ টিপেছেন : ঘরের সব জিনিসপত্রের চেহারা বদলে গিয়েছে। ঘরের প্রতিটি জিনিস দেখা যাচ্ছে— তার কারণ সেগুলি থেকে বিদ্যুতের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে।

ব্যাপারটার সঙ্গে আয়নার প্রতিবিম্বের বাস্তব সাদৃশ্য রয়েছে। উদ্ভূত সমস্ত পরিবর্তনের কেন্দ্র বিদ্যুতের আলো এ ক্ষেত্রে আমরা আগে যা বলেছি তাই দিয়েই [illegible] ব্যাখ্যা করা যায়। ক্রিয়া একটি গতি হলে ব্যাপারটা আরো গুরুত্বপূর্ণ। [illegible] ব্যাঙ্কের কাজের দিনের ভিড়ের মাঝে আপনি একটা বাঘ ছেড়ে দিয়েছেন। ভিড়ের সবাই ছোটাছুটি করবে। আর তাদের নানারকম গতির কেন্দ্র হবে ঐ বাঘটা। কেউ যদি লোকজন দেখতে পায়, কিন্তু বাঘটা দেখতে না পায় তাহলে সে ভাববে ওখানে বিকর্ষণ করার মতো কিছু রয়েছে। এখানে আমরা বলি ব্যাপারটার লোকগুলির উপর একটা ক্রিয়া আছে আর লোকগুলির উপর বাঘের [illegible]কে আমরা বলতে পারি বিকর্ষণকারী চরিত্রের ক্রিয়া। আমরা কিন্তু জানি, লোকগুলি পালাচ্ছে তার কারণ তাদের প্রতিটি কিছু একটা ঘটছে, শুধু বাঘ [illegible]ছে বলে তারা পালাচ্ছে তা নয়। তারা পালায় তার কারণ তারা বাঘটাকে দেখতে পায় এবং বাঘের আওয়াজ শুনতে পায়। এর কারণ কতগুলি তরঙ্গ তাদের চোখে আর কানে পৌছানো। বাঘ না থাকলেও যদি ঐ তরঙ্গগুলিকে তাদের কাছে পৌছানো যেত তাহলেও তারা একই রকম বেগে পালাত। তার কারণ পরিবেশ তাদের কাছে একই রকম অসন্তোষজনক মনে হতো।

এবার একই বিবেচনা প্রয়োগ করা যাক সূর্যের মহাকর্ষের ব্যাপারে। সূর্য যে বল প্রয়োগ করে তার সঙ্গে বাঘের প্রযুক্ত বলের পার্থক্য শুধুমাত্র এই যে বাঘের বল বিকর্ষণ করে আর সূর্যের বল আকর্ষণ করে। সূর্য আলোকতরঙ্গ কিংবা [illegible]তরঙ্গের মাধ্যমে কাজ করে না। সূর্যকে বেষ্টন করে যে স্থান-কাল, তার পরিবর্তনগুলির জন্যই সূর্য তার আপাতদৃষ্ট ক্ষমতা লাভ করে। বাঘের গর্জনের [illegible]ই সেগুলি উৎসের কাছে বেশি তীব্র। আমরা যত দূরে যাই এগুলিও তত কমতে থাকে। স্থান-কালের এই সমস্ত পরিবর্তনের কারণ সূর্য—এ কথা বললে আমাদের কিছু জ্ঞানবৃদ্ধি হয় না। আমরা জানি এই পরিবর্তনগুলি একটা নিয়ম মেনে চলে এবং তারা প্রতিসমরূপে (symmetrically) সূর্যকে কেন্দ্র করে চারদিকে গোষ্ঠীভুক্ত (grouped)। কার্যকারণের বাগ্বিধি শুধুমাত্র কিছু অবান্তর কল্পনা যোগ করে—ইচ্ছা, মাংসপেশীর টান এই জাতীয় তত্ত্বের সঙ্গে এগুলি যুক্ত। মহাকর্ষ সৃষ্টিকারী পদার্থের উপস্থিতিতে যে সঙ্কেত অনুসারে স্থান-কালের পরিবর্তন হয় সেই সঙ্কেত নির্ণয় করতে পারি মহাকর্ষ সৃষ্টিকারী পদার্থের উপস্থিতি কি রকম স্থান-কাল। যখন বিশেষ একটি অঞ্চলে স্থান-কাল নির্ভুল ইউক্লিডীয় নয় এবং তার একটি অনিউক্লিডীয় চরিত্র রয়েছে এবং একটি বিশেষ কেন্দ্রের যত নিকটতর হওয়া যায় তত সেই অনিউক্লিডীয় চরিত্র বৃদ্ধি পায় এবং যখন ইউক্লিড

থেকে বিচ্যুতি একটি বিশেষ বিধি পালন করে তখন এই অবস্থার সংক্ষিপ্ত [illegible] দিতে হলে আমরা বলি : কেন্দ্রে মহাকর্ষ সৃষ্টিকারী পদার্থ রয়েছে। কিন্তু এ [illegible] আমরা যা জানি তার একটি সংক্ষিপ্তসার। মহাকর্ষ সৃষ্টিকারী পদার্থ যে [illegible] জায়গায় নেই সেই সমস্ত জায়গা সম্পর্কে আমরা জানি। যে সমস্ত জায়গায় [illegible] সেই সমস্ত জায়গা সম্পর্কে জানি না। কার্যকারণের বাগ্বিধি ('বল' সে বাগ্বি [illegible] একটি বিশেষ ক্ষেত্র মাত্র) বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহৃত সুবিধাজনক সংক্ষিপ্ত দ্রুতলিখন পদ্ধতি (short hand) মাত্র। ভৌত বিশ্বে সত্যই যা পাওয়া যা তার কোনো প্রতিরূপ এ বাগ্বিধি নয়।

আর, পদার্থটা কি ব্যাপার? পদার্থও কি সুবিধাজনক দ্রুতলিখন পদ্ধতি ছা আর কিছু নয়? এ প্রশ্নটা খুব বড়। তার জন্য প্রয়োজন একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়।

১৪
পদার্থ কি?

পদার্থ কি? এ জাতীয় প্রশ্ন সাধারণত অধিবিদ্যাবিদরাই (metaphysi [illegible] করে থাকেন। এর উত্তর থাকে অবিশ্বাস্য রকম দুর্বোধ্য বিরাট বিরাট গ্রন্থে। আ কিন্তু এ প্রশ্ন অধিবিদ্যাবিদ হিসাবে করছি না। সে খুঁজে বার করতে চায় আধুনি পদার্থবিদ্যার নীতিবাক্য কি এবং বিশেষ করে জানতে চায় অপেক্ষবাদে নীতিবাক্য কি, এ প্রশ্ন আমি জিজ্ঞাসা করছি তার পক্ষ থেকে। পদার্থ সং আগে যে কল্পন ঠিক সে কল্পন এখন আর গ্রহণযোগ্য নয়। অপেক্ষবাদ আ যতটুকু জেনেছি তা থেকে এ তথ্য স্বতঃপ্রতীয়মান। আমার মনে হয় কল্পনকে কি হতেই হবে সে সম্পর্কে আমরা এখন কিছু কিছু বলতে পারি।

পদার্থ সম্পর্কে প্রাচীন ঐতিহ্যগত দুটি কল্পন ছিল : যখন থেকে বৈজ্ঞানি দূরকল্পন শুরু হয়েছে তখন থেকেই এই দুটি মতের সমর্থক রয়েছে। এদে ছিলেন পরমাণুবাদী। তাঁরা ভাবতেন পদার্থ এমন কতকগুলি ক্ষুদ্র পিণ্ড দিয়ে য যেগুলি আর ভাগ করা সম্ভব নয়। অনুমানকরা হতো, এগুলি নানাভাবে পরস্পর আঘাত করে নানাদিকে ছিটকে যায়। নিউটনের পর থেকে, তারা পরস্পর সত্যিকারের সংস্পর্শে আসে একথা আর ভাবা হতো না। ভাবা হতো পরস্পরকে আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ করে এবং তারা পরস্পরকে বেষ্টন ক কক্ষপথে চলমান। আর এক দল ছিলেন— তাঁর ভাবতেন কোনো না কোন প্রকারের পদার্থ সর্বত্রই আছে এবং সত্যকার শূন্যস্থান অসম্ভব, দেকার্তের এ মত ছিল। তিনি ভাবতেন গ্রহগুলির গতির কারণ ইথারের ভিতরকার ঘূ

মহাকর্ষ সম্পর্কে নিউটনীয় তত্ত্ব আবিষ্কারের পর, পদার্থের অস্তিত্ব সর্বত্র রয়েছে এই মতবাদে বিশ্বাস কমে যায়। আরো কমে এইজন্য যে নিউটন এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা ভাবতেন আলোকের কারণ উৎস থেকে বাস্তব কণার গতি। কিন্তু এই মত যখন অপ্রমাণিত হল এবং দেখা গেল আলোকতরঙ্গ দিয়ে গঠিত, তখন ঢেউ খেলবার জন্য একটা কিছু প্রয়োজন এই কারণে ইথারকে আবার বাঁচিয়ে তোলা হল। যখন দেখা গেল বিদ্যুৎচুম্বকীয় পরিঘটনাতেও ইথার একই ভূমিকা পালন করে তখন ইথারের ইজ্জত আরো বাড়ল। এমন কি এ আশাও করা গিয়েছিল যে হয়তো দেখা যাবে পরমাণু আসলে ইথারের এক রকম গতি। পদার্থ সম্পর্কীয় পারমাণবিক দৃষ্টিভঙ্গির অবস্থা এই সময়ে সবচাইতে কাহিল হয়ে পড়ে।

অপেক্ষবাদের কথা আপাতত বন্ধ থাক। আধুনিক পদার্থবিদ্যা সাধারণ পদার্থের আণবিক গঠন প্রমাণ করেছে। অথচ ইথারের সপক্ষে যুক্তিগুলি অপ্রমাণ করেনি। ইথারের কিন্তু ঐকম কোনো গঠন আছে বলে মনে করা হয় না। এর ফল ছিল দুটি দৃষ্টিভঙ্গির ভিতরে এক ধরনের আপোষ। একটি ভঙ্গি ছিল স্থূল পদার্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অন্যটি প্রযোজ্য ছিল ইথারের ক্ষেত্রে। ইলেকট্রন এবং প্রোটন সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। আমরা কিন্তু অচিরে দেখতে পাব পরমাণু সম্পর্কে যে প্রথাগত কল্পন (conceived traditionally) ইলেকট্রন প্রোটনকে সেভাবে কল্পনা করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমার মনে হয় অপেক্ষবাদের দাবী আসলে পদার্থ সম্পর্কীয় প্রাচীন কল্পন পরিত্যাগ করা। বস্তুর (substance) সঙ্গে জড়িত অধিবিদ্যা দ্বারা এ কল্পন সংক্রমিত। তাছাড়া এটা এমন একটি মতের প্রতিনিধি যে মতের পরিঘটনা বিচারে কোনো প্রয়োজন নেই— এটাই এবার আমরা অনুসন্ধান করব।

প্রাচীন মত অনুসারে, এক টুকরো পদার্থ ছিল চিরস্থায়ী এবং একই কালে তার অবস্থান একাধিক জায়গায় হতে পারত না। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি যে আগেকার লোকের বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত, এ তথ্য স্বতঃপ্রতীয়মান, তাঁরা বিশ্বাস করতেন স্থান ও কাল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। স্থান এবং কালের স্থলে স্থান-কাল প্রতিস্থাপন করলে আমরা স্বাভাবিকভাবেই আশা করব ভৌত জগৎকে যে সমস্ত উপাদান থেকে আহরণ করা হবে সেগুলি স্থানেও যেমন সীমিত, কালেও তেমনি সীমিত। এই উপাদানগুলিরই আমরা নাম দিয়েছি 'ঘটনা' (events)। একটি ঘটনা ঐতিহ্যগত পদার্থের টুকরোর মতো স্থায়ী কিংবা চলমান হয় না। ঘটনার অস্তিত্ব শুধুমাত্র তার ক্ষুদ্র মুহূর্তের জন্য। তারপরই তার সমাপ্তি। সুতরাং একটি পদার্থের টুকরো পরিণত হবে একটি ঘটনামালায়। ঠিক যেমন প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বিস্তৃত

একটি বস্তুপিণ্ড বহু বস্তুকণা দিয়ে গঠিত ছিল এখন তেমনি মনে করতে হবে। প্রতিটি বস্তুকণা একাদিক 'ঘটনা-বস্তুকণা' দিয়ে গঠিত, তার কারণ বস্তুকণা কালে প্রসারিত। বস্তুকণার ইতিহাস সম্পূর্ণ এই ঘটনামালা দিয়ে গঠিত। বস্তুকণাকে আমরা এর ঐতিহাসিক সত্ত্বা রূপ (being) মনে করি। আরা মনে করি না যে বস্তুকণা একটি অধিবিদ্যক সত্ত্বা (metaphysical entity) যার উপর ঘটনাগুলি ঘটছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন হয়েছে তার কারণ অপেক্ষবাদ আমাদের বাধ্য করেছে স্থান ও কালকে প্রাচীন পদার্থবিদ্যার তুলনায় সমতল স্তরে (more on a level) স্থাপন করতে।

এই বিমূর্ত প্রয়োজনকে অবশ্যই ভৌতজগতের জনিত ঘটনাবলীর সঙ্গে সম্পর্কিত করতে হবে। জানিত ঘটনাগুলি কি? ধরে নেওয়া যাক আলোক তরঙ্গ দিয়ে গঠিত এবং গৃহীত বেগে চলে; এ তথ্য মেনে নেওয়া হয়েছে। আমরা তাহলে স্থান-কালের যে অংশগুলিতে কোনো পদার্থ নেই সেখানে কি ঘটছে সে সম্পর্কে অনেক কিছুই জানি। অর্থাৎ আমরা জানি সেখানে পর্যাবৃত্ত ঘটনা (periodic occurrences) রয়েছে (light waves—আলোকতরঙ্গ)। সে ঘটনাগুলি বিশেষ কয়েকটি বিধি মেনে চলে। এই আলোকতরঙ্গগুলির শুরু পরমাণু থেকে। কি পরিস্থিতিতে সেগুলি শুরু হয় এবং তাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ধারিত হওয়ার কারণ কি এগুলি জানার সামর্থ্য আমরা পাই পরমাণুর গঠন সম্পর্কে আধুনিক তত্ত্ব থেকে। একটি আলোকতরঙ্গ কিভাবে ভ্রমণ করে শুধু সেটাই আমরা বার করতে পারি তাই না, আমরা সাপেক্ষ সেই আলোকতরঙ্গের উৎস কি করে চলমান, বার করতে পারি সেটাও। কিন্তু একথা বলার সময় আমি অনুমান করছি— সামান্য পৃথক দুটি কালে একটি আলোকের উৎসকে অভিন্ন বলে আমরা চিনতে পারব। এটাই কিন্তু আসল জিনিস-যে সম্পর্কে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন ছিল।

আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, একটি বিধি অনুসারে (by a law) পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত স্থান-কালের একটি কেন্দ্রের সর্বদিকে বিন্যস্ত, একটি সংযুক্ত, ঘটনাগোষ্ঠী কি করে গঠন করতে হয়। একটি ক্ষণস্থায়ী আলোর ঝলক থেকে নির্গত আলোকতরঙ্গের বিভিন্ন স্থানে পৌছানো হবে সেইরকম একটি ঘটনাগোষ্ঠী। কেন্দ্রে বিশেষ কিছু ঘটছে এরকম অনুমান করার কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই। সেখানে কি ঘটছে সেটা আমরা জানি এ অনুমান করার কোনো প্রয়োজনই নেই। যা আমরা জানি তা হল : আলোচ্য ঘটনাগোষ্ঠী একটি কেন্দ্রের সবদিকে জ্যামিতির রীতিতে বিন্যস্ত—মাছি একটা পুকুর ছুঁলে যেরকম প্রসারমান ঢেউ হয়— সেই রকম। কেন্দ্রে কি হয়ে থাকতে পারে সে সম্পর্কে অনুমানসাপেক্ষ

একটি ঘটনা আবিষ্কার করতে পারি এবং পরবর্তী অস্থিরতা কি করে প্রেরিত হয় তা সম্পর্কে বিধিও গঠন করতে পারি। সাধারণ বুদ্ধিতে তখন মনে হবে এই অনুমানাত্মক ঘটনাই অস্তিরতার কারণ। যে বস্তুকণা ঐ অস্থিরতার কেন্দ্রের অধিকারী বলে অনুমান করা হয়েছিল সেই বস্তুকণার জীবনীর একটি ঘটনা বলেও তাকে গণিত হবে।

আমরা দেখছি একটি কেন্দ্র থেকে একটি বিশেষ বিধি অনুসারে শুধুমাত্র একটি আলোকতরঙ্গই বহিঃর্মুখী গমন করে না বরং সাধারণত খুব ঘনিষ্ঠভাবে সমরূপ একাধিক আলোকতরঙ্গ তাকে অনুসরণ করে। উদাহরণ : ঝড়ের হাওয়ায় সামনে দিয়ে একটা মেঘ উড়ে গেলেও সূর্য সহসা তার রূপ পরিবর্তন করে না, পরিবর্তন দ্রুত হলেও ক্রমান্বয়িক। এইভাবে স্থান-কালের একটি বিন্দুতে অবস্থিত একটি কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত একটি ঘটনাগোষ্ঠীর স্থান-কালের নিকটস্থ বিন্দুকেন্দ্রিক অত্যন্ত সমরূপ অন্য ঘটনাগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অন্য গোষ্ঠীগুলির প্রতিটির কেন্দ্র দখল করে রয়েছে সমরূপ অনুমানাত্মক ঘটনা : এ আবিষ্কার হয় সাধারণ বুদ্ধিতে। সাধারণ বুদ্ধি আরও বলে : এই সমস্ত অনুমাণাত্মক ঘটনাবলী একই ইতিহাসের অংশ। অর্থাৎ সাধারণ বুদ্ধি একটি অনুমানাত্মক বস্তুকণা আবিষ্কার করে এবং ভাবে ঐ অনুমানাত্মক ঘটনাগুলি ঘটেছে ঐ বস্তুপিণ্ডে। অর্থাৎ পুরানো অর্থে যাকে পদার্থ বলা যায় তার কাছাকাছি কোথাও পৌছাতে গেলে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় দুটি অনুমান (hypothesis) ব্যবহার করতে হয়।

অপ্রয়োজনীয় অনুমান এড়াতে হলে আমরা বলব : একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে পরমাণু হল—পরিবেষ্টনকারী মাধ্যমের নানা অস্থিরতা (disturbances)। সাধারণ ভাষায় হলে বলা হতো এই অস্থিরতার 'কারণ' ঐ পরমাণু। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে তা আলোচ্য মুহূর্ত সেই সময়কার এই অস্থিরতাগুলি আমরা ধরব না তার কারণ তাহলে আমাদের পর্যবেক্ষকের উপর নির্ভর করতে হবে। তার পরিবর্তে আমরা আলোকের গতিতে পরমাণু থেকে বহিঃর্মুখে গমন করব এবং প্রতিটি জায়গায় পৌছে যা যা অস্থিরতা দেখতে পাব সেগুলিই আমরা ধরব। যেগুলির অস্তিত্ব সামান্য আগে কিংবা পরে পাওয়া যায় সেরকম প্রায় এককেন্দ্রিক ঘনিষ্ঠভাবে সমরূপ অস্থিরতার ঝাঁক (set of disturbances) সামান্য অগ্রবর্তী কিংবা পরবর্তী মুহূর্তের পরমাণুরূপে সংজ্ঞিত হবে। এইভাবে আমরা অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প কিংবা অনুমিত সত্ত্বা (inferred entity) ছাড়াই পদার্থবিদ্যার সমস্ত বিধিকেই রক্ষা করি এবং মিতব্যয়ের যে নীতি অপেক্ষবাদকে অপ্রয়োজনীয় জঞ্জাল পরিষ্কারের সামর্থ্য দান করেছে সেই মিতব্যয়িতার সঙ্গে আমরা সামঞ্জস্য রক্ষা করি।

সাধারণ বুদ্ধি কল্পনা করে : যখন সে একটা টেবিল দেখতে পায় তখন সে একটা টেবিলই দেখে। এটা একটা স্থূল (gross) বিভ্রম (delusion)। যখন বিশেষ আলোকতরঙ্গ তার চোখে পৌছায় তখন সাধারণ বুদ্ধি একটা টেবিল দেখতে পায়। সেই আলোকতরঙ্গগুলি এমন যে অতীত অভিজ্ঞতায় সেগুলির সঙ্গে বিশেষ এক ধরনের স্পর্শবোধের সম্পর্ক ছিল। তাছাড়া ছিল অন্য লোকের সাক্ষ্য : তারাও টেবিলটা দেখেছিল। কিন্তু এর কোনোটিই কখনো আমাদের তরঙ্গ সত্ত্বার (matter it self) কাছে নিয়ে যায়নি। আলোকতরঙ্গ আমাদের চোখে একাধিক ঘটনা ঘটিয়েছে। এই ঘটনাগুলি নেত্রক স্নায়ুতে (optice nerve) কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়েছে। এই ঘটনাগুলি আবার কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়েছে মস্তিষ্কে। প্রচলিত প্রাথমিক প্রক্রিয়া ছাড়া এর যে কোনো একটি ঘটলেই আমাদের ভিতরে 'টেবিলটা দেখার' বোধ নিয়ে আসত। এমনকি কোনো টেবিল যদি না থাকত তাহলেও (অবশ্য সাধারণভাবে বস্তুর ব্যাখ্যা যদি হয় কতগুলি ঘটনাগোষ্ঠী, তাহলে চক্ষু নেত্রক স্নায়ু এবং মস্তিষ্ক সম্পর্কেও এ ব্যাখ্যা প্রযোজ্য)। আমরা যখন আঙুল দিয়ে টেবিলে চাপ দিই তখন যে স্পর্শবোধ হয় সেটা আসলে আমাদের আঙুলের প্রান্তের ইলেকট্রন এবং প্রোটনের বৈদ্যুতিক অস্থিরতা। আধুনিক পদার্থবিদ্যা অনুসারে এর কারণ টেবিলের ইলেকট্রন আর প্রোটনের সান্নিধ্য। অন্য কোনোভাবে যদি আমাদের আঙুলের প্রান্তে একই অস্থিরতা হতো তাহলে কোনো টেবিল না থাকলেও একই বোধ হতো। অপরের সাক্ষ্য স্পষ্টতঃ পরের কাছ থেকে শেখা। আদালতে কোনো সাক্ষীকে যদি জিজ্ঞাসা করার হয় যে সে একটা ঘটনা দেখেছে কিনা তাহলে এরকম উত্তর তাকে দিতে দেওয়া হবে না যে : সে নিশ্চয় দেখেছে বলেই তার মনে হয় তার কারণ ঐ দেখা বিষয়ে একাধিক অন্য লোকের সাক্ষ্য রয়েছে। সে যাই হোক—কতগুলি শব্দতরঙ্গ দিয়ে সাক্ষ্য গঠিত। এর মনস্তাত্ত্বিক এবং ভৌত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সুতরাং বস্তুর সঙ্গে এর সম্পর্ক খুবই পরোক্ষ। এইসব কারণের জন্য আমরা বলি একটি লোক একটি টেবিল দেখছে তখন আমরা জটিল এবং কঠিন অনুমিত (inferness) গোপন করে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটি অভিব্যক্তি ব্যবহার করি। এ অনুমানগুলির সত্যতা প্রশ্নাতীত নয়।

কিন্তু আমাদের মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্নে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সম্ভব হলে এগুলি আমাদের এড়িয়ে চলা উচিত। সুতরাং শুদ্ধ ভৌতদৃষ্টিভঙ্গিতে ফিরে আসা যাক।

যে ইঙ্গিত আমি করতে চাই সেটা নিম্নলিখিতরূপে বলা যায়। পদার্থের অস্তিত্বের দরুন অন্য স্থানে যা কিছু ঘটে অন্তত তত্ত্বের দিক দিয়ে সে সমস্ত

পরীক্ষার সাহায্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা যায়—অবশ্য সেগুলি যদি বিশেষ গোপন কোনো পদ্ধতিতে না ঘটে। পরমাণুকে জানা যায় তার অভিক্রিয়ার সাহায্যে। কিন্তু 'অভিক্রিয়া' শব্দটি কার্যকারণ তত্ত্বের যে দৃষ্টিভঙ্গির অংশ তার সঙ্গে আধুনিক পদার্থবিদ্যার সঙ্গতি নেই, বিশেষ করে সঙ্গতি নেই অপেক্ষবাদের সঙ্গে। যা আমাদের বলার অধিকার আছে সেটা শুধুমাত্র এই : কিছু ঘটনাগোষ্ঠী একত্র ঘটে অর্থাৎ স্থান-কালের সন্নিকট অংশে ঘটে। একজন পর্যবেক্ষক একটি ঘটনাগোষ্ঠীর একটি অপর ঘটনার পূর্বে ঘটেছে ভাববেন কিন্তু অন্য পর্যবেক্ষক কাল-ক্রম ভিন্নভাবে বিচার করবেন। এমন কি যখন সমস্ত পর্যবেক্ষক সাপেক্ষই কালের ক্রম অভিন্ন তখনও আমরা শুধু বলতে পারি দুটি ঘটনার ভিতরে সম্পর্ক রয়েছে। সে সম্পর্ক অগ্রবর্তী এবং পশ্চাদ্বর্তী দু'রকমই হতে পারে। অতীত ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করে— একথা কোনো অর্থে ভবিষ্যৎ অতীতকে নিয়ন্ত্রণ করে এই কথার চাইতে পৃথক : এ তথ্য সত্য নয়। আপাতদৃষ্ট পার্থক্য শুধু আমাদের অজ্ঞতার জন্য। সে অজ্ঞতার কারণ অতীতের চাইতে ভবিষ্যতের জ্ঞান আমাদের অল্প। ব্যাপারটা কিন্তু নেহাৎই আকস্মিক : এমন জীবও থাকতে পারত যারা ভবিষ্যৎ মনে রাখতে পারে এবং অতীত যাদের অনুমান করতে হয়। এই সমস্ত ব্যাপারে ঐ জীবদের মনোভাব হতো আমাদের ঠিক বিপরীত—তা বলে মনোভাব সমাত্মক হতো না।

স্পষ্ট বোঝা যায়, পদার্থ কয়েকটি ঘটনা গোষ্ঠী ছাড়া অন্য কিছু এ অনুমান না করেও পদার্থবিদ্যার তথ্য এবং তত্ত্বও ব্যাখ্যা করা সম্ভব। প্রতিটি ঘটনাই এমন যে সেগুলির কারণ আলোচ্য পদার্থ—একথা আমাদের পক্ষে ভাবা স্বাভাবিক। এর জন্য পদার্থবিদ্যার কোনো প্রতীক (symbol) কিংবা সঙ্কেত (formula) পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না : প্রশ্নটি শুধুমাত্র প্রতীক ব্যাখ্যার।

ব্যাখ্যার এই স্বাধীনতা গাণিতিক পদার্থবিদ্যার বৈশিষ্ট্য। কতকগুলি অত্যন্ত বিমূর্ত যৌক্তিক সম্পর্ক আমরা জানি। সে সম্পর্ক আমরা প্রকাশ করি গাণিতিক সঙ্কেতের মাধ্যমে। আমরা জানি কয়েকটি ক্ষেত্রে এমন ফল পাওয়া যায়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাহায্যে যার সত্যাসত্য নির্ণয় সম্ভব। উদাহরণ : জ্যোতির্বিজ্ঞানের সেই সমস্ত পর্যবেক্ষণ যেগুলির সাহায্যে আলোকের আচরণ সম্পর্কে অপেক্ষাবাদের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। যে সমস্ত সঙ্কেতের সত্যাসত্য প্রমাণের প্রয়োজন ছিল সেগুলি আন্তঃগ্রহস্থানে আলোকের গতিপথ বিষয়ে। যদিও সঙ্কেতগুলির যে অংশ থেকে পর্যবেক্ষণ করা ফল পাওয়া যায় সে অংশের ব্যাখ্যা সব সময় একভাবেই করতে হবে তবুও অন্য অংশের কিন্তু নানারকম ব্যাখ্যা

সম্ভব। যে সঙ্কেতগুলির সাহায্যে গ্রহের গতি আহরণ করা যায় সেগুলি আইনস্টাইনের তত্ত্বে এবং নিউটনীয় তত্ত্বে প্রায় সম্পূর্ণ অভিন্ন, কিন্তু সঙ্কেতগুলির অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাধারণত গাণিতিক বিচারে আমরা আমাদের সঙ্কেতগুলির আসন্ন নির্ভুলতা (approximately correct) বিষয়ে অনেক বেশি নিশ্চিত হতে পারি কিন্তু সেগুলির বিভিন্ন ব্যাখ্যার নির্ভুলতা সম্পর্কে অতটা নিশ্চিত হতে পারি না। সেই জন্য এ অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে, ইলেকট্রন এবং প্রোটনের চরিত্র কি সে প্রশ্নের উত্তর কোনোক্রমেই পাওয়া যায় না। এমন কি এদের গতির বিধি সম্পর্কে আর পরিবেশের এবং এদের পারস্পরিক ক্রিয়া সম্পর্কে গাণিতিক পদার্থবিদ্যার যা বক্তব্য তার সমস্তটা আমাদের জানা থাকলেও এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। আমাদের প্রশ্নের নির্দিষ্ট নিশ্চিত এবং সিদ্ধান্তমূলক উত্তর সম্ভব নয়। তার কারণ শুধু এই : অনেক রকম উত্তরই গাণিতিক পদার্থবিদ্যার সত্যের সঙ্গে সুসঙ্গত। তবুও কতগুলি উত্তর অন্যগুলির চাইতে ভাল লাগে তার কারণ, কতগুলির সম্ভাব্যতা অন্যগুলির চাইতে বেশি। এই অধ্যায়ে আমরা চেষ্টা করেছি পদার্থের সংজ্ঞা দিতে। সে সংজ্ঞা এমন হবে যে পদার্থবিদ্যার সঙ্কেতগুলি যদি সত্য হয় তাহলে সেই সংজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটা জিনিস থাকতেই হবে। আমাদের সংজ্ঞা যদি হতো এমন যে লোকে যা ভাবে পদার্থের একটি কণা তাই হতো, অর্থাৎ হতো প্রকৃত বাস্তব (substantial) কঠিন (hard) নির্দিষ্ট নিশ্চিত পিণ্ড তাহলে আমরা সেরকম একটা জিনিসের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হতাম না। সেইজন্যই যৌক্তিক মিতব্যয়িতা এবং বৈজ্ঞানিক সাবধানতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের সংজ্ঞা জটিল মনে হলেও অধিকতর গ্রহণীয়।

১৫
দার্শনিক ফলাফল

অনেক সময় যেরকম ভাবা হয়, অপেক্ষাবাদের দার্শনিক ফলাফল সেরকম বিরাটও নয় কিংবা সেরকম চমকপ্রদও নয়। বাস্তববাদ এবং ভাববাদে দ্বন্দ্বের মতো চিরায়ত মর্যাদা যে দ্বন্দ্বগুলির রয়েছে সেগুলির উপর অপেক্ষাবাদের সামান্যই আলোকপাত করে। কান্টের ধারণা ছিল স্থান এবং কাল ব্যক্তিনিষ্ঠ (subjective) এবং একাধিকরূপ স্বজ্ঞা (forms of intuition)। অনেকে ভাবেন অপেক্ষবাদ এ বিষয়ে কান্টের সমর্থক। আমার ধারণা অপেক্ষবাদ সম্পর্কে লেখকরা যেভাবে পর্যবেক্ষকের কথা বলেন তার জন্যই লোকে বিপথগামী হয়েছে। পর্যবেক্ষক একজন মানুষ-অন্ততপক্ষে একটি মন-এ কথা ভাবা স্বাভাবিক

কিন্তু একটি ফটোগ্রাফের প্লেট কিংবা একটি ঘড়িরও পর্যবেক্ষক হওয়ার সম্ভাবনা একই রকম, অর্থাৎ একটি দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গির দ্বন্দ্বের জন্য যে বিষম ফল হয় সে ফল জড়িত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে। ব্যাপারটা অনুভূতিসম্পন্ন মানুষের ক্ষেত্রে যতটা প্রযোজ্য, ততটাই প্রযোজ্য ভৌত যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে। অপেক্ষবাদের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিনিষ্ঠতা আসলে ভৌত ব্যক্তিনিষ্ঠতা। বিশ্বে যদি মন কিংবা বোধ না-ও থাকত তাহলেও এ ব্যক্তিনিষ্ঠতা থাকত।

তাছাড়া, এ ব্যক্তিনিষ্ঠতা কঠোরভাবে সীমিত। সবকিছু আপেক্ষিক এরকম ঘোষণা এ তত্ত্ব করে না। বরং উল্টো। কোনটা আপেক্ষিক এবং কোনটা নিজস্ব অধিকারে ভৌত ঘটনার অংশ সেটা নির্ণয়ের কৌশল পাওয়া যায় অপেক্ষবাদ থেকে। আমরা যদি বলতে যাই স্থান ও কাল বিষয়ে এ তত্ত্ব কান্টকে সমর্থন করে তাহলে আমরা বলতে বাধ্য যে স্থান-কাল বিষয়ে এ তত্ত্ব কান্টকে খণ্ডন করে। আমার মতে এগুলির কোনোটিই সঠিক নয়। এই সমস্ত বিষয়ে দার্শনিকরা কেন পূর্বেকার মতে স্থির থাকবেন না তার কোনো কারণ আমি খুঁজে পাই না। কোনো পক্ষেই প্রামাণ্য কোনো যুক্তি এর আগে উপস্থিত করা হয়নি। এখনো কোনো যুক্তি নেই। সুতরাং কোনো একটি মতকে আঁকড়ে থাকা বৈজ্ঞানিক মেজাজের লক্ষণ নয়, লক্ষণ মতান্ধতার।

তবুও, অপেক্ষবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিন্তাধারা যখন সুপরিচিত হবে তখন আমাদের চিন্তার অভ্যাসের কতগুলি পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্কুলে যখন অপেক্ষবাদ পড়ানো হবে তখন এ তত্ত্বের পরিচিতি বাড়বে, ভবিষ্যতে এর গুরুত্ব হবে বিরাট।

একটি তথ্য প্রকাশিত হয়েছে : আমরা যা ভাবতাম, ভৌত জগৎ সম্পর্কে পদার্থবিদ্যা আমাদের তার চাইতে অনেক কম সংবাদ দিতে পারে। চিরায়ত পদার্থবিদ্যার মহান নীতিগুলির বেশিরভাগই হয়ে দাঁড়ায় সেই মহান বিধির মতো 'এক গজে তিন ফুট সবসময়ই হয়'। তাছাড়া দেখা যায় অন্যগুলি সর্বৈব মিথ্যা। একটি বিধির যে এই দুরকম দুর্ভাগ্যেরই আশঙ্কা রয়েছে তার একটি উদাহারণ ভরের নিত্যতা বিধি (conservation of mass)। আগে ভরের সংজ্ঞা ছিল 'পদার্থের পরিমাণ'। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল ওর কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু আধুনিক মাপনের নির্ভুলতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভূত সব ব্যাপার ঘটতে দেখা গেল। প্রথমত লক্ষ্য করা গেল মাপিত ভর বেগের সঙ্গে বৃদ্ধি পায় এবং আবিষ্কৃত হল এই ধরনের ভর এবং শক্তি আসলে অভিন্ন। একটি বস্তুপিণ্ড সাপেক্ষ এই ধরনের ভর নিত্য নয়। এই বিধিকে কিন্তু স্বতত একটি স্বয়ংসিদ্ধ সত্য (truism)

রূপে বিচার করা উচিত, অনেকটা 'এক গজে তিন ফুট হয়' এইরকম বিধির মতো। আসলে এটা আমাদের মাপন পদ্ধতির ফলস্বরূপ। পদার্থের সত্য ধর্ম থেকে প্রকাশ পায় না, বস্তুপিণ্ডের সঙ্গে চলমান পর্যবেক্ষক যে ভর দেখতে পান সে ভর অন্য ধরনের কিন্তু সেটাই সঠিক ভর (proper mass)। এটা হল সাধারণ পার্থিব ক্ষেত্র। এ ক্ষেত্রে যে বস্তুপিণ্ড আমরা ওজন করছি সেটা হাওয়ার ভিতর দিয়ে উড়ছে না। একটি বস্তুপিণ্ডের সঠিক ভর প্রায় নিত্য কিন্তু সম্পূর্ণ নিত্য নয়। লোকে ভাবে, আপনার যদি চারটি এক পাউন্ডের বাটখারা থাকে আর আপনি যদি সব কটাকে ওজন কলে চাপান তাহলে সেগুলির মোট ওজন হবে চার পাউন্ড। এটা একটা পছন্দসই ভ্রম। ওজনটা কমই হবে, কিন্তু কমের মাত্রা এমন বেশি নয় যে সবচাইতে সতর্ক মাপনে ধরা পড়বে। তবে যেখানে চারটা হাইড্রোজেন পরমাণুকে একত্র করে একটি হিলিয়াম পরমাণু বানানো হয় সেখানে দোষটা ধরা করা যায়। একটি হিলিয়াম পরমাণুর ওজন চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর চাইতে কম-এই হ্রাসপ্রাপ্তি মেপে বার করা সম্ভব।

মোটামুটি বলা যায় চিরায়ত পদার্থবিদ্যা দুটি অংশে ভেঙে পড়েছে স্বতঃসিদ্ধ সত্য (truism) এবং ভূগোল।

অপেক্ষবাদ যে বিশ্বকে আমাদের কল্পনে উপস্থিত করেছে সে বিশ্ববস্তু এমন গতির ততটা নয়, যতটা ঘটনার। একথা সত্য যে এখনো এমন সমস্ত বস্তুকণা রয়েছে যেগুলিকে স্থায়ী মনে হয় কিন্তু (আগের অধ্যায়ে আমরা যেরকম দেখেছি) আসলে এগুলিকে কল্পনা করা উচিত পরস্পর সংযুক্ত ঘটনামালা রূপে, অনেকটা গানের পারস্পরিক স্বরের মতো। ঘটনাই আপেক্ষিক পদার্থবিদ্যার উপাদান। ব্যাপক এবং বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ অনুসারে দুটি ঘটনা যদি পরস্পর থেকে বেশি দূরবস্থিত না হয় তাহলে তাদের ভিতরে একটা মাপনযোগ্য সর্ম্পকে থাকে, সে সম্পর্কের নাম 'অন্তত'। এই অন্তরই ভৌত বাস্তববতারূপে দেখা দেয়, কালিক এবং স্থানিক দূরত্ব এই অন্তরেরই বিভ্রান্তিকর প্রতিরূপ। পরস্পর থেকে দূরবর্তী দুটি ঘটনার কোনো নির্দিষ্ট নিশ্চিত অন্তর নেই। কিন্তু একটি ঘটনা থেকে অন্য ঘটনায় যাওয়ার একটি পথ আছে। সে পথে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্তরের যোগফল অন্য যে কোনো পথের সমরূপ যোগফলের চাইতে বেশি। এই পথের নাম 'ধরাকৃতি'—একটি বস্তুপিণ্ডকে যদি তার নিজস্বতার উপর ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে সে এই পথই গ্রহণ করবে।

আপেক্ষিক পদার্থবিদ্যার সমস্তটা আগেকার দিনের পদার্থবিদ্যা এবং জ্যামিতির তুলনায় অনেক বেশি পারস্পরিক সোপানরোহণের বিষয় (step by

...ter) । ইউক্লিডীয় ঋজুরেখার স্থলে প্রতিস্থাপন করতে হবে আলোকরশ্মি । আলোকরশ্মি যখন সূর্য কিংবা ঐরকম ভারী বস্তুপিণ্ডের কাছ দিয়ে যায় তখন ঠিক ঋজুতার ইউক্লিডীয় মান রক্ষা করে না । শূন্যস্থানের খুব ক্ষুদ্র অঞ্চলে একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের যোগফল এখনো দুই সমকোণ ভাবা হয় কিন্তু বিস্তৃত কোনো অঞ্চলে একথা ভাবা হয় না । কোথাও এমন কোনো জায়গা পাওয়া যায় না যেখানে ইউক্লিডীয় জ্যামিতি নির্ভুলভাবে সত্য । যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা (proposition) যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা হতো এখন সেগুলি হয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, ভ্রান্তি, নয়তো পর্যবেক্ষণের দ্বারা প্রমাণিত আসন্ন সত্য (approximate truths) মাত্র ।

যুক্তি যত উন্নত হয় তার বাস্তব ঘটনা প্রমাণ করার ক্ষমতা তত কমে-এরকম অদ্ভুত ঘটনার দৃষ্টান্ত শুধু অপেক্ষবাদই নয় । আগে মনে করা হতো যুক্তি আমাদের শিক্ষা দেয় কি করে অনুমিতি (inference) আহরণ করতে হয়, এখন বরং শিক্ষা দেয় কি করে অনুমিতি আহরণ করা না যায় । শিশু এবং জন্তু অত্যন্ত অনুমিতি প্রবণ । অনভ্যস্ত স্থানে মোড় ঘুরলে ঘোড়া অপরিমিতি বিস্ময় বোধ করে । মানুষ যখন যুক্তি প্রয়োগ করতে শুরু করেছে তখন সে অতীত যুগে চিন্তা না করে যে সমস্ত অনুমিতি আহরণ করেছিল সেগুলির যৌক্তিকতা দেখানোর চেষ্টা করেছে । এই প্রবণতা থেকে প্রচুর পরিমাণ মন্দ দর্শন এবং মন্দ বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে । 'প্রকৃতির সমরূপত্ব' কিংবা 'ব্রহ্মাণ্ডীয় কার্যকরণ বিধি'র মতো মহান নীতিগুলি আসলে অতীতে যা বার বার ঘটেছে, ভবিষ্যতেও তাই ঘটবে-আমাদের এই বিশ্বাসকে দৃঢ় করার চেষ্টা । এ বিশ্বাসের ভিত্তি-আপনি সাধারণত যে দিকে বাঁক নেন সেই দিকেই বাঁক নেবেন-ঘোড়ার এই বিশ্বাসের চাইতে কোনোক্রমেই দৃঢ়ভিত্তিক নয় । এই মেকি নীতির (pseudo principle) স্থলে বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে কি প্রতিস্থাপিত হবে সে সম্পর্কে পুর্বাভাস দেওয়া খুব সহজ নয় তবে অপেক্ষবাদ হয়তো আমরা কি আশা করতে পারি সে সম্পর্কে একটা আভাস দিতে পারে । তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় প্রাচীন অর্থে-কার্য-কারণ তত্ত্বের (causation) আর কোনো স্থান নেই । অন্য একটা কিছু অবশ্যই তার স্থান গ্রহণ করেছে । প্রাচীন নীতিগুলিকে বাতিল করেছে এই প্রতিকল্প (substitute) । কিন্তু যাকে বাতিল করা হয়েছে তার তুলনায় এ প্রতিকল্পের পরীক্ষামূলক ভিত্তি দৃঢ়তর ।

একটি সর্বব্যাপক কালের মাধ্যমে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সমস্ত ঘটনার দিনাঙ্ক নির্ণয় সম্ভব, এ বিশ্বাস ভেঙে পড়েছে । ভবিষ্যতে এর প্রতিক্রিয়া, কার্যকারণ তত্ত্ব, বিবর্তন এবং অন্যান্য অনেক বিষয় আমাদের মতকে প্রভাবিত করবে । দৃষ্টান্ত :

মোটের উপর ব্রহ্মাণ্ডে প্রগতি হচ্ছে কিনা এ প্রশ্নের অনেকটাই নির্ভর করে আমাদের কালের মাপন নির্বাচনের উপর। একই রকম উত্তম একাধিক মাপের ভিতর থেকে যদি আমরা একটিকে বেছে নিই তাহলে আমরা হয়তো দেখব প্রগতি সবচাইতে বিষাদগ্রস্ত শ্লাভ (slave) যা কল্পনা করতে পারে সেইরকম দ্রুত চলেছে মন্দ থেকে মন্দতরতে। সুতরাং আশাবাদ কিংবা নৈরাশ্যবাদ সত্যও নয় মিথ্যা নয়। তারা শুধু ঘড়ির নির্বাচন নির্ভর।

কতকগুলি ভাবাবেগের উপর এর ক্রিয়া সম্পূর্ণ ধ্বংসাত্মক। কবি সে সম্পর্কে বলেন :

একটি দূরতর ভাগবৎ ঘটনা
যার অভিমুখে চলেছে মহাসৃষ্টি

কিন্তু ঘটনাটি যদি যথেষ্ট দূরবর্তী হয় এবং সৃষ্টি যদি যথেষ্ট দ্রুতগামী হয় তাহলে কোনো অংশ ভাববে ঘটনাটি আগেই ঘটেছে আবার কোনো কোনো অংশ ভাববে ঘটনাটি এখনো ভবিষ্যতের গর্ভে। ফলে সম্পূর্ণ কবিতাটাই নষ্ট হয়। দ্বিতীয় লাইন হওয়া উচিত :

যার অভিমুখে সৃষ্টির কোনো কোনো অংশ চলমান আর কোনো অংশ চলমান তার বিপরীত মুখে।

কিন্তু এতে চলবে না। যে ভাবাবেগ সামান্য গণিতের চাপে ধ্বংস হতে পারে আমার মতে সে ভাবাবেগ খাঁটিও নয়, মূল্যবানও নয়। কিন্তু এই জাতীয় ত্রুটি আমাদের ভিক্টোরীয় যুগের সমালোচনার পথে নিয়ে যাবে। সেটা কিন্তু আমার বিষয়বস্তু বাইরে।

আমি আবার বলছি : ভৌত জগৎ সম্পর্কে আমরা যা জানি সেটা আগে না ভাবা হতো তার চাইতে অনেক বেশি বিমূর্ত। বস্তুপিণ্ডগুলির মধ্যবর্তী রয়েছে ঘটনা, যেমন আলোকতরঙ্গ। এগুলির বিধি সম্পর্কে আমরা কিছুটা জানি গাণিতিক সঙ্কেতে যতটা জানা যায় এ বিষয়ে ততটাই আমাদের জ্ঞান কিন্তু তাদের চরিত্র সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি বস্তুপিণ্ডগুলি স্বতত কি সে সম্পর্কে আমরা এত কম জানি যে কিছু আছে কি না সে সম্পর্কেও আমরা নিশ্চিত হতে পারি না : হয়তো তারা অন্য জায়গায় সংঘটিত ঘটনাগোষ্ঠী মাত্র। সেই ঘটনাগুলিকে আমরা স্বভাবতই তাদের ক্রিয়া বলে ভাবব। স্বভাবতই আমরা বিশ্বকে ব্যাখ্যা করি চিত্রের মতো। আমরা কল্পনা করি আমরা যা দেখি ব্যাপারটা প্রায় সেই রকমই ঘটে। আসলে কিন্তু সাদৃশ্য শুধুমাত্র কিছু রীতিগত যৌক্তিক ধর্ম পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। তারা প্রকাশ করে অবয়ব

যায় তাহলে আমরা এর পরিবর্তনের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য মাত্র জানতে পারি। একটা দৃষ্টান্ত বোধ হয় ব্যাপারটাকে সহজ করতে পারে। একটা ঐকতান বাদন আর সেই একই ঐকতানের স্বরলিপির ভিতরে একটা বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। একে বলা যেতে পারে অবয়বের সাদৃশ্য। সাদৃশ্য এমন যে নিয়মটা জানা থাকলে স্বরলিপি থেকে সুরটা বোঝা যায়-আবার সুর থেকে স্বরলিপি বোঝা যায়। কিন্তু অনুমান করুন আপনি জন্ম থেকে সম্পূর্ণ বধির কিন্তু থেকেছেন গাইয়ে বাজিয়েদের সঙ্গে। কথা বলা এবং অপরের ঠোঁট নাড়া দেখে তার কথা বোঝা (lip reading) শিখে থাকলে আপনি বুঝতে পারতেন স্বরলিপিগুলি এমন একটি বিন্যাসের প্রতিরূপ যা স্বতত তাদের চাইতে পৃথক অথচ তাদের অবয়ব* একই রকম। সুরের মূল্যবোধ আপনার কাছে অকল্পনীয় হতো কিন্তু তার গাণিতিক বৈশিষ্ট্য আপনি সবটাই বুঝতে পারতেন। তার কারণ স্বরলিপির সঙ্গে তার পূর্ণ মিল রয়েছে। প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানও অনেকটা এই রকম। স্বরলিপি আমরা পড়তে পারি। আমাদের সম্পূর্ণ বধির লোকটি সুর যতটা অনুমান করতে পারেছিল প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা ততটাই অনুমান করতে পারি। কিন্তু গাইয়ে বাজিয়েদের সঙ্গে সাহচর্যের ফলে ঐ লোকটির যে সুবিধা ছিল আমাদের সে সুবিধা নেই। আমরা জানতে পারি না স্বরলিপিটা যে সুরের প্রতিরূপ সে সুর সংগীত না সুন্দর। হয়তো শেষ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করে আমরা নিশ্চিত হতে পারব যে স্বরলিপিটা তার নিজস্ব রূপ না আর কিছু। কিন্তু একজন পদার্থবিদ্যাবিদ তাঁর ব্যবসায়িক পদাধিকারে এ সন্দেহ পোষণ করতে পারেন না।

পদার্থবিদ্যার সপক্ষে যদি সবচাইতে বেশি দাবীও করা যায় তাহলেও এ কথা বলা যায় না যে পদার্থবিদ্যা বলতে পারে যেটা পরিবতর্তিত হচ্ছে সেটা কি, কিংবা কি এর বিভিন্ন অবস্থার। পদার্থবিদ্যা শুধুমাত্র বলতে পারে একাধিক পরিবর্তন পরস্পরকে পর্যাবৃত্তিক্রমে (periodically) অনুসরণ করে কিংবা একটি বিশেষ দিকে বিস্তার লাভ করে। শুদ্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মর্মস্থলে পৌছাতে হলে শুদ্ধ কল্পনার আবরণ সম্পূর্ণ খুলে ফেলতে হয়। সে কাজ এখনো বোধ হয় আমরা শেষ করতে পারিনি। এ ব্যাপারে অপেক্ষবাদ অতি বিরাট কর্ম সম্পাদন করেছে। এই কাজ করতে গিয়ে অপেক্ষবাদ ক্রমশই আমাদের নগ্ন কাঠামোর (bare structure) নিকটতর করেছে। এটাই গণিতবেত্তার (mathematician) লক্ষ্য। তার কারণ এ নয় যে মানুষ হিসাবে এটাই তার একমাত্র আকর্ষণ।

---

* অবয়বের সংজ্ঞার জন্য এই লেখকের 'গাণিতিক দর্শনের ভূমিকা' দেখুন।

আসলে তার কারণ হল : গাণিতিক সঙ্কেতে সে এই একটি জিনিসই [illegible] করতে পারে। বিমূর্তনের (abstraction) দিকে আমরা অনেকটা এগিয়েছি [illegible] নেই কিন্তু হয়তো আমাদের অগ্রসর হতে হবে আরো।

আগের অধ্যায়ে আমি পদার্থের সর্বনিম্ন সংজ্ঞা যাকে বলা যেতে পারে [illegible] একটা আভাস দিয়েছিলাম। অর্থাৎ বলতে গেলে সে সংজ্ঞায় সর্বনিম্ন বস্তু [illegible] কিন্তু সে বস্তুতে (substance) শুধুমাত্র তাই থাকবে যা পদার্থবিদ্যার সঙ্গে [illegible] সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই সংজ্ঞা গ্রহণ করা আসলে আমাদের নিরাপত্তার প্রচেষ্টা। [illegible] আরো স্থূল কিছুর অস্তিত্ব থাকে তবুও আমাদের সূক্ষ্ম পদার্থের অস্তিত্ব [illegible] আমাদের পদার্থের সংজ্ঞাকে আমরা জেন অস্টেনের (Janc austen) ইসাবেলা জাউভাতের (Isabella's gruel) মতো করতে চেষ্টা করেছি-'পাতলা, কিন্তু [illegible] পাতলা নয়'। আমরা যদি সজোরে সুস্পষ্ট ঘোষণা করি 'পদার্থ এর চাইতে [illegible] কিছু নয়' তাহলে কিন্তু আমরা ভুল করব। লাইবনিজ (Leibnitz) [illegible] একটুকরো পদার্থ আসলে কতকগুলি আত্মার উপনিবেশ (colony of soul) [illegible] তিনি ভুল করেছিলেন একথা প্রমাণ করার মতো কিছু নেই। তবে তিনি [illegible] বলেছিলেন একথা প্রমাণ করার মতোও কিন্তু কিছু নেই। আমরা মঙ্গলগ্রহে [illegible] জীবজন্তু গাছপালা সম্পর্কে যা জানি তার চাইতে বেশি কিছু আমরা এ বিষয়ে [illegible] কোনো পক্ষেই জানি না।

অগাণিতিক মন হলে আমাদের ভৌতজ্ঞানের বিমূর্ত চরিত্র সন্তোষজনক [illegible] না হতে পারে। শিল্প কিংবা কল্পনার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাপারটা হয়তো দুঃখের [illegible] ব্যবহারিক দিক থেকে এতে কিছু এসে যায় না। বিমূর্তন কঠিন হতে পারে [illegible] বিমূর্তনই ব্যবহারিক ক্ষমতার উৎস। একজন মূলধন বিনিয়োগকারী ধনপতি (financier) পৃথিবীর সঙ্গে লেনদেন একজন 'কর্মদক্ষ' (parctical) লোক [illegible] চাইতে বেশি বিমূর্ত হতে পারে কিন্তু কর্মদক্ষ ব্যক্তিটির তুলনায় ধনপতির [illegible] অনেক বেশি। ধনপতি গম কিংবা তুলোর ব্যবসা করতে পারেন কিন্তু সেজন্য [illegible] কখনোই কোনোটা দেখার প্রয়োজন হয় না। তঁর শুধু জানার প্রয়োজন [illegible] বাড়বে না কমবে। কৃষকের জ্ঞানের সঙ্গে তুলনায় একে বলা হয় বিমূর্ত [illegible] জ্ঞান। সেইরকম, একজন পদার্থবিদ্যাবিদের হয়তো গতির কয়েকটি নিয়ম [illegible] পদার্থ সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই না থাকতে পারে কিন্তু পদার্থকে স্বকার্যে [illegible] করার মতো পর্যাপ্ত জ্ঞান তার থাকে। পদার্থবিদ্যাবিদ সমীকরণের [illegible] মালিকা নিয়ে পরিশ্রম করেন। সে সমীকরণের প্রতীকগুলি যার প্রতিনিধি স্বকীয় চরিত্র আমরা কখনোই জানতে পারব না। তিনি শেষ পর্যন্ত যে [illegible]

জানা সে ফল আমাদের দৈনন্দিন অনুভূতির বাগ্বিধিতে প্রকাশ করা সম্ভব এবং তার দ্বারা সম্ভব আমাদের নিজেদের জীবনে আকাঙ্ক্ষিত ক্রিয়া আনয়ন। পদার্থ সম্পর্কে আমরা যা জানি না তা বিমূর্ত এবং ছককাটা (schematic) হতে পারে, কিন্তু আমাদের ভিতরে তারা কি নিয়ম অনুসারে অনুভূতি ও বেদনা (feeling) উৎপাদন করে সেটুকু জানার পক্ষে নীতিগতভাবে সে জ্ঞান যথেষ্ট। এই নিয়মগুলির উপরই পদার্থবিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগ নির্ভরশীল।

শেষ সিদ্ধান্ত : আমরা এত কম জানি, অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার আমরা এত বেশি জানি, আরো আশ্চর্যের ব্যাপার এত অল্প জ্ঞান এত বেশি ক্ষমতা দান করতে পারে।

ধর্ম ও বিজ্ঞান

অধ্যায় ১

সংঘাতের ভিত্তি

ধর্ম ও বিজ্ঞান সমাজজীবনের দুটো দৃষ্টিকোণ। এর মধ্যে প্রথমটি গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রাচীন সময়ের নিরিখে। এই প্রাচীন সময়টা সে-সময় যখন থেকে আমরা মানুষের মানসিক ইতিহাসের খবর রাখছি। অন্যটির শুরু গ্রীক এবং আরবদের মধ্যে বিজ্ঞানের ঝলক দিয়ে। বিজ্ঞানের এই ঝলক হঠাৎ ষোলো শতকে গুরুত্ব পেয়ে যায়। এটা এখন আমাদের ধ্যান-ধারণা প্রভাবিত করছে। প্রভাবিত করে চলেছে সেই সব প্রতিষ্ঠানকে যেগুলোর সঙ্গে আমরা যুক্ত রয়েছি। ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সুদীর্ঘ সংঘাত চলছে। এ-সংঘাতে গত কয়েক বছর ধরে বিজ্ঞান অনিবার্যভাবে জয়ী হয়েছে। কিন্তু রাশিয়া এবং জার্মানিতে নতুন ধর্মের উত্থানে এই বিষয়টা আর আগের মতো নেই। এই নতুন ধর্মের পিছনে বিজ্ঞান-প্রদত্ত মিশনারী কার্যাবলীর প্রাধান্য। এর ফলে বিজ্ঞানের বিজয়ের বিষয়টাকে পুনরায় সংশয়ের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। যেমনটা হয়েছিল বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক কাল শুরুর সময়ে। এই কারণে সংঘাতের ভিত্তি এবং চিরাচরিত ধর্ম কর্তৃক শুরু-করা যুদ্ধের ইতিহাসটাকে আর একবার বুঝে নেবার গুরুত্ব বেড়েছে।

বিজ্ঞান হলো পর্যবেক্ষণজাত আবিষ্কারের প্রচেষ্টা। এই পর্যবেক্ষণ যুক্তিবিচারের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। যুক্তিগুলো এমন, প্রথমে বিশ্ব সম্পর্কে নির্দিষ্ট ঘটনা জানা। এরপর একটা ঘটনার সঙ্গে অন্য একটা ঘটনার নিয়মসূত্র বুঝে নেওয়া। এই বোধ থেকে ভবিষ্যৎ সংঘটনের আগাম ঘোষণা রাখা। বিজ্ঞানের এই তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণের সঙ্গে যুক্ত থাকে বিজ্ঞানের প্রয়োগগত দিক। এই দিকটা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আরাম ও বিলাসিতার ব্যবস্থা করে। প্রাক্-বিজ্ঞানের আগের সময়ে এসব বাস্তবে অসম্ভব ছিল। কঠিন চেষ্টায় এর কিছু ব্যবস্থা করা সম্ভব হলেও সেটা ছিল অঢেল খরচসাপেক্ষ। ফলে এই আরাম ও বিলাসিতার দিকটা বিজ্ঞানকে বিশাল গুরুত্ব প্রদান করেছে। যাঁরা বিজ্ঞানী নন, এই গুরুত্বটা বুঝেছেন তাঁরাও। সামাজিক বিবেচনায় ধর্ম বিজ্ঞানের চেয়ে একটি অধিকতর জটিল বিষয়। প্রতিটি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ধর্মের তিনটি উপাদান রয়েছে। এক, একটা গীর্জা। দুই, ধর্মবিশ্বাসের একটি সূত্রাবলী। তিন, ব্যক্তিগত নৈতিকতার একটি সংহিতা। আপেক্ষিক গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয় তিনটি বিভিন্ন সময় ও স্থানসাপেক্ষে খুবই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়েছে। গ্রীস এবং রোমের প্রাচীন ধর্মকে

স্টোইকদের[১] দ্বারা নৈতিক করে না তোলা পর্যন্ত ব্যক্তি নৈতিকতার বিষয়ে দুই ধর্মের বেশি কিছু বলার ছিল না। ইসলামের জাগতিক রাজাধিরাজের তুলনায় গীর্জা গুরুত্বহীন। আধুনিক প্রোটেস্টান্ট মতবাদে ধর্মবিশ্বাসের অনমনীয়তাকে শিথিল করার ঝোঁক দেখা গেছে। সে যাই হোক, এই বিভিন্ন উপাদানের তারতম্য সত্ত্বেও সামাজিক ঘটনার হিসাবে ধর্মে এসব উপাদানগুলো থাকা আবশ্যিক। আর এখানেই বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের সংঘাত। একটি পুরো গোষ্ঠী ব্যক্তি বিশ্বাসের ধর্মজাত সুস্পষ্ট ঘোষণাকেও বিজ্ঞান অপ্রমাণ করতে পারে। তবু এই ধরনের ঘোষণাজাত বিশ্বাস সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক যুগেও টিকে থাকতে পারে।

ধর্মবিশ্বাস হলো ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে বৌদ্ধিক সংঘাতের উৎস। কিন্তু সংঘাতের তিক্ততার কারণ ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে গীর্জা এবং নৈতিক সংহতির সম্পর্ক। যাঁরা ধর্মবিশ্বাসকে প্রশ্ন করেছেন তাঁরা গীর্জার কর্তৃত্বকে দুর্বল করেছেন। এতে গীর্জার মানুষদের আয়ে টান পড়েছে। অধিকন্তু, এই প্রশ্নকারীদের নৈতিক বিনষ্টকারী হিসাবে ভাবা হয়েছে। কারণ ধর্মবিশ্বাস থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নৈতিক কাজকর্ম করেছেন গীর্জার ব্যক্তিবর্গ। সুতরাং বিজ্ঞানপন্থীদের বৈপ্লবিক শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগণ এবং গীর্জার ব্যক্তিবর্গের আতঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ ছিল।

যাই হোক, আমরা সাধারণভাবে বিজ্ঞান, এমনকি সাধারণভাবে ধর্মের বিষয় আশয় নিয়েও এখানে আলোচনা করব না। আমরা কথা বলব সেইসব বিষয় নিয়ে যেগুলো অতীতে এবং বর্তমান সময়েও উভয়ের মধ্যে সংঘাতের কারণ হয়েছে। এ ব্যাপারে খ্রিষ্টজগৎ যতটা সংশ্লিষ্ট তাতে বলা যায় যে, এই সংঘাত দু'ধরনের। কখনও কখনও বাইবেলের মূল রচনা কোনো ঘটনার বিষয়গত ঘোষণা রাখে। উদাহরণে বলা যায়, বাইবেলের এই ঘটনার কথা যেখানে বলা হয়েছে, খরগোশ জাবর কাটে। এই ঘোষণা বিজ্ঞান যখন পর্যবেক্ষণের পথে বাতিল করে তখনই বিশ্বাসীর মনে সমস্যা তৈরি হয়। কারণ বেশির ভাগ খ্রিষ্টান বিশ্বাস করতেন যে, বাইবেলের প্রতিটি শব্দ ঐশ্বরিকভাবে অনুপ্রাণিত। এই বিশ্বাসে তাঁরা দৃঢ় থাকতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না বিজ্ঞান তাঁদের অন্যভাবে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে। বাইবেলের সংশ্লিষ্ট ঘোষণা যার কোনো অন্তর্নিহিত ধর্মীয় গুরুত্ব নেই সেগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়া অসুবিধাজনক নয়।

---

১. স্টোইক মানে নিস্পৃহবাদী। খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ সালে এথেন্সের একটি দার্শনিক মতবাদ ছিল স্টোইকবাদ। জেনো এই দার্শনিক মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। এই মতবাদের কথা, নাগরিকের সঙ্গে রাষ্ট্রের যে-সম্পর্ক তার চেয়ে ধর্মজীবনে আত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।—অনুবাদক

অথবা এই সিদ্ধান্তের কথা বলেও বিতর্ক এড়ানো যায় যে, বাইবেল হলো কেবলমাত্র ধর্মীয় ও নৈতিক বিষয়ের ব্যাপারে কর্তৃত্বসম্পন্ন। কিন্তু প্রবল সংঘাত তখনই দেখা দেবে যখন বিজ্ঞান কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ খ্রিষ্টীয় অনুশাসন অথবা কতিপয় দার্শনিক মতবাদ নিয়ে বিতর্কে যাবে। কারণ এইসব অনুশাসন ও দার্শনিক মতবাদকে ধর্মতাত্ত্বিকগণ সনাতন বিশ্বাসের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। বিশদভাবে বলতে গেলে, প্রথম দিকে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সংঘাতটা ছিল কোনো ঘটনা বিষয়গত ঘোষণার যৌক্তিকতা নিয়ে। পরে এই সংঘাত খ্রিষ্টান ধর্মশিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ল। বর্তমান সময়ের ধর্মবাদী নারী-পুরুষ এমন অনুভবে পৌঁছেছেন যে, মধ্যযুগের খ্রিষ্টজগতের বহু ধর্মমত এখন অপ্রয়োজনীয়। বস্তুত ধর্মীয় জীবনের পথে একটা বাধা। কিন্তু বিজ্ঞান যে-বিরোধিতার মোকাবিলা করেছে সেটা আমাদের বুঝতে হবে। এটা বুঝতে হলে অবশ্যই আমাদের ধারণার পদ্ধতির মধ্যে ঢুকতে হবে যা এই বিরোধিতাকে দৃশ্যত যুক্তিগ্রাহ্য করেছে। ধরা যাক, একজন ব্যক্তি জনৈক পাদরিকে প্রশ্ন করলেন, কেন তার খুন করা অনুচিত। পাদরির উত্তর, 'কারণ তোমার ফাঁসি হবে'। এই উত্তরটা অপর্যাপ্ত মনে হবে দুটো কারণে। প্রথমত, ফাঁসি দিতে হলে তার সংগত কারণটা জানতে হবে।

দ্বিতীয়ত, পুলিশি ব্যবস্থাটা এতটাই অনিশ্চিত যে, বহুসংখ্যক খুনি দিব্যি শাস্তি এড়াতে পারে। বিজ্ঞানের আবির্ভাবের আগে অন্য একটা উত্তর সবার কাছেই সন্তোষজনক মনে হত। সে-উত্তরের কথা, খুন করাটা 'টেন কম্যান্ডমেন্টে' নিষিদ্ধ। এই 'টেন কম্যান্ডমেন্ট' সিনাই পাহাড়ে ঈশ্বর কর্তৃক মোজেসের প্রতি উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। যে-অপরাধী পার্থিব বিচার এড়িয়ে গেল সেও কিন্তু ঈশ্বরিক রোষ থেকে রেহাই পাবে না। এই রোষ এই নির্দেশ দিয়েছে যে, অনুতাপহীন খুনিরা ফাঁসির চেয়েও ভয়ঙ্কর শাস্তি অনন্তকাল ধরে পেতে থাকবে। এই যুক্তিটা অবশ্য বাইবেল-কর্তৃত্বের উপর নির্ভরশীল। এটা যথাযথ রক্ষিত হতে পারে যদি বাইবেলকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করা হয়। বাইবেল যখন বলে যে, পৃথিবী ঘোরে না, তখন কিন্তু গ্যালিলিওর যুক্তি সত্ত্বেও বাইবেলের ঘোষণাতে অবশ্যই বিশ্বস্ত থাকতে হয়। অন্যথা করলে খুনিদের এবং অন্যান্য দুষ্কৃতকারীদের উৎসাহ দিতে হয়।

যদিও এখন অল্প সংখ্যক মানুষও এই যুক্তি গ্রহণ করবেন না তবুও একে অবাস্তব বলে বিবেচনা করা যাবে না। এবং যারা এই যুক্তির পথে কাজ করেছে তাদেরও নৈতিকভাবে নিন্দা করা যাবে না।

শিক্ষিত মানুষের মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা যুক্তিসিদ্ধ ঐক্য ছিল। সেটা এখন হারিয়ে গেছে। আমরা টমসা অ্যাকুইনকে[২] সেই ধর্মমতের কর্তৃত্বপূর্ণ প্রবক্তা হিসাবে ভাবতে পারি, যাঁর ধর্মমতকে বিজ্ঞান আক্রমণ করতে বাধ্য হয়েছিল। তিনি মনে করতেন খ্রিষ্টধর্মের কতিপয় মৌলিক সত্যকে সমর্থনহীন যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যায়। এ প্রমাণে উদ্ঘাটনের ঘটনারও সাহায্যেও নিতে হয় না। বলা বাহুল্য, রোমান ক্যাথলিক চার্চ আজও এই মতের অনুসারী। এসবের মধ্যে একটি হলো সর্বশক্তিমান এবং কল্যাণময় স্রষ্টার অস্তিত্ব। তাঁর অসীম ক্ষমতা এবং হিতৈষণার জন্যই তিনি তাঁর সৃষ্ট জীবনের তাঁর ঈশ্বরিক বিধানের জ্ঞানহীন অবস্থায় রাখতে পারেন না। তাঁর অভিলাষকে মান্যতা দেবার জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রায় এই জ্ঞান থাকতে হবে সৃষ্ট জীবদের। সুতরাং একটি স্বর্গীয় উদ্ঘাটনের বিষয় অবশ্যই থাকতে হবে। এই বিষয়টি স্পষ্টতই বাইবেলে এবং গীর্জার সিদ্ধান্তের মধ্যেও রয়েছে। এই বিষয়টা প্রতিষ্ঠিত হলে আমাদের আর যা যা জানতে হবে সে-সবের ধারণা পাওয়া যাবে ধর্মগ্রন্থ এবং খ্রিষ্টজগতের গীর্জা পরিষদের ঘোষণা থেকে। এখানে গোটা যুক্তিটা হেতুবাক্য থেকে অবরোহ[৩] পদ্ধতিতে এগোয়। খ্রিষ্ট দেশগুলোর প্রায় সব মানুষ এই হেতুবাক্য আগেই গ্রহণ করে বসে আছেন। এই যুক্তিটা আধুনিক পাঠকদের কাছে কখনো-সখনো ত্রুটিপূর্ণ মনে হতে পারে। তবুও এই যুক্তির ভ্রান্তিটা সম-সাময়িক সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষিত মানুষের কাছে স্পষ্ট নয়।

এখন যুক্তিগ্রাহ্য একতা একই সময়ে একটা শক্তি এবং একটা দুর্বলতা। এটা শক্তি এই কারণে যে, যিনি যুক্তির একটা ধাপ গ্রহণ করবেন তাঁকে অবশ্যই পরের ধাপগুলোও গ্রহণ করতে হবে। এটার দুর্বলতার কারণ হলো এই যে, যিনি পরের ধাপের যে-কোনো একটা যুক্তি বর্জন করবেন, তাঁকে আগের যুক্তিসমূহের অন্তত কতিপয় আবশ্যিকভাবে বর্জন করতে হবে। গীর্জা তাই বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে একইসাথে শক্তি এবং দুর্বলতা দেখিয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে গীর্জার অনুশাসনের যুক্তিগ্রাহ্য সংলগ্নতা থেকে। যে-পথে বিজ্ঞান তার বিশ্বাসে পৌঁছোয় সেটা মধ্যযুগীয় ধর্মতত্ত্বীয় বিশ্বাস থেকে পুরোপুরি আলাদা। অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে, সাধারণ নীতি থেকে শুরু করে অবরোহ পদ্ধতিতে এগোনোটা বিপজ্জনক।

---

২. ইনি মধ্যযুগের রাষ্ট্রীয় দর্শনের ইতিহাসে খ্রিষ্টধর্মীয় যাজক চিন্তাবিদ। কে বড়, ধর্ম না রাষ্ট্র? পোপ না রাজা? এ প্রশ্নে মধ্যযুগে রাষ্ট্রীয় দর্শণ বিকাশলাভ করে।—অনুবাদক

৩. অবরোহী অনুমানের বিচার্য বিষয় হলো হেতুবাক্য যা আছে (সত্য কিংবা মিথ্যা যাই হোক না কেন) তার ভিত্তিতে অনুমিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে কি না।—অনুবাদক

বিপদটা উভয় দিকের। কারণ নীতিগুলো অসত্য হতে পারে। এবং এই নীতিগুলোর ওপর দাঁড়িয়ে যুক্তিবিন্যাস ভ্রান্ত হতে পারে। বিজ্ঞান বড়ো ধরনের ধরে-নেওয়া মত থেকে শুরু করে না। সে শুরু করে নির্দিষ্ট ঘটনা থেকে। এই ঘটনাগুলোর পর্যবেক্ষণ অথবা পরীক্ষণ থেকে পাওয়া এ-ধরনের কতিপয় ঘটনা থেকে সাধারণ নিয়মে পৌছোয় বিজ্ঞান। এটাও ঠিক যে, আলোচিত ঘটনাগুলো হলো দৃষ্টান্ত। এই নিয়মটা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হয় না। কিন্তু এটা কাজ করার একটা প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করা হয় মাত্র। এটা যদি সত্য হয়, তাহলে এখনও অদেখা কতিপয় ঘটনা কোনো কোনো পরিস্থিতিতে ঘটবে। যদি দেখা যায় যে, এগুলো অবশ্যই ঘটছে তাহলে প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠিত হয়। না ঘটলে প্রকল্পটি পরিত্যক্ত হয়। এবং একটি নতুন প্রকল্প অবশ্যই আবিষ্কার করতে হয়। যাই হোক, অনেক ঘটনাই প্রকল্পের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এতে অবশ্য এটা বলা যায় না যে, প্রকল্পটা সুনিশ্চিত হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই প্রকল্পকে খুবই সম্ভাবনাপূর্ণ বলে মনে করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে এটাকে আর প্রকল্প না বলে আমরা তত্ত্ব বলতে পারি। নানা ধরনের তত্ত্ব যার প্রতিটি প্রত্যক্ষভাবে ঘটনার উপর দাঁড়াতে পারে এমন হলে এগুলো নতুন এবং আরও সাধারণ প্রকল্পের ভিত্তি হতে পারে। এগুলো সত্য হলে এভাবে আরও এগোনো যায়। এবং এই সাধারণীকরণের প্রক্রিয়াগুলোকে সীমিত করা যায় না। কিন্তু মধ্যযুগীয় চিন্তা-চেতনার সাধারণ নীতিগুলোই ছিল শুরু করার বিষয়। বিজ্ঞানে কিন্তু সাধারণ নীতি হলো শেষ সিদ্ধান্ত। শেষ সিদ্ধান্ত বলতে একটা নির্দিষ্ট সময়ের সিদ্ধান্ত। পরবর্তী ধাপে এইসব সিদ্ধান্ত দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা হবে অন্য কোনো আরও বৃহত্তর নিয়মের ক্ষেত্রে।

একটা ধর্মমত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব থেকে আলাদা। এই ভিন্নতা তৈরি হয় ধর্মতত্ত্বের চিরন্তন এবং চরম সত্যকে স্পষ্টরূপে প্রকাশের দাবিতে। পক্ষান্তরে, বিজ্ঞান সর্বদা পরীক্ষণমূলক। বিজ্ঞানের প্রত্যাশা এই যে, আজ কিংবা কাল এর বর্তমান তত্ত্বের রূপান্তর প্রয়োজন হতে পারে। বিজ্ঞান এ-সম্পর্কেও সচেতন যে, এর পদ্ধতিটা যৌক্তিকভাবে একটা পরিপূর্ণ এবং চূড়ান্ত প্রমাণে পৌছতে সক্ষম। কিন্তু এগিয়ে-থাকা বিজ্ঞানে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলো এমন যা আর একটু বেশি অভ্রান্ততার দিকে নিয়ে যাবে। অবশ্য পুরানো তত্ত্বগুলো প্রাথমিক মূল্যায়নের কাজে লাগাবে। নতুন পর্যবেক্ষণের সূক্ষ্মতার সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পুরানো তত্ত্ব আর কাজে লাগানো যাবে না। অধিকন্তু, পুরানো তত্ত্বের নির্দেশে প্রায়োগিক আবিষ্কার নিদর্শন হিসাবে থাকতে পারে। এই নিদর্শন হলো, একটা সময় পর্যন্ত পুরানো তত্ত্বগুলো বাস্তব সত্য ছিল। বিজ্ঞান তাই চরম সত্যের সন্ধানকে পরিত্যাগ করে।

এর বিকল্প হিসাবে টেকনিক্যাল বা প্রায়োগিক সত্যের কথা বলে। এই টেকনিক্যাল সত্যটা যে-কোনো তত্ত্বের হতে পারে যে-তত্ত্ব সফলভাবে আবিষ্কারের কাজে প্রয়োগ করা যায় কিংবা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আগে থেকেই বলা যায়। এই টেক্‌নিক্যাল সত্যটা একটা তারতম্যের বিষয়। একটা তত্ত্ব যা থেকে বেশি বেশি সফল আবিষ্কার সম্ভব হয় এবং ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়, সেটাতো কম আবিষ্কারের তত্ত্ব থেকে বেশি সত্য। 'জ্ঞান' তখন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মনের আয়না আর থাকে না। এটা পদার্থের কৌশলী ব্যবহারের একটা বাস্তব হাতিয়ার হয়ে ওঠে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির এইসব তাৎপর্য পথিকৃৎগণের কাছে প্রতিভাত হয়নি। এইসব পথিকৃৎগণ সত্য সন্ধানের একটা নতুন পদ্ধতির অনুশীলন করেছেন। তবুও এঁরা সত্যকে চরম বলে ভেবেছিলেন যেমনটা এঁদের ধর্মতাত্ত্বিক বিরোধীরা বুঝেছিলেন। মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ তফাৎ হলো কর্তৃত্বের প্রশ্নটা। স্কুল-মেনদের[৪] কাছে বাইবেল, ক্যাথলিক বিশ্বাসের আপ্তবাক্য এবং (প্রায় সমানভাবে) অ্যারিস্টটলের শিক্ষা ছিল যে-কোনো প্রশ্নের উর্ধ্বে। মৌলিক চিন্তা এবং এমনকি ঘটনার পর্যবেক্ষণও এই দূরকল্পনাভিত্তিক ধারণার নিত্যতার নির্ধারিত সীমা যেন না ছাড়িয়ে যায়। স্কুল মেনরা-এ-বিষয়ে সর্তক থাকতেন। পৃথিবীর উপরের গোলকে মানুষ আছে কিনা, জুপিটারের উপগ্রহ রয়েছে কিনা এবং কোনো বস্তু তার ভরের সমানুপাতিক হারে পতিত হয় কিনা, এসব প্রশ্ন পর্যবেক্ষণে ঠিক করা যাবে না। এসবের বিবেচনা হবে অ্যারিস্টটল কিংবা ধর্মশাস্ত্রের অবরোহী সিদ্ধান্ত থেকে। ধর্মতত্ত্ব এবং বিজ্ঞানের সংঘাত আসলে কর্তৃত্ব আর পর্যবেক্ষণের দ্বন্দ্ব। বিজ্ঞানের অনুগামীরা এটা বলেননি যে, প্রপজিশন বা যৌক্তিক বাক্যগুলো বিশ্বাস করতে হবে কারণ কোনো গুরুত্বপূর্ণ কর্তৃত্ব এসব সত্য বলে বলেছেন। পক্ষান্তরে, এঁরা মানুষের চেতনার সাক্ষ্যের প্রতি আবেদন রেখেছেন। সেইসব মতবাদে আস্থা রেখেছেন, যেগুলোর ভিত্তি ছিল ঘটনার উপর। এই মতবাদগুলো এমনই যা যে-কেউ চাইলে প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ করে নিতে পারেন। নতুন পদ্ধতি তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিকতার এত বিপুল সফলতা পেল যে, ধর্মতত্ত্বও ধীরে ধীরে বাধ্য হলো বিজ্ঞানের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে। অস্বস্তিকর বাইবেলের ব্যাখ্যা দিতে হলো রূপকার্থে কিংবা প্রতীকী হিসাবে।

---

৪. মধ্যযুগের ইউরোপের চার্চস্কুল ছিল। চার্চ নিয়ন্ত্রিত এসব স্কুলে দর্শন এবং ধর্মতত্ত্ব শেখানো হতো। এইসব স্কুলের পণ্ডিতদের প্রধান কাজ ছিল ধর্মের বিশ্বাস ও বিধিনিষেধকে যুক্তির সাহায্যে সত্য বলে প্রমাণ করা। এইসব স্কুলের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে স্কুল মেন বলা হয়েছে।—অনুবাদক

প্রোটেস্টান্টরা কর্তৃত্বের আসনের স্থানান্তর ঘটালেন। প্রথমে গীর্জা এবং বাইবেল এই দুটো থেকে সরে এসে শুধুমাত্র বাইবেলে দাঁড়ালেন। এবং তারপর ব্যক্তিক আত্মাতে চলে গেলেন। ধীরে ধীরে এটা স্বীকৃত হতে থাকল যে, ধর্মীয় জীবন কেবল ঘটনা নিয়ে ঘোষণার উপর নির্ভর করে না। উদাহারণ হিসাবে এল, আদম ও ইভের ঐতিহাসিক অস্তিত্বের কথা। এভাবে ধর্ম বাইরের আরক্ষা ব্যবস্থা সমর্পণ করে নগরদুর্গ যথাযথ সুরক্ষা করতে চাইলো। এই প্রয়াস সফল হবে কী হবে না, সেটাই এখন দেখার।

যাই হোক, ধর্মীয় জীবনের একটা দৃষ্টিকোণ খুবই আকাঙ্ক্ষিত। এটা আবার বিজ্ঞানের আবিষ্কার-নিরপেক্ষ। কথাটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতি নিয়ে। এটা নিয়ে আমরা যাই বিশ্বাস করতে চাই না কেন, এই দিকটা কিন্তু টিকে যেতে পারে। ধর্ম কেবল ধর্মবিশ্বাস আর গির্জার সঙ্গেই যুক্ত নয়। এটা কিন্তু সেইসব মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে যায় যারা এর গুরুত্বটা উপলব্ধি করেন। সাধুদের জীবনে এবং প্রতীকী ধারণার মধ্যে কতিপয় আপ্তবাক্যে বিশ্বাস এবং মানবজীবনের উদ্দেশ্যের উপলব্ধি যুক্ত হয়ে বিরাজ করে। একজন মানুষ যিনি মানবভাগ্যের সমস্যা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন, মানবজাতির দুঃখকষ্ট লাঘব করতে চান, এবং আশা করেন যে ভবিষ্যৎ এই মানবপ্রজাতির জন্য সর্বোৎকৃষ্ট সম্ভাবনা নিয়ে আসবে, আজকাল প্রায়ই এই ধরনের মানুষের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থাকার কথা বলা হয়। এই মানুষটি ঐতিহ্যগত খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস যত কমই গ্রহণ করুন না কেন, তাতে তাঁর সম্পর্কে উপরের ধারণা বদলায় না। ধর্মটা অনুভূতির পন্থা নয়, কেবল একগুচ্ছ বিশ্বাস হয়ে থাকলে বিজ্ঞানও একে স্পর্শ করতে পারে না।

সম্ভবত অনুশাসনের ঘাটতি মনোস্তাত্ত্বিকভাবে এই ধরনের উপলব্ধিকে সাময়িকভাবে অসুবিধার মধ্যে ফেলে। এর কারণ ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্বাসের সঙ্গে এটা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। কিন্তু এই অসুবিধাটাকে চিরকাল সহ্য করার প্রয়োজন নেই। বস্তুত বহু মুক্তচিন্তাবিদ তাঁদের জীবনে এটা দেখিয়েছেন যে, এই ধরনের উপলব্ধির সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের আবশ্যিক সংযোগ নেই। কোনো যথার্থ উৎকর্ষ ভিত্তিহীন বিশ্বাসের সঙ্গে অলঙ্ঘ্যভাবে যুক্ত নয়। ধর্মতত্ত্বীয় বিশ্বাসগুলো ভিত্তিহীন হলে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যেগুলো ভালো সেগুলোর সুরক্ষার জন্য দুর্গের প্রয়োজন নেই। অন্যভাবে ভাবাটা হলো, আমরা যা আবিষ্কার করতে পারি সেটা নিয়ে ভয়ের মধ্যে থাকা। এবং এই ভয় বিশ্বকে বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের চেষ্টাকে ব্যাহত করবে। কিন্তু এটা হলো একমাত্র পরিমাপের বিষয় যার মধ্য দিয়ে আমরা এই ধারণায় পৌঁছোই যে, সত্যিকারের প্রজ্ঞা বাস্তবে সম্ভব।

অধ্যায় ২

কোপার্নিকাসের বিপ্লব

ধর্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের মধ্যে তুমুল সংঘাতটা শুরু হয়েছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি বিতর্ককে কেন্দ্র করে। কোনো কোনো দিক থেকে সংঘাতটা ছিল চমকপ্রদ। বিতর্কের বিষয়টি ছিল আমরা যাকে সৌরজগত বলি তার কেন্দ্রে পৃথিবী না সূর্য, কোনটা অবস্থান করছে। টলেমির তত্ত্বটি ছিল প্রাচীন ও গোঁড়া। ওই তত্ত্ব অনুসারে পৃথিবী, এই মহাবিশ্বের কেন্দ্রে স্থির হয়ে আছে এবং সূর্য, চন্দ্র গ্রহ ও স্থির নক্ষত্রের ব্যবস্থাটা নিজ নিজ অবস্থানে থেকে পৃথিবীকে আবর্তন করছে। কোপার্নিকাসের নতুন তত্ত্ব অনুসারে স্থির থাকার পরিবর্তে পৃথিবীর দু'ধরনের গতি আছে। এই গতির প্রথমটি হলো এক দিনে একবার পৃথিবী নিজ কক্ষপথে ঘুরছে। এবং বছরে একবার সে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে।

যাকে আমরা কোপার্নিকাসের তত্ত্ব বলছি সেটা ষোলো শতকে এক অভিনবত্বের সাড়া জাগিয়েছিল। কিন্তু আসলে এটি আবিষ্কৃত হয়েছিল গ্রীকদের দ্বারা যাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিশাল দক্ষতা ছিল। পিথাগোরাসের মতাবলম্বীরা এই তত্ত্বের সমর্থক ছিলেন। সম্ভবত ঐতিহাসিক সত্যতা ছাড়াই তারা পিথাগোরাসকে এই মতের প্রবক্তা ভেবেছিলেন। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে গ্রীসের সামোসের অধিবাসী অ্যারিস্টার্কাসই প্রথম জ্যোতির্বিদ যিনি সর্বপ্রথম এই আবর্তনের বিষয়টি শিক্ষা দিয়েছিলেন। নানা দিক দিয়ে তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি তত্ত্বগতভাবে যুক্তিসিদ্ধ একটি প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করে সূর্য ও চন্দ্রের আপেক্ষিক দূরত্বের বিষয়টি আবিষ্কার করেন। যদিও ত্রুটিপূর্ণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তার আবিষ্কৃত ফলাফলগুলো সঠিক ছিল না। গ্যালিলিওর মতো তিনিও অধার্মিকতার অভিযোগে অভিযুক্ত হন এবং স্টোইক দার্শনিক ক্লিনথেসের দ্বারা প্রকাশ্যে ধিকৃত হন। কিন্তু তিনি এমন একটা যুগে বাস করতেন যখন দেশের সরকারের উপর গোঁড়াপন্থীদের তেমন প্রভাব ছিল না। ফলে প্রকাশ্যে ধিকৃত হওয়া সত্ত্বেও তাকে কোনো ক্ষতি স্বীকার করতে হয়নি।

জ্যামিতিবিদ্যায় গ্রীকদের খুবই দক্ষতা ছিল। ফলে কতিপয় বিষয়ের বৈজ্ঞানিক প্রতিপাদনে তাঁরা সক্ষম ছিলেন। তাঁরা গ্রহণের কারণ জানতেন। চাঁদের উপর পৃথিবীর ছায়া দেখে তাঁরা সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, পৃথিবীটা গোলাকৃতি। এরাতোস্থেনিস, যিনি অ্যারিস্টার্কাসের কিছু পরের দিকের বিজ্ঞানী, আলোচনা করেছিলেন কিভাবে পৃথিবীর আকার হিসেব করে বের করা যায়। কিন্তু তাঁরা গতিবিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞানেরও অধিকারী ছিলেন না। এই কারণে

পিথাগোরাসের তত্ত্বকে মান্যতা দিতেন, তাঁরা তাঁদের মতের সপক্ষে কোনও শক্তিশালী যুক্তি দিতে পারতেন না। টলেমি, সম্ভবত ১৩০ খ্রিষ্টাব্দে অ্যারিস্টার্কাসের মতকে খারিজ করে দেন এবং মহাবিশ্বের কেন্দ্রে পৃথিবীর সুবিধাজনক অবস্থানের তত্ত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। প্রাচীন যুগের শেষভাগ থেকে শুরু করে গোটা মধ্যযুগ ধরে টলেমির এই মতের বিরুদ্ধে কোনও প্রশ্ন ওঠেনি।

কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) এই সম্মানের অধিকারী হলেন। কোপার্নিকাসের তত্ত্বে তাঁর নাম যুক্ত হলো। সম্ভবত এ সম্মান তাঁর প্রাপ্য নয়। তরুণ বয়সে ক্রাকাউ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করে তিনি ইতালিতে গিয়েছিলেন। ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ তিনি রোমে গণিতের অধ্যাপনা শুরু করেন। যাই হোক, বছর তিনেক পরে তিনি পোল্যান্ডে ফিরে আসেন। সেখানকার প্রচলিত মুদ্রার সংস্কারের কাজে যুক্ত হন এবং টিউটোনিক নাইটদের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হন। ১৫০৭ থেকে ১৫৩০, তাঁর অবসর সময়ের এই তেইশ বছরে তিনি তাঁর মূল্যবান কাজটি করেন। তিনি রচনা করেন 'জ্যোতিষ্কসমূহে' কক্ষপথের আবর্তন' (*On the Revolution of the Heavenly Bodies*) শীর্ষক বইটি। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৫৪৩ সালে, তাঁর মৃত্যুর ঠিক আগে।

কল্পনার ফলপ্রসূ প্রচেষ্টা হিসাবে কোপার্নিকাসের তত্ত্বটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই তত্ত্বটির ফলে আরও অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। তবুও এটি খুবই ত্রুটিপূর্ণ ছিল। আমরা এখন জানি যে, গ্রহগুলো সূর্যকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে নয়, উপবৃত্তাকারে ঘুরছে। সূর্য কেন্দ্রে নয়, অবস্থান করছে উপবৃত্তের একটি ফোকাসে। কোপার্নিকাস যুগ অভিমত পোষণ করতেন যে, গ্রহগুলির কক্ষপথ অবশ্যই বৃত্তাকার হবে। জ্যোতির ব্যাখ্যা হিসাবে তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, সূর্য কক্ষপথগুলির কোনটিরই কেন্দ্রে অবস্থান করছে না। এটা অংশত তাঁর তত্ত্বকে সরলতা থেকে বঞ্চিত করে। এটাই ছিল টলেমির তত্ত্বের চাইতে বেশি সুবিধাজনক। কেপলার যদি কোপার্নিকাসের এই ত্রুটি সংশোধন না করতেন তাহলে নিউটনের পক্ষে তাঁর তত্ত্বকে সার্বজনীন করা সম্ভব হত না। কোপার্নিকাস এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, তাঁর কেন্দ্রীয় মতবাদটি তাঁর আগেই অ্যারিস্টার্কাস শিখিয়ে গেছেন। যা ছিল চমৎকার জ্ঞান, যার জন্য তাঁর ইতালির ক্লাসিক্যাল শিক্ষার প্রতি ঋণ রয়েছে। এই জ্ঞানটুকু ছাড়া, ইতালির সেই সময়ে যখন প্রাচীনত্বের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ক্রিয়াশীল ছিল তখন তাঁর পক্ষে তাঁর তত্ত্ব প্রকাশের সাহস হত না। যাজক সম্প্রদায়ের সমালোচনায় তাঁর প্রবল ভয় ছিল। এই কারণেই তিনি তাঁর তত্ত্বের প্রকাশনায় দীর্ঘ প্রতীক্ষা করেছিলেন। নিজে গীর্জার পুরোহিত হয়েও তিনি পোপকে তাঁর বইখানা

উৎসর্গ করেন। তাঁর প্রকাশক অসিয়েনডার একটি মুখবন্ধ জুড়ে দিয়েছিলেন। এই মুখবন্ধটি সম্ভবত কোপার্নিকাস অনুমোদন করেননি। মুখবন্ধটিতে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর গতি সম্বন্ধীয় তত্ত্বটি একটি প্রকল্প হিসাবে হাজির করা হয়েছে। এটি সত্য-আধারিত নয়। একটা সময় পর্যন্ত এই কৌশল কার্যকরী হয়েছে। কিন্তু গ্যালিলিওর সাহসী অমান্যতার ফলে কোপার্নিকাসের উপর অতীতে যা আসা পারত এমন সরকারি ধিক্কার নেমে এল।

প্রথমে প্রোটেস্টান্টরা কোপার্নিকাসের প্রতি, ক্যাথলিকদের চেয়ে বেশি তিক্ততা প্রকাশ করেছিলেন। প্রোটেস্টান্ট লুথার বলেছিলেন যে, 'মানুষ ভুঁইফোঁড় জ্যোতির্বিজ্ঞানীটার কথায় কান দিচ্ছে, যে-নাকি বিরুদ্ধতা করে দেখাতে চাইছে যে পৃথিবী ঘুরছে আর স্বর্গ, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র এরা সব ঘুরছে না। যে কেউ খুব ধুরন্ধর চালাক বলে নিজেকে প্রতিপন্ন করতে চায় তো সে একটা নয়া রীতিনিয়ম প্রস্তুত করুক, যা কি না সমস্ত রীতিনিয়মের থেকে উন্নততম হবে। এই আহাম্মকটা জ্যোতিবির্দ্যাকে উল্টে দিতে চায়। কিন্তু পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আমাদের বলেছে যে, যশুয়া সূর্যকে স্থির হয়ে থাকতে আদেশ করেছেন, পৃথিবীকে নয়।' মেলাঞ্চথনও সমানভাবে জোরালো ভাষায় নিন্দা করেছিলেন। তারপর কেপলার ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন 'পৃথিবীও প্রতিষ্ঠিত হল, যাকে নড়ানো যাবে না' (Ps.xciii.I)। তিনি জয়োল্লাসে সিদ্ধান্ত টেনে বলেছিলেন যে, 'যা আত্মার কর্তৃত্বের ওপর কে প্রতিষ্ঠা করবে ওই কোপার্নিকাসের কর্তৃত্ব?' জন ওয়েস্‌লি, অষ্টাদশ শতাব্দীর মতো যুগেও খুব জোরালোভাবে বলার সাহস দেখিয়েও বলেছিলেন যে, 'জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই নতুন তত্ত্ব নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে।'

এ-ব্যাপারে আমার মনে হয় যে, একদিক দিয়ে ওয়েস্‌লি সঠিক। টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্ট, এই দুটি ধর্মগ্রন্থেই শিক্ষার অপরিহার্য অংশটি হল মানুষকে গুরুত্ব দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল মনুষ্য সংশ্লিষ্ট। অবতারবাদ ও প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কিত উপদেশাবলীর কোন বিশ্বাসযোগ্যতা থাকত না যদি ঈশ্বরসৃষ্ট সব কিছুর মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ স্থানীয় হত। কোপার্নিকাসের জ্যোর্তিবিজ্ঞানে এমন কিছুই নেই যা মানুষকে এই গুরুত্বহীন প্রমাণিত করে, (যা আমরা স্বভাবতই নিজেদের সম্পর্কে ভেবে থাকি) কিন্তু, আমাদের গ্রহের অবস্থানচ্যুতি এই ধারণাই জন্ম দেয় যে, গ্রহের অধিবাসীরাও একইভাবে অবস্থানচ্যুত হবে। যখন এটা ভাবা হয়ে থাকে যে, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ও স্থির নক্ষত্ররা আমাদের পৃথিবীকে এক দিনে একবারই ঘোরে

করে, তখন এটা সহজেই অনুমেয় যে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহনক্ষত্ররা আমাদের সুবিধার জন্যেই বিদ্যমান। আর আমরা সেই স্রষ্টার বিশেষ সুবিধাভোগী সৃষ্টি। কিন্তু যখন কোপার্নিকাস ও তাঁর উত্তরসূরিরা জগতে এই বিশ্বাস উৎপাদন করে চলেছিলেন যে, পৃথিবী ও আমরা যখন আবর্তিত হই তখন আমাদের পৃথিবী নক্ষত্রদের নজরে আসে না। যখন এটা প্রতীয়মান হয় যে একাধিক গ্রহ ও সূর্যের তুলনায় পৃথিবী অনেক ক্ষুদ্র, যখন গণনার দ্বারা ও দূরবীক্ষণের দ্বারা আমাদের সৌরজগতের, আকাশপথের ও পরিশেষে অসংখ্য ছায়াপথ সমন্বিত মহাবিশ্বের অসীম ব্যাপ্তি প্রমাণিত হয়, তখন এটা বিশ্বাস করা ক্রমবর্ধমান দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে যে, কি করে ক্ষণস্থায়ী ও সঙ্কীর্ণ একটা আশ্রয়স্থল মানুষের বাসস্থান হিসাবে প্রত্যাশিত গুরুত্ব পেতে পারে। আর তা যদি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ধর্মতত্ত্ব অনুসারে সৃষ্টিসংক্রান্ত লক্ষ্যের অধিকারী হয় মানুষ। কেবলমাত্র পরিমাপের দ্বারাই এই ধারণার সৃষ্টি হল যে সম্ভবত আমরা এই মহাবিশ্বের অভীষ্ট লক্ষ্য নই। আমাদের ভেতরে বসবাসে জাগ্রত আত্মসম্মানবোধ যেন ফিসফিস করে বলে চলে, যদি আমরা মহাবিশ্বের অভীষ্ট লক্ষ্য না হই তবে আমাদের কোনো প্রয়োজনই নেই। অবশ্য এটা আমি বলতে চাই না যে আমার এই চিন্তাপ্রসূত ব্যাপারটা একটা অকাট্য যুক্তি। তবুও যা ছিল অপেক্ষাকৃত পরিমাণে ক্ষুদ্র তা বিশালভাবে উদ্ভূত হয়েছিল কোপার্নিকাসের মতবাদের দ্বারা। আমি শুধুমাত্র এটাই বলতে চেয়েছি যে, কোপার্নিকাসের মতবাদ এমনই একটা ব্যাপার যা উদ্দীপিত করেছিল সেই সব লোককে যাদের মন ছিল এ ব্যাপারে প্রাণবন্ত।[১]

সেইজন্য মোটেই আশ্চর্যের বিষয় ছিল না যে খ্রিষ্টান যাজক সম্প্রদায়, প্রোটেস্টান্ট ও ক্যাথলিক নির্বিশেষে এই নতুন জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে শত্রুতাপূর্ণ কারণ করবে আর সঙ্গত কারণ অনুসন্ধান করবে যাতে এই জ্যোতির্বিজ্ঞানকে প্রচলিত ধর্মের বিরোধী বলে চিহ্নিত করা যায়।

জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে এক বিরাট পদক্ষেপ নিয়েছিলেন কেপলার (১৫৭১-১৬৩০)। কেপলার যদিও গ্যালিলিওর সঙ্গে সহমত পোষণ করতেন, তবুও তিনি তাঁদের সঙ্গে কোনও সংঘাতে যাননি। বিপরীতে, ক্যাথলিক কর্তাব্যক্তিরা এমনকি প্রোটেস্টান্ট মতবাদের অনুগামী হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমা করেছিলেন তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ে বিশিষ্টতা[২] থাকার জন্য।

---

১ উদাহরণস্বরূপ, জিওর্দানো ব্রুনো, ধর্মীয় বিচারে সাত বছর কারাগারে যাকে বন্দি করে রাখার পর ১৬০০ সালে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়।

২ এটা সম্ভবত অন্যান্য গুণাবলী, কারণ সম্রাট তাঁর জ্যোতিষবিদ্যাগত পরিষেবাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

তাঁর অধ্যাপনা কালে যখন গ্রাট্জ (Gratz) শহরের কর্তৃত্ব প্রোটে... হাত থেকে ক্যাথলিকদের হাতে চলে গেল, তখন প্রোটেস্টান্ট শিক্ষকরা ... হয়েছিলেন। তিনি পালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে জেসুইটরা পুনর্বহাল ... তিনি সম্রাট দ্বিতীয় রুডলফের অধীনে রাজকীয় গণিতজ্ঞ হিসাবে ... টাইকোব্রাহের উত্তরাধিকারী হন। এবং টাইকোব্রাহের অমূল্য জ্যো... বিষয়ক নথিপত্র উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে যান। যদি তিনি শুধুমাত্র তাঁ... পদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতেন, তাহলে তাঁকে অনশনে কাটাতে ... তাঁর বেতনের পরিমাণ বেশ বড়ো মাপের হওয়া সত্ত্বেও বেশির ভাগ সময়... বাকি থাকত। জ্যোতির্বিজ্ঞানী হওয়ার পাশাপাশি তিনি জ্যোতিষচর্চাও ... খুব সম্ভবত তিনি আন্তরিকভাবে জ্যোতিষেও বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি যখন ... ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ধনবান ব্যক্তিদের জন্মকুণ্ডলী তৈরি করতেন তখন তিনি ... কাছ থেকে মোটা অর্থ দাবি করতেন। তিনি তাঁর সারল্য ঝেড়ে ফেলে ... মন্তব্য করেছিলেন যে, 'প্রকৃতি যখন প্রত্যেক প্রাণীর জীবনধারণের ... নির্ধারণ করে দিয়েছে তখন প্রকৃতিই ফলিত জ্যোতিষকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ... ও মিত্র বলে নির্ধারণ করেছে।' কোষ্ঠি তৈরি করাই কেপলারের জীবিকা ... একমাত্র উপায় ছিল না। তিনি এক ধনী উত্তরাধিকারীনিকে বিবাহ করেছি... যদিও তিনি সব সময়ই নিজেকে দারিদ্রপীড়িত বলে অভিযোগ করতেন ... তাঁর মৃত্যুর পর দেখা গেল যে, তিনি মোটেই নিঃস্ব ছিলেন না।

কেপলায়ের বৌদ্ধিক চরিত্র ছিল অদ্বিতীয়। তিনি যেমন ... কোপার্নিকাসের প্রকল্পকে সর্বাগ্রে সমর্থন জানিয়েছিলেন, তেমনি অন্যান্য... সূর্য উপাসনাকে যুক্তিগ্রাহ্য করেছিলেন। শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টার দ্বারা তিনি ... সূত্রের আবিষ্কার করেন। কেপলার কল্পনাপ্রসূত এক উদ্ভট প্রকল্পের ... পরিচালিত হয়ে বলেছিলেন যে, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি— এই ... পাঁচটি সুষম কঠিন পদার্থের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কেপলারের এই আবিষ্কারটি... আবিষ্কারের একটি চরমতম নিদর্শন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে অবশ্য এটা বিরল... নয়। ওই ধরনের তত্ত্বগুলি যা আবিষ্কারকদের মনে সত্য ও গুরুত্বপূর্ণ ... প্রতীয়মান হয় তা আসলে অদ্ভুত কল্পনাপ্রসূত ও অবাস্তব। আসল ঘটনা ... সঠিক প্রকল্প অনুধাবন করা খুবই মুশকিলের। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ... জরুরি এই বিষয়টিকে সহজতর করার প্রয়োগকৌশলের কোনো অস্তিত্ব ... নেই। ফলস্বরূপ কোনো সুশৃঙ্খল পরিকল্পনার দ্বারা যখন নতুন প্রকল্পগুলি ... জন্মায় তখন তা সঙ্গতভাবেই উপযোগী হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারটা...

বিশ্বাস রাখা যায় তাহলে তা অনুসন্ধানকারীকে ধৈর্যশীল করে তোলে আর তাতে পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে নতুন নতুন সম্ভাবনারও সৃষ্টি হয়। যাই হোক, তাতে এরকম অনেক প্রকল্পকেই খারিজ করতে হয়েছে। কেপলারের ক্ষেত্রেও তাই ঘটনা ঘটেছিল। তাঁর অবিশ্বাস্য ধৈর্য্যশীলতার জন্য চরম সাফল্য এসেছিল, বিশেষ করে তাঁর তৃতীয় সূত্র আবিষ্কারের ব্যাপারে। কিন্তু তাঁর ধৈর্য্যশীলতার মূল কারণ ছিল অতীন্দ্রিয়তায় বিশ্বাস। এই বিশ্বাস একটি সূত্রের যোগান দিয়েছিল। সেটা কথা, গ্রহগুলো আবর্তনের দ্বারা 'একটা গাগণিক সঙ্গীত' সৃষ্টি করে। এই সঙ্গীত কেবল সূর্যের আত্মাই শুনতে পায়। এর কারণ এই ধারণায় তিনি দৃঢ় ছিলেন যে, সূর্য হলো কম বা বেশি স্বর্গীয় আত্মার একটি দেহ।

কেপলারের প্রথম দুটি সূত্র ১৬০৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তৃতীয়টি প্রকাশিত হয় ১৬১৯ সালে। আমাদের সৌরজগতের সাধারণ ছবিটার দৃষ্টিকোণ থেকে এই তিনটির ভিতর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল প্রথমটি। এই সূত্রে বলা হয়েছিল যে, গ্রহরা সূর্যের চারদিকে উপবৃত্তাকারে ঘুরে চলেছে, আর সূর্য, একটি ফোকাস বরাবর করে রয়েছে। উপবৃত্ত আঁকতে, ধরা যাক, এক ইঞ্চির দূরত্বে দুটো পিনকে পৃথকভাবে এক টুকরো কাগজে আটকানো হলো। তারপর দুই ইঞ্চি লম্বা এক টুকরো সুতো নেওয়া হলো এবং সুতো টুকরোর দুটি প্রান্ত ওই দুটো পিনে বেঁধে দেওয়া হলো। সুতোটিকে দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী যে-কোনো বিন্দু থেকে টেনে ধরলে যে-বিন্দুগুলোতে পৌঁছানো যায় সেই বিন্দুগুলো যোগ করলে একটি উপবৃত্ত পাওয়া যাবে। ওই পিন দুটোর অবস্থান হবে ওই উপবৃত্তের দুটো ফোকাস। এর মানে হলো একটি উপবৃত্ত সেইসব বিন্দুর সংযোগে গঠিত যে-বিন্দুগুলোর ক্ষেত্রে ফোকাস থেকে ওই বিন্দুগুলোর দূরত্বের সমষ্টি সবসময় সমান। প্রথমে গ্রিকরা ধরে নিয়েছিল যে, আকাশে অবস্থিত সবকিছুই চক্রাকারে ঘোরে কারণ বৃত্তই হলো সবচেয়ে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ বদ্ধ বক্ররেখা। যখন তাঁরা দেখলেন যে, এই প্রকল্প কাজে আসছে না তখন তাঁরা একটি নতুন প্রকল্প প্রতিষ্ঠিত করল। এই প্রকল্পের কথা, গ্রহরা 'উপচক্রাকারে" ঘোরে। এর মানে বৃত্তগুলো যে-বিন্দুর চারদিকে ঘোরে, সে-বিন্দু নিজেই বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। (একটি উপচক্র তৈরি করতে একটা বড় চাকা নিয়ে সেটা মাটিতে রাখতে হবে। তারপর একটি ছোটো চাকা নিতে হবে যার বেড়ে কাঁটা থাকবে। তারপর বড়ো চাকাটিকে ঘিরে ছোটো চাকাটি ঘোরালে মাটিতে পেরেক দ্বারা চিহ্নিত দাগগুলো হবে একটি উপচক্র। যদি পৃথিবী যদি সূর্যের চারদিকে বৃত্তাকারে ঘোরে আর চাঁদ যদি পৃথিবীর চারদিকে বৃত্তাকারে ঘোরে তাহলে বলা হবে যে, চাঁদ সূর্যের চারদিকে উপচক্রাকারে

ঘুরছে।) যদিও গ্রীকরা উপবৃত্তগুলি সম্বন্ধে বেশ ভালো রকমই জানত, এ
যত্ন সহকারে গণিতের উপাদানগুলি নিয়ে পড়াশোনাও করেছিল। কি
তাদের মনে আসেনি যে আকাশে অবস্থানকারী বস্তুগুলি বৃত্ত এবং
জটিলতাগুলি ছাড়াও ঘুরতে পারে। কারণ তাদের নান্দনিক বোধ
অনুমানকে প্রভাবিত করেছিল। এবং এক সুসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকল্প ছাড়া সবকিছু
খারিজ করেছিল। গ্রীকদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পণ্ডিতসুলভ মনো
জন্যে তারা সংস্কারবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। কেপলারই সর্বপ্রথম সাহস করেছিলেন
ব্যাপারে তাদের বিরোধিতা করতে। পূর্বকৃত ধারণাগুলির যদি নান্দনিক
থাকে তাহলে তারা মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করে। যেমনটা নৈতিক
ও ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে ঘটে থাকে। এ-ব্যাপারে কেপলারই একজন
শ্রেণীর নূতনত্বের প্রবর্তনকারী। যাই হোক, তাঁর ওই তিনটি সূত্র বিজ্ঞানের
ইতিহাসে এক বিরাট স্থান অধিকার করে আছে। কারণ এই সূত্র তিনটি নিউটনের
মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের প্রমাণ জুগিয়েছিল।

কেপলারের সূত্রগুলি, মাধ্যাকর্ষণের সূত্রের বিপরীতে নির্ভেজাল বর্ণনামূলক
ছিল। তাঁর সূত্রগুলো গ্রহগুলোর আবর্তন সম্বন্ধে কোনো সাধারণ কারণ দর্শায়নি
কিন্তু কতকগুলি সরলসূত্রের ধারণা দিয়েছিল যার দ্বারা পর্যবেক্ষণের ফলাফলের
উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। বর্ণনার সারল্যে এই তত্ত্বের একটাই সুবিধা ছিল
যে গ্রহগুলো পৃথিবী নয়, সূর্যের চারদিকে ঘুরত। এবং আপাত প্রতীয়মান
দৈনিক আবর্তনের কারণ পৃথিবীর ঘূর্ণন। সপ্তদশ শতাব্দীর জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের
এটা প্রতীয়মান হয়েছিল যে, সংযুক্ত সারল্যের চাইতে পৃথিবী সত্যিতেই ঘোরে
এবং গ্রহরাও সত্য সত্যই সূর্যের চারদিকে ঘোরে। এই মতটি নিউটনের
শক্তিবৃদ্ধি ঘটিয়েছিল। কিন্তু আসলে যেহেতু সব গতিই আপেক্ষিক, সে
সূর্যকে ঘিরে পৃথিবী ঘোরে আর যে-প্রকল্পে পৃথিবীকে ঘিরে সূর্য ঘোরে
মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় আমরা করতে পারি না। একই ঘটনার মাত্র দুটি ভিন্ন
বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন ক, খ,—কে বিবাহ করে অথবা খ, ক-কে বিবাহ
করে। কিন্তু আমরা যখন পুংঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করি তখন কোপার্নিকাসের
বর্ণনার সারল্য বিরাট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে,
সুস্থির মস্তিষ্কের মানুষ, পৃথিবী অনড়, এই তত্ত্বের জটিলতা দ্বারা নিজেকে
ভারাক্রান্ত করবেন না। আমরা বলে থাকি যে, একটা ট্রেন এডিনবরার দিকে
করছে। কিন্তু এটা বলি না যে, এডিনবরা ট্রেনের দিকে যাত্রা করছে। যৌক্তিক
ছাড়া আমরা দ্বিতীয়টাও বলতে পারতাম। সেক্ষেত্রে এটা আমাদের ধারণা

মনে যে, সমস্ত শহরগুলো এবং মাঠগুলো ট্রেনের লাইন ধরে হঠাৎ অত্যন্ত দ্রুতবেগে দক্ষিণ মুখে ধেয়ে চলেছে। এই ব্যাপারটা ট্রেনটি ছাড়া পৃথিবীর যেকোনো ক্ষেত্রে বিস্তৃত করা যায়। এটা যুক্তির দিক দিয়ে সম্ভব কিন্তু অপ্রয়োজনীয়ভাবে জটিল। টলেমির প্রকল্প একইভাবে নক্ষত্রগুলির দৈনন্দিন আবর্তনের ব্যাপারে নিয়মবহির্ভূত ও উদ্দেশ্যবিহীন। কিন্তু একইভাবে বৌদ্ধিক ভুল থেকে মুক্ত। যাই হোক, কেপলার, গ্যালিলিও এবং তাদের বিরোধীপক্ষ যেহেতু গতির আপেক্ষিকতার সত্যতা স্বীকার করেননি, সেহেতু বির্তকের প্রশ্নটা বর্ণনার সুবিধার্থে গ্রাহ্য নয়, এটি গ্রাহ্য বিষয়গত সত্য হিসাবে। এই ভুলটা মনে হয়, সেই সময়কাল জ্যোতির্বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য একটি প্রয়োজনীয় উদ্দীপক বিষয় ছিল। কারণ স্বর্গীয় বস্তুর অবস্থার নিয়ন্ত্রণের নিয়ম কখনই আবিষ্কৃত হতো না যদি না কোপার্নিকাসের প্রকল্প সারল্যের কথা না বলতো।

গ্যালিলিও গ্যালিলি (১৫৬৪-১৬৪২) তাঁর আবিষ্কারগুলির জন্য এবং শাসকদের বিচারসভার বিরোধিতার জন্য সেই সময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিমানবব্যক্তিত্ব বলে স্বীকৃত ছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন একজন দরিদ্র গণিতজ্ঞ। এবং তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন লাভজনক শিক্ষার দিকে তাঁর ছেলেকে চালিত করতে। উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি গ্যালিলিওকে গণিত যে-একটি বিষয়, সে-ধারণা থেকে দূরে রাখতে সফল হয়েছিলেন। গ্যালিলিও আড়ি পেতে জ্যামিতি সম্পর্কিত বক্তৃতা শুনলেন। তিনি ঐকান্তিক আগ্রহে বিষয়টি গ্রহণ করেন। এটি ছিল তাঁর কাছে আকর্ষণীয় নিষিদ্ধ ফলের মতো। দুর্ভাগ্যবশত এই ঘটনার গুরুত্বকতা স্কুলশিক্ষকের আবর্তে হারিয়ে গেছে।

গ্যালিলিওর সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব ছিল এই যে, তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গাণিতিক দক্ষতার মিলন ঘটিয়ে তাঁর সূত্রগুলিকে গাণিতিক সূত্রে রূপ দিতে পেরেছিলেন। গতিবিজ্ঞানের শিক্ষা অর্থাৎ বস্তুর গতিকে নিয়ন্ত্রণের সূত্র তাঁর হাতেই শুরু হয়েছিল। গ্রীকরা স্থিতিবিদ্যা অর্থাৎ ভারসাম্যের সূত্রগুলি অধ্যয়ন করেছিল। কিন্তু গতির, বিশেষ করে বিভিন্ন বেগসম্পন্ন গতির সূত্রগুলিকে গ্রীকরা এবং ষোড়শ শতাব্দীর মানুষেরা সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছিল। শুরুতে, এটা ভাবা হয়েছিল যে, গতিসম্পন্ন বস্তুকে যদি ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে সেই বস্তু নিজে থেকেই থেমে যাবে। পক্ষান্তরে গ্যালিলিও প্রমাণ করলেন যে, বস্তুটি সমান গতিবেগে একটি সরলরেখায় চলবে যদি বাইরের সমস্ত রকমের প্রভাব থেকে বস্তুটি মুক্ত থাকে। বিষয়টি অন্যভাবে রাখলে, পরিবেশ সংক্রান্ত অবস্থাগুলিকে বিচারের জন্য অবশ্যই বিচারের মধ্যে আনতে হবে, বস্তুর গতির জন্য নয়, গতি পরিবর্তনের জন্য, সেটা

লক্ষ্য অথবা বেগ অথবা দুইয়েরই পরিবর্তনের জন্য। গতিবেগ অথবা গ... অভিমুখের পরিবর্তনকে ত্বরণ বলা হয়। এইভাবে বস্তুগুলো আন্দোলিত হয়। ... কেন, তার ব্যাখ্যায় বলা হয় এটা ঘটে ত্বরণের জন্য, বেগের জন্য নয়। ... প্রমাণ করে যে, গতির প্রয়োগ বাইরে থেকে হয়। এই তত্ত্বের আবিষ্কারটা ... গতিবিজ্ঞানে প্রথম অপরিহার্য পদক্ষেপ।

তিনি তাঁর পড়ন্ত বস্তুগুলি সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফল ব্যাখ্যা করতে ... এই তত্ত্ব প্রয়োগ করেছিলেন। অ্যারিস্টটল শিক্ষা দিয়েছিলেন, যে-গতিতে এক... বস্তু ওপর থেকে পড়ে সেটি সেই বস্তুর ওজনের সমানুপাতিক। অর্থাৎ একটি ... ধরা যাক, তার ওজন দশ পাউণ্ড এবং অপর একটি বস্তু যার ওজন এক পা... তাদের একই উচ্চতা থেকে একই সময়ে নিচে ফেলে দেওয়া হলো। এক পা... ওজনের বস্তুটি দশ পাউন্ড ওজনের বস্তুটির দশগুণ বেশি সময় নেবে মাটি... পড়তে। পিসার অধ্যাপক গ্যালিলিওর ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য অধ্যাপকদের অনুভূতির প্রতি কোনো শ্রদ্ধা ছিল না। অ্যারিস্টটলপন্থী অধ্যাপকদের লেকচার দিতে যাওয়ার পথে পিসার হেলানো মিনার থেকে গ্যালিলিও ওজনের মাটিতে ছুঁড়ে ফেলতেন। বড়ো এবং ছোটো সীসার পিণ্ডগুলো মাটিতে যুগপৎ প্রায় একই সঙ্গে এসে পড়ত। এই ঘটনা গ্যালিলিওর কাছে এটা প্রমাণ করেছিল যে অ্যারিস্টটল ভুল করেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য অধ্যাপকদের কাছে এটা ছিল গ্যালিলিরও দুষ্টুমিপনা। অসংখ্য বিদ্বেষপরায়ণ প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে এটি ছিল একটি বিশেষ ধরনের নমুনা। গ্যালিলিওকে বিরামহীন ঘৃণা পেতে হয়েছে তাঁদের কাছে যারা বিশ্বাস করতেন যে, সত্যের অনুসন্ধান করতে হবে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে নয়, বই পড়ে।

গ্যালিলিও আবিষ্কার করেছিলেন যে, বাতাসের বাধা ছাড়াও যখন বস্তুগুলি মুক্তভাবে পড়তে থাকে তখন সেগুলি একইরূপ ত্বরণের সাথে পড়তে থাকে। এটি একটি সম্পূর্ণ শূন্য অবস্থায় সকলের জন্য একই ভাবে ঘটে। তা সেই বস্তুগুলি স্তূপাকৃতিই হোক অথবা বস্তুগুলি উপাদানেই গঠিত হোক। যখন একটি বস্তু শূন্যতার মধ্যে প্রতি সেকেন্ডে পড়তে থাকে তখন তার গতি প্রতি সেকেন্ডে বাড়তে থাকে ৩২ ফুট হিসাবে। তিনি আরও প্রমাণ করেছিলেন যে, যখন একটি বস্তু আড়াআড়িভাবে ছুঁড়ে দেয়া হয়, ঠিক বুলেটের মতো, এটি তখন একটি অধিবৃত্তের মধ্য দিয়ে যেতে থাকে। অথচ আগে এটা ধরা হত যে বস্তুটি কিছুক্ষণের জন্য আড়াআড়িভাবে চলবার পর লম্বাভাবে পড়তে থাকে। এই ফলাফলগুলি এখন আর রোমাঞ্চকর বলে মনে হয় না। কিন্তু বস্তুগুলি কী করে আন্দোলিত হয় তার ...

গাণিতিক জ্ঞানের এগুলিই ছিল সূচনা। তাঁর সময়কালের আগেও বিশুদ্ধ গণিত ছিল। যা ছিল অবরোহী পদ্ধতির এবং পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল। তখন পুরোপুরি একধরনের পরীক্ষামূলক গবেষণা ছিল, বিশেষ করে সেটা ছিল অপরসায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু তিনি ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভ্যাসটির সূত্রপাতের জন্য যথেষ্ট কাজ করেছিলেন। তাঁর কাজের লক্ষ্য ছিল একটি গাণিতিক নিয়মে পৌঁছানো। এই নিয়মকে বস্তুতে প্রয়োগের ক্ষেত্রে গণিতকে সক্ষম করা, যা নিয়ে পূর্ব নির্ধারিত জ্ঞান থাকত না। তিনি সচেষ্ট ছিলেন নাটকীয়ভাবে এবং অকাট্যভাবে এটা প্রমাণ করতে যে, সামান্যতম পরীক্ষার চেষ্টা করলেই যেটা মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারত বংশপরম্পরায় সেটা করা হয়নি। অ্যারিস্টটলের থেকে গ্যালিলিও, এই দু'হাজার বছর ধরে কেউই এটা বুঝতে চায়নি যে অ্যারিস্টটলের বলা পড়ন্ত বস্তুগুলি সম্পর্কিত সূত্রগুলি সঠিক কিনা। এইরকম বিবৃতিগুলিকে পরীক্ষা করা এখন আমাদের কাছে খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু গ্যালিলিওর সময়ে এর জন্য প্রতিভাধরদের প্রয়োজন ছিল।

পড়ন্ত বস্তু সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি যদিও পণ্ডিতম্মন্যদের খেপিয়ে তুলত, তবুও ধর্ম—আদালত এর নিন্দা করতে পারেননি। দূরবীক্ষণই গ্যালিলিওকে খুবই বিপজ্জনক রাস্তায় ঠেলে দিয়েছিল। একজন ওলন্দাজ ওই ধরনের একটা যন্ত্র আবিষ্কার করছেন শুনে গ্যালিলিও এমনটি পুনঃআবিষ্কার করলেন। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অনেক নতুন নতুন জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় ঘটনা আবিষ্কার করলেন, যার মধ্যে তাঁর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বৃহস্পতির একাধিক উপগ্রহের অস্তিত্ব। কোপার্নিকাসের তত্ত্ব অনুযায়ী ওইগুলি সৌরজগতের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু ওগুলোকে টলেমির তথ্যের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো মুশকিল ছিল। অধিকন্তু স্থির নক্ষত্রদের কথা বাদ দিয়েও আরও নানাধরনের জানার বিষয় ছিল। মহাকাশে সাতটি বস্তুর আবশ্যিকতাই গ্রাহ্য হত (সূর্য, চন্দ্র এবং আর পাঁচটি গ্রহ)। অতিরিক্ত চারটির আবিষ্কারই ছিল সবচেয়ে বিপর্যয়কারী। ওখানে কি এ্যাপোক্যালিপসের সাতটি সোনার বাতিদান ছিল না আর এশিয়াতে কি সাতটি গীর্জা ছিল না? অ্যারিস্টটলপন্থীরা দূরবীক্ষণের মাধ্যমে অবলোকন করাকে সর্বতোভাবে প্রত্যাখান করেছিলেন এবং অনমনীয়ভাবে এইমত পোষণ করেছিলেন যে বৃহস্পতির চারটি চাঁদের কথা হল একটা বিভ্রান্তি।[৩]

---

১. উদাহারণস্বরূপ, ফাদার ক্ল্যাভিয়াস বলেছিলেন যে, 'জুপিটারের চারটি উপগ্রহকে দেখতে হলে মানুষকে এমন যন্ত্র আবিষ্কার করতে হবে যা এই উপগ্রহগুলোকে সৃষ্টি করবে।'—White এর Warfare of Science with Theology. প্রথম খণ্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কিন্তু গ্যালিলিও বিচক্ষণতার সঙ্গে টুসক্যানির গ্রান্ড ডিউকের নামে তাঁদের নামকরণ করেছিলেন 'সিডেরা মেডিসিয়া (মেডিসিয়ান স্টার)'। এটা গ্রহসমূহের বাস্তবতা সম্বন্ধে অনেকটাই সরকারের প্রত্যয় জন্মাতে সাহায্য করেছিল। তাঁরা যদি কোপার্নিকাসের তত্ত্বের জন্য যুক্তি প্রদান না করতেন তাহলে তাঁরা তাঁদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছিলেন তাঁরা বেশি দিন পর্যন্ত তাঁদের মতকে ধরে রাখতে পারতেন না।

বৃহস্পতিবার চাঁদগুলি ছাড়া, দূরবীক্ষণ ধর্মতাত্ত্বিকদের পক্ষে ভয়ংকর অন্যান্য অনেক জিনিসের রহস্য উদ্ঘাটন করেছিল। দূরবীক্ষণ প্রমাণ করেছিল যে, শুক্র গ্রহের চাঁদের মতো চন্দ্রকলা আছে। কোপার্নিকাস এটাকে তাঁর তত্ত্বে প্রত্যাশা করেছিলেন। গ্যালিলিওর যন্ত্র কোপার্নিকাসের বিরুদ্ধে উত্থিত যুক্তিকে তাঁর স্বপক্ষে যুক্তি হিসাবে বদলে দিল। যন্ত্রে দেখা গেল চাঁদে অনেক পাহাড় আছে যেটা কতিপয় কারণে বেদনাদায়ক মনে হয়েছিল। আরও ভয়ঙ্কর ছিল এই কথাটা যে, সূর্যের কলঙ্ক আছে। সেই সময় এটা বিবেচিত হয়েছিল যে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি কলঙ্কযুক্ত বলে দেখানো যাচ্ছে। ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সূর্যের কলঙ্কের কথাকে উল্লেখ করতে নিষিদ্ধ করেছিলেন। এবং তাঁদের মধ্যে কিছু মানুষ এই নিষেধ শতাব্দীকাল ধরে মেনেছিলেন। একজন ডোমিনিক সন্তের পদোন্নতি করা হয়েছিল শ্লেষাত্মক পুঁথির একটি উপদেশের জন্য, 'ওহে গ্যালিলির অনুসরণকারী মানুষেরা, তোমরা স্বর্গের দিকে তাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন?' কালক্রমে এই ডোমিনিকান এইমত পোষণ করেছিলেন যে, জ্যামিতি শয়তানের শাস্ত্র এবং ওইসব গণিতজ্ঞদের সমস্ত ধর্মবিদ্বেষের প্রবক্তা হিসাবে নির্বাসিত করা উচিত। ধর্মতাত্ত্বিকরা এটা নির্দেশ করতে দেরি করেননি যে, নতুন মতবাদ অবতারবাদকে বিশ্বাস করাতে খুবই মুশকিলে পড়বে। সর্বোপরি, যেহেতু ঈশ্বর উদ্দেশ্যহীনভাবে কিছু করেন না, আমরা অবশ্যই ধরে নেব যে অন্যান্য গ্রহগুলিই স্বাভাবিক আবাসস্থল। কিন্তু সেখানকার অধিবাসীরা কি নোয়ার বংশধররূপে উদ্ভূত হয়েছিলেন অথবা বিশেষ ত্রাণকর্তা তাঁদের ত্রাণ করেছিলেন? কার্ডিনাল এবং আর্চ বিশপদের মতে ওইগুলোই ছিল কিছু ভয়ঙ্কর সন্দেহের ব্যাপার যা গ্যালিলিওর অপবিত্র অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তুলতে চাইবে। এ-সবের ফলস্বরূপ ধর্ম-আদালত জ্যোতির্বিজ্ঞানকে তাদের এক্তিয়ারে অন্তর্ভূক্ত করেছিল এবং নির্দিষ্ট ধর্মগ্রন্থ থেকে অবরোহী পদ্ধতিতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

'প্রথম প্রস্তাব ছিল যে, সূর্য কেন্দ্রে অবস্থিত এবং পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে না, এটা বলা মূর্খতা, ধর্মতত্ত্বের বিচারে মিথ্যা এবং প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী, কারণ

পবিত্র ধর্মগ্রন্থের বিপরীতে এটা বলা হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাব হলো পৃথিবী কেন্দ্রে অবস্থিত নয়, কিন্তু সূর্যের চারদিকে ঘোরে, এটাও অসম্ভব, দর্শনশাস্ত্র অনুযায়ী মিথ্যা এবং অন্তত ধর্মতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা সত্যবিশ্বাসের বিরোধী।'

এর অব্যবহিত পরেই গ্যালিরিওকে পোপ আদেশ করেছিলেন ধর্ম-আদালতে উপস্থিত হবার জন্য। ধর্ম-আদালতে গ্যালিলিওকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল শপথপূর্বক তাঁর ভুলগুলিকে পরিত্যাগ করতে। ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ফেব্রুয়ারি তিনি তা পালন করেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি আর কখনই কোপার্নিকাসের মত অবলম্বন করবেন না কিংবা ওই মতের শিক্ষা তিনি লিখিত বা মৌখিকভাবে দেবেন না। এটা অবশ্যই মনে রাখার বিষয় যে, ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারার মাত্র ষোলো বছর পর এটা ঘটেছিল।

পোপের নির্দেশে, পৃথিবী ঘোরে, এটা-বলা সব বইপত্র ইনডেক্সের ওপর রাখা হলো। এবং এই প্রথম কোপার্নিকাসের কাজের নিন্দা করলেন গ্যালিলিও। গ্যালিলিও ফ্লোরেন্সে চলে গেলেন। সেখানে একান্তে কিছুদিন বাস করলেন এবং তাঁর বিজয়ী শত্রুদের সঙ্গে যোগযোগ রাখলেন না।

গ্যালিলিও, যাই হোক, একজন আশাবাদী মানসিকতার মানুষ ছিলেন। এবং সবসময়ে তাঁর প্রবণতা ছিল মূর্খদের বিরুদ্ধে তাঁর উদ্ভাবনী শক্তিকে পরিচালিত করা। ১৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর বন্ধু কার্ডিন্যাল বারবেরিনি, অষ্টম আরবার্ন এই উপাধি নিয়ে পোপ নিযুক্ত হলেন। এটা গ্যালিলিওর মনে একটা নিরাপত্তার বোধ এনে দিয়েছিল। কিন্তু ঘটনাবলী এটা ভুল প্রমাণ করে। তিনি তাঁর *Dialgus on the Two Gratest Systems of the World* বইটি লেখার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এই বইটি ১৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়ে ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই বইটিতে তিনি একটি ক্ষীণ অজুহাত রেখেছিলেন দুটি বিরাট তত্ত্বের বিষয়কে আলোচনায় রাখতে। যার একটি ছিল টলেমির আর অন্যটি কোপর্নিকাসের। আসলে কিন্তু এটা ছিল শেষোক্ত ব্যক্তির পক্ষে একটি শক্তিশালী যুক্তির অবতারণা। এটি একখানা বুদ্ধিদীপ্ত বই। সারা ইউরোপ জুড়ে সাগ্রহে বইটি পড়া হয়েছিল।

বিজ্ঞানের জগৎ এই বইটিকে প্রশংসা করেছিল, কিন্তু গীর্জার পাদ্রিরা ক্ষেপে উঠেছিলেন। গ্যালিলিওর উপর বাধ্যতামূলকভাবে চাপানো নীরবতার সময়কালে তাঁর শত্রুরা সংস্কার বাড়ানোর সুযোগ নিয়েছিল এমন কতিপয় যুক্তির দ্বারা, যার উত্তর দেওয়া হঠকারিতার পর্যায়ে পড়ত। এটা দাবি করা হয়েছিল যে, ঈশ্বরের ধর্ম সম্বন্ধীয় উপদেশাবলীর সঙ্গে গ্যালিলিওর শিক্ষার কোনো সঙ্গতি নেই।

জেসুইট ফাদার মেলচিওর ইন্‌চোফার বিশ্বাস করতেন যে, 'পৃথিবী ঘুরছে এই মতটি প্রচলিত ধর্মবিদ্বেষের বিশ্বাসগুলির মধ্যে সবচেয় জঘন্য, ভীষণ ক্ষতিকর এবং সবচেয়ে কুৎসাপূর্ণ। পৃথিবী যে-গতিহীন অনড় এটা সবচেয়ে পবিত্র ব্যাপার। আত্মার অবিনশ্বরতার, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, এবং অবতারবাদ এসবের বিরুদ্ধে যুক্তিকে যদিও সহ্য করা যায় কিন্তু পৃথিবী ঘুরছে এটা প্রমাণ করার যুক্তিকে সহ্য করা যায় না।' শেয়ালকে দেখে শিকারিরা যেমন চিৎকার করে, ধর্মতত্ত্ববিদেরা সেই রকম চিৎকার শুরু করেছিল এবং একে অপরকে উত্তেজিত করে তুলেছিল। একজন বৃদ্ধ, অশক্ত, অসুস্থ, এবং প্রায়ান্ধ মানুষকে খুঁজে বার করার জন্য তারা সবাই হন্যে হয়ে চেষ্টা চালালো। গ্যালিলিওকে আরেকবার ধর্মযাজকদের ধর্ম আদালতে উপস্থিত হওয়ার জন্যে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। তিনি ধর্ম-আদালতের নির্দেশ অমান্য করছেন, এটা ধরে নিয়ে ১৬১৬ সালের নির্দেশের চাইতে কড়া মেজাজ দেখান হতে থাকল। প্রথমে সনির্বন্ধ আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন, তিনি এতই অসুস্থ যে, ফ্লোরেন্স থেকে যাত্রার ধকল তাঁর সহ্য হবে না। পোপ অবিলম্বে তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসককে ওই অপরাধী (গ্যালিলিও)-কে পরীক্ষা করার জন্য পাঠাবেন বলে হুমকি দিলেন। যদি অসুস্থতা সাংঘাতিক বলে প্রমাণিত না হয়, তাহলে তাঁকে শৃঙ্খলিত করে আনা হবে, এই হুমকিতে গ্যালিলিও তাঁর শল্য-চিকিৎসক দূতের রায়ের জন্য অপেক্ষা না করে যাত্রা শুরু করলেন। কারণ অষ্টম আরবার্ন তখন গ্যালিলিওর ক্রুদ্ধ প্রতিপক্ষ ছিলেন। রোমে পৌছলে তাঁকে ধর্ম আদালতের কারাগারে আটক করা হয়। এই বলে হুমকি দেয়া হয় যে, পূর্বেকার ধারণা পরিহার না করলে তাঁকে শরীরিক অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হবে। ধর্ম আদালতে প্রভু যিশু ও তাঁর মহিমান্বিত কুমারী মা মেরির নাম উচ্চারণ করে আহ্বান জানিয়ে হুকুম জারি করেছিল যে, গ্যালিলিও প্রচলিত ধর্মমতের বিশ্বাসের বিরুদ্ধতার জন্য শাস্তির দায় বহন নাও করতে পারেন, যদি তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে এবং অকৃত্রিম বিশ্বাসের সঙ্গে ওই বিচারকদের উপস্থিতিতে তাঁর ভুলগুলোকে এবং প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে বিশ্বাসগুলিকে শপথপূর্বক পরিত্যাগ করেন। পূর্বের বিশ্বাস পরিত্যাগ করলেও এবং কৃতপাপের জন্য অনুতপ্ত হলেও, 'আমাদের ইচ্ছানুযায়ী বিবেচিত সময়ের জন্য এই পবিত্র আদালতের কারাগারে থাকতে হবে। কল্যাণকর প্রায়শ্চিত্তের প্রসঙ্গে, আমরা আপনাকে এই আদেশ প্রদান করছি যে, পরবর্তী তিন বছর ধরে, সপ্তাহে একবার, প্রায়শ্চিত্ত বিধানগ্রন্থের সাতটি স্তোত্র আপনাকে আবৃত্তি করতে হবে।' তুলনামূলকভাবে কোমল এই রায় পূর্বতন বিশ্বাস পরিত্যাগের শর্তসাপেক্ষ ছিল। গ্যালিলিও ওই রায় অনুযায়ী হাঁটু গেড়ে বসে

যাজকদের দ্বারা তৈরি দীর্ঘ অনুমোদিত বিধানগুলিকে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন। স্বীকারোক্তির এই প্রক্রিয়ায় তিনি বললেন, 'শপথপূর্বক আমি আমার ভুলগুলিকে ও প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধতাকে পরিত্যাগ করছি, ঘৃণা করছি ও অভিশাপ দিচ্ছি। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, ভবিষ্যতে মৌখিকভাবে ও লিখিতভাবে আর কখনই এমন কিছুই বলব না, ঘোষণা করব না যা আমার প্রতি এই ধরনের সন্দেহ জাগায়।' তিনি যাজকদের বিচারসভার সামনে প্রতিজ্ঞা করে আরও বললেন যে, এরপর তিনি প্রচলিত ধর্মমতের কোনো বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলে যিনি বিশ্বাস করেন যে, পৃথিবী ঘুরছে, তাহলে তাকে তিনি বর্জন করবেন। তিনি খ্রিষ্টের উপদেশাবলী সম্বলিত গ্রন্থের উপর হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করে বললেন যে, তিনি নিজে তাঁর পূর্বতন মতবাদকে শপথপূর্বক পরিত্যাগ করছেন। সেই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটিকে দিয়ে তাঁর 'শপথভঙ্গের মাধ্যমে ধর্মীয় ও নৈতিক স্বার্থ রক্ষিত হয়েছে এতে সন্তুষ্ট হয়ে ধর্ম-আদালত তাঁর বাকি জীবনটা বন্দিদশায় এবং নিঃসঙ্গতায় কাটানোর অনুমতি দিল। এই বন্দিজীবন কারাগারে নয় সত্য, কিন্তু তাঁর সমুদয় চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং তাঁর পরিবারের লোকজন ও বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ১৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং ১৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে যে-বছর নিউটন জন্মগ্রহণ করেন সেই বছর তিনি প্রয়াত হন। যাজক সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণে-থাকা সমস্ত বিদ্বজ্জন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাছে সত্য হিসাবে কোপার্নিকাসের তত্ত্বের শিক্ষাকে নিষিদ্ধ করেছিলেন। পৃথিবী ঘোরে এই শিক্ষা সম্বলিত যাবতীয় বইপত্র ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত কেবল সূচিপত্রেই রয়ে গেল। ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে ওয়ার্শতে থরওয়াল্ডসেনের তৈরি কোপার্নিকাসের মূর্তির আবরণ যখন উন্মোচিত হল, তখন এক বিরাট জনতা ওই জ্যোতির্বিজ্ঞানীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে সমবেত হয়েছিল। কিন্তু কোনো ক্যাথলিক যাজক ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না। ক্যাথলিক ধর্মযাজকেরা প্রায় ২০০ বছর ধরে অনিচ্ছাভরে একটি তত্ত্বের বিরুদ্ধে দুর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধতা বজায় রেখেছিলেন। অথচ সেই পুরো সময় ধরে যোগ্য জ্যোতির্বিদদের দ্বারা এই তত্ত্ব সমর্থিত ছিল।

এটা মনে করা অবশ্যই ঠিক নয় যে, প্রোটেস্টান্ট ধর্মতাত্ত্বিকরা প্রথমে ক্যাথলিকদের চেয়ে এই তত্ত্বের প্রতি বেশি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল। কিন্তু নানা কারণে তাদের বিরোধিতা কম কার্যকর ছিল। প্রোটেস্টান্ট প্রভাবিত দেশগুলিতে ধর্মমতের গোড়ামিকে জোরদার করার ব্যাপারে রোমান ক্যাথলিক যাজকদের চেয়ে ক্ষমতাশালী তেমন কেউ ছিলেন না। অধিকন্তু সম্প্রদায়গত বৈচিত্র্যের জন্য ধর্মগত

কারণে নির্যাতন চালানো মুসকিল ছিল। এ-ভাবেই ধর্মকে কেন্দ্র করে যে-যু তাতে যুক্তফ্রন্টই কাম্য হয়ে উঠেছিল। দেকার্ত ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দের গ্যালিলি দণ্ডাদেশের কথা শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। এবং হল্যান্ডে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর শাস্তির কথা শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন এবং হল্যান্ডে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর শাস্তির কথা শুনে হল্যান্ডের ধর্মতত্ত্ববিদরা হইচই করেছিলেন কিন্তু সেখানকার সরকার ধর্মীয় সহনশীলতার নীতিকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন। সর্বোপরি অভ্রান্ততার দাবি থেকে প্রোটেস্টান্ট গির্জাসমূহের কোনো ক্ষতিই হয়নি যদিও খ্রিষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র মৌখিকভাবে অনুপ্রেরণাদানকারী বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ওই ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যার ব্যাপারটা ব্যক্তিগত বিচারের উপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এই ব্যাপারটা শীঘ্রই ধর্মমতের অসুবিধাজনক রচনাগুলিকে ব্যাখ্যার দ্বারা দূর করার রাস্তা দেখিয়েছিল। প্রোটেস্টান্টবাদ গীর্জার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ হিসাবে শুরু করেছিল এবং সর্বত্র খ্রীষ্টান যাজকদের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষের শক্তি বৃদ্ধি ঘটাচ্ছিল। এ নিয়ে প্রশ্ন নেই যে, ধর্মযাজকেরা ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, তবুও কোপার্নিকাসের মতবাদের ব্যাপ্তিকে রোধ করার জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করত। সুতরাং একটু দেরিতে ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকান লুথারেন টিচার্স সেমিনারির একজন প্রাক্তন সভাপতি জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর লেখা একটি বই সেন্ট লুই থেকে প্রকাশ করলেন। তাতে এই ব্যাখ্যা দেওয়া হলো যে, সত্যকে বাইবেলের মধ্যে খুঁজতে হবে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বইতে নয়। এই কারণে কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন এবং তাঁদের উত্তরসূরীদের শিক্ষাকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে। কিন্তু ওই বিলম্বিত প্রতিবাদ শুধুমাত্র করুণ অবস্থাই প্রাপ্ত হয়। এটা এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করেছে যে, কোপার্নিকাসের তত্ত্ব চূড়ান্ত নয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হিসাবে এটারও প্রয়োজন ছিল।

যদিও ধর্মতত্ত্ববিদরা গ্যালিলিওর উপর তাদের সর্বনাশা 'জয়ে'র পর একটা বিজ্ঞ বিবেচনায় পৌঁছলেন। বিবেচনাটা হলো, এর পর থেকে তাঁরা গ্যালিলিও ঘটনায় যে-সরকারি অবস্থানে ছিলেন সেটা এড়িয়ে যাবেন। বিজ্ঞানের প্রতি দুর্জ্ঞেয়বাদকে তাঁদের সাহস অনুযায়ী তাঁরা বিরোধিতা করবেন। ধূমকেতুর বিষয়ে তাঁদের মনোভাবেই এটা স্পষ্ট হয় যে, আধুনিক মানসিকতায় ধূমকেতুর সঙ্গে ধর্মের মনে হয় কোনো ঘনিষ্ট সম্পর্ক নেই। মধ্যযুগীয় ধর্মতত্ত্বে যেহেতু এটি একমাত্র যুক্তিগ্রাহ্য ব্যবস্থা ছিল তাই তাকে অপরিবর্তনীয় মনে করা হত। এই ধর্মতত্ত্ব প্রায় সমস্ত ব্যাপারে সঠিক মতামতগুলিকে এড়িয়ে চলতে পারত না এবং

যার ফলে বিজ্ঞানের সমস্ত দিকগুলির সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য দায়ী হয়েছিল ধর্মতত্ত্বের প্রাচীনতত্ত্ব যার বেশিরভাগই ছিল একটি সংগঠিত অজ্ঞতা। আলোকপ্রাপ্ত যুগে ভুলগুলির উপর পবিত্রতার সুগন্ধ ছড়িয়েও বেশিদিন সেগুলোকে বাচানো যায়নি। ধূমকেতু সম্বন্ধে ধর্মযাজকদের মতামতের দুটি উৎস ছিল। একদিকে আইনের শাসনকে আমরা যে-ভাবে বুঝি সে-ভাবে বোঝা হত না। অপরদিকে এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপরে যা কিছুই আছে সবই ধ্বংসাতীত।

শুরু করা যাক আইনের শাসন নিয়ে। এটা ভাবা হয়েছিল যে, নিয়মিতভাবে কিছু জিনিস ঘটে থাকে। উদাহারণস্বরূপ, সূর্যোদয় এবং ঋতুর পরিবর্তন। অন্যগুলি হল কিছু প্রতীক ও ভবিষ্যতের পূর্ব লক্ষণ, যা ঘটনার পূর্বাভাস দেয় অথবা মানুষকে তার কৃতপাপের জন্য অনুতপ্ত হতে সক্রিয় করে তোলে। সেই গ্যালিলিওর সময় থেকেই বিজ্ঞানমনস্ক মানুষেরা প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে পরিবর্তনের নিয়ম বলে ধরে নিয়েছিল। পরিবর্তনের এই নিয়মগুলো বলতে একটা বিশেষ অবস্থায় বস্তুগুলি কী করে আন্দোলিত হয় এবং ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা গণনা করে বলতে আমাদের সক্ষম করে। কিন্তু এগুলো শুধুমাত্র এটা বলে না যে, যা ঘটেছে তা ঘটবে। আমরা জানি যে, বহুদিন ধরে সূর্য উদিত হতে থাকবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত বস্তুগুলির সংঘর্ষের কারণে এটা আর ঘটবে না। যে-নিয়মগুলোর কারণে সূর্য উঠছে সেই একই নিয়মের জন্য সূর্য আর উঠবে না। মধ্যযুগীয় মানসিকতায় এই ধরনের ধারণা অসম্ভব ছিল। ওই মানসিকতা কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে বুঝতে পারত পুনঃ পুনঃ সংগঠিত হবার কারণে। যা কিছু অস্বাভাবিক অথবা পুনঃ পুনঃ সঙ্ঘটনশীল নয় তাকে তারা প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলেই নির্দিষ্ট করত এবং প্রাকৃতিক নিয়মের কারণে এগুলো ঘটে বলে বিবেচনা করত না।

মহাশূন্যে প্রায় সবকিছুই নিয়মাধীন। একটা সময় গ্রহগুলিকে নিয়মের ব্যতিক্রম বলে ধরা হত এবং কুসংস্কারগ্রস্ত আতঙ্ক জাগিয়ে তুলত। কিন্তু ব্যাবিলনের যাজকদের দ্বারা এটি একটি নিয়মে পর্যবসিত হয়েছিল। সূর্য এবং চন্দ্র, গ্রহসমূহ এবং স্থির নক্ষত্রগুলো বছরের পর বছর ধরে ঘুরত এবং প্রত্যাশা মতো কাজ করত। নতুন কোনো কিছুকেই পর্যবেক্ষণ করা হত না। এবং অপরিচিতদেরও বয়স বাড়ত না। এই মনোভাব অনুযায়ী এটাই ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওপরে অবস্থিত সবকিছুই মাত্র একবারের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। এবং সেটা করা হয়েছে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী।

ক্রমবৃদ্ধি ঘটা এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া এটা আমাদের পৃথিবীর জন্যই সীমাবদ্ধ। ... আমাদের আদি পিতা-মাতার কৃত পাপের অংশবিশেষ। সেইজন্য উল্কাপিণ্ড ... ধূমকেতুরা যারা অচিরস্থায়ী তাদের অবস্থান অবশ্যই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে, ... ঠিক নিচে। এটা যেন চন্দ্রাবস্থানের নিচে। উল্কাপিণ্ড সম্বন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গি ... ছিল। কিন্তু ধূমকেতু সম্বন্ধে এটি সঠিক ছিল না। ধর্মতত্ত্ববিদেরা অত্যন্ত জোরে ... সঙ্গে এই দুটি মতকে মেনে চলত যে, ধূমকেতুরা দূর্লক্ষণ এবং তারা পৃথিবীর ... বায়ুমণ্ডলের ভিতরেই অবস্থিত। পুরাকাল থেকে ধূমকেতুদের সবসময়ই বিপদের ... বার্তাবাহক বলে মেনে নেওয়া হত। এই মতটি শেক্সপীয়ারের দ্বারাও ... হয়েছিল। উদাহারণ স্বরূপ 'জুলিয়াস সীজার' আর পঞ্চম হেনরি'র নাটকের ... উল্লেখ করা যায়। তৃতীয় ক্যালিক্সটাস যিনি ১৪৫৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪৫৮ খ্রিষ্টাব্দ ... অবধি পোপের পদে আসীন ছিলেন, তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন ... তুর্কিদের দ্বারা কনস্ট্যান্টিনোপল দখলের ঘটনায়। এই বিপর্যয়কে একটা বিশাল ... ধূমকেতুর আবির্ভাবের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। পোপ প্রার্থনা করার আদেশ ... দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'যা কিছু আসন্ন দুর্যোগ সেসব খ্রিষ্টানদের দিক থেকে ... তুর্কিদের দিকে ঘুরে যাবে।' এবং এই প্রার্থনা সংগীতের সঙ্গে আরও একটু যোগ ... করা হয়েছিল, 'হে মহান ঈশ্বর, ওই ধূমকেতু আর তুর্কিদের হাত থেকে আমাদের ... রক্ষা করুন। ১৫৩২ খ্রিষ্টাব্দে ক্রান্মার অষ্টম হেনরিকে লিখতে গিয়ে সেইসময়ে ... দৃশ্যমান একটি ধূমকেতু সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, 'এই প্রতীকগুলো এরপর কি ... বিস্ময়কর ঘটনা ঘটাবে তা কেবল ঈশ্বরই জানেন। কারণ এই প্রতীকগুলো ... হালকাভাবে আবির্ভূত না হয়ে কতিপয় বিরাগ ঘটনায় প্রেক্ষিতে ঘটেছে।' ১৬৮০ ... খ্রিষ্টাব্দে যখন একটি অস্বাভাবিক আশঙ্কাজনক ধূমকেতুর আবিভার্ব ঘটেছিল তখন ... একজন বিশিষ্ট স্কটিশ ধর্ম—উপদেষ্টা প্রশংসনীয় জাতীয়তাবাদের আবেগে ঘোষণা ... করেছিলেন যে, ধূমকেতুগুলো এই দেশে আমাদের পাপের জন্য মহান বিচারের ... অত্যাশ্চর্য এবং অসাধারণ নির্দশন। কারণ এর আগে কখনো ঈশ্বর এই দেশের ... মানুষের উপর এত প্ররোচিত হননি। এ-ব্যাপারে তিনি খুব সম্ভবত অজ্ঞানতাবশত ... লুথারের নজিরকেই অনুসরণ করেন যিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'ধর্মহীন বর্বরেরা ... লিখছে যে, ধূমকেতু প্রাকৃতিক কারণে আবির্ভূত হয়। কিন্তু ঈশ্বর এমন কিছুই সৃষ্টি ... করেন না যেটি নিশ্চিত দুর্যোগকে সূচিত করে না।'

ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টান্টদের অন্যান্য বিষয় নিয়ে যা কিছু পার্থক্য থাকুক ... না কেন ধূমকেতুর ব্যাপারে তারা একই মত পোষণ করত। ক্যাথলিক ... বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপকদের একটি শপথ নিতে হত যে

ছিল ধূমকেতু সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ধারণার পক্ষে অসংগত। রোমের ক্লেমেনটাইন কলেজের রেকটর ফাদার অগাস্টিন ডে এ্যাঞ্জেলিস ১৬৭৩ খ্রিষ্টাব্দে খানহাওয়াবিজ্ঞানের ওপর একটি বই প্রকাশনা করেছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনি বলেছিলেন যে, ধূমকেতুগুলি কোনো স্বর্গীয় বস্তু নয়, এগুলি চাঁদের নিচে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলেই উৎপন্ন হয়। যা কিছু স্বর্গীয় তা অসীম ও নিষ্কলুষ কিন্তু ধূমকেতুদের একটা শুরু আছে এবং শেষ আছে। অতএব ধূমকেতুরা স্বর্গীয় বস্তু হতে পারে না।' টাইকো ব্রাহেকে অগ্রাহ্য করে এটা বলা হয়েছিল। টাইকো ব্রাহে পরবর্তীকালে কেপলারের সমর্থনে বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য প্রচুর কারণ দর্শিয়েছিলেন। একটি কারণ হিসাবে বলা হয়েছিল যে, ১৫৭৭ সালের ধূমকেতুটি চাঁদের উপরে ছিল। ফাদার অগাস্টিন ধূমকেতুর অস্থির বিচলন সম্পর্কে এই মত দিয়েছিলেন যে, ধূমকেতুগুলির দ্বারা এই ধরনের কাজ করানোর জন্য দেবদূতরা স্বর্গীয় নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন।

র‍্যালফ থোরেস্‌বি এফ. আর.এস. যিনি প্রকৃত অর্থে একজন ব্রিটেনের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর ডায়েরিতে আপোস মীমাংসার মূল নীতির বিষয়ে একটি উল্লেখ আছে। ১৬৮২ খ্রিষ্টাব্দে হ্যালির ধূমকেতু আবির্ভূত হয়েছিল এবং সর্বপ্রথম এই ধূমকেতুর কক্ষপথকে গণনা করা সম্ভব হয়েছিল। তখনই থোরেস্‌বি লিখেছিলেন, 'ঈশ্বর যে-কোনো পরিবর্তনের জন্য আমাদের উপযুক্ত করুন। যদিও আমি এ ব্যাপারে অজ্ঞ নই যে, ওই ধরনের ধূমকেতুরা প্রাকৃতিক কারণেই উদ্ভূত হয়ে থাকে, তবুও তারা প্রায়শই প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস দিয়ে থাকে।'

তিনজন মানুষের জন্য এটা শেষমেষ প্রমাণিত হয়েছিল যে, ধূমকেতুরা প্রাকৃতিক নিয়মেরই একটি বিষয় এবং এরা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে থাকে না। হায়েরফেল নামে সুইজারল্যান্ডের একজন অধিবাসী প্রমাণ করেছিলেন যে, ১৮০ খ্রিষ্টাব্দের ধূমকেতুর কক্ষপথ বলে যা ধরা হত তা ছিল মোটামুটিভাবে একটি উপবৃত্তের মতো। হ্যালির নামে নামাঙ্কিত ১৬৮২ সালের ধূমকেতুটি কনস্টান্টিনোপলের পতনে ১০৬৬ সালে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। এটি সম্পর্কে হ্যালি বলেছিলেন যে, এর কক্ষপথ একটি ঝুলন্ত উপবৃত্ত। ১৬৮৭ সালে নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া' দেখালো যে, ধূমকেতুর গতির ব্যাখ্যায় মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যতটা সন্তোষজনক ছিল, গ্রহদের গতির ক্ষেত্রেও ব্যাখ্যাটি একই রকম সন্তোষজনক। জ্যোতিস্তত্ত্বিকরা যাঁরা অশুভ ঘটনার পূর্বাভাস প্রত্যাশা করতেন, তাঁরা ভূমিকম্প এবং শিলাবৃষ্টিপাতের ঘটনা নিয়ে পিছু হটতে বাধ্য হলেন। এসব ঘটনা কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানের নয়, একটি পৃথক বিজ্ঞানের বিষয়। সেটি হলো ভূবিজ্ঞান, যেটি

পরে বিকশিত হয়েছে। এই ভূবিজ্ঞানেরও অজ্ঞতার-যুগ-থেকে প্রাপ্ত [illegible] আপ্তবাক্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নিজস্ব যুদ্ধক্ষেত্র ছিল।

অধ্যায় ৩
বিবর্তন

বিজ্ঞান তো একটা নিয়ম মেনে বিকশিত হয়েছে। এর বিপরীত [illegible] প্রত্যাশিত হতে পারত। যা কিছু আমাদের থেকে দূরে ছিল সেসব প্রথমে [illegible] গণ্ডির মধ্যে এনে ফেলা হলো। তারপর কাছাকছি যেসব ছিল, প্রথমে স্বর্গ, পৃথিবী এবং পর পর প্রাণী ও উদ্ভিদজীবন, মানবদেহে এবং সবশেষে মানবমন নিয়মের সীমায় এনে ফেলা হলো। যদিও মানবমন এখন অসম্পূর্ণভাবেই [illegible] রয়েছে। এসবের ক্ষেত্রে কোনোটাই ব্যাখ্যাতীত নয়। এগুলোর সঙ্গে নিত্য পরিচয় এসবের বিশাল পরিধিটা বুঝতে অসুবিধা ঘটায়। যেমনটা [illegible] উড়োজাহাজ থেকে রোমের পথ-ঘাট সহজেই চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু মাটি থেকে তা এত ভালোভাবে করা যায় না। একজন মানুষের বন্ধুরা জানেন ওই মানুষ যা করে তার চেয়ে আরও ভালো তার কী করা দরকার। এদের কথাবার্তার [illegible] বাঁকে এরা আগে বুঝতে পারে এদের পছন্দসই একটা সত্যকাহিনী [illegible] অপরিহার্য। কিন্তু ওই লোকটির নিজের কাছে মনে হয় স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় কাজটা করে চলেছে। নিবিড় অভিজ্ঞতা থেকে-পাওয়া বিশদ পরিচিতিতে [illegible] কোনো সাধারণ সূত্র পাওয়া যায় না। বিজ্ঞান তো এই সাধারণ সূত্রেরই [illegible] করে। কেবলমাত্র সরল প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্কারই নয়, যে-পৃথিবীকে আমরা জানি তার ক্রমবিকাশের মতবাদও জানা দরকার। এই জানার চেষ্টা শুরু হয়েছিল জ্যোতির্বিদ্যা থেকে। কিন্তু পৃথিবীর ক্রমবিকাশের মতবাদ জ্যোতির্বিজ্ঞানের [illegible] এর গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগের বিষয়টা এই গ্রহে জীবনের বিকাশ থেকে বেশি জোনো। বিবর্তনের মতবাদ, আমাদের বিবেচনায়, জ্যোতির্বিদ্যা থেকে শুরু হয়েছে ঠিকই কিন্তু অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব পেয়েছে ভূবিদ্যা এবং জীববিদ্যায়। কোপার্নিকাসের আবিষ্কারের বিজয়ের পর এই ভূবিদ্যা ও জীববিদ্যার [illegible] থাকার ক্ষেত্রে জ্যোতির্বিদ্যার লড়াইয়ের থেকে বেশি লড়তে হয়েছে [illegible] ধর্মতাত্ত্বীয় প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে। একটা আধুনিক মনের পক্ষে এটা বোঝা [illegible] যে, বিকাশ এবং ক্রম অগ্রগতির ধারণায় 'বিশ্বাস' সাম্প্রতিক একটা বিষয়। আসলে এটা নিউটনের পরের ঘটনা। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে ছ'দিনে। এবং স্বর্গীয় সবকিছু, সব ধরনের জীবজন্তু এবং গাছপালা যা এখন

পরিমান, এবং যা মহাপ্লাবনে হারিয়ে গেছে, সব কিছুই পৃথিবীতে রয়েছে সেই সৃষ্টির সময় থেকে। প্রগতি একটা বিশ্বনিয়ম। এটা এখন বেশিরভাগ ধর্মতাত্ত্বিকরা মানেন। এই ধর্মতাত্ত্বিক এবং সমুদয় খ্রিষ্টনরাও বিশ্বাস করেন যে, আদম ও ইভের মহাপতনের সময় থেকে একটা ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের সন্নিবেশ ঘটেছে। ঈশ্বর আদম এবং ইভকে একটা বিশেষ গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন। এই নিষেধ সত্ত্বেও ওঁরা নিষিদ্ধ ফল খেয়েছিলেন অবশ্যই। পরিণতিতে ঈশ্বর বিধান দিলেন যে, ওঁরা দুজন এবং ওঁদের উত্তর পুরুষ মরণশীল হবে। এবং মৃত্যুর পরে এঁদের সুদূরতম প্রজন্মও নরকে অনন্ত শাস্তি ভোগ করে চলবে। শাস্তির ব্যাপারে অবশ্য কতিপয় ব্যতিক্রমও থাকবে। এই ব্যতিক্রম হবে একটা পরিকল্পনা অনুযায়ী। এই পরিকল্পনা নিয়েও বেজায় বির্তক ছিল। আদমের পাপের মুহূর্ত থেকেই প্রাণীরা একে অন্যকে শিকার করতে শুরু করল। জন্মাতে শুরু করল কাঁটাযুক্ত গাছ। প্রকৃতির বৈচিত্র্য এল। মাটি অভিশপ্ত হলো। মাটির এই অভিশাপের কথা, এই মাটি অনায়াসে মানবজাতিকে ভরণ-পোষণ যোগাবে না। মাটি থেকে এসব পেতে হলে কষ্টসাধ্য পরিশ্রম করতে হবে। নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার ঘটনার পরেই মানুষ ভীষণ পাপী হতে শুরু করল। এতটাই যে, নোয়া, তাঁর তিন পুত্র এবং তাঁদের ভার্যাগণ ব্যতীত সবাইকে মহাপ্লাবনে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তা বলে এটাও ভাবা হয়নি যে, সেই থেকে মানুষ ভালো হয়ে গেছে। কিন্তু প্রভু প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, আর কোনো মহাপ্লাবন তিনি পাঠাবেন না পৃথিবীতে। তবে মাঝে মাঝে ভূমিকম্প আর অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়েই তিনি পরিতৃপ্ত থাকবেন।

আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, এসব কিছু আক্ষরিক ঐতিহাসিক ঘটনা। এগুলো ঘটে, বাইবেলে বলা হয়েছে অথবা সেখানে যা বলা হয়েছে তা থেকে যেমনটা নিরূপিত হয়েছে। পৃথিবীর সৃষ্টির দিনটা সৃষ্টিতত্ত্বের কুলজিবিদ্যা থেকে বুঝে নেওয়া যায়। এই কুলজি আমাদের জানায় যে, প্রতিটি গোষ্ঠীপতি কত প্রাচীন ছিল যখন তাদের জ্যেষ্ঠপুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল। এসব ব্যাপারে বির্তকের কিছু সুযোগ অনুমোদিত হয়েছে। কী কারণে? কারণ সেপটুয়াজিন্ট[১] এবং হিব্রুগ্রন্থের মধ্যে কিছু পার্থক্য এবং দ্ব্যর্থতা ছিল। পরিশেষে, প্রোটেস্টান্ট খ্রিষ্টজগৎ সাধারণভাবে খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০৪ সালটাকে গ্রহণ করল। এই সালটাকেই আর্চবিশপ আশার স্থির করেছিলেন পৃথিবীর সৃষ্টির সাল হিসাবে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. লাইটফুটও সৃষ্টির এই সালটা মেনে নেন।

---

১ আনুমানিক ২৭০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ৭০/৭২ জন অনুবাদক কর্তৃক অনুদিত বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের গ্রীক অনুবাদ।—অনুবাদক

তাঁর মতে, সৃষ্টিতত্ত্বের আরও সযত্ন অধ্যয়নে খুবই সুনির্দিষ্টভাবে সময়টা ... সম্ভব। তিনি বললেন ২৩ অক্টোবরের সকাল ৯টা এই সুনির্দিষ্ট সময়। ... অবশ্যই কখনোই বিশ্বাসের বিষয় হয়ে থাকেনি। বিধর্মী হবার কোনো ঝুঁকি ... নিয়েই আপনি বিশ্বাস করতে পারেন যে, আদম ও ইভের জন্ম হয়েছিল ১৬ অথবা ৩০ অক্টোবর। এটা আপনার বিশ্বাসে থাকবে যদি এই বিশ্বাসের কারণটা আপনি সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে জেনে থাকেন। এবং সৃষ্টি সপ্তাহের দিনটা অবশ্যই শুক্রবার ... ধরতে হবে। কারণ ঈশ্বর শনিবার বিশ্রাম নিয়েছেন। এই সংকীর্ণ কাঠামোর মধ্যে বিজ্ঞানকে আটকে রাখার চিন্তা করা হয়েছিল। যাঁরা এমন প্রশ্ন তুলতেন যে, ... দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বের পক্ষে ৬০০০ বছরটা নিতান্তই কম সময়, তাঁদের অপবাদ দেওয়া হত। এই অপবাদের পরিণতিতে তখন হয়তো প্রশ্নকারীদের পুড়িয়ে মারা কিংবা কারারুদ্ধ করে রাখা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ধর্মতত্ত্ববাদীরা অন্য যা যা করা সম্ভব সবই করেছেন এঁদের জীবনকে বিড়ম্বিত করে তুলতে। ... উদ্দেশ্য ছিল প্রশ্নকারীদের মতবাদ যাতে বিস্তারলাভ না করে।

ইতিমধ্যে কোপার্নিকাসের মতবাদ গৃহীত হয়েছে। কিন্তু নিউটন ধর্মীয় গোঁড়ামি নাড়িয়ে দিতে তেমন কিছুই করেননি। তিনি নিজেই ছিলেন গভীরভাবে এক ধর্মবিশ্বাসী মানুষ। তিনি বাইবেলের আক্ষরিক অনুপ্রেরণায় বিশ্বাস করতেন। তাঁর বিশ্বাসের পৃথিবীতে বিকাশের স্থান ছিল না। তাঁর শিক্ষণের কথা, সবকিছু একটা বস্তুনিচয়ে সৃষ্ট। গ্রহসমূহের মূর্ত গতিবেগের জন্য এগুলো সূর্যের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। এই ব্যাপারটাতে তাঁর ধারণা ছিল যে, গ্রহগুলোকে ঈশ্বর প্রথমে নিজ হাতে সবেগে ছুঁড়ে দিয়ে পৃথক করে দিয়েছেন। তারপর থেকে গ্রহগুলো মাধ্যাকর্ষণ শক্তি মেনে চলেছে। এটা সত্য যে, বেন্টলের কাছে এক ব্যক্তিগত চিঠিতে নিউটন একটা পথের কথা বলেছেন যে-পথে সৌরজগৎ বিকশিত হয়ে থাকবে। তাঁর মতে এই পথটা ছিল পদার্থের একটা আদিম প্রায় সম-বিভাজন। কিন্তু তাঁর পদমর্যাদাগত এবং প্রকাশ্য ঘোষণায় এই মতটাই প্রকাশ পেত যে, আমরা যেমন জানি, সূর্য এবং গ্রহগুলোর সৃষ্টি হয়েছে আচম্বিতে। এবং এসব সৃষ্টির ক্ষেত্রে মহাজাগতিক বিবর্তনের কোনো স্থান নেই।

নিউটনের কাছ থেকে আঠারো শতক একটা অদ্ভুত ঈশ্বরভক্তি ধার করেছিল। এতে ঈশ্বর ছিলেন আবশ্যিকভাবে আইনপ্রণেতা। এই ঈশ্বরই প্রথমে বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তারপর আইন প্রণয়ন করেছেন। এই আইনই পরে ঈশ্বরের বিশেষ হস্তক্ষেপ ছাড়া অন্য সব কিছু নির্ধারণ করেছে। এক্ষেত্রে প্রথাসম্মত ধর্মবিশ্বাস অবশ্য ব্যতিক্রম মেনে নিয়েছে। এমন একটি ব্যতিক্রম হলো ধর্মে

সঙ্গে যুক্ত অলৌকিকতা। কিন্তু যৌক্তিক একেশ্বরবাদীরা ব্যতিক্রমকে মানেননি। তাদের মতে সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় প্রাকৃতিক নিয়মে। এই দুটো ধারণাই আলেকাজান্ডার পোপের *Essay on Man*-এ স্থান পেয়েছে। পোপের এই রচনার একাংশে রয়েছে—

শুরুতে সর্বশক্তিমান কারণ
তিনি কাজ করেন, সাধারণ নিয়মে;
ব্যতিক্রম অবশ্য রয়েছে কিছু।
কিন্তু ধর্মগোড়ামির দাবি যখন ভুলে যাওয়া হয় তখন ব্যতিক্রমগুলো অদৃশ্য হয়:
প্রকৃতির বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী যে নিয়ম-শৃঙ্খলের একটি আংটায় আঘাত কর
তা সে আংটা প্রথম থেকে দশম হোক কিংবা দশসহস্রতম
সে আঘাতে সমগ্র শৃঙ্খলাটি ভেঙে পড়বে।
কেননা এই শৃঙ্খলের প্রতিটি অংশ একটা ক্রমবিন্যাসের পর্যায় হিসাবে
ওই আশ্চর্য সমগ্রের অপরিহার্য অঙ্গ,
একটি আংটার বিশৃঙ্খলা গোটা শৃঙ্খলাবর্তের বিপর্যয় ঘটায়।
পৃথিবী কক্ষপথের বাইরে চলে গেলে
গ্রহসমূহ ও সূর্যরাও নিয়ম ভেঙে অসংযত বেগে ধাবমান হবে।
ব্রহ্মাণ্ড শাসন-করা দেবদূতেরা স্ব স্ব স্থানচ্যুত হলে,
সর্বস্তরের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে
জগৎ চরাচরের স্বর্গীয় পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুই স্থানচ্যুত হবে।
এর প্রভাবে পরিব্যাপ্ত প্রকৃতি এমনকি তার চূড়ায়
ঈশ্বরের আসন পর্যন্ত আন্দোলিত হবে, টলে যাবে।

Queen Anne-র সময় থেকে সম্ভবত আইনের রাজত্ব রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সঙ্গে যুক্ত হলো। যুক্ত হলো এই বিশ্বাসও যে, বিপ্লবের যুগের সমাপ্তি ঘটেছে। মানুষ যখন পুনরায় পরিবর্তন চাইল তখন প্রাকৃতিক কার্যাবলী সম্পর্কে তাদের ধারণা কম নিশ্চল হয়ে পড়ল।

১৭৫৫ সাল। প্রকাশিত হলো কান্টের একখানা বই। বইখানার নাম *General Natural History and Theory of the Heavens, or Investigation of the Constitution and Mechanical Origin of the Whole Structure of the Universe, treated according to Newtonian Principles*। এই পুস্তকেই প্রথম সূর্য, গ্রহসমূহ এবং নক্ষত্রের বিকাশের বৈজ্ঞানিক মতবাদ তৈরির ঐকান্তিক প্রয়াস শুরু হলো। এই কাজটা খুবই অসাধারণ। এই কাজটা কতক পরিমাণে

আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার ফলাফল আগে থেকেই আঁচ করেছে। এই [illegible] এভাবে আলোচনা শুরু করেছে যে, আমাদের খালি-চোখে-দেখা [illegible] নক্ষত্রমণ্ডলী একটা সিস্টেমের অন্তর্গত। এটা হলো দুগ্ধসরণি বা ছায়াপথ। [illegible] সমুদয় নক্ষত্রগুলো প্রায় একটা সমতলে অবস্থান করে। কান্ট বলছেন যে, [illegible] মধ্যে এক ধরনের ঐক্য রয়েছে যা অবশ্য সৌরজগতের ঐক্যের মতো [illegible] অসাধারণ কাল্পনিক দূরদৃষ্টিতে তিনি নেবুলাকে এরকমই কিন্তু বহু, বহু দূরের [illegible] একটি নক্ষত্রগোত্র বলে ভেবেছেন। তাঁর এই মতটা কিন্তু এখনও সাধারণ [illegible] স্বীকৃত। তাঁর তত্ত্বটা অবশ্য গাণিতিকভাবে অসমর্থনীয়। কিন্তু বিশদভাবে [illegible] পরবর্তী পর্যবেক্ষণে বলা হয় যে, নেবুলা, ছায়াপথ, নক্ষত্রসমূহ, গ্রহসমূহ [illegible] উপগ্রহগুলো সবেরই উৎপত্তি হয়েছে মূলত বিক্ষিপ্ত পদার্থের ঘনীভূত [illegible] থেকে। এক্ষেত্রে এই সৃষ্টি সেইসব এলাকা থেকে হয়েছে যেখানে ঘনত্ব [illegible] এলাকা থেকে বেশি। কান্ট বিশ্বাস করেন যে, জড় ব্রহ্মাণ্ড অসীম। স্রষ্টার অসীম [illegible] মেনে নিতে এটাই একমাত্র ধারণা। তিনি মনে করেন যে, বিশৃঙ্খল অবস্থা [illegible] শৃঙ্খলায় ক্রম উত্তরণ ঘটেছে। এটা শুরু হয় ব্রহ্মাণ্ডের ভরকেন্দ্রে। ধীরে ধীরে [illegible] সূচনা থেকে দূরবর্তী স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এটা এমন একটা পদ্ধতি যা ক্রিয়াশীল [illegible] হতে প্রয়োজন অসীম পরিসর এবং অসীম সময়।

কান্টের এই কাজটার অসাধারণত্বের প্রথম কারণ হল, এটা সামগ্রিকভাবে [illegible] ব্রহ্মাণ্ডের একটা ধারণা দেয়। এই জড় বিশ্বলোকে ছায়াপথ এবং নেবুলা [illegible] দুটো সংঘটক উপাদান। অন্য কারণটা হল, এমন ধারণা যে, ক্রমবিকাশের [illegible] মহাশূন্যে পদার্থের অপৃথকীকৃত আদিম বিতরণ। আচম্বিতে সৃষ্টিতত্ত্বের [illegible] হিসাবে এটাই প্রথম ঐকান্তিক প্রয়াস। লক্ষ্যণীয়ভাবে এটা মজার ব্যাপার [illegible] পৃথিবীতে এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গিটা শুরু হলো, জীবন নিয়ে নয়, স্বর্গতত্ত্ব হিসাবে।

যাই হোক, নানা কারণে কান্টের এই কাজ সীমিত মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এই পুস্তক প্রকাশের সময় কান্ট নিতান্তই যুবক। বয়স তখন তাঁর [illegible] একত্রিশ। তাছাড়া এসময় পর্যন্ত তিনি কোনো যশলাভ করতে পারেননি। [illegible] কোনো বিশাল খ্যাতি ছিল না। তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক। পেশাগত [illegible] গণিতবিদ কিংবা পদার্থবিদ তিনি ছিলেন না। গতিবিজ্ঞানে যোগ্যতার অভাব [illegible] তাঁর। সেটা বোঝা গেছে তাঁর একটা ধারণা থেকে। তিনি ধরে নিয়েছিলেন [illegible] স্ব-অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতি একটা ঘূর্ণন আয়ত্ত করতে পারে, যে-ঘূর্ণন মূলত তার [illegible] না। তাছাড়া, তাঁর তত্ত্ব অংশত কল্পনাপ্রসূত। উদাহরণে বলা যায়, [illegible] ভেবেছিলেন যে, সূর্য থেকে দূরে-থাকা গ্রহের অধিবাসীরা তুলনামূলক [illegible]

ভালো। এটা এমন একটা ধারণা, মানবজাতির অনুষঙ্গে এর শালীনতা প্রশংসনীয়। কিন্তু বিজ্ঞানের পরিচিত কোনো বিবেচনাতেই এটা সমর্থনীয় নয়। এই কারণে তাঁর থেকে পেশাগতভাবে যোগ্যতর ল্যাপল্যাসের তত্ত্বটা বিকশিত না হওয়া পর্যন্ত কান্টের কাজটা প্রায় অলক্ষ্যেই থেকে গেছে।

ল্যাপল্যাসের বিখ্যাত নেবুলার প্রকল্প প্রথম প্রকাশিত হয় ১৭৯৬ সালে। এটি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর *Exposition du Systime du Monde* নামক বইয়ে। এটা প্রকাশের সময় ল্যাপল্যাসের জানা ছিল না যে, এই প্রকল্পটা অনেকটা পরিমাণে কান্টের ধারণাতেও ছিল। ল্যাপল্যাসের কাছে এটা একটা প্রকল্পের চাইতে বেশি কিছু ছিল না। একটা নোটে তিনি জানিয়েছেন, 'অবিশ্বাসটা অবশ্যই সবকিছু দ্বারা সমর্থিত হবে যা পর্যবেক্ষণ অথবা ভাবনাচিন্তার ফল নয়।' কিন্তু এই মত এখন অচল। তবুও এক শতক ধরে এই ভাবনাচিন্তা প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে। তিনি এই মত পোষণ করতেন যে, বর্তমানে সৌর এবং গ্রহদের যে-সিস্টেম সেটা মূলত ছিল একটা একক বিক্ষিপ্ত নেবুলা। এটা ধীরে ধীরে সংকুচিত হলো এবং পরিণামে দ্রুত ঘুরতে লাগল। কেন্দ্রাতিগ শক্তি পিণ্ডগুলোকে বিক্ষিপ্ত করে দিল। এগুলোই গ্রহ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এবং একই পুনরাবৃত্ত পদ্ধতিতে উপগ্রহগুলো সৃষ্টি করেছে। ফ্রান্স বিপ্লবের ঐতিহাসিক যুগের মানুষ ছিলেন বলে তিনি ছিলেন পুরোপুরি মুক্তচিন্তক। সৃষ্টিতত্ত্বকে তিনি পুরোপুরি বাতিল করে দেন। নেপোলিয়ান বলেছিলেন যে, স্বর্গীয় রাজাধিরাজে বিশ্বাস পার্থিব সম্রাটের প্রতি মানুষের মনোভাবকে উৎসাহ যোগাবে। তিনি তখন বললেন যে, ল্যাপল্যাসের সেলেস্টিয়াল মেকানিকস্-এর মহান কাজের মধ্যে ঈশ্বরের কোনো উল্লেখ নেই কেন? উত্তরে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ল্যাপল্যাস বলেন, 'স্যার, আমার ওই ধরনের কোনো প্রকল্পের প্রয়োজন নেই।' ধর্মতত্ত্বীয় জগৎটা এমন উত্তরে ব্যথিত হলো বটে, কিন্তু ল্যাপল্যাসের প্রতি এদের অপছন্দটা নাস্তিকতার আতঙ্ক এবং বৈপ্লবিক ফ্রান্সের সমাড়াপনার মধ্যে মিশে গেল। যাই হোক, জ্যোতির্বিদদের বিরুদ্ধে লড়াইটা কঠিনকারী বলে মনে হয়েছিল।

ভূবিদ্যার একটা বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটেছিল জ্যোতির্বিদ্যায় সমসাময়িক দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতভাবে। অপার্থিব বস্তুনিচয় অপরিবর্তনশীল, জ্যোতির্বিদ্যার এই বিশ্বাস, বস্তুনিচয়ের ক্রমবিকাশ তত্ত্বকে জায়গা ছেড়ে দিল। কিন্তু ভূবিদ্যার ধারণা এই যে, পূর্ববর্তী সময়ে একটা মহাপরিবর্তনের ব্যাপার ছিল। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে এই ধারণাটা দাঁড়াল, পরিবর্তন সর্বদাই ঘটে চলেছে খুব ধীরে। প্রথমে এটা ভাবা হয়েছিল যে, পৃথিবীর গোটা ইতিহাসটা ছয় হাজার

বছরের সময়সীমার মধ্যে সংকুচিত করতে হবে। পাললিক শিলা এবং [illegible] অবক্ষেপ এবং অন্যান্য সাক্ষ্যকে এই সময়সীমার মধ্যে আনার জন্য বলতে হবে যে, এর আগে মহাপরিবর্তন ঘটত ঘন ঘন। বৈজ্ঞানিক বিকাশে [illegible] জ্যোতির্বিদ্যা থেকে কতটা পিছিয়ে ছিল সেটা নিউটনের সময়ে এর অবস্থা থেকে বোঝা যায়। ১৬৯৫ সালে উডওয়ার্ড পাললিক শিলার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, গোটা পার্থিব জগতটা মহাপ্লাবনে টুকরো টুকরো হয়ে থাকবে এবং ভেসে গিয়ে থাকবে। স্তরসমূহ এই প্রস্তরীভূত পিণ্ড থেকে তৈরি হয়ে থাকবে, যেমন ঘটে তরল থেকে মৃন্ময় পললের ক্ষেত্রে।' লায়েলের বক্তব্য এই যে, ল্যাপলাস শেখাতেন 'পৃথিবীর ভূত্বকে থাকা প্রস্তরীভূত স্তরের গোটা বস্তুনিচয় কয়েক মাসের মধ্যে জমে গেছে।' চোদ্দো বছর আগে ১৬৮১-তে রেভারেন্ড টমাস বার্নেট চার্টার হাউসের মাস্টার ছিলেন। তিনি প্রকাশ করলেন তাঁর *Sacred Theory of the Earth; containing on Account of the Original of the Earth, and of all the general Changes which it hath already undergone, or is to undergo, till the Consummation of all things*। তিনি বিশ্বাস করতেন যে নিরক্ষরেখা মহাপ্লাবনের আগে পর্যন্ত ক্রান্তিবৃত্তের সমতলে ছিল। পরে এটা তার বর্তমান তির্যক অবস্থানে সরে গেছে। (ধর্মতত্ত্বগতভাবে সঠিকতর ধারণাটা ছিল মিল্টনের। তাঁর মতে এটা ঘটেছে মহাপতনের সময়ে।) মিল্টনের ধারণায় সূর্যের তাপ ভূপৃষ্ঠকে ফাটিয়ে দিয়েছে। এই ফাটলের পথে পাতাল থেকে জল উঠে এসে তৈরি করেছে ভূগর্ভস্থ জলাধার। এভাবে মহাপ্লাবনটা ঘটেছে। তাঁর ধারণায় বিশৃঙ্খলার দ্বিতীয় ঘটনার সূচনা হবে সহস্রাব্দে। তাঁর মতামতটাকে সতর্কভাবে বুঝতে হবে। কারণ তিনি চিরন্তন শান্তিতে বিশ্বাস করতেন না। আরও ভয়ানক কথা হচ্ছে, মহাপতনের ঘটনাটাকে তিনি একটা রূপক বলে মনে করতেন। এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা আমাদের জানায় যে, 'রাজা তাঁকে খাসকামরার করণিক পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন।' নিরক্ষরেখাসহ অন্যান্য বিষয়ে তাঁর সঙ্গে হুইটসন্ এড়িয়ে গেছেন। ১৬৯৬ সালে হুইটসনের একখানা বই প্রকাশিত হয়। বইয়ের নাম *A New Theory of the Earth: wherein the Creation of the World in Six Days, the Universal Deluge, and the General Conflagration, as laid down in the Holy Scriptures, are shown to be perfectly agreeable to Reason and Philosophy*। ১৬৮০ সালের ধূমকেতুর আবির্ভাব এই বই লেখার আংশিক অনুপ্রেরণা হতে পারে। এই ধূমকেতুর আবির্ভাবের ঘটনা তাঁকে এভাবে ভাবিয়েছে যে, ধূমকেতুই হয়তো মহাপ্লাবন

আটিয়ে থাকবে। একটা বিষয় তাঁর শাস্ত্রনিষ্ঠ বিশ্বাসকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। সেটা হলো, তার চিন্তায় সৃষ্টির ছয় দিন সাধারণ দিনের সময়সীমা থেকে বেশি ব্যাপক।

এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে, উড্‌ওয়ার্ড বার্নেট এবং হুইটস্‌ন তাঁদের সময়ের অন্যান্য ভূবিদদের থেকে যোগ্যতায় পেছিয়ে ছিলেন। পক্ষান্তরে, তাঁরা তাদের সময়ে সর্বশ্রেষ্ঠ ভূবিদ ছিলেন। অন্ততপক্ষে হুইটসন্‌ তো লক্‌ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ছিলেন।

আঠারো শতকটাকে দুটো মতবাদের বিতর্ক আকড়ে ধরেছিল। নেপচুনবাদীরা[২] প্রায় সবকিছুই জলপ্রসূত বলে মনে করতেন। ভালকানবাদীরা[৩] প্রবল গুরুত্ব আরোপ করতেন অগ্ন্যুৎপাত এবং ভূমিকম্পের উপর। নেপচুনবাদীরা অবিরাম মহাপ্লাবনের সাক্ষ্য সংগ্রহ করতেন। তাঁরা পাহাড়ের শীর্ষ উচ্চতায় প্রাপ্ত সামুদ্রিক জীবাশ্মকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। এঁরা ছিলেন ভীষণভাবে গোঁড়াপন্থী। ফলে এই গোঁড়াপন্থার শত্রুরা স্বীকার করতেন যে, জীবাশ্ম প্রাণীদের খাঁটি অবশেষ নয়। ভল্টেয়ার ছিলেন বিশেষভাবে সংশয়বাদী। তিনি যখন এসবের জৈব উৎস অস্বীকার করতেন না তখন বলতেন যে, এসব তীর্থযাত্রীরা ফেলে গেছে। এই নিদর্শনে বোঝা গেল যে, অন্ধ মুক্তচিন্তা গোঁড়া ধর্মবাদী মতের চেয়ে বেশি অবৈজ্ঞানিক।

বিখ্যাত প্রকৃতিবিদ বাফন ১৭৪৯ সালে প্রকাশিত তাঁর *Natural History* বইয়ে সাধারণের জ্ঞানের জন্য চোদ্দোটি বক্তব্য রেখেছেন। এগুলো প্যারিসের সোরবোর্ন ধর্মতাত্ত্বিক ফ্যাকাল্টি কর্তৃক ধিকৃত হয়েছে। বলা হয়েছে, এগুলো 'নিন্দার্হ এবং খ্রিষ্ট ধর্মমত বিরোধী।' এগুলোর মধ্যে জীববিদ্যা সংক্রান্ত একটি ঘোষণা, 'পৃথিবীর বর্তমান পর্বত এবং উপত্যকাগুলো গৌণ কারণে গড়ে উঠেছে। এসবগুলো যথাসময়ে অনুরূপ এক গৌণ কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে। এবং এ ধরনের পর্বত ও উপত্যকা পুনরায় তৈরি হবে।' এখানে গৌণ কারণ' মানে ঈশ্বরের সৃষ্টিমুখীন আদেশ ছাড়া অন্য কোনো কারণ। ফলে ১৭৪৯ সালে গোঁড়া ধর্মবাদীদের পক্ষে এমন বিশ্বাস প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল যে, পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে একই পাহাড়-পর্বত-উপত্যকাসহ। ভূমি এবং সমুদ্রের বিতরণ, যেমনটা আজ আমরা দেখছি, এসব পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে অলৌকিক কারণে। একমাত্র ব্যতিক্রম ডেড সী'র ক্ষেত্রে।

---

২. নেপচুনবাদী, তাঁরা যাঁরা বিশ্বাস করতেন জলের অবক্ষেপ থেকে অ-স্তরীভূত কঠিন শিলা গড়ে উঠেছে। ওয়ার্নার (১৭৪৯-১৮৭১) ছিলেন একজন কট্টর নেপচুনবাদী। —অনুবাদক

৩. ভালকানবাদী তাঁরাই, যাঁরা বলতেন প্রাচীন আগ্নেয়গিরির লাভা জমাট বেধে শিলার সৃষ্টি।—অনুবাদক

সোরবার্নের সঙ্গে বির্তকে যাওয়া ঠিক হবে না ভাবলেন বাফন। তিনি তাঁর আগের মতামত পরিহার করলেন এবং এই স্বীকারোক্তি দিলেন, 'আমি ঘোষণা করছি যে, বাইবেলের বক্তব্যের বিরোধিতা করার কোনো অভিপ্রায় আমার ছিল না। সময়ের ক্রম এবং ঘটনার বিবরণে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে যা বলা হয়েছে সবই আমি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। বিশ্বগঠন সম্পর্কে আমার পুস্তকে যা কিছু বলা হয়েছে সবই আমি প্রত্যাখ্যান করছি এবং সাধারণভাবে বাতিল করছি আমার সে সব বক্তব্যও যেগুলো মোজেসের বর্ণনার বিরোধী।" এটা স্পষ্ট যে, জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞানের বাইরে ধর্মতাত্ত্বিকরা গ্যালিলিওর সঙ্গে বিরোধের ফলে উদ্ভূত জ্ঞান থেকে তেমন কিছুই শেখেননি।

ভূবিদ্যায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রচলন করেন হাটন। এঁর *Theory of the Earth* প্রথম প্রকাশিত হয় ১৭৮৮ সালে। এই বইখানাই বর্ধিত আকারে পুনঃপ্রকাশিত হয় ১৭৯৫তে। তিনি বললেন যে, যে-সব কারণে অতীতে ভূপৃষ্ঠে পরিবর্তন ঘটেছে সেগুলো আজও সমান ক্রিয়াশীল। এটা ধরে নেবার কোনো কারণ নেই যে, অতীতের কারণগুলো বর্তমানের কারণসমূহ থেকে বেশি সক্রিয় ছিল। যদিও প্রধানত এটি একটি যুক্তিপূর্ণ সূত্র, হাটন এই সূত্রকে অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত করেন। মহাদেশগুলোর অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কারণটাকে তিনি ভূপৃষ্ঠের অবক্ষয়ের ওপর আরোপিত করলেন। এই অবক্ষয়ের ফলে সাগরের তলদেশে পলি জমা হয়। কিন্তু নতুন মহাদেশগুলোর উত্থানের কারণ হিসাবে তিনি প্রচণ্ড আলোড়নের কথা বলেন। তিনি ভূমির হঠাৎ নিমজ্জন এবং এর ক্রমউত্থানের বিষয় দুটো যথেষ্ট পরিমাণে বুঝে উঠতে পারেননি। কিন্তু তাঁর সময় থেকে সমুদয় বৈজ্ঞানিক ভূবিদগণ বর্তমানের সাহায্যে অতীতকে ব্যাখ্যা করার সাধারণ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। মেনে নিয়েছেন তাঁর আরও কতিপয় মতবাদ। বর্তমানে দেখা যে-সব কারণগুলোর জন্য ধীর গতিতে উপকূল রেখার পরিবর্তন ঘটছে, পর্বতের উচ্চতা বৃদ্ধি অথবা হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং সমুদ্রতলের উচ্চতা উঠে আসা কিংবা নিচু হওয়া—এসব কারণ দিয়ে তিনি ভূতাত্ত্বিক কালের বিশাল পরিবর্তনগুলো ব্যাখ্যা করেছেন। প্রধানত ইহুদি ধর্মগুরু মুসার কালপঞ্জি অনুসরণের কারণে প্রথম দিকে মানুষ এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারেনি। সৃষ্টিতত্ত্বের প্রবক্তারা হাটনের এবং তাঁর শিষ্য প্লেফেয়ারের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ নামিয়ে আনেন। লায়েলের[৪] ভাষায়, 'হাটনীয় মতবাদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা দলীয় মনোবৃত্তির আকার ধারণ করে।

---

৪. Principles of Geology. একাদশ সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭৪

ওই সময় ইংরেজদের মনোভাব অ-স্থিত উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। অনেক বছর ধরে ফ্রান্সের এক শ্রেণির লেখক প্রবল পরিশ্রম করেছিলেন ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের প্রভাব কমিয়ে আনতে। এটা তাঁরা করেছিলেন খ্রিষ্টবিশ্বাসে চিড় ধরিয়ে। তাঁদের এই সাফল্য এবং ফরাসি বিপ্লবের পরিণতি খ্রিষ্টবিশ্বাসে অনমনীয় মানুষদের আতঙ্কিত করেছিল। তুলনায় ভীত মানুষদের কল্পনাকে ক্রমাগত ভয়ঙ্কর প্রথার তাড়না দিয়ে চালানো হতে থাকল। এইসাথে যুক্ত হলো কতিপয় ভয়ার্ত স্বপ্নের ভৌতিকতা।' ১৭৯৫ সাল নাগাদ ইংল্যান্ডের সম্পন্ন নাগরিকরা দেখলেন প্রতিটি বাইবেলবিরোধী মতবাদকে আক্রান্ত হতে। এ আক্রমণ নামানো হয়েছিল ফরাসি বিপ্লবের আগে বিট্রিশ জনমত যতটা উদার ছিল, পরে অনেক বছর ধরে ইংল্যান্ড তুলনামূলক কম উদারতা দেখিয়েছে।

ভূবিদ্যার আরও উন্নতি জীববিদ্যার উন্নতির সঙ্গে জড়িয়ে গেল। এটা হবার কারণ ইতিমধ্যে বিলুপ্ত অসংখ্য জীবাশ্মতে বদলে গেছে। সংরক্ষণ করেছে জীববিলুপ্তির রেকর্ড। পৃথিবীর প্রাচীনত্ব যতটা সংশ্লিষ্ট তাতে ভূবিদ্যা এবং ধর্মতত্ত্ব একটা ঐকমত্যে পৌছতে পারত যদি ছয় দিন ছয়টা যুগ বলে ব্যাখ্যা করতে সম্মত থাকত ধর্মবাদীরা। কিন্তু প্রাণীদের জীবনচক্র সম্পর্কে ধর্মতত্ত্বের সুনির্দিষ্ট অনেক ধারণা ছিল। এসব ধারণাগুলো বিজ্ঞানে খাপ খাওয়ানো খুবই অসুবিধাজনক মনে হলো। মহাপতনের আগে পর্যন্ত কোনো প্রাণী অন্য প্রাণী শিকার করত না। এই সময় পর্যন্ত টিকে-থাকা সমস্ত প্রাণীকুল নোয়ার আর্কে[৫] থাকা প্রজাতিগুলোর প্রতিনিধি। আর বর্তমানে যে-সব প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে, কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত, সে-সব মহাপ্লাবনে ডুবে গেছে। প্রজাতিসমূহ অপরিবর্তনশীল। এবং প্রতিটি প্রজাতি এসেছে সৃষ্টির পৃথক কাজ থেকে। এসব বিবৃতির একটিকে প্রশ্ন করার অর্থ ধর্মতাত্ত্বিকদের বিরূপতা ডেকে আনা।

নয়া দুনিয়া আবিষ্কারের পর অসুবিধা দেখা দিতে শুরু করল। আমেরিকা তো আরারত পর্বত থেকে অনেক দূরে। অথচ আমেরিকায় বহু প্রাণী রয়েছে, যারা মধ্যবর্তী স্থানে নেই। কীভাবে এসব প্রাণী এতটা দূরে এল? এতটা দূরে আসতে গিয়ে কেন তাদের কেউ পথিমধ্যে রয়ে গেল না? কেউ কেউ ভাবলেন, নাবিকরা এদের নিয়ে গেছেন।

---

৫. এই মতামত অসুবিধামুক্ত ছিল না। সেন্ট অগাস্টিন মাছি সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের কারণটা বোঝার ব্যাপারে নিজের অজ্ঞতাকে স্বীকার করেছেন। লুথার, আরও সাহসিকতার সাথে সিদ্ধান্তে এলেন যে, মাছিগুলো সব শয়তানের সৃষ্টি। শয়তান এদের সৃষ্টি করেছে তাঁর ভালো ভালো বই লেখার কাজে মনোযোগ নষ্ট করতে। পরের মতটা অবশ্যই আপাত-যুক্তিগ্রাহ্য।

কিন্তু এমন প্রকল্পের অসুবিধাও রয়েছে। এই বিষয়টা ধর্মবিদ জোসে যোশেপ অ্যাকসটা, যিনি ইন্ডিয়ানদের ধর্মান্তরকরণে নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন, তিনি নিজের ধর্মবিশ্বাসও ধরে রাখতে অসুবিধায় পড়েছিলেন। ১৫৯০ সালে প্রকাশিত হল তাঁর বই *Natural and Moral History of Indies*। এই বইয়ে তিনি যথেষ্ট গভীর ধারণায় বিষয়টা আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, 'কে এমন কল্পনা করবে যে, ভ্রমণের এতটা পথে মানুষ কষ্ট করে খেঁকশিয়ালকে পেরু নিয়ে আসবে? বিশেষত খেঁকশিয়ালের সেই জাত, যারা সব থেকে নিকৃষ্ট। যাদের ওঁরা অ্যাসিয়াস *(Acise)* বলে। কেই-বা এভাবে বলবে যে, তারা বাঘ আর সিংহদেরও বহন করে এনেছে? সত্যি বলতে গোটা ব্যাপারটা এমনই যে ভাবলে হাসি পায়। এতটা দীর্ঘ ও অচেনা সমুদ্রযাত্রায় মানুষ নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো দাপটে চালিত হয়েছে? নিজেদের জীবন বাঁচানোর তাগিদেই তারা নেকড়ে আর খেঁকশিয়াল বহন করবে না, সমুদ্রপথে[৬] ওদের দেখভালও করবে না।' এসব সমস্যার কারণে ধর্মতাত্ত্বিকরা এমন বিশ্বাসে বদল ঘটালেন। তাঁরা বললেন যে নোংরা অ্যাসিয়াস এবং এ-ধরনের অন্যান্য বিদঘুটে পশুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সূর্যের কাজের দ্বারা তৈরি কাদামাটি থেকে জন্মেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এসব কথার কোনো ইঙ্গিত নোয়ার আর্কে ছিল না। অথচ প্রশ্ন থাকল, কীভাবে চলনে বড়ো শ্লথ অলস জন্তুগুলো আররত পর্বত থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণ আমেরিকায় পৌছালো? আর একটা সমস্যা দেখা দিল প্রাণীবিদ্যার অগ্রগতিতে প্রজাতির সংখ্যা জানতে পারার কারণে। যে-সংখ্যা এখন জানা গেছে তা তো লক্ষ লক্ষ। এত সংখ্যক প্রাণীর এক জোড়া করেও যদি নোয়ার আর্কে থেকে থাকে, তাহলে তো ওই আর্ক প্রচণ্ড ভিড়ে ঠাসা ছিল। সব প্রাণীদের ওই আর্কে জায়গা দেওয়া সম্ভব ছিল কী? অধিকন্তু, আদম, এত প্রাণীর নামকরণ করেছেন। সেটাও তো কম জীবনের শুরুতে করে ওঠা এক সাংঘাতিক কঠিন প্রচেষ্টা। অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কার এক নতুন অসুবিধার সৃষ্টি করল। প্রশ্ন উঠল, কেন সব ক্যাঙ্গারু লাফিয়ে টোপা প্রণালী পেরিয়ে গেল? কেন এদের এক জোড়াও পেছনে পড়ে রইল না? ইতিমধ্যে জীববিদ্যায় প্রভূত অগ্রগতি ঘটে গেছে। ফলে এটা ধরে নেওয়ার অসুবিধা দেখা দিল যে, সূর্য আর কাদামাটি এক জোড়া ক্যাঙ্গারুর জন্ম দিয়েছে। তবুও এই সময়ে এমন একটা তত্ত্বের বড়ো বেশি প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

---

৬. হোয়াইটের Warfare of Science with Theology বই থেকে উদ্ধৃত।

গোটা উনিশ শতক জুড়ে এই ধরনের সমস্যা ধর্মবিশ্বাসীদের মন তোলপাড় করেছিল। এসব জানতে আপনারা পড়ে নিন একখানা ক্ষুদ্র বই। শিরোনাম *The Theology of Geologists as exemplified in the casess of Hugh Miller and Orther*। এই বইয়ের লেখক উইলিয়াম গিলেসপি যিনি *The Necesssary Existence of God etc. etc* বইয়েরও লেখক। একজন স্কটিশ ধর্মতাত্ত্বিকের লেখা এই বই প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে। এই একই বছরে প্রকাশিত হয় ডারউইনের *Origin of Species*। স্কটিশ ধর্মতাত্ত্বিকের বইখানায় বলা হয়েছে, প্রতিবাদদের ভয়াবহ স্বীকৃত সত্যের কথা। প্রধান যে-সমস্যাটা নিয়ে লেখক আলোচনা করেছেন সেটাই উত্থাপন করেছিলেন হাগ মিলার। *Testimony of the Rocks* বইয়ে মিলার বলেছেন, 'মানুষের আবির্ভাবের পূর্বে অকথিত যুগে পাপ এবং ভোগান্তি ঘটেছে। জীবজন্তুর সৃষ্টি যথাযথভাবে এর বর্তমান লড়াইয়ের অবস্থাটা দেখিয়েছে। কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে মিলার সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন মৃত্যু এবং অত্যাচারের হাতিয়ারগুলোর কথা। মানুষের আবির্ভাবের পূর্বে এগুলো একক প্রজাতির জন্তু অন্য প্রজাতির বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। এসব জন্তুরা মানুষের আবির্ভাবের পূর্বেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মিলার নিজে প্রবলভাবে ধার্মিক ছিলেন। তবুও তিনি এটা বুঝতে বেশ অসুবিধায় পড়েছিলেন যে, স্রষ্টা কেন পাপ করতে অপারগ জন্তুদের উপর এই যন্ত্রণা আরোপ করবেন! মি. গিলেস্‌পি সাক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও, গোঁড়া ধর্মমতকে পুনরায় নিশ্চিত করে বলেছেন। তিনি বলেছেন, নিম্নবর্গীয় জন্তুরা মানুষের পাপের জন্যই ভোগে এবং মারা যায়।' তিনি বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দেন, মানুষের দ্বারা মৃত্যু এল।' এই উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করতে চান যে, আদম আপেল[৭] খাওয়ার আগে পর্যন্ত কোনো প্রাণীই মারা যায়নি। বিলুপ্ত প্রাণীদের মধ্যে লড়াইয়ের মিলার প্রদত্ত বর্ণনা দিয়ে তিনি বললেন যে, একজন দয়ালু স্রষ্টা এ-ধরনের দানব সৃষ্টি নাও করতে পারতেন। এ-যুক্তিতে আমরা তাঁর সঙ্গে একমত। কিন্তু তাঁর পরবর্তী যুক্তিগুলো কৌতূহল উদ্দীপক। মনে হয়েছিল যে, তিনি সম্ভবত ভূবিদ্যার সাক্ষ্যগুলোকে অস্বীকার করতে চাইছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর সাহসে কুলোয়নি। এ ধরনের দানব তাঁর বক্তব্যের আগেও ছিল। কিন্তু এসব দানব সরাসরি ঈশ্বরের সৃষ্ট নয়। আদিতে ওরা নির্দোষ প্রাণীই ছিল। শয়তান ওদের পথভ্রষ্ট করেছে। অথবা, বোধহয়, গ্যাডারিন শূকরদের মতো ওরা পশুত জন্তুর দেহে দানবের আত্মাবিশেষ।

---

৭. এই ধারণাটা সব সম্প্রদায়ের ছিল। এভাবে ওয়েসলে বলেন যে, মহাপতনের আগে, সব মাকড়সাই আজকের মতো নিরীহ ছিল এবং রক্তের জন্য ওত পেতে সে থাকত না।

এই ব্যাপারটাই ব্যাখ্যা করে, বাইবেলে কি কারণে গ্যাডারিন শূকরের [illegible] রয়েছে। এই গল্প বিশ্বাসের ব্যাপারে অনেককে বিশ্বাসে দ্বিধাগ্রস্ত করে।

জীববিদ্যার ক্ষেত্রে ধর্মীয় গোঁড়ামিকে বাঁচাতে একটা অদ্ভুত চেষ্টা চালালেন প্রকৃতি পর্যবেক্ষক গস। ইনি ছিলেন একমণ্ড গসের পিতা। পৃথিবীর প্রাচীনত্বের অনুকূলে হাজির-করা সব সাক্ষ্যই তিনি পুরোপুরি স্বীকার করলেন। কিন্তু [illegible] বিশ্বাসটা বজায় রাখলেন যে, যখন সৃষ্টি চলছিল তখন সবকিছু এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যাতে বোঝা যায় যে, এর একটা অতীত ইতিহাস রয়েছে। যুক্তি অনুসরণ করে এই তত্ত্বকে অসত্য বলে প্রমাণ করা অসম্ভব। ধর্মতাত্ত্বিকরা [illegible] সিদ্ধান্ত করেছেন যে, আদম এবং ইভের নাভিস্থল ছিল। এতে বোঝা যায় যে তাঁরা সাধারণভাবেই জন্মগ্রহণ[৮] করেছিলেন। অনুরূপভাবে সবকিছু, যা [illegible] হয়েছে, এসব এমনভাবে সৃষ্ট হতে পারে যে, এগুলো সব বিকশিত হয়েছে শিলার মধ্যে জীবাশ্মভরা হয়ে থাকতেই পারে। এসব এভাবে তৈরি হবার [illegible] আগ্নেয়গিরির কাজ অথবা পাললিক শিলার জমাট এমন সৃষ্টির কারণ হতে পারে। কিন্তু একবার এই ধরনের সম্ভাবনা স্বীকার করে নিলে পৃথিবীর সৃষ্টিকে অন্য [illegible] ছাড়া একটা বিশেষ মুহূর্ত বলে ভাবার কোনো কারণ থাকে না। যদিও এটা একটা যৌক্তিক সম্ভাবনা তবুও কেউ এটা বিশ্বাস করতে পারেন না। গস নিজেও [illegible] তিক্ত হতাশা নিয়েই বুঝেছিলেন যে, কেউ তাঁর ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে বিজ্ঞানের [illegible] মিটমাটের যৌক্তিকভাবে প্রশংসনীয় উদ্যোগ বিশ্বাস করেন না। ধর্মতত্ত্ববিদরা তাঁকে এড়িয়ে তাঁদের আগেকার অনেকখানি দখল ছেড়ে দিলেন। বাকি যেটুকু রইল সেটুকুতে নিজেরা গেড়ে বসতে চাইলেন।

অবতরণ ও ভিন্নতার পথে গাছপালা এবং প্রাণীর ক্রমবিবর্তনের মতবাদ জীববিদ্যায় এসেছে অনেকটাই ভূবিদ্যার মাধ্যমে। এই মতবাদকে তিনটে অংশে ভাগ করা যায়। এক, প্রথম মতবাদটা হলো ঘটনা। দূরবর্তী যুগের ঘটনা যা [illegible] নিশ্চিত হবার আশা করা যায়, ঘটনা ততটাই। জীবনের সরল আকারই [illegible] প্রাচীনতর। অধিকতর জটিল গঠনের জীবন প্রথম দেখা গেল পরবর্তী পর্যায়ে। দুই, এমন একটা তত্ত্ব রয়েছে যে, পরবর্তী এবং অধিকতর সংগঠিত আকার স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুরু হয়নি। এগুলো আগের আকার থেকে ক্রম রূপান্তরের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে।

---

৮. সম্ভবত এই কারণেই গস তাঁর বইখানার নাম দেন *Omphalos*।— লেখক

* *Omphlos* কথাটার দুটো অর্থ। (১) গ্রীসের ডেল্‌ফিতে পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু বলে অনুমিত স্থানে [illegible] শঙ্কু আকৃতির প্রস্তরফলক। (২) নাভি। এখানে নাভি অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত।

এটাকেই জীবিদ্যায় বিশেষভাবে 'বিবর্তন' বলা হয়। তিন, এখনও সম্পূর্ণতা থেকে দূরবর্তী বিবর্তনের কার্যকারিতার ব্যাখ্যা নিয়ে গবেষণা চলছে। এই কার্যকারিতার ব্যাখ্যা মানে ভিন্নতার কারণ এবং অন্য অনেকের মূল্যে কতিপয় ধরনের প্রাণীদের বেঁচে থাকা। বিবর্তনের সাধারণ মতবাদ এখন জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত। তবুও এর কার্যকারিতার ব্যাখ্য নিয়ে সংশয় রয়ে গেছে। ডারউইনের মুখ্য ঐতিহাসিক গুরুত্ব হলো তিনি একটা কার্যকারিতার ব্যাখ্যা দিতে পেরেছিলেন। এটা হলো প্রাকৃতিক নির্বাচন। এটাই বিবর্তনের সম্ভাব্যতাকে তুলে ধরে। তাঁর এই যুক্তি এখনও স্বীকার্য। তবুও এটা তাঁর পরবর্তী উত্তরসূরীদের কাছে যতটা সন্তোষজনক ছিল, বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানীদের কাছে ততটা নয়।

বিবর্তনের মতবাদকে প্রথম যে-জীববিজ্ঞানী গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তিনি হলেন ল্যামার্ক (১৭৪৪-১৮২৯)। তাঁর মতবাদটা অবশ্য গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। এর কারণ, কেবলমাত্র প্রজাতির অপরিবর্তনীয়তার প্রতি পূর্বসংস্কার নয়। উপরন্তু তিনি কার্যকারিতার যে-ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন সেটাও বিজ্ঞানবাদীরা গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, একটি প্রাণীর মধ্যে একটি নতুন অঙ্গ তৈরি হয় প্রাণীটির সেই অঙ্গের নতুন চাহিদা থেকে। তাঁর আরও বিশ্বাস ছিল যে, একটি প্রাণীর জীবদ্দশায় যে-অঙ্গটি সংগৃহীত হলো সেটি তার সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চারিত হয়। দ্বিতীয় প্রকল্পটি ছাড়া প্রথমটি অকার্যকারী বিবর্তনের আংশিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও। ডারউইন নতুন প্রগতির বিকাশে প্রথম প্রকল্পটি প্রত্যাখ্যান করেন। তবুও তিনি দ্বিতীয়টি গ্রহণ করেন যদিও ল্যামার্কের তুলনায় তাঁর পদ্ধতিতে এর গুরুত্ব কম। দ্বিতীয় প্রকল্পটি, যেটি অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার, সেটি ওয়েইস্‌ম্যান কর্তৃক বলিষ্ঠভাবে অস্বীকৃত হয়েছে। এটা নিয়ে এখনও বিতর্ক রয়েছে। যে-সাক্ষ্য এখনও প্রবল তা হলো সম্ভাব্য বিরল ব্যতিক্রমসহ কেবলমাত্র অর্জিত বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকারে পর্তায় যেগুলো জননকোষকে প্রভাবিত করে। এগুলো অবশ্য খুবই কম। এই কারণে ল্যামার্কের বিবর্তনের কার্যকারিতার ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যায় না।

লায়েলের Principles of Geology প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৩০ সালে। এই বইয়ে তিনি পৃথিবী ও প্রাণের প্রাচীনত্ব নিয়ে জোরালো সাক্ষ্যমূলক ঘোষণা রাখেন। এতে গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রবল আলোড়ন শুরু হয়। এসব সত্ত্বেও তাঁর বইয়ের আগের সংস্করণগুলো জৈবিক বিবর্তন প্রকল্পের অনুকূলে ছিল না। আলোচ্য বইখানায় ল্যামার্কের তত্ত্বের খুব সতর্ক আলোচনা রয়েছে। এবং বৈজ্ঞানিক কারণেই তিনি ল্যামার্কের তত্ত্ব বাতিল করেছেন। ১৮৫৯ সালে

প্রকাশিত হলো ডারউইনের Origin of Species। এই বই প্রকাশের আগে লায়েলের বইয়ের পরবর্তী সংস্করণগুলোতে বিবর্তনতত্ত্বকে ক্রমপোষকতা করা হয়েছে।

ডারউইনের তত্ত্বের আবশ্যিক বিস্তার ছিল প্রাণী এবং উদ্ভিদ জগতের অর্থনীতির অবাধ বাণিজ্য তত্ত্বের আদল পর্যন্ত। ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব ডারউইনের তত্ত্বকে পোষকতা দিয়েছে। সমস্ত সজীব বস্তু এত দ্রুত নিজেদের পুনরুৎপাদিত করে যে, এদের প্রত্যেকটি প্রজন্মের বেশি সংখ্যক উত্তরাধিকার রেখে যাবার বয়সে পৌঁছোনোর আগেই মারা যায়। একটা স্ত্রী কডফিস্ বছরে প্রায় ৯,০০০,০০০ ডিম পাড়ে। এরা সবাই যদি পূর্ণবয়স্কে পৌঁছোয় এবং কড্‌ফিস্ জন্ম দেয় তাহলে সমুদ্র, কয়েক বছরে, কড্‌ফিসে ভরে যাবে। এতে ভূভাগেও নতুন মহাপ্রলয় শুরু হবে। এমনকি মানুষের জনসংখ্যা, যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার, হাতি ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে কম, তাও পঁচিশ বছরে দ্বিগুণ হয়ে যায়। এই জনবৃদ্ধি আগামী দুই শতকে পৃথিবীব্যাপী চলতে থাকলে পরিণামে জনসংখ্যা দাঁড়াবে কয়েক হাজার লক্ষে। কিন্তু ঘটনা হিসাবে আমরা দেখছি যে, প্রাণী এবং উদ্ভিদের সংখ্যা কার্যত মোটামুটি স্থিতিশীল। বেশিরভাগ সময়ে মানুষের জনসংখ্যার ক্ষেত্রেও এটা সত্য বলে দেখা গেছে। সুতরাং প্রতিটি প্রজাতির নিজেদের মধ্যে এবং বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে একটা স্থায়ী ধারবাহিক প্রতিযোগিতা চলছে। এই প্রতিযোগিতায় পরাজয়ের শাস্তি হলো মৃত্যু। এ থেকে বলা যায় যে, একটি প্রজাতির সদস্যরা অন্যদের থেকে কেমনভাবে আলাদা হলে, এটা তাদের বেশি সুযোগ দেয়, এটা বুঝলে তাদের টিকে থাকার সম্ভাবনা অধিকতর হয়। এই পার্থক্য অর্জিত হলে সেটা এদের উত্তরপুরুষে রূপান্তরিত হবে না। কিন্তু এটা যদি সহজাত হয়, তাহলে এটার অন্তত অনেকাংশ তাদের উত্তরপ্রজন্মে পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনা থাকে। ল্যামার্ক ভেবেছিলেন যে, উঁচু ডালে পৌঁছোনোর চেষ্টায় গলা বাড়িয়ে দেবার কারণে জিরাফের গলা লম্ব হয়। এবং এই গলা বাড়িয়ে দেবার প্রবণতা বংশানুক্রমিক। ডারউইনের ধারণা হলো যে, অন্তত ওয়েইজম্যানের রূপান্তরের জন্ম থেকে জিরাফের প্রবণতা হলো লম্বা গলাপ্রাপ্তি, এর ফলে অন্যদের তুলনায় এদের অনাহারে থাকার সম্ভাবনা কম। এ কারণে এরা বেশি সংখ্যক উত্তরসূরী রেখে গেছে। এই উত্তরসূরীদের লম্বা গলা থাকার সম্ভাবনা। এদের মধ্যে কারোর কারোর তাদের পিতামাতার লম্বা গলা থেকেও অধিকতর লম্বা গলা থাকতে পারে। এভাবে জিরাফ ক্রমে তার অদ্ভুত ধরনের বিকাশ ঘটাবে। এটা ঘটতে থাকবে সেই পর্যন্ত যখন বিকাশের দ্বারা গলা আর লম্বা করা যাবে না।

ডারউইনের তত্ত্ব নির্ভর করে আকস্মিক ভিন্নতার ঘটনার উপর। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, এর কারণ তিনি জানেন না। এটা একটা পর্যবেক্ষণজাত ঘটনা যে, একজোড়া প্রাণীর উত্তরপুরুষ হুবহু একরকম নয়। গৃহপালিত পশুদের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে কৃত্রিম নির্বাচনের ফলে। মানুষের হস্তক্ষেপে গরু বেশি বেশি দুধ দেয়, রেসের ঘোড়া দ্রুততর বেগে ছোটে, ভেড়া বেশি উল দেয়। এসব ঘটনা ডারউইনকে খুবই প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য জুগিয়েছে। নির্বাচন এই কাজগুলো করে থাকতে পারে। এটা সত্যি যে, প্রজননবিদ একটা মাছকে উপ-জঠরীতে রূপান্তরিত করতে পারেন না। অথবা একটা উপ-জঠরী প্রাণীকে একটা বাঁদরেও বদলে দিতে পারেন না। কিন্তু এ ধরনের বিশাল পরিবর্তনের জন্য অগণন যুগব্যাপী সময়সীমা দরকার। অধিকন্তু, অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ বংশধারার সাক্ষ্যও ছিল। জীবাশ্ম এটা দেখিয়েছে যে, বর্তমানের ব্যাপক পৃথক প্রজাতির মধ্যবর্তী প্রাণীর অতীতেও অস্তিত্ব ছিল। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, টেরাডেকটাইল ছিল অর্ধ-পাখি, অর্ধ-সরীসৃপ। ভ্রূণবিদ্যাবিদগণ আবিষ্কার করেছেন যে, বিকাশের গতিধারায় অপরিণত প্রাণীরা আগের প্রাণীদের আকারের পুনরাবৃত্তি ঘটায়। একটা স্তন্যপায়ীর ভ্রূণের একটা বিশেষ স্তরে একটা মাছের কান্‌কোর প্রাথমিক পর্যায়টা বর্তমান থাকে। স্তন্যপায়ীর ভ্রূণের পক্ষে এটা পুরোপুরি অপ্রয়োজনীয়। তবুও এটা থাকার বিষয়টাকে প্রাচীন বংশধারার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ছাড়া অন্য কোনোভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। বিভিন্ন ধরনের অনেক যুক্তিধারা যুক্ত হয়ে জীববিজ্ঞানীদের প্রত্যয় জাগিয়েছে। এ-প্রত্যয়ের মূল কথা বিবর্তনের ঘটনা এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনই প্রধান কারক, যার দ্বারা এসব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

কোপার্নিকাসের মতবাদের মতো ডারউইনবাদও ধর্মতত্ত্বের প্রতি এক তীব্র আঘাত। এই আঘাতে বরবাদ করতে হয়েছে অনেক কিছু। প্রজাতির স্থায়িত্ব এবং সৃষ্টিতত্ত্ব ঘোষিত সৃষ্টির পৃথক কারণসমূহ বাতিল করতে হয়েছে। প্রয়োজন হয়েছে জীবনের সূচনা থেকে সময়ের বিরতির ধারণা গ্রহণ করা। এটা গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসীদের কাছে ছিল এটা শোকাবহ ব্যাপার। বাতিল করার প্রয়োজন হয়েছিল বিধাতার বদান্যতার শত যুক্তি। পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীদের নিখুঁত অভিযোজন, যেটা এখন প্রাকৃতিক নির্বাচনের কাজ বলে ব্যাখ্যা করা হয় কিন্তু উপরে-বলা একটি কিংবা সবকটি থেকে বিপর্যয়কারী কথা হলো বিবর্তনবাদীদের এই সোচ্চার ঘোষণা যে, নিম্নতর প্রাণী থেকে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। ধর্মতত্ত্ববিদরা এবং অশিক্ষিত মানুষেরা বস্তুত এই তত্ত্বটার একটা দিকের উপর সব জোর দিলেন। দিকটা হলো, ডারউইন বলছেন যে, মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে

বাঁদর থেকে।'এ কথায় বিশ্ব আতঙ্কে সচকিত হয়ে উঠল। ধিকৃত ভাষায় এটা শুরু হলো যে, ডারউইন এটা বিশ্বাস করেন কারণ তিনি নিজে দেখতে বাঁদরের মতো। (তিনি দেখতে তেমন ছিলেন না।) আমি যখন বালক ছিলাম আমার এক গৃহশিক্ষক নিরতিশয় গাম্ভীর্য নিয়ে আমাকে বলেছিলেন, 'তুমি একজন ডারউইন পন্থী হলে আমি তোমাকে করুণা করি, কারণ একই সময়ে ডারউইনবাদী ও খ্রিস্টান হওয়া অসম্ভব।' আজও পর্যন্ত আমেরিকার টেনিসি রাজ্যে বিবর্তন মতবাদ শিক্ষা দেওয়া বেআইনি। এর কারণ এই মতবাদকে ঈশ্বরের বক্তব্যবিরোধী বলে ভাবা হয়।

প্রায়শই যেমনটা ঘটে, ধর্মতত্ত্ববিদরা এই মতবাদের প্রবক্তাদের তুলনায় দ্রুত এই নতুন ডারউইনি মতবাদের পরিণতি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। প্রবক্তাদের অনেকেই ছিলেন ধর্মবাদী মানুষ। ডারউইনের হাজির-করা সাক্ষ্য থেকে প্রমাণ হলেও এঁরা আগেকার বিশ্বাস যতটা সম্ভব ধরে রাখতে চাইছিলেন। প্রগতি ঘটে বিশেষত উনিশ শতকে এর প্রবক্তাদের মধ্যে, অনেকটাই সহজসাধ্য করার চেষ্টা হয়েছে। অন্য একটা পরিবর্তন গ্রহণ করানোর আগে অন্য আর একটা পরিবর্তনে তাদের অভ্যস্ত করানো হয়েছিল। নতুন কোনো উদ্ভাবনের সমুদয় যুক্তিতর্ক একসঙ্গে হাজির করা হলে, মানুষের অভ্যাসটা এতটাই আঘাত পায় যে, মানুষ গোটা বিষয়টাকেই প্রত্যাখ্যান করে। পক্ষান্তরে,তাঁদের যদি প্রতি দশ অথবা বিশ বছরে একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলা হত, তাহলে বেশি প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই তারা প্রগতির পথে এগিয়ে যেত। বৌদ্ধিক কিংবা রাজনৈতিকভাবে উনিশ শতকের মহান মানুষেরা সবাই বিপ্লবী ছিলেন না। কিন্তু কোনো সংস্কার প্রবল ভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠলে তাঁরা এর সপক্ষে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে আগ্রহী ছিলেন।উদ্ভাবকদের সতর্ক মানসিক অবস্থা উনিশ শতককে চূড়ান্ত দ্রুত গতি প্রগতির জন্য বিশিষ্ট করে রেখেছে। ধর্মতত্ত্ববিদরা সাধারণ মানুষের তুলনায় বেশি বুঝতে পেরেছিলেন, কী ঘটতে যাচ্ছে। তাঁরা নির্দিষ্টভাবে বললেন, মানুষের অমর আত্মা রয়েছে যা বাঁদরের নেই। যিশুখ্রিস্ট মানুষদের উদ্ধারের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন, বানরদের জন্য নয়। মানুষের মধ্যে ঐশ্বরীয়ভাবে সঞ্চারিত ভালো মন্দের একটা ধারণা আছে। পক্ষান্তরে, বাঁদরেরা পুরোপুরি সহজাত প্রবৃত্তি পরিচালিত। মানুষ যদি বোধাতীতভাবে বানর থেকে বিকশিত হয়, তাহলে কোন্ মুহূর্তে আচম্বিতে তারা এসব ধর্মতত্ত্বীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করল? The Origin of Species বইটির প্রকাশের পরের বছর ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনে বিশপ উইলফোর্স ডারউনবাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন।

ঘোষিত কণ্ঠে বললেন, 'প্রাকৃতিক নির্বাচনের নীতি ঈশ্বরের বাণীর সম্পূর্ণ বিপরীত।' কিন্তু তাঁর সমুদয় বাগ্মিতা ব্যর্থ হলো। সাধারণভাবে ভাবা হলো যে, ডারউইনবাদের প্রবক্তা হাক্সলি যুক্তিবিন্যাসে বিশপকে পরাজিত করেছেন। মানুষ এখন আর গির্জার অসন্তোষে ভীত নন। জীববিজ্ঞানীরা দ্রুত প্রাণী ও উদ্ভিদের বিবর্তন মতবাদ গ্রহণ করছেন। যদিও চিচেস্টারের (Chichester) ডিন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মোপদেশ সভার অক্সফোর্ডকে বললেন, 'যাঁরা আমাদের প্রথম পিতা-মাতার সৃষ্টির ইতিহাস, এর স্পষ্টত আক্ষরিক অভিপ্রায় অনুযায়ী গ্রহণে অসম্মত এবং বিবর্তনের আধুনিক স্বপ্নকে এর স্থলাভিষিক্ত করতে চান, তাঁরা মানুষের মুক্তির পুরো পরিকল্পনাটাই ভেস্তে দিতে উদ্যত।' কার্লাইল কট্টরপন্থীদের গোঁড়া ধর্মমত নয়, কিন্তু প্রশ্রয় দিতেন কট্টরপন্থীদের অসহিষ্ণুতাকে। ডারউইন সম্পর্কে তিনি বললেন, 'নোংরা পুজোর বাণী প্রচারক।'

সাধারণ খ্রিস্টানদের অবৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গি বেশ ভালোভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন গ্লাডস্টোন। তখন তো উদারতার যুগ। যদিও এই উদারমনা নেতা তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন এটাকে একটু ভিন্নতর করার। ১৮৬৪ সালে দু'জন যাজককে চিরন্তন শাস্তির ব্যাপারে তাঁদের অবিশ্বাসের জন্য শাস্তির চেষ্টা ব্যর্থ হলো। কারণ প্রিভি কাউন্সিলের জুডিশিয়াল কমিটি এঁদের দু'জনকে মুক্তি দিয়েছিলেন। গ্লাডস্টোন আতঙ্কিত হলেন। তিনি বললেন যে, যদি বিচারের রায় অনুসৃত হত তাহলে খ্রিস্টীয় বিশ্বাস এবং এর স্বীকৃতির মধ্যে একটা সম্পূর্ণ উদাসীনতা প্রতিষ্ঠা পেয়ে যেত। ডারউইনের তত্ত্ব প্রথম প্রকাশের সময় শাসনে অভ্যস্ত মানুষের মতো সহানুভূতিশীল অনুভূতি প্রকাশ করে বললেন, 'যে-প্রত্যয়ে বিবর্তনের কথা বলা হয় তাতে ঈশ্বর সৃষ্টির পরিশ্রম থেকে স্বস্তি পেলেন; অপরিবর্তনীয় বিধানের নামে তিনি বিশ্বশাসনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেলেন।' গ্লাডস্টোনের অবশ্য ডারউইনের বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তিগত বিরোধিতা ছিল না। পরে তিনি ডারউইনবাদের বিরোধিতার রূপান্তরও ঘটিয়েছেন। ১৮৭৭ সালে অন্তত একবার তিনি ডারউইনের সঙ্গে সাক্ষাৎও করেছেন। এই সাক্ষাৎকারে তিনি বুলগেরীয় নিষ্ঠুরতা নিয়েই বিরামহীনভাবে কথা বলেছেন। তিনি চলে যাবার পরে ডারউইন সর্বিক সফলতায় মন্তব্য করলেন, 'কী দারুণ সম্মানের বিষয় যে, এরকম একজন বিখ্যাত মানুষ আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন!' ইতিহাস কিন্তু আমাদের জানালো না যে, গ্লাডস্টোন ডারউইন সম্পর্কে কোনো ধারণা নিয়ে গেলেন কিনা।

আমাদের সময়ে ধর্ম নিজেকে বিবর্তনের মতবাদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। এমনকি এই মতবাদ থেকে নতুন নতুন যুক্তিও আহরণ করেছে। এখন আমাদের বলা হচ্ছে, 'যুগ যুগ ধরে একটা বর্ধিষ্ণু উদ্দেশ্য প্রবাহমান রয়েছে।'

এবং এটাও বলা চলছে যে, বিবর্তন হলো ঈশ্বরের মনোজগতে চিরকাল ধরে বজায়-থাকা একটা ধারণার প্রকাশ। এটা মনে হচ্ছে যে, ওইসব যুগে মিলারকে যে-সব ঘটনা অস্বস্তি দিয়েছে সেসব হলো এইরূপ। প্রাণীগুলো নৃশংস শিং আর যন্ত্রণাদায়ক শৃঙ্গ-হুল নিয়ে একে অন্যের উপর আক্রমণ চালাচ্ছিল। সর্বশক্তিমান এসব দেখেও নীরবে অপেক্ষা করছিলেন শেষ মানুষের আবির্ভাবের জন্য। আর এই মানুষের আবির্ভাব ঘটলো নিপীড়নের সূক্ষ্ম ক্ষমতা এবং অনেক বেশি পরিব্যাপ্ত নিষ্ঠুরতা নিয়ে। স্রষ্টা তাঁর এই কাজ সরাসরি না পৌঁছে একটা পদ্ধতিকে বেছে নিলেন কেন? আধুনিক ধর্মতত্ত্ববিদরা এ-লক্ষ্যে সরাসরি না পৌঁছে একটা পদ্ধতিকে বেছে নিলেন কেন? আধুনিক ধর্মতত্ত্ববিদরা এ-কথার কোনো উত্তর আমাদের জানান না। পরিসমাপ্তির গৌরব নিয়ে আমাদের সংশয় নিরসনে তাঁরা বেশি কিছু বলেনও না। এটা খুব কষ্ট হয় না যেমনটা একটি বালকের মনে হয়। বালকটিকে বর্ণমালা শেখার পর তার মনে হয়, এটুকু পাবার জন্য এতটা কষ্ট করার প্রয়োজন ছিল না। যা হোক, এটা একটা রুচির ব্যাপার।

আর একটি গুরুতর আপত্তি হলো, বিবর্তনের উপর ভিত্তি-করা যে-কোনো ধর্মতত্ত্ব। ষোল ও সতের শতকে মতবাদটি প্রথম প্রচলিত হয়। তখনই সেটা একটা বিশ্ববিধি বলে গৃহীত হয়। আমরা কী বছর বছর জ্ঞানে সমৃদ্ধশালী হচ্ছি না? এবং হ্রাসপ্রাপ্ত কর ব্যবস্থা সত্ত্বেও বাজেটের উদ্বৃত্ততা কি ভোগ করছি না? আমাদের যন্ত্রপাতি-ব্যবস্থা কি বিশ্বের বিস্ময় ছিল না? আলোকপ্রাপ্ত বিদেশের অনুকরণের জন্য আমাদের পার্লামেন্টারি সরকার কি একটা মডেল ছিল না? কেউ কি সন্দেহ করতে পারে যে, প্রগতি অনির্দিষ্ট কাল ধরে চলতেই থাকবে? বিজ্ঞান এবং যান্ত্রিক উদ্ভাবন যারা সৃষ্টি করেছে তাঁদের নিশ্চিন্তভাবেই বিশ্বাস হয় চলে যে, তাঁরা আরও অঢেল পরিমাণে এসব করতে পারবেন। এমনই সব বিশ্বে বিবর্তনকে মনে হয় প্রাত্যহিক জীবনের একটা সামান্যীকরণ।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও, আরও বেশি চিন্তাশীলের কাছে অন্য একটা ছবি প্রতীয়মান হয়। একই নিয়ম যেটা বিকাশকে সৃষ্টি করে, সেটা অবক্ষয়কে সৃষ্টি করতে পারে। একদিন সূর্য শীতল হয়ে যাবে এবং পৃথিবীর জীবনও থেমে যাবে। প্রাণী ও উদ্ভিদের গোটা ঐতিহাসিক কালটাই তীব্র তাপ এবং বেজায় ঠাণ্ডা যুগসমূহের একটা মধ্যবর্তী সময়। মহাজাগতিক অগ্রগতির কোনো নিয়ম নেই, কিন্তু কেবল একটা ঊর্ধ্বমুখীন এবং নিম্নমুখীন দোদুল্যমানতা রয়েছে। এই দোদুল্যমানতার একটা ধীর প্রবণতা ভারসাম্যের উপর শক্তির ব্যাপনার

কারণে নিম্নমুখীন। এটাকে অন্তত বিজ্ঞান এখন খুবই সম্ভাব্য বলে মনে করে। এবং বর্তমানে আমাদের মোহমুক্ত প্রজন্মে এটা বিশ্বাস করা সহজ। আমাদের বর্তমান জ্ঞান যতটা সংশ্লিষ্ট তাতে বিবর্তন থেকে শেষ পর্যন্ত আশাবাদী-দর্শন সম্পর্কে কোনো যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাচ্ছে না।

অধ্যায় ৪

ডাকিনীবিদ্যা ও ভেষজ

মানব শরীর এবং তার অসুখ-বিসুখের বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাকে লড়তে হয়েছিল এবং এখনও অনেক ক্ষেত্রে লড়তে হচ্ছে বিপুল কুসংস্কারচ্ছন্নতার বিরুদ্ধে। এসব কুসংস্কারাচ্ছন্নতার জন্ম প্রাক্‌খ্রিস্টীয় যুগে। এবং এসব কুসংস্কারের সমর্থনে, এই আধুনিক সময় পর্যন্তও, যাজক সম্প্রদায় সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিল। অসুখ-বিসুখকে কখনও কখনও পাপের শাস্তির নিমিত্ত একধরনের দৈবীয় উপস্থিতি বলে ভাবা হত। কিন্তু প্রায়শই এটাকে অপদেবতার কাজ বলেই ধরা হত। এসব অসুখ-বিসুখ ভালো হতে পারে ব্যক্তিগতভাবে সাধু-সন্তের মধ্যস্থতিতে। কিংবা সাধুপুরুষের সংরক্ষিত স্মৃতিচিহ্ন দ্বারা। আরোগ্য হতে পারে প্রার্থনা তীর্থ ভ্রমণের সাহায্যে। যদি এটা কোনো ভূত-প্রেতের জন্য ঘটে থাকে তা হলে, রোগটা সারাতে হবে ভূত-প্রেত বিতাড়নের মন্ত্রতন্ত্রের ব্যবস্থার দ্বারা এবং সমান চিকিৎসার ব্যবস্থা করে যা ভূত-প্রেতরা অপছন্দ করে।

এ-ধরনের চিকিৎসার বেশিরভাগ সমর্থন মেলে খ্রিস্টের উপদেশাবলীতে। এটির বাদবাকি অংশ যাজকদের দ্বারাই বিকশিত হয়েছে। অথবা তাঁদের এগুলো থেকে স্বাভাবিকভাবেই এসবের বিকাশ ঘটেছিল। সেন্ট অগাস্টিন এই মত পোষণ করতেন যে, 'খ্রিস্টানদের সমস্ত অসুখ-বিসুখের কারণ আরোপ করতে হবে এই অপদেবতার ওপর। প্রধানত সদ্য খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত, এমনকি নির্দোষ সদ্যজাত শিশুদের উপর বেশি পীড়ন চালিয়ে। এটা অবশ্যই বুঝতে হবে যে, যাজকরা তাদের লেখায় যেমন বলেছেন, অপদেবতাদের অর্থ হল অখ্রিস্টানদের দেবদেবী, যারা খ্রিস্টধর্মের প্রসার দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। প্রাচীন খ্রিস্টধর্মাবলম্বীরা কোনো সন্দেহই অলিম্পাস পর্বতবাসী প্রাচীন গ্রিক দেবদেবীদের অস্তিত্ব অস্বীকার করত না। কিন্তু ওই দেব-দেবীদের তারা শয়তানের ভৃত্য বলে মনে করত। মিলটন তাঁর প্যারাডাইস লস্টে এই অভিমত গ্রহণ করেছিলেন। গ্রেগরী নাজিয়ানজের এই মত পোষণ করতেন যে, ওষুধপত্র সব অকাজের, কিন্তু পবিত্র হাতের স্পর্শ প্রায়শই নিরাময়কারী। এই একই অভিমত অন্যান্য যাজকরাও ব্যক্ত করেছেন।

সারা মধ্যযুগ ধরে সাধুপুরুষদের সংরক্ষিত দেহাবশেষ বা স্মৃতিচিহ্ন [illegible] কার্যকারিতার উপর বিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছিল। এখনও এ-ধরনের বিশ্বাস [illegible] হয়নি। যে-গীর্জা এবং যে-শহরে ঐ স্মৃতিচিহ্নগুলি সংরক্ষিত ছিল, তারা এগুলো [illegible] আয়ের উৎস হিসাবে কাজে লাগাত। এসব প্রদর্শিত হত আর্থিক বিবেচনা [illegible] রেখে। এ-কারণে সেন্ট পলের বিরুদ্ধে এফিশিয়ানদের ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল [illegible] স্মৃতিচিহ্ন সংক্রান্ত বিশ্বাস উদ্‌ঘাটনের পরেও বেঁচে থেকেছে। দৃষ্টান্ত [illegible] পেলারমোতে সেন্ট রোসালিয়ার অস্থিগুলি বহু শতাব্দী ধরে রোগ নিরাময়ে [illegible] হয়েছিল। কিন্তু একজন অদীক্ষিত অ্যানাটমিস্ট পরীক্ষা করে জানিয়েছিলেন [illegible] অস্থিগুলো ছিল ছাগলের।

তৎসত্ত্বেও এভাবেই রোগনিরাময় ব্যাপারটা চলতেই থাকে। এখন আমরা জানি কতিপয় অসুখ-বিসুখ বিশ্বাসের দ্বারা নিরাময় হয়, যেখানে অন্যান্য [illegible] নিরাময় হয় না। এতে সন্দেহ নেই যে 'অলৌকিকত্বের' দ্বারা রোগ নিরাময় [illegible] কিন্তু সেটা একটা অবৈজ্ঞানিক পারিপার্শ্বিকতায় ওই ধরনের গল্পগুলি [illegible] সত্যকে অতিরঞ্জিত করে। এভাবে সাজানো মূর্ছা বায়ুগ্রস্ত রোগগুলোর [illegible] অন্যান্য রোগগুলোর, যা রোগনির্ণয় বিদ্যায় নিরাময়যোগ্য, এ দুয়ের পার্থক্য [illegible] লুপ্ত করে দেয়।

একটা উত্তেজনাকর পরিস্থিতে কিংবদন্তির বৃদ্ধি কীভাবে ঘটে তার [illegible] বিশেষ দৃষ্টান্ত হলো, যুদ্ধের প্রথম সপ্তাহে অনুমান করা হয়েছিল যে, [illegible] ইংল্যান্ডের মধ্য দিয়ে ফ্রান্সে যাবে। ওই ধরনের বিশ্বাসগুলির উৎসকে যখন [illegible] বার করতে পারা যায় তখন আপাতদৃষ্টিতে প্রশ্নাতীতভাবে ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের [illegible] কোনটিকে বিশ্বাস করা হবে তার বিচার করতে ঐতিহাসিকদের সাহায্য করা [illegible] সচরাচর ঘটে না এমন একটি পূর্ণাঙ্গ নজির হিসাবে লয়োলার বন্ধু [illegible] পূর্বদেশীয়[১] জেসুইট মিশনারীদের প্রথম ও সবিশেষ বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের ধরে-নেওয়া অলৌকিতার কথা বলা যায়।

সেন্ট ফ্রান্সিস বহুবছর ভারতে, জাপানে ও চীনে কাটিয়েছিলেন। অবশেষে ১৫৫২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি এবং তাঁর সহযোগীরা অনেক দীর্ঘ [illegible] লিখেছিলেন যা, এখনও পাওয়া যায়। তাঁরা তাঁদের পরিশ্রমের কথা [illegible] করেছিলেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউই চিঠিগুলোর মধ্যে সেন্ট ফ্রান্সিসের [illegible] জীবিতাবস্থায় কোন অলৌকিক ক্ষমতার কথা দাবি করেননি।

---

১. এ বিষয়টা White-এর Warfare of Science with Thelogy গ্রন্থে প্রশংসনীয়ভাবে [illegible] হয়েছে। এই গ্রন্থের নিকট আমি ঋণী।

জেসুইট যোসেফ অ্যাকস্টা পেরুর পশুদের দেখে খুবই বিব্রত হয়েছিলেন। তিনি স্পষ্টভাবে মতপ্রকাশ করে বলেছিলেন যে, খ্রিস্টমিশনারীগণ অখ্রিস্টানদের ধর্মান্তরিত করার প্রচেষ্টায় কোনো অলৌকিকতার সাহায্য পাননি। কিন্তু জেভিয়ারের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে অলৌকিক ব্যাপারগুলোর উদ্ভব হতে শুরু করে। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তাঁর ঈশ্বর প্রদত্ত বাকশক্তি ছিল যদিও তাঁর চিঠিপত্রগুলি জাপানি ভাষার দুরূহতায় পূর্ণ ছিল। ভালো দোভাষীর স্বল্পতা। এরকম বলা হত যে, যখন তাঁর সঙ্গীসাথীরা সমুদ্রে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়তেন, তখন তিনি লোনাজলকে মিষ্টিজলে পরিণত করতেন। তিনি তাঁর ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্তিটি হারিয়ে ফেলেছিলেন। একটি কাঁকড়া সেটি তাঁকে উদ্ধার করে দিয়েছিল। পরবর্তী একটি বর্ণনা অনুসারে, প্রচণ্ড ঝড়কে থামাতে জাহাজের উপর থেকে ক্রুশবিদ্ধ যিশুমূর্তিটিকে জলে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন তিনি। ১৬২২ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে খ্রিস্টীয় মতে মাহাত্ম্য দান করা হয়েছিল। তখন ভ্যাটিক্যানের কর্তাদের সন্তুষ্টির জন্য এটা প্রমাণ করা জরুরি ছিল যে, তিনি অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছিলেন, কারণ ওই ধরনের প্রমাণ ছাড়া কেউ খ্রিস্টান সন্ত হতে পারেন না। পোপ দায়িত্বের সঙ্গে জেভিয়ারের ঈশ্বর প্রদত্ত বাকশক্তির কথা সরকারিভাবে ঘোষণা করেছিলেন। জেভিয়ার তেলের পরিবর্তে জল দিয়ে প্রদীপ জ্বালানোর ঘটনাতে তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত। ইনি সেই একই পোপ, অষ্টম আরবান, যিনি গ্যালিলিওর মতবাদকে অবিশ্বাস্য বলে রায় দিয়েছিলেন। ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে ফাদার বাউয়ারস্-এর জীবনী প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত এই পৌরাণিক কাহিনীর ক্রমবৃদ্ধি ঘটেই চলেছিল। ওই গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে, জীবদ্দশায় চৌদ্দজন মৃতব্যক্তিকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। ক্যাথলিক লেখকরা এখনও তাঁকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হওয়ার স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। সোসাইটি অফ্ জিশাসের ফাদার কোলরিজ ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর জীবনীগ্রন্থে সেন্টফ্রান্সিসের ঈশ্বরপ্রদত্ত বাকশক্তির কথাকে দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করেছিলেন।

এই দৃষ্টান্ত থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, বিস্ময়কর ব্যাপারগুলির ওপর কত অল্প আস্থা রাখতে হয়। এই আস্থা রাখার বিষয়টা সেই সময়ের কথা যখন সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের প্রমাণপত্রগুলির তুলনায় প্রমাণপত্রের সংখ্যা অল্পই ছিল।

অলৌকিক নিরাময়ের ঘটনাগুলি শুধু প্রোটেস্টান্টরাই নয়, ক্যাথলিকরাও সমানভাবে বিশ্বাস করতেন। ইংল্যান্ডে রাজার স্পর্শে নিরাময় হওয়াকে 'রাজার অশুভ শক্তির ব্যাপার' বলা হত। এবং দ্বিতীয় চার্লস যিনি সাধুপ্রকৃতির সম্রাট ছিলেন, তিনি ১ লক্ষ লোককে স্পর্শ প্রদান করেছিলেন। মহিমান্বিত সম্রাটের

শল্যচিকিৎসক ষাটজনের সফল নিরাময়ের খবর প্রকাশ করেছিলেন। এবং [illegible] একজন শল্য চিকিৎসক, তাঁর কথায়, তিনি নিজে রাজার স্পর্শে একশোজনের নিরাময় হওয়ার ঘটনা দেখেছিলেন। ওইসব রোগীদের অনেকেই [illegible] শল্যচিকিৎসকদের চিকিৎসা অগ্রাহ্য করেছিলেন। প্রার্থনার বইতে [illegible] অলৌকিক শক্তি প্রয়োগে আরোগ্যলাভ উপলক্ষে বিশেষ ধর্মাপোসনার অনুষ্ঠানের বিধান দেওয়া হয়েছিল। এই ধরনের ক্ষমতা বংশানুক্রমে দ্বিতীয় জেমস, [illegible] উইলিয়ম এবং রানি অ্যানি পর্যন্ত সঞ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু ওই ক্ষমতাসম্পন্ন হ্যানোভারিয়ান উত্তরাধিকার পর্যন্ত টিকে থাকেনি।

মধ্যযুগে প্রায়ই ঘটে-চলা ভয়ঙ্কর প্লেগ এবং মহামারি রোগগুলো কখনও অপদেবতাদের কাজ আবার কখনও-বা ঈশ্বরের রোষ বলে ধরা হত। ঈশ্বরের ক্রোধ এড়িয়ে যাবার জন্য যাজকরা গীর্জাকে জমিদান করার বেশি সুপারিশ করতেন। ১৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে রোমের ভয়াবহ প্লেগের কারণ হিসাবে অযথার্থভাবে অবজ্ঞাত সেন্ট সেবাস্টিয়ানের রাগের কথাই বলা হয়েছিল। তাঁর নামে একটা স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয় এবং এর পরে প্লেগের প্রকোপ থেমে যায়। ১৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে রেনেসাঁসের চরম বিকাশমান অবস্থায় রোমানরা শহর বিদীর্ণ-করা প্লেগ রোগের কারণ নির্ণয়ে প্রথমে ভুল করেছিল।

যদিও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসগুলি মূলত নিষ্ঠুরতাকে প্রেরণা জুগিয়েছিল [illegible] বেশিদিন এর মান্যতা ছিল না। তবু মস্তিষ্কবিকৃত রোগীদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করার ব্যবস্থাটি প্রথাগতভাবে টিকেছিল। ঘুমকে প্রতিরোধ করা ছিল একটি স্বীকৃত ব্যবস্থা। অন্য ব্যবস্থাটি ছিল রোগীকে প্রহার করা। তৃতীয় জর্জ যখন উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন তখন তাঁকেও প্রহার করা হয়েছিল। যদিও কেউই এটা মনে করেনি যে তিনি যখন প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিলেন তার তুলনায় উন্মাদ হয়ে তিনি বেশি মাত্রায় শয়তানের খপ্পরে পড়েছিলেন। তারা ভেবেছিল এটা অপদেবতা অর্থাৎ প্রাচীন দেবতাদের রোষের কারণে ঘটেছে। সুতরাং কলোসিয়ামে জুপিটারের উদ্দেশে তারা একটা ষাঁড় বলি দিল। এতে কোনো ফলোদয় হলো না। এর পরে তারা ভার্জিন এবং সন্তদের প্রসন্ন করতে মিছিলের আয়োজন করল। এটাকেই তারা অভীষ্ট ফলদানে অধিকতর কার্যকরী বলে ভাবল।

১৩৪৮ সালের 'কালো মৃত্যু' নানা স্থানে নানা ধরনের কুসংস্কারের আমদানি ঘটালো। ঈশ্বরের রোষকে প্রশমিত করতে একটা প্রিয় পদ্ধতি হয়ে উঠল ইহুদিদের ধ্বংসসাধন। ব্যাভারিয়াতে, হিসেব করে দেখা গেল, বারো হাজার

ইহুদিকে হত্যা করা হয়েছিল। এরফুর্টে তিন হাজার। দু'হাজার ইহুদিকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে স্ট্রাসবুর্গে এবং এখানে-ওখানে আরও। কেবলমাত্র পোপ একা এই সংগঠিত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। সায়েনাতে এই 'কালো মৃত্যুর' একটা অসামান্য ফল ফলেছিল। এটা ঠিক হয়েছিল যে, ওখানকার ক্যাথিড্রালটা বিশালভাবে প্রসারিত করা হবে। এই লক্ষ্যে অনেকটা পরিমাণে কাজও এগিয়েছিল। কিন্তু সায়েনার অধিবাসীবৃন্দ, অন্যান্য স্থানের ভাগ্যকে বিস্মৃত হয়ে, এটা ভাবলেন যে, প্লেগ পাপিষ্ঠ সায়েনাতে এসেছিল অশরীরী আত্মার বিশেষ পরিদর্শন হেতু। এই পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল এ-ধরনের একটি জমকালো ক্যাথিড্রাল নির্মাণের গর্বের জন্য তাদের শাস্তি প্রদান করা। তারা কাজটা বন্ধ করে দিল। এই অসম্পূর্ণ নির্মাণটি 'তাদের' অনুতাপের একটি নিদর্শন হিসাবে আজও রয়ে গেছে।

রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে কুসংস্কারমূলক পদ্ধতি শুধুমাত্র বিশ্বজনীনভাবে বিশ্বাসই করা হয়নি, ভেষজের বৈজ্ঞানিক পঠনকেও, প্রবলভাবে হতোদ্দম করা হয়েছে। এর প্রধান 'চিকিৎসক' ছিলেন ইহুদিগণ যারা তাদের জ্ঞান মুসলমানদের কাছ থেকে লাভ করেছিল। ইহুদিদের যাদুবিদ্যা সম্পর্কে সংশয় ছিল, যে-সংশয়টা তারা নীরবে মেনে নিয়েছিল কারণ এতে তাদের 'দক্ষিণা, বাড়িয়ে দিয়েছিল। দ্বিবিধ কারণে শারীরসংস্থানবিদ্যা নষ্টামি হিসাবে বিবেচিত হত। প্রথম কারণ এই বিদ্যা দেহের পুনরুজ্জীবন ঘটনায় হস্তক্ষেপ করে। দ্বিতীয় কারণ গীর্জা রক্তপাতকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করে। বুল অফ্ এইটথ্ বোনিফেসের ভুল বোঝার ফলে শবদেহ ব্যবচ্ছেদ কার্যত নিষিদ্ধ হলো। পোপ পঞ্চম পিউস, অর্ধষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তী অধ্যায়ে পূর্বের অনুশাসনের পুনর্নবীকরণ করে চিকিৎসকদের আদেশ দিয়েছিলেন যে, প্রথমে একজন যাজককে ডাকতে হবে। এর কারণ 'শারীরিক বৈকল্য পাপ থেকে ঘন ঘন উদ্ভূত হয়' এবং যদি রোগী যাজকের সামনে তিনদিনের মধ্যে স্বীকারোক্তি না করে, তবে চিকিৎসকরা পরবর্তী চিকিৎসা প্রত্যাখান করবে। সেই সময়কার অনগ্রসর প্রাচীন ওষুধপত্রের দিকে লক্ষ্য রেখে বলা যেতে পারে, সম্ভবত তিনি একজন জ্ঞানীপুরুষ ছিলেন।

মানসিক ব্যাধিগ্রস্তদের চিকিৎসা, অনুমান করা যেতে পারে যে, অদ্ভুতভাবে কুসংস্কারগ্রস্ত ছিল। এবং চিকিৎসাবিদ্যার অন্যান্য শাখা থেকে এই কুসংস্কারমূলক চিকিৎসাব্যবস্থা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়েছিল। মস্তিষ্ক বিকৃতিকে শয়তানের অধিকৃত রোগ হিসাবে বলা হয়েছিল। নিউ টেস্টামেন্টে এই মতের উৎসের সাক্ষাৎ মেলে। কোনো কোনো সময়ে রোগ নিরাময়ে ভূত তাড়াবার মন্ত্র প্রয়োগ করা হয়েছিল।

সাধু পুরুষদের ব্যবহৃত কোনো স্মৃতিচিহ্নের স্পর্শে রোগ নিরাময় করা হত। আবার একজন সাধুমহাত্মার আদেশে অপদেবতা রোগীর শরীরকে মুক্ত করে দিলে রোগীর আরোগ্যলাভ ঘটাত। কোনো সময়ে যাদুর সুগন্ধি উপকরণের সঙ্গে ধর্মের মিশ্রণ ঘটানো হত। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'যখন একটি অপদেবতা কোনো একটি মানুষের শরীরকে অধিকার করে অথবা শরীরের ভেতর থেকে রোগের সাহায্যে তাকে নিয়ন্ত্রিত করে, তখন গরুর বমন করা শিমজাতীয় গোখাদ্য, বিশপ ওয়ার্ট, নিদ্রাকর্ষক মাদক দ্রব্য, রসুন একসঙ্গে পিষে তার সঙ্গে সিরান্বিত মদ ও পবিত্র জল মিশিয়ে ব্যবহার করতে হত।

এই সমস্ত পদ্ধতিতে বড় ধরনের কোনো ক্ষতি হত না। কিন্তু দুষ্ট আত্মাকে তাড়ানোর জন্য তাকে নির্যাতন করাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা অথবা শয়তানের অহংকারকে অবমানিত করা, কারণ শয়তানের পতনের উৎস ছিল তার অহমিকা। দুর্গন্ধযুক্ত ও বিতৃষ্ণাকর বস্তু ব্যবহার করা হত। ভূত তাড়ানোর বিধিব্যবস্থা বহুদিন ধরে চলেছিল এবং ক্রমবর্ধমান অশ্লীলতায় পূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল। এই ধরনের উপায়ে ভিয়েনার জেসুইটরা ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে ১২,৬৫২টি অপদেবতা তাড়িয়েছিল। যাই হোক, যখন এই কোমল পদ্ধতিগুলি নিষ্ফল হত, তখন রোগীকে চাবুক মারা হত। এতেও যদি অপদেবতাটি রোগীকে ছেড়ে না যেত তাহলে রোগীর ওপর পীড়ন চালানো হত। শতাব্দীর পর শতাব্দী অসংখ্য অসহায় বিকৃত মস্তিষ্ক রোগীদের জেলখানার বর্বর কর্তৃপক্ষের নিষ্ঠুরতার হাতে তুলে দেওয়া হত। মধ্যযুগীয় বিকৃত মস্তিষ্কের চিকিৎসার সঙ্গে ডাকিনীবিদ্যার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বাইবেলের কথা, 'তুমি নিজে বাঁচার জন্য ডাইনিকে কষ্ট দেবে না।' (Exod. xxii. 18) বাইবেলের উদ্ধৃত ঐ ক্ষুদ্রাংশটি ও অন্যান্য উদ্বৃতির জন্য ওয়েস্‌লে এই মত পোষণ করেছিলেন যে, 'ডাইনিবিদ্যা পরিত্যাগ করার অর্থ বাইবেলকে পরিত্যাগ করা।' আমার মনে তিনি ঠিকই বলেছিলেন।[২] যতক্ষণ বাইবেলের উপর মানুষের বিশ্বাস থাকবে, ততক্ষণ তারা ডাইনি সম্পর্কিত আদেশ ভালোভাবেই পালন করবে। আধুনিক উদারমনস্ক খ্রিস্টানরা, যাদের এখনও ধারণা যে, বাইবেল নীতিগতভাবে মূল্যবান, তারা চট করে বাইবেলের উদ্ধৃত ক্ষুদ্রাংশটি এবং লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষের মৃত্যু যন্ত্রণার কথা ভুলে যায়। এর কারণ একটা সময়ে মানুষ বাইবেলকে তাদের আচার-আচরণের নির্দেশিকা বলে আন্তরিকভাবে মানত।

---

২. যদি না ডাকিনীবিদ্যার বিরুদ্ধে চালিত এই মতটা, যখন এটা ক্ষয়িষ্ণুতার পথে, আমরা বিশ্বাস করি যে, এক্সডাসে অনুদিত 'ডাইনি' শব্দটির আসল মানে 'কয়েদী'। এবং এনডোরের ডাইনিকে ভুল প্রমাণ করে না।

ডাকিনীবিদ্যার বিষয় এবং আরো বৃহত্তর ইন্দ্রজাল ও যাদুবিদ্যার বিষয় একই সঙ্গে কৌতূহল উদ্দীপক ও দুর্বোধ্য। নৃ-তত্ত্ববিদরা অতি আদিম জাতিগুলির মধ্যেও ইন্দ্রজাল ও ধর্মের মধ্যে পার্থক্যটি ধরতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁদের বিচারের মাপকাঠি নিঃসন্দেহে তাঁদের বিজ্ঞানের সঙ্গে মানানসই, কিন্তু ওই বিচার অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে যখন আমরা যাদুবিদ্যার নির্যাতন বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারে কৌতূহলী হই। যেমন, রিভর্স মেলোনেসিয়া সম্পর্কে তাঁর খুবই মজাদার বই Medicine, Magic and Religion (1924) গ্রন্থে বলেছেন, 'যখন আমি ইন্দ্রজালের কথা বলি, তখন আমি এটাই বলতে চাই যার অর্থ কতকগুলি পদ্ধতির মাধ্যমে যে-সব আচার-অনুষ্ঠান মানুষ করে সেটার ফলপ্রসূতা নির্ভর করে তার নিজের শক্তি কতটা তার উপর অথবা তার বিশ্বাসগতভাবে সহজাত শক্তির ওপর। কিংবা কতিপয় বস্তু এবং পদ্ধতির উপর যেগুলো এসব আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে ধর্ম হল কতকগুলি পদ্ধতির সমষ্টি যার কার্যকারিতা নির্ভর করে কতিপয় উচ্চতর শক্তির ইচ্ছার উপর, এমন কতিপয় শক্তি যাদের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করা হয় মিনতি ও সন্তুষ্টি বিধানের আচার অনুষ্ঠানের দ্বারা। এই সংজ্ঞাটি উপযুক্ত তখনই যখন আমরা এমন সব লোকেদের সংস্পর্শে আসি যারা একদিকে পাথরের মতো কতিপয় জড়পদার্থকে আশ্চর্যজনক শক্তির অধিকারী বলে বিশ্বাস করে। এবং অন্যদিকে তারা মনে করে যে, সমুদয় মানবাতীত প্রেতাত্মারা মানুষের চেয়ে শ্রেয়। এটা সত্য যে পবিত্র পাথর এবং মানুষকে পরমায়ু দানকারী রসায়নগুলির ওপর আশ্চর্যজনক শক্তিগুলি আরোপিত হয়েছে। কিন্তু এগুলিকে প্রায় বিজ্ঞানসম্মত বলে শ্রেণিভুক্ত করা যেতে পারে। গবেষণার দ্বারা এগুলির প্রাপ্তি ঘটেছিল এবং তাদের প্রত্যাশিত গুণগুলি রেডিয়ামের মধ্যে প্রাপ্ত গুণগুলির চেয়েও দুর্লভ বিস্ময়কর বস্তু ছিল।

এ দুটোর কোনোটাই মধ্যযুগীয় খ্রিস্টান কিংবা মুসলমানদের সম্পর্কে সত্য নয়। এটা সত্য যে, পরশপাথরের উপর অদ্ভুত ক্ষমতা এবং জীবনের সঞ্জীবনী শক্তি আরোপিত হয়েছিল। কিন্তু এইগুলোকে বৈজ্ঞানিক বলেও শ্রেণিবদ্ধ করা যেত। এগুলো পরীক্ষণের মাধ্যমে খোঁজা হয়েছিল। এবং এদের বাঞ্ছিত উপাদানসমূহ রেডিয়ামে-দেখা অবস্থার চেয়ে বেশি বিস্ময়কর ছিল না। মধ্যযুগে অধিগত যাদুবিদ্যা প্রতিনিয়ত প্রেতাত্মা বিশেষ করে দুষ্ট প্রেতাত্মা আহ্বান করত। মেলানেশিয়ানদের মধ্যে ভালো এবং মন্দ আত্মার পার্থক্য বিদ্যমান ছিল না। কিন্তু খ্রিস্টীয় মতবাদে এই তফাৎ অপরিহার্য ছিল। শয়তান এবং দেবতা, উভয়েই অলৌকিকতা সম্পাদন করতে পারত। কিন্তু শয়তান দুষ্ট লোকদের সাহায্য করতে এই অলৌকিক কাজ করত। আর দেবতারা ভালো মানুষদের সাহায্য করতে এই

অলৌকিক ক্ষমতা কাজে লাগাত। খ্রিস্টের সময়ে ইহুদিরা যিশুখ্রিস্ট প্রচারিত সুসমাচার থেকে এই পার্থক্যের বিষয়টা অবগত ছিল। কারণ ইহুদিরা বালজিবাবের সাহায্যে শয়তান বিতাড়ন করছেন বলে যিশুখ্রিস্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল। মধ্যযুগে যাদুবিদ্যা এবং ডাকিনীবিদ্যা বিশেষভাবে প্রাথমিকভাবে গির্জা- সংক্রান্ত অপরাধ বলে বিবেচিত হত। এসবের অন্তর্নিহিত নিষ্পাপতা এই ঘটনার মধ্যে রয়েছে যে, এসবগুলো নরকের ক্ষমতার সঙ্গে সংযুক্ত। মজা হলো, শয়তানকে কখনও কখনও এমন কাজ করতে বলা হত যে কাজ অন্য কোনো মানুষ করলে সেটা পুণ্যের কাজ বলে বিবেচিত হত। সিসিলিতে এখনও আছে (কিংবা সাম্প্রতিক অতীতেও ছিল) এমন পুতুল খেলা যা মধ্যযুগ থেকে অবিচ্ছিন্ন ঐতিহ্য হিসাবে চলে এসেছে। চার্লিম্যাগনে এবং মূরদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ নিয়ে এমন একটি পুতুল খেলা আমি প্যালারমোতে দেখেছিলাম ১৯০৮ সালে। এই পুতুল-নাটকে একটা বিরাট যুদ্ধের পূর্বে পোপ শয়তানের সাহায্য নিয়েছিলেন। এবং যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে শয়তানকে শূন্য থেকে খ্রিস্টানদের বিজয় প্রদান করতে দেখা গেল। এমন দারুণ ফলাফল সত্ত্বেও পোপের কাজটি ছিল মন্দ এবং চ্যারলিম্যাগনে এতে ব্যথিত হয়েছিলেন যদিও তিনি জয়ের সুযোগটা নিয়েছিলেন।

বর্ত্যমানে ডাকিনীবিদ্যার কতিপয় ঘনিষ্ঠ ছাত্র মনে করেন যে, এটা হলো খ্রিস্টীয় ইউরোপে পৌত্তলিক ধর্মবিশ্বাস এবং পৌত্তলিক দেবদেবীর পুজো, যে-সব দেবদেবী খ্রিস্টীয় ডাকিনীবিদ্যার প্রেতাত্মাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে, তেমনই একটা উদ্‌বর্তন। এমনতর অনেক সাক্ষ্য বর্তমান যে, পৌত্তলিকতার উপাদান যাদুবিদ্যার আচার-আচরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তবুও ডাকিনীবিদ্যার উৎস হিসাবে এ-সত্যকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অসুবিধাও রয়েছে। প্রাক্-খ্রিস্টীয় প্রাচীনতার যুগে জাদুবিদ্যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ ছিল। রোমে টএলফ টেব্‌ল্-এর বিরুদ্ধে একটি আইনও ছিল। ১১০০ খিস্টপূর্বে তৃতীয় রামেসেসের কতিপয় অফিসার এবং তাঁর হারেমের কিছু মহিলা একটা মোমের মূর্তি তৈরি করে তার সামনে জাদুবিদ্যার মন্ত্র উচ্চারণ করে রামেসেসের মৃত্যুকে আহ্বান করার কারণে এদের বিচার হয়েছিল। জাদুবিদ্যা চর্চার জন্য লেখক অ্যাপুলিয়াসেরও বিচার হয়েছিল ১৫০ খ্রিস্টাব্দে। বিচারের অন্যতম কারণ অ্যাপুলিয়াস জাদু করে তাঁর পুত্রের বিরক্তি সত্ত্বেও জনৈক ধনী বিধবাকে বিবাহ করেছিলেন। যাই হোক, ওথেলোর মতো তিনিও আদালতকে এটা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, তিনি কেবল তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণকে কাজে লাগিয়েছেন।

শুরুতে যাদুবিদ্যাকে মহিলাসুলভ এক অদ্ভূত অপরাধ হিসাবে ধরা হত না। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে মহিলাদের ওপর এটা কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। এবং সেই থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ডাইনি নির্যাতন বহুবিস্তৃত ও তীব্র হতে থাকে। ১৪৮৪ সালে অষ্টম ইনন্যেসেন্ট ডাকিনীবিদ্যার বিরুদ্ধে পোপের মুদ্রাঙ্কিত এক অনুশাসন জারি করেন এবং এই কাজের শাস্তিবিধানে তদন্তকারী নিয়োগ করেন। এই সব ব্যক্তিরা ১৪৮৯ সালে Malleus Malefic arum নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন, যাকে এক কথায় 'দুষ্কৃতিকারী মহিলাদের হাতুড়ি' বলা হত। তারা এই মত পোষণ করতেন যে, ডাকিনিবিদ্যা পুরুষদের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের কাছে বেশি স্বাভাবিক কারণ তারা সহজাত দুষ্ট হৃদয়ের অধিকারী। ডাইনিদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত অভিযোগ ছিল এটা যে, খারাপ আবহাওয়ার জন্য এরাই দায়ী। ডাকিনীবিদ্যার জন্য সন্দেহভাজন স্ত্রীলোকদের প্রশ্ন করার জন্য একটি প্রশ্নের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল। আর শাস্তিপ্রদানের জন্য শরীরকে টানটান করে একটি যন্ত্রে আটকে রেখে তাদের ওপর নির্যাতন চালান হত, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা কাঙ্ক্ষিত উত্তর দিত। ১৪৫০ থেকে ১৫৫০ সালের মধ্যে, হিসাব করে দেখা যায় যে, শুধু জার্মানিতেই কয়েক হাজার ডাইনিকে হত্যা করা হয়েছিল, বেশির ভাগকে মারা হয়েছিল পুড়িয়ে।

নির্যাতন চরমতম মাত্রায় পৌছানোর সময়ে কতিপয় সাহসী যুক্তিবাদী মানুষ ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সন্দেহ পোষণ করেছিলেন এটা ভেবে যে, প্রচণ্ড ঝড়, শিলাবৃষ্টি, বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ এসবের কারণ সত্যিই কী স্ত্রীলোকদের ষড়যন্ত্রে। ওই ধরনের সন্দেহ-থাকা মানুষদের কোনো ক্ষমাপ্রদর্শন করা হয়নি। এইভাবে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ট্রিভস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর এবং নির্বাচনী বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি, অসংখ্য ডাইনিদের দণ্ডিত করে ভাবতে শুরু করলেন যে, সম্ভবত পীড়ন যন্ত্রে বদ্ধ হয়ে নির্যাতনকে এড়ানোর জন্যই তারা স্বীকারোক্তি দিয়ে থাকে। এর ফলস্বরূপ তিনি আর কাউকে দণ্ডিত করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি অভিযুক্ত হলেন যে, তিনি নিজেকে শয়তানের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। এবং যে-নির্যাতন তিনি অন্যের ওপর চালিয়েছিলেন সেই ধরনের নির্যাতন তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল। তাদেরই মতো তিনিও তাঁর অপরাধ স্বীকার করেছিলেন। ১৫৮৯ সালে প্রথমে গলায় ফাঁস লাগিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে, পরে তাঁকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

প্রোটেস্টান্টরা ক্যাথলিকদের মতোই ডাইনি নির্যাতনের ব্যাপারে সমান অনুরক্ত ছিলেন। এ-ব্যাপারে প্রথম জেমস্ অদ্ভূতভাবে উৎসাহী ছিলেন। তিনি

পৈশাচিক বিদ্যার ওপর একটি বই লেখেন। ইংল্যান্ডে তাঁর রাজত্বকালের প্রথম বছরে এটর্নি জেনারেল ছিলেন কোক আর বেকন ছিলেন হাউস অফ্ কমন্সের সদস্য। ১৭৩৬ সাল পর্যন্ত বলবৎ-থাকা একটি বিধানকে তিনি আরও কঠোর আইনে পরিণত করেন। তখন অনেক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছিল যার একটির চিকিৎসক সাক্ষী ছিলেন স্যার টমাস ব্রাউনি। তিনি তাঁর Religio Medici গ্রন্থে ঘোষণা করেছিলেন যে, 'আমি চিরটাকাল ডাইনিদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এসেছি, এখনও জানি যে, ডাইনি আছে। যারা ডাইনিদের অস্তিত্বে সন্দেহ পোষণ করে তারা কেবল এদের অস্বীকারই করে না, তারা নৈতিক বিকৃতির শিকার। তারা শুধু অবিশ্বাসী নয়, নাস্তিকও।' বস্তুত, লেকি যেমন উল্লেখ করেছেন যে, 'সপ্তদশ শতাব্দীতে ভূত আর ডাইনিতে অবিশ্বাস করা সংশয়বাদের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এটা প্রথমে ঘোষিত মুক্তচিন্তকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।'

স্কটল্যান্ডে যেখানে ডাইনি নির্যাতন ইংল্যান্ডের থেকেও কঠোর ছিল, সেখানে প্রথম জেমস্ বিরাট সাফল্যের সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড়ের কারণ আবিষ্কার করেছিলেন যে ঝড়ে তিনি পড়েছিলেন ডেনমার্ক থেকে সমুদ্রযাত্রার সময়। জনৈক ড. ফিয়েন নির্যাতনের ফলে স্বীকার করেছিলেন যে, ঝড়গুলো শত শত ডাইনিদের দ্বারা উৎপন্ন হয়েছিল এবং এদের লেইথ্ থেকে একটা চালুনিতে করে সমুদ্রে সোজা রেখে দেওয়া হয়েছিল। বার্টন তাঁর Hitory of Scotland (Vol.II.p- 116) গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'একদল বিধিনিয়মের চূড়ান্ত গবেষণার ব্যাপারে এ-দুটি শব্দ জুগিয়েছিল। ড. ফিয়েন তৎক্ষণাৎ তাঁর ডাইনির সমন্বিত উদ্যোগে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দিকে এই বিস্ময়কর ব্যাপারটির ক্ষমতাযোগ্যতা বেড়ে গিয়েছিল। ডাকিনীবিদ্যার বিধিনিয়মের চূড়ান্ত গবেষণার ব্যাপারে এ-দুটি শব্দ জুগিয়েছিল। ড. ফিয়েন তৎক্ষণাৎ তাঁর স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। এরপর তাঁর ওপর অত্যাচারের মাত্রা আরও কঠোরভাবে বেড়ে গিয়েছিল। তাঁর পা দুটির হাড়গুলো বহুটুকরো করে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তাতেও তিনি দমেননি। তারপর প্রথম জেমস্ এই কার্যপদ্ধতি লক্ষ্য করে এক নতুন ধরনের নির্যাতনের পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। নিপীড়নের শিকার ড. ফিয়েনের আঙুলের নখগুলো বলছে 'তাঁর মাথায় অনেকগুলো সূচ বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সমসাময়িক বিবরণী বলছে 'তাঁর হৃদয়ে শয়তান এত গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করেছিল যে, আগে যা কিছু তিনি শপথপূর্বক, স্বীকার করেছিলেন তার সবকিছুই তিনি পুরোদস্তুর অস্বীকার করলেন। ফলে তাঁকে অগ্নিদগ্ধ করা হয়েছিল।[৩]

---

৩. History of Rationalism in Europe. প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৪ দেখুন।

১৭৩৬ সালে যে-অধিনিয়মের দ্বারা ইংল্যান্ডে ডাকিনীবিদ্যার বিরুদ্ধে বলবৎ আইন বাতিল করা হয়েছিল ঠিক সেই একই অধিনিয়মের দ্বারা স্কটল্যান্ডে বলবৎ আইনটি বাতিল করা হয়। কিন্তু স্কটল্যান্ডে তখনও ডাকিনীবিদ্যার ওপর বিশ্বাস ছিল বেশ জোরদার। ১৭৩০ সালে আইনের পেশাগত একটি পাঠ্যপুস্তকে বলা হয়েছিল 'আমার কাছে কোনো কিছু এত পরিষ্কার বলে প্রতীয়মান হয় না যে, ডাইনিদের অস্তিত্ব থাকতে পারে বা ডাইনিদের অস্তিত্ব আছে এবং যেটা সম্ভবত সত্যসত্যই বিদ্যমান। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যা আমার অভিপ্রায় তা হলো ফৌজদারি আইনের একখানা বৃহত্তর গ্রন্থে এই বিষয়টা আরও স্পষ্ট করে বলা। ১৭৩৬ সালে এসটাব্লিশড চার্চ অফ্ স্কটল্যান্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ অপসৃত দলের নেতারা যুগের বঞ্চনার ওপর একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। এতে অভিযোগ করা হয়েছিল যে, শুধুমাত্র নাচ ও নাটকের দ্বারাই উৎসাহিত করা হয়নি বরং সম্প্রতি ডাইনিদের বিরুদ্ধে দণ্ডের যে-মর্যাদা তাকেও বাতিল করা হয়েছে। এটা ঈশ্বরের আইনের প্রতীকী বার্তা 'তুমি নিজে বাঁচার জন্য ডাইনিকে কষ্ট দেবে না'[৪]-এর বিপরীত ধর্মী। যাই হোক, এ-ঘটনার পর থেকে স্কটল্যান্ডের শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে ডাকিনীবিদ্যার ওপর বিশ্বাসে ভাঁটা পড়তে থাকে।

পশ্চিমের দেশগুলিতে একই সঙ্গে ডাইনিবিদ্যার জন্য শাস্তির সমাপ্তির ঘটনা একটি উল্লেখযোগ্য সমকালীনতা। ইংল্যান্ডে অ্যাংলিকানদের থেকে পিউরিটানদের মধ্যেই এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে প্রথিত ছিল। সারা কমনওয়েলথে ডাইনিবিদ্যার জন্য যত প্রাণবধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এক ইংল্যান্ডের টিউডর ও স্টুয়ার্টদের রাজত্বকালে ততগুলি প্রাণবধের ঘটনা ঘটে। রেসটোরেশনের সাথে সাথে এই বিষয়ে সংশয়বাদ একটি চালু রেওয়াজে পরিণত হয়। এটা নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, আইনবলে শেষ প্রাণবধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৬৮২ সালে। যদিও এটা বলা হয়ে থাকে যে, ১৭১২ সালের অনতিকাল পূর্ব-পর্যন্ত আরও প্রাণবধের ঘটনা ঘটেছিল। এই বছরে, হার্টফোর্ডশায়ারে এক পাদ্রির প্ররোচনায় একটি বিচার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিচারক, অপরাধের সম্ভাব্যতাকে অস্বীকার করেছিলেন এবং জুরিদের তিনি ওই ভাবেই অনুধাবন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। জুরিরা তৎসত্ত্বেও অভিযুক্তকে দণ্ডিত করেন। কিন্তু ওই দণ্ড বাতিল হয়ে যায়। এটা পাদ্রীদের প্রবল প্রতিবাদ সংঘটিত করতে প্রণোদিত করে। স্কটল্যান্ডে, ডাইনিদের ওপর নির্যাতন এবং আইনবলে প্রাণবধ ইংল্যান্ডের তুলনায় অতি সাধারণ ব্যাপার ছিল।

---

৪. বার্টনের History of Rationalism in Europe. ৮ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৪১০।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে সেখানে এসব ঘটনা বিরল হয়ে ওঠে। ডাইনি পুড়িয়ে মারার শেষ ঘটনা ঘটে ১৭২২ অথবা ১৭৩০ সালে। ফ্রান্সে পুড়িয়ে হত্যা করার শেষ ঘটনা ঘটেছিল ১৭১৮ সালে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে নিম্ন ইংল্যান্ডে ডাইনি শিকারের এক প্রচণ্ড প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়েছিল। কিন্তু তার পুনরাবৃত্তি আর ঘটেনি। সর্বত্রই লোকায়ত বিশ্বাস স্থায়িত্ব লাভ করেছিল। সুদূর গ্রামাঞ্চলের কতিপয় জায়গায় তখনও পুরানো বিশ্বাস টিকে ছিল। ১৮৬৩ সালে ইংল্যান্ডের এসেক্সে শেষ এই ধরনের ঘটনা ঘটে যেখানে একজন বৃদ্ধলোককে মায়াবী জাদুকর বলে প্রতিবেশীরা মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। স্পেনে এবং আয়ারল্যান্ডে বহুকাল ধরে ডাকিনীবিদ্যাকে সম্ভাব্য অপরাধ বলে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া ছিল। ১৮২১ সাল পর্যন্ত আয়ারল্যান্ডে ডাকিনীবিদ্যার বিরুদ্ধে বলবৎ আইন বাতিল হয়নি। ১৭৮০ সালে স্পেনে একজন জাদুকরকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

লেকি তাঁর Histry of Rationdlism গ্রন্থে ডাকিনীবিদ্যার বিষয়ের ওপর বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি সূত্রানুসন্ধান করে এক কৌতূহলদীপক বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে, যুক্তিতর্কের দ্বারা যাদুটোনাতে মানুষের বিশ্বাসকে পরাজিত করা যায়নি। কিন্তু আইনের শাসনে সর্বজনীন বিশ্বাসের দ্বারা তা সম্ভব হয়েছে। তিনি এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে, ডাকিনীবিদ্যার ওপর নির্দিষ্ট আলোচনায় যুক্তির ভার সমর্থনকারীদের দিকেই ছিল। এটা সম্ভবত আশ্চর্যের বিষয় নয়, যখন আমরা মনে করি যে, সমর্থনকারীরাই বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারবেন আর অন্যদিকে খুব কম মানুষই ঝুঁকি নিয়ে বলতে পারবেন যে, বাইবেলকে সবসময় বিশ্বাস করা চলে না। তার ওপর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানমনস্করা প্রচলিত কুসংস্কারের দ্বারা নিজেদের আবদ্ধ রাখেন না। তার অন্য আংশিক কারণ তাঁদের অনেক দামি ব্যাপার নিয়ে কাজ করতে হয়, এবং আংশিক কারণ হল তাঁরা বিরোধিতাকে উসকে দিতে ভয় পান। ঘটনা প্রমাণ করে যে, তাঁরা সঠিকই ছিলেন। নিউটনকৃত ধারণা মানুষকে এই বিশ্বাসে প্রাণিত করেছিল যে, ঈশ্বরই প্রকৃতিকে সৃজন করেছিলেন এবং প্রকৃতির নিয়মের অনুশাসন জারি করেছিলেন, যাতে যেমনটি তিনি চেয়েছিলেন তেমনি ফললাভ হয় এবং সেটা নতুন কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই। ব্যতিক্রম শুধুমাত্র খ্রিস্টান ধর্মের উদ্‌ঘাটনের মতো বৃহৎ। কোনো ঘটনার ক্ষেত্রে প্রোটেস্টান্টরা মনে করতেন খ্রিস্টীয় যুগের প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে অলৌকিক ব্যাপারগুলো সংঘটিত হয়েছে এবং তারপর তা সমাপ্ত হয়ে গেছে। যদি ঈশ্বর কখনই অলৌকিকভাবে হস্তক্ষেপ না করতেন, তাহলে এটা প্রায় সম্ভব ছিল না যে, তিনি শয়তানকে এই রকম কাজ করতে অনুমতি দিতেন। বিজ্ঞানীরা এই

আবহাওয়াতত্ত্বের ওপর ছিল অনেক প্রত্যাশা যা কোনমতেই কোনো বৃদ্ধাকে ঝাঁটা মারতে ঝড়ের কারণ হতে সুযোগ দিত না। কিছু দিনের জন্য বিদ্যুৎ ও বজ্রপাতের ব্যাপারে প্রাকৃতিক নিয়ম প্রয়োগ করাকে অধার্মিকতা বলে মনে করা হত, যেহেতু গুলি ঈশ্বরের বিশেষ ক্রিয়াকাণ্ড ছিল। এই মনোভাব বিদ্যুৎ সঞ্চারকের বিরুদ্ধতা করার জন্য বিদ্যমান ছিল। এইভাবে যখন ১৭৫৫ সালে ভূমিকম্পে ম্যাসাচুসেটস্ কেঁপে উঠেছিল তখন রেভারেন্ড ড. প্রাইস তাঁর প্রকাশিত ধর্মোপদেশে এর কারণ হিসাবে জ্ঞানী মি. ফ্রাঙ্কলিনের দ্বারা আবিষ্কৃত 'সূচিমুখ লৌহ'কে দায়ী করে বলেছিলেন যে 'নিউ ইংল্যান্ডের যে-স্থান থেকে বোস্টন বেশি মাত্রায় সুনির্মিত হওয়া সত্ত্বেও বোস্টনই কেন ভয়ঙ্কর ভাবে কেঁপে উঠেছিল। শক্তিমান ঈশ্বরের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার কোনো উপায় নেই। এই সতর্কবাণী সত্ত্বেও বোস্টোনিয়ানরা লৌহ-স্থাপনের কাজ চালিয়ে গিয়েছিল। ফলে ভূকম্পনের পুনরাবৃত্তির হার বাড়েনি। নিউটনের সময়ে এবং পরবর্তীকালে ড. প্রাইসের মতো দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা কুসংস্কার রক্ষকদের কাছে বেশি প্রয়োজনীয় বলে অনুভূত হয়েছিল। এবং প্রাকৃতিক নিয়মে যখন অলৌকিক হস্তক্ষেপের ওপর বিশ্বাস লুপ্ত হতে লাগল তখন ডাকিনীবিদ্যার সম্ভাব্যতাও আবশ্যিকভাবেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। ডাকিনীবিদ্যার গুজবকে কখনই খণ্ডন করা হয়নি, শুধুমাত্র এই ব্যাপারটার পরীক্ষাজাত উপযোগিতা বোঝার ব্যাপারটা বন্ধ হয়েছিল।

সারা মধ্যযুগ ধরে, যে-রকম আমরা দেখলাম, রোগের প্রতিরোধ এবং রোগমুক্তির জন্য যে-সব পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছিল সেসব হয় কুসংস্কারমূলক অথবা পুরোপুরি খামখেয়ালিপূর্ণ ছিল। শারীরসংস্থানবিদ্যা এবং শারীরক্রিয়াবিদ্যা থেকে কোনকিছুই বেশি বিজ্ঞানভিত্তিক হওয়া সম্ভব ছিল না। এবং এসবই শবব্যবচ্ছেদ ছাড়া সম্ভব ছিল না। আর এসব ব্যাপারেই বিরোধিতা করেছিল গির্জা। ভেসেলিয়াস, যিনি সর্বপ্রথম শারীর সংস্থানবিদ্যাকে বিজ্ঞানভিত্তিক করেছিলেন, তিনি কিছুদিনের জন্য সরকারি ভৎর্সনা থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন সম্রাট পঞ্চম চার্লসের চিকিৎসক। যিনি তাঁর শারীরিক দুর্ভোগের ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিলেন পাছে তাঁর প্রিয় চিকিৎসকের চিকিৎসা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হয়। পঞ্চম চার্লসের রাজত্বকালে ধর্মতাত্ত্বিকদের একটা সম্মেলন হয়েছিল। তাঁরা ভেসেলিয়াসের সম্বন্ধে আলোচনা করে এই মতপ্রকাশ করেছিলেন যে, শবব্যবচ্ছেদ কোনো অপবিত্র কাজ নয়। কিন্তু দ্বিতীয় ফিলিপস্, যিনি সবসময় নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন ছিলেন ও ব্যধিগ্রস্ত হবার অলীক ধারণা পোষণ করতেন, তিনি সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে রক্ষা করার কোনো কারণ দেখতে পেতেন

না। এর ফলে ভেসেলিয়াস শবব্যাবচ্ছেদের জন্য আর শবদেহ যোগাড় ... পারেননি। খ্রিস্টীয় যাজকেরা বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের শরীরে এমন ... অবিনশ্বর হাড় আছে, যা ধ্বংস করা যায় না। এই হাড়টি মানুষের পুনরুত্থানযোগ্য দেহের একটি নিউক্লিয়াস। প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে ভেসেলিয়াস স্বীকারোক্তি ... বলেছিলেন যে, তিনি ওই ধরনের হাড় কখনই দেখেননি। এটা খারাপ ব্যাপার হলেও খুব খারাপ ছিল না। অ্যারিস্টটল যেমন পদার্থবিদ্যার উন্নতির বিরোধী ছিলেন তেমনি গ্যালেনের চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্ররাও ওষুধের উন্নতিবিধান প্রচেষ্টার বিরোধী ছিলেন। এরা ভেসেলিয়াসকে নিরন্তর আক্রমণের দ্বারা তাঁর ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করেছিল এবং একটা সময়ে তাঁকে ধ্বংস করার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল যখন তিনি আত্মীয়দের অনুমতিক্রমে স্পেনদেশীয় একজন অমাত্যের মৃতদেহ পরীক্ষা করছিলেন তখন ওই অমাত্যের হৃৎপিণ্ডে, যে-রকম তাঁর শত্রুরা বলে থাকে, তাঁর ছুরির তলায় প্রাণের স্পন্দনের চিহ্ন দেখা গিয়েছিল। ভেসেলিয়াসকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় এবং যাজকদের বিচারসভায় তাঁকে নিন্দা করা হয়। রাজার প্রভাবের ফলে তাঁকে কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল। যিশুর পুণ্য জন্মভূমি প্যালেস্টাইনে তীর্থযাত্রা করে। কিন্তু স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁর জাহাজ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যদিও তিনি তীরে পৌঁছতে পেরেছিলেন কিন্তু নিদারুণ ক্লান্তিতে তিনি মারা যান। চিকিৎসাবিজ্ঞানগত তাঁর প্রভাব স্থায়ী হয়েছিল। তাঁর একজন ছাত্র ফ্যালোপিয়াস অসাধারণ কাজ করেছিলেন। এবং চিকিৎসাবৃত্তিতে ধীরে ধীরে এই প্রত্যয় উৎপন্ন হয়েছিল যে, মানবশরীরের অভ্যন্তরে কী আছে তা জানা একমাত্র চোখ দিয়ে দেখা বা তাকানোর দ্বারাই সম্ভব।

শারীরক্রিয়াবিদ্যা শারীরসংস্থানবিদ্যার পরে উন্নত হয়। এবং এটা মনে নেওয়া যেতে পারে যে হার্ভের (১৫৭৮-১৬৫৭) দ্বারাই চিকিৎসাবিদ্যা বৈজ্ঞানিক হয়ে ওঠে। এই হার্ভে ছিলেন রক্তসঞ্চালনের আবিষ্কর্তা। ভেসেলিয়াসের মতো তিনি ছিলেন রাজদবারের চিকিৎসক প্রথমে তিনি প্রথম জেমসের এবং পরে প্রথম চার্লসের রাজদরবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিন্তু তিনি ভেসেলিয়াসের মতো ধর্মীয় কারণে নির্যাতন ভোগ করেননি। এমনকি প্রথম চার্লসের পতনের পরেও মধ্যযুগীয় শতাব্দীটা চিকিৎসাবিদ্যার বিষয়গুলোকে অনেক বেশি উদার করতে পেরেছিল বিশেষত প্রোটেস্টান্ট দেশগুলোতে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকেও স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শরীরের রক্তসঞ্চালন ব্যাপারটিকে অস্বীকার করা হত এবং তখনও শবব্যবচ্ছেদ চিকিৎসাবিদ্যার কোনো অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হত না।

ধর্মতত্ত্বের পুরানো গোঁড়ামিগুলো, যদিও বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তবুও তার আবির্ভাব হত কোনো চমকপ্রদ অভিনব ঘটনার দ্বারা চালিত হয়ে। বিসূচিকার টিকাদানের বিরুদ্ধে ধর্মবাদীরা প্রবল প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল। সোরবোন ধর্মীয় বিতর্ক অবতারণা করে টিকাদানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল। জনৈক অ্যাংলিকান যাজক একটি উপদেশাবলী প্রকাশনা করেছিলেন। এবং তাতে তিনি বলেছিলেন যে, শয়তানের দ্বারা টিকা দেওয়ার ফলে Job's Boil দেখা দেবার ব্যাপারটা নিঃসন্দেহ।' বহু স্কটিশ মন্ত্রীরা যুক্তভাবে লিখিত ঘোষণায় বলেছিলেন যে, 'এটি একটি দৈববিচারকে ব্যর্থ করার প্রচেষ্টা'। যাই হোক, বিসূচিকর রোগে মৃত্যুহারের হ্রাসপ্রাপ্তি এতটাই উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছিল যে, ধর্মীয় ভীতি রোগভীতিকে ছাপিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছিল। অধিকন্তু, ১৭৬৮ সালে রানী ক্যাথেরিন এবং তাঁর পুত্র টিকাগ্রহণ করেছিলেন। যদিও সম্ভবত নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি কোনো অনুকরণীয় ঘটনা ছিল না, তবুও তাঁকে পার্থিব ক্ষমতার পথপ্রদর্শক বলে ধরা হত।

এ-ব্যাপারে বিতর্কটি লোপ পেতে শুরু করেছিল যখন টিকার আবিষ্কারের ব্যাপারটি পুনরারম্ভ হলো। পাদ্রিরা এবং চিকিৎসাবিদরা টিকাকরণ প্রচেষ্টাকে নিন্দা করতেন স্বর্গকে অস্বীকার করার আহ্বান, এমনকি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিকৃতি বলে। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে টিকার বিরুদ্ধে ধর্মীয় উপদেশাবলী পাঠ করা হয়েছিল। ১৮৮৫ সালের শেষাশেষি যখন মন্ট্রিলে বিসূচিকার ভয়ঙ্কর প্রকোপ হয়েছিল তখন জনসাধারণের মধ্যে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্তরা পাদ্রিদের পরামর্শে টিকাপ্রদানকে প্রতিহত করেছিল। একজন যাজক বলেছিলেন, 'যদি আমরা বিসূচিকা রোগের দ্বারা আক্রান্ত হই তাহলে তার কারণ হিসাবে বুঝতে হবে গত শীতে আমাদের যে-মেলা হয়েছিল আর মাংসের ভোজ হয়েছিল, তাতে ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন'। ওবলেট ফাদারেরা যাঁদের গির্জা রোগাক্রান্ত জেলার ঠিক মধ্যভাগে অবস্থিত ছিল, তাঁরা টিকাদানের নিন্দা করেছিলেন। অধিবাসীদের বিবিধ ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি নির্ভর করতে প্রণোদিত করা হয়েছিল। যাজকতন্ত্রের অনুমতিক্রমে এক বিরাট শোভাযাত্রা সংগঠিত করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল কুমারী মেররী প্রতি আবেদন জানিয়ে এবং সতর্কতার জপমালার ব্যবস্থা বিশেষভাবে হয়েছিল নির্দিষ্ট করা হয়েছিল।[৫]

---

৫. Ibid. তদেব, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬০।

ধর্মতাত্ত্বিক হস্তক্ষেপের অপর একটি সুযোগ ঘটেছিল যখন মানুষের শারীরিক ক্লেশ দূরীকরণের জন্য অনুভূতিনাশক ওষুধের আবিষ্কার হয়েছিল। ১৮৪৭ সালে সিম্পসন্ শিশু জন্মানোর সময় অনুভূতিনাশক ওষুধগুলি ব্যবহারের সুপারিশ করেছিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ পাদ্রিরা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, ঈশ্বর ইভকে বলেছিলেন, 'কষ্টের মধ্য দিয়েই তুমি শিশুদের জন্ম দেবে' (Genesis 3: 16)। কি করে সে কষ্ট অনুভব করবে যদি সে ক্লোরোফর্মের প্রভাবাধীনে থাকে? সিম্পসন্ সফলতার সঙ্গে এটা প্রমাণ করেছিলেন যে, অনুভূতিনাশক পুরুষমানুষের ওপর ব্যবহারে কোনো ক্ষতি নেই, কারণ ঈশ্বর যখন আদমের পাঁজরের হাড় নিষ্কাশন করেছিলেন তখন আদমকে তিনি গভীর ঘুমের মধ্যে রেখেছিলেন। কিন্তু পুরুষ পাদ্রীরা শিশু জন্মানোর যে-কোনো অবস্থাতে নারীদের শারীরিক ক্লেশ দূরীকরণ ব্যাপারটা নিরসনে সম্মত ছিলেন না। এটা লক্ষণীয় বিষয় যে, জাপানে যেখানে জেনেসিসের কর্তৃত্বের মান্যতা ছিল না, সেখানেও নারীদের সম্বন্ধে মনে করা হত যে তারা সন্তান প্রসবকালীন যন্ত্রণার কৃত্রিমভাবে উপশম না ঘটিয়ে যন্ত্রণা ভোগ করবে। এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনটা আটকানো অসম্ভব যে, অনেক মানুষের কাছে নারীদের কষ্ট থেকে উপভোগের কিছু আছে। অতএব, কোনো ধর্মীয় বা নৈতিক বিধানের প্রতি নিবিষ্ট থেকে নারীরা নারীরা নীরবে কষ্ট ভোগ করা কর্তব্য বলে মনে করত। অথচ এসব সত্ত্বেও কষ্টকে পরিহার না করার কোনো বৈধ কারণ ছিল না। ধর্মতত্ত্ব যে-ক্ষতিটা করেছিল সেটা শুধু নিষ্ঠুরতার জন্য সৃষ্টির জন্য নয়। পক্ষান্তরে তাকে মহিমান্বিত নৈতিকতা বলে দৃঢ়ভাবে মেনে করার অনুমোদন প্রদান এবং আপাতদৃষ্টিতে এই প্রথার একটা পবিত্ররূপ দান করা হয়েছিল। এসব অধিকতর ও বর্বর যুগ থেকে প্রাপ্ত।

চিকিৎসা সম্বন্ধীয় প্রশ্নগুলিতে ধর্মতত্ত্বের হস্তক্ষেপ এখনও শেষ হয়নি। জন্মনিয়ন্ত্রণের উপর মতামতের বিষয়গুলি এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে গর্ভপাত আইনি অনুমোদন এখনও বাইবেলের উদ্ধৃতি ও যাজকশ্রেণীর অনুশাসনের দ্বারা প্রভাবিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, কয়েক বছর আগে একাদশ পোপ পায়াস নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে Encyclical আদেশ জারি করেন। যাঁরা জন্মনিয়ন্ত্রণ অভ্যাস করেন তাঁদের সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'প্রকৃতির বিরুদ্ধতা করা পাপ এবং এই দুষ্কর্ম অত্যন্ত লজ্জাজনক এবং পুরোপুরি অধার্মিকতাপূর্ণ।' এ-কারণে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যদি পবিত্র বাইবেল প্রত্যক্ষ করে যে, গর্ভপাতকে মহিমান্বিত ঈশ্বর অতিশয় ও ভয়ঙ্কর পাপের ব্যাপার বলে গণ্য করেন এবং কখনও কখনও মৃত্যুর

পাপবিধান করেন। তিনি (Genesis xxxviii, 8-10) থেকে সেন্ট অগাস্টিনের কথা উল্লেখ করেন। জন্মনিয়ন্ত্রণকে নিন্দিত করার জন্য এর বেশি কিছু যুক্তির বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন নেই। অর্থনৈতিক যুক্তি 'আমরা গভীরভাবে বিচলিত হই সেইসব পিতা-মাতার কষ্ট দেখে যাঁরা চরমতম অভাবে সন্তানসন্ততি পালন করতে ভীষণ অসুবিধা ভোগ করেন' কিন্তু অধার্মিক সমস্ত কাজকে নিষিদ্ধ করা সর্বান্ত ঈশ্বরের বিধানকে পাশে সরিয়ে রাখার ন্যায্যতা প্রতিপাদনে কোনো অসুবিধাই আসতে পারে না।' চিকিৎসা ও রোগনিরাময়ের কারণে' গর্ভধারণে বাধাদান যখন নারীর প্রাণ বাঁচাতে জরুরি মনে করা হয়, তখন তাঁর বিচারে, একে সমর্থন করা যায় না। একজন নিরীহকে সরাসরি হত্যার ঘটনাকে ক্ষমা করার পর্যাপ্ত কারণ আর কিই-বা হতে পারে? মায়ের অথবা সন্তানের যার ওপরই আঘাত বাধা করা হোক না কেন সেটা ঈশ্বরের অজ্ঞতার এবং প্রাকৃতিক বিধানেরও বিরোধী। 'তুমি হত্যা করবে না।'তৎক্ষণাৎ তিনি ব্যাখ্যা করতে উদ্যত হন যে, বাইবেলের উদ্বৃত অংশ যুদ্ধকে অথবা চরম দণ্ডকে নিন্দা করে না এবং উপসংহারে বলেন যে, 'ন্যায়পরায়ণ ও কুশলী চিকিৎসকরা প্রশংসনীয়ভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করেন যাতে মায়ের ও সন্তানের দুজনেরই প্রাণকে রক্ষা করা যায় এবং নিরাপদে রাখা যায়। বিপরীতে, যারা তাদের নিজেদের চিকিৎসকের মতো মহান পেশার পক্ষে অযোগ্য রূপে প্রমাণ করে, তারা চিকিৎসকের ভান করে অথবা বিপথে চালিত সমবেদনার মনোভাব নিয়ে একজন বা অন্যজনের মৃত্যু ডেকে আনে। এইভাবে ক্যাথলিক যাজকদের মতবাদ শুধুমাত্র বাইবেলের অংশবিশেষ আহরণ করেই নয়, পক্ষান্তরে তা মানব ভ্রূণের বেড়ে ওঠার প্রাথমিক অবস্থায় প্রয়োগযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এবং উল্লিখিত পরের মতটি সুস্পষ্টভাবে এই বিশ্বাস থেকে আহরিত হয়েছিল যে, ভ্রূণ থেকে প্রাপ্ত বস্তুকে ধর্মতত্ত্বে 'আত্মা' বলা হয়।[৬] এই সিদ্ধান্তগুলি এমন সব হেতুবাক্য থেকে নেওয়া হয়েছে যা ঠিকও হতে পারে, ভুলও হতে পারে। কিন্তু এর যে কোনোটির ক্ষেত্রে কোনা যুক্তিই বিজ্ঞান মেনে নিতে পারে না। মায়ের মৃত্যু যা চিকিৎসক আগে থেকেই বুঝে থাকেন আর পোপ যেটা নিয়ে আলোচনা করছেন, সেটা হত্যা নয়, কারণ চিকিৎসক কখনই নিশ্চিত হতে পারেন না যে এটাই ঘটবে; কোনো অলৌকিকত্বের দ্বারা তিনি হয়তো বেঁচেও যেতে পারেন।

---

৬. ধর্মতাত্ত্বিকদের দ্বারা এটা আগে বিশ্বাস করা হত যে, একটা আত্মা পুরুষ ভ্রূণ চল্লিশতম দিনে এবং নারী ভ্রূণ আশিতম দিনে এটা পেয়ে থাকে। এখন এটাই সর্বোত্তম মত যে, উভয় লিঙ্গই 'আত্মা' লাভ করে চল্লিশতম দিনে। Needham-এর History of Embryology, পৃষ্ঠা ৫৮ দ্রষ্টব্য।

কিন্তু যদিও, যে-রকমটা আমরা এইমাত্র দেখেছি, ধর্মতত্ত্ব ভেষজের ক্ষেত্রে এখনও হস্তক্ষেপ করে চলেছে যেখানে নৈতিক বিষয়গুলি বিশেষভাবে জড়িত, তবুও ভেষজের ব্যাপারে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যের লড়াইয়ে বিজয়ী হয়েছে। এখনও কেউই এটা নিয়ে ভাবে না যে, স্বাস্থ্যবিধান ও স্বাস্থ্যবিধির দ্বারা প্লেগ ও ব্যাপক মহামারীকে এড়ানো একটি অধর্মীয় ব্যাপার। যদিও এখনও কিছু লোক এখন মনে করে যে, রোগ-ব্যাধি ঈশ্বর প্রেরিত, তবুও তারা এ নিয়ে তর্ক করে না যে, রোগের প্রকোপ এড়ানোর চেষ্টাটা অধর্মীয়। স্বাস্থ্যের উন্নতি ও দীর্ঘ আয়ুলাভ আমাদের যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং প্রশংসনীয় লাভ। এমনকি যদি মানুষের সুখের জন্য বিজ্ঞান বেশি কিছু নাও করে থাকে, তবু এ কাজটার জন্যই বিজ্ঞানের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। যে-সব মানুষ ধর্মীয় বিশ্বাসের উপযোগিতায় বিশ্বাসী, তারা মানবজাতিকে প্রদান করেছে এমন কোনো তুলনামূলক সুবিধার কথা বলতে অসুবিধায় পড়বে।

অধ্যায় ৫
আত্মা ও দেহ

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমুদয় বিভাগগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম উন্নত বিদ্যা হলো মনোবিদ্যা। ব্যুৎপত্তির দিক থেকে 'মনোবিদ্যা'র ইংরাজি প্রতিশব্দ 'সাইকোলজি'র আবশ্যিক অর্থ হবে 'আত্মার তত্ত্ব'। কিন্তু আত্মা ধর্মতত্ত্ববিদদের কাছে পরিচিত হলেও এটা একটা বৈজ্ঞানিক ধারণা হিসাবে বিবেচিত হয় না। কোনো মনোবিদই বলবেন না যে, তাঁর অধ্যয়নের বিষয় হলো আত্মা। যদি তাঁকে যদি প্রশ্ন করা যায় এটা তাহলে কী? তিনি সহজে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না। কেউ কেউ বলবেন যে, মনোবিদ্যা মানসিক বিষয়। সেইসব বিষয় থেকে আলাদা যেগুলোকে পদার্থবিদ্যার তথ্য যোগান দিতে হয়? যেসব মনোবিদ্যাজনিত প্রশ্নগুলো দ্রুত আমাদের দার্শনিক অনিশ্চয়তার মধ্যে আনে। এবং অন্যান্য বিজ্ঞান থেকে এক্ষেত্রে অনেক কঠিন মৌলিক প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া হয়। কাঠিন্যের কারণ মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যথার্থ পর্যবেক্ষণ ও জ্ঞানের স্বল্পতা।

এতদ্‌সত্ত্বেও কিছুটা প্রাপ্তি ঘটেছে এবং বহু প্রাচীন ভুল পরিত্যক্ত হয়েছে। এসব প্রাচীন ভুলের পরিমাণের অনেকখানি ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত ছিল, হয় কিংবা 'ফলাফল' হিসাবে। কিন্তু এ-পর্যন্ত আমাদের আলোচিত বিষয়গুলো এর বিশেষ টেক্সট অথবা বাইবেলীয় ভুলের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। এগুলো

আধিবিদ্যক মতবাদের সঙ্গেই জড়িয়ে ছিল। এটা কিংবা সেটার কারণে গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসের অনুশাসনের অঙ্গের সঙ্গে এগুলির সংযুক্তি অপরিহার্য বলে ভাবতে হয়েছিল।

'আত্মা'র ধারণাটা প্রথমে গ্রিকচিন্তায় জায়গা নিয়েছিল। এই আত্মার একটা ধর্মীয়, কিন্তু খ্রিস্টীয় নয়, এমন একটা উৎস ছিল। মনে হয়, গ্রিসের সংশ্লিষ্টতার জন্য পিথাগোরাসের অনুগামী ব্যক্তিবর্গের মধ্যেই এটার সূচনা হয়েছে। এই অনুগামীরা পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করতেন। এঁদের লক্ষ্য ছিল অন্তিম নির্বাণ হলো বস্তুর বন্ধন থেকে মুক্তি। এই বস্তুর বন্ধনেই যতদিন দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকে ততদিন আত্মা কষ্ট পায়। পিথাগোরাসপন্থীরা প্লেটোকে প্রভাবিত করেছিলেন। এবং প্লেটো প্রভাবিত করেছিলেন গির্জার যাজকদের। এভাবে আত্মার মতবাদ, যে-আত্মা দেহ থেকে পৃথক, খ্রিস্টান মতবাদের অংশ হয়ে পড়ল। অন্যান্য প্রভাব যেগুলো পরে এই খ্রিস্টীয় মতবাদে প্রবেশ করেছে, তার মধ্যে লক্ষণীয় হলো অ্যারিস্টটল এবং স্টোইকদের প্রভাব। কিন্তু প্লেটোবাদ বিশেষত এর পরবর্তী রূপ খ্রিস্টীয় পৌত্তলিক দর্শনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

প্লেটো থেকে জানা যায় যে, পরবর্তী সময়ে খ্রিস্টধর্ম কর্তৃক শিক্ষণীয় মতবাদের সমতুল্য মতবাদ তাঁর সময়ে দার্শনিকদের তুলনায় সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছিলেন। Rcpublic গ্রন্থের একটি চরিত্র বলছে, 'নিশ্চিত থাকুন সক্রেটিস, যখন একজন মানুষকে বোঝানো যায় যে, তিনি মরতে চলেছেন, ওই মানুষটি তখন আশঙ্কিত হন এবং তাঁকে আগে-ভাবাতো-না এমন সব বিষয় নিয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন। এর আগে পর্যন্ত মুমূর্ষু মানুষদের সম্পর্কে ওইসব গল্প নিয়ে মানুষটি হেসেছেন। গল্পগুলো আমাদের বলে যে, যিনি এ-জগতে অন্যায় করেছেন তিনি পরলোকে অবশ্যই কষ্ট ভোগ করবেন। কিন্তু এখন ওই মুমূর্ষু মানুষটির মন যন্ত্রণাপীড়িত এটা ভেবে যে, ওসব গল্প সম্ভবত সত্য।' প্লুটোর অন্য একটি রচনাংশে দেখতে পাই, যে-আশীর্বাদ মুসিউস এবং তাঁর পুত্র ইউমোলপাস দেবতা- প্রদত্ত হিসাবে পেয়েছেন, সেগুলো এসবের থেকে বেশি প্রীতিকর। (যেমন এ জগতে ধন- সম্পদ)। এর কারণ তাঁরা পাতালপুরীতে এসব নিয়ে আসেন। এদের সম্পর্কে বর্ণনা দেন যে, এরা পুণ্যবানদের ভোজসভায় সোফায় অর্ধশায়িত থাকেন, মাথায় মালা জড়িয়ে সুরাপানে চিরকাল ব্যয় করেন।' মনে হয় মুসিউস এবং অরফিউস 'কেবলমাত্র ব্যক্তিকে বোঝাতেই সক্ষম হননি, পুরো শহরটাকেই এঁরা বোঝাতে পেরেছেন। বুঝিয়েছেন যে, মানুষকে অপরাধ থেকে অব্যাহতি দেওয়া যায় এবং তাদের শুদ্ধ করে তোলাও সম্ভব। মানুষ বেঁচে

থাকতেও এটা করা যায়, এবং এটা করা সম্ভব তাদের মৃত্যুর পরেও। এটা [illegible] যায় কতিপয় ত্যাগ এবং আনন্দদায়ক পীড়ন থেকে উদ্ধার করে। [illegible] অবহেলার শাস্তি ভয়াবহ অবধারিত ধ্বংস।' সক্রেটিস নিজে তাঁর Republic [illegible] বলেছেন যে, পরবর্তী জীবন আনন্দ হিসাবে উপস্থাপিত করতে হবে এই [illegible] যে, এটা যুদ্ধক্ষেত্রে শৌর্যকে উৎসাহিত করবে। অথচ তিনি বলেননি যে, [illegible] সত্য বলে তিনি নিজে বিশ্বাস করেন কিনা।

খ্রিস্টান দার্শনিকদের মতবাদ প্রাচীন পৃথিবীতে প্রধানত প্লেটনীয় ছিল। একাদশ শতকের পরে এটি মূলত অ্যারিস্টটলীয় হয়ে উঠল। টমাস অ্যাকুইনাস (১২২৫-৭৪) যিনি মধ্যযুগীয় পণ্ডিতদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ [illegible] বিবেচিত ছিলেন, তিনি এখনও পর্যন্ত রোমান ক্যাথলিক গির্জার দার্শনিক গোঁড়ামির প্রামাণ্যই রয়ে গেছেন। ভ্যাটিকান নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ, যখন তাঁরা বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করবেন দেকার্ত অথবা লক, [illegible] অথবা হেগেলের ঐতিহাসিক আগ্রহের বিষয়গুলো, তখন তাঁদের স্পষ্ট করে [illegible] হবে যে, কেবলমাত্র সত্য পদ্ধতি হলো 'দেবদূতকল্প ডাক্তার'। চূড়ান্ত অনুমোদন অনুজ্ঞা হলো এটা বলা যে, যেমনটা তাঁর অনুবাদক মনে করেন, তিনি [illegible] আলোচনা করতে গিয়ে ঠাট্টা করেছেন। আলোচনার বিষয় ছিল, কী ঘটে যখন নরখাদকটির সামনে একটি শরীরের পুনরুত্থান ঘটে, যে-নরখাদকটির পিতা-মাতাও নরখাদক? স্পষ্টতই নরখাদক এবং তার পিতা-মাতা যেসব মানুষের উদরপূর্তি করেছে তাদের তো নিজেদের দেহগুলো পুনরায় গঠন করার অধিকার রয়েছে। প্রত্যেকের এ-দাবিতে নরখাদক চরম নিঃস্ব হয়ে পড়বে। যারা দেহের পুনরুত্থানে বিশ্বাস রাখেন এটা তাঁদের কাছে একটা বাস্তব সমস্যা। এটি আমার ভগবদ্‌বাক্য প্রচারকদের ধর্মবিশ্বাস দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন। আমাদের [illegible] এটা একটা কট্টর ধর্মবিশ্বাসের বৌদ্ধিক শক্তিহীনতার প্রতীক। এই বিশ্বাসটা কত বাস্তব সেটা বোঝা যায় মৃতদেহ সমাহিত করতে আপত্তি জানানোর ঘটনায়। প্রোটেস্টান্ট দেশগুলোর অনেকেই এবং ক্যাথলিক দেশসমূহের প্রায় সবাই [illegible] মতো মুক্ত হলেও এই আপত্তি জানায়। আমার ভাইয়ের মরদেহ সমাহিত করা হলো মারসেইলিসে। তখন ওখানকার দায়িত্বে—থাকা ব্যক্তি আমাকে বলেন যে, এর আগে সমাহিত করার কোনো ঘটনাই ঘটেনি। এটা না ঘটানোর পেছনে ধর্মতত্ত্বীয় সংস্কার। স্পষ্টতই এটা ভাবা যায় যে, সর্বশক্তিমানের পক্ষে দেহগুলো গ্যাস হয়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে সেগুলো পুনঃসমাবিষ্ট করতে অসুবিধাজনক সেই দেহগুলো থেকে, যেগুলো কবরে পোকা এবং মাটি [illegible]

রয়েছে। এ-ধরনের একটা ধারণা, এটা নিয়ে আমাকে বলতে বলা হলে, সেটা বলা আমার পক্ষে একটা ধর্মবিদ্বেষ হবে। বস্তুত এটা প্রচলিত মতবাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে একটা গোঁড়া ধর্মবিশ্বাস।

আত্মা ও দেহ, মধ্যযুগীয় পণ্ডিতম্মন্য দর্শনে (যেটা এখনও রোমে বর্তমান) উভয়ই ভালো পদার্থ। 'পদার্থ' হলো একটা ধারণা যেটা বাক্যগঠন পদ্ধতি থেকে প্রাপ্ত। 'পদার্থ' হলো একটা ধারণা যেটা আহরিত হয় পদান্বয় (syntax) থেকে। এবং পদান্বয় আহরিত হয়েছে আদিম জনগোষ্ঠীর কম বা বেশি অচেতন অধিবিদ্যা থেকে। এই আদিম জনগোষ্ঠীরাই আমাদের ভাষার গঠনপ্রণালী নির্ধারণ করেছে। বাক্যগুলোকে উদ্দেশ্য এবং বিধেয় এই দু'ভাগে বিশ্লেষিত করা যায়। এবং এটা ভাবা হয় যে, যখন কতিপয় শব্দ আগে উদ্দেশ্য অথবা বিধেয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তখন অন্য শব্দও আছে (কিছু স্পষ্ট অর্থে নয়) যেগুলো উদ্দেশ্য হিসাবে উঠে আসে। এই শব্দগুলো—যেগুলোর ব্যক্তি, বস্তু বা স্থানগত নাম (proper nouns) হলো সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ—এগুলোকেই 'পদার্থ' হিসাবে নির্দেশিত করা হয়। একই ধারণার জনপ্রিয় শব্দটি হলো 'বস্তু' অথবা মানুষের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলো 'ব্যক্তি'। পর্দাথের অধিবিদ্যক ধারণা হলো সাধারণ জ্ঞানে বস্তু বা ব্যক্তি বলতে যা বোঝায় তার সূক্ষ্মতা প্রদানের চেষ্টা।

একটা উদাহরণের কথা বলা যাক। আমরা বলতে পারি 'সক্রেটিস জ্ঞানী ছিলেন,' 'সক্রেটিস একজন গ্রিক ছিলেন,' 'সক্রেটিস প্লেটোকে শিক্ষা প্রদান করেছিলেন' এবং এরকম আরো কিছু। এই সবগুলো বর্ণনায় আমরা সক্রেটিসের প্রতি আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য আরোপ করি। এইসব বাক্যগুলোতে 'সক্রেটিস' শব্দটির একই অর্থ। ব্যক্তি সক্রেটিস এভাবে তাঁর বৈশিষ্ট্য থেকে কিছুটা পৃথক। এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে ভাবা হয় 'সহজাত'। স্বাভাবিক জ্ঞান কেবল একটা বস্তুকে এবং এর বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে চিনতে সাহায্য করে। সক্রেটিসের যদি একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন যমজ থাকত, আমরা তাহলে এঁদের পৃথক বলতে পারতাম না। এতদ্‌সত্ত্বেও, একটা পদার্থ এর বৈশিষ্ট্যসমূহের যোগফল ছাড়াও অন্য কিছু। ইউক্যারিস্টের মতবাদ থেকে এটা খুবই স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। একটা খ্রিস্টীয় ধর্মানুষ্ঠানে রুটির বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে, কিন্তু পদার্থটি খ্রিস্টের শরীরের বৈশিষ্ট্যে বদলে যায়। আধুনিক দর্শনের উত্থানের সময় পর্যন্ত দেকার্ত থেকে লাইবনিৎজ (স্পিনোজা ব্যতীত) সমুদয় উদ্ভাবক এটা প্রমাণে দারুণ কষ্ট স্বীকার করেছেন যে, তাঁদের মতবাদ খ্রিস্টীয় ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কর্তৃপক্ষ বহুদিন ধরে দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলেন যে, নিরাপত্তা কেবলমাত্র ধর্মভিত্তিক জ্ঞানচর্চার মধ্যেই খুঁজতে হবে।

এতে এটা মনে হয় যে, উদ্‌ঘাটিত জ্ঞান ছাড়া আমরা কখনোই নিশ্চিত হতে পারি না যে, একটা সময়ে দেখা একটি বস্তু বা একজন ব্যক্তি অন্য সময়ে দেখা একটি বস্তু বা একজন ব্যক্তির অনুরূপ কিনা। বস্তুত আমরা একটা চিরস্থায়ী ভ্রান্তিবিলাস (comedy of errors)-এর ঝুঁকির মধ্যে থাকি। লকের প্রভাবে যাঁরা অনুগামীরা অন্য এক পথ নিয়েছিলেন যে-পথে তিনি নিজে চলেননি। তাঁরা পর্দাথের সম্পূর্ণ উপযোগিতার ধারণাটাই অস্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে সক্রেটিস সম্পর্কে আমরা যা কিছু জানি, সেসব জানতে পারি তাঁর বৈশিষ্ট্য থেকে। আপনি যখন বলেছেন, কোথায় এবং কখন তিনি বাস করতেন, তিনি দেখতে কেমন ছিলেন, তিনি কী করতেন, এবং এমনতর আরও কিছু, তখন তাঁর সম্পর্কে যা বলার সবই আপনি বলে ফেলেছেন। এখন পুরোপুরি অজ্ঞাত তাঁর মর্মস্থলে গিয়ে ধরে নেবার কিছু নেই যে মর্মস্থলে তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলো সহজাত হয়ে থাকে যেমন পিনদানিতে পিন থাকে। যেটা পুরোপুরি এবং বস্তুত অজ্ঞেয় সেটা কখনো অস্তিত্বশীল বলে জ্ঞাত হতে পারে না। আর সেটার অস্তিত্ব থাকতে পারে, এমনও ধরে নেবারও প্রয়োজন নেই।

পর্দাথের ধারণা, যার বৈশিষ্ট্য বর্তমান কিন্তু যে-কোনো একটি এবং সমস্ত থেকে স্পষ্ট, এই ধারণা রক্ষা করেছেন দেকার্ত, স্পিনোজা এবং লাইবনিৎস হ্রাসপ্রাপ্ত গুরুত্ব সহকারে রক্ষা করেছেন লক। যাই হোক, এটা হিউম কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। ক্রমে এটাকে মনোবিদ্যা এবং পদার্থবিজ্ঞান থেকে বাদ করা হয়েছে। যেভাবে এটা ঘটেছে সেটা এখন আরও বলা হবে। এই মুহূর্তে এই মতবাদের ধর্মতত্ত্বগত তাৎপর্য এবং এই প্রত্যাখ্যান থেকে উদ্ভূত অসুবিধাগুলো অবশ্যই আমাদের চিন্তায় সংশ্লিষ্ট।

প্রথমে দেহের কথা ধরা যাক। যতক্ষণ পর্দাথের ধারণা বজায় রাখা হয়েছে সে সময় পর্যন্ত দেহের পুনরুত্থানের মানে পৃথিবীতে বাস করার সময়ে থাকা যথার্থ পদার্থের পুনরায় একত্রিত করা। পদার্থটা বহু পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু এর স্বরূপ বজায় রেখেছে। যাই হোক, যদি একটা বস্তু অন্য কিছু না হয়ে বৈশিষ্ট্যগুলোর সমন্বয় হয়, এবং স্বরূপ হারিয়ে যায়, যদি বৈশিষ্ট্যগুলো পরিবর্তিত হয় তখন এটা বলা অর্থহীন যে, পুনরুত্থানের ফলে মৃত দেহ একই 'বস্তু' যেটা এক সময় ছিল একটি পার্থিব শরীর। যথেষ্ট উদ্ভট এই অসুবিধাটার যথার্থ অনুরূপ একটি সমস্যা রয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানে। একটা পরমাণু এর আনুষঙ্গিক ইলেকট্রনসহ হঠাৎ পরিবর্তনের প্রবণতাযুক্ত। পরিবর্তন-পূর্ব ইলেকট্রনগুলোকে পরিবর্তন-পরবর্তী ইলেকট্রনের সঙ্গে অভিন্ন বলে চিহ্নিত

ধরা যায় না। প্রতিটি হলো প্রত্যক্ষণীয় ঘটনার কেবল গ্রুপিং করার একটা পদ্ধতি। এবং এর সেই ধরনের 'বাস্তবতা' নেই যেটা পরিবর্তনেও স্বরূপ সংরক্ষণে প্রয়োজন।

পদার্থ বর্জনের ফলাফল দেহের চেয়ে আত্মার ব্যাপারে অধিকতর গুরুতর হয়েছে। যাই হোক, এই গুরুতর অবস্থাটা ধীরে ধীরে বোঝা গেছে। এর কারণ বহু প্রাচীন মতবাদের জীর্ণ চেহারা এক সময় রক্ষণীয় মনে হয়েছিল। প্রথমে 'মন' শব্দটাকে 'আত্মা' শব্দের বিকল্প ধরা হয়েছিল ধর্মতত্ত্বগত তাৎপর্য এড়ানোর জন্য। এর পরে 'বিষয়' শব্দটাকে বদল করা হয়েছিল এবং এই শব্দটা এখন চলছে। বিশেষ করে এই 'বিষয়' শব্দটার প্রতিতুলনা করা হয়েছে 'বিষয়গত' এবং 'বিষয়গত' শব্দ দুটোর সঙ্গে। এখানে তাহলে এই 'বিষয়' শব্দটা নিয়ে কিছু বলতে হবে।

গতকাল যে-ব্যক্তি ছিলাম আজও আমি সেই ব্যক্তি, এ-কথাটার স্পষ্টতই 'কিন্তু' বোধ-শক্তি আছে। আরো স্পষ্ট উদাহরণে বলা যায়, আমি যদি একই সঙ্গে একজন ব্যক্তিকে দেখি এবং তাকে কথা বলতে শুনি, তাহলে কিছু 'বোধশক্তি' এখানে পেলাম যেখানে একই আমি দেখছি, সেই একই আমি শুনছি। এ-থেকে এই চিন্তা এল যে, যখন আমি কোনো কিছু ধারণা করি তখন আমার এবং বস্তুটির মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়। আমি, যে দেখছি, সেই হলো 'বিষয়ী' এবং যে-জিনিসটা দেখছি সেটি হল 'বিষয়'। দুর্ভাগ্যবশত এতে এটা দেখা গেল যে 'বিষয়' সম্পর্কে কিছুই জানা যাবে না; বিষয়ী সর্বদা অন্য জিনিস দেখছে, কিন্তু নিজেকে দেখতে পারছে না। হিউম দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছেন যে, বিষয় বলে কিছু নেই, কিন্তু এটা কখনোই গ্রাহ্য হতে পারে না। যদি বিষয় না থাকে, তাহলে এটা কী অমর? এটা কী ছিল, যার স্বাধীন ইচ্ছা ছিল? এটা কী যা, পৃথিবীতে পাপ করে নরকে শাস্তি ভোগ করেছে? প্রশ্নগুলোর উত্তর মেলেনি। হিউমের কোনো অভিপ্রায় ছিল না এর উত্তর পাবার। কিন্তু অন্যদের তাঁর মতো সাহসিকতার অভাব ছিল।

কান্ট হিউমের প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইলেন। তিনি ভাবলেন যে, তিনি একটা পন্থা পেয়ে গেছেন যে-পন্থাটা এর দুর্বোধ্যতার কারণে অতি গভীর বলে বিবেচিত হয়েছিল। সংবেদনশীল ভাবে তিনি বললেন, বস্তু আমাদের উপর কাজ করে কিন্তু আমাদের প্রকৃতি আমাদের প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য করে বস্তুগুলো আসলে যা, সেভাবে নয়, অন্যভাবে। এই অন্যভাবে প্রত্যক্ষ করাটা হলো আমরা যে-নানাবিধ ব্যক্তিগত সংযোজন তৈরি করি তার ফলাফল। এই সংযোজনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্যযোগ্য হলো সময় এবং স্থান।

বস্তুর অন্তর্ধর্ম (things-in-themselves), কান্টের মতে, স্থান ও কালে (time andspce), নেই, যদিও আমাদের প্রকৃতি আমাদের প্রত্যক্ষ করায় যে, বস্তুগুলোর অস্তিত্ব রয়েছে। অহং (অথবা আত্মা) একটা বস্তুর অন্তর্ধর্ম হিসাবে স্থান ও কালে নেই, যদিও প্রত্যক্ষ করণীয় ঘটনা হিসাবে এটা যেন স্থান ও কাল উভয়ের মধ্যেই রয়েছে। যেটা আমরা ইন্দ্রিয় চেতনায় প্রত্যক্ষ করছি সেটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য 'আত্মা' ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য 'বস্তুর' মধ্যে একটা সম্পর্ক। কিন্তু এই দুটোর পিছনেই রয়েছে একটা প্রকৃত আত্মা এবং একটা প্রকৃত বস্তু, এই দুটোর কোনোটাকেই প্রত্যক্ষ করা যায় না। তাহলে কেন ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, আত্মা ও বস্তু বাস্তবে রয়েছে? এর কারণ এগুলো ধর্ম ও নৈতিকতার জন্য প্রয়োজন। যদিও বৈজ্ঞানিকভাবে আমরা প্রকৃত আত্মার সম্পর্কে কিছুই জানতে পারি না। আমরা জানি যে, আত্মার আছে একটা স্বাধীন ইচ্ছা, এটা পুণ্যশীল অথবা পাপযুক্ত হতে পারে (যদিও সময় নিরিখে নয়), এটা অমর এবং পৃথিবীতে ভালো মানুষদের দুঃখ-কষ্টের আপাত অবিচার ধরে আনন্দের দ্বারা প্রতিবিধান করা হবে। এইসব কারণে কান্ট মনে করতেন, বিশুদ্ধ হেতু ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে না। তিনি ভাবতেন যে, এটা প্রমাণ করা সম্ভব 'বাস্তব' কারণের জন্য, কারণ এটা ছিল একটা প্রয়োজনীয় পরিণতি যেটা আমরা নৈতিকতার ক্ষেত্রে সজ্ঞাজাত ভাবে জানতে পারি।

দর্শনের পক্ষে এই অর্ধপথে দীর্ঘ বিশ্রাম নেওয়াটা অসম্ভব ছিল। কান্টের মতবাদের সন্দেহপ্রবণ অংশটার স্থায়ী মূল্য প্রমাণিত হয়েছিল তাঁর সেই অংশ থেকে, যেখানে তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামিকে উদার করতে চেয়েছিলেন। শীঘ্রই এটা দেখা গেল যে, বস্তুর অন্তর্ধর্মের অস্তিত্ব ধরে নেবার কোনো প্রয়োজন নেই। বস্তুর অন্তর্ধর্মটা ছিল পুরানো 'বস্তু,' যার অজ্ঞেয়তাকে সবিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। কান্টের তত্ত্বে 'ঘটনা' যা প্রত্যক্ষ করা যায়, সেটা কেবলমাত্র আপাত এবং এর পিছনে বাস্তবতা হলো এমন কিছু যার সম্পর্কে আমাদের শুধু জানতে হবে এর নিছক অস্তিত্ব, যদিও এটা নৈতিকতার পূর্বশর্ত নয়। তাঁর উত্তরসূরীদের কাছে তাঁর চিন্তার পরিণতি দিয়েছেন হেগেল। এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, 'ঘটনার' রয়েছে আমাদের জ্ঞাত বাস্তবতা। এবং যা প্রত্যক্ষ করা যায় না তাকে উৎকৃষ্ট বাস্তবতার ছাপ দেবার প্রয়োজন নেই। তবে অবশ্যই এই ধরনের উৎকৃষ্ট বাস্তবতার ছাপ থাকতে পারে, কিন্তু এই ধরনের যুক্তির যে উৎকৃষ্ট বাস্তবতা থাকতেই হবে, এটা অকার্যকর। এবং সম্ভাবনা হলো অসংখ্য সম্ভাবনার মধ্যে এটি একটি যেটা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এটা জ্ঞাত বস্তুর পরিধির বাইরে এবং যা জ্ঞাত হওয়া যায় তারও বাইরে। যা জানা যায় তার পরিধির মধ্যে পদার্থের কোনো ধারণার স্থান

নেই অথবা বিষয় এবং বিষয়ীর ফর্মের রূপান্তরের জন্যও নেই। আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি এমন ঘটনাগুলোর এই ধরনের কোনো দ্বৈতবাদ নেই। এবং এরা 'বস্তু' অথবা 'ব্যক্তিকে' ঘটনার সমাহার ছাড়া অন্য কিছু ভাবার কোনো কারণের কথা বলে না।

আত্মা ও দেহের সম্পর্ক বিবেচনায় পদার্থের ধারণাটাই কেবল আধুনিক দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানে অসুবিধাজনক ছিল না, কার্য-কারণ সম্পর্কেও সমান অসুবিধা ছিল।

'কারণ'-এর ধারণাটা ধর্মতত্ত্বে জায়গা করে নিয়েছে প্রধানত 'পাপ'-এর অনুষঙ্গে। পাপ ছিল ইচ্ছার নিদর্শন এবং ইচ্ছা হলো কার্যের কারণ। কিন্তু অমান্যতা সর্বদা পূর্ববর্তী কারণের ফলাফল হতে পারে না। যদি এমনটা হত, তাহলে আমরা আমাদের কার্যাবলীর জন্য দায়ী হতাম না। সুতরাং পাপের ধারণাকে রক্ষা করতে এটাও সমানভাবে প্রয়োজন যে ইচ্ছার কোনো কারণ থাকবে না (অন্তত কখনও কখনও) এবং এটাই একটা কারণ হবে। মানসিক ঘটনার বিশ্লেষণ এবং মন ও দেহের সম্পর্ক বিষয়ে এই বিবৃতি বহু সমস্যাকে আবশ্যিক করে তুলল। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে এর কতিপয় বিবৃতি রক্ষা করা খুবই অসুবিধাজনক হয়ে পড়ল।

প্রথম অসুবিধাটা দেখা দিল বলবিদ্যার বিধি আবিষ্কারের মাধ্যমে। সতরো শতকে এটা স্পষ্ট হলো যে, যেসব নিয়মগুলো পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণকে সত্য বলে দেখায় তারা পুরোপুরি পদার্থের সমস্ত ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে নির্ধারণ করে। প্রাণী অথবা মানুষের ক্ষেত্রে কোনো ব্যতিক্রম তৈরির সপক্ষে কোনো কারণ নেই। দেকার্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, প্রাণীরা হলো যন্ত্রবৎ ক্রিয়াশীল জীব কিন্তু তবুও তিনি ভাবলেন, মানুষের ক্ষেত্রে ইচ্ছা তার দৈহিক সচলতা ঘটাতে পারে। পদার্থবিদ্যা দ্রুত এটা দেখাল যে, তার আপোসকামিতা অসম্ভব। কান্টের অনুগামীরা এই ধারণা পরিত্যাগ করলেন যে, পদার্থের উপর মনের কোনো প্রভাব নেই। তাঁরা তুলাদণ্ডটা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে এমনকি এটাও বললেন যে, বিপরীতক্রমে পদার্থেরও কোনো প্রভাব নেই মনের উপর। এই প্রয়াস দুটো সমান্তরাল তত্ত্বের দিকে ওঁদের নিয়ে গেল। এর একটি মানসিক; অন্যটি পদার্থগত। এই দুটোরই নিজস্ব নিয়ম আছে। যখন এক জন ব্যক্তির সঙ্গে আপনার দেখা হবে এবং তাঁকে এটা জিজ্ঞেস করতে আপনি স্থির করলেন, 'আপনি কেমন আছেন,' তখন আপনার সিদ্ধান্তটা হবে মানসিক ধারার। কিন্তু ঠোঁট, জিহ্বা এবং বাক্‌যন্ত্রের সচলতা যা এর ফলস্বরূপ সচল হলো, সেটা

পুরোপুরি যান্ত্রিক কারণ। তাঁরা মন ও দেহকে দুটো ঘড়ির সঙ্গে তুলনা করেছেন, যারা যথাযথ সময় রক্ষা করে। যখন একটা ঘড়ি এক ঘণ্টায় পৌঁছলো তখন দুটো ঘড়িই একসঙ্গে ঘণ্টা বাজায়, যদিও একটা ঘড়ির উপর অন্যটির কোনো প্রভাব নেই। আপনি যদি ঘড়ি দুটোর মধ্যে একটা ঘড়ি দেখতে পান, কিন্তু অন্য ঘড়িটির ঘণ্টাধ্বনিতে সেটাকে জানতে পারেন, তাহলে আপনি ভাববেন যে, যেটি আপনি দেখতে পান সেটিই ঘণ্টা-ধ্বনির কারণ।

এই তত্ত্বটা বিশ্বাস করা কষ্টকর ছিল। তাছাড়া এই তত্ত্বটা স্বাধীন ইচ্ছাকে রক্ষা করতে পারত না, এটা ছিল এর অন্য অসুবিধা। এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, দেহের অবস্থা এবং মনের অবস্থার মধ্যে একটা গোপন যোগাযোগ আছে। যখন এই যোগাযোগের একটা দিক জানা গেল তখন অন্য দিকটার তাত্ত্বিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। যে-ব্যক্তি এই যোগাযোগের নিয়মটা জানতেন এবং এইসাথে জানতেন পদার্থবিদ্যার নিয়মও, এতে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতা থাকত। এ-কারণে তিনি মানসিক এবং দৈহিক সংঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতেন। যাই হোক, মানসিক ইচ্ছাশক্তি অকার্যকরী হত যদি না দৈহিক অভিব্যক্তি এর অনুবর্তী হত। পদার্থবিদ্যার নিয়ম সুনিশ্চিত করতে আপনি যখন অন্যকে বলবেন, 'আপনি কেমন আছেন' তখন এটা হবে একটা দৈহিক কার্য। এই বিশ্বাস করাটা একটা ছোট্ট সান্ত্বনা হবে যে, আপনি এটা বলতেই ইচ্ছুক ছিলেন 'বিদায়।' যদিও এটা পূর্বনির্দিষ্ট ছিল যে, আপনার বস্তুত উল্টোটাই বলা উচিত।

অতএব, এটা বিস্ময়কর নয় যে, আঠারো শতকের ফ্রান্স কার্টেস্রীয় মতবাদ বিশুদ্ধ বস্তুবাদের জায়গা ছেড়ে দিয়েছে, যে-বস্তুবাদে মানুষ সম্পূর্ণরূপে পদার্থবিদ্যার নিয়মে পরিচালিত। এই দর্শনে ইচ্ছার কোনো স্থান নেই এবং পাপের ধারণা অদৃশ্য। 'আত্মা' বলে কিছু নেই। সুতরাং মানুষের দেহে যে-পৃথক পরমাণুসমূহ সাময়িকভাবে সংযুক্ত বলে মনে করা হয়, সেটা একটা আতঙ্কের বিষয় হয়ে উঠল। এটা ঘটেছিল সন্ত্রাসের রাজত্বের পরে। প্রথমে এটা আতঙ্কিত করেছিল তাঁদের, যাঁরা ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। তারপর ১৮১৪ সালের পরে আতঙ্কিত করে সমুদয় ফ্রান্সবাসীদের, যারা সরকারকে সমর্থন করত। ব্রিটেন ধর্মীয় গোঁড়ামিতে প্রত্যাবর্তন করল। জার্মানি কান্টের উত্তরসূরীদের ভাববাদী দর্শন গ্রহণ করল। এরপরে শুরু হলো রোমান্টিক আন্দোলন। এই আন্দোলন আবেগকে পছন্দের বিষয় হিসাবে বেছে নিল। এই রোমান্টিক আন্দোলন গাণিতিক ফর্মূলা দিয়ে মানবিক কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করাটা অপছন্দ করল। ইতোমধ্যে এল

মানবীয় শারীরবিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানে যাঁরা বস্তুবাদ অপছন্দ করলেন, তাঁরা হয় প্রাণবাদে অথবা 'জৈবনিক শক্তিতে' আশ্রয় নিলেন। কেউ কেউ বললেন যে, বিজ্ঞান কখনো মানব শরীরকে বুঝতে পারে না।

অন্যেরা ঘোষণা দিলেন যে, এটা পারা রসায়নশাস্ত্র এবং পদার্থবিদ্যার নীতি ব্যতীত অন্য মূলনীতি অনুসরণ করলে। জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে এই দুটে মতের কোনোটিরই এখন কোনো জনপ্রিয়তা নেই। পরের নীতিটার এখনও কতিপয় সমর্থক রয়েছে। ভ্রূণতত্ত্ব, জীবরসায়ন এবং জৈবযৌগে অনেক কাজ হয়েছে। এতে এটা অধিকতর সম্ভাব্য যে, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার সংযোগে সজীব বস্তুর বৈশিষ্ট্যসমূহ পুরোপুরি ব্যাখ্যাযোগ্য। বিবর্তনতত্ত্ব অবশ্যই এটা ধরে নেওয়াটাকে সম্ভব করে দিয়েছে যে, প্রাণীদেহের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য নীতিসমূহ মানুষের দেহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

মনোবিদ্যা এবং ইচ্ছাতত্ত্বে ফেরা যাক। এটা সর্বদা স্পষ্ট ছিল যে, আমাদের কাজকর্মশক্তির অনেক, সম্ভবত বেশির ভাগের কারণ ছিল। কিন্তু গোঁড়া ধর্মপন্থী দার্শনিকরা মনে করতেন যে, এইসব কারণসমূহ পার্থিব পৃথিবীতে অনুপস্থিত কারণসমূহের মতো, তাদের ফলসমূহকে অপরিহার্য করে তোলে না। সুতরাং তাঁরা মনে করতেন যে, এমনকি সবচেয়ে শক্তিশালী আকাঙ্ক্ষাকেও ইচ্ছার কাজের দ্বারা প্রতিরোধ করা সর্বদাই সম্ভব : এইভাবে এটা ভাবনায় চলে এল যে, আমরা যখন উদ্দীপনা দ্বারা পরিচালিত হই তখন আমাদের কার্যাবলী স্বাধীন নয়। এটা স্বাধীন নয় এই জন্য যে, এদের 'কারণ' রয়েছে কিন্তু একটা মানসিক ক্ষমতা আছে, কখনও সেটাকে 'হেতু' এবং কখনো 'চেতনা' বলা হয়। এই চেতনার নির্দেশনা আমরা যখন অনুসরণ করি এটা তখন আমাদের মুক্তি দেয়। এভাবে যথার্থ স্বাধীনতাকে মর্জির বিপরীতে নৈতিক নিয়মের প্রতি অনুগত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। হেগেলপন্থীরা আরো একটু এগিয়ে গেলেন। এবং নৈতিক নিয়মকে রাষ্ট্রের নিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করলেন, যাতে 'যথার্থ' স্বাধীনতার অর্থ হয়ে দাঁড়ায় পুলিশকে মান্য করা। এই মতবাদটা সরকার খুবই পছন্দ করত।

'ইচ্ছা' কখনও কখনও 'হেতুহীন'—এই তত্ত্বটা মেনে নেওয়া কঠিন। এটা বলা যায় না যে, সর্বশ্রেষ্ঠ ধার্মিক ব্যক্তিও উদ্দেশ্যহীনভাবে কাজ করেন। একজন ধার্মিক ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে চাইতে পারেন, তাঁর নিজের কিংবা তাঁর প্রতিবেশীর আত্মমোদন চাইতে পারেন কিংবা অন্যের কষ্ট লাঘব করতে আগ্রহী হতে পারেন। এদের যে-কোনো একটি অভিলাষ একটা মহৎ কাজের 'হেতু' হতে পারে। কিন্তু কোনো ব্যক্তির মধ্যে যদি কিছু মহৎ অভিলাষ না থাকে তাহলে নৈতিক নিয়ম

অনুমোদিত হলেও তিনি কাজ করবেন না। আমরা অতীতে যতটা জানতাম, এখন তার চেয়ে অভিলাষের কারণসমূহ বেশি জানি। নালিবিহীন গ্রন্থীর কার্যাবলীতে দেখা যায়, কখনও প্রাথমিক শিক্ষায়, কখনও বিস্মৃত অভিজ্ঞতায়, কখনও অভিলাষের অনুমোদনে এই 'হেতু' দেখা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, নানাবিধ উৎসের সংখ্যা একটা অভিলাষের কার্যকারণে দেখা যায়। এটা পরিষ্কার যে আমরা যখন একটা সিদ্ধান্ত নেই, আমরা এটা করি কতিপয় অভিলাষের ফলস্বরূপ। যদিও একই সময়ে অন্যান্য অভিলাষও আমাদের বিপরীত দিকে টানতে চায়। এসব ক্ষেত্রে, যেমনটা হব্‌স্ বলেছেন, 'ইচ্ছা' বা অভিলাষ হলো তর্কবিতর্কের 'অন্তিম ক্ষুধা'। পুরোপুরি হেতুবিহীন ইচ্ছার একটা কাজের ধারণাও সমর্থনযোগ্য নয়। নৈতিকতার ক্ষেত্রে এর ফলাফল নিয়ে পরের এক অধ্যায়ে আলোচনা করব।

মনোবিদ্যা এবং পদার্থবিদ্যা যতটা বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠেছে, উভয়েরই ঐতিহ্যগত ধারণাসমূহ ততই ক্রমবর্ধমানভাবে নতুন ধারণার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। বলা বাহুল্য, এই নতুন ধারণা বৃহত্তর অভ্রান্ততা দিতে পারে। পদার্থবিদ্যা খুব সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত 'পদার্থ' ও 'গতি' নিয়েই তুষ্ট থাকত। 'পদার্থ'কে দার্শনিক মুহূর্তে প্রকরণগতভাবে মধ্যযুগীয় ধারণার 'বস্তু' বলেই ধরা হতো। পদার্থ ও গতিকে এখন, এমনকি প্রকরণগত ভাবেও অপর্যাপ্ত বলে ভাবা হয়। তাত্ত্বিক পদার্থবিদদের পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক দর্শনের দাবি-পরিধির মধ্যে অনেকটা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মনোবিদ্যা, ঠিক এভাবেই এটা প্রয়োজনীয় মনে করছে এই ধরনের 'প্রত্যক্ষকরণ' এবং চেতনা'কে পরিত্যাগ করতে। এর কারণ এরা দেখা গেছে যে, এগুলো যথাযথতার ক্ষেত্রে অক্ষম। এই বিষয়টা পরিষ্কার করতে এই দুটোর প্রত্যেকটি নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। প্রথম পরিচয়ে প্রত্যক্ষকরণ যথার্থভাবে সহজবোধ্য। আমরা 'প্রত্যক্ষ করি' সূর্য এবং চন্দ্র, কথিত শব্দে আমরা শুনি, স্পর্শ-করা কোনো বস্তুর কাঠিন্য অথবা কোমলতা অনুভব করি, একটা গাঁদা ডিমের গন্ধ পাই, অথবা সর্ষের স্বাদ পেয়ে থাকি। যে-সব ঘটনার এই ধরনের বর্ণনা দেই, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। কেবলমাত্র 'বর্ণনা'কে প্রশ্ন করা যায়। আমরা সূর্যকে প্রত্যক্ষ করি, তখন একটা দীর্ঘ কার্য-কারণ পদ্ধতি থাকে। প্রথমত, তিরানব্বই মিলিয়ন মাইল মধ্যবর্তী শূন্যতা, তারপর চোখের অভ্যন্তর। অপটিক নার্ভ এবং মস্তিষ্ক। শেষ পর্যন্ত 'মানসিক' ঘটনা যাকে আমরা 'সূর্যকে দেখা' বলি, তার সঙ্গে সূর্যের সাদৃশ্য আছে বলে ধরে নেওয়া যাবে না। যেমন কান্টের 'বস্তুটির অন্তর্ধর্ম'-এর (thing-in itself) ধারণার মতো আমাদের

অভিজ্ঞতার বাইরে থাকে, এবং কেবলমাত্র জানতে হয় যে, যদি আদৌ জানা সম্ভব হয়, একটি কঠিন অভিজ্ঞতাপ্রসূত সিদ্ধান্ত থেকে, যেটাকে আমরা 'সূর্যকে দেখা' বলি। আমরা ধরে নেই যে, অভিজ্ঞতার বাইরে সূর্যের একটা অস্তিত্ব রয়েছে। কারণ অনেক মানুষ এটা তৎক্ষণাৎ দেখে থাকেন। সমস্ত ধরনের বস্তু, যেমন চাঁদের আলো, এগুলোকে খুব সহজভাবে ব্যাখ্যা করা হয় এটা ধরে নিয়ে যে, যেখানে সূর্যকে দেখা যায় না সেখানেও সূর্যের প্রভাব রয়েছে। কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই সূর্যকে দেখা এবং সহজ ধারণায় 'প্রত্যক্ষ করি' না, যেভাবে মনে হয় আমরা এটা করি সংবেদনের বিশেষ ভৌত কার্য-কারণ বোঝার আগেই।

একটা ঢিলেঢালা ধারণায় আমরা বলতে পারি যে, আমরা একটা 'বস্তু' প্রত্যক্ষ করি যখন আমাদের কাছে কিছু একটা ঘটে, যেটার ক্ষেত্রে ওই বস্তুটিই প্রধান কারণ। ওটি সেই প্রকৃতির যা আমাদের অনুমতি দেয় ওটিকে বস্তু বলে সিদ্ধান্ত করার। আমরা যখন কোনো ব্যক্তিকে কথা বলতে শুনি, আমরা যা শুনি তার পার্থক্যটা তিনি যা বলেন তার পার্থক্যের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এই দুইয়ের মাঝখানে ঘটা মাধ্যমের ফল মোটামুটি স্থির। এই কারণে কম-বেশি এটাকে এড়িয়ে যাওয়া চলে। অনুরূপভাবে আমরা যখন এক টুকরো লাল এবং এক টুকরো নীল পাশাপাশি দেখি, তখন আমাদের অধিকার থাকে এটা ধরে নেওয়া যে, কিছুটা তফাৎ থাকে দুটো স্থানের মধ্যে, যেখান থেকে লাল এবং নীলের সংবেদনের মধ্যে পার্থক্য ঘটানোর। এভাবে আমরা 'প্রত্যক্ষ করার' চেষ্টাকে রক্ষা করতে পারি। কিন্তু আমরা কখনোই একে যথার্থতা প্রদান করতে পারি না। বাধা-সৃষ্টিকারী মাধ্যমের সবসময়ই কিন্তু বিকৃতির ফলাফল থাকে। লাল স্থানটিকে লাল মনে হয় কারণ বাধা-সৃষ্টিকারী কুয়াশা। নীল স্থানটিকে নীল দেখায় কারণ আমরা রঙিন চশমা পরিধান করেছি। যে-ধরনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বস্তুটির সম্পর্কে অবধারণা করি, সেটাকে আমরা স্বাভাবিকভাবে 'প্রত্যক্ষ করা' বলি। এটা করার জন্য আমাদের পদার্থবিদ্যা এবং শারীরবিদ্যার ইন্দ্রিয় যন্ত্রের ধারণা থাকতে হবে। এইসঙ্গে আমাদের এবং বস্তুর মধ্যে বাধা-সৃষ্টিকারী শূন্যতার মধ্যে কী আছে, সে-সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য থাকতে হবে। সমস্ত তথ্য পেলে এবং বাহ্যিক পৃথিবীর বাস্তবতার ধারণা নিয়ে আমরা কতিপয় উন্নত ধরনের বিমূর্ত তথ্য পেতে পারি 'প্রত্যক্ষ করা' বস্তু সম্পর্কে। কিন্তু সমুদয় উষ্ণতা আর তাৎক্ষণিকতা যা 'প্রত্যক্ষ করা' শব্দটার মধ্যে নিহিত রয়েছে সেসব কঠিন গাণিতিক ফর্মূলার সাহায্যে এই সিদ্ধান্তের পদ্ধতির মধ্যেই হারিয়ে যাবে। সূর্যের মতো দূরবর্তী বস্তুর ক্ষেত্রে এটা বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু আমরা যা স্পর্শ করি, যার ঘ্রাণ গ্রহণ করি,

সেসবের ক্ষেত্রে এটা সমান সত্য। কারণ এইসব বস্তু আমাদের প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হচ্ছে আমাদের স্নায়ু এবং মস্তিষ্কের মধ্যে চলমান বিশদ প্রক্রিয়ার কারণে।

'চেতনা'র প্রশ্নটা সম্ভবত আরও বেশি দুরূহ। আমরা বলি যে, আমরা সচেতন। কিন্তু 'লাঠি' এবং 'পাথর' তা নয়। আমরা যখন জেগে থাকি তখনই বলতে পারি যে, আমরা 'সচেতন।' ঘুমোনোর সময় এটা বলতে পারি না। আমরা যখন এমনটা বলি তখন আমরা নিশ্চয়ই কিছু একটা বোঝাতে চাই। এবং আমরা এমন কিছু বোঝাতে চাই যা সত্য। কিন্তু যথার্থতার সঙ্গে ব্যক্ত করা যে, আমরা সত্য, এটা কিন্তু একটি কঠিন বিষয়। এটা বলতে ভাষার পরিবর্তন দরকার হয়।

আমরা সচেতন। এই কথাটা বলতে আমরা দুটো জিনিস বোঝাতে চাই। একাধারে, আমরা আমাদের পরিবেশের প্রতি একভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাই। পক্ষান্তরে, ভেতরের দিকে তাকিয়ে আমরা সম্ভবত খুঁজি, আমাদের চিন্তা অনুভূতিতে কতিপয় গুণ, যেগুলো আমরা অজৈব বস্তুতে খুঁজে পাই না।

পরিবেশের প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে বলা যায়, এটা হল কোনোকিছু সম্পর্কে সচেতন হওয়া। যদি আপনি চিৎকার করে বলেন, 'আগুন' তখন মানুষ চারদিকে তাকিয়ে দেখে, কিন্তু পাথর এমনটা করে না। আপনি জানেন যে, এই ধরনের একটা বিষয়ে আপনি যখন নিজেই চারদিকে দেখেন এর কারণ আপনি একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন। যতক্ষণ এটা ধরে নেওয়া যাবে যে, একজন বাইরের পৃথিবীতে বস্তু নিয়ে প্রত্যক্ষ করেন। তাহলে এমনটা একথা বলতে পারেন যে, উনি বস্তুনিচয় সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এখন আমরা কেবলমাত্র এটাই বলতে পারি যে, আমরা উদ্দীপনায় সাড়া দেই। পাথরও সাড়া করে, যদিও যে-উদ্দীপনায় তারা সাড়া দেয় তা সংখ্যায় অত্যল্প। অতএব, আমাদের প্রত্যক্ষকরণ যতটা সংশ্লিষ্ট, একটা পাথর এবং আমাদের মধ্যে পার্থক্য হল কেবল মাত্রাগত।

'চেতনা'র ধারণার অধিকতর গুরুত্বের অংশটা, যেটা আমরা অন্তর্দর্শনের সাহায্যে আবিষ্কার করি, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আমরা কেবলমাত্র বাহ্যিক বস্তুর প্রতি প্রতিক্রিয়া করি না, কিন্তু আমরা জানি যে, আমরা প্রতিক্রিয়া করছি। পাথর আমরা ভাবি, জানে না কখন এটা প্রতিক্রিয়া করে। যদি পাথর এটা জানত তাহলে বলা যেত যে, পাথরেরও চেতনা আছে। এখানেও, বিশ্লেষণ করলে পার্থক্য বোঝা যাবে সেটাও মাত্রাগত। আমরা কিছু দেখি, এটা জানা সত্ত্বেও কোনো কিছু নতুন জ্ঞানের অংশ নয়। সর্বোপরি, দেখাটা যদি না একটা ঘটনা না হয়ে ওঠে। আমরা যদি প্রথমে কিছু একটা দেখি, এবং তারপর

মুহূর্তেই, ভাবি যে, আমরা এটা দেখছি, এই ভাবনাচিন্তা যেটা অন্তর্দর্শনমূলক, এটাই স্মৃতিশক্তি। এটা বলা যেতে পারে যে, স্মৃতিশক্তি কিছুটা বৈশিষ্ট্যমূলক ভাবে ব্যাপক। কিন্তু এটাও পুনরায় অস্বীকার করা যায়। স্মৃতিশক্তি হলো অভ্যাসের একটা রূপ। এবং অভ্যাস হলো স্নায়ুকলার বৈশিষ্ট্যমূলক। এটা অন্যত্রও ঘটতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কাগজের একটা রোল-কাগজ পুনরায় নিজে থেকেই রোল করা যাবে যদি এই কাগজ আগে গোটানো অবস্থায় থাকে। আমি এটা বলছি না যে, আমরা ভাসাভাসাভাবে যাকে 'চেতনা' বলছি, সেটার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা এখানে দিলাম। প্রশ্নটা ব্যাপক এবং এটার আলোচনায় মহাভারত হয়ে যাবে। আমি কেবল এটুকুই বলতে চাইছি যে, যেটা প্রথম দর্শনে একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা বলে মনে হয়, সেটা সত্যি সত্যি এমন ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। এটা বোঝার জন্য বৈজ্ঞানিক মনোবিদদের পৃথক পরিভাষা-বিজ্ঞান দরকার। পরিশেষে, এটাই বলতে হবে যে, আত্মা ও দেহের পুরানো পার্থক্য অনেকখানি উবে গেছে। এর কারণ 'পদার্থ' তার পুরানো কঠিন অবস্থা হারিয়েছে, কারণ 'মন' হারিয়েছে এর আধ্যাত্মিকতা। এখনও, কখনও কখনও ভাবা হয় এবং এটা বিশ্বজনীন ভাবেই মানা হয় যে, পদার্থবিদ্যার তথ্য সর্বজনবিদিত। এটা এই অর্থে যে, পদার্থ যে-কোনো ব্যক্তির কাছে দৃশ্যমান। কিন্তু মনোবিদ্যার তথ্য ব্যক্তিগত কারণ, এটা অন্তর্দর্শনে পেতে হয়। যাই হোক, এই পার্থক্যটা মাত্রাগত। দু'জন ব্যক্তি হুবহু একই বস্তু একই সময়ে প্রত্যক্ষ করতে পারে না। কারণ তাদের দর্শনগত অবস্থাটা তারা যা দেখে তার মধ্যে তফাৎ তৈরি করে দেয়। পদার্থবিদ্যার তথ্য যদি নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করা হয় তখন দেখা যায় যে, মনোবিদ্যার মতো একই ধরনের গোপনীয়তা রয়েছে। এবং এই ধরনের অর্ধ-প্রসিদ্ধি যা তারা লাভ করে সেটা মনোবিদ্যার ক্ষেত্রেও পাওয়া অসম্ভব নয়।

দুটো বিজ্ঞানের সূচনা যে-ঘটনা দিয়ে তা অন্তত অংশত অভিন্ন। রঙের যে-জ্ঞান আমরা দেখি সেটা সমানভাবে পদার্থবিদ্যা এবং মনোবিদ্যার তথ্য। পদার্থবিদ্যা এক ধরনের 'প্রকরণ' নিয়ে এক প্রকার সিদ্ধান্তের দিকে এগোয়। মনোবিদ্যা অন্য ধরনের 'প্রকরণ' নিয়ে ভিন্নতর সিদ্ধান্তে পৌছতে চায়। কেউ কেউ বলবেন, এমনভাবে এগোনোটা খুবই অপরিণত। কারণ পদার্থবিদ্যা মস্তিষ্কের বাইরে কার্যকারণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এবং মনোবিদ্যা মস্তিষ্কের ভেতরের কার্যকারণে সংশ্লিষ্ট। এবং মনোবিদ্যা মস্তিষ্কের ভেতরের কার্যকারণে সংশ্লিষ্ট। এই ক্ষেত্রে, মনোবিদরা মস্তিষ্কের বাহ্যিক অনুসন্ধানে যা আবিষ্কার করেছেন তা বিচার করতে হবে। পদার্থবিদ্যা এবং মনোবিদ্যা দুটোরই তথ্য হলো ঘটনা, যা

কতিপয় ধারণায় মস্তিষ্কে ঘটে চলে। এদের বাহ্যিক কারণের একটা শৃঙ্খল রয়েছে। এই শৃঙ্খলটাই পদার্থবিদ্যা অনুসন্ধান করে এবং আভ্যন্তরীণ ফলাফল একটা শৃঙ্খল—স্মৃতি, অভ্যাস প্রভৃতির অনুসন্ধান করে মনোবিদ্যা। কিন্তু এবং মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্যের কোনো সাক্ষ্য আগে যা ভাবা হয়েছিল যে, আমরা উভয় ব্যাপারেই কম জানি এটা। সুনিশ্চিত হতে এটাও আমরা যথেষ্টই জানি যে, আত্মা' এবং 'দেহ' কোনোটাই আধুনিক বিজ্ঞানে স্থান পেতে পারে না। অমরত্বে গোঁড়া ধর্মীয় বিশ্বাস রয়েছে। তবে এটা এখনও অনুসন্ধানের বিষয় যে, শারীর-বিদ্যা এবং মনোবিদ্যার আধুনিক মতবাদ এই বিশ্বাসের বিশ্বাসযোগ্যতার সম্পর্কে কতখানি প্রাসঙ্গিক।

দেহের মৃত্যুর পর আত্মা বেঁচে থাকে, এই মতবাদটা যেটা এখনও আমরা খ্রিস্টান ও অখ্রিস্টান, সভ্য এবং অসভ্য মানুষেরা ব্যাপকভাবে মেনে নিয়েছে। খ্রিস্টের সময়ে ইহুদিদের মধ্যে Pharisees[১]- রা অমরত্বে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু Sadducees রা, যাঁরা প্রাচীন ঐতিহ্যে দৃঢ় ছিলেন তাঁরা এটাতে বিশ্বাস করতেন না। খ্রিস্টধর্মে শাশ্বত জীবনে বিশ্বাস সর্বদাই একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। রোমান ক্যাথলিক বিশ্বাসে কেউ কেউ স্বর্গে পরম সুখ উপভোগ করে। এই সুখ উপভোগ করার আগে নরকে একটা সময় ধরে শুদ্ধিকরণের কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। অন্যেরা নরকে অন্তহীন যন্ত্রণা ভোগ করে। আধুনিক সময়ে উদার খ্রিস্টানেরা প্রায়ই এই মতে বিশ্বাসী যে, নরক চিরন্তন নয়। ১৮৬৪ সালে প্রিভি কাউন্সিলের সময় থেকে ইংল্যান্ডের অধিকাংশ ধর্মযাজক এই ধারণাটাই পোষণ করে আসছেন এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, এই বিশ্বাস তাঁদের পক্ষে বেআইনি নয়। কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত খুব কম খ্রিস্টানই চিরন্তন শাস্তির বাস্তবতায় সন্দেহ পোষণ একটা উৎস যেটা বেঁচে থাকা বিশ্বাসের সুখ অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে। অন্যদের নরক থেকে বাঁচাবার মনোভাব নিগ্রহের ন্যায্যতাকে প্রতিপাদন করতে চেয়েছিল। এর কারণ যদি একজন ধর্মপ্রচারক অন্যদের বিপথগামী করে তাদের নরকভোগ করাতে পারে, পার্থিব অত্যাচারের কোনো মাত্রাই অতিরিক্ত বলে মনে হবে না যদি এই ভয়াবহ ফলাফল নিবারণ করতে নিয়োজিত করা যায়। এখন যাই ভাবা হোক, আগে এটাই বিশ্বাস করা হতো। সংখ্যালঘু মানুষ ছাড়া, বিধর্মিতা মুক্তির সঙ্গে বিসদৃশ। নরক-বিশ্বাস হ্রাসের কারণ কোনো নতুন ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তিধারা নয়, বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রভাবও নয়, এর কারণ হলো নিষ্ঠুরতার কমতি যা আঠারো এবং উনিশ শতকে ঘটে গিয়েছিল।

---

১. আচারনিষ্ঠা ও গোঁড়ামির জন্য প্রসিদ্ধ প্রাচীন ইহুদি গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ।—অনুবাদক

২. ইহুদি নাস্তিক্য বিশ্বাসের মানুষ।— অনুবাদক

এটা একই আন্দোলনের অংশ যেটা ফরাসি বিপ্লবের কিছু আগে পরিচালিত হয়েছে অনেক দেশের বিচার বিভাগীয় অত্যাচারের বিলুপ্তি সাধনে। এটাই আবার উনিশ শতকের শুরুর দিকে ইংল্যান্ডের আদিম দণ্ডবিধির (Penal Code) সংস্কার সাধনে পরিচালিত হয়েছিল। এই দণ্ডবিধি একসময় ইংল্যান্ডকে কলঙ্কিত করেছিল। বর্তমান সময়ে যারা নরকে বিশ্বাস করেন, নরকের পীড়নে ভোগান্তির জন্য দণ্ডিত, তাদের সংখ্যা আগের তুলনায় খুবই কম। আমাদের হিংস্রতার উদ্দীপনা ধর্মতত্ত্বীয় নয়, এটা এখন রাজনৈতিক অভিমুখ গ্রহণ করেছে।

এটা একটা কৌতূহল-জাগানো ঘটনা যে, নরকে বিশ্বাসটা যতটা কম নির্দিষ্ট হয়ে গেছে, স্বর্গে বিশ্বাসও ততটাই স্পষ্টতা হারিয়েছে। স্বর্গ এখনও খ্রিস্টান গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসের একটি স্বীকৃত অঙ্গ, তবুও আধুনিক আলোচনায় বির্বতনের ঐশ্বরিক সাক্ষ্যের তুলনায় এটা নিয়ে কমই বলা হয়। ধর্মের সপক্ষে যুক্তিধারা এখন পরকালের জীবনের সঙ্গে এর যোগাযোগের চেয়ে বেশি আলোচনা করে এই পৃথিবীতে মানুষের সুখী জীবন সম্পর্কে। পার্থিব জীবন কেবলমাত্র অন্য এক জীবনের প্রস্তুতি, এই বিশ্বাস আগে নৈতিকতা ও আচরণকে প্রভাবিত করত। এখন কিন্তু এই বিশ্বাসটা যারা সচেতনভাবে পরিত্যাগ করেনি, তাদের উপরও বেশি প্রভাব বিস্তারে অক্ষম।

অমরত্ব নিয়ে বিজ্ঞানের কী বলার আছে সেটা এখনও খুব নির্দিষ্ট নয়। মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকার সপক্ষে বস্তুত এক ধরনের যুক্তি রয়েছে, যেটা অন্তত আংশিকভাবে, পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক। আমি যুক্তির সেই দিকটা নিয়ে বলছি, যেটা প্রাণীতবিজ্ঞানের গবেষণা-পরীক্ষিত বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত। এই বিষয়টা নিয়ে আমার যথেষ্ট জ্ঞান নেই যা দিয়ে আমি ইতোমধ্যে লভ্য সাক্ষ্য বিচার করে দেখাতে পারি। কিন্তু এটা পরিষ্কার নয় যে, যুক্তিবাদী মানুষকে বোঝাবার মতো সাক্ষ্য থাকতেই পারে। যাই হোক, এর সঙ্গে কতিপয় শর্ত জুড়ে দিতেই হবে। প্রথমত, সাক্ষ্য কেবল বড়জোর প্রমাণ করে যে, আমরা মৃত্যুর পর অস্তিত্বশীল থাকি, যদিও চিরকাল আমরা বেঁচে থাকি না। দ্বিতীয়ত, যেখানে জোরালো ইচ্ছার ব্যাপারটা থাকে সেখানে মজ্জাগতভাবে যথার্থ ব্যক্তির প্রমাণ গ্রহণ করা খুবই কঠিন। এ নিয়ে যুদ্ধের সময় এবং প্রবল উত্তেজনার সময় অনেক সাক্ষ্য ছিল। তৃতীয়, অন্য কারণে এটা অসম্ভবও মনে হয় যে, আমাদের ব্যক্তিত্ব দেহের সঙ্গে মরে যায় না। আমাদের পেতে হবে অনেক বেশি শক্তিশালী সাক্ষ্য, যদি আমরা চিন্তা করি পরকল্পটা পূর্ববর্তী ঘটনাক্রমে সম্ভব। এমনকি আধ্যাত্মিকতায় উৎসাহী বিশ্বাসীও এমন ভান করতে পারবেন না যে, মৃত্যুর পর বেঁচে থাকার অনেক সাক্ষ্য তার

রয়েছে। যেভাবে ইতিহাসবিদগণ প্রমাণস্বরূপ হাজির করতে পারেন যে, [illegible] শারীরিকভাবেই শয়তানকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিল। তবুও এখন কিন্তু প্রায় [illegible] এইসব ঘটনার সাক্ষ্য পরীক্ষার যোগ্য বলে মনে করেন না।

এইঘটনা থেকে বিজ্ঞানের অসুবিধাটা উঠে আসে যে, আত্মা অথবা [illegible] (self), এসবের কোনো সত্ত্বা নেই। যেমনটা আমরা দেখেছি যে, এখন আত্মা এবং দেহকে দুটো 'বস্তু' হিসাবে বিবেচনা করা সম্ভব নয়। অথচ [illegible] সময়ের সহনশীলতার মধ্য দিয়ে অধিবিদ্যাবিদগণ বিবেচনা করতেন যে, [illegible] ধারণার সঙ্গে এটা যৌক্তিকভাবে সংবদ্ধ। মনোবিদ্যাতেও এটা ধরে নেবার [illegible] কারণ নেই যে, 'বিষয়ী'কে প্রত্যক্ষকরণে 'বিষয়'-এর সংস্পর্শে আনা [illegible] সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত এটাই ভাবা হত যে, পদার্থ হলো অমর, কিন্তু এটা [illegible] আর পদার্থবিদ্যার প্রকরণে ধরে নেওয়া হয় না। একটা পরমাণু এখন [illegible] কতিপয় ঘটনাকে দলভুক্ত করার একটি সুবিধাজনক পন্থা। একটা [illegible] অনুষঙ্গী ইলেকট্রন নিয়ে একটা নিউক্লিয়াস, একটা মাত্রা পর্যন্ত এভাবে [illegible] সুবিধাজনক। কিন্তু এক সময়ের ইলেকট্রনকে অন্য সময়ের ইলেকট্রনের [illegible] সনাক্ত করা যায় না। একজন আধুনিক পদার্থবিদ কোনো ক্রমেই এদের [illegible] বলে ভাবেন না। যখন জাগতিক বস্তুকে চিরন্তন বলে ভাবা হয়েছিল, তখন [illegible] যুক্তি দিয়ে বোঝানো সহজ ছিল যে, মনটাও অবশ্যই সমানভাবে চিরন্তন। [illegible] এই যুক্তি, যেটা কখনোই শক্তিশালী ছিল না যে, মনটাও অবশ্যই সমানভাবে চিরন্তন। কিন্তু এই যুক্তি, যেটা কখনোই শক্তিশালী ছিল না, এটাকে এখন ব্যবহার করা যাবে না। যথেষ্ট কারণ থাকাতে পদার্থবিদগণ পরমাণুকে [illegible] পরম্পরায় পরিণত করেছেন। একই রকম ভালো যুক্তির কারণে মনোবিদ [illegible] দেখছেন যে, একটা মনের একটা একক চলমান 'বস্তু'র পরিচিতি নেই, কিন্তু [illegible] কতিপয় ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে বাঁধা ঘটনার পরম্পরা। অতএব, অমরত্বের প্রশ্নটা [illegible] প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কগুলো একটা জীবন্ত দেহের [illegible] সম্পর্কিত ঘটনাসমূহ এবং অন্যান্য ঘটনাসমূহ যেগুলো ঘটে দেহের মৃত্যুর [illegible] এ দুয়ের মধ্যে বর্তমান থাকে কিনা।

এই প্রশ্নটার উত্তর দেবার আগে, আমাদের প্রথমে অবশ্যই সিদ্ধান্ত [illegible] হবে, সম্পর্কগুলো কী, যা কতিপয় ঘটনাকে একসঙ্গে বেঁধে ফেলে এমনভাবে [illegible] সেগুলো একজন ব্যক্তির মানসিক জীবন গঠন করে। স্পষ্টতই, [illegible] স্মৃতিশক্তিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো : আমি যে-জিনিসগুলো [illegible] করতে পারি, তাই আমার কাছে ঘটেছিল। এবং আমি যদি একটা নির্দিষ্ট [illegible]

স্মরণ করতে পারি, এবং ওই ঘটনায় আমি যদি অন্য কিছু স্মরণ করতে পারতাম, তাহলে অন্য কিছুও আমার ঘটতে পারত। এটা অবশ্যই আপত্তির যে, দু'জন ব্যক্তি একই ঘটনা স্মরণ করতে পারে, কিন্তু সেটা একটা ভুল হবে। কোনো দু'জন ব্যক্তি কখনো যথার্থ একই জিনিস দেখতে পায় না, কারণ এটা ঘটে তাদের অবস্থানের ভিন্নতার জন্য। কখনই তাদের শোনার অথবা ঘ্রাণ নেবার অথবা স্পর্শ করার অথবা স্বাদ নেবার একই অভিজ্ঞতা হতে পারে না। আমার অভিজ্ঞতা অন্য যেকে ব্যক্তির অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য থাকতে পারে। কিন্তু সর্বদা ওই ব্যক্তির অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতার বেশি কিংবা কম পার্থক্য হবেই। প্রতিটি ব্যক্তির অভিজ্ঞতা কেবল তারই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। যখন একটা অভিজ্ঞতা অন্য একটি অভিজ্ঞতাকে স্মরণে আনতে চায়, এই দুটোকে তখন একই ব্যক্তির অভিজ্ঞতা বলে ধরা হয়।

অন্য একটি, কম মনস্তাত্ত্বিক, সংজ্ঞা আছে ব্যক্তিত্বের। ব্যক্তিত্ব এটা লাভ করেছে দেহ থেকে। বিভিন্ন সময়ে একটা জীবন্ত দেহের পরিচিতির সংজ্ঞা জটিল হবে। কিন্তু এই মুহূর্তের জন্য আমরা এটা সুনিশ্চিতভাবে গ্রহণ করব। আমরা এটাও সুনিশ্চিতভাবে গ্রহণ করব যে, আমাদের পরিচিত প্রতিটি 'মানসিক' অভিজ্ঞতা কোনো জীবন্ত দেহের সঙ্গে যুক্ত। আমরা তাহলে একজন 'ব্যক্তি'কে এভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি যে, ব্যক্তি হলো দেহের সঙ্গে সংযুক্ত মানসিক ঘটনাবলীর ক্রম। এটা হলো আইনি সংজ্ঞা। যদি জন্ স্মিথের দেহ একটা খুন সংঘটিত করে, এবং পরে এক সময় পুলিশ জন্ স্মিথের দেহটাকে গ্রেপ্তার করে, তাহলে দেহের মধ্যে বাস-করা ব্যক্তি গ্রেপ্তারের সময় একজন খুনি।

একজন 'ব্যক্তি'কে এই দু'ভাবে সংজ্ঞায়িত করাটা বিরোধ তৈরি করে সেই ক্ষেত্রে যাকে বলা হয় দ্বৈত ব্যক্তিত্ব। এ ধরনের ঘটনায়, বাহ্যিক নিরীক্ষণে একজন ব্যক্তি বিষয়ীগত ভাবে দু'জন ব্যক্তিতে বিভক্ত হয়। কখনও কখনও একজন অন্যজন সম্পর্কে কিছুই জানে না। আবার কখনও কখনও একজন অন্যজনকে জানে। কিন্তু উল্টোটা কখনই নয়। এমন ঘটনায় যেখানে কেউ-ই অন্যজন সম্পর্কে কিছুই জানে না, সেখানে এরা দু'জন ব্যক্তি, যদি স্মৃতিকে সংজ্ঞা হিসাবে ধরা হয়। কিন্তু দেহকে ধরলে এখানে একজনই ব্যক্তি। অন্যমনস্কতা, সম্মোহন এবং স্বপ্নচারিতা প্রকৃতির মাধ্যমে দ্বৈত ব্যক্তিত্বের (চরম মাত্রার) ধাপ রয়েছে। ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা দেবার ব্যাপারে স্মৃতিশক্তিকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে এসব বিষয়গুলো অসুবিধা সৃষ্টি করে। কিন্তু এটা দেখা যায় যে, হারানো স্মৃতি সম্মোহনে পুনরুদ্ধার করা যায়। অথবা এটা করা সম্ভব মনোবিশ্লষণেও। সম্ভবত অসুবিধাটা অলঙ্ঘনীয় নয়।

যথার্থ স্মরণক্ষমতার সঙ্গে অন্যান্য আরও উপাদান, কম-বেশি স্মৃতিশক্তির সাদৃশ্যে, ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রবেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, অভ্যাস, যেটা অভিজ্ঞতার ফল স্বরূপ গঠিত হয়েছে। এর কারণ হলো, যেখানে জীবন সেখানে ঘটনাবলী অভ্যাস তৈরি করতে পারে, একটা 'অভিজ্ঞতা' একটা ঘটনার থেকে পৃথক হয়। একটা প্রাণী, আরও বেশি বলা যায়, একজন মানুষ, এভাবে অভিজ্ঞতার দ্বারা গঠিত। কিন্তু মৃত প্রাণী এভাবে গঠিত হয় না। যদি একটা ঘটনা আকস্মিকভাবে আর একটি ঘটনার সঙ্গে ওই বিশেষভাবে সম্পর্কিত হয়, সে অদ্ভুতভাবে সেটা অভ্যাস গঠনে করতে হয়, তাহলে দুটো ঘটনাই একই ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেবলমাত্র স্মৃতিশক্তির সংজ্ঞার চইতে এটি একটি ব্যাপক সংজ্ঞা। এর মধ্যে স্মৃতিশক্তির সংজ্ঞার সবকিছুই থাকছে। এবং থাকছে আরও অনেক কিছু।

দেহের মৃত্যুর পরেও যদি একটি ব্যক্তিত্বের বেঁচে থাকার ঘটনায় বিশ্বাস রাখি, তাহলে আমাদের অবশ্যই ধরে নিতে হবে যে, স্মৃতিশক্তির ধারাবাহিকতা রয়েছে অথবা অন্তত অভ্যাসের। এর কারণ, অন্যথায় এটা ধরে নেবার কোন যুক্তি থাকে না যে, একই ব্যক্তি চলমান থাকছে। কিন্তু এই ব্যাপারে শারীরতত্ত্ববিদরা অসুবিধা সৃষ্টি করছে। অভ্যাস এবং স্মৃতি দুটোই দেহের ওপর প্রভাবের কারণে। অভ্যাসের গঠনটাকে ছোট নদীর সাদৃশ্যে ভাবা যেতে পারে। এখন দেহের উপর প্রভাব যেটা অভ্যাস এবং স্মৃতিকে সৃষ্টি করে, সেগুলো মৃত্যু এবং অবক্ষয় দ্বারা বিলুপ্ত হয়। এবং এটা বোঝা অসুবিধাজনক যে কীভাবে, রহস্যময়তায়, এরা নতুন দেহে স্থানান্তরিত হতে পারে যাতে ধরে নিতে হয় যে, পরবর্তী জীবনে বাস করা হচ্ছে। যদি আমাদের আত্মাকে অশরীরী করতে হয়, তাহলে শুধু অসুবিধাই বেড়ে যায়। বাস্তবিক, আমি সংশয় প্রকাশ করছি, পদার্থের আধুনিক ধারণা নিয়ে অশরীরী আত্মা যুক্তিগ্রাহ্যভাবে সম্ভব কিনা। পদার্থ হলো ঘটনাবলীতে দলবদ্ধতার একটা সুনিশ্চিত পথ। এই কারণে যেখানে ঘটনা থাকে, সেখানে পাদার্থও থাকে। যেমনটা আমি মনে করি যে, যদি একজন দেহধারী ব্যক্তির গোটা জীবনব্যাপী চলমানতা অভ্যাস গঠনের উপর নির্ভর করে, তাহলে এটা অবশ্যই দেহের চলমানতার উপর নির্ভর করা উচিত। পরিচিতি না হারিয়ে একটা ছোট নদীকে স্বর্গে পৌঁছে দেওয়া যত সহজ, ততটাই সহজ একজন ব্যক্তিকে স্বর্গে স্থানান্তরিত করা।

ব্যক্তিত্ব হলো আবশ্যিকভাবে সংগঠনের একটি বিষয়। কতিপয় ঘটনা যেগুলো কতিপয় সম্পর্ক দিয়ে দলবদ্ধ, এরাই গঠন করে একজন ব্যক্তিকে। এই

ধারাবদ্ধতা কার্য-কারণ বিধির সাহায্যে ফলপ্রসু হয়। সেগুলো অভ্যাস গঠনের সঙ্গে সংযুক্ত, যা স্মৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করে, এবং সংশ্লিষ্ট কার্য-কারণ বিধি দেহের উপর নির্ভর করে। এটা যদি সত্যি হয়, অবশ্য এটা সত্য ভাবার সপক্ষে শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক কারণ রয়েছে। মস্তিষ্কে বিভাজন সত্ত্বেও একজন ব্যক্তিত্বের বেঁচে থাকাটা হলো এমন একটি ব্যাপার, যেখানে একটি ক্রিকেট ক্লাবের সব সদস্য মারা যাবার পরেও ক্লাবটির অস্তিত্ব টিকে থাকার মতো।

আমি এটা দুঃসাহসে বলছি না যে, এই যুক্তিধারা তর্কাতীত। বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ দূরদৃষ্টি করা অসম্ভব, বিশেষত মনোবিদ্যার, যেটা সবেমাত্র বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠছে। এটা হতে পারে যে, মনস্তাত্ত্বিক কার্য-কারণকে এর বর্তমান দেহ-নির্ভরতা থেকে মুক্ত করা যায়। কিন্তু মনোবিদ্যা এবং শারীরবিদ্যার বর্তমান অবস্থায়, অমরত্বে বিশ্বাস, যেভাবেই হোক, বিজ্ঞানের কাছ থেকে কোনো সমর্থন দাবি করতে পারে না। এবং এই বিষয়টা সম্পর্কে যতই সম্ভাব্য যুক্তিসম্ভার হাজির করা হোক না কেন, তা সত্ত্বেও মৃত্যুতে ব্যক্তিত্বের বিলুপ্তিই নির্দেশ করে। এমন চিন্তা আমাদের দুঃখ দিতে পারে যে, আমরা বেঁচে থাকব না, কিন্তু এটা ভাবাও স্বস্তির যে, সমস্ত নির্যাতনকারী, ইহুদি-নির্যাতক এবং প্রতারকরাও চিরকাল বেঁচে থাকবে না। আমাদের বলা হতে পারে যে, ওরা যথাসময়ে উন্নতি করবে, কিন্তু এটাকে আমি সন্দেহ করি।

অধ্যায় ৬

নির্ধারণবাদ

জ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে, বাইবেলে বর্ণিত পবিত্র ইতিহাস এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় গির্জার বিশদ ধর্মতত্ত্বের গুরুত্ব ধর্মমনস্ক পুরুষ এবং নারীদের কাছে আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে। বাইবেল সম্পর্কিত সমালোচনা, অধিকন্তু বিজ্ঞান, বাইবেলের প্রতিটি শব্দকে সত্য বলে বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি করেছে। উদারণস্বরূপ, প্রত্যেকেই এখন জানেন যে, পৃথিবীর সৃজন উপাখ্যানে দু'জন লেখকের দুটো ভিন্ন ও অসঙ্গত সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা রয়েছে। এসব বিষয়গুলো এখন অনাবশ্যক বলে মনে করা হয়। কিন্তু তিনটি কেন্দ্রীয় মতবাদ—ঈশ্বর, অমরত্ব এবং স্বাধীনতা এগুলো খ্রিস্টধর্মের গঠনে গুরুত্বপূর্ণ বলে অনুভূত হয়। যদিও ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে এসব সংশ্লিষ্ট নয়। এই মতবাদগুলো 'প্রাকৃতিক ধর্মের'সঙ্গে যুক্ত। টমাস অ্যাকুইনাস এবং অনেক আধুনিক দার্শনিকদের মতে, উদ্‌ঘাটন তত্ত্ব ছাড়াই, মানবিক যুক্তিতে এসব সত্য বলে প্রমাণ করা যায়। সুতরাং

এই তিনটি মতবাদ নিয়ে বিজ্ঞানের কী বলার আছে এটা অনুসন্ধান করা গুরুত্বপূর্ণ। আমার নিজের বিশ্বাস এই যে, বিজ্ঞান বর্তমানে এটা প্রমাণ করা অপ্রমাণ করতে পারে না এবং বিজ্ঞানের বাইরে এটা প্রমাণ বা অপ্রমাণের কোনো পদ্ধতি নেই। যাই হোক, আমি ভাবছি যে, এসবের সম্ভাবনা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক যুক্তি রয়েছে। এটা স্বাধীনতা এবং এর বিপরীত নির্ধারণবাদ, এ-দুটোকেই এ অধ্যায়ে আমরা বিবেচনা করে দেখব।

নির্ধারণবাদ এবং স্বাধীন ইচ্ছার ইতিহাস নিয়ে এর আগেই বলা হয়েছে। আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি যে, নির্ধারণবাদ তার মিত্র খুঁজে পেয়েছে পদার্থবিজ্ঞানের মধ্যে, যে পদার্থবিজ্ঞান সম্ভবত বস্তুর সমুদয় গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের সূত্র আবিষ্কার করেছে এবং এগুলোকে তাত্ত্বিক পূর্বনির্ধারণযোগ্য করেছে। যথেষ্ট অদ্ভুতভাবে, নির্ধারণবাদের বিরুদ্ধে বর্তমান সময়ে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী যুক্তি পদার্থবিজ্ঞান থেকেই সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু এটা বিবেচনার পূর্বে আসুন আমরা যতটা স্বচ্ছভাবে সম্ভব বিষয়টার সংজ্ঞা নিরূপণ করি।

নির্ধারণবাদের দ্বিবিধ চরিত্র। একদিকে বৈজ্ঞানিক তদন্তকারীদের চালনা করার জন্য এটা একটা বাস্তব সাধারণ নীতি। পক্ষান্তরে, ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতি বিষয়ে এটা একটা সাধারণ মতবাদ। বাস্তব সাধারণ নীতি যুক্তিযুক্ত হতে পারে, এমন কি যদি সাধারণ মতবাদটা অসত্য অথবা অনিশ্চিত হলেও। আমরা সাধারণ নীতি নিয়ে শুরু করে পরে মতবাদের আলোচনায় যাবো।

সাধারণ নীতি মানুষকে উপদেশ দেয় কার্য-কারণ বিধি খুঁজতে। অর্থাৎ এমন বিধি যা এক সময়ের ঘটনার সঙ্গে অন্য সময়ের ঘটনাকে যুক্ত করে। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা এই ধরনের নিয়ম দিয়ে আমাদের আচরণ পরিচালনা করি। কিন্তু যে-নিয়ম আমরা ব্যবহার করি তাতে যথার্থের খরচে সরলতা কিনে নিই। আমি সুইচটা টিপে দিলে ফিউজ-না-হলে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে উঠবে, একটা ম্যাচের কাঠির মাথাটা উবে না গেলে এটার আঘাতে আগুন জ্বলবে, টেলিফোনে এলোমেলো নাম্বার চাইলে, এটি ভুল নাম্বার না হলে, আমি নাম্বারটি পাবো। এই ধরনের নিয়ম বিজ্ঞানের চলবে না, তার চাই অপরিবর্তনীয় নিয়ম। এর আদর্শ নিউটনীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান দ্বারা স্থিরীকৃত হয়েছিল, যেখানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়ম অনিবার্য বিশালতার সময় ধরে অতীত এবং ভবিষ্যতের গ্রহদের হিসাব করা যায়। কক্ষপথের সঙ্গে গ্রহদের সম্পর্কের চেয়ে ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু বা বিষয়ের পরিচালনাজনিত নিয়মের অনুসন্ধান অনেক কঠিন। এর কারণ অন্যত্র নানা ধরনের কারণের জটিলতা এবং ঘটনার পর্যাবৃত্ত সংঘটনের অল্প পরিমাণ

নিয়মনির্দিষ্টতা। তা সত্ত্বেও, রসায়ন বিদ্যা, তড়িৎ-চুম্বক বিজ্ঞান, জীববিদ্যা এমন কি অর্থনীতিতেও কার্য-কারণ নিয়ম আবিষ্কৃত হয়েছে। কার্য-কারণ নিয়মের আবিষ্কার বিজ্ঞানের মর্মবস্তু। সুতরাং এবিষয়ে কোনো সংশয় থাকতে পারে না যে, বিজ্ঞানবিদরা এদের খুঁজতে গিয়ে সঠিক কাজ করেন। যদি এমন কোনো অঞ্চল থাকে, যেখানে কোনো কার্য-কারণ নেই তাহলে সেই অঞ্চলে বিজ্ঞান অপ্রবেশ্য। কিন্তু তত্ত্বকথা হলো এটাই যে, মাশরুম সংগ্রাহকদের মাশরুম সংগ্রহের মতো বিজ্ঞানবিদরা কার্য-কারণের নিয়ম খুঁজে বেড়াবেন।

কার্য-কারণ নিয়মাবলী নিজেদের মধ্যে অতীত দ্বারা ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয়ভাবে সম্পূর্ণ নির্ধারণের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটা একটা কার্য-কারণের নিয়ম যে, শ্বেতকায় মানুষের পুত্ররা শ্বেতকায় হবে। কিন্তু এটাই যদি বংশগতির একমাত্র নিয়ম হয়, তাহলে শ্বেতকায় পিতামাতার সন্তানদের সম্পর্কে আমরা বেশি ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম হবো না। সাধারণ মতবাদ হিসাবে নির্ধারণবাদ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, অতীত দ্বারা ভবিষ্যতের নির্ধারণ তাত্ত্বিকভাবে সব সময় সম্ভব, যদি আমার অতীত এবং কার্য-কারণ নিয়ম সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি। তদন্তকারী কতিপয় ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে এই নীতি অনুযায়ী পূর্বতন আবছা কার্য-কারণ বিধি খুঁজে পেতে সমর্থ হবেন। এই দুটো বিষয় একসাথে ঘটনাটাকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে। এই নিয়মটি আবিষ্কারের পর যখন তিনি একই ধরনের অবস্থা প্রত্যক্ষ করবেন, তিনি তখন সমর্থ হবেন এমন সিদ্ধান্তে পৌছতে যে, অনুরূপ ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে।

এই ধরণের মতবাদ সংক্ষেপে বর্ণনা করা কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। আমরা যখন এটা করতে চেষ্টা করি, আমরা তখন এমন ঘোষণা দেই যে, এটা অথবা ওটা 'তাত্ত্বিকভাবে' সম্ভব এবং কেউ-ই জানেন না 'তাত্ত্বিকভাবে' বলতে কী বোঝায়। এটা বিবৃত করা কোনো পাপের নয় যে, এমন নিয়ম আছে, যা ভবিষ্যতে স্পষ্টতই যা হবার তাই হবে এবং সেই অর্থে এটা ইতোমধ্যে নির্ধারিত। একজন সর্বজ্ঞ ঈশ্বর, যেমনটা গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করেন, তিনি অবশ্যই ভবিষ্যতের সমুদয় গতিবিধি জানবেন। যদি একজন সর্বজ্ঞ ঈশ্বর থাকেন তাহলে একটি বর্তমান ঘটনা, দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাঁর পূর্বজ্ঞান, এটা থেকেই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা যায়। যাই হোক, এটা কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বাইরে থাকে। নির্ধারণবাদের মতবাদকে কোনকিছু ঘোষণা দিতে হলে যা সাক্ষ্য দ্বারা সম্ভাব্য কিংবা অসম্ভাব্য করা যায়, তাহলে সেটা বিবৃত করতে হবে মানবীয় শক্তি সম্পর্কে। অন্যথায় এই ঝুঁকি থেকেই যায় যে আমরা মিল্টনের 'Paradise Lost' ('হৃতস্বর্গ')-এর শয়তানদের বিমূঢ়তার অংশীদার হয়ে পড়ব, যারা--

"দম্ভে বিচারিল নানা মত—
ঈশ্বরীয় বিধি, ভবিষ্যের জ্ঞান, ইচ্ছাবৃত্তি, নিয়তির পাশ
নিয়ন্ত্রণ নিয়তির বা মুক্ত ইচ্ছা, চরম ও অবাধ জ্ঞান ভবিষ্যের—
কিন্তু হায়, পৌঁছিল না কোনও সমাধানে,
চক্রাবর্তে দিগ্‌ভ্রান্ত গোলকধাঁধায়—"

আমাদের যদি একটা মতবাদ থাকে যা পরীক্ষা করতে হবে, তাহলে এটা বলা যথেষ্ট নয় যে, প্রকৃতির গোটা ধারাটাই কার্য-কারণ নিয়মে নির্ধারিত হতে হবে। সেটা সত্য হতে পারে, কিন্তু আবিষ্কার করা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ, কাছে যা আছে তার থেকে যা দূরে আছে তার যদি বেশি প্রভাব থাকে, তাহলে এটা বুঝতে, আমাদের পৃথিবীতে এর প্রভাব কেমন, এটা জানার আগে দূরতম নক্ষত্রদের বিষয়ে জ্ঞান সংগ্রহ করতে হবে। আমরা যদি আমাদের মতবাদ পরীক্ষা করতে পারি, তাহলে আমরা অবশ্যই সমর্থ হবো ব্রহ্মাণ্ডের একটা নির্দিষ্ট অংশ সম্পর্কে বর্ণনা করতে। এক্ষেত্রে নিয়মগুলো আমাদের জন্য অবশ্যই যথেষ্ট সরল হবে যাতে এগুলোর সাহায্যে নির্ণয় করা সম্ভব হয়। আমরা গোটা ব্রহ্মাণ্ডটা জানতে পারি না এবং আমরা নিয়মগুলোকে পরীক্ষা করতে পারি না কারণ নিয়মগুলো এত জটিল যে, এমন পরীক্ষার ফলাফল জানার ব্যাপারে আমাদের আশানুরূপ দক্ষতার চেয়ে অনেক বেশি দক্ষতা থাকতে হয়। গণনার যে-ক্ষমতা প্রয়োজন হবে সেটা বর্তমান ক্ষমতার থেকে বেশি, কিন্তু ভবিষ্যতে যে-ক্ষমতা অর্জিত হবে তার চেয়ে বেশি নয়। এই বিষয়টা খুবই স্পষ্ট কিন্তু আমাদের নীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে অধিকতর অসুবিধাজনক। কারণ আমাদের তথ্যাবলী ব্রহ্মাণ্ডের একটা নির্দিষ্ট অংশে সীমাবদ্ধ। এই অংশের বাইরে থেকে বস্তুসমূহ এখানে ঢুকে পড়তে পারে এবং অপ্রত্যাশিত ফল হতে পারে। কখনও কখনও একটা নতুন নক্ষত্র আকাশে দেখা যায় এবং এই উপস্থিতি সৌরজগৎ সম্পর্কে সীমাবদ্ধ তথ্য থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। যেহেতু কোনো কিছুই আলোর গতি থেকে বেশি গতিতে চলে না, ফলে এমন কোনো পথ নেই যার সাহায্যে আমরা অগ্রিম বার্তা পাবো যে, একটা নতুন নক্ষত্র আকাশে উদিত হতে যাচ্ছে।

নিম্নবর্ণিত উপায়ে আমরা এই অসুবিধা থেকে বেরিয়ে আসতে পারি। এটা বলা যাক যে, কোনো একটা গোলকের মধ্যে ১৯৩৬ সালের শুরু থেকে যা যা ঘটে চলেছে সে- সব কিছুই আমরা জানি এবং আমরা এই গোলকের কেন্দ্রে অবস্থান করছি। যথার্থতার জন্য আমরা ধরে নেবো, গোলকটা এত বড় যে, এর পরিধি থেকে কেন্দ্রে আসতে আলোকের ঠিক এক বছর লাগে। যেহেতু কোনো কিছুই আলোর

থেকে দ্রুত চলে না, তাহলে, ১৯৩৬ সালে গোলকের কেন্দ্রে যা কিছু ঘটেছে তা অবশ্যই, যদি নির্ধারণবাদ সত্য হয়, বছরের শুরুতে গোলকের মধ্যে থাকা সবকিছুর ওপর নির্ভরশীল। এর কারণ কেন্দ্রে যে-কোনো প্রভাব ফেলতে আরও দূরের জিনিস এক বছরের চেয়ে বেশি সময় নেবে। বছর শেষ না হলে, আমরা সত্যি সত্যি সমস্ত অনুমিত তথ্য পাবো না। কারণ পরিধি থেকে আমাদের কাছে আলো পৌঁছতে ওই সময় দৈর্ঘ্য প্রয়োজন হবে। কিন্তু বছরটি শেষ হলে আমরা অতীত সম্পর্কে চিন্তাশীল হয়ে অনুসন্ধান করতে পারি যে, পরিচিত কার্য-কারণ নিয়মসহ যে-তথ্যাদি আমরা এখন পেলাম এসব ওই-বছরে-ঘটা সব কিছু কি না।

আমরা এখন নির্ধারণবাদের প্রকল্পটা বর্ণনা করতে পারি যদিও এই ঘোষণাটা বেশ জটিল। প্রকল্পটা এইরূপ : *আবিষ্কারযোগ্য কার্য-কারণ নিয়ম আছে যেমন, গণনার জন্য যথেষ্ট ক্ষমতা (কিন্তু অতিমানবীয় নয়) দেওয়া হলো একজন মানুষকে যিনি একটি নির্দিষ্ট গোলকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে যা কিছু ঘটছে সে-সব জানেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন যে, ওই সময়ে গোলকের কেন্দ্রে কী ঘটবে, যখন আলো পরিধি থেকে গোলকের কেন্দ্রে পৌঁছয়।*

আমি চাই যে, আমার বক্তব্যকে পরিষ্কারভাবে বোঝা হোক। আমি এটা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছি না যে, এই নীতিটা সত্য। নির্ধারণবাদ বলতে কী বোঝায়, আমি কেবল এটাই বিবৃত করছি, যদি এর পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো সাক্ষ্য থাকে। আমি জানি না নীতিটা ঠিক কি না, এবং অন্য কেউ এর বেশি জানেন না। এটাকে একটা আদর্শ হিসাবে ধরা যায় যেটাকে বিজ্ঞান তার সামনে রেখেছে, কিন্তু অবরোহী পদ্ধতির কারণ ছাড়া এটাকে নিশ্চিত সত্য কিংবা নিশ্চিত মিথ্যা বলে বিবেচনা করা যাবে না। সম্ভবত, নির্ধারণবাদের পক্ষে এবং বিপক্ষের যুক্তিগুলো যখন আমরা পরীক্ষা করতে চাই তখন দেখব যে, মানুষের মনে যেটা ছিল সেটা আমরা যে-নীতিতে পৌঁছেছি তা থেকে কিছুটা কম নির্দিষ্ট।

ইতিহাসে এই প্রথম বিজ্ঞানবিদদের দ্বারা বৈজ্ঞানিক কারণে নির্ধারণবাদ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার নতুন পদ্ধতিতে পরমাণু সম্পর্কে অধ্যয়নের মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জটা এসেছে। এই আক্রমণের নেতা ছিলেন স্যার আর্থার এডিংটন। যদিও কতিপয় সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ (যেমন, আইনস্টাইন) এই ব্যাপারে এডিংটনের ধারণার সঙ্গে একমত নন। তবুও বলব তাঁর যুক্তি শক্তিশালী এবং খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে এই মতবাদটাকে যতদূর সম্ভব পরীক্ষা করা উচিত।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যা অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে একটা পরমাণু কী করবে তা জানা যায় না। এক্ষেত্রে এর কাছে নির্দিষ্ট বিকল্প খোলা রয়েছে এবং

এটা কখনও একটা, কখনও অন্যটা পছন্দ করে। আমরা জানি ঘটনার কোন্ অনুপাতে একটা পছন্দ হবে, কোন্ অনুপাতে দ্বিতীয়টি অথবা তৃতীয়টি প্রভৃতি। কিন্তু একটা বিশেষ-দৃষ্টান্তে পছন্দ নির্ধারণের কোনো নিয়ম আমরা জানি না। পেডিংটনের একজন বুকিং অফিস ক্লার্কের মতোই আমাদের একই অবস্থা, যিনি চাইলে এটা আবিষ্কার করতে পারেন কত সংখ্যক যাত্রী তাঁর ওই স্টেশন থেকে বারমিংহামে যাবে, কত সংখ্যক একসিটারে যাবে প্রভৃতি। কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত কারণটা জানেন না যে-কারণে একটা ক্ষেত্রে একটা পছন্দ, অন্য ক্ষেত্রে অন্যটা। এইসব ঘটনাগুলো, যাই হোক, পুরোপুরি সাদৃশ্যমূলক নয়। এর কারণ বুকিং অফিস ক্লার্কের পেশাগত সময়ের বাইরে নিজস্ব সময় রয়েছে। সে-সময়ে তিনি মানুষ সম্পর্কিত অন্য বিষয় দেখাতে পারেন যাতে কেউ তাকে বলবে না কখন তারা টিকিট সংরক্ষণ করবে। পদার্থবিদের এ-ধরনের কোনো সুযোগ নেই কারণ তাঁর পেশাগত সময়ের বাইরে তাঁর কোনো সুযোগই থাকছে না পরমাণু প্রত্যক্ষ করার। তিনি যখন তাঁর গবেষণাগারে থাকেন না তখন তিনি কেবল অনেক মিলিয়ন পরমাণু গঠিত বৃহৎ ভর কী কাজ করে এটাই তিনি প্রত্যক্ষ করতে পারেন। এবং তাঁর গবেষণাগারে পরমাণুগুলো ট্রেন ছাড়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে দ্রুত টিকিট কাটা যাত্রীদের তুলনায় আদৌ বেশি উন্মুখ নয়। বিজ্ঞানীর জ্ঞান বুকিং অফিস ক্লার্কের মতোই হত, যদি ওই ক্লার্ক তাঁর অফিস ডিউটির সময়ের বাইরে শুধু ঘুমিয়ে কাটাতেন।

এ পর্যন্ত এটা দেখা হলো যে, পরমাণুর আচরণ থেকে প্রাপ্ত নির্ধারণবাদের বিরুদ্ধে যুক্তিটা পুরোপুরি আমাদের বর্তমান অজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল এবং একটি নতুন নিয়ম আবিষ্কৃত হলে আগামীকালই এটি বাতিল হতে পারে। একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত এটা সত্য। পরমাণু সম্পর্কিত আমাদের জ্ঞান সাম্প্রতিক সময়ের। এবং এটা ধরে নেবার অবশ্যই কারণ রয়েছে যে, এটা বাড়বে। কেউ এটা অস্বীকার করতে পারে না যে, এমন নিয়ম আবিষ্কৃত হতে পারে সেটা আমাদের বলবে কেন পরমাণু একটা ঘটনায় একটা সম্ভাবনা পছন্দ করে এবং অন্য ঘটনায় অন্যটি। বর্তমানে আমরা দুটো বিভিন্ন পছন্দের কার্যনির্ণয়াত্মকের প্রাসঙ্গিক পার্থক্য জানি না, কিন্তু একদিন এই ধরনের পার্থক্য জানা যাবে। আমাদের যদি নির্ধারণবাদে বিশ্বাস করার শক্তিশালী কোনো কারণ থাকে তাহলে এই যুক্তির খুবই গুরুত্ব রয়েছে।

পারমাণবিক খেয়ালের আধুনিক মতবাদে দুর্ভাগ্যবশত নির্ধারণবাদীদের জন্য আরও একটি পদক্ষেপ রয়েছে। আমাদের ছিল—কিংবা আমরা এমনটা

করেছিলাম— সাধারণ পদার্থবিজ্ঞান থেকে সাক্ষ্যের একটা বিশাল ভর যেটা এটা প্রমাণ করতে চায় যে, বস্তু সর্বদা নিয়ম অনুসারে চলতে চায় যে-নিয়মসমূহ সম্পূর্ণভাবে তারা কী করবে সেসব নির্ধারণ করে। এখন এটা মনে হয় যে, এইসব নিয়মগুলো কেবলমাত্র পরিসংখ্যানগত। সম্ভাবনাসমূহের মধ্য থেকে কতক অনুপাতে পরমাণু পছন্দ করে এবং সেগুলো এত বেশি সংখ্যক যে, পুরোনো পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যক্ষ করা বিশাল বস্তুনিচয়ের ফলাফলের পরিপূর্ণ পর্যায়বৃত্তির একটা দৃষ্টিগোচরতা রয়েছে। ধরুন, আপনি একটি দৈত্য ছিলেন, যিনি ব্যক্তিমানুষ হিসাবে এটা দেখতে পেতেন না, এবং কখনও এক মিলিয়ন মানুষের সমষ্টিবদ্ধতার কম হলে আপনি তা বুঝতেন না।

আপনি এটা দেখতে সমর্থ হবেন যে, লন্ডনে রাতের থেকে দিনে বেশি বস্তু থাকে, কিন্তু আপনি এই ঘটনা সম্পর্কে সম্ভবত অবহিত হতে পারবেন না যে, একটা নির্দিষ্ট দিনে, মি. ডিক্‌সন অসুস্থ হয়ে বিছানায় ছিলেন এবং তিনি তাঁর দৈনন্দিন ট্রেনে চাপেননি। সুতরাং আপনি বিশ্বাস করবেন যে, সকালে বস্তুনিচয়ের লন্ডনে আসা এবং সন্ধ্যায় এসব বেরিয়ে যাওয়া এর থেকে একটা অধিকতর নিয়মিত বিষয় হবে। আপানি নিঃসন্দেহে এটাতে সূর্যের একটা অদ্ভুত শক্তি আরোপ করবেন। এটা এমন একটা প্রকল্প যেটি পর্যবেক্ষণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে সে, কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় গতিবিধি ব্যাহত হয়। পরে আপনি যদি ব্যক্তি মানুষদের পর্যবেক্ষণ করেন, আপনি দেখতে পাবেন আপনি যতটা ধরে নিয়েছিলেন, নিয়মনির্দিষ্টতা তার থেকে কম। একদিন মি. ডিক্‌সন অসুস্থ, একদিন মি. সিম্‌সন, এতে কিন্তু পরিসংখ্যানগত গড় প্রভাবিত হলো না এবং বড় মাপের পর্যবেক্ষণে কোনো তফাৎ নেই। আপনি দেখবেন যে, সমুদয় নিয়মনির্দিষ্টতা যেগুলো আপনি আগে পর্যবেক্ষণ করেছেন সেগুলো বৃহৎ সংখ্যার পরিসংখ্যান নিয়মের জন্য দায়ী হতে পারে; এটা না ধরে নিয়েও যে, মি. ডিক্‌সন এবং মি. সিমসনের খেয়ালের বাইরে অন্য কোনো কারণ রয়েছে। সকালে লন্ডনে যাবার ক্ষেত্রে অনিয়মিত ব্যর্থতার এটা যথার্থভাবে এমন একটা অবস্থা, যে-অবস্থায় পরমাণু নিয়েও পদার্থবিজ্ঞান পৌছবে। এটা এমন কোনো নিয়ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ জানে না, যেটা পুরোপুরি তাদের আচরণ নির্ধারণ করে এবং পরিসংখ্যানজাত নিয়মসমূহ যেগুলো এটা আবিষ্কার করেছে, সেগুলোই বৃহৎ বস্তুনিচয়ের গতির পর্যবেক্ষণজাত পর্যাবৃত্তের জন্য যথেষ্ট। যেহেতু নির্ধারণবাদের বিষয়টা এসবের উপর নির্ভরশীল, তাই মনে হয় এগুলো ভেঙে পড়েছে। খেয়ালের বাইরে অন্য কোনো কারণ রয়েছে।

এই যুক্তির জন্য নির্ধারণবাদীরা দুটো ভিন্ন উপায়ে এর উত্তর দিতে পারেন করতে পারেন। তিনি এই যুক্তি দিতে পারেন যে, অতীতে যে-সব ঘটনা কোনো নিয়মের অধীন বলে মনে হয়নি, পরে দেখা গেছে এরা কতিপয় নিয়ম অনুসরণ করছে। এবং যেখানে এটা এখনও ঘটেনি সেখানে বিষয়বস্তুর প্রতিটি একটা পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। যদি, যেমনটা অনেক দার্শনিক বিশ্বাস করেছেন যে, আইনের রাজত্বে বিশ্বাস করার অবরোহী কারণ রয়েছে, এটা খুব ভালো যুক্তি হবে। কিন্তু এমন কোনো কারণ যদি না থাকে, তাহলে যুক্তিটা খুব কার্যকরী পাল্টা জবাবের মুখে পড়বে। পৃথক পরমাণুর কাজে নিয়মনির্দিষ্টতা প্রয়োজনীয়তা ধরে না নিয়েই বড় ধরনের ঘটনাসমূহের নিয়মনির্দিষ্টতা সম্ভাব্য নিয়ম থেকে বেরিয়ে আসে। পৃথক পরমাণু সম্পর্কে কোয়ান্টাম তত্ত্ব যা ধরে নেয় সেটা হলো সম্ভাবনার নিয়ম। এই সম্ভাবনার নিয়মটা—পরমাণুর প্রতি জোড়া সম্ভাব্য পছন্দ, একটার এক জ্ঞাত সম্ভাবনা, দ্বিতীয় একটার জ্ঞান সম্ভাবনা প্রভৃতি। সম্ভাবনার এই নিয়ম থেকে এটা সিদ্ধান্ত করা যায় যে, বৃহৎ বস্তুনিচয় ঐতিহ্যগত বলবিদ্যা বিশেষজ্ঞের মতে আচরণে প্রায় নিশ্চিত। সুতরাং বৃহৎ বস্তুনিচয়ের পর্যবেক্ষণজাত পর্যায়বৃত্ত এবং প্রায় সদৃশ, এবং পৃথক পরমাণুর কাজকর্মে যথাযথ পর্যাবৃত্তের প্রত্যাশার জন্য কোনো আরোহ-প্রণালীনির্ভর কারণ প্রদান করে না।

দ্বিতীয় উত্তর যেটা নির্ধারণবাদীরা দেবার চেষ্টা করতে পারেন সেটা আরো কঠিন। এবং এখনও এর বৈধতা নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য। তিনি বলতে পারেন আপনি স্বীকার করছেন যে, আপনি যদি আপাত সদৃশ পরিস্থিতিতে সদৃশ পরমাণুর বৃহৎ সংখ্যক পছন্দকে পর্যবেক্ষণ করেন, তাহলে পুনরাবৃত্তির মধ্যে নিয়মনির্দিষ্টতা দেখবেন যার সাহায্যে তারা নানাবিধ সম্ভাব্য পরিবর্তন ঘটায়। পুরুষ এবং মেয়ে সন্তান জন্মের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা একই রকম। আমরা জানি না যে, একটা নির্দিষ্ট জন্মের ঘটনাটা পুরুষ কিংবা মেয়ে কিন্তু আমরা এটা জানি যে, গ্রেট ব্রিটেনে প্রায় ২১ জন পুরুষ সন্তানের জন্মের সমানুপাতে ২০টি মেয়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এভাবে গোটা জনগণের মধ্যে যৌনহারের নিয়মনির্দিষ্টতা রয়েছে, যদিও এটা প্রয়োজনীয়ভাবে একটা পরিবারের ক্ষেত্রে নয়। এখন পুরুষ ও মেয়ে জন্মের ক্ষেত্রে প্রত্যেকে বিশ্বাস করেন যে, প্রতিটি পৃথকক্ষেত্রে যৌনতা বিষয়টা নির্ধারণের কারণ রয়েছে। আমরা মনে করি যে, পরিসংখ্যানগত নিয়ম যা ২১ এবং ২০ অনুপাত জানিয়ে দেয়, এটা অবশ্যই নিয়মের পরিণতি যেটা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ঠিক এভাবেই, এটা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে যেখানে বৃহৎ সংখ্যক পরমাণু সংশ্লিষ্ট, সেখানে এটার অবশ্যই এমন নিয়ম থাকা

নিয়ম প্রতিটি পৃথক পরমাণু কী করবে সেটা নির্ধারণ করবে। যদি এমন কোনো নিয়ম না থাকে, নির্ধারণবাদীরা যুক্তি দেবেন যে, সেক্ষেত্রে কোনো পরিসংখ্যানগত নিয়মও নেই।

এই যুক্তির দ্বারা যে-প্রশ্ন উত্থাপিত হয় সেটা হলো, পরমাণুর সঙ্গে এর কোনো প্রাসঙ্গিক সংযোগ নেই এবং এটা বিবেচনা করে আমরা আমাদের মন থেকে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সমস্ত জটিল বিষয়গুলোকে বাতিল করতে পারি। এর পরিবর্তে আমরা একটা পেনি উৎক্ষেপণের পরিচিত বিষয়টা করে দেখতে পারি। আমরা সুনিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি যে, এই পেনির ঘূর্ণনটা বলবিদ্যা নিয়ন্ত্রিত। এবং আমাদের ধারণায় 'হেড' পরবে না 'টেইল' পরবে সেটা 'চান্স' ঠিক করে দেয় না। কিন্তু একটা বিশেষ ক্ষেত্রে কোনটা ঘটবে এই গণনাটা আমাদের পক্ষে খুবই জটিল। এটা বলা হয় (যদিও আমি কখনও কোনো ভালো পরীক্ষণজাত প্রমাণ পাইনি) যে, যদি আপনি একটি পেনিকে অনেকবার উৎক্ষেপণ করেন, তাহলে হেড বা টেইল প্রায় সমসংখ্যকবার দেখা যাবে। অধিকন্তু আরও বলা হয় যে, এটা কিন্তু নিশ্চিত নয়, কেবলমাত্র প্রবলভাবে সম্ভব। আপনি পর পর দশবার পেনিটি উৎক্ষেপণ করতে পারেন এবং প্রত্যেক বারই 'হেড' দেখা যেতে পারে। দশটি উৎক্ষেপণের ১,০২৪ পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে মাত্র একবার ঘটলেও এটা কোন বিস্ময়কর ঘটনা নয়। কিন্তু আপনি যদি বৃহত্তর সংখ্যায় পৌঁছন, তাহলে 'হেড' এর ক্রমাগত ঘটনের বিরলতা অনেক বেড়ে যাবে। আপনি যদি পেনিটাকে ১০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ বার উৎক্ষেপণ করেন, সেক্ষেত্রে আপনি ভাগ্যবান হবেন, যদি আপনি হেডের চলমান ১০০ সিরিজ পান। কিন্তু অভিজ্ঞতালব্ধভাবে এটা পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে জীবনটা বড়োই সংক্ষিপ্ত।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যা আবিষ্কারের বহু পূর্ব থেকে পরিসংখ্যানগত নিয়ম পদার্থবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটা গ্যাস অণুগুলোর বিপুল সংখ্যা নিয়ে সমস্ত দিকেই বিভিন্ন গতিসহ যদৃচ্ছভাবে ঘুরছে। এই গতি বেশি হলে গ্যাসটি গরম হয়, এই গতি কম হলে গ্যাসটি ঠাণ্ডা হয়। যদি অণুগুলো স্থির দাঁড়িয়ে থাকলে, গ্যাসটির উত্তাপ নিরঙ্কুশ শূন্য। এই ঘটনার কারণে অণুগুলো সর্বক্ষণ একটি অন্যটির মধ্যে লাফিয়ে পড়ছে, যেগুলো ধীরে যাচ্ছে যেগুলোর গতি বেড়ে যাচ্ছে। এই কারণে বিভিন্ন উত্তাপের দুটো গ্যাস পরস্পর স্পর্শে এলে, ঠাণ্ডা গ্যাসটি গরম হয় এবং গরম গ্যাসটি ঠাণ্ডা হয়, যতক্ষণ না গ্যাসদুটো একই উত্তাপে পৌঁছয়। কিন্তু এই সবকিছুই কেবলমাত্র সম্ভাব্য। আগে থেকেই এক রকম উত্তাপ-থাকা একটা কক্ষে সমস্ত দ্রুত গতিসম্পন্ন কণা একদিকে

জড়ো হয় এবং সমুদয় ধীর গতিসম্পন্ন কণা জড়ো হয় অন্য দিকে। কোনো বাহ্যিক কোনো কারণ ছাড়া কক্ষের একটা দিক ঠাণ্ডা হবে এবং অন্য দিক গরম হবে। এমনকি এমনটাও ঘটতে পারে যে, সমস্ত বাতাস কক্ষটির অর্ধাংশে এবং বাকি অর্ধাংশ বায়ুশূন্য থাকবে। ১০০ 'হেড' চলমানতা থেকে প্রবলভাবেই অসম্ভব কারণ অণুগুলির সংখ্যা অনেক বেশি, কিন্তু সঠিকভাবে গেলে এটা অসম্ভব নয়।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় যেটা নতুন, সেটা পরিসংখ্যানবিষয়ক নিয়মের নয়, পৃথক ঘটনাকে পরিচালিত করার নিয়মের পরিবর্তে তারা চরম। এটা খুবই কঠিন ধারণা। আমার মতে এর সমর্থকরা যা বোঝেন তার চেয়েও বা এটা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে, একটা পরমাণু যে-সব বিভিন্ন কাজ করতে সেটা প্রত্যেকটা কাজ করে ক্ষেত্রগুলোর একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে। কিন্তু একক পরমাণু যদি নিয়মহীন হয়, তাহলে বিপুল সংখ্যা সম্পর্কে নিয়মনির্দিষ্টতা কি থাকবে? কেউ তো ধরে নিতেই পারেন যে, এমন কিছু থাকবে যা বিরল রূপান্তরকে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল তোলে। আমরা একটা উপমা দিতে পারি যা সত্যি সত্যি এসবের কাছাকাছি একটা স্নানের ঢাকা-দেওয়া জলাশয়ে যে-কেউ সিঁড়ি খুঁজে পাবেন, যা প্রতি ডুবুরিকে তাঁর পছন্দের চাইতে পৃথক যে-কোনো উচ্চতা থেকে তাকে ডুব দিতে সক্ষম করবে। সিঁড়ির ধাপগুলো যদি অনেক উচ্চতায় পৌঁছে যায়, তো একমাত্র ব্যতিক্রমী কৃতিত্বের ডুবুরিয়া সর্বোচ্চ ধাপটাই বেছে নেবেন। আপনি সাঁতারের একটা সেসন থেকে অন্য সেসনের তুলনা করেন তাহলে যাঁরা উচ্চ ধাপ পছন্দ করেন, এমন ডুবুরিদের অনুপাতের মধ্যে মাঝারি মাত্রার নিয়মনির্দিষ্টতা দেখা যাবে। এবং বিলিয়ন সংখ্যক ডুবুরিদের অনুপাতেও মাঝারি ধরনের নিয়মনিষ্টতা দেখা যাবে। এবং বিলিয়ন সংখ্যক ডুবুরি আমরা এটা ধরে নিতে পারি যে, নিয়মনির্দিষ্টতা বেশি হবে। কিন্তু এটা কঠিন, কেন এই নিয়মনির্দিষ্টতা থাকবে যদি প্রত্যেক ডুবুরির পছন্দের অভিপ্রায় থাকে। এটা মনে হবে, কিছু মানুষ সঠিক অনুপাত বজায় রাখতে উচ্চ ডুব পছন্দ করবে। কিন্তু সেটা আর বিশুদ্ধ খেয়াল বলে প্রতিপন্ন হবে না।

যৌক্তিক এবং গাণিতিকভাবে সম্ভাবনা তত্ত্ব খুবই অসন্তোষজনক মনে রয়েছে। আমি বিশ্বাস করি না যে, এমন কোনো অ্যালকেমি আছে যার সাহায্যে এটা প্রতিটি পৃথক ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ খেয়াল থেকে বৃহৎ সংখ্যায় নিয়মনিষ্ঠতা উৎপাদন করতে পারে। যদি পেনিটা খেয়ালের দ্বারা পছন্দ করে যে, 'হেড' না 'টেইল' হবে, সেক্ষেত্রে এটা বলার কোনো কারণ আছে কি যে, এটা ন

একটা' অতপর 'অন্যটা' পছন্দ করবে? খেয়ালটা কি সর্বদা একই পছন্দের দিকে ঠেলে দেবে না? এটা মত ছাড়া এটা আর কিছুই নয়, কারণ কর্তৃত্বব্যঞ্জক ঘোষণার পক্ষে এটা খুবই অস্পষ্ট। কিন্তু এর যদি কোনো বৈধতাও থাকে, তাহলেও আমরা এই ধারণাটা গ্রহণ করতে পারি না যে, পৃথিবীর চরম নিয়মনির্দিষ্টতাকে অনেক সংখ্যক ঘটনা বিবেচনায় রাখতে হবে। এবং আমাদের এটা ধরে নিতেই হবে যে, পরমাণবিক আচরণের পরিসংখ্যানগত নিয়ম এপর্যন্ত অনাবিষ্কৃত ব্যক্তিগত আচরণের নিয়ম থেকে সিদ্ধান্তমূলক। পরমাণুর স্বাধীনতা থেকে, এটাকে একটা ঘটনা হিসাবে ধরে নিয়ে, আবেগগত ঐকমত্যের সিদ্ধান্তে পৌছানোর উদ্দেশ্যে, এডিংটন বাধ্য হয়েছেন একটা অনুমান করতে, যেটা এই মুহূর্তে কেবল একটা সংকল্প ছাড়া কিছু নয়। তিনি চাইছেন মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকে সুরক্ষিত করতে পারে, যদি এর কোনো গুরুত্ব থাকে, অবশ্যই থাকতে হবে বড়সড়ো বস্তুগত চলাচল ঘটানোর ক্ষমতা। এই ক্ষমতা বড়সড়ো বলবিদ্যার নিয়ম থেকে উদ্ভূত হবে না। আমরা যেমনটা দেখেছি, পরমাণুর নতুন তত্ত্বের দ্বারা বড়মাপের বলবিদ্যার নিয়ম অপরিবর্তনীয়। একমাত্র পার্থক্যটা হলো এরা এখন নিশ্চয়তার চেয়ে প্রবল সম্ভাবনার বর্ণনা করে। এটা অনুমান করা সম্ভব, এইসব সম্ভাবনা কতিপয় অদ্ভুত ধরনের অস্থায়িত্ব ছাড়া প্রতিরোধ্য হয়ে, এই কারণে একটা খুবই কম শক্তি একটা খুব বেশি প্রভাব তৈরি করতে পারে। এডিংটন কল্পনা করেন এই ধারনের অস্থায়িত্ব জীবন্ত বস্তুর মধ্যেও থাকতে পারে এবং বিশেষভাবে থাকতে পারে মস্তিষ্কে। বাছাই করার একটা কাজ একটা পরমাণুকে এমন পছন্দের দিকে চালিত করতে পারে যেটা কতিপয় সূক্ষ্ম ভারসাম্যকে বিঘ্নিত করতে পারে এবং বড়ো ধরনের ফলাফল তৈরি করতে পারে অর্থাৎ 'অন্যটির পরিবর্তে 'একটি। এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, এটা অবশ্যই সম্ভব কিন্তু সেটাই হলো সর্বোচ্চ যা স্বীকার করা যায়। এটাও একটা সম্ভাবনা এবং আমার কাছে অধিকতর বেশি একটা সম্ভাবনা যে, নতুন নিয়ম আবিষ্কৃত হবে যেটা পরমাণুর ধরে নেওয়া স্বাধীনতা বিলোপ করবে। ধরা যাক, পরমাণুর স্বাধীনতা মঞ্জুর করা হলো, এমন কোনো পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ নেই যে, মানুষের শরীরের বড়ো ধরনের সচলতা গড় নির্মাণের প্রক্রিয়া থেকে দায়মুক্ত। এটাই ঐতিহ্যগত বলবিদ্যাতে অন্যান্য আকারের বস্তুনিচয়ের চলমানতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এডিংটন মানুষের ইচ্ছাকে পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে পুনর্মিলিত করতে চান। সুতরাং, যদিও এটা মজাদার এবং (বর্তমানে) কঠোরভাবে খণ্ডনযোগ্য। আমর কাছে এটা পর্যাপ্ত পরিমাণে ন্যায়সঙ্গত মনে হয় না, যে-বিষয়টা কোয়ান্টাম বলবিদ্যার পূর্বে এসেছে সেটার তত্ত্বে একটা পরিবর্তনের দাবি তোলা।

মনস্তত্ত্ব এবং শারীরবিদ্যা, যতদূর এই দুটো স্বাধীন ইচ্ছার প্রশ্নের [illegible] সম্পর্কিত, এটাকে অসম্ভব করে তুলতে চায়। অন্ত্রের রসক্ষরণ, মস্তিষ্কের [illegible] অংশের কার্যাবলী সম্পর্কে বর্ধিত জ্ঞান, পাভলভের শর্তাধীন প্রতিবর্ত [illegible] অনুসন্ধান এবং অবরুদ্ধ স্মৃতি এবং ইচ্ছার ফলাফলের মনঃসমীক্ষণগত [illegible] সম্পর্কিত কাজসমূহ মিলিতভাবে মানসিক ব্যাপারসমূহ নিয়ন্ত্রণে কার্য-[illegible] নিয়মের আবিষ্কারে অবদান রেখেছে। এগুলোর কোনোটাই অবশ্য স্বাধীন [illegible] সম্ভাবনাকে অপ্রমাণিত করেনি কিন্তু এগুলো এটাকে উচ্চ সম্ভাবনাময় করেছে, [illegible] অঘটিত ইচ্ছাশক্তি ঘটে যায়, সেগুলো খুবই বিরল।

আবেগগত গুরুত্ব যাকে স্বাধীন ইচ্ছা বলে ধরে নেওয়া হয়, সেটা [illegible] মতে প্রধানত কতিপয় চিন্তার বিভ্রান্তির উপর নির্ভর করে। মানুষ অনুমান [illegible] যে, যদি ইচ্ছাশক্তির কারণ থাকে, তারা এমন সব কাজ করতে বাধ্য হয় যা [illegible] করতে চায় না। এটা অবশ্যই একটি ভুল। ইচ্ছাটা হলো কাজের কারণ, এমনকি [illegible] যদিও ইচ্ছার নিজস্ব কারণ রয়েছে। আমরা যা করব না তা আমরা করতে [illegible] না, কিন্তু এই সীমাবদ্ধতার অভিযোগ জানানো অযৌক্তিক মনে হয়। আমাদের [illegible] ইচ্ছাগুলোকে ব্যাহত করা অসন্তোষজনক। কিন্তু এটা না ঘটার থেকে [illegible] সম্ভাবনা অধিক। নির্ধারণবাদও এই আবেগ প্রতিপন্ন করে না যে, আমরা [illegible] ক্ষমতাহীন। ক্ষমতার বাঞ্ছিত ফলাফল থাকতে হয়। এবং আমাদের অভিপ্রায়ের [illegible] কারণ আবিষ্কারের দ্বারা এটা বাড়ে না কিংবা কমে না।

স্বাধীন ইচ্ছায় বিশ্বাসীরা, অন্য মানসিক স্তরে থেকে, একই সঙ্গে বিশ্বাস [illegible] যে, ইচ্ছাশক্তির কারণ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাঁরা ভাবেন যে, সদাচার [illegible] মধ্যে বদ্ধমূল করে দেওয়া যায় ভালোভাবে প্রতিপালন করে এবং ধর্মীয় [illegible] নীতিশিক্ষার ক্ষেত্রে হিতকারী। এঁদের বিশ্বাস, সুসমাচার কল্যাণ করে, [illegible] নৈতিক প্রেরণা বা পরামর্শ কল্যাণকর। এখন এটা স্পষ্ট যে, যদি ধর্মাচার্য [illegible] ইচ্ছাশক্তি স্বয়ংসৃষ্ট হয়, তাহলে এটা বিকাশে আমরা কিছুই করতে পারি না। যে [illegible] পরিমাণ একটা মানুষ বিশ্বাস করে যে, অন্যের মধ্যে বাঞ্ছিত আচরণ বিকাশ [illegible] করা তাঁর ক্ষমতার মধ্যে কিংবা যে-কোনো মানুষের ক্ষমতাধীন, ঠিক [illegible] পরিমাণে তিনি, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিতে নয়, মনস্তাত্ত্বিক কার্যকরণে বিশ্বাস [illegible] বাস্তবে, একজনের সঙ্গে অন্যজনের সামগ্রিক আদান-প্রদান এই ধারণার [illegible] নির্ভরশীল যে, মানুষের কাজ পূর্ববর্তী অবস্থাবিশেষের উপর নির্ভর। রাজনৈতিক [illegible] প্রচার, ফৌজদারি আইন, এটা-কিংবা-সেটা কাজের ধারা নির্দেশ করে বই [illegible] এ সবকিছুই তাদের যথার্থ উদ্দেশ্য হারাবে যদি মানুষ যা কিছু করে তার [illegible] এসবের কোনো প্রভাব না থাকে। যারা এইমত পোষণ করেন, তাঁরা স্বাধীন [illegible]

মতবাদের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পারেন না। আমরা প্রশ্ন করি, 'আপনি এটা কেন করলেন?' এবং উত্তর আশা করি যে, উত্তরদাতা যে-কারণে কাজটি করবেন সেটার বিশ্বাস এবং অভিপ্রায়ের কারণ জানাবেন। যখন একজন নিজেই জানেন না, তিনি যা করলেন তা কেন করলেন, তখন আমরা একটা কারণের জন্য তাঁর অচেতনতার কারণ অনুসন্ধান করতে পারি, কিন্তু এটা কখনোই আমাদের মনে হবে না যে, ওখানে কোনো কারণ নেই।

এটা বলা হয় যে, অন্তর্দর্শন তাৎক্ষণিক আমাদের ইচ্ছাশক্তি সম্পর্কে সচেতন করে। যতদূর এটা ধরা হয় এক অর্থে এটা কার্য-কারণকে নিবারিত করে, এটা কেবলমাত্র একটা ভুল। আমরা যেটা জানি সেটা হলো আমরা যখন একটা পছন্দ তৈরি করি, আমরা চাইলে তখন অন্যভাবেও পছন্দটা করতে পারতাম। কিন্তু আমরা কেবলমাত্র অন্তর্দর্শন দিয়ে জানতে পারি না, আমরা যা করলাম তার জন্য আমাদের চাওয়ার কোনো কারণ আছে কি নেই। যে-সমস্ত কাজ যুক্তিগ্রাহ্য সেক্ষেত্রে আমরা তাদের কারণ জানতে পারি। যখন আমরা আইনগত অথবা চিকিৎসাসংক্রান্ত কিংবা আর্থিক উপদেশ গ্রহণ করি এবং সেইমতো কাজ করি, তখন আমরা কাজের কারণ জানি। কিন্তু সাধারণভাবে কাজের কারণগুলো অন্তর্দর্শনের সাহায্যে আবিষ্কার করা যায় না। অন্যান্য ঘটনার কারণের মতো এই কারণসমূহ আবিষ্কার করতে হয় এদের পূর্ববর্তী কারণ পর্যবেক্ষণ এবং পারম্পর্যের নিয়ম আবিষ্কারের মাধ্যমে।

অধিকন্তু, এটাও অবশ্যই বলতে হবে যে, ইচ্ছাশক্তির ধারণা খুবই অস্পষ্ট এবং সম্ভবত এমনটাই যা বৈজ্ঞানিক মনস্তত্ত্ব থেকে উধাও হয়ে যায়। আমাদের বেশিরভাগ কাজ ইচ্ছাশক্তির কাজের মতো কোনো কিছুর দ্বারা পূর্ববর্তী নয়। এটা এক ধরনের মানসিক রোগ যার প্রভাবে পূর্বে সিদ্ধান্ত না নিয়ে সাধারণ কিছুও করা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা কোনো এক স্থানে হাঁটতে যাবো ঠিক করলাম, এবং তারপর যদি আমরা পথটা চিনি, একটা পা ফেলার আগে আর একটা পা ফেলে চলতে চলতে গন্তব্যে পৌঁছে যাই। এটা হলো কেবল মূল সিদ্ধান্ত যেটাকে 'ইচ্ছাশক্তি'বলে অনুভূত হয়। আমরা ভাবনা-চিন্তার পরে যখন সিদ্ধান্ত নেই, তখন দুটো বা তিনটে সম্ভাবনা আমাদের মনে থাকতে পারে, প্রতিটি কম বা বেশি আকর্ষণীয়, এবং সম্ভবত প্রতিটি কম বা বেশি বিরক্তিকর! শেষ পর্যন্ত, অন্যগুলোকে পরাস্ত করে 'একটি' আকর্ষণীয় বলে প্রতিপন্ন হলো। কেউ যদি পশ্চাৎচিন্তার দ্বারা ইচ্ছাশক্তিকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেন, তিনি দেখবেন মাংসপেশীর একটা উৎকণ্ঠা এবং কখনও কখনও একটা সজোরে বাক্যোচ্চারণ, 'এটা আমি করবই।' কিন্তু আমি, একবারের জন্যেও আমার মধ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট ধরনের মানসিক ঘটনা টের পাইনি যাকে আমি 'ইচ্ছাশক্তি' বলতে পারি।

'ঐচ্ছিক' এবং 'অনৈচ্ছিক' কাজের মধ্যে পার্থক্য অস্বীকার করা অযৌক্তিক হবে। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন পুরোপুরি অনৈচ্ছিক। এরকম শ্বাস-প্রশ্বাস, হাইকোলা হাঁচি দেওয়া প্রভৃতি অনৈচ্ছিক কাজ, কিন্তু (সীমার মধ্যে) এসব ঐচ্ছিক প্রচেষ্টা দ্বারা নিয়ন্ত্রণযোগ্য। হাঁটাচলা এবং কথা বলার কাজ পুরোপুরি ঐচ্ছিক। যে পেশীগুলো হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের মতো বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করে, সেগুলো ঐচ্ছিক কাজে সংশ্লিষ্ট পেশীসমূহ থেকে ভিন্ন ধরনের। ঐচ্ছিক কাজকর্ম 'মানসিক' পূর্বগামী ঘটনার দ্বারা সংঘটিত হতে পারে। কিন্তু এর কোনো কারণ নেই, অথচ আমার মনে হয়, এইসব 'মানসিক' পূর্বগামী ঘটনাগুলো ঘটনাসমূহের একটা অদ্ভুত শ্রেণী, যেমন ধরা হয় 'ইচ্ছাশক্তি'কে।

স্বাধীন ইচ্ছার তত্ত্বকে নৈতিকতা সম্পর্কে, গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবা হয়েছে। এমনটা ভাবা হয়েছে 'পাপের' সংজ্ঞা এবং শাস্তির বিশেষ করে ঐশ্বরিক শাস্তির ন্যায্যতা—এই উভয় বিষয় বিবেচনায় রেখে। প্রশ্নটার এই দিকটা নিয়ে পরবর্তী কোনো এক অধ্যায়ে, যেখানে নৈতিকতার উপর বিজ্ঞানের প্রভাবের বিষয়টা তুলব, সেখানে আলোচনা করা হবে।

এমনটা মনে হতে পারে যে, বর্তমান অধ্যায়ে প্রথমে নির্ধারণবাদ এবং পরে স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিতর্ক তুলে অসংলগ্নতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছি। কিন্তু বস্তুত, দুটোই চরম অধিবিদ্যক মতবাদ এবং উভয়ই বৈজ্ঞানিকভাবে নির্ধারণযোগ্যতার বাইরে চলে যায়। কার্য-কারণের অনুসন্ধান হলো যেমনটা আমরা দেখলাম, বিজ্ঞানের সারমর্ম এবং বিশুদ্ধ বাস্তব জ্ঞানে, বিজ্ঞানবিদদের অবশ্যই সর্বদা নির্ধারণবাদকে প্রকল্পের কাজ বলে ধরে নিতে হবে। কিন্তু এমন ঘোষণা দিতে তিনি বাধ্য নন যে, তিনি বাস্তবিকপক্ষে যেখানে কার্য-কারণ নিয়ম দেখেছেন তার বাইরেও কার্য-কারণ নিয়ম রয়েছে। বাস্তবিকই তিনি অবিবেচক হবেন যদি তিনি তাই করেন। কিন্তু তিনি আরও অধিক অবিবেচক হবেন যদি তিনি নিশ্চিত করে বলেন যে, তিনি এমন একটা অঞ্চল জানেন, যেখানে কার্যকারণ নিয়ম ক্রিয়াশীল নয়। এই ধরনের ঘোষণার তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক বিবেচনাহীনতা রয়েছে। তাত্ত্বিক, এই কারণে যে, আমাদের জ্ঞান কখনোই এই ধরনের ঘোষণা দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এবং প্রায়োগিক, এই কারণে, এমন বিশ্বাস যে, জ্ঞানবিজ্ঞানের কোনো এক শাখায় কার্য-কারণ নিয়ম নেই এমন ঘোষণা অনুসন্ধানকে অনুৎসাহিত করে এবং এই নিয়মের আবিষ্কারে বাধা দিতে পারে। এই দ্বিত্ব বিবেচনাহীনতা, আমার মনে হয়, তাঁদের মধ্যেই রয়েছে যাঁরা ঘোষণা দেন যে, পরমাণুর পরিবর্তন পুরোপুরি নির্ধারণযোগ্য নয় এবং অন্যেরা যাঁরা যুক্তিপ্রমাণ ব্যতিরেকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির বিবৃতি দেন। এই দুই গোড়ামি

মুখি হয়ে বিজ্ঞানকে অবশ্যই পরীক্ষাবাদী থাকতে হবে, যথার্থ সাক্ষ্য যা তার বাইরে ঘোষণা কিংবা অস্বীকৃতির বিষয় বহন করবে না।

নির্ধারণবাদ এবং স্বাধীন ইচ্ছার মধ্যে বহুকালব্যাপী বিতর্ক চলতে থাকে দুটো শক্তিশালী কিন্তু যৌক্তিকভাবে পুনর্মিলন সম্ভাবনা রহিত আবেগের থেকে। নির্ধারণবাদের সুবিধাটা হলো এই যে, কার্য-কারণ নিয়মের আবিষ্কারের মাধ্যমে ক্ষমতা আসে। ধর্মতাত্ত্বিক সংস্কারের সঙ্গে বিরোধ থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞান গৃহীত হয়েছে কারণ এটা ক্ষমতা প্রদান করেছে। প্রকৃতির গতি নিয়মিত, এই বিশ্বাস আপত্তার বোধ প্রদান করছে। একটা পর্যায় পর্যন্ত ভবিষ্যৎ আগে থেকে দেখতে এবং অপ্রীতিকর ঘটনা আটকে দিতে আমাদের সক্ষমতা প্রদান করে। যখন রোগ-ব্যাধি এবং ঝড়-ঝঞ্ঝার কারণগুলো খেয়ালি পৈশাচিক শক্তির উপর আরোপিত হত তখন তারা আজকের থেকে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর ছিল। এইসব অভিপ্রায় মানুষকে নির্ধারণবাদের দিকে চালিত করে। কিন্তু যখন তারা প্রকৃতির ওপর ক্ষমতা পেতে চাইল, তখন তারা তাদের উপর প্রকৃতির ক্ষমতা মেনে নিতে চাইল না। তারা যদি এটাই বিশ্বাস করে তাহলে মানবজাতির অস্তিত্বের আগে নিয়মগুলোর কার্যকারিতা ছিল। এই নিয়ম এক ধরনের অন্ধ প্রয়োজনের দ্বারা সাধারণভাবে পুরুষ ও মহিলা নয়, এমন একজনের সৃষ্টি করল, যে নিজের বিশেষ স্বভাব নিয়ে জন্মাল। এই একজন যা করে ও বলে, অন্যেরা তাই করে ও বলে। তবে মানুষ উপলব্ধি করল যে, তাদের ব্যক্তিত্ব অপহৃত হয়েছে। ব্যর্থ, গুরুত্বহীন, পরিস্থিতির দাস, প্রথম থেকে প্রকৃতি তাদের যে-ভূমিকা প্রদান করেছে তা থেকে সামান্য পরিমাণেও এদিক-ওদিক করা সম্ভব হচ্ছে না। এই উভয় সংকট থেকে কতিপয় মানুষ পালাতে চাইল, মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা এবং সর্বত্র নির্ধারণবাদ, এমন ধরে নিয়ে। অন্যেরা এ অবস্থা থেকে বেরোতে চাইল দক্ষতার সঙ্গে উদ্ভাবিত যুক্তিমূলক প্রচেষ্টার দ্বারা স্বাধীনতার সঙ্গে নির্ধারণবাদের যৌক্তিক পুনর্মিলন ঘটিয়ে। বস্তুত, যে-কোনো একটি বিকল্পকে আমাদের গ্রহণ করার কোনো যুক্তি নেই। কিন্তু এটা ধরে নেবারও কোনো কারণ নেই যে, সত্য, তা যাই হোক না কেন, সেটা এমনই যা উভয়ের সম্মতিমূলক বৈশিষ্ট্যসমূহকে যুক্ত করবে অথবা যে কোনো পরিমাণে আমাদের অভিলাষের সম্পর্কের দ্বারা নির্ধারণযোগ্য হবে।

অধ্যায় ৭

অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদ

বিজ্ঞান ও ধর্মতত্ত্বের মধ্যে সংঘর্ষ একটা অদ্ভুত ধরনের। সব সময়ে সর্বত্র, আঠারো শতকের শেষপাদের ফ্রান্স এবং রাশিয়া ছাড়া, অধিকাংশ বিজ্ঞানবিদ তাঁদের যুগের ধর্মীয় গোঁড়ামিকে সমর্থন করেছেন। কতিপয় ব্যতিক্রম বিজ্ঞানবিদগণ তো এ-সমর্থনের ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। নিউটন, যিনি একজন আরীয়[১] অন্যান্য সমুদয় ক্ষেত্রে একজন খ্রিষ্ট বিশ্বাসের সমর্থক ছিলেন। ক্যুভিয়ার[২] তো ছিলেন ক্যাথলিক শুদ্ধতার একজন আদর্শ মানুষ। ফ্যারাডে ছিলেন একজন স্যানডিম্যানিয়ান[৩] (Sandymanian)। কিন্তু এই ধর্মীয় উপযোগিতার ভুলগুলোও, তাঁর কাছে, বৈজ্ঞানিক যুক্তির নিরিখে প্রমাণযোগ্য ছিল না। বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্কটাও তাঁর ধারণায় এমনই ছিল, যেমনটা প্রতিটি বিজ্ঞানী মানুষ সমর্থন করতে পারে। সংঘর্ষটা ছিল বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মতত্ত্বের, বিজ্ঞানীর সঙ্গে ধর্মতত্ত্বের নয়। এমনকি যখন বিজ্ঞানবিদের পোষিত ধারণা নিন্দিত হয়েছে তখনও তাঁরা বিরোধ এড়াতে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। কোপার্নিকাস, যেমনটা আমরা দেখলাম, তাঁর বই পোপকে উৎসর্গ করলেন; গ্যালিলিও গুটিয়ে নিলেন নিজেকে, দেকর্ত, যদিও হল্যান্ডে বাস করাই বিজ্ঞোচিত বিবেচনা করলেন, গির্জার পুরোহিতদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে প্রয়াসী হলেন এবং পুরোপুরি নীরবতা বজায় রেখে গ্যালিলিওর মতবাদের অংশীদারিত্বের জন্য ভর্ৎসনা এড়িয়ে গেলেন। উনিশ শতকে বেশির ভাগ ব্রিটিশ বিজ্ঞানবিদ ভাবতেন যে, বিজ্ঞান এবং খ্রিস্টধর্মের বিশ্বাসের সেই অংশ যেটা উদার খ্রিস্টানরা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন, এই দুইয়ের মধ্যে কোনো আবশ্যিক সংঘাত নেই। খ্রিস্টানদের পক্ষে মহাপ্লাবন আক্ষরিক অর্থে এবং এমনকি আদম ও ইভকে বিশ্বাস করা সম্ভব হয়েছে।

---

১. ইংরেজি কথাটা Arian চতুর্থ শতাব্দীর ধর্মতাত্ত্বিক Arius (আরিয়াস) -এর মতাবলম্বী সম্প্রদায়। অনুবাদক

২. ফরাসি প্রাণীবিদ এবং রাষ্ট্রনেতা, যিনি শারীরসংস্থানবিদ্যা এবং জীবাশ্মবিদ্যার তুলনামূলক শাখা প্রতিষ্ঠা করেন।—অনুবাদক

৩. স্যানডিম্যানিয়ান তিনিই যিনি কঠোর নৈতিকতা এবং মদ্যপানবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত।

কোপার্নিকাসের বিজয়ের সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত গোটা সময়টা ধরে অবস্থ্র খুব একটা পার্থক্য ঘটেনি। উপর্যুপরি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে খ্রিস্টান ধর্মীয় মানুষ একটার পর একটা বিশ্বাস পরিত্যাগে বাধ্য হয়েছে যে-বিশ্বাসগুলো মধ্যযুগেও অপরিহার্য বলে বিবেচিত হত। এবং এই উপর্যুপরি পশ্চাদপসারণ বিজ্ঞানবিদদের খ্রিস্টান থাকতেই সাহায্য করেছে, যদি না বিতর্কিত সীমান্তে তাঁদের কাজ আমাদের সময়ের সংঘর্ষের পর্যায় উন্নীত করেছে। গত তিন শতকের বেশিরভাগ সময়ে এটা দাবি করা হচ্ছিল যে, বিজ্ঞান ও ধর্মের বিরোধ মিটমাট হয়ে গেছে; বিজ্ঞানীরা সবিনয়ে স্বীকার করেন যে, এমন ক্ষেত্র রয়েছে যা বিজ্ঞানের পরিসরের বাইরে। এবং উদার ধর্মতত্ত্ববিদরা মেনে নেন যে, বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করা সম্ভব এমন কোনো কিছু তাঁরা অস্বীকারের চেষ্টা করবেন না। এটা সত্য যে, এখনও কিছু শান্তি বিঘ্নকারী রয়েছেন, একাধারে মৌলবাদীরা এবং একগুঁয়ে ক্যাথলিক ধর্মতত্ত্ববিদরা; অন্যপক্ষে জীবরসায়ন এবং প্রাণী মনোবিদ্যার মতো বিষয়গুলোর এমন অধিকতর প্রগতিশীল শিক্ষার্থী রয়েছে যারা অধিকতর আলোকপ্রাপ্ত গির্জাপন্থীদের তুলনামূলকভাবে পরিমিত, বিনয়ী দাবিও মঞ্জুর করতে অস্বীকার করে। কিন্তু মোটের ওপর লড়াইটা আগের তুলনায় ম্লান। কম্যুনিজম এবং ফ্যাসিজমের নতুনতর মতবাদ ধর্মতাত্ত্বিক সংকীর্ণতার উত্তরাধিকার। এবং সম্ভবত, অচেতনার কোনো গভীর প্রদেশে বিশপ এবং প্রফেসরগণ নিজেদেরকে যুক্তভাবে আগ্রহী মনে করেন পূর্বাবস্থা বজায় রাখার লক্ষ্যে।

বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে বর্তমান সম্পর্ক, যেমনটা রাষ্ট্র বজায় রাখতে চায়, সেটা একখানা শিক্ষণীয় বই থেকে বুঝে নেওয়া যায়। বইখানা হলো, Science and Religion, a Symposiun । ১৯৩০ সালে বিবিসি কর্তৃক প্রচারিত বারোটি আলোচনার সংকলন-গ্রন্থ এটি। ধর্মের বিরুদ্ধে স্পষ্টভাষীদের অবশ্য এই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এর কারণ (অন্য কোনো যুক্তির কথা বলছি না), এঁরা শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে অধিকতর ধর্মগোঁড়াদের আঘাত দিতে পারতেন। এটা সত্য যে, অধ্যাপক জুলিয়ান হাক্সলের একটি অসাধারণ প্রারম্ভিক আলোচনার কথা বলা যায় যে-আলোচনায় এমনকি অস্পষ্ট ধর্মগোঁড়ামির প্রতিও বিন্দুমাত্র সমর্থন ছিল না। কিন্তু এই আলোচনায় এমন কিছু ছিল না যা এখন উদার ধর্মযাজকরা আপত্তিজনক মনে করতে পারেন। বক্তাগণ নির্দিষ্ট মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। নিজেদের অনুকূলে যুক্তিধারা বিন্যস্ত করেছেন। এবং তাঁরা নানাবিধ অবস্থান গ্রহণ করেছেন। অবস্থানসমূহ এমন, অধ্যাপক ম্যালিনস্কির ঈশ্বরে ও অমরত্বে বিশ্বাস-এড়িয়ে-যাওয়া অভিলাষের মর্মস্পর্শী ঘোষণা থেকে ও 'হারার বলিষ্ঠ ঘোষণা এটাই যে, উদ্‌ঘাটনের সত্য বিজ্ঞানের সত্য থেকে অধিকতর নিশ্চিত। ও' হারারের

মতে, যেখানে সংঘর্ষ হবে সেখানে উদ্‌ঘাটনই জয়ী হবে। বিশদ বর্ণনায় ভিন্নতা ছিল ঠিকই, কিন্তু সাধারণ ধারণাটা এভাবেই দেওয়া হয়েছে যে, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সংঘাতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। যা কিছু প্রত্যাশিত, ফলাফলটা তাই হয়েছিল। বক্তা ক্যানন স্ট্রিটার শেষের দিকে বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বলেছেন যে, 'আগের বক্তৃতাগুলোর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, সব ভাষণগুলোই ঘুরে ফিরে একই গতিপথে এগিয়েছে।...একটা ধারণা আলোচনায় বার বার ঘুরে-ফিরে এসেছে যে, বিজ্ঞান নিজে যথেষ্ট নয়।' বিজ্ঞান ও ধর্ম সম্পর্কে এই মতৈক্য ঘটনা কি না অথবা যে-কর্তৃপক্ষ বিবিসি নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁরাও এটাকে ঘটনা মনে করেন কিনা, সে প্রশ্ন তো করা যেতেই পারে। কিন্তু এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, নানাবিধ পার্থক্য সত্ত্বেও সিম্পোসিয়ামের বক্তাগণ ক্যানন স্ট্রিটারের মতবাদের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন।

স্যার জে আর্থার টমসন্ বলেন, 'বিজ্ঞান, হিসাবে কখনও "কেন" এই প্রশ্নটা করে না। এটা বলার যে, বিজ্ঞান কখনও এই বহুমুখী 'বিয়িং, বিকামিং এবং হ্যাভিং বিন'-এর অর্থ অথবা তাৎপর্য কিংবা উদ্দেশ্য নিয়ে অনুসন্ধান করে না।' তিনি আরও বলেন, 'এভাবে বিজ্ঞান সত্যের ভিত্তিভূমি হবার অসঙ্গত দাবি করে না।' তিনি পুনরায় বলেন,'বিজ্ঞান তার পদ্ধতি অতীন্দ্রিয় এবং আধ্যাত্মিকের ব্যাপারে ব্যবহার করতে পারে না।' অধ্যাপক জে এস হলডেন মনে করেন, 'এটা কেবলমাত্র আমাদের ভেতরে, আমাদের সক্রিয় সত্যের আদর্শে, সঠিকতায়, সহৃদয়তায়, সৌন্দর্যে এবং এসবের ফলস্বরূপ অন্যের সঙ্গে সৌহার্দে—এসবের মধ্যেই আমরা ঈশ্বরের উদ্‌ঘাটন প্রত্যক্ষ করি।' ড. ম্যালিনস্কি বলেন যে, 'ধর্মীয় উদ্‌ঘাটন একটা অভিজ্ঞতা যেটা নীতিগত বিষয় হিসাবে বিজ্ঞানের গণ্ডির বাইরে অবস্থান করে।' আমি এই মুহূর্তে ধর্মতাত্ত্বিকদের কথার উল্লেখ করছি না, কারণ এই ধরনের মতের সঙ্গে তাদের ঐকমত্য প্রত্যাশিত।

বেশিদূর যাবার আগে, আমাদের স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে, এসব বক্তব্যে কী বলা হয়েছে, বুঝতে হবে বক্তব্যের সত্যতা এবং অসত্যতা। ক্যানন স্ট্রিটার যখন বলেন যে, 'বিজ্ঞান যথেষ্ট নয়'— একথা বলায় তিনি এক অর্থে স্বতঃসিদ্ধতার উচ্চারণ করেন। বিজ্ঞান শিল্প অথবা বন্ধুত্ব কিংবা জীবনের অন্যান্য মূল্যবান উপাদানসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে না। কিন্ত অবশ্যই এসবের থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলে। আর একটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ধারণায় 'বিজ্ঞান যথেষ্ট নয়'- এটিও আমার কাছে সত্য বলে মনে হয়। মূল্যবোধ সম্পর্কে বিজ্ঞানের কিছু করার নেই। বিজ্ঞান এমন বক্তব্যও প্রমাণ করতে পারে না যে, 'ঘৃণা করার চেয়ে ভালোবাসা ভালো' অথবা 'নিষ্ঠুরতার চেয়ে দয়া বেশি বাঞ্ছিত।' বিজ্ঞান আমাদের

ইচ্ছাপূরণের উপায়ের কথা বলতে পারে, কিন্তু একটা ইচ্ছা অন্যটার চেয়ে বেশি কাঙ্ক্ষিত, এটা বলতে পারে না। এটা একটা বিশাল বিষয়। এটা সম্পর্কে আমি আরও বিশদে বলব পরের কোনো এক অধ্যায়ে।

কিন্তু যে-সব বক্তাদের কথা আমি উল্লেখ করেছি, এঁরা আরও বেশি কিছু বলতে চান, যা আমি মিথ্যা বলে বিশ্বাস করি। 'বিজ্ঞান সত্যের ভিত্তিভূমি হবার অসঙ্গত দাবি করে না' বলতে বোঝায়, অন্য একটি অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি রয়েছে সত্যে পৌঁছানোর।' 'ধর্মীয় উদ্‌ঘাটন...বিজ্ঞানের গণ্ডির বাইরে অবস্থান করে' কথাটা, এই অবৈজ্ঞানিক পন্থাটা কী সে-সম্পর্কে আমাদের কিছু বলছে। ডিন ইন্‌গে আরও সুনির্দিষ্ট, 'ধর্মের প্রমাণ পরীক্ষামূলক।' (তিনি অতীন্দ্রিয়তার প্রমাণের কথা বলছেন।) 'এটা ঈশ্বরের তিনটি গুণের অধীন একটা ক্রমবর্ধমান জ্ঞান, যার সাহায্যে তিনি মানবজাতির কাছে নিজেকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন—যেগুলোকে কখনও কখনও চরম অথবা চিরন্তন মূল্যবোধ বলা হয়—মহত্ত্ব অথবা ভালোবাসা, সত্য এবং সুন্দর। এই গুণগুলিই যদি সব হয়, আপনি বলবেন, তাহলে ধর্মকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সংঘাতে আসার আদৌ কোনো কারণ নেই। বিজ্ঞান ঘটনা নিয়ে কাজ করে, ধর্ম মূল্যবোধ নিয়ে। ধরা গেল, দুটোই বাস্তব, এরা ভিন্নতর স্তরের। এটাও কিন্তু পুরোপুরি সত্য নয়। আমরা দেখেছি বিজ্ঞান নৈতিকতা, কবিতা এবং কি নয়— সবকিছুর উপর অনধিকার প্রবেশ করছে। ধর্মও এসব ক্ষেত্রে অনধিকারে প্রবেশ না করে পারছে না। তাহলে বলতে হয়, ধর্মকে স্পষ্টভাবে বলতেও হবে কী হচ্ছে, কী হওয়া উচিত এটা তার একমাত্র বলার কথা নয়। ডিন ইন্‌গে কর্তৃক মুক্ত কণ্ঠে ঘোষিত এই মতামতটাই নিহিত রয়েছে স্যার জে আর্থার টমসন এবং ড. ম্যালিনস্কির বক্তব্যে।

আমাদের কি স্বীকার করতেই হবে যে, ধর্মের সমর্থনে জ্ঞানের একটা উৎস পাওয়া সম্ভব যেটা বিজ্ঞানের বাইরে এবং সেটাকে যথাযথভাবে 'উদ্‌ঘাটন' বলে ব্যাখ্যা করা যায়? যুক্তিতর্ক দিয়ে বিচারের ক্ষেত্রে এটা একটা কঠিন প্রশ্ন, কারণ যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, সত্য তাঁদের কাছেই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তাঁরা নিজেদের সম্পর্কে একই পরিমাণ নিশ্চয়তা ব্যক্ত করেন যেটা ধারণার বস্তু হিসাবে আমাদেরও রয়েছে। যে-ব্যক্তি দূরবিনের সাহায্যে বস্তুনিচয় দেখছেন যা আমরা কখনও দেখিনি তাঁকে আমরা বিশ্বাস করি। তাহলে কেন তাঁরা এমন প্রশ্ন করবেন, আমাদের কি উচিত নয় তাঁদের বিশ্বাস করা যখন তাঁরা বলছেন যে তাঁদের দেখা বস্তুনিচয় নিয়ে তাঁরা সমানভাবে প্রশ্নহীন?

যিনি নিজে অতীন্দ্রিয় উদ্ভাসন উপভোগ করছেন তাঁর কাছে এটা নিয়ে যুক্তি উত্থাপন করা মনে হয় অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু আমরা অন্যেরা কেন এই প্রমাণ গ্রহণ

করব তা নিয়ে কিছু তো বলাই যায়। প্রথমত, এই প্রমাণ সাধারণ পরীক্ষার অন্তর্গত হয়। কেন? যখন একজন বিজ্ঞানবিদ একটা পরীক্ষণের ফলাফল আমাদের জানান, তিনি এটাও বলেন যে, কীভাবে এই পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। অন্যেরা এটা পুনরায় করে দেখতে পারেন এবং ফলাফল যদি নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে এটাকে সত্য বলে গ্রহণ করা হয় না। কিন্তু অনেক মানুষ নিজেদেরকে এমন অবস্থায় নিয়ে যেতে পারেন যেখানে অতীন্দ্রিয় দিব্যদর্শন সংঘটিত হয়েছে একই ধরনের উদ্‌ঘাটন ছাড়াই। এসব কথায় এটা বলা যায় যে একজন ব্যক্তির যথোপযুক্ত ধারণা ব্যবহার করা উচিত। যে-ব্যক্তি চোখ বুজে থাকে তার কাছে দূরবিনের কোনো উপযোগিতা নেই। অতীন্দ্রিয় প্রমাণের বিশ্বাসযোগ্যতার যুক্তি প্রায় অনির্দিষ্টভাবে প্রসারিত করা যায়। বিজ্ঞানকে অবশ্যই নিরপেক্ষ হতে হবে, কারণ যুক্তিটা হলো একটি বৈজ্ঞানিক যুক্তি। যুক্তিকে এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে ঠিক যেভাবে একটা অনিশ্চিত পরীক্ষণের যুক্তি পরিচালিত হয়। বিজ্ঞান প্রত্যক্ষকরণ এবং সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। এটার বিশ্বাসযোগ্যতা এই ঘটনার কারণে যে, প্রত্যক্ষকরণটা এমনই যেটা যে-কোনো পর্যবেক্ষক পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। অতীন্দ্রিয়বাদী নিজেই হয়তো নিশ্চিত হতে পারেন যে, তিনি 'জানেন' এবং এইজন্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। কিন্তু যাঁদের তিনি এই প্রমাণ গ্রহণ করতে বলেন, তাঁরা তো এটাকে বিজ্ঞানের মতো একই ধরনের পরীক্ষণের অধীনে আনতে চাইবেন, যেমনটা আনা হয় সেইমতো ব্যক্তির ক্ষেত্রে যাঁরা বলেন যে, তাঁরা উত্তরমেরুতে গিয়েছিলেন। সদর্থক কিংবা নঞর্থক, বিজ্ঞানের এমনতর কোনো ফলাফলের ব্যাপারে প্রত্যাশা থাকা ঠিক নয়।

অতীন্দ্রিয়বাদীদের সপক্ষে প্রধান যুক্তি হলো এদের একের সঙ্গে অন্যের বোঝাপরা। ডিন ইন্‌গে বলেন, 'প্রাচীন, মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক, প্রোটেস্টান্ট ক্যাথলিক এবং এমনকি বৌদ্ধ অথবা মোহাম্মদীয়, অতীন্দ্রিবাদীদের ঐকমত্যের চেয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো কিছুই আর জানা নেই, যদিও খ্রিস্টীয় অতীন্দ্রিয়বাদীরা সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য।' আমি এই যুক্তির শক্তিকে খাটো করতে চাইছি না যেটা আমি অনেক আগেই আমার *Mysticism and Logic* বইতে স্বীকার করেছি। অতীন্দ্রিয়বাদীরা তাঁদের অভিজ্ঞতার মৌখিক প্রকাশ ঘটাতে অনেকখানি ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু আমি মনে করি যাঁরা সর্বাপেক্ষা সফল হয়েছেন, তাঁরা সবাই মনে করেন যে, (১) সব ধরনের বিভাজন এবং ভিন্নতা অবাস্তব এবং ব্রহ্মাণ্ডটা হলো একটি অবিভাজ্য সত্ত্বা (২) অসৎ হচ্ছে অলীক এবং এই অলীকতা সৃষ্টি হয় এর অংশকে অসারভাবে আত্ম-স্থায়ী অস্তিত্বসম্পন্ন ভাবার ফলে (৩) সময় হলো

অবাস্তব এবং বাস্তবতা হচ্ছে চিরন্তন, চিরকালীন অর্থে নয়, কিন্তু পুরোপুরি সময় অন্তর্ভূত অর্থে। আমি এটা বলছি না যে, এটা হলো বিষয়সমূহের একটা পূর্ণ হিসাব যার উপর সমস্ত অতীন্দ্রিয়বাদী সহমত পোষণ করেন। কিন্তু এই তিনটে বিবৃতিতে আমি যেগুলোর উল্লেখ করলাম সেগুলো সামগ্রিকতার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। এবার আমরা আমাদেরকে আদালতের জুরি হিসাবে ভাবতে পারি। জুরিদের কাজ হলো সাক্ষীদের বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করে দেখা। এখানে এই আপাত বিস্ময়কর ঘোষণা তিনটে আমরা যাচাই করে দেখব।

প্রথমত আমরা দেখব যে, সাক্ষীগণ একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট পর্যন্ত একমত, ওই পয়েন্টটা ছাড়িয়ে গেলেই তাঁরা ভিন্নমত পোষণ করেন। এঁরা সবাই একমত এবং ভিন্নমতের সময় একইরকম যে-যার যুক্তিতে সুনিশ্চিত। প্রোটেস্টান্ট নয়, কিন্তু ক্যাথলিকদের দিব্যদৃষ্টিতে Virgin-এর আগমন ঘটতে পারে। বৌদ্ধদের নয়, কিন্তু খ্রিস্টান এবং মুসলমানদের কাছে সর্ব্বোচ্চ মার্গের দেবদূত গ্যাব্রিয়েল কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত মহান সত্য বিশ্বাসযোগ্য। তাও (Tao) ধর্মের চৈনিক অতীন্দ্রিয়বাদীরা আমাদের জানান যে, তাঁদের কেন্দ্রীয় মতাদর্শের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ, সব সরকারই খারাপ। অথচ বেশিরভাগ ইউরোপিয় এবং মুসলিম অতীন্দ্রিয়বাদীরা, সমান বিশ্বাসে, সংগঠিত কর্তৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু যে-পয়েন্টগুলোতে তারা ভিন্নমত পোষণ করেন তা হলো, প্রতিটি দল বলবে অন্য দলগুলো বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমরা যদি আদালতি (forensic) বিজয় নিয়ে সন্তুষ্ট থাকি, তাহলে আমাদের বলতে হবে যে, বেশিরভাগ অতীন্দ্রিয়বাদী ভাবেন, অন্যান্য বেশিরভাগ অতীন্দ্রিয়বাদীরা বেশিরভাগ পয়েন্টে ভ্রান্ত। যাই হোক, তাঁরা এটাকে একটা অর্ধ-বিজয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন যদি তারা মতানৈক্যের বিষয়ের তুলনায় পদার্থের ব্যাপারে ঐকমত্যের গুরুত্ব স্বীকার করেন। আমরা ধরে নেব যে, তাঁরা তাঁদের মতানৈক্যের নিষ্পত্তি করেছেন এবং এই তিনটে পয়েন্টকে সুরক্ষা হিসাবে সংহত করেছেন। এগুলো—বিশ্বের সংহতি, অসতের অলীক প্রকৃতি এবং সময়ের অবাস্তবতা। নিরপেক্ষ বহিরাগত হিসাবে আমরা তাদের সর্বসম্মত সাক্ষ্যের ব্যাপারে কোনো পরীক্ষা প্রয়োগ করতে পারি কী?

বৈজ্ঞানিক মেজাজের মানুষ হিসাবে আমরা স্বভাবতই প্রথমে প্রশ্ন করতে পারি যে, এমন কোনো পদ্ধতি আছে কিনা যার সাহায্যে আমরা নিজেরাই প্রথমে একই সাক্ষ্য পেতে পারি? এ-প্রশ্নের উত্তরে আমরা নানাবিধ উত্তর পাবো। আমাদের বলা হতে পারে যে, স্পষ্টতই আমাদের মনের সুগ্রাহী কাঠামো নেই। আমাদের অত্যাবশ্যক দীনতা নেই অথবা উপবাস এবং ধর্মীয় ধ্যান আমাদের

থাকা প্রয়োজন কিংবা (যদি আমাদের সাক্ষী ভারতীয় বা চৈনিক হয়) তাহলে আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত হবে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়ামের একটা কোর্স। আমার মনে হয় আমরা বুঝতে পারব যে, পরীক্ষণজাত সাম্যের ওজনটা শেষ ধারণার অনুকূলে যদিও উপবাসও প্রায়শ ফলপ্রসূ হতে দেখা গেছে। বস্তুত, যোগ নামে নিখিল দৈহিক শৃঙ্খলা রয়েছে যেটা অভ্যাস করা হয় অতীন্দ্রিয়বাদীর নিশ্চয়তা লাভ করার জন্য। যাঁরা এটা চেষ্টা করে[৪] দেখেছেন তাঁরা বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গেই রায় করে দেখতে বলেন। এর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম। আমাদের উদ্দেশ্যগুলোর জন্য আমরা বাকি সব বাদ দিতে পারি।

যোগ অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে, এই বিবৃতিটা কীভাবে আমরা পরীক্ষা করব সে বুঝতে আমরা কৃত্রিমভাবে এই বিবৃতিটা সরল করে নেবো। আমরা ধরে নিলাম যে, কতিপয় মানুষ আশ্বস্ত করেছেন যে, 'কিছু সময়ের জন্য' আমরা নির্দিষ্টভাবে নিঃশ্বাস নেব, এতে আমরা নিশ্চিত প্রত্যয়ী হবো যে, সময় হলো অবাস্তব। আমাদের আর একটু এগোতে হবে। এবার আমরা ধরে নেব যে, ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী চেষ্টা করার পর, আমরা নিজেরা তাঁদের বর্ণনা মতো একটা মানসিক অবস্থার অভিজ্ঞতা পেলাম। এখন আমরা আমাদের স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসে ফিরে। আমরা সুনিশ্চিত নই যে, ওই দিব্যদৃষ্টিটা বিশ্বাস করতে হবে। আমরা কীভাবে এই প্রশ্নটা তদন্ত করে দেখব?

প্রথমত, সময় অবাস্তব, এটা বলতে কী বোঝানো যায়? আমরা যা বলছি তা যদি বোঝাতে যাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই বোঝাতে হবে যে, 'এটা ওটার পূর্বে' এ-ধরনের বিবৃতি কেবল অর্থহীন বাগাড়ম্বর। আমরা যদি এর চেয়ে কম কিছু ধরে নেই— উদাহরণ স্বরূপ, ঘটনাগুলোর মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে যা এগুলোকে একই ক্রমে সাজায়, আগের এবং পরের সম্পর্ক হিসাবে, কিন্তু এটা একটা ভিন্ন সম্পর্ক— এতে আমরা কোনো ঘোষণা বিবৃত করিনি যেটা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো সঠিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এটা কেবলমাত্র এমন একটা অনুমানের মতো হবে যে, ইলিয়ড হোমারের রচিত নয়, একই নামের অন্য কোনো ব্যক্তির রচনা এটি। আমাদের অনুমান করতে হবে যে, 'ঘটনা' বলে কোনো কিছু নেই, ব্রহ্মাণ্ডে কেবল একটাই বিশাল সমগ্রতা রয়েছে। এই সমগ্রতা পার্থিব মিছিলের বিভ্রান্তকর চেহারায় যা কিছু বাস্তব সব কিছুতে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। আগের এবং পরের ঘটনার মধ্যে আপাত পার্থক্যের মতো বাস্তবে কিছুই থাকা উচিত নয়। আমরা জন্মাই, তারপর বড়ো হই; এবং তারপর মারা যাই, এটা বলা অবশ্যই আর একটি মিথ্যা বলার মতো।

---

৪. চৈনিক যোগ সম্পর্কে জানতে পড়ুন Waley -এর The Way and its Power, পৃষ্ঠা ১১১৭-১১৮

সেটি হলো আমরা মারা যাই, তারপর ছোট হই এবং শেষ পর্যন্ত জন্মাই। সত্যটা এই, একটা ব্যক্তিজীবন হলো ব্রহ্মাণ্ডে সময়হীন এবং অবিভাজ্য সত্ত্বার কেবলমাত্র একটা উপাদানের অলীক স্বতন্ত্রীকরণ। উন্নয়ন এবং অবনমনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কোনো তফাৎ নেই এমন দুঃখে যা সুখে সমাপ্ত হয় এবং এমন সুখে যা দুঃখে শেষ হয়। আপনি যদি ছোরাবিদ্ধ একটা মৃতদেহ দেখতে পান, তাহলেও—মানুষটি ছোরার আঘাতে মৃত, না মৃত্যুর পরে ছোরাটা মৃতদেহে বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে— এই দুয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এমনটা বুঝতে হবে। এ-ধরনের ঘটনা, যদি সত্য হয়, তাহলে সেটা কেবল বিজ্ঞানের সমাপ্তি ঘটায় না, বিচক্ষণতা, আশা এবং চেষ্টারও ইতি ঘটায়। এটা পার্থিব জ্ঞানের সঙ্গে এবং ধর্মে যেটা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, সেই নৈতিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন।

বেশিরভাগ অতীন্দ্রিয়বাদীরা সামগ্রিকভাবে এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই মেনে নেন না। কিন্তু যে-মতবাদ থেকে এই সিদ্ধান্তসমূহ অপরিহার্যভাবে অনুসৃত হয়, তাকে প্রণোদিত করেন। এভাবে ইন্‌গে সেই ধরনের ধর্ম বাতিল করেন, যে-ধর্ম বিবর্তনের কাছে আবেদন জানায়। কারণ এটা পার্থিব প্রক্রিয়ার উপর অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। তিনি বলেন, 'প্রগতির কোনো নিয়ম নেই, এবং চিরন্তন প্রগতি বলে কিছু নেই।' তিনি পুনরায় বলেন, 'স্বয়ংক্রিয় এবং চিরন্তন প্রগতির মতবাদ সেটা বহু ভিক্‌টোরিয়ানের গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম, সেটা চেষ্টা চালায় কেবলমাত্র একটি দার্শনিক তত্ত্বের অসুবিধা অর্জনে যেটা নিশ্চিতভাবেই অপ্রমাণ করা যায়।' এই বিষয়ে যেটা আমি পরে আলোচনা করব, সেটা হলো আমি ডিনের সঙ্গে সহমত পোষণ করি। অনেক বিষয়ে এই ডিনের প্রতি আমার খুবই গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। কিন্তু তিনি স্বাভাবিকভাবে হেতুবাক্য থেকে তাঁর সমস্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছন না, যেটা আমার কাছে অসমর্থনীয় মনে হয়।

এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদের ক্যারিক্যাচার করা ঠিক নয়। এই মতবাদে, আমি মনে করি, জ্ঞানের মর্মবস্তু রয়েছে। আমাদের দেখতে হবে কীভাবে এটা চরম ফলাফলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় যেটা সময়ের অস্বীকৃতি থেকে অনুসৃত হয়।

পারমেনিডেস থেকে হেগেল, অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে-ওঠা দর্শনের একটা বিরাট ঐতিহ্য রয়েছে। পারপেনিডেস বলেন, 'যেটা বর্তমান, সেটা স্বয়ম্ভু এবং অবিনশ্বর, কারণ এটা হলো পরিপূর্ণ, নিশ্চল এবং অন্তহীন। এটা কখনও ছিল না, এটা কখনও হবে না কারণ বর্তমানে 'এটা আছে' আচম্বিতে, ধারাবাহিক।[৫]

---

৫. Burnet রচিত Early Greek Philosophy থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ১৯৯

তিনি অধিবিদ্যার মধ্যে বাস্তবতা এবং দৃশ্যতার পার্থক্য অন্তর্ভুক্ত করেছেন অথবা সত্যের পথ এবং মতামতের পথের, পার্থক্য যেমনটা তিনি বলেন। এটা পরিষ্কার যে, যিনি সময়ের বাস্তবতা অস্বীকার করেন তাঁকে এই ধরনের কতিপয় পার্থক্যকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, কারণ স্পষ্টতই পৃথিবী সময়ের মধ্যেই দৃশ্যমান। এটাও স্পষ্ট যে, যদি নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা পুরোপুরি অলীক না হয়, তাহলে দৃষ্টিগোচরতা এবং এর পিছনের বাস্তবতার মধ্যে সম্পর্ক থাকতে হবে। যাই হোক, এই পর্যায়ে এসে সবচেয়ে কঠিন অসুবিধা দেখা দেয়। যদি দৃষ্টিগোচরতা এবং বাস্তবতার মধ্যে সম্পর্ককে খুবই ঘনিষ্ঠ করে তোলা হয়, তাহলে দৃষ্টিগোচরতার সমস্ত অপ্রীতিকর বৈশিষ্ট্য বাস্তবতার মধ্যে প্রতিফলিত হবে। আবার এই দুইয়ের সম্পর্কটা যদি খুব দূরবর্তী করা হয়, তাহলে আমরা দৃষ্টিগোচরতার চরিত্র থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে অসমর্থ হবো। সেক্ষেত্রে বাস্তবতাকে হার্বার্ট স্পেনসারের অজ্ঞেয় অজ্ঞের হিসাবে ত্যাগ করতে হবে। খ্রিস্টানদের পক্ষে সর্বেশ্বরবাদকে এড়িয়ে যাওয়া কষ্টসাধ্য। যদি পৃথিবীটা কেবল আপাত হয়, ঈশ্বর কিছুই সৃষ্টি করেননি এবং পৃথিবীর অনুরূপ বাস্তবতা হল ঈশ্বরের অংশ। কিন্তু পৃথিবী যদি যে-কোনো পরিমাণে বাস্তব এবং ঈশ্বর থেকে স্পষ্ট হয়, তখন আমরা সব কিছুর সামগ্রিকতাকে পরিত্যাগ করি। এটা অতীন্দ্রিয়বাদের আবশ্যিক মতবাদ। আমরা এটা ধরে নিতে বাধ্য যে, যতটা পর্যন্ত পৃথিবী বাস্তব, যে-ইচ্ছা এটা ধারণ করে সেটাও বাস্তব। এই ধরনের অসুবিধা অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদকে একজন গোঁড়া খ্রিষ্টানের কাছে মুশকিলের বিষয় করে তোলে। বিরমিংহামের বিশপ বলেন, 'সর্বেশ্বরবাদের সমুদয় আকার... আমার যেমন মনে হয়, অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে কারণ মানুষ যদি বাস্তব ঈশ্বরের অংশ হয়, তাহলে মানুষের অসততা ঈশ্বরের মধ্যেও বর্তমান।'

এত সময় ধরে আমি এটা ধরে নিয়ে চলেছি যে, আমরা সবাই জুনি, অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদের সাক্ষ্য শুনে চলেছি এবং এটা গ্রহণ না, বর্জন করব সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করছি। যদি, যখন তারা ধারণাগত পৃথিবীর বাস্তবতা অস্বীকার করে, আমরা তখন এটা বুঝি যে, তারা 'বাস্তবতা' বলতে আদালতের সাধারণ ধারণার বাস্তবতার কথা বলছে এক্ষেত্রে ওনারা যা বলেন সেটা প্রত্যাখান করতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই। কারণ আমাদের এটা বোঝা উচিত, এই ধারণা অন্য সমুদয় প্রমাণের বিপরীত। এমনকি তাদের একঘেয়ে মুহূর্তগুলোতে তাদেরও এমনটা মনে হবে। সুতরাং আমাদের অন্য কোনো ধারণার দিকে তাকাতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, যদি অতীন্দ্রয়বাদীরা 'বাস্তবতাকে' 'দৃষ্টিগোচরতা'র সঙ্গে পৃথক করেন, তাহলে 'বাস্তবতা' শব্দটার

যুক্তিগত নয়, কিন্তু আবেগগত তাৎপর্য রয়েছে। এর অর্থ, যা আছে, কোনো ধারণায় সেটা গুরুত্বপূর্ণ। যখন এটা বলা হয় যে, সময় 'অবাস্তব', তাহলে যা অবশ্যই বলতে হবে সেটা হলো এই যে, কতিপয় ধারণায় এবং কতিপয় ঘটনায়, ব্রহ্মাণ্ডকে সামগ্রিকভাবে বুঝতে হবে। এর কারণ স্রষ্টা, যদি তিনি বর্তমান থাকেন, তিনি এটা সৃষ্টি করার চিন্তা করেছেন। যখন এমনটা চিন্তা করা হলো, সমুদয় প্রক্রিয়া একটি সমগ্রতার মধ্যে চলে এল। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ—একটা ধারণায় এসবই অস্তিত্বশীল। এবং 'বর্তমান'-এর সর্বাগ্রগণ্য বাস্তবতা নেই। এমন বাস্তবতার ধারণা রয়েছে পৃথিবীকে বোধগম্যতার পক্ষে আমাদের সাধারণ ভাবনায়। যদি এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয় তাহলে অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদ একটা আবেগ প্রকাশ করে, কোনো ঘটনা নয়। এটা কোনো কিছু বিবৃত করে না, অতএব বিজ্ঞানের দ্বারা এটা স্বীকৃত অথবা অস্বীকৃত হয় না। অতীন্দ্রিয়বাদীরা বিবৃতি প্রদান করেন, কারণ তারা আবেগগত গুরুত্বকে বৈজ্ঞানিক বৈধতা থেকে পৃথক করতে পারেন না। এটা অবশ্যই প্রত্যাশিত নয় যে, তাঁরা এই ধারণা গ্রহণ করবেন। যতদূর আমার মনে হয়, যখন তাঁদের কিছু পরিমাণ দাবি গ্রহণ করা হয়, সেটা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্রতিকূল নয়।

একটা ঘটনার প্রমাণ গ্রহণে নিশ্চয়তা এবং অতীন্দ্রিয় বাদীদের আংশিক ঐকমত্য কোনো তর্কাতীত যুক্তি নয়। বিজ্ঞানবিদ নিজে যা দেখেছেন, সেটা তিনি অন্যদের দেখাতে চাইলে, অনুবীক্ষণযন্ত্র অথবা দূরবিনের ব্যবস্থা করেন। বলতে হয়, তিনি বাহ্যিক পৃথিবীতে পরিবর্তন ঘটান, কিন্তু পর্যবেক্ষকের কাছে কেবল সাধারণ দৃষ্টিশক্তির দাবি করেন। পক্ষান্তরে, অতীন্দ্রিয়বাদী পর্যবেক্ষকের নিজের পরিবর্তন দাবি করেন, উপবাসের মাধ্যমে, নিঃশ্বাসের ব্যায়ামের মাধ্যমে এবং বাহ্যিক পর্যবেক্ষণ থেকে সতর্ক অনুপস্থিতির মাধ্যমে। (কেউ কেউ এই শৃঙ্খলা সম্পর্কে আপত্তি করেন এবং ভাবেন যে, অতীন্দ্রিয়বাদী উদ্ভাসন কৃত্রিমভাবে পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এটা তাঁদের বিষয়টাকে আরও জটিল করে তাঁদের বিষয়টার তুলনায়, যাঁরা যোগের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু প্রায় সবাই স্বীকার করেন যে, উপবাস এবং একটা তপস্বী জীবন এ ব্যাপারে সহায়ক।) আমরা সবাই জানি যে, আফিম, হাসিস এবং অ্যালকোহল পর্যবেক্ষকের উপর কিছু প্রভাব তৈরি করে। কিন্তু আমরা এসব প্রভাবকে প্রশংসনীয় ভাবি না বলে আমরা আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্বের মধ্যে এসব অন্তর্ভুক্ত করি না। এগুলো কখনও কখনও সত্যের অসম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটাতে পারে। কিন্তু আমরা এগুলোকে সাধারণ জ্ঞানের উৎস বলে বিবেচনা করি না। একজন মাতাল সাপ দেখার পরে এমনটা ভাবে না যে, অন্যদের কাছে লুকানো কোনো বাস্তবতার উদ্‌ঘাটন সে প্রত্যক্ষ করেছে। যদিও

কতিপয় অন্য ধরনের বিশ্বাস অন্যকে Bacchus-এর উপাসনার দিকে নিয়ে যেতে পারে। আমাদের নিজেদের এই সময়ে, যেমনটা উইলিয়াম জেমস লক্ষ্য করেছেন, এমন মানুষও থাকতে পারে যারা বিবেচনা করে যে, লাফিং-গ্যাসের নেশার ঘোর তৈরি করে সেটা 'সত্যকে' উদ্‌ঘাটন করে, যে-সত্যটা স্বাভাবিক সময়ে গুপ্ত থাকে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে-মানুষটি কম খায় এবং কম দেখতে পায়, আর যে-মানুষটি প্রচুর পান করে এবং সাপ দেখে—এই দু'জনের মধ্যে কোনো তফাৎ করতে পারি না। উভয়ই থাকে অস্বাভাবিক দৈহিক অবস্থায় এবং সেই কারণে এদের অস্বাভাবিক 'প্রত্যক্ষকরণ' ঘটে। স্বাভাবিক প্রত্যক্ষকরণগুলো যেহেতু জীবনের জন্য সংগ্রামে প্রয়োজনীয়, এগুলোর সঙ্গে ঘটনার সঙ্গে সংযোগ থাকতেই হয়। কিন্তু অস্বাভাবিক প্রত্যক্ষকরণে এই ধরনের কোনো সংযোগের প্রত্যাশা করার কারণ নেই। এবং এসবের সপক্ষে যাওয়া স্বাভাবিক প্রত্যক্ষকরণকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না।

অতীন্দ্রিয় আবেগ, যদি এটাকে অসমর্থিত বিশ্বাস থেকে মুক্ত করা যায়, যা অতটা প্রবল নয়, একজন মানুষকে যদি পুরোপুরি জীবনের সাধারণ ব্যস্ততা থেকে সরিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে কিছুটা মহৎ মূল্য তৈরি করতে পারে। দিতে পারে একই ধরনের বস্তু, বৃহত্তর আকারে, যেটা ধ্যানের দ্বারা প্রদত্ত হয়। নিঃশ্বাস নেয়া প্রশান্তি এবং গভীরতা—এসব কিছুরই উৎস রয়েছে আবেগের মধ্যে। যার মধ্যে মুহূর্তের জন্য সমস্ত আত্মকেন্দ্রিক ইচ্ছার মৃত্যু ঘটছে, এবং মনটা ব্রহ্মাণ্ডের বিশালত্বের একটা দর্পণ হয়ে ওঠে। যাদের এই অভিজ্ঞতা হয়েছে, এবং যারা বিশ্বাস করে যে, ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতির বিষয়ে বিবৃতির সঙ্গে এটা বন্ধনযুক্ত, তারা স্বভাবত এই বিবৃতিতে দৃঢ় সংলগ্ন হয়। আমি নিজেও বিশ্বাস করি যে, বিবৃতিগুলো গুরুত্বহীন এবং এদের সত্য বলে বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। বিজ্ঞানের পদ্ধতি ছাড়া সত্যে পৌঁছানোর অন্য কোনো পদ্ধতি আমি স্বীকার করতে পারি না। কিন্তু আবেগের ক্ষেত্রে আমি অভিজ্ঞতার মূল্যকে অস্বীকার করি না। এটাই সৃষ্টি করেছে ধর্ম। মিথ্যা বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত থেকে এরা মন্দ এবং ভালো করেছে। মিথ্যা বিশ্বাসের এই সঙ্গ থেকে মুক্ত করতে পারলে, এটা আশা করা যায় যে, কেবল ভালোটাই থেকে যাবে।

---

৬. এই লেখকের Varieties of Religious Experience বইটি দেখুন।

অধ্যায় ৮
মহাজাগতিক উদ্দেশ্য

আধুনিক বিজ্ঞানবিদগণ যদি ধর্মের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন অথবা উদাসীন না হলেও, তাঁরা একটা বিশ্বাস আঁকড়ে থাকেন। তাঁদের মতে এই বিশ্বাস পূর্বতন পাড়ামির ধ্বংসের মধ্যেও বেঁচে থাকতে পারে। প্রধানত এই বিশ্বাসটা হলো মহাজাগতিক উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাসী। উদার ধর্মতাত্ত্বিকেরা সমানভাবে এই বিশ্বাসকে তাঁদের ধর্মমতের কেন্দ্রীয় বিষয় করে তোলেন। এই মতবাদের কতিপয় প্রকরণ আছে। কিন্তু সব প্রকরণেরই সাধারণ বিষয়টা হলো বিবর্তনের ধারণা। এই ধারণার নির্দেশিকা হলো এমন কিছুর প্রতি যেটা নৈতিকভাবে মূল্যবান এবং যেটা সমগ্র দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কারণটা জানতে পারে। আমরা যেমনটা দেখেছি, স্যার জর্জ আর্থার টমসন মনে করতেন যে, বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ কারণ 'কেন' এই প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞান দিতে পারে না। তাঁর ভাবনায় ধর্ম এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। যেমন এ কেন সৃষ্টি করা হয়েছিল? সূর্য গ্রহদের সৃষ্টি করেছিল কেন? পৃথিবী ঠাণ্ডা হলো কেন এবং অবশেষে জীবনের উদ্ভব ঘটল কেন? কারণ, পরিশেষে, প্রশংসনীয় কিছু ঘটতে চলেছে। সেটা কি আমি জানি না, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি এরা সব বৈজ্ঞানিক ধর্মতাত্ত্বিক এবং ধর্মমনস্ক বিজ্ঞানী।

এই মতবাদের তিনটি প্রকরণ রয়েছে—ঈশ্বরবিশ্বাসী, সর্বেশ্বরবাদী এবং একটিকে বলা যেতে পারে 'উত্থানশীল'। প্রথমটি সহজতম এবং একান্তই পাড়া। এদের মতে, ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং প্রাকৃতিক নিয়মের বিধান দিয়েছেন কারণ তিনি পূর্বাহ্নে দেখাতে পেরেছেন কোনো এক সময়ে ভালো কিছু বিকশিত হবে। এই মতে, উদ্দেশ্যটা সচেতনভাবে স্রষ্টার মনে রয়েছে এবং এই স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির বাইরে থাকেন। সর্বেশ্বরবাদীর প্রকরণে, ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে থাকেন না, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডকে বিবেচনা করা হয় একটা সমগ্র হিসাবে। সুতরাং সৃষ্টিকার্য বলে কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে এক ধরনের সৃষ্টিশীল শক্তি রয়েছে যা একটা পরিকল্পনা অনুসারে এটাকে বিকশিত করে। এটা করার গোটা প্রক্রিয়ার সময় সৃষ্টিশীল শক্তির মনে আগে থেকে এই পরিকল্পনাটা থাকতে পারে বলে বলা যায়। উত্থানশীল মতবাদের প্রকরণে উদ্দেশ্যটা অধিকতর সৃষ্টিহীন। পূর্বতন স্তরে ব্রহ্মাণ্ডের কিছুই পরবর্তী স্তরকে আগে থেকে দেখতে পারে না। কিন্তু এক ধরনের অন্ধ মানসিক ঝোঁকে ওইসব পরিবর্তনের দিকে চালিত করে, যা আরও বিকশিত প্রকরণ বাস্তবে নিয়ে আসে যাতে অন্য কোনো অজ্ঞাত ধারণার শুরুতেই পদ্ধতিটা অন্তর্নিহিত থাকে।

এই তিন ধরনের প্রকরণই বিবিসি আলোচনায় প্রতিনিধিত্ব করেছে যেটা [illegible] আগেই আমি আলোচনা করেছি। বিরমিংহামের বিশপ ঈশ্বরবিশ্বাসী প্রকরণের পক্ষে বলেন। প্রফেসর জেএস হলডেন সর্বেশ্বরবাদী প্রকরণের পক্ষে [illegible] প্রফেসর আলেকজান্ডার বলেন উত্থানশীল প্রকরণের সপক্ষে। যদিও সম্ভব [illegible] শেষতম প্রকরণের অধিকতর প্রতিভূস্থানীয় প্রতিনিধি হলেন বার্গসন এবং প্রফেসর লয়েড মর্গান। এইসব মতবাদ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে মতাবলম্বীদের নিজেদের বক্তব্যে।

বিরমিংহামের বিশপ মনে করেন, 'মানুষের মনের সমধর্মী একটি বিচারশীল এই ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে' এবং এটা আমাদের সংশয়ী করে তোলে এই ধারণায় যে মহাজাগতিক প্রক্রিয়া একটি মন দ্বারা পরিচালত নয়।' এই সংশয়টা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তৎক্ষণাৎই আমরা জেনে যাই যে, 'এই বিশাল দৃশ্যপটে স্পষ্টতই [illegible] অগ্রগতি রয়েছে, যেটা সভ্য মানুষের সৃষ্টির সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছে। [illegible] অগ্রগতি কি দৃষ্টিহীন শক্তির পরিণাম? আমার কাছে অদ্ভুত লাগছে এটা বলতে [illegible] এই প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ'....। বস্তুত, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লব্ধ আধুনিক জ্ঞান থেকে যে-স্বাভাবিক সিদ্ধান্তে আসতে হয় তা হল, ব্রহ্মাণ্ড চিন্তার প্রভাবের অধীন নয় যা সুনির্দিষ্ট পরিণামের দিকে ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত। এইরূপে, মানুষের [illegible] ইলেকট্রন এবং প্রোটনের উপাদানের সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় এবং পুরোপুরি অসম্ভব পরিণতি ছিল না। অথবা আপনি চাইলে এভাবেও বলতে পারেন স্পেস-টাইমের অবচ্ছিন্নতা, এটা ছিল কোনো মহাজাগতিক উদ্দেশ্যে এবং যে-লক্ষ্যের দিকে [illegible] উদ্দেশ্য কাজ করেছিল সেটাকে অবশ্যই দেখতে হবে মানুষের স্বাতন্ত্র্যসূচক গুণাবলী এবং ক্ষমতার মধ্যে। বস্তুত, মানুষের সর্বোচ্চ নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সক্ষমতা মহাজাগতিক উদ্দেশ্যের প্রকৃতি দেখিয়ে দেয় যেটা হলো তার সবচেয়ে উৎস।'

যেমনটা আমরা দেখলাম যে, বিশপ সর্বেশ্বরবাদ প্রত্যাখ্যান করছেন, কারণ বিশ্বই যদি ঈশ্বর হন তাহলে বিশ্বের অশুভ সবকিছু ঈশ্বরের মধ্যে রয়েছে। তা আরও এই কারণে যে, 'আমাদের অবশ্যই বলতে হবে ঈশ্বর তাঁর ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সৃষ্টিতে নেই। 'তিনি স্পষ্টভাবে পৃথিবীর অমঙ্গল স্বীকার করেন না' বলেন,'আমরা বিমূঢ় যে, এত অমঙ্গল থাকবে এবং এই বিভ্রান্তি বিশ্বাস আস্তিক্যবাদের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি।' প্রশংসনীয় সততায় তিনি এটা দেখানোর চেষ্টা করেননি যে, আমাদের বিভ্রান্তি অযৌক্তিক।

ড. বার্নেসের বিবরণ দু'ধরনের সমস্যা তৈরি করে। একদল [illegible] সাধারণভাবে মহাজাগতিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং অন্যদল [illegible]

ঈশ্বরবিশ্বাসী প্রকরণের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। প্রথম দলের বিষয়ে আমি পরে বলব। পরের দলের বিষয়ে এখনই অবশ্যই কিছু বলতে হবে আমাকে।

উদ্দেশ্যের ধারণা হলো একটি স্বাভাবিক ধারণা যেটা সুদক্ষ কারিগরী মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আরব্য উপন্যাস ছাড়া একজন মানুষ একটি গৃহ পেতে চাইলে এটা তার বাসনা থেকেই পাওয়া যায় না। তার বাসনা চরিতার্থ করতে সময় ও শ্রম ব্যয় করতে হয়। কিন্তু সর্বশক্তিমান এ-ধরনের কোনো সীমাবদ্ধতার অধীন নন। ঈশ্বর যদি মানবজাতি সম্পর্কে ভালোভাবে চিন্তা করেন—আমার কাছে এটা একটি আপাতদৃষ্টিতে অসঙ্গত প্রকল্প—কেন তিনি, যেমনটা সৃষ্টিতত্ত্বে রয়েছে, তৎক্ষণাৎ মানুষ সৃষ্টি করতে উদ্যোগী হলেন না? ইসথাইসারস, ডাইনোসারস, ডিপলোডোসি, ম্যাস্টোডনস এবং অন্যান্য প্রাণীদের বিষয়েই-বা কী বলার?

কোথাও ড. বার্নেস নিজে স্বীকার করেছেন যে, ফিতে-কৃমির উদ্দেশ্যটাই একটা রহস্য। র‍্যাবিস এবং জলাতঙ্ক রোগে কী উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে? বলার মতো এটা কোনো উত্তর নয় যে, প্রাকৃতিক নিয়ম অপরিহার্যভাবে শুভ এবং অশুভ সৃষ্টি করে কারণ ঈশ্বরই প্রাকৃতিক নিয়মের বিধান দিয়েছেন। পাপের কারণে যে-অমঙ্গল সেটাকে আমাদের মুক্ত ইচ্ছার ফল হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু মানব-পূর্ব পৃথিবীতে অমঙ্গলের সমস্যা থেকেই যায়। আমার মনে হয় না উইলিয়াম গিলেস্‌পির সমাধান বার্নেস গ্রহণ করবেন। গিলেস্‌পির সমাধানের কথা, শিকারী পশুদের দেহে শয়তান বাস করত, যাদের প্রথম পাপ পশুসৃষ্টির পূর্বতন সময়ের। তবুও এটা বোঝা অসুবিধাজনক যে, অন্যান্য যৌক্তিকভাবে সন্তোষজনক উত্তর কী হতে পারে। এ-অসুবিধাটা প্রাচীন কিন্তু তা সত্ত্বেও বাস্তব। সর্বশক্তিমান এক সত্ত্বা যিনি পাপ থেকে উদ্ভূত নয়, এমন একটা পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি তো নিজেও অন্ততপক্ষে আংশিক অমঙ্গল।[১]

এই আপত্তিতে মহাজাগতিক উদ্দেশ্যের সর্বেশ্বরবাদী এবং উত্থানশীল মতবাদের প্রকরণ কম উন্মোচিত হয়।

সংশ্লিষ্ট সর্বেশ্বরবাদের নির্দিষ্ট স্থান অনুসারে সর্বেশ্বরবাদী বিবর্তনের বৈচিত্র্য রয়েছে। আমাদের বিবেচনায় জে এস হলডেনের এই মতবাদটা হেগেলের সঙ্গে সংযুক্ত এবং হেগেলের সব কিছুর মতোই এটা বোঝাও খুব সহজ নয়। কিন্তু এই

---

১. ডিন ইন্‌গে বলেছেন, 'আমরা আমাদের সংকীর্ণ নৈতিকতা দিয়ে অমঙ্গলের সমস্যাটা বড়ো করে দেখি, যেটা আমরা অভ্যাসগত ভাবে স্রষ্টার উপর চাপিয়ে দেই। এই তত্ত্বের সপক্ষে কোনো সাক্ষ্য নেই যে, ঈশ্বর কেবলমাত্র একজন নৈতিক সত্ত্বা এবং আমরা তাঁর বিধান এবং প্রয়োগ সম্পর্কে যা পর্যবেক্ষণ করি সেসব বলিষ্ঠভাবে এটা নির্দেশ করে, যে তিনি তেমনটা নন।' Outspoken Essays, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪।

ধারণাটা এমনই যে, গত একশো বছরের বেশি সময় ধরে এটার যথেষ্ট [illegible] ছিল এবং সে-কারণেই এটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। অধিকন্তু, প্রফেসর হলডেন নানাবিধ বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর কাজের জন্য প্রখ্যাত। তিনি তাঁর সামগ্রিক দর্শনকেও বিশদ অনুসন্ধানে দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এটা [illegible] বিশেষভাবে করেছেন শারীরবিজ্ঞানে। যুক্তির সাহায্যে এটা দেখানো তাঁর [illegible] প্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল যে, রসায়নবিদ্যা এবং পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম ছাড়া [illegible] জীবন্ত দেহের বিজ্ঞানের জন্য অন্য নিয়মও দরকার। এই ঘটনা তাঁর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গুরুত্ব বাড়িয়েছে।

এই দর্শন অনুযায়ী বিশেষভাবে বলতে গেলে, 'মৃত' বস্তু বলে কোনো [illegible] নেই, এমন কোনো জীবন্ত দ্রব্য নেই যার মধ্যে অন্তত কিছুটা পরিমাণে চৈতন্যের প্রকৃতি নেই। এবং এক পা এগিয়ে বলতে হয়, এমন কোনো চৈতন্য নেই যা অন্তত কিছু পরিমাণে ঐশ্বরিক নয়। দৃষ্টিগোচরতা এবং বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য যা আমরা এর আগের অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি, সেটা প্রফেসর হলডেনের দৃষ্টিতে সংশ্লিষ্ট, যদিও তিনি এটার উল্লেখ করেন না। কিন্তু এখন, হেগেলের প্রসঙ্গে [illegible] প্রকারের পার্থক্য নয়, পরিমাণের পার্থক্য হয়ে উঠেছে'। মৃত বস্তু কম বাস্তব, জীবন্ত বস্তু আর একটু বেশি পরিমাণে বাস্তব, মানবীয় চৈতন্য আরও একটু বেশি। কিন্তু কেবলমাত্র সম্পূর্ণ বাস্তবতা হলো ঈশ্বর অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড যাকে ঈশ্বরীয় বলে ধারণা করা হয়। হেগেল এসব ধারণার যৌক্তিক প্রমাণ প্রদানের প্রয়াস করেন, কিন্তু আমরা এখানে এসব আলোচনা এড়িয়ে যাব কারণ এসব আলোচনা একটা মহাভারত হয়ে যাবে। আমরা বরঞ্চ প্রফেসর হলডেনের ধারণার বিশদ আলোচনা করব বিভিন্ন আলোচনা থেকে কতিপয় উদ্ধৃতি সহকারে।

তিনি বলেন, 'আমরা যদি আমাদের জীবনদর্শনের একমাত্র ভিত্তিকে অধিযান্ত্রিক হিসাবে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হই, তাহলে ঐতিহ্যগত ধর্মীয় বিশ্বাস এবং অন্যান্য অনেক সাধারণ বিশ্বাসকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সৌভাগ্যবশত তিনি ভাবেন যে, সবকিছু অধিযান্ত্রিকভাবে অর্থাৎ রসায়নবিদ্যা এবং পদার্থবিদ্যার সাহায্যে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। বাস্তবিকপক্ষে এটা সম্ভব নয়, কারণ জীববিদ্যায় জীবসত্ত্বার ধারণা প্রয়োজন। 'ভৌত দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন চলমান অলৌকিকতা থেকে কিছু কম নয়।' 'উত্তরাধিকারমূলক সঞ্চার...নিয়ত সূচিত করে জীবনের পৃথকীকরণ বৈশিষ্ট্য, যেমন সুসংহত ঐক্য সর্বদা নিজের রক্ষা ও পুনরুৎপাদনে সচেষ্ট।'

'আমরা যদি ধরে নেই যে, জীবন প্রকৃতিতে সহজাত নয়, এবং জীবনের অস্তিত্বের আগে অবশ্যই একটা সময় ছিল, এটা তাহলে একটা অসমর্থিত [illegible]

না জীবনের আবির্ভাবকে পুরোপুরি অবোধগম্য করে তোলে।' 'ঘটনা হল, আমাদের অভিজ্ঞতার একটা চূড়ান্ত অধিযান্ত্রিক অথবা গাণিতিক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে জীববিজ্ঞান তার দরজা চূড়ান্তভাবে বন্ধ করে দেয়। এই ঘটনাটা ধর্ম সম্পর্কে আমাদের ধারণার বিষয়ে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।' জীবনের প্রতি সচেতন আচরণের সম্পর্ক, যান্ত্রিকতার প্রতি জীবনের আচরণের সম্পর্কের অনুরূপ।' মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার জন্য বর্তমান কোনো স্বল্পস্থায়ী মুহূর্ত নয়। এটা নিজের মধ্যে অতীত এবং ভবিষ্যৎ দুটোকেই ধারণ করে।' জীববিজ্ঞানের জীবসত্ত্বার ধারণা প্রয়োজন, তদুপরায় মনস্তত্ত্বের দরকার ব্যক্তিত্বের। একজন ব্যক্তি সম্পর্কে এটা ভাবা ভুল যে, সে কেবল একটা আত্মা' এবং একটা শরীর নিয়ে গঠিত। অথবা এটা ধরে নেওয়াও ভুল যে, আমরা বাহ্যিক পৃথিবী নয়, কেবল সংবেদনশীলতাকেই জানি, কারণ সত্যের নিরিখে পরিপার্শ্ব আমাদের সত্ত্বার বাইরে নয়। 'স্থান এবং সময় ব্যক্তিত্বকে পৃথক করে না, এরা এর মধ্যে একটা শৃঙ্খলাকে ব্যক্ত করে যাতে স্থান ও সময়ের প্রকাণ্ডতা এর মধ্যেই থাকে, এমনটাই কান্ট দেখেছিলেন।' ব্যক্তিসত্ত্বাগুলোর একটি অন্যটিকে বর্জন করে না। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে এটি একটি নিছক মৌলিক ঘটনা যে, সত্যের একটি সক্রিয় আদর্শ, ন্যায়বিচার, দানশীলতা এবং সৌন্দর্য প্রভৃতি সর্বদাই আমাদের কাছে উপস্থিত এবং এটাই আমাদের আগ্রহ, কিন্তু কেবলমাত্র ব্যক্তিগত আগ্রহ নয়। অধিকন্তু, আদর্শটা একটিই আদর্শ, যদিও এর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ রয়েছে।'

এই বক্তব্য থেকে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণে প্রস্তুত, একক ব্যক্তিসত্ত্বা থেকে ঈশ্বরে পৌছানো। ব্যক্তিত্ব নিছক ব্যক্তিগত নয়। এই ঘটনায় এটা আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতি হিসাবে স্বীকার করি—ঈশ্বর আমাদের বাইরের কোনো সত্ত্বা হিসাবে উপস্থিত নন কিন্তু আমাদের মধ্যে, আমাদের পারিপার্শ্বে ব্যক্তিত্বসমূহের মধ্যে ব্যক্তিত্ব হিসাবে বর্তমান।'

'কেবলমাত্র আমাদের মধ্যেই, আমাদের সত্যের সক্রিয় আদর্শ ন্যায়, দানশীলতা এবং সৌন্দর্য্যের মধ্যে, এবং অন্যদের সঙ্গে সংঘটিত সৌহার্দের মধ্যে আমরা ঈশ্বরের প্রকাশ প্রত্যক্ষ করি।' আমাদের বলা হয়েছে স্বাধীনতা এবং অমরত্বের মালিক ঈশ্বর, কোনো ব্যক্তি মানুষ নয়। কারণ এই ব্যক্তি মানুষ, যেভাবেই হোক না কেন পুরোপুরি বাস্তব নন। গোটা মানবজাতি লুপ্ত করে দিলেও, ঈশ্বর একাই সমুদয় চিরন্তনতা থেকে কেবলমাত্র বাস্তব সত্ত্বা হবেন এবং তাঁর অস্তিত্বে আমাদের মধ্যে যা বাস্তব তাই বেঁচে থাকবে।'

একটা সান্ত্বনাযোগ্য শেষ ভাবনা : ঈশ্বরের একমাত্র বাস্তবতা থেকে এটা বলতে হবে যে, গরিবের গরিব হবার জন্য কিছু মনে করা উচিত নয়।

অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতার মতো চলমান মুহূর্তের অবাস্তব ছায়া' ধরার [illegible] নির্বুদ্ধিতা। গরিবের বাস্তবটা ধনীর চেয়ে অধিকতর সন্তোষজনক। যাঁরা উপলব্ধি রয়েছে তাদের পক্ষে এটা স্মরণ আরামদায়ক হবে যে, একমাত্র অন্তিম পরিণাম হলো আধ্যাত্মিক অথবা ব্যক্তিগত বাস্তবতা যেটা আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব দিয়ে নির্দেশ করি।

এই তত্ত্ব অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করে। আমরা সব থেকে নির্দিষ্ট বিষয়টা দিয়ে শুরু করছি। কোন অর্থে, যদি কোনো অর্থ থাকে, জীববিদ্যা কেন পদার্থবিজ্ঞান রসায়নশাস্ত্রে রূপান্তরযোগ্য হবে না? কিংবা মনোবিদ্যা জীববিদ্যায়?

রসায়নশাস্ত্র এবং পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে জীববিদ্যার সম্পর্কে প্রফেসর হলডেনের ধারণাটা এখন বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞরা মান্য করেন না। হলডেনের মতের বিপরীত প্রশংসনীয় বক্তব্যটা জ্যাকুইস লোয়েবের ১৯১২ সালে প্রকাশিত পুস্তক *The Mechanistic Conception of Life* গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই বইয়ের দারুণ মজাদার কতিপয় অধ্যায় পুনরুৎপাদন সম্পর্কে পরীক্ষণের ফলাফল জানায়। প্রফেসর হলডেনের মতে এগুলো যান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী অনিবার্য। অধিযান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিটা যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণযোগ্য হয়ে *Encyclopaedia Britannica*-এর শেষ সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখানে মি.ই এস রোনা 'বিবর্তন' শিরোনামে বলেন, 'তাহলে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকারীর ধারণায় একটি জীবন্ত জীবসত্ত্বা হলো স্ব-নিয়ন্ত্রিত, স্ব-সংস্কারমূলক, ভৌত-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সমষ্টি যা ছেদহীন আন্তঃনির্ভর ক্রম গঠন করে এবং এর মধ্যে কোনো রহস্যময় বহিরাগত শক্তির হস্তক্ষেপ নেই।'

জীবন্ত বস্তুতে এমন প্রক্রিয়া রয়েছে যা পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়নশাস্ত্রে হ্রাসযোগ্য নয়, এমন কোনো ইঙ্গিতের জন্য আপনার এই লেখাটা পড়া বৃথা হবে।

লেখক এটা বলছেন যে, জীবন্ত এবং মৃত বস্তুর মধ্যে কোনো স্পষ্ট রেখা নেই। জীবন্ত এবং মৃত বস্তুর মধ্যে কোনো বাঁধাধরা রেখা টানা যায় না। কোনো নির্দেশ জীবন্ত রাসায়নিক দ্রব্য, মৃত বস্তু থেকে পৃথক বিশেষ কোনো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং কোনো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শক্তিকে কাজ করতে দেখা যায় না। প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রতিটি পদক্ষেপ নির্ধারিত হয় পূর্ববর্তী কোনো কিছুর দ্বারা এবং যা অনুসরণ হয় তাকে নির্ধারণ করে।' জীবনের উৎস সম্পর্কে 'এটা ধরে নিতেই হবে যে, বহুপূর্বে যখন অবস্থা অনুকূলে এল, নানা ধরনের তুলনামূলকভাবে উন্নত [illegible] তৈরি হলো। এসবের অনেকগুলো সম্পূর্ণ অস্থায়ী হবে, গঠনের সঙ্গে সঙ্গে [illegible] পড়বে, অন্যগুলো স্থায়ী এবং পুরোপুরি থেকে যাবে। কিন্তু আরও অনেকে [illegible] দ্রুত ভাঙবে তাতেই পুনর্গঠিত এবং সংলগ্ন হতে চেষ্টা করবে। একবার এভাবে [illegible]

করে এ-ধরনের বিকাশশীল যৌগ অথবা মিশ্রণ অবশ্যম্ভাবীভাবে নিজেকে চিরস্থায়ী করে তুলতে চায় এবং অন্যদের যারা কম জটিল তাদের সঙ্গে যুক্ত হতে অথবা অন্যদের খাদ্য হিসাবে পেতে চায়।' প্রফেসর হলডেনের থেকে পৃথক এই ধারণা বর্তমানের জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রবল। তাঁরা এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, জীবন্ত এবং মৃত বস্তুর মধ্যে কোনো স্পষ্ট রেখা নেই। কিন্তু প্রফেসর হলডেন মনে করেন যে, আমরা যাকে মৃত বস্তু বলে ভাবি সেটি সত্যিকারে জীবন্ত বস্তু! জীববিজ্ঞানীদের অধিকাংশ মনে করেন যে, জীবন্ত বস্তু আসলে একটি ভৌত-রাসায়নিক যান্ত্রিকতা।

শারীরবিদ্যা এবং মনস্তত্ত্বের মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্নটা অধিকতর জটিল। এ-নিয়ে দুটো স্পষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। আমাদের শারীরিক আচরণ কি কেবলমাত্র মনস্তাত্ত্বিক কারণে ঘটে বলে ধরা যাবে? মনের ঘটনার সঙ্গে দেহের সংঘটনশীল কার্যাবলীর সম্পর্ক কী? কেবলমাত্র শারীরিক আচরণই কি মানুষের পর্যবেক্ষণের জন্য উন্মুক্ত? আমাদের চিন্তা অন্যেরা অবধারণ করতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র আমরাই সেটা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে পারি। অন্ততপক্ষে এটাই আমাদের সাধারণ জ্ঞানের কথা। তাত্ত্বিক কড়াকড়িতে আমরা শরীরের কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করতে পারি না, কিন্তু প্রত্যক্ষ করি কতিপয় ফলাফল যেগুলো আমাদের উপর বর্তায়। একই সময়ে অন্যেরা যা প্রত্যক্ষ করে সেটা একরকম হতে পারে, কিন্তু তাদের এই প্রত্যক্ষ করাটা আমাদের প্রত্যক্ষ করা থেকে পরিমাণে কম-বা বেশি হবে। এটা এবং অন্যান্য কারণে পদার্থবিজ্ঞান এবং মনস্তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্যটা আগে-ভাবা পার্থক্যের মতো অতটা প্রশস্ত নয়। কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আমরা কী দেখব সেটা পদার্থবিদ্যা অগ্রিম জানাতে পারে এবং এই অর্থে পদার্থবিজ্ঞান মনোবিদ্যার একটা শাখা কারণ আমাদের প্রত্যক্ষ করার বিষয়টা একটা 'মানসিক' ঘটনা। সেইসব অভিলাষ যেগুলো কেবল অভিজ্ঞতালব্ধ, তাকে প্রমাণযোগ্য ঘোষণা করে সেগুলোর মাধ্যমে এই দৃষ্টিকোণ আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সামনে চলে এসেছে। এর সাথে এই ঘটনাটাও যুক্ত থাকে যে, একটা সত্যতা নিরূপণ সর্বদা মানুষের দ্বারা একটা প্রত্যক্ষকরণ এবং সেই কারণে এটা একটা এমন ঘটনা যা মনস্তত্ত্ব বিবেচনা করে। কিন্তু এসব কিছুই তাদের অনুশীলনে নয়, দুটো বিজ্ঞানের দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। বিষয়বস্তুগত সৌহার্দ সত্ত্বেও এদের প্রকরণ স্বতন্ত্রই থাকে।

ঠিক আগের অনুচ্ছেদের শুরুতে উত্থাপিত প্রশ্ন দুটো, যে-দুটো প্রশ্নের বিষয় আগের একটা অধ্যায়েও দেখেছি, সেখানে ফিরে গিয়ে বলতে হয়, যদি আমাদের সমুদয় শারীরিক ক্রিয়াকলাপের শারীরবিদ্যাগত কারণ থাকে, তাহলে আমাদের

মন কার্য-কারণগতভাবে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। কেবলমাত্র শারীরিক কাজের মাধ্যমে আমরা অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারি, অথবা বাইরের পৃথিবীর উপর কোনো ফলাফল পেতে পারি, যেগুলোকে আমরা কেবল বস্তু বলেই জানি যদি এটা আমাদের শরীর যা করে তাকে প্রভাবিত করতে পারে। যাই হোক, যা মানসিক এবং যা শারীরিক, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো কেবল একটা সুবিধার বিষয়। আমাদের শারীরিক কাজের কারণসমূহ পুরোপুরি পদার্থবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, এবং মানসিক ঘটনাসমূহ এসবের কারণ হতে পারে। বাস্তব বিষয়টা মন এবং শরীরের সংশ্লিষ্টতায় বর্ণনা করা যাবে না। এটা সম্ভবত এভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে, আমাদের শারীরিক ক্রিয়াসমূহ কি ভৌত-রাসায়নিক নিয়মে নির্ধারিত? এবং যদি সেটাই হয়, তা সত্ত্বেও মনস্তত্ত্বের একটা স্বাধীন-বিজ্ঞান কি এখানে নেই, যার মধ্যে কৃত্রিমভাবে গঠিত বস্তুর ধারণার হস্তক্ষেপ ছাড়া আমরা মানসিক ঘটনাগুলোকে সরাসরি বুঝতে চাই?

কোনো আস্থা সহকারে এই দুটো প্রশ্নের কোনোটারই উত্তর দেওয়া যাবে না, যদিও প্রথম প্রশ্নটার সদর্থক উত্তরের সপক্ষে কিছু সাক্ষ্য রয়েছে। সাক্ষ্যটা প্রত্যক্ষ নয়, আমরা যেভাবে শুক্রগ্রহের চলাফেরা নির্ণয় করি, সেভাবে মানুষের গতিবিধি নির্ণর করতে পারি না। কিন্তু মানুষের শরীর এবং নিম্নতর জীবনের ধরনের মধ্যে কোনো স্পষ্ট রেখা টানা যায় না। কোথাও এমন কোনো ফাঁক নেই যা আমাদের এমনটা বলতে প্রলুব্ধ করবে—এখানে পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়নবিদ্যা পর্যাপ্ত নয়। এবং এতক্ষণ আমরা যা দেখলাম, জীবন্ত এবং মৃত দ্রব্যের মধ্যে কোনো স্পষ্ট রেখা নেই। সুতরাং এটা সম্ভাব্য মনে হয় যে, পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়নবিদ্যা সর্বাংশে সর্বোচ্চ।

মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের স্বাধীন সম্ভাবনা সম্পর্কে এই মুহূর্তে কমই বলা যাবে। কতক পরিমাণে মনোবিশ্লেষণ এই ধরনের বিজ্ঞান নির্মাণে চেষ্টা চালিয়েছে। এই প্রচেষ্টা শারীরবিদ্যাগত কার্য-কারণ এড়াতে চায় বলে এর সফলতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। দ্বিধা নিয়েও আমি এই ধারণার পক্ষে যে, পদার্থবিজ্ঞান এবং মনস্তত্ত্বের মিলনে পরিশেষে এটা বিজ্ঞান হয়ে উঠবে, যদিও সেটা হবে এর বর্তমান বিকাশ থেকে পৃথক। পদার্থবিজ্ঞানের প্রকরণের বিকাশ ঘটেছে, 'বস্তুর' অধিবিদ্যক বাস্তবতায় বিশ্বাসের প্রভাবে। এই বিশ্বাস কিন্তু আজ আর বেঁচে নেই। একটা নতুন কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ভিন্নতর প্রকরণ তৈরি করেছে যেটা মিশ্র অধিবিদ্যার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে। মনস্তত্ত্বের প্রকরণও কতক পরিমাণে 'মনের' অধিবিদ্যক বাস্তবতায় বিশ্বাসের প্রভাবে বিকশিত হয়েছিল। এটা সম্ভব বলেই মনে হয় যে, যখন পদার্থবিজ্ঞান এবং মনস্তত্ত্ব এইসব দীর্ঘস্থায়ী ত্রুটি থেকে

পুরোপুরি মুক্ত হবে, এরা তখন দুটোই মিলে গিয়ে একটা বিজ্ঞানে পরিণত হবে। এই বিজ্ঞানটা তখন মন অথবা পদার্থ কোনোটা নিয়েই কাজ করবে না, কাজ করবে একমাত্র ঘটনা নিয়ে। এবং এই ঘটনাগুলোকে 'শারীরিক' কিংবা মানসিক বলে লেবেল এঁটে দেবে না। ইতিমধ্যে মনস্তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক মর্যাদার প্রশ্নটা অবশ্যই 'খোলা' থাকবে।

যাই হোক, মনস্তত্ত্ব বিষয়ে প্রফেসর হলডেনের ধারণা একটা সংকীর্ণতর বিষয় উত্থাপন করে। সেটা হলো, কোন ব্যাপারে অনেক বেশি নির্দিষ্ট বস্তুসমূহের কথা বলা যায়। তিনি মনে করেন যে, মনস্তত্ত্বের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশক ধারণা হলো' ব্যক্তিত্ব'। এই শব্দটাকে তিনি সংজ্ঞায়িত করেন না, কিন্তু আমরা এটার অর্থ এটা করতে পারি—কিছু একীভূত নীতি, যা একটা মনের সংঘটক উপাদানগুলোকে একত্রে বেঁধে রাখে। এবং এগুলো একে অন্যকে পরিমার্জিত করে। ধারণাটা অস্পষ্ট। এটার অর্থ 'আত্মা' এখনও সমর্থনযোগ্য। নেহাৎ সত্ত্বা হিসাবে এটা আত্মা থেকে পৃথক নয় শুধু, কিন্তু সামাজিকতার এক ধরনের গুণ। যারা এটাতে বিশ্বাস করেন তাঁরা ভাবেন যে, জন স্মিথের মনের মধ্যে সব কিছুর জন্য স্মিথি গুণ রয়েছে যা অন্য যে-কোনো ব্যক্তির মনের কোনো কিছুর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া অসম্ভব। আপনি যদি জন স্মিথের মনের একটা বৈজ্ঞানিক বিবরণ দিতে চেষ্টা করেন, তাহলে আপনি সাধারণ নিয়ম নিয়ে সন্তুষ্ট হবেন না, যেমনটা সমস্ত বস্তুর অংশ নিয়ে, এলোমেলোভাবে দেওয়া সম্ভব। আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলো ওই বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রেই ঘটছে এবং তার পূর্ণ ইতিহাস তো চরিত্রের কারণে সেসব যা ,তাই রয়েছে।

এই ধারণার কতিপয় আকর্ষণীয় দিক রয়েছে কিন্তু আমি এটাকে সত্য বলার মতো কোনো কারণ দেখি না। এটা অবশ্যই বোধগম্য যে, তাদের অতীত ইতিহাসের পার্থক্যের জন্য দু'জন মানুষ একই পরিস্থিতিতে বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া করতে পারে। দুই টুকরো লোহা যার একটিকে চুম্বকিত করা হয়েছে এবং অন্যটিকে করা হয়নি, এদের ক্ষেত্রেও এটা একইভাবে সত্য। কারোর ধারণায় স্মৃতিশক্তি মস্তিষ্কে খোদিত থাকে এবং শারীরিক গঠনের ভিন্নতার মাধ্যমে এটা আমাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। একই অবস্থা চরিত্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একজন মানুষ যদি ক্রুদ্ধ এবং অন্যজন যদি স্বভাব-শীতল হন, এদের এই পার্থক্য গ্রন্থি থেকে নির্ণয়যোগ্য। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভেষজ প্রয়োগে এটা বিলুপ্ত করা সম্ভব। ব্যক্তিত্ব রহস্যময় এবং অরূপান্তরযোগ্য, এমন বিশ্বাসের কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। এই বিশ্বাসটা গ্রহণ করার প্রধান কারণ এটা আমাদের মানবীয় আত্মশ্লাঘার পক্ষে একটি স্তাবকতা।

পুনরায় দুটো বিবৃতি বিচার করুন।' মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার জন্য বর্তমানটা আর ক্ষণস্থায়ী মুহূর্ত নয়, এটা অতীত এবং ভবিষ্যৎ দুটোকেই নিজের মধ্যে ধারণ করে।' এবং স্থান ও সময় ব্যক্তিত্বকে পৃথক করে না; এরা এর মধ্যে পারস্পরিক ক্রমকে ব্যক্ত করে।' অতীত এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে, আমার মনে হয়, প্রফেসর হলডেনের মনে এমন বিষয় রয়েছে, যেটা আমাদের এমন একটা অবস্থা যখন আমরা বিদ্যুৎ চমকাতে দেখি এবং তখনই বজ্রপাতের প্রত্যাশা করি। এটাকে এভাবে বলা যায় যে, বিদ্যুৎ-চমক—এটা হলো অতীত এবং বজ্রপাত হলো ভবিষ্যৎ, উভয়ই আমাদের বর্তমান মানসিক অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু পরোক্ষ উপমা দিয়ে এটাকে বিপথে চালিত করতে হয়। বিদ্যুতের স্মরণ বিদ্যুৎ নয় এবং বজ্রপাতের প্রত্যাশাও বজ্রপাত নয়। আমি কেবল এটাই ভাবছি না যে স্মরণ এবং প্রত্যাশার কোনো শারীরিক ফলশ্রুতি নেই, আসলে আমি আমাদের অভিজ্ঞতার যথার্থ গুণের কথা চিন্তা করছি—দেখাটা এক জিনিস, স্মরণ করাটা অন্য, শোনাটা এক জিনিস, প্রত্যাশা করাটা অন্য। মনস্তত্ত্ব কিংবা অন্যত্র অতীত এবং ভবিষ্যতের সঙ্গে বর্তমানের সম্পর্ক হলো কার্য-কারণগত সম্পর্ক, এ সম্পর্ক কিন্তু ব্যাখ্যাজাত সম্পর্ক নয়। (অবশ্যই আমি এটা বলতে চাইছি না যে, আমার প্রত্যাশাই বজ্রপাত ঘটায়। কিন্তু বিদ্যুৎ-চমকের পরেই বজ্রপাতের অতীত ঘটনা এবং বর্তমানের বিদ্যুৎ চমক মিলে বজ্রপাতের প্রত্যাশা জাগায়। স্মৃতি অতীতের অস্তিত্বকে দীর্ঘায়িত করে না, এটা কেবল একটা উপায় যার মধ্যে দিয়ে অতীতের ফলোদয় ঘটে।)

স্থান বিষয়ে বলার, বস্তু একই ধরনের কিন্তু অধিকতর জটিল। দু'ধরনের স্থানের ধারণা রয়েছে। এর একটার মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাসমূহ এবং সেটা পদার্থবিদ্যা, যার মধ্যে আছে অন্য ব্যক্তিদের শরীর, চেয়ার-টেবিল, সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্র। এগুলো সব কেবলমাত্র আমাদের ব্যক্তিগত অনুভবের মধ্যেই নয়, কিন্তু এগুলো ওইসব জিনিসের মধ্যে বিদ্যমান যেমনটা আমরা ধরে নেই। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে প্রকল্পিত এবং যথার্থ তর্কবিদ্যায় যে-কোনো ব্যক্তি এটা অস্বীকার করতে পারে, যে-ব্যক্তি এমনটা ধরে নিতে ইচ্ছুক যে, পৃথিবীতে তার নিজের অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নেই। প্রফেসর হলডেন এমনটা বলতে ইচ্ছুক নন, সুতরাং তিনি অবশ্যই স্বীকার করেন যে, স্থান যা বস্তুকে ধারণ করে সেটা তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে পৃথক। স্থানের ব্যক্তিগত ধরন সম্পর্কে বলার দৃশ্যগত স্থান আমার সমুদয় দৃশ্যগত অভিজ্ঞতা ধারণ করে। এছাড়া স্পর্শগত স্থান রয়েছে, যেমনটা উইলিয়াম জেমস্ নির্দেশ করেছিলেন। অসংখ্য বস্তুনিচয়ের মধ্যে একটি বস্তু হিসাবে যখন আমি বিবেচিত হই তখন আত্মগত স্থানের ধা

গগন আমার মধ্যেই থাকে। নক্ষত্রখচিত যে আকাশ আমি দেখি সেটা জ্যোতির্বিজ্ঞানের নক্ষত্রখচিত দূরতম আকাশ নয়। এটা হলো আমার উপর নক্ষত্রদের ফলশ্রুতি। যেটা আমি দেখি সেটা আমারই মধ্যে, আমার দেহের বাইরে নয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের নক্ষত্রমণ্ডলী ভৌতিক স্থানে, যেগুলো আমার শরীরের বাইরে কিন্তু যেগুলোতে আমি পৌছই আমার ব্যক্তি অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণে নয়, ওখানে পৌছই অবধারণের সাহায্যে। প্রফেসর হলডেনের বিবৃতি, স্থান ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা ক্রম নির্দেশ করে। একথাটা ঠিক আমার ব্যক্তিগত স্থান সম্পর্কে কিন্তু ভৌত স্থান সম্পর্কে নয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর অন্য বিবৃতিটি—স্থান ব্যক্তিত্বকে বিচ্ছিন্ন করে না— এটা কেবলমাত্র তখনই সত্য হবে যদি ভৌত স্থানটাও আমার মধ্যেই থাকে। যে-মুহূর্তে এই বিভ্রান্তি দূরীভূত হয়, তখনই তাঁর অবস্থান গ্রহণযোগ্যতা হারায়।

যাঁরা হেগেলকে অনুসরণ করেন, তাঁদের সকলের মতো হলডেনও এটা দেখাতে উদ্‌গ্রীব যে, সত্যি সত্যি কোনো কিছুই অন্য কিছু থেকে পৃথক নয়। কেউ যদি তাঁর যুক্তি গ্রহণ করেন, তিনি এখন এটা দেখিয়েছেন যে, প্রতিটি মানুষের অতীত এবং ভবিষ্যৎ তাঁর বর্তমানের সঙ্গে সহাবস্থান করে এবং যে-স্থানের মধ্যে আমরা সবাই বাস করি সেটাও আমাদের মধ্যেই বর্তমান। কিন্তু প্রমাণস্বরূপ তাঁকে আর একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছে,' ব্যক্তিত্বসমূহের একটি অন্যটিকে বর্জন করে না।' এটা দেখা যায় যে, একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব তাঁর আদর্শ দ্বারা গঠিত এবং আমাদের আদর্শসমূহ সবই সমান। আমি আর একবার তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করছি, 'সত্যের সক্রিয় আদর্শ, ন্যায়, দানশীলতা এবং সৌন্দর্য সর্বদা আমাদের কাছে উপস্থিত...। অধিকন্তু, আদর্শটা হলো, এক আদর্শ, যদিও এর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ রয়েছে। এসব সাধারণ আদর্শ এবং যে-সৌহার্দ তারা তৈরি করে তা থেকেই ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটে।'

আমাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এই ধরনের বিবৃতি আমাকে খাবি খাওয়ায় এবং আমি বুঝতেই পারি না, কোথা থেকে শুরু করতে হবে। আমি প্রফেসর হলডেনের কথায় সংশয় প্রকাশ করি না যখন তিনি বলেন যে, 'সত্যের একটা সক্রিয় আদর্শ, ন্যায়, দানশীলতা এবং সৌন্দর্য,' সর্বদা তাঁর মধ্যে বর্তমান। আমি নিশ্চিত, অবশ্যই এমনটা হবে কারণ তিনিই এটা বলেছেন। কিন্তু যখন এই সদাচারের অসাধারণ পরিমাণ সাধারণভাবে মানবজাতির কল্যাণে আরোপ করা হয়, তখন আমার মনে হয় আমার মতবাদে আমার সন্নিষ্ঠ থাকার অধিকার আছে, যেমনটা রয়েছে তাঁর নিজের। আমি তো আমার মতো করে দেখতে পাচ্ছি যে, অসত্য, অন্যায়, অদানশীলতা এবং কদর্যতা প্রভৃতি অনুসৃত হচ্ছে, কেবলমাত্র

ঘটনায় নয়, আদর্শ হিসাবেও। তিনি কী সত্যি সত্যি ভাবেন যে, হিটলার এবং আইনস্টাইনের 'একই আদর্শ যদিও এর দৃষ্টিকোণ পৃথক?' আমার মনে হয় যে এ-ধরনের বিবৃতির জন্য প্রত্যেকের বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ আনা যেতে পারে। অবশ্যই এমনটা বলা যায় যে, এঁদের একজন খলনায়ক এবং নিজের অন্তরে থাকা যে আদর্শে তিনি বিশ্বাস করেন সেটা তিনি অনুসরণ করছেন না। কিন্তু আমার কাছে এটা একটা সহজসাধ্য সমাধান বলে মনে হয়। হিটলারের আদর্শ প্রধানত নিৎসের কাছ থেকে এসেছে যাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ আন্তরিকতার প্রমাণ সাক্ষ্য রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত হেগেলের দ্বান্দ্বিকতা ছাড়া অন্য পদ্ধতিতে এই বিষয়টা হটানো না যাবে, ততক্ষণ আমি বুঝতে পারছি না আমরা কীভাবে জানবো যে, ঈশ্বর, যাঁর মধ্যে আদর্শটি মূর্তমান, তিনি জিহ্বা অথবা ওটান।

এই ধারণাটা যে, ঈশ্বরের চিরন্তন স্বর্গসুখ গরিবের কাছে একটা স্বাচ্ছন্দ্য, এটা তো সর্বদা ধনীদেরই রয়েছে, কিন্তু গরিবরা এতে তো চরম বীতশ্রদ্ধ হতে শুরু করেছে। সম্ভবত, এ-সময় পর্যন্ত ঈশ্বরের এই ধারণাকে আর্থিক অবিচারের সমর্থনে সংযুক্ত করা আদৌ বিচক্ষণ হবে না।

মহাজাগতিক উদ্দেশ্যের ঈশ্বরবিশ্বাসী মতবাদের মতো সর্বেশ্বরবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, সময় যদি শেষাবধি বাস্তব না হয়, তাহলে বিশ্ব ইতিহাসের সর্বোত্তম জিনিসগুলো আগে না এসে, পরে আসে কেন? বিপরীত ক্রমটা কী সঠিক হতে পারত না? ঘটনাসমূহের তারিখ থাকাটা যদি বিভ্রম হয়, যে-বিভ্রম থেকে ঈশ্বর মুক্ত, তাহলে তিনি কেন প্রীতিজনক ঘটনাবলীকে শেষে ঘটিয়ে অপ্রীতিজনক ঘটনাসমূহকে প্রথম ঘটান? এই বিষয়টার ভাবনায় আমি ডিন ইন্‌গের সঙ্গে একমত যে, এই প্রশ্নটা উত্তরহীন।

এর পরেই আমরা 'উত্থানশীল' মতবাদের আলোচনায় গিয়ে বলতে পারি যে, এই মতটা এই অসুবিধা এড়াতে পারে এবং দৃঢ়ভাবে সময়ের বাস্তবতা সমর্থন করে। কিন্তু আমরা এটা দেখব যে, এই মতবাদ বেশ বড়ো মাপের অন্যান্য অসুবিধা ডেকে আনে।

বিবিসি-র আলোচনার পরিধিতে, যেখান থেকে আমি এইসব উদ্ধৃতিগুলো ব্যবহার করছি, সেখানে এই 'উত্থানশীল' মতবাদের একমাত্র প্রতিনিধি প্রফেসর আলেকজান্ডার। তিনি শুরু করেন এটা বলে যে, মৃত বস্তু, জীবন্ত বস্তু, এবং মন পরম্পরাগতভাবে আবির্ভূত হয়েছে এবং তিনি বলে চলেন যে, 'মি. লয়েড মরগান এই ধারণা এবং এই শব্দটি প্রচলন এবং পুনঃপ্রচলন করেছেন। এখন তাঁর ধারণার বিকশিত রূপ হলো উত্থানশীলতা। জীবন, বস্তু থেকে আবির্ভূত হয় এবং মন, আবির্ভূত হয় জীবন থেকে। একটি জীবন্ত সত্ত্বা একটি বস্তুগত সত্ত্বাও বটে।

কিন্তু একটি নতুন গুণ প্রমাণে এত সচেষ্ট যে এই নতুন গুণটাই হলো জীবন। জীবন থেকে মনে উত্তরণের ব্যাপারে এই একই কথা বলা যায়। একটি 'মননশীল' সত্ত্বা একই জীবন্ত সত্ত্বা। কিন্তু বিকাশের এত জটিলতা, এর কোন্ অংশে এত সূক্ষ্মভাবে এটা সংগঠিত বিশেষত স্নায়ুতন্ত্রে? এই স্নায়ুতন্ত্র মনকে বহন করে। আপনি চাইলে এটাকে চৈতন্যও বলতে পারেন।'

তিনি আরও বলেন যে, এমন কোনো কারণ নেই যার ফলে এই প্রক্রিয়া মনের সঙ্গে থেমে যাবে। পক্ষান্তরে, এটা মনের অতীত একটি অতিরিক্ত অস্তিত্বের গুণের কথা বলে, যেটি মনের সঙ্গে সম্পর্কিত। কারণ মন তো জীবন এবং জীবন তো বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত। এই গুণটাকে আমি দেবতা বলি এবং যে-সত্ত্বা এই গুণকে ধারণ করে সেই-তো ঈশ্বর। অতএব, আমার আছে এটা মনে হয় যে, সমুদয় বস্তুই এই গুণের প্রকাশমানতার দিকে নির্দেশ করে। এই কারণেই আমি বলেছিলাম যে, বিজ্ঞান নিজে, যখন একটা ব্যাপকতর ধারণা গ্রহণ করে, তখন তার একটি দেবতার প্রয়োজন হয়।' তিনি বলেন যে, পৃথিবীটা 'চেষ্টা করছে অথবা ঝুঁকে পড়ছে, দেবত্বের দিকে।' কিন্তু 'পৃথিবীর অস্তিত্বের এই পর্যায়ে দেবতা তাঁর স্বাতন্ত্র্যনির্দেশক প্রকৃতি নিয়ে এখনও পর্যন্ত আবির্ভূত হননি।' তিনি আরও বলেন যে, তাঁর কাছে ঈশ্বর 'ঐতিহাসিক ধর্মে বলা একজন স্রষ্টা নন, কিন্তু তিনি সৃষ্ট।'

প্রফেসর আলেকজান্ডারের ধারণার সঙ্গে বার্গসনের 'সৃষ্টিশীল বিবর্তনে'র ধারণার একটা ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য রয়েছে। বার্গসন মনে করেন যে, বহিঃর্নিয়ন্ত্রণবাদ ভুল, কারণ বিবর্তনের গতিপথে প্রকৃত অভিনবত্ব দেখা দেয় যা নিয়ে আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না এবং এমনকি কল্পনাও করা যায় না। একটা রহস্যজনক শক্তি যা সবকিছুকেই বিবর্তিত হতে তাড়িত করে। উদাহরণস্বরূপ, দেখতে পায় না এমন একটি প্রাণীর দর্শনের কতিপয় রহস্যময় পূর্বাভাস আছে এবং প্রাণীটি এমনভাবে কাজ করে যা তার চোখের বিকাশকে চালিত করে।

প্রতি মুহূর্তে নতুন কিছুর আবির্ভাব ঘটে কিন্তু অতীত কখনও মরে যায় না। এটা স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকে, কারণ ভুল কেবলমাত্র আপাত। এভাবে পৃথিবী ধারাবাহিকভাবে, বিষয়বস্তুগতভাবে সমৃদ্ধ হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এটি একটি সুন্দর আবাস হয়ে উঠবে। যেটা এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তা হলো প্রজ্ঞাকে এড়িয়ে চলতে হবে যেটা পশ্চাৎগামী এবং নিশ্চল বলে প্রতিভাত হয়। আমাদের যেটা অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে তা হলো স্বজ্ঞা, যা নিজের মধ্যে সৃষ্টিশীল অভিনবত্বের তাড়না ধারণ করে থাকে।

এটা অবশ্যই ধরে নেওয়া যাবে না যে, মন্দ জীববিজ্ঞানের আনুষঙ্গিক প্রকোরোসমূহের বাইরে ল্যামার্কের স্মারক হিসাবে এসব কিছু বিশ্বাস করার জন্য

কারণ দর্শানো হয়েছে। বার্গসনকে কবি হিসাবে বিবেচনা করতে হবে এবং তাঁর নিজের নীতিসমূহের বিষয়ে সবকিছু এড়িয়ে যেতে হবে যা প্রজ্ঞার কাছে আবেদন রাখে।

আমি মনে করি না যে, প্রফেসর আলেকজান্ডার বার্গসনের দর্শনকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে ধারণাগত মিল রয়েছে যদিও তাঁরা দু'জনেই স্বাধীনভাবে এই ধারণা বিকশিত করেছেন। যাই হোক, তত্ত্বগুলো সময়ের উপর জোর দেবার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে। ঐকমত্য বজায় থাকে এ-ব্যাপারেও যে, বিবর্তনের গতিপথে অনির্দেশ্য অভিনবত্বের আবির্ভাব ঘটে।

নানাবিধ অসুবিধা উত্থানশীল বিবর্তনের দর্শনকে অসন্তোষজনক করে। সম্ভবত এসবের মধ্যে প্রধান অসুবিধাটা হলো, বহিঃনিয়ন্ত্রণবাদ থেকে বেরিয়ে আসতে, ভবিষ্যদ্বাণীকে অসম্ভব করে তোলে এবং তবুও এই তত্ত্বের অনুগামীরা ঈশ্বর-অস্তিত্বের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে। এঁরা যথার্থভাবেই বার্গসনের সেল-ফিসের (shell-fish) অবস্থায় যারা দর্শন করতে চায় যদিও জানে না দর্শন করাটা আসলে কী। প্রফেসর আলেকজান্ডার মনে করেন যে, কতিপয় অভিজ্ঞতায় 'দেবতা' সম্পর্কে আমাদের অস্পষ্ট সচেতনতা রয়েছে। এটাকে তিনি 'ঐশ্বরিকতা' বলে বর্ণনা করেন। এ-ধরনের অভিজ্ঞতাকে বৈশিষ্ট্য দান করে এমন অনুভূতি হলো, তাঁর মতে, কোনো কিছুর রহস্যের জ্ঞান যা আমাদের আতঙ্কিত করতে পারে অথবা আমাদের অসহায় অবস্থায় সহায়তা করতে পারে। কিন্তু এটা হলো যে-কোনো কিছু আলাদা যা আমরা আমাদের জ্ঞান অথবা আমাদের ভাবনার সাহায্যে জানতে পারি।' এই অনুভূতিকে গুরুত্ব দেবার কোনো কারণ তিনি দেন না, অথবা তাঁর তত্ত্ব যেমন দাবি করে, মানসিক বিকাশ জীবনে একটি বৃহত্তর উপাদান হিসাবে তৈরি করে দেয়। নৃতত্ত্ববিদদের কাছ থেকে যে-কেউ পুরোপুরি বিপরীত ধারণাটাই অবধারণ করবেন। বন্ধুত্বপূর্ণ কিংবা শত্রুতাপূর্ণ অ-মানবীয় শক্তির রহস্যের জ্ঞান, সভ্য মানুষের চেয়ে আদিম বর্বর মানুষের জীবনে অনেক বেশি ভূমিকা পালন করে। বস্তুত, ধর্মকে যদি এই অনুভূতির সঙ্গে চিহ্নিত করতে হয় তাহলে জ্ঞাত মানুষের উন্নতির প্রতিটি পদক্ষেপে ধর্মের হ্রাসপ্রাপ্তির কথা বলতে হয়। তাহলে উত্থানশীল দেবতার জন্য ধরে-নেওয়া বিবর্তনমূলক যুক্তি এক্ষেত্রে খাটে না।

যুক্তিটা, যেভাবেই হোক, লক্ষণীয়ভাবে হালকা। যুক্তি দিয়ে বলা হয় বিবর্তনের তিনটি স্তর—বস্তু, জীবন এবং মন। এটা ধরে নেবার কোনো কারণ নেই যে, পৃথিবীর বিবর্তন পর্যায় শেষ করে ফেলেছে। সুতরাং, সম্ভবত পরের কোনো এক সময়ে শুরু হবে চতুর্থ পর্যায়, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ প্রভৃতি, এমনটা হলে

ধরে নিতে পারে। কিন্তু এমনটা হবে না, চতুর্থ পর্যায়ের সঙ্গেই বিবর্তন সম্পূর্ণ হবে। এখন বস্তু আগাম জীবনকে দেখতে পাচ্ছে না এবং জীবনও আগে থেকে মনকে দেখতে পারছে না, কিন্তু মন ক্ষীণভাবে পরবর্তী পর্যায় আগেই দেখতে পারছে, বিশেষত এটা যদি একজন পুয়ার অধিবাসী কিংবা একজন বুশমানের মন হয়। এটা স্পষ্ট যে, এসব কিছুই কেবল আন্দাজি ব্যাপার। এটা সত্য হিসাবে ঘটতেও পারে কিন্তু এটা ঘটবে এমনটা ধরে নেবার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। উত্থানশীল দর্শন এটা বলায় পুরোপুরি সঠিক যে, ভবিষ্যৎ অনির্দেশ্য। কিন্তু এই দর্শনটা এটা বলেই আবার ভবিষ্যদ্বাণী পড়তে এগিয়ে যায়। যে-ধারণার জন্য 'ঈশ্বর' শব্দটা, এ পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে, এই ধারণার চেয়ে মানুষ 'ঈশ্বর' শব্দটা ত্যাগ করতে বেশি অনিচ্ছুক। ঈশ্বর এই পৃথিবী সৃষ্টি করেননি, এটা উত্থানশীল বিবর্তনবাদীদের বোঝানোর পর তাঁরা এটা বলতে সন্তুষ্ট যে, পৃথিবী ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে। কিন্তু নামটি ছাড়া এ ধরনের ঈশ্বরের সঙ্গে ঐতিহ্যগতভাবে পূজিত বস্তুর প্রায় কোনো সাযুজ্য নেই।

এর রূপ যাই হোক সাধারণভাবে মহাজাগতিক উদ্দেশ্যের দুটো সমালোচনা রয়েছে। প্রথমত, যারা মহাজাগতিক উদ্দেশ্যে বিশ্বাস করেন তাঁরা সর্বদা ভাবেন যে, এ পর্যন্ত বিবর্তিত পৃথিবীর গতিপথের মতো পৃথিবীটা বিবর্তিত হতেই থাকবে। দ্বিতীয়ত, তাঁরা মনে করেন যে, এ-পর্যন্ত যা ঘটে গেছে সেটাই ব্রহ্মাণ্ডের শুভ মনোভাবের লক্ষ্য। এই দুটো বিবৃতি নিয়েই প্রশ্ন রয়েছে।

বিবর্তনের গতিপথ নিয়ে যুক্তিটা প্রধানত আহরিত হয়েছে জীবন-শুরু-হওয়া থেকে এই পৃথিবীতে যা- ঘটেছে সেই ঘটনা থেকে। পৃথিবীটা এখন ব্রহ্মাণ্ডের একটি ক্ষুদ্র কোণ, এবং এটা ধরে নেবার মতো কারণ রয়েছে যে, এই পৃথিবীটা বাকি অংশের মতো নির্দিষ্ট ধরনের নয়। বর্তমান সময়ে অন্য কোথাও জীবন আছে কি না, তা নিয়ে জেমস জিনস্ খুবই সংশয়ী। কোপার্নিকাসের বিপ্লবের আগে এটা ধরে নেওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল যে, ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বিশেষভাবে পৃথিবীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু এটা এখন একটা অগ্রহনযোগ্য প্রকল্প হিসাবে বিবেচিত হয়। মহাবিশ্বের যদি মনের বিবর্তন ঘটানোই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আমাদের অবশ্যই এটাকে এত দীর্ঘ সময়ে এত কম উৎপাদনের জন্য অযোগ্য বিবেচনা করতে হবে। এটা অবশ্যই সম্ভব যে, পরে অন্য কোথাও আরও মন সৃষ্টি হবে। কিন্তু এ সম্পর্কে আমাদের সামান্যতম বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য নেই। এটা উদ্ভটই মনে হয় যে, আকস্মিকভাবে জীবন শুরু হবে কিন্তু এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে আকস্মিকতা তো ঘটবেই।

এমনকি যদি আমরা এই কৌতূহলী ধারণাটাও গ্রহণ করি যে, মহাজাগতিক উদ্দেশ্যটা বিশেষভাবে আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রহ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট, তাহলেও আমরা

দেখবো সংশয় করার কারণ রয়েছে যে, এই গ্রহের কাজ সম্পর্কে ধর্মতাত্ত্বিকরা যা বলেন পৃথিবী নামক গ্রহটা কি তাই করে? পৃথিবীটা (যদি না আমরা যথেষ্ট নিউক্লিয়ার গ্যাস ব্যবহার করে সমুদয় জীবন ধ্বংস করে ফেলি) সম্ভবত আরও বহু সময় ধরে বাসযোগ্য থাকবে, কিন্তু চিরকাল থাকবে না। সম্ভবত, আমাদের পরিমণ্ডল ধীরে ধীরে ক্রমে মহাশূন্যে মিলিয়ে যাবে, সম্ভবত জোয়ার-ভাটা পৃথিবীর একটা দিককে সবসময় সূর্যমুখীন করে দেবে। এর ফলে একটা গোলার্ধ ভীষণ গরম হবে এবং অন্যটা বেজায় ঠাণ্ডা হবে। সম্ভবত (যেমনটা জেবিএস-এর একটা নীতিগল্পে রয়েছে) চাঁদ হুমড়ি খেয়ে পৃথিবীতে পড়বে। প্রথম যদি এসব ঘটনার একটিও না ঘটে, আমরা সবাই যেভাবেই হোক ধ্বংস হয়ে যাবো যখন সূর্যটা বিস্ফোরিত হয়ে একটি লাল শ্বেত বামনে পরিণত হবে। যেমনটা জিনস্ আমাদের বলেছেন যে, এটা ঘটবে প্রায় এক মিলিয়ন মিলিয়ন বছরে, যদিও সঠিক তারিখটা এখনও কিছুটা অনিশ্চিত।

এক মিলিয়ান মিলিয়ন বছর শেষের সে-দিনের জন্য তৈরি হবার কিছুটা সময় দেবে এবং আমরা আশা করি ইতোমধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানে এবং বড়ো কামনা নিয়ন্ত্রণ কৌশলে যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বাসযোগ্য গ্রহ সমেত আর একটা নক্ষত্র আবিষ্কার করে ফেলতে পারেন এবং গোলন্দাজরা ওই গ্রহের অভিমুখে আমাদের উড়িয়ে দিতে পারেন আলো চলার গতিতে। এমন হলে, এমন যাত্রার যাত্রীরা যৌবনে যাত্রা শুরু এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুর আগে ওই গ্রহে পৌঁছতে পারবেন। এটা সম্ভবত একটা ক্ষীণ আশা। কিন্তু এটার আলো দিকটা ভাবনায় থাকুক।

যাই হোক, ব্রহ্মাণ্ডের চারদিকে ভ্রমণ, এটা যদি সর্বোত্তম যথার্থ, বৈজ্ঞানিক দক্ষতায় করা হয় তবুও এটা চিরকালের জন্য জীবনকে প্রসারিত করতে পারে না। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র আমাদের জানায় যে, মোটের ওপর, শক্তি সর্বদা কোনো সঙ্কুচিত থেকে কম সঙ্কুচিত অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়, এবং পরিশেষে সব শক্তিকেই একটা রূপের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতে হবে যেখানে পরবর্তী পরিবর্তন অসম্ভব। এটা যখন ঘটে গেছে, যদি আগে না ঘটে থাকে, জীবনকে অবশ্যই থেমে যেতে হবে। আর একবার জিনস্‌কে উদ্ধৃত করা যায়, 'ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে মরণশীলদের একটাই সম্ভাব্য জীবন হলো কবরের দিকে অগ্রগমন।' এটা কতিপয় ধারণার দিকে তাঁকে চালিত করে যেটা আমাদের বিষয়ের পক্ষে প্রাসঙ্গিক।

'পৃথিবীর বহুত্ববাদে বিশ্বাসের জন্য জিওর্দানো ব্রুনোর শহীদত্ব বরণের পর অতিবাহিত তিনটি শতক ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে প্রায় বর্ণনাতীতভাবে বদলে দিয়েছে। কিন্তু এসব ধারণা (প্রশংসনীয়ভাবে) জীবনের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের

সম্পর্কের ব্যাপারে বোধগম্যতার কাছে পৌঁছে দেয়নি। আমরা এখনও জীবনের অর্থ সম্পর্কে কেবলমাত্র অনুমান করতে পারছি যা সমস্ত দৃশ্যতার কাছে এত বিরল। এটাই কি শেষ শীর্ষবিন্দু যার অভিমুখে সমুদয় সৃষ্টি চলমান, যার জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন বছর ধরে অবাসযোগ্য নক্ষত্র এবং নেবুলায় বস্তুর রূপান্তর, এবং মরুভূমিতে বিকিরণের অপচয়, এসবগুলো অবিশ্বাস্য বেহিসাবি প্রস্তুতি? অথবা এটা কি কেবল আকস্মিক এবং সম্ভবত পুরোপুরি গুরুত্বহীন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার উপজাত, যেগুলোর অন্য কোনো এবং আরও প্রকাণ্ড সমাপ্তি, যেটা দেখা যাচ্ছে? অথবা এটা কি আরও বিনয়ী চিন্তার দিকে দিকপাত? এটাকে কি আমরা একটা রোগের প্রকৃতির মতো কিছু বলে বিবেচনা করব, যেটা বস্তুকে পরিণত অবস্থায় সম্ভাবিত করে যখন এটা অধিক উত্তাপ হারিয়েছে এবং উচ্চমাত্রার বিকিরণ তৈরির ক্ষমতা যার সঙ্গে মিশে কম বয়েসি এবং অধিক সবল বস্তু তৎক্ষণাৎ জীবন ধ্বংস করবে? অথবা দীনতা পাশে সরিয়ে রেখে আমরা কি কল্পনার ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ নেবো যে, এটাই একমাত্র বাস্তব যেটা সৃষ্ট হবার পরিবর্তে সৃষ্টি করে নক্ষত্র ও নেবুলার বিপুল ভর এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় সময়ের প্রায় অভাবনীয় দীর্ঘ দিগন্ত?

এটা, আমি মনে করি, বিকল্পের বর্ণনা করে যেটা বিজ্ঞান সঠিকভাবে এবং পক্ষপাতিত্বহীনভাবে হাজির করেছে। সর্বশেষ সম্ভাবনা যে, মনই হলো একমাত্র বাস্তবতা এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের স্থান ও সময় এটার দ্বারাই সৃষ্ট, এটার পক্ষেই যৌক্তিকভাবে অনেক কিছু বলতে হবে। কিন্তু বিষণ্ন সিদ্ধান্ত এড়ানোর আশায় যাঁরা এটা গ্রহণ করেন তাঁরা পুরোপুরি বুঝতে পারেন না এটা কী দরকার। আমি সরাসরি যে সব জানি সেসব আমার মনের 'অংশ' এবং যে-অনুমান থেকে অন্যান্য বস্তুর অস্তিত্বে পৌঁছই সেগুলো কোনোক্রমেই তর্কাতীত নয়। সুতরাং এটা হতে পারে যে, আমার মন ছাড়া কিছুই অস্তিত্বশীল নয়। সেক্ষেত্রে আমি যখন মারা যাব, ব্রহ্মাণ্ডটা শেষ হবে। কিন্তু আমি যদি আমার নিজের মনটি ছাড়াও অন্যের মন স্বীকার করি, তখন আমাকে অবশ্যই গোটা জ্যোতির্বিজ্ঞানীর ব্রহ্মাণ্ডকে স্বীকার করতে হবে, কারণ উভয় ক্ষেত্রেই সাক্ষ্য সমান শক্তিশালী। অন্য লোকেদের দেহ নেই, কিন্তু তাদের মন আছে, জিন্‌সের এই শেষ বিকল্পটা সন্তোষজনক তত্ত্ব নয়। এটা এমন একটা তত্ত্ব যার কথা, আমি একা শূন্য ব্রহ্মাণ্ডে, মানবজাতি, পৃথিবীর প্রাবিদ্যার বয়স, সূর্য, নক্ষত্র, এবং নেবুলা এসব আবিষ্কার করছি আমার উর্বর কল্পনার সাহায্যে। আমি যতদূর জানি এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে কোনো স্বীকার্য তর্কশাস্ত্রীয় যুক্তি নেই। কিন্তু অন্য কোনো মতবাদের বিরুদ্ধে যে, মনই হলো একমাত্র বাস্তবতা সেখানে অন্য মানুষের মন থাকার সাক্ষ্য তাদের দেহ থাকার সাক্ষ্য থেকে গৃহীত। অন্য মানুষদের যদি তাদের মন থাকে তাহলে তাদের দেহও

রয়েছে। কেবলমাত্র একজনেরই বিদেহী মন থাকতে পারে, কিন্তু কেবলমাত্র
একজনই যদি অস্তিত্বশীল থাকে।

মহাজাগতিক উদ্দেশ্যের আলোচনায় আমি এখন শেষ প্রশ্নটায় আসব।
ব্রহ্মাণ্ডের শুভ মনোভাবের এ-পর্যন্ত সাক্ষ্যের কি ঘটল? এটা বিশ্বাস করার
তথাকথিত কারণ, যেটা আমরা দেখেছি, ব্রহ্মাণ্ডে আমাদিগকে সৃষ্টি করেছে। আমি
এটা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু এই ধরনের একটি দীর্ঘ প্রস্তাবনায় যথাযথ
বিচার করতে আমরা কি সত্যি সত্যি এত গৌরবমণ্ডিত? দার্শনিকগণ মূল্যবোধের
উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁরা বলেন যে, আমরা ভাবি কতিপয় বস্তু ভাল,
এবং যেহেতু এই বস্তুগুলো উৎকৃষ্ট, ওগুলো উৎকৃষ্ট ভাবতে আমাদেরও ভাল
হতে হবে। কিন্তু এটা একটা প্যাঁচালো যুক্তি। ভিন্ন মূল্যবোধ নিয়ে একজন কেউ
আমাদের এত নৃশংস বলে ভাবতে পারেন যে, প্রমাণ স্বরূপ তিনি বলবেন আমরা
শয়তানের দ্বারা অনুপ্রাণিত। মানুষ একখানা আয়না সামনে ধরে তার দিকে
তাকিয়ে এটা কী ভাববে যে তারা অসাধারণ সুন্দর যা কিছু দেখতে পায় তাতেই
মহাজাগতিক উদ্দেশ্য যা সর্বদা তাদের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে? মানুষের
গৌরবান্বিত হওয়া কেন? সিংহ এবং বাঘের ব্যাপারে কী হবে? এরা, আমরা যা
করি, তার চেয়ে অনেক কম প্রাণী অথবা মানবজীবন ধ্বংস করে এবং
আমাদের থেকে অনেক সুন্দর। পিঁপড়েদের ব্যাপারটাই-বা কী? যে কোনো
ফ্যাসিস্টের তুলনায় এরা অনেক ভালোভাবে কর্পোরেট স্টেট পরিচালনা করে।
আমাদের মানুষদের নিষ্ঠুরতা, অবিচার এবং যুদ্ধের পৃথিবী থেকে নাইটিঙ্গেল
গায়ক পাখি, এবং হরিণের পৃথিবী অধিকতর ভালো নয় কী? মহাজাগতিক
উদ্দেশ্যের বিশ্ববাসীরা তথাকথিত বুদ্ধিবৃত্তির থেকে বেশি প্রদর্শনের চেষ্টা করে,
কিন্তু তাদের লেখাপত্র যে কোনো ব্যক্তিকে এ-ব্যাপারে সংশয়ী করে তোলে।
আমাকে সর্বশক্তিমান হওয়ার যোগ্যতা প্রদান করা হত, এবং লক্ষ লক্ষ বছর
পরীক্ষণের সুযোগ পেতাম, তাহলে আমার সমুদয় প্রচেষ্টার ফলাফল দিয়ে
মানুষকে বেশি গর্ব করতে দিতাম না।

অনালোকিত স্থানের একটা কৌতূহলী দুর্ঘটনা হিসাবে মানুষ বোধগম্য।
পাপ ও পুণ্যের মিশ্রণ এমনই যা আকস্মিক উৎস থেকে উঠে-আসা ফলাফল
প্রত্যাশিত। কিন্তু কেবল সীমাহীন আত্মতুষ্টি মানুষের মধ্যে একটা কারণকে
সর্বশক্তিমান পর্যাপ্ত বলে বিবেচনা করতে পারেন, স্রষ্টার একটা উদ্দেশ্য হিসাবে
কোপার্নিকাসের বিপ্লব তার কাজটা ঠিকমতো করতে পারবে না যে-পর্যন্ত না
মানুষকে আরও বেশি বিনয় শেখাতে পারছে, যে-বিনয় তাদের মধ্যে দেখা যায়।
এরাই ভাবেন মানুষ হলো মহাজাগতিক উদ্দেশ্যের পর্যাপ্ত সাক্ষ্য।

অধ্যায় ৯
বিজ্ঞান ও নৈতিকতা

বিজ্ঞানের অপ্রতুলতায় যারা বিশ্বাস করেন, যেমনটা আমরা এর আগের অধ্যায় দুটোতে দেখলাম, তাঁরা এই ঘটনায় বিশ্বাস রাখেন যে, 'মূল্যবোধ' নিয়ে বিজ্ঞানের কিছু বলার নেই। এটা আমি স্বীকার করি। কিন্তু যখন এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো হয় যে, মূল্যবোধ যে-সত্য ধারণ করে, সেটা বিজ্ঞান প্রমাণ বা অপ্রমাণ করতে পারে না, তখন আমি এ-কথাটা অস্বীকার করি। পদার্থ এমন একটা কিছু যার সম্পর্কে পরিষ্কার ভাবনা-চিন্তা করা আদপেই সহজ নয়। এ সম্পর্কে তিরিশ বছর আগে যে ধারণা ছিল আমার ধারণা তার থেকে আলাদা। কিন্তু এটা সম্পর্কে পরিষ্কার হওয়া দরকার যদি আমরা পরম উদ্দেশ্যের তত্ত্ব সম্পর্কে এ-ধরণের যুক্তিগুলো যাচাই করে দেখতে চাই। নৈতিকতা সম্পর্কে মতবাদগুলোর কোনো একমত্য গড়ে ওঠেনি। এই কারণে এটা অবশ্যই বুঝতে হবে যে, যা ধারণা করব, সেসব আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, বিজ্ঞানের প্রবচন নয়।

ঐতিহ্যগতভাবে, নৈতিকতার গঠন-পাঠনের দুটো ভাগ। একটা নৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে যুক্ত। অন্যটির কথা, ভালোর নিজস্ব ধারণার ভালো কী, এ বিষয়টা। আচরণবিধির অনেকগুলোর একটা অনুষ্ঠানগত মৌলিকতা আছে। এটা অসভ্য এবং আদিম মানুষের জীবনে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করে। গোষ্ঠীপ্রধানের থালা থেকে খাবার খাওয়া নিষিদ্ধ অথবা ছাগছানাকে তার মায়ের দুধপানে বিরক্ত না করা; দেবদেবীর কাছে আত্মত্যাগের নির্দেশ প্রদান, এগুলো উন্নতির একটা ধাপে ভীষণই প্রয়োজন যদিও এসব মানুষের জন্য নয়। অন্যান্য নৈতিক মূল্যবোধগুলো যেমন খুন ও চৌর্যবৃত্তির নিষিদ্ধকরণ, এগুলোর স্পষ্টতই অধিকতর সামাজিক উপযোগিতা রয়েছে। এবং এসব আদিম ধর্মতাত্ত্বিক প্রথার সঙ্গে মূলগতভাবে যুক্ত থাকায় এগুলো কালোত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু মানুষের চিন্তাশীলতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তারা এসব বিধানের উপর কম জোর দিয়ে মনের অবস্থার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে শুরু করেছে। এই পরিবর্তন দুটো উৎস থেকে উঠে এসেছে। একটি দর্শন। অন্যটি অতীন্দ্রিয় ধর্ম। আমরা সবাই পয়গম্বর এবং সুসমাচারের বক্তব্যগুলোর সঙ্গে সুপরিচিত। এসবে হৃদয়ের পবিত্রতাকে বিধান-এর খুঁটিনাটির চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেন্ট পল কর্তৃক বদান্যতার সবিশেষ প্রশংসা অথবা ভালোবাসা একই নীতি শেখায়। একই জিনিস খ্রিস্টীয় অথবা অখ্রিস্টীয় সমুদয় অতীন্দ্রিয়বাদীর মধ্যেই দেখা যাবে। এঁরা সবাই মনের অবস্থানকেই মূল্য দেন এবং এই মূল্য থেকেই, যেমনটা তাঁরা মনে করেন, সঠিক আচরণ সুনিশ্চিত হবে। বিধানকে বাহ্যিক মনে হয় এবং এটা পরিস্থিতির সঙ্গে অপর্যাপ্তভাবে অভিযোজিত।

পন্থাসমূহের মধ্যে একটা পন্থায় বাহ্যিক আচরণবিধির কাছে আনোমিয়ান প্রয়োজনীয়তা এড়িয়ে চলা হয়েছে। এই এড়িয়ে চলাটা আসলে 'বিবেকে' বিশ্বাস রাখা। এটা আবার প্রটেস্টান্ট নৈতিকতায় একটা সবিশেষ গুরুত্ব বিষয়। এটা ধরে নেওয়া হয়েছে যে, কোন্‌টি ঠিক এবং কোন্‌টা ভুল, ঈশ্বর তা প্রতিটি মানবহৃদয়ের কাছে প্রকাশ করেন, যাতে পাপ এড়ানোর জন্য মানুষ কোন্ অন্তরের বাণীটাই শুনতে পান। এই তত্ত্বে অবশ্য দুটো অসুবিধা রয়েছে। প্রথম বিবেক বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন বাণী শোনাতে পারে। দ্বিতীয়ত, নির্জ্ঞানের আমাদেরকে ন্যায়পরায়ণতার জাগতিক কারণসমূহের ধারণা দিয়েছে।

বিবেকের বাণীর ভিন্নতা সম্পর্কে বলা যায়, তৃতীয় জর্জের বিবেক তাকে বলেছে যে, ক্যাথলিক মুক্তি মঞ্জুর করা তাঁর অনুচিত। কারণ তিনি যদি এটা করেন তাহলে তিনি 'করোনেশন ওথে'র শপথ ভঙ্গ করবেন। কিন্তু পরবর্তী সম্রাটদের এ-ধরনের কোনো ঔচিত্য-অনৌচিত্য বোধ ছিল না। বিবেক কাউকে বা ধনীদের গরিবদের দ্বারা ধনীদের লুণ্ঠনপ্রবৃত্তিকে নিন্দা করতে পরিচালিত করে। এমনটা বলে থাকেন কম্যুনিস্টরা। অন্যদের আবার এই বিবেকই ধনীদের দ্বারা গরিবদের শোষণকে নিন্দা করতে বলে। এমন শোষণই পুঁজিপতিরা করে থাকে। বিবেক একজনকে নির্দেশ দেয়, আগ্রাসনের সময় মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে। আবার অন্যকে বলে, যুদ্ধে অংশগ্রহণ অনিষ্টকর। মহাযুদ্ধের সময় কর্তৃপক্ষ, যাদের মধ্যে কেউ কেউ নৈতিকতার পাঠ নিয়েছেন, তাঁদের কাছে বিবেকটাকে জটিল বস্তু বলে মনে হয়েছিল। তাঁরা কিছু কৌতূহলী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেগুলো, একজন ব্যক্তির নিজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য বিবেকসম্মত উচিত-অনুচিত বোধ থাকা দরকার। কিন্তু অন্য একজন মানুষের বিরুদ্ধে যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে কর্মরত, তার বিরুদ্ধে লড়াই করা ঠিক নয়। তাঁরা আরও মনে করেন যে, যখন বিবেক এ ধরনের যুদ্ধকে অনুমোদিত করে না, তখন চলতে-থাকা যুদ্ধকেও হতোদ্যম করা ঠিক নয়। যে-কোনো কারণেই হোক, যাঁরা যুদ্ধ করাকে অন্যায় মনে করেছিলেন তাঁরা কিছুটা আদিম এবং 'বিবেকে'র অবৈজ্ঞানিক ধারণায় তাঁদের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

বিবেকের নির্দেশের বৈচিত্র হলো যখন এর মৌলিকতা বোঝা যাবে তখন প্রত্যাশাটা কী হবে। প্রথম যৌবনে কতিপয় ধরনের কার্যাবলী অনুমোদিত হয় এবং অন্য কিছু কাজ অনুমোদিত হয় না। সংযুক্তির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়, আমরা এবং অস্বস্তি কার্যাবলীর সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে। এই যুক্ত করার মধ্যে অনুমোদন এবং অননুমোদনের কোনো ভূমিকা থাকে না। সময় চলতে থাকে

পরে, আমরা আমাদের আগের নৈতিক প্রশিক্ষণ ভুলে যেতে পারি। তবু আমরা এখনও কতিপয় কাজ সম্পর্কে আমাদের অস্বস্তি অনুভব করি। আর অন্যান্য কাজ আমাদের নৈতিক উৎকর্ষের প্রভাব দিতে পারে। অন্তদর্শনে এসব উপলব্ধি রহস্যময়, কারণ যে-পরিস্থিতি মূলত এসব কাজের হেতু ছিল সেটাকে আমরা আর স্মরণে রাখি না। অতএব এটা স্বাভাবিক যে, এসব কাজকে হৃদয়ে ঈশ্বরের বাণী বলে মনে করি। কিন্তু আসলে বিবেক হলো শিক্ষার উপজাত। এই বিবেককে মানবজাতির বিপুল সংখ্যাধিক্য মানুষের মধ্যেই অনুমোদন কিংবা অননুমোদনের প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়, যেমনটা শিক্ষাবিদগণ উপযুক্ত মনে করবেন। সুতরাং বাহ্যিক নৈতিক বিধান থেকে নৈতিকতাকে মুক্ত করার ইচ্ছেটা একটা অধিকার। এটা অবশ্য 'বিবেকের' ধারণার দ্বারা সন্তোষজনকভাবে লাভ করা কঠিন।

দার্শনিকগণ ভিন্ন পথে ভিন্ন অবস্থানে পৌঁছেছেন যেখানে আচরণের নৈতিক বিধানের একটা গৌণ স্থান রয়েছে। তাঁরা 'ভালো'র একটা ধারণা তৈরি করেছেন। এ ধারণার দ্বারা তাঁরা বোঝাতে চাইছেন যে, যা অস্তিত্বশীল তাই আমরা দেখতে চাই। এই ধারণার মানুষেরা যদি আস্তিক হন তাহলে 'ভালো' বলতে তাঁরা তাই বুঝবেন যা ঈশ্বরের কাছে আনন্দদায়ক। বেশিরভাগ মানুষই এ-বিষয়ে একমত হবেন যে, দুঃখের চেয়ে আনন্দ কাম্য, বন্ধুত্বহীনতার চেয়ে বন্ধুতাই কাম্য এবং এমনতর আরও কিছু। এই ধারণার তেমন নৈতিক বিধানগুলোই যুক্তিপূর্ণ যদি তারা নিজ থেকে যা-ভালো তার উন্নতি বিধানে সাহায্য করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খুন নিষিদ্ধ করার বিধানকে খুনের পরিণতি দিয়ে যুক্তি সিদ্ধ করা যায়। কিন্তু বিধবাদের তাদের স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারার অভ্যাসের ন্যায্যতা যুক্তিসিদ্ধ করা যায় না। এই কারণে আগের বিধানটা রক্ষা করতে হবে, পরেরটা নয়। এমনকি সর্বশ্রেষ্ঠ নৈতিক বিধানের কতিপয় ব্যতিক্রম থাকে, কারণ কোনো ধরনের কাজেরই সর্বদা খারাপ পরিণতি হয় না। আমাদের তাহলে তিনটি পৃথক ধারণা রয়েছে যা দিয়ে বোঝা যায় একটা কাজ নৈতিকভাবে প্রশংসনীয় কেন। এগুলো হলো, (১) প্রাপ্ত নৈতিক আচরণ অনুযায়ী এটা হতে পারে (২) শুভ পরিণতির আন্তরিক ইচ্ছা থাকতে পারে (৩) এতে বাস্তবত উত্তম পরিণতি থাকতে পারে। যাই হোক, তৃতীয় ধারণাটা নৈতিকতায় অনুমোদিত। গোঁড়া ধর্মমত অনুসারে জুডাস ইস্‌কেরিটাসের বিশ্বাসঘাতকতার কাজটার একটা উত্তম পরিণতি হয়েছিল কারণ প্রায়শ্চিত্তের জন্য এটা প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু এই কারণেই এটা প্রশংসনীয় ছিল না।

বিভিন্ন দার্শনিক 'মহত্ত্বের' নানা ধারণা গঠন করেছেন। কেউ কেউ মনে করেন, এটা ঈশ্বরের জ্ঞান ও ভালোবাসায় গঠিত। অন্যেরা মনে করেন, চিরন্তন

ভালোবাসায়। অন্য অনেকের ধারণা, এটা আছে সৌন্দর্যের উপভোগে। অন্য অনেকের মনে হয় এটা রয়েছে আনন্দ উপভোগে। মহত্ত্বটা একবার সংজ্ঞায়িত হয়ে গেলে, অন্যান্য নৈতিকতা একে অনুসরণ করে। আমাদের অবশ্যই সেভাবে কাজ করা উচিত যেভাবে আমরা বিশ্বাস করি। এটা করা যায় সেভাবেই চেষ্টা করা উচিত। নৈতিক বিধি গঠন, যতক্ষণ চরম শুভ জ্ঞাত বলে ধারণা, এটাই বিজ্ঞানের বিষয়। উদাহরণস্বরূপ, চৌর্যবৃত্তির জন্য কি মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা উচিত? অথবা এই মৃত্যুদণ্ড কি কেবল খুনের ঘটনার জন্য নির্দিষ্ট থাকবে? নাকি এটা একদমই থাকবে না? জেরমি বেন্থাম আনন্দকে শুভ বলে মনে করতেন। কোন্ দণ্ডবিধি বেশি পরিমাণে আনন্দ সৃষ্টি করবে এটা প্রচলনের লক্ষ্যে তিনি নিজেই কাজ করেছেন। অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এই দণ্ডবিধি বর্তমানে প্রচলিত দণ্ডবিধির তুলনায় কম কঠোর হবে। কেবল আনন্দই শুভ, এই ধারণা ছাড়া বাকি সবকিছু বিজ্ঞানের পরিসরে আসবে।

এটা অথবা ওটা 'শুভ' বলে আমরা যা বুঝি, সেটা সুনির্দিষ্ট করতে যখন আমরা চেষ্টা করি, তখনই আমরা নিজেদেরকে বিরাট অসুবিধার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে ফেলি। বেন্থামের মতবাদ, আনন্দই হলো 'শুভ'। তাঁর এই মতবাদ প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়েছিল। এটাকে বলা হতো শূকরের দর্শন। তিনি কিংবা তাঁর বিরোধীরা কোনো যুক্তি দিতে পারেননি। একটা বৈজ্ঞানিক প্রশ্নে, দুই তরফেই সাক্ষ্য হাজির করতে হয়। শেষ পর্যন্ত এক পক্ষের সাক্ষ্য অধিকতর ভালো বলে গণ্য হয়। অথবা, এটা যদি নাও ঘটে সেক্ষেত্রে প্রশ্নটা অমীমাংসিত থেকে যায়। কিন্তু প্রশ্নটা যদি এমন হয়, এটা কিংবা ওটা, কোনটা পরম শুভ? সেক্ষেত্রে কোনো তরফেই কোনো সাক্ষ্য নেই। প্রতিপক্ষ কেবল তার নিজের আবেগের কাছে আবেদন জানাতে পারে। এবং এমন বাগাড়ম্বড়পূর্ণ কৌশল অবলম্বন করতে পারে যাতে অন্যের মধ্যে এই একই ধরনের আবেগ জেগে ওঠে।

উদাহরণস্বরূপ, একটা প্রশ্নের কথা ধরুন, যেটা বাস্তব রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বেন্থাম বলেছেন যে, একজন মানুষের আনন্দ অন্য একজন মানুষের আনন্দের মতো একই গুরুত্ব রয়েছে, যদি পরিমাণটা একই হয়। এবং এই যুক্তিতে তিনি গণতন্ত্রের পক্ষে সওয়াল করলেন। পক্ষান্তরে, নিৎসে মনে করতেন যে, কেবলমাত্র মহৎ ব্যক্তি নিজেদের কারণেই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে এবং মানবজাতির অনেকেই তাঁর কল্যাণের উপায়মাত্র। তিনি সাধারণ মানুষকে এমনভাবে দেখতেন যেভাবে অনেক মানুষ প্রাণীদের দেখে থাকে। সাধারণ মানুষকে ব্যবহার করাটা তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করতেন। সাধারণ মানুষ ভালোর জন্য নয়, সুপারম্যানদের ভালোর জন্য। এবং এই ধারণাটাই সেই

গণতন্ত্র বাতিল করাকে যুক্তিসিদ্ধ করতে গৃহীত হয়েছে। এখানে একটা বিশাল গাণ্ডব গুরুত্বের ব্যাপারে আমাদের তীব্র মতভেদ রয়েছে। কিন্তু আমাদের বৈজ্ঞানিক অথবা বৌদ্ধিক, আদৌ কোনো উপায় নেই যার দ্বারা আমরা একদলকে বোঝাতে পারি যে, অন্যরা সঠিক। এই বিষয়ে মানুষের মতামত পরিবর্তনের উপায় আছে সত্য, কিন্তু এসব উপায়সমূহ সবই আবেগগত, বৌদ্ধিক নয়।

'মূল্যবোধ'-এর প্রশ্নে, অর্থাৎ পরিণতি ব্যতীত স্বাধীনভাবে কোন্‌টা ভালো আর কোন্‌টা মন্দ—এটা বলা বিজ্ঞানের এক্তিয়ারের বাইরে। এই কথাটাই ধর্মরক্ষাকারীরা জোরালোভাবে ঘোষণা করেন। আমি মনে করি এ-বিষয়ে তাঁরা সঠিক। কিন্তু আমি আরও একটা সিদ্ধান্তে পৌছই, যে-সিদ্ধান্তে তাঁরা পৌছন না, সেটা হলো, 'মূল্যবোধ'-এর প্রশ্নটা পুরোপুরি জ্ঞানের এক্তিয়ারের বাইরে। এ-কথার অর্থ হলো, আমরা যখন বলি যে, এটা কিংবা ওটার 'মূল্যবোধ' আছে, তখন আমরা কেবল আমাদের নিজেদের আবেগের প্রকাশ ঘটাই। এটা নয় যে, আমাদের ব্যক্তিগত অনুভূতি ভিন্নতর হলেও বিবৃত ঘটনাটা তখনও সত্যিই থেকে যাবে। এই বিষয়টা পরিষ্কার করতে আমাদের শুভ-এর ধারণাটাকে পরিষ্কার করার চেষ্টা করতে হবে।

এটা স্পষ্ট যে, ভালো ও মন্দের পুরো ধারণাটারই 'ইচ্ছা'র সঙ্গে কিছু যোগাযোগ রয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে, আমরা সবাই যা পেতে ইচ্ছে করি তাই 'ভালো' এবং আমরা সকলে যেটা ভয় করি সেটা 'মন্দ'। আমরা সবাই যদি আমাদের ইচ্ছার ব্যাপারে একমত হই, তাহলে বিষয়টাকে সেখানেই ছেড়ে দেওয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের ইচ্ছেগুলো দ্বন্দ্বে নামে। যদি আমি বলি 'আমি যা চাই সেটা ভালো'; আমার প্রতিবেশী বলবে, 'না, আমি যা চাই, সেটাই ভালো।' যদিও এমনটা নয়, নৈতিকতা হলো, আমি যেমনটা ভাবি, একটা সফলতা, এই অহংচিন্তার থেকে সরে যাওয়া। প্রতিবেশীর সঙ্গে আমার বিরোধে স্বভাবতই আমি দেখাতে চেষ্টা করব যে, আমার ইচ্ছাগুলোর এমন কিছু গুণ রয়েছে যা প্রতিবেশীর ইচ্ছার থেকে বেশি সম্মান পেতে পারে। আমি যদি আমার অধিকার রক্ষা করতে চাই, আমি জেলার ভূমিহীন অধিবাসীদের কাছে আবেদন জানাবো। কিন্তু তিনি তার দিক থেকে ভূস্বামীদের কাছে আবেদন জানাবেন। আমি বলব, 'গ্রামের সৌন্দর্যের প্রয়োজনীয়তা কী যদি কেউ এটা চোখ মেলে না দেখেন?' তিনি চটজলদি বলবেন 'কোন্ সৌন্দর্য বাকি থাকবে যদি প্রমোদ ভ্রমণকারীরা ধ্বংস ছড়িয়ে দেবার অনুমতি পায়?' প্রত্যেকে তার সমর্থক বাড়াতে চান এটা দেখিয়ে যে, তার নিজের ইচ্ছেগুলো অন্য মানুষের ইচ্ছেগুলোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যখন এটা স্পষ্টতই অসম্ভব, যেমনটা সিঁধেল চোরের ক্ষেত্রে, তখন

উক্ত ব্যক্তিটি জনমতে ধিক্কৃত হন এবং তার নৈতিক অবস্থানটা একজন পাপিষ্ঠের মতো হয়ে দাঁড়ায়।

নৈতিকতা হলো তাই রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এটা একটা দলের যৌথ ইচ্ছেগুলোকে ব্যক্তিবিশেষের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। কিংবা বিপরীত ক্রমে, ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার ইচ্ছেকে তার দলের ইচ্ছের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া। এই পরের ইচ্ছেটা অবশ্য তখনই সম্ভব যদি ইচ্ছেগুলো স্পষ্টতই সাধারণ স্বার্থের বিপরীতে না যায়। সিঁধেল চোর কখনোই মানুষকে এমনটা বোঝাতে চেষ্টা করবে না যে, মানুষের ভালো করছে, যদিও ধনদপীরা এরকম চেষ্টাই করছে এবং প্রায়ই সফল হচ্ছে। যখন আমাদের ইচ্ছেগুলো এমন জিনিসের জন্য সেগুলো সাধারণভাবে সবাই উপভোগ করতে পারে তখন এটা আশা করা যুক্তিসম্মত যে, অন্যেরা একমত হবেন। দার্শনিকরা সত্যবাদিতা, মহত্ত্ব এবং সৌন্দর্যকে মূল্য দেন। এগুলো তাঁদের নিজেদের কাছে নিজেদের ইচ্ছের প্রকাশ নয়, কিন্তু এগুলো মানবজাতির কল্যাণের নির্দেশ। সিঁধেল চোরের বিপরীতে দাঁড়িয়ে দার্শনিক এমন বিশ্বাসে সমর্থ যে, তাঁর ইচ্ছেগুলোর এমন কিছুর জন্য সেগুলো নৈর্ব্যক্তিক অর্থে মূল্যবান।

নৈতিকতা হলো এমন এক প্রয়াস যেটা কেবলমাত্র আমাদের কতিপয় ইচ্ছাকে ব্যক্তিগত নয়, চিরন্তন গুরুত্ব প্রদান করে। আমি আমাদের ইচ্ছেগুলোর মধ্যে 'কতিপয়' কথাটা বলছি কারণ এমন আরও অনেক ইচ্ছে রয়েছে যেগুলো স্পষ্টতই অসম্ভব, যেমনটা আমরা সিঁধেল চোরের ক্ষেত্রে দেখেছি। যে-ব্যক্তি কিছু গুহ্য জ্ঞানের ভিত্তিতে স্টক এক্সচেঞ্জে টাকা বাড়াচ্ছেন, তিনি অন্যদের এই ব্যাপারে সমজ্ঞানী হবার কথা ভাববেন না। সত্যটা তার ক্ষেত্রে একটা ব্যক্তিগত অধিকার, দার্শনিকের সাধারণ মান্য মহত্ত্বের মতো নয়। এটা সত্য যে, একজন দার্শনিক যখন কিছু আবিষ্কারের দাবি করেন, তিনি তখন একজন শেয়ার বাজারের দালালের পর্যায়েও নামতে পারেন। কিন্তু এটা একটা বিচ্যুতি, কারণ তাঁর পূর্ণ দার্শনিক সামর্থ্যে তিনি কেবলমাত্র সত্যের প্রত্যাশা উপভোগ করতে চান এবং এটা করার জন্য তিনি কোনোভাবেই অন্যের ব্যাপারে নাক গলান না, অন্যেরা যে এমনটাই করতে চান।

আমাদের ইচ্ছেগুলোকে চিরন্তন গুরুত্ব দেওয়া যায়। এটা নৈতিকতার কাজ। দুটো ধারণা থেকে এই চেষ্টা করা সম্ভব: একটা আইন প্রণেতার দিক থেকে। অন্যটা ধর্মপ্রচারকের দিক থেকে। প্রথমে আমরা আইন প্রণেতার দিকটা দেখব।

যুক্তির খাতিরে আমি ধরে নেব যে, আইন প্রণেতা ব্যক্তিগতভাবে অনাগ্রহী। বলা যায়, যখন তিনি তাঁর একটা ইচ্ছেকে নিজের কল্যাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে চিনতে

পারেন, তখন আইন প্রণয়ণে নিজেকে প্রভাবিত হতে দেন না। উদাহরণে বলা যায়, যেন তাঁর ব্যক্তিগত ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করতে বিধানটা তৈরি হচ্ছে না। কিন্তু তাঁর অন্য আরও ইচ্ছে রয়েছে যেগুলো নৈর্ব্যক্তিক বলে মনে হয়। তিনি রাজা থেকে কৃষক পর্যন্ত একটি সুশৃঙ্খল শ্রেণীকাঠামোতে বিশ্বাস করতে পারেন। কিংবা খনিমালিক থেকে চুক্তিবদ্ধ কালো শ্রমিক পর্যন্ত আর একটা শ্রেণীকাঠামোতে। তিনি বিশ্বাস করতে পারেন যে, নারীদের পুরুষদের প্রতি অনুগত থাকা উচিত। তিনি মনে করতে পারেন যে, নিচুশ্রেণীর মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার বিপজ্জনক। এমনতর আরো অনেক কিছু। এমন হলে যদি তিনি পারেন, তাহলে তিনি এমন বিধান গড়ে তুলবেন যেটা হবে তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থ অনুসারে। এই আত্মস্বার্থকেই তিনি বেশি মূল্য দেন। এবং তিনি নৈতিক নির্দেশের এমন একটা ব্যবস্থা গড়ে তুলবেন যেটা, যেখানে সফল হবে, মানুষকে নিকৃষ্ট বলে অনুভব করাবে, যদি তারা তাঁর[১] উদ্দেশ্য ছাড়া অন্যদের উদ্দেশ্য অনুসরণ করে। এইভাবে 'সুনীতি' একটা ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে। যদিও বিষয়ীগত মূল্যবিচারে নয়, আইন প্রণেতার ইচ্ছের উপায়স্বরূপ। কারণ তিনি বিবেচনা করেন এসব ইচ্ছেগুলো চিরন্তন হবার যোগ্য।

ধর্মপ্রচারকের দৃষ্টিকোণ এবং পন্থা প্রয়োজনীয়ভাবে কিছুটা ভিন্নতর। কারণ তিনি রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করেন না এবং সেইকারণে নিজের এবং অন্যদের ইচ্ছেসমূহের মধ্যে একটি কৃত্রিম ঐক্য গড়ে তুলতে পারেন। তাই তাঁর একমাত্র পন্থা হলো এটা চেষ্টা করা যে, তিনি নিজে যে ইচ্ছেটা পোষণ করেন সেটাকে অন্যদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে। এই উদ্দেশ্যে তাঁকে আবেদন রাখতে হয় অন্যদের আবেগের কাছে। এভাবেই রাস্কিন মানুষকে গথিক স্থাপত্য পছন্দ করতে বলেছেন, যুক্তির সাহায্যে নয়, ছন্দময় গদ্যের চলমান প্রভাবের দ্বারা। 'আঙ্কেল টমস্ কেবিন' নিজেদের দাস হিসাবে কল্পনা করে দাসপ্রথা যে-খারাপ এমনভাবে ভাবতে বলেছে মানুষকে। কিছু জিনিস এমনিতেই ভালো (বা খারাপ); এসবের ফলাফলের উপর নির্ভরশীল নয়—এটা মানুষকে বোঝাতে প্রতিটি চেষ্টা নির্ভর করে অনুভূতি জাগানোর শিল্পকৌশলের উপর, সাক্ষ্যের প্রতি আবেদনের উপর নয়।

---

১. অ্যারিস্টটলের সমসাময়িক জনৈক (গ্রিক নয়, চৈনিক) ব্যক্তির নিচের উপদেশটা তুলনা করুন : শাসকদের এমন ব্যক্তিদের কথা শোনা উচিত নয় যাঁরা নিজেদের মতামত থাকা ব্যক্তিদের বিশ্বাস করেন এবং ব্যক্তিবিশেষের গুরুত্বেও বিশ্বাস রাখা ঠিক নয়। এই ধরনের শিক্ষা মানুষদের নির্জন স্থানে চলে যাবার কারণ হিসাবে কাজ করে এবং এঁরা গুহায় কিংবা পাহাড়ের উপরে লুকিয়ে থাকেন, সেখান থেকে ক্ষমতাসীন সরকারকে তিরস্কার করেন, কর্তৃত্বে-থাকা ব্যক্তিদের প্রতি অবজ্ঞা দেখান, পদমর্যাদার গুরুত্ব ও পারিশ্রমিক তুচ্ছ করেন এবং অফিসের পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের ঘৃণা করেন। Waley-এর, The Way and its Power, পৃষ্ঠা ৩৭ দ্রষ্টব্য।

প্রত্যেকটি ঘটনায় ধর্মপ্রচারকের দক্ষতা নির্ভর করে নিজের আবেগের অনুরূপ আবেগ অন্যের মধ্যে জাগিয়ে তোলার দক্ষতায়। তিনি একজন কপট হলে এই দক্ষতা নির্ভর করে নিজের আবেগের বিপরীত আবেগ জাগিয়ে তোলায়। এটা কোনো ধর্মপ্রচারকের সমালোচনা হিসাবে নয়, আমি এটা বলছি তাঁর কাজের গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতি সম্পর্কে একটা বিশ্লেষণ হিসাবে।

একজন মানুষ যখন বলেন, 'এটা স্বভাবতই ভালো' তখন তিনি একটা বিবৃতি প্রদান করেন। যেমনটা, তিনি যদি বলতেন, 'এটা একটা চতুর্ভুজ' অথবা 'এটা মিষ্টি'। এটাকে আমি মিথ্যা বলে বিশ্বাস করি। আমি মনে করি মানুষটি সত্যি সত্যি যা বোঝাতে চান, সেটা হল, 'আমি প্রত্যেককে এমনটা ইচ্ছে করতে বলি' অথবা 'প্রত্যেকে এমনটাই ইচ্ছে করবে।' তিনি যা বলেন সেটা যদি বিবৃতি হিসাবে ব্যাখ্যা করতে হয়, এটা কেবল তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছের একটা স্বীকৃতি। পক্ষান্তরে, এটা যদি সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে এটা কিছুই ব্যক্ত করে না, কেবলমাত্র কিছু ইচ্ছে 'প্রকাশ' করে। একটা ঘটনা হিসাবে ইচ্ছেটা ব্যক্তিগত, কিন্তু এটা যা পেতে চায় সেটা চিরন্তন। আমার মতে, 'বিশেষ' এবং 'চিরন্তনের' কৌতূহলী সংলগ্নতার ক্ষেত্রে এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে।

বিষয়টা সম্ভবত পরিষ্কার হতে পারে একটা নৈতিক বাক্যের সঙ্গে একটা বিবৃতির বৈশাদৃশ্য তুলনা করলে। যদি আমি বলি, 'সমস্ত চীনারাই বৌদ্ধ' তাহলে আমার কথাটা প্রত্যাখান করা যেতে পারে একজন চীনা খ্রিস্টান অথবা একজন চীনা মুসলমানকে হাজির করে। যদি আমি এভাবে বলি, 'আমি বিশ্বাস করি যে, সমস্ত চীনারাই বৌদ্ধ', তাহলে চীনের কোনো সাক্ষ্য থেকেই আমার কথাটা বাতিল করা যাবে না। কিন্তু আমার কথাটা বাতিল করা যাবে এমন সাক্ষ্য থেকে যে, আমি যা বললাম তা আমি বিশ্বাস করি না কারণ আমি যা বিবৃত করলাম সেটা কেবল আমার মনের একটা অবস্থা। এখন যদি একজন দার্শনিক বলেন, 'সৌন্দর্য ভালো', আমি এভাবে তাঁর কথাটার ব্যাখ্যা করতে পারি, 'এটা কি এমন যে, প্রত্যেকেই সৌন্দর্য ভালোবাসে' (এরকম কথাটা হলো, 'সমস্ত চীনারাই বৌদ্ধ') অথবা ব্যাখ্যা করতে পারি এভাবেও, 'আমি চাই প্রত্যেকেই সৌন্দর্যকে ভালোবাসুন' (এরকম কথাটার মানে দাঁড়ায়, 'আমি বিশ্বাস করি যে সমস্ত চীনারাই বৌদ্ধ')। এই বক্তব্যগুলোর মধ্যে প্রথম বক্তব্যগুলো কোনো বিবৃতি তৈরি করে না, একটা আকাঙ্খা ব্যক্ত করে; কারণ এটা কোনো কিছুই স্পষ্ট করে বলে না। এটা যৌক্তিকভাবেই অসম্ভব যে, এর পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষ্য থাকবে অথবা সত্যতা কিংবা মিথ্যাত্ব থাকবে। দ্বিতীয় বাক্যটি কেবলমাত্র ইচ্ছাসূচক না হয়ে বিবৃতিমূলক হয়ে উঠেছে। কিন্তু এগুলো দার্শনিকের মনের অবস্থা হয়ে উঠেছে। এটা এমন সাক্ষ্য দিয়েই বাতিল করা যাবে যে, দার্শনিক

যে-আকাঙ্খার কথা বলেছেন, সে আকাঙ্খা তাঁর নেই। এই দ্বিতীয় বাক্যটি নৈতিকতার বিষয় নয়, মনোবিদ্যা অথবা জীবনীর বিষয়। প্রথম বাক্যটা যা নৈতিকতার বিষয়, সেটা কোনো কিছুর আকাঙ্খা ব্যক্ত করে কিন্তু কোনো কিছু বিবৃত করে না।

উপরের বিশ্লেষণ সত্য হলে, নৈতিকতার সত্য বা মিথ্যা, কোনো বিবৃতি নেই, কিন্তু সাধারণ ধরনের কতিপয় আকাঙ্ক্ষা আছে। প্রধানত এমন আকাঙ্ক্ষা যা সাধারণভাবে মনুষ্যজাতির আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এবং আকাঙ্ক্ষাগুলো সংশ্লিষ্ট দেবদেবী, দেবদূত, শয়তানদের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গেও, যদি তাঁরা বাস্তবে থেকে থাকেন। বিজ্ঞান এই আকাঙ্ক্ষার কারণ নিয়ে আলোচনা করতে পারে, আলোচনা করতে পারে এগুলো পাবার উপায় নিয়েও। কিন্তু বিজ্ঞান সত্যিকারের নৈতিক বাক্য ধারণ করতে পারে না, কারণ এটা সত্য অথবা মিথ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

যে-তত্ত্বটা আমি প্রতিষ্ঠা করতে চাইছি, সেটা হলো মতবাদের একটা রূপ, যাকে 'মূল্যবোধের দৃষ্টিভঙ্গি' বলা হয়। এই মতবাদ মনে করে যে, যদি দু'জন ব্যক্তি মূল্যবোধ নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করে, তাহলে এই দু'জনের মধ্যে যে-কোনো ধরনের সত্য নিয়ে মতানৈক্য নেই, এটা হলো আসলে রুচির ভিন্নতা। যদি একজন বলে যে, 'ঝিনুক ভালো' এবং যদি অন্যজন বলে, 'আমি মনে করি ঝিনুক খারাপ', এ নিয়ে তর্ক করার কিছু নেই। আলোচ্য তত্ত্বটা মনে করে, মূল্যবোধ নিয়ে সমস্ত ভিন্নতা এই ধরনের। যদিও আমরা স্বভাবতই এরকমটা মনে করি না যখন আমরা এমন বস্তু নিয়ে কাজ করি যেগুলো ঝিনুক থেকে বেশি উন্নত। এই ধারণা পোষণের প্রধান কারণ হলো, কোনো যুক্তি খুঁজে পাবার পরিপূর্ণ অক্ষমতা। এই অক্ষমতা প্রমাণ করতে পারে না যে, এটা অথবা ওটার মৌলিক মূল্য রয়েছে। আমরা সবাই যদি একমত হই তাহলে আমরা সহজাত জ্ঞানে মূল্য বুঝতে পারি। একজন বর্ণান্ধ ব্যক্তির কাছে আমরা প্রমাণ করতে পারি না যে, ঘাস সবুজ, লাল নয়। কিন্তু তার কাছে এটা প্রমাণ করার অনেক উপায় রয়েছে যে, বেশিরভাগ মানুষের মতো পার্থক্য করার ক্ষমতা তার নেই। কিন্তু মূল্যবোধের ক্ষেত্রে এ-ধরনের কোনো উপায় নেই। রঙের ক্ষেত্রের চেয়ে মূল্যবোধের ক্ষেত্রে মতানৈক্য অনেক বেশি ব্যাপক। মূল্যবোধ নিয়ে মতানৈক্যের পার্থক্য ঘোচাবার কোনো উপায়ের কথা কল্পনাও করা যায় না। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটা আমাদের উপর চেপে বসে যে, মত পার্থক্যটা রুচির, কোনো বিষয়গত সত্যের নয়।

এই মতবাদটার পরিণামফল প্রচুর। প্রথমত, কোনো পরম ধারণায় 'পাপ' বলে কোনো জিনিস নেই। একজন ব্যক্তি যেটা 'পাপ' বলে মনে করেন, অন্য এক ব্যক্তি সেটাকেই 'পুণ্য' বলতে পারেন। এবং এই পার্থক্যের জন্য তাঁর একজন অন্যজনকে অপছন্দ করতে পারেন। কিন্তু কেউ কাউকে বৌদ্ধিক ভুল করছেন বলে অভিযুক্ত করতে পারেন না। অপরাধী ব্যক্তিটি 'বজ্জাত', এই যুক্তিতে তার বিরুদ্ধে শাস্তিকে

ন্যায্য বলে প্রতিপন্ন করা যায় না। শাস্তিকে ন্যায্য বলে প্রতিপন্ন করা যায় এই ভাবে যে, অপরাধী এমনভাবে আচরণ করেছেন যেটাকে অন্যেরা নিরুৎসাহিত করতে চান। নরক, পাপিষ্ঠদের শাস্তির স্থান হিসাবে পুরোপুরি বিবেচনাহীন।

দ্বিতীয়ত, মূল্যবোধ সম্পর্কে কথা বলার ধরনটা বজায় রাখা অসম্ভব সেটা ঐশ্বরিক উদ্দেশ্যে বিশ্বাসীদের একটা সাধারণ ধারণা। তাঁদের যুক্তি হলো, কতিপয় বস্তু যেগুলোকে বিকশিত করা হয়েছে সেগুলো 'ভালো'। সুতরাং বিশ্বের একটা উদ্দেশ্য থাকতেই হবে যেটা নৈতিকভাবে প্রশংসনীয়। বিষয়ীগত মূল্যবোধের ভাষায়, যুক্তিটা এমন দাঁড়ায় : 'পৃথিবীর কতিপয় জিনিস আমাদের পছন্দের, সুতরাং এগুলোকে একজন স্রষ্টার আমাদের রুচি অনুযায়ী সৃষ্টি করতেই হয়। এই স্রষ্টাকে আমরা পছন্দ করি এবং যিনি ফলত ভালো।' এখন এটা পুরোপুরি স্পষ্ট যে, পছন্দ এবং অপছন্দ নিয়ে প্রাণীদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে, তাদের নিজেদের পরিবেশে 'কিছু' বস্তু তাদের পছন্দ করতেই হবে, নতুবা তাদের জীবন অসহ্য হয়ে উঠবে। আমাদের মূল্যবোধসমূহ আমাদের বাকি দৈহিক গঠন অনুযায়ী বিকশিত হয়েছে এবং যৌক্তিক উদ্দেশ্য বলে কোনো কিছুর সিদ্ধান্ত করা যায় না এমন ঘটনা থেকে যে, তারা তেমনই রয়েছে, যেমন তারা আছে।

যারা 'বিষয়গত' মূল্যবোধে বিশ্বাস করেন, প্রায়ই তাঁরা বলেন যে, আমি যে ধারণার পক্ষে সওয়াল করছি তার অনৈতিক ফলাফল রয়েছে। আমার কাছে এটা ত্রুটিপূর্ণ যুক্তি বলে মনে হয়। ইতোমধ্যেই যেমনটা বলা হয়েছে, কতিপয় বিষয়ীগত মূল্যবোধের মতামতের নৈতিক ফলাফল রয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রতিহিংসা পরায়ণ শাস্তি এবং 'পাপে'র ধারণা। কিন্তু ব্যাপক সাধারণ ফলাফল যেগুলোকে ভয় করা হচ্ছে, যেমন, সমস্ত নৈতিক বাধ্যবাধকতার অবক্ষয়, এগুলো কিন্তু যৌক্তিকভাবে সিদ্ধান্তকৃত নয়। নৈতিক বাধ্যবাধকতা, এটাকে যদি আচরণকে প্রভাবিত করতে হয়, তাহলে এটাতে কেবল বিশ্বাস থাকলেই হবে না, আকাঙ্ক্ষাও থাকতে হবে। আকাঙ্ক্ষা হলো, আমাকে বলা হতে পারে যে, এটা এক অর্থে 'ভালো' হবার একটা ইচ্ছে, যেটা আমি অনুমোদন করি না। কিন্তু আমরা যখন 'আকাঙ্ক্ষা'কে 'ভালো' বলে বিশ্লেষণ করি, এটা সাধারণভাবে নিজের একটা আকাঙ্ক্ষা করে তুলতে চায়। অথবা বিপরীতক্রমে কতিপয় সাধারণ ফলাফল আনতে চায় যেগুলো পেতে আমরা ইচ্ছে করি। আমাদের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে যেগুলো পুরোপুরি ব্যক্তিগত নয়, এবং আমাদের যদি এসব না থাকত, তাহলে কোনো পরিমাণ নৈতিক শিক্ষাই আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করত না। যে-ধরণের জীবন আমরা বেশিরভাগ মানুষ তারিফ করি, সেটা বৃহৎ নৈর্ব্যক্তিক আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিচালিত। এখন এই ধরনের আকাঙ্ক্ষা নিঃসন্দেহে উদাহরণ, শিক্ষা, জ্ঞান দ্বারা উৎসাহিত করা যায়। কিন্তু তাদের

এমন বিমূর্ত বিশ্বাস দ্বারা সৃষ্টি করা যায় না যে এগুলো 'ভালো' কিংবা 'ভালো' শব্দটি দ্বারা যা বোঝায় তা বিশ্লেষণ করেও নিরুৎসাহিত করা যায় না।

আমরা যখন মানবজাতির কথা ভাবি, আমরা এমনটা আকাঙ্ক্ষা করতে পারি যে, এটা সুখী হবে অথবা স্বাস্থ্যবান অথবা বুদ্ধিশীল অথবা যুদ্ধবাজ প্রভৃতি। এর যে-কোনো একটি আকাঙ্ক্ষা যদি শক্তিশালী হয়, তাহলে এটা এর নিজের নৈতিকতা সৃষ্টি করবে। কিন্তু আমাদের যদি এ-ধরনের কোনো সাধারণ আকাঙ্ক্ষা না থাকে, আমাদের আচরণ আমাদের মূল্যবোধ যাই হোক, এতে সামাজিক উদ্দেশ্য সাধন করবে না; যদি আত্ম-স্বার্থ এবং সামাজিক স্বার্থের মধ্যে সংহতি না থাকে। যতদূর সম্ভব জ্ঞানী প্রতিষ্ঠানগুলোর এ-ধরনের সংহতি তৈরি করাই কাজ। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আমাদের মূল্যবোধের তাত্ত্বিক সংজ্ঞা যাই হোক, আমাদের অবশ্যই নৈর্ব্যক্তিক আকাঙ্ক্ষার অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল হতে হবে। আপনি এমন একজন ব্যক্তির সংস্পর্শে এলেন যার সঙ্গে আপনার নৈতিক মতানৈক্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি মনে করেন যে, সমস্ত মানুষই সমান, আর তিনি একটা শ্রেণীকে গুরুত্বপূর্ণ বলে বেছে নেন। আপনি তাঁর সাথে মানিয়ে চলার কোনো উপায় খুঁজে পাবেন না যদি আপনি বিষয়গত মূল্যবোধে বিশ্বাস করেন, কিংবা না করেন। যে-কোনো ক্ষেত্রে, আপনি কেবল তাঁর আকাঙ্ক্ষা প্রভাবিত করে, তার আচরণ প্রভাবিত করতে পারেন। এতে আপনি সফল হলে তাঁর আচরণবিধি পরিবর্তিত হবে, যদি এতেও তাঁর আচরণবিধির পরিবর্তন না ঘটে, তাহলে কখনও সেটা ঘটবে না।

কিছু মানুষ মনে করেন একটা সাধারণ আকাঙ্ক্ষার, ধরা যাক, মানবজাতির সুখ, যদি পরম ভালোর অনুমোদন না থাকে, তাহলে এটা কোনো-না-কোনো ভাবে বিবেচনাহীন। এটা বিষয়গত মূল্যবোধের একটা দীর্ঘস্থায়ী বিশ্বাস। একটা বিশ্বাস স্বভাবতই বিবেচনাপ্রসূত অথবা বিবেচনাহীন হতে পারে না। এটা অন্যান্য আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বিরোধে জড়াতে পারে এবং এর ফলে অসুখী হওয়ার দিকে পরিচালিত হতে পারে। এটা অন্যদের মধ্যে বিরোধিতা জাগিয়ে তুলতে পারে এবং এটা সন্তুষ্টির অযোগ্য। কিন্তু এটা 'বিবেচনাহীন' বলে বিবেচিত হতে পারে না কারণ এটা অনুভব করার জন্য কোনো কারণ দর্শানো যায় না। আমরা ক-র আকাঙ্ক্ষা করতে পারি কারণ এটা খ-র একটা উপায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা যখন উপায়কে ত্যাগ করছি তখন আমাদের এমন কিছুতে আসতে হয় যেটা কোনো কারণ ছাড়াই আমরা আকাঙ্ক্ষা করেছি, কিন্তু সেই কারণেই এটা 'বিবেচনাহীন ভাবে' নয়। নৈতিকতার সমুদয় পদ্ধতিই তাদের আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করে যারা সেসবের সওয়াল করে, কিন্তু এই ঘটনাকে শব্দের ধোঁয়াশায় গোপন করা হয়। বস্তুত আমাদের আকাঙ্ক্ষাসমূহ, যেমনটা অনেক নৈতিকতাবাদী কল্পনা করেন, তার চেয়ে অধিকতর সাধারণ এবং কম স্বার্থান্ধ।

এটা যদি না হত, নৈতিকতার কোনো তত্ত্বই উন্নতির পক্ষে অসম্ভব হত। এটা বাস্তব নৈতিক তত্ত্বের দ্বারা নয় বরঞ্চ ভয় থেকে মুক্তি, সুখ, বুদ্ধি এসবের বৃহৎ এবং মহৎ আকাঙ্ক্ষার অনুশীলন দ্বারা মানুষকে বেশি কাজ করানো যায়। মানুষ বর্তমানে যে উপায়ে সাধারণ সুখের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে-পরিমাণ কাজ করছে, প্রস্তাবিত পরিমাণটা তার থেকে বেশি হবে। আমাদের 'ভালো'-এর সংজ্ঞা যাই হোক না, আমরা এটাকে বিষয়ীগত অথবা বিষয়গত যাই বলে বিশ্বাস করি না কেন, যাঁরা মানবজাতির সুখের আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁরা এটাকে প্রসারিত করার চেষ্টা করবেন না।' এবং যাঁরা এটা পেতে চান তাঁরা এটা পেতে, যা পারেন, তাই করবেন।

আমি সিদ্ধান্ত করছি এই বলে, এটা সত্য যে, বিজ্ঞান মূল্যবোধের প্রশ্নগুলো ফয়সালা করতে পারে না। এর কারণ এই প্রশ্নগুলোকে আদৌ বৌদ্ধিকভাবে নিষ্পন্ন করা যায় না। এবং এগুলো সত্য এবং মিথ্যার চৌহদ্দির বাইরে থাকে। যেটুকু জ্ঞান আয়ত্ত করা যায়, সেটুকুই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আয়ত্ত করতে হবে। এবং বিজ্ঞান যা আবিষ্কার করতে পারে না, তা মানবজাতি জানতেও পারে না।

অধ্যায় ১০

উপসংহার

গত চার শতক ধরে ধর্মতত্ত্ব এবং বিজ্ঞানবিদদের মধ্যে অধিকতর উল্লেখযোগ্য সংঘাত-সমূহের উৎস সংক্ষিপ্ত রূপরেখায় পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে আলোচনা করেছি। এবং আমরা বর্তমান ধর্মতত্ত্বের উপর বর্তমান বিজ্ঞানের প্রভাবও মূল্যায়নের চেষ্টা করেছি। আমরা দেখেছি যে, কোপার্নিকাসের সময় থেকে যখনই বিজ্ঞান ও ধর্মতত্ত্বের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতানৈক্য ঘটেছে, সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানই জয়ী হয়েছে। আমরা এটাও দেখেছি যে, ডাকিনীবিদ্যা এবং ভেষজবিদ্যার মতো বাস্তব বিষয় যেখানে যুক্ত ছিল, সেখানেও বিজ্ঞান দুঃখকষ্টের হ্রাসপ্রাপ্তির পক্ষে দাঁড়িয়েছে। আর ধর্মতত্ত্ব প্রাকৃতিক আদিমতাকে উৎসাহিত করেছে। ধর্মতত্ত্বের বিপরীতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আজ পর্যন্ত সংশয়াতীত ভাবে মানুষের সুখের ব্যবস্থাই করেছে।

বিষয়টা এখন পুরোপুরি একটা নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করছে। এটা করছে প্রধানত দুটো কারণে। প্রথমত, মানসিকতার বৈজ্ঞানিক মেজাজের চেয়ে, প্রয়োগের থেকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অধিকতর গুরুত্ব পাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, নতুনতর ধর্মসমূহ খ্রিস্টধর্মের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে এবং যে সব ভুলের জন্য খ্রিস্টধর্ম অনুতাপ করেছে, সেসব ভুলগুলোই এসব ধর্ম পুনরাবৃত্তি করছে।

মনের বৈজ্ঞানিক মেজাজ সতর্ক, সন্দিগ্ধ এবং আংশিক। এটা এমন কল্পনা করে না যে, এটা সমগ্র সত্যকেই জানে অথবা এর সর্বোত্তম জ্ঞানটা সম্পূর্ণ সত্য। এ

বৈজ্ঞানিক মেজাজ এটা জানে যে, প্রতিটি মতবাদেরই, আগে কিংবা পরে, সংশোধনের প্রয়োজন হয়। এমন সংশোধনের জন্য অনুসন্ধানের এবং আলোচনার স্বাধীনতা দরকার। কিন্তু তত্ত্বীয় বিজ্ঞান থেকেই একটা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া বিকশিত হয়েছে। এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার এ-ধরনের কোনো তত্ত্বগত সন্দিগ্ধতা নেই। বর্তমান শতকে পদার্থবিদ্যা আপেক্ষিকতা এবং কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাহায্যে বৈপ্লবিক হয়ে উঠেছে। কিন্তু পূর্বতন পদার্থবিদ্যাভিত্তিক সমুদয় আবিষ্কার আজও সন্তোষজনক অবস্থায় রয়েছে। বিদ্যুৎকেন্দ্র, সম্প্রচার এবং বৈদ্যুতিক আলো, এসব অন্তর্ভুক্ত করে শিল্পে এবং দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুতের ব্যবহার ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের কাজের উপর ভিত্তি করে ষাট বছর আগেই প্রকাশিত হয়েছে। এবং এসব আবিষ্কারের কোনোটিই অকার্যকরী হয়নি। এর কারণ এখন আমরা জানি যে, অনেক ক্ষেত্রে ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের মতামত অপর্যাপ্ত ছিল। এভাবে প্রয়োগকুশলী বিশেষজ্ঞগণ যাঁরা বৈজ্ঞানিক কৌশল প্রয়োগ করেন এবং আরও বিশদে সরকার ও বৃহৎ ফার্মগুলো, যারা প্রয়োগকুশলী বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করে, এতে এসব বিশেষজ্ঞরা বিজ্ঞানবিদদের থেকে পুরোপুরি পৃথক মেজাজ অধিগত করেন। এই মেজাজটি সীমাহীন দক্ষতার ধারণা, স্পর্ধিত নিশ্চয়তা এবং মানসিক বস্তুর কৌশলী হস্তচালনার আনন্দের যোগফলে তৈরি করা। এটি কার্যত বৈজ্ঞানিক মেজাজের বিপরীত কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে, বিজ্ঞান এটার বিকাশে সহায়তা করেছে।

বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের প্রত্যক্ষ ফলাফলও কোনো ক্রমেই পুরোপুরি কল্যাণদায়ী হয়নি। একাধারে এরা যুদ্ধাস্ত্রের ধ্বংসকারিতা বাড়িয়েছে, এবং শান্তিপূর্ণ শিল্পে জনসংখ্যার একাংশকে যুদ্ধ ও গোলাবারুদ তৈরির জন্য ব্যবহার করেছে। পক্ষান্তরে, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে তারা পুরানো আর্থিক ব্যবস্থা তৈরি করেছে, যে-ব্যবস্থা নির্ভর করত দুষ্পাপ্যতা, কাজ করার প্রবল অসুবিধা এবং নতুন মতবাদের প্রবল প্রভাবে তারা প্রাচীন সভ্যতা বাতিল করেছে, চীনকে বিশৃঙ্খলার মধ্যে এবং পাশ্চাত্য মডেলের নিষ্ঠুর সাম্রাজ্যবাদের খপ্পরে জাপানকে ঠেলে দিয়েছে। রাশিয়াকে একটা নতুন আর্থিক ব্যবস্থা গড়ার প্রবল প্রচেষ্টার মধ্যে এবং জার্মানিকে পুরাতন আর্থিক ব্যবস্থা বজায় রাখতে বেপরোয়া প্রচেষ্টার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। আমাদের সময়ের এইসব অকল্যাণের আংশিক কারণ বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ, সুতরাং পরিশেষে বিজ্ঞান।

বিজ্ঞান ও খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের সংঘাত, মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে খণ্ডযুদ্ধ সত্ত্বেও এখন প্রায় পরিসমাপ্তির দিকে। আমি মনে করি, বেশিরভাগ খ্রিস্টানরা এটা স্বীকার করবেন যে, তাঁদের ধর্ম এ-কাজে উৎকৃষ্টতর। আদিম যুগ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বস্তুসত্ত্বাহীনতা থেকে খ্রিস্টধর্মকে বিশুদ্ধ করা হয়েছে এবং ধর্মীয় কারণে নিগ্রহ করার ইচ্ছা থেকেও মুক্ত করা হয়েছে। অধিকতর উদার খ্রিস্টানদের মধ্যে একটা

নৈতিক মতবাদ রয়েছে যেটা মূল্যবান। এই মতবাদের কথা, আমাদের প্রতিবেশীদের আমাদের ভালোবাসা উচিত, এই সংক্রান্ত খ্রিস্টের শিক্ষা, এটাকে আর 'আত্মা' বলে মনে না করলেও, প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে এমন কিছু আছে যা শ্রদ্ধার উপযুক্ত, এই বিশ্বাস। গির্জাসমূহে ক্রমবর্ধমান এই বিশ্বাস যে, খ্রিস্টানদের উচিত যুদ্ধের বিরোধিতা করা।

কিন্তু পুরাতন ধর্ম যখন এভাবে বিশুদ্ধিকৃত হলো এবং অনেকভাবে কল্যাণকর হয়ে উঠল, তখন বলিষ্ঠ যৌবনের শক্তিসহ ধর্মীয় কারণে নির্যাতনের উদ্দীপনা নিয়ে নতুন ধর্মসমূহের আবির্ভাব ঘটল। গ্যালিলিওর সময়ের ধর্ম-আদালতের বিজ্ঞান বিরোধিতার বৈশিষ্ট্যকে কার্যকরী করে তুলতে চাইছে এইসব নতুন ধর্ম। জার্মানিতে যদি আপনি বলেন যে, খ্রিষ্ট একজন ইহুদি ছিলেন কিংবা রাশিয়াতে থেকে যদি বলেন যে, পরমাণু তার বস্তুময়তা হারিয়ে কেবল ঘটনার ক্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাহলে আপনাকে ভয়ংকর শাস্তি পেতে হবে। সম্ভবত, আইনি শাস্তির চেয়ে আর্থিক শাস্তি, কিন্তু এক্ষেত্রে কোনো শাস্তিটাই মৃদুতর হবে না। জার্মানিতে এবং রাশিয়ায় বুদ্ধিজীবীদের উপর নিগ্রহ গত আড়াইশো বছরে গির্জাসমূহের দ্বারা সংঘটিত যে কোনো নির্যাতনের প্রচণ্ডতাকে অতিক্রম করে গেছে।

বর্তমান সময়ে বিজ্ঞান যা নির্যাতনের অত্যন্ত প্রত্যক্ষ আঘাত বহন করে সেটি হলো অর্থনীতি। ইংল্যান্ড বর্তমানে, যেমনটা সব সময়ে, একটি ব্যতিক্রমী সহনশীল দেশ। সেখানেও একজন মানুষ, অর্থনীতি সম্পর্কে যার মতবাদ সরকারের পক্ষে আপত্তিকর, তিনিও সমুদয় শাস্তি এড়াতে পারেন, যদি তিনি কেবল নিজের মধ্যেই এই মতবাদ সীমিত রাখেন কিংবা কোনো পুস্তকে সেটা ব্যক্ত করেন। কিন্তু সেই ইংল্যান্ডেও, কেউ যদি তাঁর বক্তব্যে কিংবা সস্তা প্রচারপত্রে কম্যুনিস্ট মতবাদ ব্যক্ত করেন তাহলে সেই মানুষটিকে তাঁর জীবিকা হারাতে এবং মাঝে মাঝে কারাগারে থাকতে হবে। একটা সাম্প্রতিক আইনে, যদিও এ পর্যন্ত আইনটির পরিপূর্ণ ব্যবহার ঘটেনি, বলা হয়েছে, সরকার যে-লেখাকে রাজদ্রোহসূচক বলে মনে করে এমন লেখার লেখককেই শুধু নন, যাঁর অধিকারে এসব লেখা থাকবে, তিনিও শাস্তিযোগ্য হবেন এই কারণে যে, তিনি এসব লেখা সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিকে দুর্বল করার জন্য ব্যবহারের চিন্তা করতে পারেন।

জার্মানি এবং রাশিয়ায় ধর্মান্ধতার প্রশস্ত সুযোগ রয়েছে এবং ধর্মান্ধহীনতার জন্য শাস্তি ভিন্নতর প্রচণ্ড ধরনের। ওইসব দেশে সরকার নিযুক্ত অন্ধ মতবাদ অনুযায়ী এমনটি কর্তৃত্ব থাকে এবং যারা খোলাখুলি ভিন্নমত পোষণ করে, তারা তাদের জীবন রক্ষা করতে পারলেও কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বাধ্যতামূলক শ্রমদানে বাধ্য হয়। এটা সত্য যে এক দেশে যেটা ধর্মদ্বেষিতা, অন্য দেশে সেটা ধর্মান্ধতা। একজন মানুষ যিনি যে

কোনো একটা দেশে নির্যাতিত, তিনি যদি অন্য দেশটাতে চলে যেতে পারেন, তাহলে তিনি বীর বলে সমাদৃত হন। যাই হোক, এরা ধর্ম-আদালতের মতবাদ সংরক্ষণের ব্যাপারে সমগোত্রীয়। সত্য বিকশিত করার পথ সত্য কি, সেটা চিরকালের জন্য বর্ণনা করা এবং যারা এই সত্যে অসম্মতি জানাবে তাদের শাস্তি প্রদান করা। বিজ্ঞান এবং গির্জাসমূহের মধ্যে সংঘাত এই মতবাদের মিথ্যাত্ব প্রমাণ করেছে। আমরা সবাই এখন সুনিশ্চিত যে, গ্যালিলিওর নির্যাতনকারীরা সমুদয় সত্য জানতেন না, কিন্তু আমাদের কেউ কেউ হিটলার অথবা স্ট্যালিন সম্পর্কে কম সুনিশ্চিত বলে মনে হয়।

এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, অসহনশীলতাকে প্রশ্রয় দেবার সুযোগ দুটো বিরুদ্ধ দিক থেকেই উঠে এসেছে। এমন কোনো দেশ যদি থাকত যেখানে বিজ্ঞানবিদগণ খ্রিস্টানদের নিগ্রহ করতে পারতেন, সম্ভবত গ্যালিলিওর বন্ধুরা 'সমুদয়' অসহনশীলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেন না, প্রতিবাদ করতেন কেবলমাত্র বিরুদ্ধ দলের অসহনশীলতার বিরুদ্ধে। এমন হলে গ্যালিলিওর বন্ধুরা তাঁর মতবাদকে একটা অন্ধবিশ্বাসের অনুশাসনে গৌরবান্বিত করতেন। আইনস্টাইন, যিনি দেখিয়েছিলেন যে, গ্যালিলিও এবং ধর্ম-আদালত উভয়ই ভ্রান্ত ছিল, তিনি তো উভয় পক্ষ কর্তৃক নির্বাসিত হতে পারতেন এবং কোথাও আশ্রয় খুঁজে পেতে ব্যর্থ হতেন।

এটা নিবেদন করা যেতে পারে যে, আমাদের সময়ে অতীত থেকে ভিন্নতর নির্যাতনের স্বরূপ হলো রাজনৈতিক এবং আর্থিক, কিন্তু ধর্মতাত্ত্বিক নয়। কিন্তু এ-ধরনের যুক্তি অনৈতিহাসিক। অসংযামী মতবাদের উপর লুথারের আক্রমণের ফলে পোপের বিশাল আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অষ্টম হেনরীর বিদ্রোহে পোপকে প্রভূত রাজস্ব হারাতে হয়েছে যা তিনি তৃতীয় হেনরীর সময় থেকে ভোগ করে আসছিলেন। স্কটের মেরি কুইন অথবা দ্বিতীয় ফিলিপের দ্বারা এলিজাবেথকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চাওয়াতে তিনি রোমান ক্যাথলিকদের উপর নির্যাতন চালিয়েছিলেন। মানুষের মন থেকে গির্জার আধিপত্যকে দুর্বল করেছে বিজ্ঞান। এবং পরিণামে অনেক দেশে গির্জার সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্ত করার দিকে ঘটনাকে পরিচালিত করেছে। আর্থিক এবং রাজনৈতিক অভিপ্রায়ই নির্যাতনের আংশিক কারণ, সম্ভবত প্রধান কারণ।

যাই হোক, মতামতের নির্যাতনের বিরুদ্ধে যুক্তি, নির্যাতনের যে-কোনো কারণের উপর নির্ভর করে না। যুক্তিটা হলো আমরা কেউ-ই সমুদয় সত্য জানি না, নতুন সত্যের আবিষ্কার মুক্ত আলোচনা দ্বারা উন্নীত, এবং দমনে সত্য জানা খুবই কষ্টসাধ্য। পরিণামে সত্যের আবিষ্কারে মানবিক কল্যাণ বর্ধিত হয় এবং ভ্রমাত্মক কাজে এটা বাধাপ্রাপ্ত হয়। নতুন সত্য স্বার্থান্বেষীদের পক্ষে প্রায়ই অসুবিধাজনক। শুক্রবারে উপবাস প্রয়োজনীয় নয়, প্রোটেস্টান্টদের এই মতবাদ প্রবলভাবে প্রতিহত হয়েছিল এলিজাবেথীয় মাছ-ভক্ষকদের দ্বারা। কিন্তু বৃহত্তর সম্প্রদায়ের স্বার্থে নতুন সত্য স্বাধীনভাবে প্রচারিত হবে। একটা নতুন মতবাদ সত্য কিনা সেটা তো প্রথমে জানা

যায় না। নতুন সত্যের স্বাধীনতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে ভুলের স্বাধীনতাকে। এইসব মতবাদ যেগুলো বহুল প্রচলিত, সেগুলো এখন জার্মানি এবং রাশিয়ায় আছে এবং অন্যত্র যথেষ্ট পরিণামে স্বীকৃত নয়।

১৬৬০ সাল থেকে যে-কোনো সময়ের চেয়ে আমাদের সময়ে বৌদ্ধিক স্বাধীনতার প্রতি হুমকিটা ব্যাপকতর। কিন্তু এটা এখন খ্রিস্টীয় গির্জা থেকে আসছে না। এটা সরকারের তরফে আসছে, যে-সরকার নৈরাজ্য এবং বিশৃঙ্খলার আধুনিক বিপদের কারণে যাবতীয় বিরোধিতা থেকে সুরক্ষিত গির্জার কর্তৃপক্ষের চরিত্র উত্তরাধিকার হিসাবে পেয়েছে। বিজ্ঞানবিদ এবং যাঁরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে মূল্য দেন, তাঁদের সামনে এটা একটি স্বচ্ছ কর্তব্য, এই নতুন ধরনের নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। পুরাতন ব্যবস্থার পতনে নিজেদেরকে সন্তোষজনকভাবে অভিনন্দিত করার চেয়েও এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এবং এই কর্তব্যের পরিমাণ কমে যায় না এমন কোনো নতুন মতবাদের প্রতি আনুগত্যে, যে-মতবাদের সমর্থনে নির্যাতন যুক্ত হয়ে পড়ে। সাম্যবাদের প্রতি কোনো অভিরুচি আমাদের অনিচ্ছুক করবে না রাশিয়ায় কোনো অসংযমকে চিনতে অথবা এটা বুঝতেও অনিচ্ছুক করবে না যে, একটা শাসনব্যবস্থা যা তার গোঁড়ামির কোনো সমালোচনাকে অনুমতি দেয় না, আখেরে এই ব্যবস্থা নতুন জ্ঞানের আবিষ্কারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিপরীতক্রমে, সাম্যবাদ অথবা সমাজতন্ত্রের প্রতি বিরাগ আমাদের চিন্তায় এই মতবাদ দমনে জার্মানিতে সংঘটিত বর্বরতাকে ক্ষমার যোগ্য করে তুলবে না। যে-সব দেশে বিজ্ঞানবিদরা তাঁদের কাঙ্ক্ষিত বৌদ্ধিক স্বাধীনতা জয় করে নিতে পেরেছেন, পক্ষপাতিত্বহীন প্রতিবাদ সহ তাঁদের দেখানো উচিত যে, যে-কোনো স্থানে সে-স্থানের মতবাদের জন্য এই স্বাধীনতা দমিত হলে তাঁরা এ-ধরনের স্বাধীনতা খর্ব করার চেষ্টাকে অপছন্দ করছেন।

যাঁদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে এই বৌদ্ধিক স্বাধীনতা গুরুত্বপূর্ণ তাঁরা কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠ হতে পারেন, কিন্তু এঁদের মধ্যেই ভবিষ্যতের পথে গুরুত্বপূর্ণ মানুষেরা আছেন। মানবেতিহাসে আমরা কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও এবং ডারউইনের গুরুত্ব দেখেছি। এবং এটা ধরে নেওয়া ঠিক নয় যে, ভবিষ্যৎ এ-ধরনের ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটাবে না। তাঁরা যদি তাঁদের কার্যসাধনে বাধাপ্রাপ্ত হন এবং তাঁদের প্রাপ্য গুরুত্ব না পান তাহলে মানবজাতি বন্ধ্যা হয়ে যাবে এবং নতুন অন্ধকার যুগ পরম্পরাক্রমে শুরু হবে, যেমন উজ্জ্বল প্রাচীন যুগের পরম্পরায় পূর্বতন অন্ধকার যুগ শুরু হয়েছিল। নতুন সত্য প্রায়শই অস্বস্তিদায়ক, বিশেষত ক্ষমতাবানদের কাছে। তা সত্ত্বেও, নিষ্ঠুরতা এবং ধর্মান্ধতার দীর্ঘ নিদর্শনের মধ্যেও, এটাই আমাদের বুদ্ধিশালী কিন্তু দূরন্ত প্রজাতির সর্বোত্তম গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্তি।

কর্তৃত্ব ও ব্যক্তিসত্তা

বক্তৃতা : এক

সামাজিক আসঞ্জন ও মানবিক প্রকৃতি

আমি এই বক্তৃতাগুচ্ছে যে বিবেচনাযোগ্য মূল বিষয়টিকে প্রস্তাবাকারে রাখতে চাই, তা মোটামুটি এই রকম ঃ অস্তিত্বরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক আসঞ্জন ও প্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত উদ্যোগের মাত্রাভিত্তিক সমন্বয় আমরা কিভাবে ঘটাতে পারি? সামাজিক সহযোগিতার চালিকাশক্তি হিসাবে চিহ্নিত মানবিক প্রকৃতিজাত প্রেরণার প্রসঙ্গ দিয়েই আমি শুরু করবো। সর্বপ্রথম আমি বিশ্লেষণ করবো–একেবারে আদিম সমাজে ও সভ্যতায় এই মানবিক প্রেরণার ধরন–ধারণ ঠিক কিরকম ছিল, তারপর বিচার করবো, উন্নততর সভ্যতার ক্রম–পরিবর্তনশীল বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে এই মানবিক প্রেরণার কীভাবে ও কতদূর অভিযোজন ও পরিবর্তন ঘটেছে। তারপর আমি বিবেচনা করবো–বিভিন্ন সময়– পর্বে ও বিভিন্ন স্থানে, এমনকী সাম্প্রতিককালের সমাজে ও সম্প্রদায়েও এই সামাজিক আসঞ্জনের বিস্তার ও গভীরতার স্বরূপটিকে, এবং এই সূত্রে অদূর ভবিষ্যতে এই প্রবণতার অধিকতর অগ্রগতির সম্ভাবনাটিকেও খতিয়ে দেখার চেষ্টা করবো। সামাজিক ঐক্য অটুট রাখার অনুকূল শক্তি ও শর্ত–সম্পর্কিত আলোচনার পরে, সমাজ ও সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত মানবজীবনের অন্য দিকটিতে দৃষ্টিপাত করবো–যথা ব্যক্তিগত উদ্যোগ, মানুষের বিবর্তনের বিভিন্ন পর্বে এই বিষয়টি কী ভূমিকা পালন করেছে, বর্তমান কালে তা কী ভূমিকা পালন করছে এবং ভবিষ্যতে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত পটভূমিতে এই উদ্যোগে কতটা বেশি বা কতটা কম ভূমিকা পালন করতে পারে, সেই সম্ভাবনাকেও দেখানোর চেষ্টা করা হবে। তারপর, আমি আমাদের এই সময়ের মূল সমস্যার বিশেষ একটি প্রসঙ্গে আসবো–আধুনিক প্রযুক্তির সুবাদে সংগঠন ও মানবিক প্রকৃতির পারস্পরিক সংঘাতের ফলে উদ্ভূত সেই সমস্যা, অথবা অন্যভাবে বলা যায়–সৃজন ও অধিকারের প্রেরণার সঙ্গে অর্থনৈতিক চালিকাশক্তির বিচ্ছেদ–প্রসঙ্গ। এই সমস্যাটিকে বর্ণনা করার পরে এর সমাধানকল্পে কী করা যায়, তা অনুসন্ধান করবো এবং চূড়ান্তভাবে, ব্যক্তিগত চিন্তা, উদ্যোগ ও কল্পনার সঙ্গে সামাজিক কর্তৃত্বের সামগ্রিক সম্পর্কটিকে নীতিশাস্ত্রের একটি বিষয়রূপেই গণ্য করবো।

মানুষ সহ সমস্ত সামাজিক জীবের মধ্যেই সহযোগিতা ও গোষ্ঠীগত ঐক্যের প্রবৃত্তিগত অর্থে কিছুটা ভিত্তিভূমি রয়েছে। এটা সম্পূর্ণভাবে দেখা যায় পিঁপড়ে ও

মৌমাছিদের ক্ষেত্রে, যারা আপাতভাবে অসামাজিক কাজকর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে না। কখনই বাসা বা মৌচাকের প্রতি তাদের গভীর অনুরাগ বিনষ্ট হয় না। [illegible] কর্তব্যের প্রতি এই নিরবচ্ছিন্ন অনুরাগকে আমরা একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত [illegible] করতে পারি, কিন্তু এরও রয়েছে অপূর্ণতা; পিঁপড়ে ও মৌমাছিরা কোন মহৎ শিল্প [illegible] করে না অথবা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও করে না কিংবা এমন কোন ধর্মমতও প্রচার [illegible] না যে, সমস্ত পিঁপড়েই পারস্পরিক সহোদরা সম্পর্কে আবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে, [illegible] সামাজিক জীবন যান্ত্রিক, সুনির্দিষ্ট ও নিশ্চল। আমরা এই ইচ্ছা লালন করবো [illegible] মানুষের জীবনে বিশেষ ধরনের তুমুল আলোড়ন থাকা দরকার এবং সেইভাবে [illegible] আমরা উপরোক্ত বিবর্তনমূলক স্থবিরতা থেকে মুক্ত হতে পারি।

আদিম মানুষ ছিল এক দুর্বল ও বিরল প্রজাতি, যার প্রাথমিক অস্তিত্ব [illegible] বিষয়টিই ছিল উদ্বেগজনক। কোন এক সময়-পর্বে তার পূর্বপুরুষ গাছ থেকে [illegible] নেমে এসেছিল এবং পায়ের আঙুলের আঁকড়ে ধরার যে ক্ষমতা সেই সুবিধা [illegible] হারিয়েছিল, কিন্তু লাভ করেছিল বাহু ও হাতের সুবিধা। এইসব পরিবর্তনের [illegible] তারা অর্জন করলো বনবাসী না হওয়ার সুবিধা, কিন্তু পক্ষান্তরে যে উন্মুক্ত প্রান্তরে [illegible] ছড়িয়ে পড়েছিল সেই প্রান্তর আফ্রিকার ক্রান্তীয় জঙ্গলের তুলনায় অনেক [illegible] পুষ্টি-প্রাচুর্য সরবরাহ করতো। স্যার আর্থার কিথের হিসাব অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় খাদ্যসংগ্রহের জন্য আদিম মানুষের প্রয়োজন ছিল মাথাপিছু দুই বর্গমাইল অঞ্চল এবং অন্যান্য কিছু বিশেষজ্ঞদের মতে, মাথাপিছু প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ ছিল আরো বেশি। বনমানুষ-গরিলা জাতিয় প্রাণী ও আধুনিক যুগেও অস্তিত্ববাহী প্রাচীনতম [illegible] সম্প্রদায়ের কথা মনে রেখে এ কথা বলা যায়--আদিম মানুষ ছোট ছোট গোষ্ঠীতে [illegible] বসবাস করতো, যে গোষ্ঠীগুলি পরিবারের চেয়ে খুব বেশি বড় ছিল না, এ-ও অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না। এ রকম এক একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠতো পঞ্চাশ থেকে একশো জন ব্যক্তি নিয়ে। প্রতিটি গোষ্ঠীতে নিজেদের মধ্যে থাকতো উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পারস্পরিক সহযোগিতা, কিন্তু একই প্রজাতির ভিন্নতর গোষ্ঠীর সঙ্গে সংযোগ ঘটলে শত্রুতাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো। যতদিন পর্যন্ত মানুষের অবস্থান বিরল ছিল ততদিন পর্যন্ত অন্যান্য গোষ্ঠীর সঙ্গে সংযোগ ঘটতো কালেভদ্রে এবং সেই যোগাযোগও তেমন কোন গুরুত্ব বহন করতো না। প্রতিটি গোষ্ঠীর নিজস্ব সুনির্দিষ্ট এলাকা ছিল এবং কেবলমাত্র সীমান্ত অঞ্চলেই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতো। সেই প্রাচীন কালে, সম্ভবতঃ একই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল, সেই কারণেই অন্তঃগোষ্ঠী বংশবৃদ্ধি নিশ্চিতভাবে ব্যাপক মাত্রায় প্রচলিত ছিল, অবশ্য বংশবৃদ্ধির এই প্রবণতাই সেই যুগে প্রবহমান ছিল। যদি কোন একটি গোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি হতে হতে এমন জায়গায় পৌঁছাতো যে তাদের নির্দিষ্ট এলাকা হয়ে উঠতো সংক্ষিপ্তরে, তখন সেই গোষ্ঠীর [illegible] কোন প্রতিবেশী গোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠতো, [illegible] ধরনের সংঘর্ষে অভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত অধিকতর জৈব সুবিধাভোগী বংশধারাই জয় করার

করতো, এবং সেই কারণেই অব্যাহত ছিল জয়-পরাজয়ের এই বৈশম্যধারাই। এই বিষয়গুলো খুব বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন স্যার আর্থার কিথ। এটা স্পষ্ট যে, আমাদের আদিম ও বিরল মানবিক পূর্বপুরুষেরা কোন সুচিন্তিত ও সুনির্ধারিত নীতি-নিয়মমাফিক কাজ করতে পারত না, বরং তারা চালিত হতো প্রবৃত্তিজাত প্রক্রিয়ার দ্বারা-নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে বন্ধুত্ব ও গোষ্ঠী-বহির্ভূত অন্যদের প্রতি বৈরিতা, এ রকমই এক দ্বৈত প্রক্রিয়া। যেহেতু আদিম মানবগোষ্ঠী ছিল খুবই ক্ষুদ্র, সেই কারণে গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিরা পরস্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনতো ও জানতো, এর ফলে পরিচিতি ও সহাবস্থানের ভিতের ওপর গড়ে উঠতো বন্ধুত্বের অনুভূতি।

সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে দৃঢ় ও সহাজাত সূত্র, যা অতীতেও ছিল-বর্তমানেও আছে, তা হলো-পরিবার। শৈশবাবস্থার অত্যধিক দৈর্ঘ্যের কারণে মানবজাতির মধ্যে পরিবারপ্রথার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল, এছাড়া এর পিছনে ছিল এই বাস্তবতা যে, পরিবারপ্রথা প্রচলিত না থাকলে শিশুসন্তানের জননীকে খাদ্যসংগ্রহের ক্ষেত্রে পদে পদে বাধাবিঘ্নের মুখোমুখি পড়তে হতো। পক্ষীকুলের অধিকাংশ প্রজাতির মতোই মানবসমাজেও এই অনিবার্য পটভূমিতে পিতার ভূমিকা নির্ধারিত হলো পরিবার গোষ্ঠীর এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরূপেই। এভাবেই গড়ে উঠলো এমন এক শ্রমবিভাজন, যেখানে পুরুষেরা শিকারের উদ্দেশ্যে বাইরে যেত এবং মেয়েরা থাকতো বাড়িতে। পরিবার থেকে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে অবস্থান্তরের যে ঘটনা, সম্ভবত তার পিছনেও ছিল একটি বিশেষ জৈব কারণ, এবং তা হল এরকমই একটি ধারণা যে, পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিচালিত হলে শিকারপর্ব অনেক বেশি কার্যকরী ও সফল হয়ে উঠতে পারে এবং এ কারণেই বহু প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন গোষ্ঠীগত সংঘাত- বিরোধের তুলনায় আন্তঃগোষ্ঠী সহযোগিতা ও সমন্বয়ের প্রবণতাই বাড়তে শুরু করেছিল।

প্রাচীন মানুষ ও অর্ধ-মানবদের সম্পর্কে অসংখ্য তথ্য-প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং এই সব তথ্য-প্রমাণ থেকে গরিলা জাতীয় বনমানুষ থেকে আদিম মানবে বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর-সম্পর্কিত মোটামুটি পরিষ্কার ছবি পাওয়া যায়। এতদিন পর্যন্ত আদিমতম মানব সম্পর্কিত পূর্ববর্তী প্রায় দশ লক্ষ বছরের সমসাময়িক প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু ওই যুগপর্বের বহুলক্ষ বছর আগেও সম্ভবত নরাকার পশুর অস্তিত্ব ছিল, যারা গাছের পরিবর্তে মাটিতেই বসবাস করতো। এইসব প্রাচীন পূর্বপুরুষের বিবর্তন সম্পর্কিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে মস্তিষ্কের আকৃতির মধ্যে, বর্তমান সময়ের মস্তিষ্কের আকার-আয়তনে পৌছানোর আগে প্রাচীন যুগের মস্তিষ্কের পরিমাপ খুবই দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল, তারপর আবার কয়েকশত হাজার বছর ধরে এর আয়তন অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। এই হাজার হাজার বছর ধরে জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন ও সামাজিক সংগঠনে মানুষের অগ্রগতি ঘটেছে, কিন্তু যতদূর মনে হয়-সহজাত বৌদ্ধিক অগ্রগতি ততটা ঘটেনি। অস্থিসূত্রে প্রমাণের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ওই ধরনের নিছক জৈব অগ্রগতির প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে বহু আগেই। সেই কারণে, আমাদের প্রচলিত

ধারণার বিপরীতে আমরা ধরে নিতে পারি–আমাদের সহজাত মানসিক পরিকাঠামো প্রত্ন–প্রস্তরযুগের মানুষের চেয়ে খুব বেশি আলাদা ধরনের নয়। সম্ভবত আমাদের মধ্যে সেইসব প্রবৃত্তির অস্তিত্ব রয়ে গেছে, যা মানুষকে, তার স্বেচ্ছাকৃত আচরণধর্মী পর্বের আগে, অভ্যন্তরীণ মৈত্রী ও বহির্মুখী বৈরিতার বৈপরীত্য নিয়ে ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বসবাস করতে প্রণোদিত করেছে। সেই প্রাচীন যুগ থেকে ধারাবাহিকভাবে সংঘটিত পরিবর্তনগুলোকে চালিকাশক্তির জন্য আংশিকভাবে নির্ভর করতে হয়েছিল এই আদিম প্রবৃত্তির ভিতের ওপর ও মাঝেমধ্যে আংশিকভাবে শুধুমাত্র যৌথ স্বার্থবোধযুক্ত সচেতনাতার ভিতের ওপর। মানুষের সামাজিক জীবনে যেসব মানসিক চাপ ও অবসাদ আসে, তার অন্যতম কারণ হল–সহজাত ও স্বাভাবিত প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত নয় এমন কোন কোন আচরণ শুধুমাত্র যুক্তিবাদী পটভূমি সম্পর্কে অবহিতও হওয়া সম্ভব একটি স্তর পর্যন্ত। এ ধরনের আচরণ যখন স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ওপর ব্যাপক চাপ ফেলে, তখন অবসাদ ও ধ্বংসাত্মক প্রবণতার জন্ম দিয়ে প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নেয়; এর ফলে যুক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত কোন পরিকাঠামোও ভেঙে পড়তে পারে।

সামাজিক আসঞ্জনের শুরু শত্রুভীতির সুবাদে গোষ্ঠীবদ্ধতার প্রতি আনুগত্য দিয়ে, তারপর এই আসঞ্জনের (Cohesion) বৃদ্ধি ঘটেছিল প্রক্রিয়া–পরম্পরায়–যা আংশিকভাবে ছিল স্বাভাবিক, আংশিক ছিল স্বেচ্ছাকৃত। অবশেষে এই আসঞ্জন পৌঁছায় সেই সুবিশাল একীভূত পর্যায়ে, যা আমাদের কাছে জাতি রূপে পরিচিত। এইসব প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন উপাদান ও শক্তির অবদান ছিল। খুব প্রাথমিক স্তরে, নেতার প্রতি আনুগত্য থেকে বলবৎ হতো গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য। এমনকী যখন সাধারণ আদিম মানুষেরা প্রায়শই পরস্পরের কাছে অপরিচিত ছিল, তখনও একটি বড়সড় গোষ্ঠীর প্রধান বা রাজাকে সকলেই চিনতো। এইভাবে, গোষ্ঠীগত আনুগত্যের পরিবর্তে ব্যক্তিগত আনুগত্যই, প্রবৃত্তির ধ্বংসাত্মক ক্ষতি না করেও, গোষ্ঠীর আয়তন–বৃদ্ধি সম্ভব করে তুলেছিল।

একটি নির্দিষ্ট পর্বে, আরও পরিবর্তনমুখী অগ্রগতি ঘটলো। যুদ্ধ মানেই হয়ে দাঁড়ালো ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ, অন্তত আংশিকভাবে জয়ের জন্য যুদ্ধ; পরাজিতদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পরিবর্তে ক্রীতদাসে পরিণত করা হতো, যারা তাদের বিজেতা প্রভুদের আদেশে শ্রমদান করতে বাধ্য থাকতো। এরকম ঘটনা যখন ঘটতে লাগলো, তখন কোন সমাজে দুই ধরনের মানুষ দেখা গেল, যথা–মূল সদস্যবৃন্দ, যারা নিজেরা ছিল স্বাধীন ও গোষ্ঠীতান্ত্রিক প্রেরণার অধি, আর দ্বিতীয় বিভাগে ছিল মূলত প্রজাশ্রেণী যাদের আনুগত্যের উৎস ছিল প্রবৃত্তির পরিবর্তে ভীতি। নিনেভে ও ব্যাবিলনের শাসন সুবিশাল এলাকাজুড়ে প্রসারিত ছিল, অবশ্য তার কারণ এই নয় যে, এই অঞ্চলের প্রজাদের এই প্রভাববিস্তারী নগরের প্রতি ছিল কোন সামাজিক সংসক্তিজাত প্রবৃত্তিগত চেতনা, বরং আসল কারণটা ছিল– যুদ্ধবিজেতাদের শৌর্যবীর্য–প্রভাবিত সন্ত্রাস। তাই প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক আমল পর্যন্ত যুদ্ধ মূলত হয়ে দাঁড়িয়েছে নিজ গোষ্ঠীর

সম্প্রাদায়ের সম্প্রসারণের প্রধান চালিকাশক্তি এবং সামাজিক সংসক্তির উৎসরূপে দ্রুততর গতিতে গোষ্ঠী ঐক্যের জায়গা নিয়েছে ভীতি। এই পরিবর্তন বৃহদায়তন গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না; দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়–স্পার্টায় স্বাধীন নাগরিক ছিল সংখ্যালঘু, এবং হেলটরা নির্দয়ভাবে নিষ্পেষিত হতো: প্রশংসনীয় সামাজিক আসঞ্জনের জন্য স্পার্টানগরী সমগ্র প্রাচীন কাল জুড়েই প্রশংসা অর্জন করেছে, কিন্তু এটা এমনই এক সংসক্তি ছিল, যা কখনই সমগ্র জনসাধারণকে কাছে টানতে চেষ্টা করেনি, বরং সন্ত্রাসের সুবাদে বাহ্যিক আনুগত্যেরই প্রকাশ ঘটেছিল।

সভ্যতার অগ্রগতির পরবর্তী স্তরে এক নতুন ধরনের আনুগত্যের অধ্যায়ের সূচনা ঘটেছিলঃ আঞ্চলিক জ্ঞাতিত্ব বা সাদৃশ্যের ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং মতবাদের অভিন্নতার ভিত্তিতে আনুগত্য। পাশ্চাত্য দেশে অরক্ষিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রবণতা উদ্ভূত হয়েছিল, যেখানে ক্রীতদাসদেরও সমানাধিকারীর স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও প্রাচীনযুগের ধর্মাধিকারের সঙ্গে সরকারি সম্পর্ক এতটাই নিবিড় ছিল যে, সমধর্মচারীদের সঙ্গে পুরাতন জৈব ভিত্তিতে লালিত গোষ্ঠীদের অবস্থান মোটামুটিভাবে সদৃশ ছিল। কিন্তু মতবাদের অভিন্নতা ক্রমশ প্রবলতর নির্ণায়ক শক্তি হয়ে দাঁড়ালো। এর সামরিক শক্তি সর্বপ্রথম দেখা গিয়েছিল ইসলামের নেতৃত্বে–সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর বিজয়াভিযানের মাধ্যমে। এই শক্তি মুসলমান বিরোধী জেহাদে ও অন্যান্য ধর্মযুদ্ধে প্রেরণা জুগিয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদী আনুগত্যকে প্রায়শই ছাপিয়ে যেত ঈশ্বরবাদী আনুগত্য ঃ ইংরেজ ক্যাথলিকরা প্রায়শই স্পেনের পক্ষ গ্রহণ করতো, আর ফরাসি–ইংল্যান্ডের পক্ষ। আমাদের নিজেদের সমকালে দুটি ব্যাপক–প্রচলিত মতবাদে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে মানবজাতির এক বিশাল অংশ। এর মধ্যে একটি হল–কমিউনিস্ট মতবাদ, একটি পবিত্র পুস্তকে সন্নিবেশিত রয়েছে এই মতবাদের প্রভূত গোঁড়ামি ও অনুরাগের আয়োজন। অন্যটি অনেকটাই অনির্দিষ্ট ধরনের হলেও যথেষ্ট শক্তিশালী, যাকে বলা যায় 'জীবনযাপনের মার্কিন পদ্ধতি।' বিভিন্ন দেশ থেকে আসা অভিবাসীদের নিয়ে গড়ে ওঠা আমেরিকার কোন জৈব ঐক্য নেই, তা সত্ত্বেও দেশটির রয়েছে ইয়োরোপীয় দেশগুলোর মতোই দৃঢ় ঐক্য। সম্ভবত এ কারণেই আব্রাহাম লিঙ্কন বলেছিলেন, এই দেশ একটি শপথের প্রতি উৎসর্গীকৃত।' আমেরিকায় অভিবাসীরা প্রায়শই ইয়োরোপের জন্য স্মৃতিকাতরতায় ভোগেন, কিন্তু তাদের সন্তানসন্ততিরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পুরনো পৃথিবীর চেয়ে মার্কিনী জীবনধারাকে অধিকতর পছন্দ করে, এবং তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, এই ধরনের জীবনবিচিত্রা যদি বিশ্বজনীন হয়ে ওঠে, তাহলে তা মানবজাতির ঐক্য একাঙ্গীভূত হয়ে এক নতুন ধরনের ক্ষমতা অর্জন করেছে, কিন্তু এই পরস্পরবিরোধী মতবাদ দুটির এমন আকর্ষণ রয়েছে, যা প্রায়শই জাতীয় সীমান্ত অতিক্রম করে যায়।

আমাদের সময়ের বিশাল গোষ্ঠীর প্রতি আধুনিক আনুগত্য, তা যতই শক্তিশালী ও আত্মবাদী অর্থে সন্তোষজনক হোক না কেন, এখনও ক্ষুদ্র গোষ্ঠীজীবনের দিনগুলোতে

বিকশিত প্রাচীন মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার প্রয়োগ রয়েছে। মস্তিষ্কের স্বাভাবিক আকারের সঙ্গে মানুষের যখন সর্বপ্রথম পরিচিতি ঘটেছিল, সেই দিনগুলো থেকে আজও সহজাত মানবিক প্রকৃতির বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি, যদিও বিদ্যালয় ও ধর্ম, প্রচার ও সংগঠনের সমবেত উদ্যোগে এর বিপরীত প্রবণতা গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে। প্রবৃত্তিগত অর্থে আমরা মানবজাতিকে দুই ভাগে ভাগ করবো–মিত্র ও শত্রু–তারাই হল মিত্র, যাদের প্রতি আমাদের রয়েছে সহযোগিতার নৈতিকতা; আর যাদের প্রতি রয়েছে আমাদের প্রতিযোগিতার নৈতিকতা, তারা–শত্রু। কিন্তু এই বিভাজনেরও অবিরাম পরিবর্তন ঘটে চলেছে; কোন মুহূর্তে হয়তো কোন ব্যক্তি তাঁর ব্যবসায়ী–প্রতিযোগীকে ঘৃণা করেন, কিন্তু অন্য কোন মুহূর্তে তাঁদের দু'জনের প্রতি যখন সমাজবাদ বা কোন বহির্শত্রু ভীতি প্রদর্শন করে, তখন হঠাৎ তিনি তাঁর শত্রুকেও বন্ধুরূপে ভাবতে শুরু করেন। যখন আমরা পরিবারের সীমানা ছাড়িয়ে যাই, তখন সবসময়ের বহির্শত্রুই সংসক্তির রসদ সরবরাহ করে। নিরাপদ সময়ে আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের ঘৃণা করার সুযোগ পাই, কিন্তু বিপদের সময়ে তাকে আমাদের ভালবাসতেই হবে। অধিকাংশ সময়েই, মানুষ বসে তার পাশে বসে থাকা ব্যক্তিকে ভালবাসে না, কিন্তু বিমানহানার সময়ে সে তাকেই ভালবাসে।

এই কারণের জন্যই পৃথিবীব্যাপী ঐক্যের উপায় উদ্ভাবন করা দুরূহ হয়ে ওঠে। যদি কোন দিন বিশ্বরাষ্ট্র দৃঢ়ভাবে গঠিত হয়, তখন ভয় পাওয়ার মতো কোন শত্রুপক্ষ থাকবে না; এই অবস্থায় সে কারণে, সংসক্তিমূলক উপাদানের অভাবে সেই রাষ্ট্রের ভেঙে পড়ার আশঙ্কাও থাকবে। বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিস্টানধর্ম–এই দুটি মহৎ ধর্মমত স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানবজাতির মধ্যে সহযোগিতার বাতাবরণ সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করেছে। তারা মানুষের সৌভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে প্রচার করেছেন, 'সৌভ্রাতৃত্ববোধ' শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে তারা তাদের স্বাভাবিক বাধ্যবাধকতা অতিক্রম করে এক ধরনের আবেগময় দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করার চেষ্টা করছে, যার বৈশিষ্ট্য মূলত দৈব্য। যদি আমরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান হয়ে থাকি, তাহলে আমাদের সকলকে নিয়েই তো একটি পরিবার। কিন্তু বাস্তবে যারা তত্ত্বগতভাবে এই মতবাদ গ্রহণ করেছে, তারা সবসময়ে মনে করে, যারা এই মত গ্রহণ করে না, তারা ঈশ্বরের সন্তান নয়, বরং তারা শয়তানের সন্তান– এবং গোষ্ঠীবহির্ভূত ক্ষেত্রে ঘৃণার যে প্রক্রিয়া, তা আবার বর্ধিত শক্তি নিয়ে ফিরে এসেছে, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে এই প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। ধর্ম, নীতি, অর্থনৈতিক স্বার্থ, জৈবিক অস্তিত্বরক্ষা–এসব কিছুই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির কাছে সরবরাহ করে বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার পরিপূরক নিরুত্তরযোগ্য যুক্তিবাদ, কিন্তু আমাদের গোষ্ঠী ঐতিহ্যবাহিত প্রবৃত্তি ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধে জ্বলে ওঠে এই কথা চিন্তা

করে যে, যদি ঘৃণার পাত্র কেউ না থাকে, তাহলে জীবন স্বাদহীন হয়ে পড়বে, নির্বোধের মতো যাকে তাকে ভালবাসতে পারে একমাত্র কীটপতঙ্গরাই. চিন্তার মধ্যে এও থাকে যে, সংগ্রামই হল জীবনের সূত্র; এমন কোন পৃথিবীতে যদি সকলেই পরস্পরকে ভালবাসে, তাহলে বেঁচে থাকার কোন মানেই হয় না। যদি কোনদিন মানবজাতির ঐক্যের রূপায়ণ করতে হয়, তাহলে আংশিকভাবে আইনের শাসন কায়েম করে, এবং আংশিকভাবে আমাদের প্রতিযোগিতামূলক প্রবৃত্তিসমূহের নির্দোষ নির্গমনের ব্যবস্থা করে আমাদের অসচেতন আদিম হিংস্রতাকে বিদায় জানানোর পথ খুঁজে বার করতে হবে।

এটা কোন সরল সমস্যা নয়, এবং এটা এমন এক সমস্যা, যার সমাধান শুধুমাত্র নৈতিকতার দ্বারা সম্ভব নয়। মনোসমীক্ষা–তার কিছু কিছু সুনিশ্চিত অতিরঞ্জনী ও অবাস্তবতামূলক বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও আমাদের প্রচুর সঙ্গত ও মূল্যবান শিক্ষা প্রদানও করেছে। একটি প্রাচীন প্রবাদ–যদি তুমি বিশেষ ধরনের নিক্ষেপ–দন্ড দিয়েও প্রকৃতিকে বিতাড়িত করো, তাহলেও তা ফিরে আসবে, কিন্তু মনোবিশ্লেষণ এই পটভূমিতেই বিবরণীটিকে সরবরাহ করেছে এখন আমরা জানি–যদি কোন মানুষের জীবন মাত্রাতিরিক্তভাবে প্রাকৃতিক প্রবৃত্তিকে অতিক্রম করে ফেলে, তখন সেই জীবনে নানাবিধ মানসিক চাপের কুফল দিখা দেতে পারে, যা নিষিদ্ধ প্রবৃত্তিতে আসক্তির মতোই খারাপ পর্যায়ে পৌছাতে পারে।

যেসব মানুষের জীবন একটা নির্দিষ্ট বিন্দু অতিক্রম করে অস্বাভাবিক প্রবাহিত হয়, তাদের জীবন সাধারণত নানাবিধ ঈর্ষা, অপচিকীর্ষা ও নির্মমতায় পরিপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাদের মধ্যে নিষ্ঠুরতাপুষ্ট মানসিক চাপ দেখা দিতে পারে, অথবা–পক্ষান্তরে তাদের জীবন থেকে হারিয়ে যেতে পারে সব ধরনের আনন্দ, যার ফলশ্রুতিতে তারা আর উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতা দেখাতে পারে না। যেসব আদিম সম্প্রদায়কে আকস্মিকভাবে আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে নিয়ে আসা হয়েছে, তাদের মধ্যে উপরোক্ত প্রবণতার প্রকাশ ঘটতে দেখা গেছে। নৃতত্ত্ববিদেরা বর্ণনা করেছেন; কীভাবে পাপুয়া নরমুন্ড–শিকারিরা শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের দ্বারা তাদের দীর্ঘকালীন অভ্যাসলালিত খেলাধুলা থেকে বঞ্চিত হয়ে সব ধরনের উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে এবং কোন বিষয়েই তাদের আর আগ্রহী করে তোলাও সম্ভব হয়নি। আমি অবশ্যই এই মন্তব্য করতে চাই না যে, তাদেরকে আবার নরমুন্ড–শিকারের অনুমতি দেওয়া হোক, কিন্তু আমি যা বলতে চাই, তা হল–মনস্তত্ত্ববিদরা যদি সামান্য কষ্ট করে তাদের জন্য কিছু নির্দোষ কর্মোদ্যোগের বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে বের করেন। পৃথিবীর সর্বত্রই সুসভ্য মানুষের অবস্থা, অন্তত আংশিকভাবেও, চারিত্র–বৈশিষ্ট্যের শিকারস্বরূপ পাপুয়া সম্প্রদায়ের মতোই। আমাদের মধ্যে রয়েছে সবধরনের আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি এবং অবশ্যই সৃজনমূলক

প্রবৃত্তিও রয়েছে, যার সঙ্গে যুক্ত হতে সমাজ নিবৃত্ত করে, এবং এর পরিবর্তে সমাজ ফুটবলম্যাচ–কুস্তি ইত্যাকার আঙ্গিকে যেসব বিকল্পের ব্যবস্থা করেছে, তা আদৌ যথেষ্ট নয়। যদি কেউ এমন আশা পোষণ করেন যে, যথাসময়েই যুদ্ধকে বিলুপ্ত করা সম্ভব হবে, তাহলে আদিমতার প্রজন্ম–পরম্পরা ও উত্তরাধিকারবাহিত প্রবৃত্তিসমূহের আপাত–নির্দোষ চরিতার্থকরণ জনিত সমস্যাটিকে নিয়ে গুরুত্ব দিয়ে তাদের ভাবনাচিন্তা করতে হবে। আমার তরফে বলতে পারি–আমি গোয়েন্দা গল্পের মধ্য দিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে নির্গম–পথ খুঁজে পাই, সেখানে আমি বিকল্প–পদ্ধতিতে হত্যাকারী ও শিকারী গোয়েন্দার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করি, কিন্তু আমি এও জানি–এমন মানুষও রয়েছে, যাদের কাছে এই ধরনের মামুলি নির্গম–পথগুলো খুবই অনুগ্র, এবং তাদের জন্য কিছু কড়া ধরনের খোরাকের ব্যবস্থা করা উচিত।

আমি মনে করি না প্রতিযোগিতা ছাড়া সাধারণ মানুষ সুখী হতে পারে, কেননা মানবজাতির জন্মলগ্ন থেকেই প্রতিযোগিতা যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মোদ্যোগের অনুপ্রেরণার ভূমিকা নিয়েছে। সে কারণে প্রতিযোগিতার বিলোপসাধনের চেষ্টা করা উচিত নয়, শুধু এদিকটায় লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, প্রতিযোগিতা যেন খুব অনিষ্টকর রূপ না নিতে পারে। আদিম প্রতিযোগিতা ছিল এমন এক ধরনের সংঘাত যেখানে একজন মানুষ অন্য একজন মানুষ, তার স্ত্রী ও সন্তানসন্ততিকে হত্যা করতো; আধুনিক যুগের প্রতিযোগিতাতেও যুদ্ধের আঙ্গিকে একই ধরনের ঘটনা ঘটে। কিন্তু ক্রীড়া–সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবং সাংবিধানিক রাজনীতিতে প্রতিযোগিতায় নামমাত্র ক্ষতি জড়িয়ে থাকে এবং তা সত্ত্বেও এগুলো প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্গমনের যথেষ্ট সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা করে থাকে। এক্ষেত্রে যা অসঙ্গত, তা হল–এ ধরনের প্রতিযোগিতা মন্দ নয়, কিন্তু এগুলোতে সাধারণ পুরুষ ও নারীদের এক অতি ক্ষুদ্রাংশই নিজেদের যুক্ত করে থাকে।

যুদ্ধ ছাড়াও আধুনিক সভ্যতা ক্রমশ নিরাপত্তার বিষয়টিকে লক্ষ্যবস্তু রূপে নির্ধারিত করেছে, কিন্তু আমি আদৌ সুনিশ্চিত নই যে, সব ধরনের বিপদ দূরীভূত হলেই সুখের সন্ধান মিলবে। এ প্রসঙ্গে আমি স্যার আর্থার কিথের 'নিউ থিওরি অব হিউম্যান ইভলিউশন' (New theory of human evolution) থেকে একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করতে চাই–

"বন্য বিচারের রাজত্বে যারা বসবাস করে, তাদের পরিদর্শন করে, কিছু মানুষ উপরোক্ত সদৃশ অবস্থায় বসবাসকারী স্বদেশীয়দের মধ্যে সেই বৃত্তান্ত পরিবেশন করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ–ফ্রেয়া স্টার্ক দক্ষিণ–আরব সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে–'আমি ওই দেশের এমন একটি অংশে পরিভ্রমণ করতে এলাম যেখানে নিরাপত্তা–ব্যবস্থার কোন অস্তিত্ব নেই, সেখানে আমি এমন এক সম্প্রদায়ের মানুষের সাক্ষাৎ পেলাম, যাদের

জীবনের অপর নাম ছিল নিরবচ্ছিন্ন–ভাবে ভীতিপ্রদর্শন ও লুণ্ঠনকর্ম–তা সত্ত্বেও তাদের জীবন পৃথিবীর যে কোন স্থানে বসবাসকারী মানুষদের মতোই আনন্দ–বিনোদনে পরিপূর্ণ থাকত।' ডঃ এইচ–কে–ফ্লাই অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সম্পর্কে অনুরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'অরণ্যরাজ্যের আদি অধিবাসী বসবাস করে চলমান বিপদকে সঙ্গে নিয়ে; বৈরি আত্মারা সবসময়েই তাকে প্রদক্ষিণ করে। তা সত্ত্বেও, সে কোমলহৃদয় ও আনন্দময়...তার সন্তানসন্ততির প্রতি সে যথারীতি প্রশ্রয়প্রবণ ও বাবা–মায়ের প্রতি সহৃদয়।' আমার তৃতীয় দৃষ্টান্ত হল–আমেরিকার ক্রো ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়, যারা বহু বছর ধরে ডঃ আর লৌরির চোখের সামনেই বসবাস করেছে। তারা এখন সংরক্ষিত নিরাপত্তা–বলয়ে বাস করছে। ডঃ লৌরি বলেছেন, 'একজন ক্রো–কে জিজ্ঞাসা করো যে, সে বর্তমানের নিরাপত্তা অথবা অতীতের বিপন্নতা–কোনটিকে বেছে নেবে, তার উত্তরটি হবে–"অতীতের বিপন্নতাই বেছে নেব...কারণ তার মধ্যে অনেক গৌরব ছিল'। 'আমি ধরে নিচ্ছি–আমার বর্ণিত জীবনের আরণ্যক শর্তগুলো উদ্ভূত হয়েছে সেই পটভূমি থেকে, যা মানবজাতি বির্বতনের সমগ্র প্রাথমিক পর্ব জুড়ে অতিবাহিত করেছে। এই রকম পরিস্থিতির মধ্যেই গড়ে উঠেছিল মানুষের প্রকৃতি ও চারিত্রিক ধর্ম এবং এই পরিস্থিতিনির্ভর একটি শর্ত ছিল–রক্তস্নাত প্রতিশোধের অভ্যাস।"

মানব–মনস্তত্ত্বের এধরনের ফলাফলের পিছনে এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলো ১৯১৪ সালে সর্বপ্রথম জানার পরে, অন্তত আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়েছিল। এমন অনেক মানুষ রয়েছে, যারা শান্তিকালীন সময়ের চেয়ে যুদ্ধের সময়ে বেশি সুখী অনুভব করে, অবশ্য এই শর্তসাপেক্ষে যে যুদ্ধরত মানুষদের প্রত্যক্ষ দুঃখকষ্ট যেন তাদের ওপর খুব বেশি না পড়ে। শান্তশিষ্ট জীবন মানে একঘেঁয়ে জীবনও হতে পারে। মোটামুটি ভাল উপার্জন করেন, সচ্ছল জীবনযাপনে অভ্যস্ত–এরকম রোমাঞ্চহীন সদাচারী নাগরিকের অস্তিত্বের ফসল হল এক বৃহত্তর মানবিক প্রকৃতি–৪,০০,০০০ বছর আগে জন্মগ্রহণ করলে যে প্রকৃতির সুবাদে সে উদ্যোগ নিত খাদ্যান্বেষণে, নরমুন্ড শিকার ও বাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচার অঢেল সুযোগে। যখন যুদ্ধ বেধে যায়, তখন ব্যাংকের করণিক পালিয়ে কমান্ডারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে, এবং অবশেষে সে মনে করতে পারে, প্রকৃতি ঠিক যেভাবে চেয়েছিল, ঠিক সেইভাবেই তো সে এখন জীবনযাপন করছে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত, বিজ্ঞান আমাদের হাতে বর্তমানে আমাদের ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি চরিতার্থকরণের এমন সব দারুণ শক্তিশালী উপকরণ তুলে দিয়েছে যে, মানুষের অবাধ আচরণ–যখন তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল–সেরকম কোন বিবর্তনমূলক উদ্দেশ্যে আর সিদ্ধ করবে না। আমাদের নৈরাজ্যমূলক প্রবৃত্তির সঙ্গে শান্তির সংযোগস্থাপনের সমস্যা এমনই একটি বিষয়, যার ওপর চর্চা খুব বেশি হয়নি, অথচ

বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যা একান্ত প্রয়োজনীয় ও অনিবার্য হয়ে উঠেছে একেবারে নির্ভেজাল জৈব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেও এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, প্রযুক্তির সৃজনাত্মক দিকের তুলনায় ধ্বংসাত্মক দিকটার দ্রুততর গতিতে অনেক বেশি প্রসার ঘটেছে। এক মুহূর্তের মধ্যে একজন মানুষ ৫,০০,০০০ মানুষকে হত্যা করতে পারে কিন্তু সে প্রাচীন আদিম যুগের তুলনায় সামান্যতম কম সময়েও একটি শিশুর জন্মাধিকার অর্জন করতে পারেনি। মানুষ একটি আণবিক বোমা দিয়ে যতখানি দ্রুততায় ৫,০০,০০০ মানুষের জীবন ধ্বংস করতে পারে, যদি ঠিক ততটা দ্রুততায় মানুষ ৫,০০,০০০ শিশুকে হাতে পেয়ে যেতো, তাহলে আমরা অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের বিনিময়েও, জৈব সমস্যাটিকে অস্তিত্বের সংগ্রাম ও যোগ্যতমের উদ্বর্তনের দিকে ঠেলে দিতাম। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে বিবর্তনের পুরনো প্রক্রিয়াটির ওপর আর আস্থা রাখা যায় না।

সুতরাং সমাজ–সংস্কারকের সমস্যা নিছক নিরাপত্তার উপায়–অনুসন্ধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, কারণ এই উপায়সমূহ খুঁজে বার করা সম্ভব হলেও কোন গভীর তৃপ্তি সরবরাহ করতে পারে না–রোমাঞ্চ-বিপদ-প্রতিদ্বন্দ্বিতার অ. শ্রকের সমন্বয়-সাধন এবং এই সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টার সময়ে আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে–যদিও আমাদের জীবনের আচার ব্যবহার এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ ও জ্ঞানবৃত্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে, তবুও আমাদের ভাল ও মন্দ প্রবৃত্তির ক্ষেত্রগুলো সেই আদিমযুগের মতো একই রকম রয়ে গেছে, যখন আমাদের পূর্বপুরুষেরা সর্বপ্রথম বর্তমান আকৃতির মস্তিষ্কের অধিকারী হয়েছিল। আমি মনে করি না, সুসভ্য জীবনচর্যার সঙ্গে আদিম প্রবৃত্তিসমূহের সমন্বয়সাধন কোন অসম্ভব ব্যাপার, এবং নৃতাত্ত্বিকদের সমীক্ষা থেকে এঘটনাও প্রমাণিত যে, বিভিন্ন সংস্কৃতি ও লোকাচারের সঙ্গে মানবিক প্রকৃতি ব্যাপকভাবে অভিযোজনপন্থী। কিন্তু আমি এও মনে করি না যে, মূল প্রবৃত্তিকে বাদ দিয়ে এটা করা সম্ভব। রোমাঞ্চবর্জিত জীবন সম্ভবত অতৃপ্তিজনক, কিন্তু যে জীবনে রোমাঞ্চকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং সেই রোমাঞ্চ যদি যথেচ্ছ রূপ পরিগ্রহ করে– সেই জীবনও সংক্ষিপ্ত হতে বাধ্য।

আমি মনে করি, এই বিষয়টির নির্যাস নিহিত রয়েছে রেড ইন্ডিয়ানের সেই উক্তিটির মধ্যে, যা আমি কিছুক্ষণ আগে উদ্ধৃত করেছি, যে পুরনো জীবনের এক স্মৃতিচারণা করে দুঃখ প্রকাশ করেছিল–'আগের জীবনে ছিল অনেক গরিমা'। যে কোন উদ্যোগী মানুষই এমন কিছু কামনা করে থাকে। একে চিহ্নিত করা যায় 'গৌরব' রূপে। এটা করায়ত্ত করতে পারে এমন মানুষও রয়েছে–চিত্রতারকা, বিখ্যাত খেলোয়াড়, সামরিক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, এবং এমনকী কিছুসংখ্যক রাজনীতিবিদও, কিন্তু তারা খুবই সংখ্যালঘু, এবং বাকিদের সম্বল হল দিবাস্বপ্ন– চলচ্চিত্রের দিবাস্বপ্ন, বন্য পশুমার

রোমাঞ্চকাহিনীর দিবাস্বপ্ন, কল্পচারিতার নির্ভেজাল ব্যক্তিগত দিবাস্বপ্ন। আমি সেই দলে নই, যারা মনে করে দিবাস্বপ্ন মানে জিনিসটা আদ্যোপান্ত খারাপ; কল্পিত জীবনের অপরিহার্য অংশ হল এই দিবাস্বপ্ন। কিন্তু একটা দীর্ঘ জীবনে যখন এগুলোকে কোনভাবেই বাস্তবের সঙ্গে মেলানো সম্ভব হয়ে ওঠে না, তখন সহজেই এগুলো হয়ে ওঠে অস্বাস্থ্যকর এবং এমনকী প্রকৃতিস্থতার পক্ষে বিপজ্জনক। বর্তমানে অলীক ও অবাস্তবতার রাজ্যে বন্দী প্রবৃত্তিসমূহের কিছুসংখ্যক প্রকৃত নির্গমন-পথ খুঁজে বের করা এই যান্ত্রিক পৃথিবীতে বোধ হয় এখনও সম্ভব হতে পারে। সুস্থিতির স্বার্থে সর্বতোভাবে এই আশা লালন করতে হবে যে, এটা সম্ভব হতে পারে, কারণ এরকম আশাবাদ যদি পোষণ না করা হয়, তাহলে বিভিন্ন সময়ে ধ্বংসাত্মক দর্শনসমূহ মানবিক কৃতিত্বের শ্রেষ্ঠ বিষয়গুলোকে ধুয়েমুছে সাফ করে দেবে। এটা যদি প্রতিরোধ করতে হয়, তাহলে আমাদের প্রত্যেকের অন্তর্লীন আদিমতাকে কিছু নির্গম-পথ খুঁজে নিতেই হবে, সভ্য জীবনধারা ও তারই মতো সম-আদিম প্রবৃত্তিবাহী প্রতিবেশীর সুখের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ হয়ে উঠবে না।

বক্তৃতা : দুই
সামাজিক আসঞ্জন এবং সরকার

সামাজিক আসঞ্জনের মৌলিক প্রক্রিয়া, যা এখনও দেখা যায় অধিকাংশ আদিম জাতির মধ্যে, তা সরকার নামক বস্তুটির সাহায্য ব্যক্তি-মনস্তত্ত্বের পরিসর জুড়ে ক্রিয়াশীল ছিল। নিঃসন্দেহে, গোষ্ঠীগত রীতি-প্রথার প্রচলন ছিল, যা সকলকেই মানতে হবে। কিন্তু এটাও ধরে নেওয়া যায় যে, এইসব রীতিনীতি অমান্য করার প্রবৃত্তি ও প্রবণতা ছিল না অথবা তা বলবৎ করার জন্য কোন ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশবাহিনীর প্রয়োজন দেখা দেয়নি। পুরাতন প্রস্তর যুগে, নেতৃত্বের পরিমন্ডলে এমন একটা পরিস্থিতি ছিল যাকে আমরা বর্তমান কালের নৈরাজ্যতন্ত্র রূপে বর্ণনা করতে পারি। কিন্তু আধুনিক সমাজ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নৈরাজ্য থেকে তা পৃথক ধরনের ছিল, এর কারণ হল-সেই যুগে সামাজিক প্রবৃত্তিসমূহ ব্যাপকভাবে ব্যক্তির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতো। নতুন প্রস্তর যুগের মানুষরা ছিল সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের; তাদের সরকার ছিল, বলপূর্বক আনুগত্য ও বৃহত্তর সহযোগিতা আদায়ে সক্ষম নেতৃত্ব ছিল। তাদের কাজ দেখেও তাদের স্পষ্ট বোঝা যায়; ক্ষুদ্রগোষ্ঠীভিত্তিক আসঞ্জনের ফলে হয়তো কোন বিশালাকার স্মারকমূর্তি তারা সৃষ্টি করতে পারেনি, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি পিরামিড তারাই গড়ে তুলেছিল। সামাজিক ক্ষুদ্রগোষ্ঠীর সম্প্রসারণ মূলত যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে ঘটেছিল। যদি দুই গোষ্ঠীর মধ্যে কোন ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ বেধে যেত, তাহলে নতুন এলাকা দখলকারী বিজয়ী গোষ্ঠী তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করতে সমর্থ হতো। যুদ্ধে দুই বা ততোধিক গোষ্ঠীর মধ্যে সমঝোতার সুবিধাও থাকতো। যদি সমঝোতা-উৎপাদক বিপদের সম্ভাবনা বজায় থাকতো, তাহলে যথাসময়ে সেই সমঝোতা একতাবদ্ধ মিশ্রণের রূপ নিত। যখন কোন একটি দলের সদস্যসংখ্যার অতিরিক্ত বৃদ্ধি ঘটাতো, যার ফলে পারস্পরিক জানা-চেনার ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দিত, তখন যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কোন নতুন পদ্ধতির প্রয়োজন দেখা দিত এবং ধাপে ধাপে এই প্রক্রিয়া নিশ্চিতভাবেই বিকাশিত হতো এমনভাবে, যা দেখে একজন আধুনিক মানুষ সেটিকে সরকার রূপে চিনে নিতে সক্ষম হয়। যখনই সরকারের উদ্ভব ঘটলো, তখনই অন্যদের তুলনায় কিছুসংখ্যক মানুষের হাতে এল অধিকতর ক্ষমতা, এবং মোটামুটিভাবে বলতে গেলে যা

ক্ষমতা নির্ভর করতো তাদের শাসনাধীন দলটির আয়তনের উপর। সেই কারণে ক্ষমতার প্রতি ভালবাসা থেকেই জন্ম নিত শাসকের বিজয়-আকাঙ্ক্ষা। এই ধরনের উদ্দেশ্যে তখনই ব্যাপকভাবে রূপায়িত ও বলবৎ হতো, যখন পরাজিতদের ধ্বংস না করে ক্রীতদাসে পরিণত করা হতো। এইভাবে খুবই প্রাথমিক স্তরে সামাজিক সহযোগিতার অনুকূলে আদিম প্রবৃত্তির সক্রিয় অস্তিত্ব সত্ত্বেও বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিকাশ এমনভাবে অব্যাহত ছিল যে আদেশ অমান্যকারীদের সরকার কর্তৃক শাস্তিপ্রদানের ক্ষমতার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে তার প্রকাশ ঘটেছিল। প্রাচীন ইজিপ্টের আদিমতম পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক গোষ্ঠীদের ক্ষেত্রে আমরা এমন এক রাজার সাক্ষাৎ পাই, পুরোহিততন্ত্রের দ্বারা আরোপিত কিছু সীমাবদ্ধতা ছাড়া বিশাল এলাকা জুড়ে যার ক্ষমতা ছিল অসীম, এবং আমরা এও দেখি- ক্রীতদাসসুলভ এক বিশালসংখ্যক মানুষকে সেই রাজা যথেচ্ছভাবে পিরামিডের মতো সরকারি উদ্যোগে নিয়োজিত করতে পারতেন। এরকমই এক সমাজ- সম্প্রদায়ে সামাজিক স্তরের একেবারে চূড়ায় এক অতি ক্ষুদ্রাংশ-রাজা-অভিজাততন্ত্র, যাজক-সামাজিক আসঞ্জনের অনুকূলে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন অনুভব করলো; আর অবশিষ্ট সকলের কাজ ছিল-শুধুই তা মান্য করা। কোন সন্দেহ নেই-জনসাধারণের বিশাল অংশই ছিল অসুখী; এক্সোডাসের প্রথম অধ্যায়গুলোতে তাদের অবস্থার প্রতিচ্ছবি মেলে। কিন্তু প্রথাগতভাবে বহির্শত্রুদের কাছ থেকে যতদিন পর্যন্ত কোন ভয়ের কারণ ঘটেনি, ততদিন এই ব্যাপক দুঃখকষ্ট-বিধ্বস্ত অবস্থার কারণে রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি ব্যাহত হয়নি, এবং এর ফলে ক্ষমতার অধিকারীদের তরফে জীবনকে উপভোগ করার ক্ষেত্রেও কোন প্রতিবন্ধকতা আসেনি। এই ধরনের অবস্থা দীর্ঘকাল ধরে বজায় ছিল সেই অঞ্চলে, যাকে আমরা বলি মধ্য প্রাচ্য। এই স্থিতাবস্থার জন্য তারা নির্ভর করেছিল ধর্ম ও রাজার অলৌকিকত্বের উপর। অবাধ্যতাকে মনে করা হতো এক ধরনের অধার্মিকতা এবং বিদ্রোহ মানেই ছিল দেবতার ক্রোধবর্ষণকে ডেকে আনা। যতদিন পর্যন্ত উচ্চতর সামাজিক লোকবৃত্ত অকৃত্রিমভাবে এটা বিশ্বাস করতো, ততদিন বাকিদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা যেত, ঠিক বর্তমানে আমরা যেভাবে পশুদের বশে রাখি।

এটা খুবই কৌতূহলের বিষয় যে, সামরিক বিজয়ের সূত্রে প্রায়শই বিজিতদের মধ্যে জন্ম নিত অকৃত্রিম প্রভুভক্তি। রোমক বিজয়াভিযানের সমকালে এধরনের ঘটনা দেখা গিয়েছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে যখন রোম আর বশ্যতাকে বাধ্যতামূলক করে রাখতে পারল না, তখনও গল ছিল সম্পূর্ণভাবেই সম্রাটের প্রতি অনুগত। প্রাচীনতার ঐতিহ্যবাহী সব বড় রাষ্ট্রই সামরিক শক্তির উপরেই তাদের অস্তিত্ব অর্পণ করেছিল,

কিন্তু এই রাষ্ট্রগুলোর অধিকাংশই দীর্ঘস্থায়িত্ব লাভ করলে, সংযুক্তিকরণের সময়ে প্রবল আঞ্চলিক সহিংস প্রতিরোধ সত্ত্বেও, সামগ্রিকভাবে এক ধরনের আসঞ্জনের পরিবেশ সঞ্চারিত করতে সমর্থ হয়েছিল। মধ্যযুগে আধুনিক রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একই ঘটনা ঘটেছিল। জাতি নামে চিহ্নিত পরিমন্ডলের কোন কোন অংশের শাসকেরা সামরিক বিজয়ের সূত্রে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, এবং স্পেন সকলেই ঐক্য অর্জন করেছিল।

ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় ইজিপ্ট ছাড়া সব রাষ্ট্রই স্থায়িত্ব-হানির আশঙ্কায় ভুগতো, ব্যাপকতর অর্থে এর কারণগুলো ছিল কৌশলগত। যে যুগে ঘোড়ার চেয়ে দ্রুততর অন্য কোন মাধ্যমের অস্তিত্ব ছিল না, তখন অতি দূরবর্তী, বিদ্রোহপ্রবণ প্রাদেশিক শাসক বা তাদের প্রতিনিধিদের উপর দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে দুরূহ ছিল এবং এই বিদ্রোহী প্রান্তিক শাসকরা মাঝে মাঝে সমগ্র সাম্রাজ্য জয় করে নিতে সফল হতো এবং কখনও তার একটি অংশের স্বাধীন, সার্বভৌম শাসক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতো। আলেকজান্ডার, অ্যাটিলা এবং চেঙ্গিস খানের ছিল সুবিশাল সাম্রাজ্য-তাঁদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল, এবং এসব ক্ষেত্রে, বড় মাপের বিজেতার মান সম্মানের উপরে সাম্রাজ্যের ঐক্য নির্ভর করতো। এরকম বিভিন্ন ঘরানার সাম্রাজ্যের কোন মনস্তাত্ত্বিক ঐক্যবোধ ছিল না, ছিল শুধু ক্ষমতার ঐক্য। রোমের ভূমিকা ছিল কিছুটা ভাল, গ্রিক-রোমান সভ্যতা ছিল এমন একটা পর্যায় যেখানে ব্যক্তির জন্য থাকতো কিছুটা মূল্যবোধের শিক্ষা-দীক্ষা, যা অবস্থানগতভাবে ছিল সীমান্ত-বহির্ভূত গোষ্ঠীগত বর্বরতার পুরোপুরি বিপরীত বিন্দুতে। আধুনিক প্রযুক্তি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত, আগাপাশতলা বরাবর সমাজের উচ্চতর অংশের কিছু সাধারণ ভাবাবেগ-অনুপ্রাণিত ঐক্যবোধ ব্যতিরেকে কোন বিশাল সাম্রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ রাখা খুবই দুরূহ ছিল, এবং বর্তমান সময়ের তুলনায় সেই যুগে এধরনের সাধারণ ভাবাবেগ উৎসারণ সম্পর্কিত উপলব্ধির মাত্রাও ছিল খুবই সীমিত। সেই কারণে সামাজিক আসঞ্জনের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিটি তখনও ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, যদিও তার প্রয়োজনীয়তা একটি ক্ষুদ্র শাসকগোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রাচীন গোষ্ঠী ও সমাজজীবনে বিশাল সৈন্যবাহিনীর সম্ভাব্যতার মতো বিশাল আয়তনের প্রধান সুবিধার বিষয়টির ভারসাম্য নির্ধারিত হতো একটি অসুবিধাজনক দিকের মাধ্যমে এবং সেটি হলো-সাম্রাজ্যের এক অংশ থেকে অন্য প্রান্তে সৈন্যবাহিনীকে স্থানান্তর করতে দীর্ঘ সময় লাগতো, এবং এছাড়াও অসামরিক সমাজের সামরিক আগ্রাসন প্রতিরোধের উপায় আবিষ্কার করতে পারেনি। আধুনিক যুগেও অল্প কিছুটা স্তর পর্যন্ত এই অবস্থা দেখা গিয়েছিল। প্রধানত, গতিশীলতার অভাবের ইংল্যান্ড, স্পেন এবং পর্তুগালকে হারাতে হয়েছিল পশ্চিম গোলার্ধে তাদের অধিকাংশ

কিন্তু বাষ্প ইঞ্জিন ও টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের ফলে, আগের তুলনায় অনেক সহজ হয়ে উঠলো বিশাল অঞ্চল ধরে রাখা, এবং সর্বজনীন শিক্ষা প্রচলনের পর থেকে বিশালসংখ্যক মানুষের মধ্যে কম-বেশি কৃত্রিম আনুগত্যবোধ সঞ্চারিত করা সহজ হয়েছে।

আধুনিক প্রযুক্তি শুধুমাত্র বিশাল গোষ্ঠীভিত্তিক আসঞ্জনের মনস্তত্ত্বকেই সাবলীল করে তোলেনি, তা অর্থনৈতিক ও সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বড়সড়ো গোষ্ঠীকে অপরিহার্যও করে তুলেছে। বিশালায়তন উৎপাদনভিত্তিক সুবিধার বিষয়টি একটি মামুলি অজুহাত, যা আমি বিস্তৃত করতে চাই না। যেমন-আমরা সকলেই জানি, পশ্চিম ইউরোপের জাতিসমূহের অভ্যন্তরীণ নিকট-ঐক্যের কারণস্বরূপ এই বিষয়গুলোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। নীলনদ, সেই প্রাচীনকাল থেকেই সমগ্র ইজিপ্টের আসঞ্জন-প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করেছে, যদিও শুধুমাত্র উচ্চ-নীল অঞ্চলের নিয়ন্ত্রক কোন সরকার নিম্ন-নীল অঞ্চলের উর্বরতা ধ্বংস করতে পারতো। এক্ষেত্রে কোন উন্নত প্রযুক্তির অংশগ্রহণ ছিল না, কিন্তু টেনেসি উপত্যকা প্রকল্প এবং প্রস্তাবিত সেন্ট লরেন্স জলপথ ছিল নদীসমূহের একই আসঞ্জনমূলক ফলশ্রুতির বিজ্ঞানভিত্তিক সম্প্রসারণমাত্র। কেন্দ্রীয় শক্তি পর্ষদগুলো ব্যাপক অঞ্চলে বিদ্যুৎ বণ্টন করার কাজ করতো ও এভাবেই ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং ক্ষুদ্রায়ত অঞ্চলের তুলনায় বৃহত্তর অঞ্চলে এগুলো অধিকতর লাভজনকও হয়ে উঠেছিল। আণবিক শক্তির ব্যবহারকে যদি বৃহদায়তন ভিত্তিতে বাস্তবায়িত (যা অসম্ভব নয়) করে তোলা যায়, তাহলে তার দ্বারা বন্টনের এলাকাকে বিপুলতর লাভজনক রূপে সম্প্রসারিত করা যাবে, বড় বড় সংস্থার পরিচালন-গোষ্ঠী এইসব আধুনিক অগ্রগতির মাধ্যমে ব্যক্তিজীবনের ওপর নিয়ন্ত্রণের মাত্রাকে বৃদ্ধি করতে সমর্থ হবে, এবং একই সঙ্গে ক্ষুদ্রতর সংস্থার তুলনায় মুষ্টিমেয় বৃহত্তর সংস্থাগুলোকে অধিকতর উৎপাদনমুখী হয়ে উঠবে। এই গ্রহের সামগ্রিক নীতি-নিয়মটা এরকমই যে, কী অর্থনৈতিক, কী রাজনৈতিক সব ক্ষেত্রেই আয়তনগত সুবিধার কোন দৃশ্যমান সীমারেখা নেই।

আমি এখন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মোটামুটিভাবে একই সরকার-পরিচালিত উন্নয়ন ধারার একটি ভিন্নতর সমীক্ষা প্রসঙ্গে আসব। শুধুমাত্র সরকারের আওতাধীন অঞ্চলের আয়তনেই নয়, বরং ব্যক্তিজীবনে সরকারি হস্তক্ষেপের গভীরতাবৃদ্ধির ক্ষেত্রেও, সমগ্র ইতিহাস জুড়েই দেখা যায় সমাজ-সদস্যদের জীবনের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণের ভিন্নময়তা ও বৈচিত্র্যময়তা। 'সভ্যতা' অভিধায় আমরা যা চিহ্নিত করে থাকি, তার সূত্রপাত ঘটেছিল সুসংগঠিত রূপের 'সাম্রাজ্য' ব্যবস্থা থেকে, যার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল-ইজিপ্ট, ব্যাবিলন এবং নিনেভা; আজটেক ও ইনকা সাম্রাজ্যও

অনিবার্যভাবেই ছিল একই ধরনের। এই ধরনের সাম্রাজ্যে, প্রথমদিকে উচ্চপদে মানুষদের ছিল উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ব্যক্তিউদ্যোগ, কিন্তু ভিন্নদেশ জয়ের মাধ্যমে আনীত বিশালসংখ্যক দাসজনসাধারণের কোন উদ্যোগ বা উদ্যমই ছিল না। যাজকতন্ত্রও দৈনন্দিন জীবনে ব্যাপকভাবে হস্তক্ষেপ করতে সমর্থ ছিল। এরকম ধর্মভিত্তিক পটভূমি ছাড়া রাজা চরম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর প্রজাদের ওপর অংশগ্রহণে বাধ্য করতে পারতেন। রাজার ঐশ্বরিক ক্ষমতা ও যাজকতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, এই দুইয়ের সম্মিলনে গড়ে উঠেছিল স্থিতিশীল সমাজ। এরকমই একটি দৃষ্টান্ত ইজিপ্ট যা আমাদের জানাশোনার পরিধিতে সর্বাধিক স্থিতিশীলতারই দৃষ্টান্ত বিশেষ। এই স্থিতি অর্জিত হয়েছিল কঠোরতার বিনিময়ে এবং এই প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলো একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত এতটাই গতানুগতিক হয়ে পড়েছিল যে, তারা আর বিদেশী আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারত না। পারস্য তাদের গ্রাস করে ফেলেছিল এবং অবশেষে পারস্যও গ্রীকদের কাছে পরাজিত হয়েছিল। গ্রিকজাতি একটা নতুন ধরনের সভ্যতার উন্নয়ন ঘটিয়েছিল যা প্রচলিত হয়েছিল ফিনিসিয়দের উদ্যোগে বাণিজ্য সমুদ্র শক্তির ওপর গঠিত নগর-রাষ্ট্রপর্যায়। নাগরিকদের প্রতি প্রদত্ত ব্যক্তিস্বাধীনতা নিরিখে গ্রিসের নগরগুলোর মধ্যে ছিল পারস্পরিক বৈসাদৃশ্য; অধিকাংশ নগরের ক্ষেত্রেই যথেষ্ট পরিমাণেই স্বাধীনতা ছিল, কিন্তু স্পার্টা নগরীতে এই স্বাধীনতার পরিমাণ ছিল ন্যূনতম। তাদের অধিকাংশকেই থাকতে হতো স্বৈরাচারীদের প্রভাবে এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী বজায় থাকত বিদ্রোহ-প্রভাবিত স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন। নগররাষ্ট্রে বিদ্রোহ-বিপ্লবের বিষয়টি ছিল খুবই সহজ। কোন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অভিলাষী রাজনৈতিক কারণে অসন্তুষ্ট ব্যক্তিদের সেই সরকারি অঞ্চলের সীমানা ছাড়িয়ে মাত্র কয়েক মাইল অতিক্রম করতে হতো এবং সেইসব ব্যক্তিদের সাহায্য করার জন্য সর্বদা কিছু শত্রুপক্ষীয় রাষ্ট্র প্রস্তুত থাকতো। গ্রিসদেশের মহান অংশে কালব্যাপী বজায় ছিল একটি নির্দিষ্ট স্তরভিত্তিক নৈরাজ্য, আধুনিক মননে যা অসহনীয় রূপেই বিবেচিত হবে। কিন্তু একটি গ্রিক নগরের নাগরিকবৃন্দ, এমনকী যারা সরকারের বিরুদ্ধাচারী হিসেবে পরিচিত ছিল, সকলেই এক ধরনের আবিশ্য আনুগত্যের মনস্তত্ত্ব পোষণ করতো, তারা তাদের নিজেদের নগরকে একধরনের মুক্তিহীন অথচ চরম আবেগপূর্ণ আনুগত্য দিয়ে ভালবাসতো। আমি মনে করি-ব্যক্তিগত কৃতিত্বে গ্রিকদের মহান ঐতিহ্যের বিষয়টি তাদের রাজনৈতিক অযোগ্যতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। কেননা ব্যক্তিগত আবেগের শক্তিই ছিল ব্যক্তিগত কৃতিত্ব ও গ্রিক-ঐক্য অর্জনে ব্যর্থতার উৎস। এই কারণে গ্রিসকে প্রথমে ম্যাসিডোনিয়া এবং পরে রোমের প্রভাবাধীনে পড়তে হয়েছিল।

সম্প্রসারণশীল অবস্থায় রোমক সাম্রাজ্য বিভিন্ন প্রদেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ব্যক্তিগত ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রসার ঘটিয়েছিল, কিন্তু অগস্টাস সরকারের পরে ক্রমশ নিয়ন্ত্রণ, আরও নিয়ন্ত্রণ জারি হল, এবং সবশেষে নিছক মাত্রাধিক করধার্যের কারণে বিশাল রোমক সাম্রাজ্যের বৃহত্তর রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন ঘটেছিল। তবে, অবশিষ্ট যা রইলো–সেখানেও নিয়ন্ত্রণ কমলো না। জাস্টিনিয়ানের ইতালি ও আফ্রিকা পুনর্বিজয়ের অন্যান্য কারণের চেয়ে সবচেয়ে বড় কারণ ছিল–এই ধরনের অত্যধিক নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। যারা প্রথমে বিশাল সেনাবাহিনীকে গথ ও ভ্যান্ডালদের তরফ থেকে প্রেরিত রক্ষক হিসাবে স্বাগত জানিয়েছিল, এই সেনাবাহিনীর পিছু পিছু আসা কর–সংগ্রাহকদের দেখা তারাই তাদের মনোভাব পরিবর্তন করেছিল।

সুসভ্য পৃথিবীকে ঐক্যবদ্ধ করার রোমের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ ছিল–সম্ভবত অতি দূরবর্তী ও বিদেশী বৈশিষ্ট্যের জন্য সে এমনকী সমৃদ্ধ নাগরিকদের জন্যও কোন প্রবৃত্তিগত সুখের ব্যবস্থা করতে পারেনি। তার শেষ শতকগুলোতে সেখানে দেখা গিয়েছিল সামগ্রিক হতাশা ও উদ্যমহীনতা। মানুষ মনে করতো–এই ধরাধামে নশ্বর জীবনের দেওয়ার মতো কিছু নেই, এবং মানুষের এই লালিত ধারণা আগামী দিনের মানুষের ভাবনাকে কেন্দ্রীভূত করতে খ্রিস্টধর্মকে সাহায্য করেছিল।

রোম রাহুগ্রস্ত হওয়ার পরে পাশ্চাত্যে দেখা গিয়েছিল এক পূর্ণাঙ্গ রূপান্তর। ব্যবসা–বাণিজ্যচক্র প্রায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, মহান রোমের পথ সংস্কারের অযোগ্য হয়ে উঠলো, খুদে রাজারা পরস্পর নিজেদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহে মেতে রইলো এবং তাদের নাগালে থাকা ছোটখাটো অঞ্চল জুড়ে তাদের শাসন অব্যাহত রইলো, সেই সঙ্গে তাদের মোকাবিলা করতে হয়েছে উদ্ভত জার্মান-ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত অভিজাততন্ত্রের অরাজকতা ও পুরাতন রোমক ঐতিহ্যাবিষ্ট মানুষদের পুঞ্জীভূত বিতৃষ্ণার সঙ্গে। পশ্চিম খ্রিস্ট-সাম্রাজ্য থেকে ব্যাপক দাসপ্রথা প্রায়–অবলুপ্ত হল কিন্তু তার পরিবর্তে এল দায়বদ্ধ কৃষকবৃত্তি। সুবিশাল নৌ–পরিবহনের মাধ্যমে আফ্রিকা থেকে রোমে আনীত শস্য–সহায়তার পরিবর্তে খুবই সীমিত বিরল বহির্যোগাযোগের সুবিধাবলম্বী ছোট ছোট সম্প্রদায়গুলো তাদের নিজেদের জমির উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল হয়ে সাধ্যমতো বেঁচে থাকার প্রক্রিয়া শুরু করলো। জীবনযাপন খুবই কঠিন ও রূঢ় হয়ে দাঁড়ালো, কিন্তু তা সত্ত্বেও, তা আর রোম সাম্রাজ্যের শেষ দিনগুলোর মতো অবসাদ ও হতাশায় পরিপূর্ণ ছিল না। সমগ্র অন্ধকার যুগ ও মধ্যযুগ ধরে আইনহীন বিশৃঙ্খলা চরমে পৌঁছেছিল, যার ফলে সর্বস্তরের চিন্তাশীল মানুষের আইনী অনুশাসনের পুজো করতে শুরু করেছিলেন। কালক্রমে উদ্দমতা-প্রসূত বিশৃঙ্খলা থেকেই জন্ম নিল

এক ধরনের শৃঙ্খলা, যা এক দল মহান মানুষকে উদ্বুদ্ধ করলো এক নতুন সভ্যতা গড়ে তুলতে।

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ধারাবাহিক-ভাবেই ক্রমবর্ধমান; প্রথমত, এর প্রধান কারণ ছিল—বারুদের আবিষ্কার। ঠিক যেমন নৈরাজ্যবাদের গোড়ার দিনগুলোতে সবচেয়ে চিন্তাশীল মানুষ আইনের পুজো করতো, সেরকমই ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রশক্তির সময় পর্বে স্বাধীনতার আবাহন এল ক্রমবর্ধমান প্রবণতা রূপে দেখা দিয়েছিল। রাষ্ট্রক্ষমতা প্রসারের ক্ষেত্রে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে দেখা গিয়েছিল। উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সাফল্য এবং এটা শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় ছিল এবং নিম্নতম সামাজিক স্তরের নয় এমন নাগরিকদের কাছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে স্বাধীনতা ছেড়ে দেওয়া সত্ত্বেও এটা ঘটেছিল। অবশ্য, স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগের বিষয়টির অন্তর্নিহিত শক্তি অনেকাংশেই হারিয়ে গিয়েছিল সংস্কারকদের মধ্যে থেকে এবং এই শূন্যস্থান পূরণ করেছিল সাম্যের প্রতি ভালবাসা যা আবার ব্যাপকভাবে উজ্জীবিত হয়েছিল উচ্চমান্যতার ঐতিহ্যবাহী দাবি ব্যতিরেকেই নতুন শিল্প-উদ্যোক্তাদের বদান্যতা ও ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে এবং সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তার সূত্রে অন্তত প্রায় সকলকেই এটুকু বোঝানো সম্ভব হয়েছিল যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের সন্তোষবিধানকারী পরিস্থিতির তুলনায় একটা দৃঢ়তর সামাজিক ব্যবস্থার আশু প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

এক ধরনের নতুন যাজকতন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত প্রধান ইজিপ্টের স্বর্গীয় রাজকীয় ব্যবস্থার বিপরীত রূপান্তরমাত্র নয়-ঠিক এরকম একটা অবস্থা উদ্ভূত হয়েছিল এই বিশ্বের এক বৃহত্তর অংশে। যদিও এখনও পর্যন্ত এই প্রবণতা প্রাচ্যের মতো পাশ্চাত্যে এতদূর প্রসারিত হয়নি, তবুও তা এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে, যা ইংল্যান্ড ও আমেরিকা দুটি দেশেরই অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীকে বিস্মিত করেছে। রাষ্ট্র বা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যক্তিগত উদ্যোগকে বিন্যস্ত করার চেষ্টা হয়েছে, এর ফলে এমন বিপদের সম্ভাবনাও রয়েছে, যা দেখা গিয়েছিল প্রাচীন রোমে-এবং তা হল, সতেজ জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর এক ধরনের অবসাদ ও অদৃষ্টবাদ। আমি অবিরাম এই ধরনের বয়ানে চিঠি পাই, 'আমি দেখছি যে, পৃথিবীর অবস্থা খুবই খারাপ স্তরে পৌঁছেছে, কিন্তু একজন সাদামাটা বিনয়ী মানুষ এর জন্য কী করতে পারে? জীবন ও ধনসম্পদ যেন কয়েকজন মানুষের একচেটিয়া অনুগ্রহ-বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে-একমাত্র তারাই শান্তি বা যুদ্ধ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকারী। যে কোন বৃহদায়তন ভিত্তিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নির্ধারিত হয়ে থাকে এমন বিশেষ কিছু মানুষের দ্বারা, যারা রাষ্ট্র অথবা বিশাল সংস্থাগুলোতে শাসন চালায়। এমনকী যেখানে নামমাত্র গণতন্ত্র রয়েছে, সেখানে

নীতিনির্ধারণে একজন নাগরিকের ভূমিকা হল অত্যন্ত নগণ্য। এই অবস্থায় কি গণমুখী কাজকর্ম ভুলে গিয়ে সময় সভ্যতার শর্তসাপেক্ষে সর্বাধিক আনন্দ-স্ফূর্তিতে মেতে যাওয়া অধিকতর বাঞ্ছনীয় নয়?' এধরনের চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়া আমার কাছে খুবই দুরূহ মনে হয় এবং আমি এ ব্যাপারেও সুনিশ্চিত—যে মানসিক পরিমন্ডল এধরনের চিঠি লিখতে তাদের প্রাণিত করে, তা স্বাস্থ্যকর সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে খুবই ক্ষতিকর। নিছক আয়তনের ফলশ্রুতিতে সরকারের সঙ্গে শাসিতের দূরত্ব ক্রমশ বেড়েই চলে, এবং এই ভাবে এমনকী গণতন্ত্রে নিজস্ব ঢঙের এক স্বাধীন জীবনচর্যার প্রবণতা দেখা যায়। আমি জানতে চাই না কোন উপায়ে সম্পূর্ণভাবে অশুভ প্রবণতার নিরাময় সম্ভব, কিন্তু আমি মনে করি, এর অস্তিত্বকে চিহ্নিত করা এবং এর মাত্রাকে হ্রাস করার জন্য পথের অনুসন্ধান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরস্পরের চেনাজানায় এরকম ক্ষুদ্র গোষ্ঠীভুক্ত সদস্যদের প্রতি আনুগত্যের মতো সামাজিক আসঞ্জনের প্রবৃত্তিগত প্রক্রিয়াটি আধুনিক পৃথিবীতে বিশাল রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের ধরনের চেয়ে বাস্তবিকই বহুলাংশে পৃথক, এবং এমনকী আদিম ঐতিহ্যের আনুগত্যের অবশিষ্টাংশও বিপদসংকুল পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। একজন ইংরেজ অথবা একজন স্কটল্যান্ডের মানুষ ব্রিটেনের প্রতি স্বাভাবিক আনুগত্য পালন করতে পারে : তার জানা থাকতে পারে, শেক্সপিয়র তাদের দেশ সম্পর্কে কী বলেছেন: সে জানে—এটা হল একটা দ্বীপ, যার সীমানা সম্পূর্ণভাবেই প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক। সে ইংল্যান্ডের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত, অন্তত এই দেশের গৌরবময় পর্বের সবটুকুই তার জানা, এবং সে এ-ও জানে—মহাদেশের মানুষেরা বিদেশী ভাষায় কথা বলে। কিন্তু যদি ব্রিটেনের মতো আনুগত্যের স্থানে পশ্চিমী সংঘকে প্রতিস্থাপিত করতে হয় তাহলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে এমন এক ধরনের সচেতনতার প্রয়োজন দেখা দেবে, যা জাতীয় সীমানা অতিক্রম করে এক ধরনের ঐক্যের প্রতিনিধিত্ব করবে: কারণ, এছাড়াও এই উদ্দেশ্যের পরিপূরক আর মাত্র একটিই মনস্তাত্ত্বিকতার কথা ভাবা যায় এবং তা হ'ল বহির্শত্রু থেকে ভীতিজনিত মানসিকতা। কিন্তু, ভয় হল একটা নেতিবাচক মানসিকতা, যা বিজয়ের মুহূর্তে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। যখন এটাকে একজন গ্রিকের তার স্বদেশ-নগরীর প্রতি ভালবাসার সঙ্গে তুলনা করা হয়, তখন এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এই বন্ধন কতই না ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এবং তাৎক্ষণিক ও বর্ধমান বিপদের অনুপস্থিতিতে যে আনুগত্য নিছক সাধারণ নর-নারীর প্রবৃত্তি ও আবেগের ওপর ভর রেখে অবস্থান করে।

তার অস্তিত্বের একেবারে গোড়ার দিনগুলো থেকে সরকারের দুটি কার্যধারা রয়েছে, একটি নেতিবাচক ও একটি ইতিবাচক। এই নেতিবাচক কাজের মধ্যে রয়েছে বে-সরকারি হিংসা দমন, জীবন ও সম্পত্তির সুরক্ষা, ফৌজদারি আইন-প্রণয়ন ও তার

প্রয়োগ। এসব ছাড়াও, এর একটা ইতিবাচক উদ্দেশ্য রয়েছে এবং তা হল—অধিকাংশ নাগরিকের পক্ষে উপযোগী ও জরুরি অভিলাষসমূহের রূপায়ণ–প্রক্রিয়ার ত্বরান্বিতকরণ। অধিকাংশ সময়েই সরকারের ইতিবাচক কার্যাবলি যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে ঃ যদি কোন শত্রুকে পরাজিত করা যায় এবং তার এলাকা দখল করা যায়, তাহলে বিজয়ী জাতির প্রত্যেকেই কম-বেশি লাভবান হয়। কিন্তু, বর্তমানে সরকারের ইতিবাচক কার্যাবলি বহুধাবিস্তৃত। সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয়–শিক্ষা যা শুধুমাত্র পণ্ডিতসুলভ চর্চা দিয়ে নয়, বরং সুনির্দিষ্ট আনুগত্য ও বিশ্বাস–সঞ্চারক উপকরণ দিয়ে গড়ে উঠবে। এগুলো হল সেইসব উপকরণ, যা রাষ্ট্রের কাছে কাম্য এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অন্তত সীমিত পর্যায়েও যা কিছু ধর্মীয় সংস্থার কাছেও অভীপ্সিত। এরপরেও রয়েছে সুবিশাল শিল্পোৎপাদন উদ্যোগ। এমনকী, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যথাসম্ভব রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সীমিত রাখার পক্ষপাতী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেরও উপরোক্ত ধরনের উদ্যোগে সরকারি নিয়ন্ত্রণ অতি দ্রুতগতিতে বেড়েই চলেছে। এমন শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রেও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, রাষ্ট্র–পরিচালিত ক্ষেত্রে ও বৃহৎ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত ক্ষেত্রের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। উভয় ক্ষেত্রেই, প্রকৃতপক্ষে স্বেচ্ছায় না হলেও এমন একটা সরকার রয়েছে, যার সঙ্গে তার নিয়ন্ত্রকদের রয়েছে যথেষ্ট দূরত্ব। একমাত্র রাষ্ট্র অথবা বেসরকারি সংস্থার সদস্যরাই ব্যক্তিগত উদ্যোগ সচেতনতাকে উজ্জীবিত করতে পারে এবং নিছক প্রয়োজনীয় উপকরণের মতো যন্ত্রকে মান্য করার মতোই সরকারের তরফ থেকে, যারা তাদের অনুকূলে কম–বেশি কাজ করে, তাদের মান্য করার একটা অনিবার্য প্রবণতা রয়েছে। মসৃণ সহযোগিতার ইচ্ছায় নিরবচ্ছিন্নভাবে সংস্থার আয়তন বর্ধিত করার প্রবণতা থাকে এবং সেকারণে স্ব–উদ্যোগ রয়েছে, এমন মানুষদের সংখ্যা কমানোরও প্রবণতা থাকে। আমাদের বর্তমান দৃষ্টিকোণ থেকে, সবচেয়ে খারাপ বিষয় হল–ব্রিটেনের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এমন একটা ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে যেখানে যাদের মধ্যে অতি সামান্য পরিমাণে উদ্যোগ রয়েছে, তারা চিরকাল জনপালন কৃত্যকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এই জনপালনের মধ্যে রয়েছে শুধু 'ভেটো' ও পরিকল্পনা-শূন্যতার ক্ষমতা, এবং যা এইভাবে শুধুমাত্র নিষিদ্ধকরণের অনুকূলে এক ধরনের চিরন্তন নেতিবাচক মনস্তত্ত্বের ভিত গড়ে তুলেছে। এরকম একটা ব্যবস্থায় উৎসাহ পর্যবসিত হয় হতাশায়; যারা অধিকতর আশাবাদী পরিবেশে উৎসাহী হয়ে উঠতে পারতো, তারাও অবসন্ন ও অসাড় হয়ে যেতে পারে এবং এরকম সম্ভাবনাও নেই যে, রাষ্ট্রের ইতিবাচক কাজগুলো উদ্দীপনা ও দক্ষতা সহকারে সম্পন্ন হবে। এরকম সম্ভাবনাও রয়েছে যে, অর্থনৈতিক পতঙ্গবিজ্ঞান বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে মুনাফা নিয়ে আসবে, কিন্তু তা

জন্য এক উল্লেখযোগ্য অংশ পতঙ্গবিজ্ঞানীর বেতন মঞ্জুর করতে হবে এবং বর্তমানে সরকারের অভিমত হল–পতঙ্গবিজ্ঞানীদের নিয়োগ করার মতো উদ্যোগী নীতিকে খুব ধীরে রূপায়িত করা হবে। বলা নিষ্প্রয়োজন–এটা এমনই মানুষদের একটা অভিমত যারা একটি বিশেষ ধরনের অভ্যাস রপ্ত করেছেন। এই অভ্যাসের সুবাদে একদল আগে তাঁরা অবশ্য বিচারও করেন না যে, 'ওটা' আদৌ কোন ক্ষতিকর বস্তু কিনা। যে পটভূমিতে দূর–নিয়ন্ত্রণী ব্যবস্থা রয়েছে এবং বিশালতর সংগঠনের যেখানে আরও অনেক বেশি দূর– নিয়ন্ত্রণী ব্যবস্থার সম্ভাবনা রয়েছে, সেক্ষেত্রে এ ধরনের ক্ষতিকর প্রবণতাকে এড়িয়ে চলা খুবই দুরূহ।

পরবর্তী একটি বক্তৃতায় আমি বিশ্লেষণ করবো, বৃহদায়তন সংগঠনের সুনিশ্চিত সুবিধাকে না হারিয়ে এই অশুভ প্রবণতার সমাধানে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। এরকমও হতে পারে যে, বর্তমানে কেন্দ্রীভূত করার দিকে প্রবণতা এতটাই শক্তিশালী যে, তাকে প্রতিরোধ করা অসাধ্য, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা কোন বিপর্যয় বয়ে আনে–যে রকম বিপর্যয়ের সূত্র ধরে নৈরাজ্য ও দারিদ্র্যের সমস্ত রকম অনিবার্য ফল সহ পঞ্চম শতাব্দীতে সমগ্র ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়েছিল–যতক্ষণ পর্যন্ত না জীবনের স্বাদসঞ্চারী ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মাত্রা মানুষ আবার অর্জন করতে পারে। আমি আশা করি, ঘটনা আসলে এরকমটা নয়, কিন্তু যদি বিপদের গুরুত্ব না উপলব্ধি করা হয় এবং তার মোকাবিলা করতে যদি না কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবেই এরকম ঘটনা ঘটবেই।

ঐতিহাসিক পর্বে সংগঠিত সামাজিক আসঞ্জন-সম্পর্কিত পরিবর্তন–প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত চালচিত্রে, আমরা একটি দ্বি-স্তর আন্দোলনকে পর্যবেক্ষণ করতে পারি।

একদিকে রয়েছে একটা সময়ভিত্তিক অগ্রগতি, যা আসলে এক ঢিলেঢোলা ও আদিম ধরনের সাংগঠনিক ব্যবস্থা থেকে বৃহত্তর এলাকাভিত্তিক ও বৃহত্তর সংখ্যক ব্যক্তি মানুষের জীবনের সুবিন্যাসমূলক সুশৃঙ্খল সরকারে ক্রমশ উত্তরণ। অগ্রগতির এই পর্বের-এক নির্দিষ্ট স্তরে, যেখানে সম্পদ ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সম্প্রতি দেখা গেছে উল্লেখযোগ্য, কিন্তু আদিমতর যুগের প্রাণশক্তি ও উদ্যম এখনও অন্তর্হিত হয়নি, সেক্ষেত্রে সভ্যতার অগ্রগতির মাপকাঠিতে বড় ধরনের কৃতিত্বের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু যখন নতুন সভ্যতা গতানুগতিকতায় পর্যবসিত হয়, যখন সরকার সব ক্ষমতা হাতের মুঠোয় কেন্দ্রীভূত করার সময় পায়, যখন লোকাচার, ঐতিহ্য এবং আইনের সুবাদে বিধিনিয়ম এমনভাবে প্রচলিত হয়েছে যাতে উদ্যোগ স্তব্ধ হয়ে যায়, তখন সংশ্লিষ্ট সমাজ এক অচল অবস্থায় প্রবেশ করে। মানুষ তাদের পূর্বসূরীর শোষণকে প্রশংসা করে, কিন্তু নিজেদের সেই সমাবস্থায় নিয়ে যেতে পারে না; শিল্পকলা হয়ে পড়ে গতানুগতিক; এবং কর্তৃত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে বিজ্ঞান গতিরুদ্ধ হয়ে যায়

কঠোর রাজ্য-অনুসৃত এই ধরনের অগ্রগতি দেখা যায় চীন ও ভারত, মেসোপটেমিয়া ও ইজিপ্টে, এবং গ্রিক-রোমক পৃথিবীতে। সাধারণত এর অবসান ঘটে বিদেশী অভিযানের সূত্রেঃ পুরনো শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য পুরনো নিয়মনীতি রয়েছে, কিন্তু যখন কোন নতুন ধরনের শত্রুর উদয় হয়, তখন বয়োজ্যেষ্ঠ সমাজের পক্ষে সুরক্ষা প্রদানকারী নতুন নিয়মনীতিতে অভিযোজিত হয়ে উঠতে পারে না। যদি—যা প্রায়শই ঘটে থাকে—বিজিতদের চেয়ে বিজেতারা কম সভ্য হয়, সেক্ষেত্রে সম্ভবত বিশাল সাম্রাজ্যশাসন করা বা বিস্তৃতর অঞ্চল জুড়ে বাণিজ্য ব্যবস্থা সংরক্ষণ করার মতো দক্ষতা তাদের থাকে না। এর অনিবার্য ফল—জনসংখ্যা, সরকারি সংস্থার আয়তন ও সরকারি নিয়ন্ত্রণের কঠোরতার হ্রাস। কালক্রমে, নতুনতর কম-বেশি নৈরাজ্যবাদী অবস্থায় সজীবতা ফিরে আসে, এবং এক নতুন পরিক্রমার সূচনা হয়।

কিন্তু, এ ধরনের পর্যাবৃত্ত অগ্রগতি ছাড়াও আরও একটি আছে। প্রতিটি পর্যায়ের শীর্ষে, কোন পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় কোন রাষ্ট্র-শাসিত অঞ্চলের আয়তন বৃহত্তর হয়ে থাকে, এবং ব্যক্তির ওপর কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণের মাত্রা পূর্ববর্তী যে কোন আমলের চেয়ে অনেক বেশি কঠোরতর হয়ে থাকে। রোমক সাম্রাজ্য ব্যাবিলনীয় ও ইজিপ্টীয় সাম্রাজ্যের চেয়ে বড় ছিল, এবং বর্তমানের সাম্রাজ্য, রোম সাম্রাজ্যের চেয়ে বৃহত্তর। অতীত ইতিহাসে কখনও এমন কোন বড় রাষ্ট্র দেখা যায়নি, যা তার নাগরিকদের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র, অথবা এমনকী পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর মতো সামগ্রিকভাবে শাসন করে চলেছে।

যেহেতু, এই পৃথিবীর রয়েছে সুনির্দিষ্ট আয়তন, নিয়ন্ত্রিত না হলে এই প্রবণতার সূত্র ধরে গড়ে উঠবে এক অখণ্ড বিশ্বরাষ্ট্র। কিন্তু, যেহেতু তখন কোন বহির্শত্রুর অস্তিত্ব থাকবে না, তাই ভীতির মাধ্যমে আসঞ্জন উন্নয়নেরও প্রয়োজনীয়তা থাকবে না, সে কারণে পুরনো মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া আর যথেষ্ট বলে গণ্য হবে না। বিশ্বরাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে কোন দেশপ্রেমের সুযোগ থাকবে না; ঘৃণা ও ভয়ের সক্রিয় উপাদান ব্যতিরেকেই আত্মস্বার্থ ও বদান্যতা থেকে চালিকাশক্তিকে খুঁজে নিতে হবে। এই ধরনের সমাজ কি টিকে থাকতে পারে? যদি টিকে থাকেও, তাহলে তা কি প্রগতির চাকাকে সচল রাখতে সমর্থ হবে? এসব খুবই দুরূহ প্রশ্ন। এর উত্তরের জন্য কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে, যা পরবর্তী বক্তৃতাসমূহে আলোচিত হবে।

আমি অতীত ইতিহাসের এক ধারনের দ্বি-স্তর অগ্রগতির কথা বলেছি। কিন্তু—আমরা আবিষ্কার করতে পারি, এমন ঐতিহাসিক অগ্রগতি সংক্রান্ত নিয়মের নির্দিষ্টতা ও অনিবার্যতাকে আমি বিবেচনা করি না। নতুন জ্ঞান ঘটনাক্রমকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় চালিত করতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকা-আবিষ্কারের ফলাফলের উল্লেখ করা যায়। আগে থেকে অনুমান করা যায় না, এরকম ঘটনার ওপরেও নতুন প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিক্রিয়া ফেলতে পারে : আমি ভাবতে পারি না কিভাবে জুলিয়াস

সিজারের সমকালীন একজন রোমান ক্যাথলিক চার্চের মতো ভীবষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম হয় এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে, কেউ-ই, এমনকী মার্ক্সও সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্ভাবনা দেখতে পাননি. এইসব কারণের জন্য, মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে কোন ভাবিষ্যদ্বাণীকেই বিবেচনাযোগ্য প্রকল্পিত ধারণারূপে বিশ্লেষণ করা উচিত।

আমি মনে করি, যেহেতু সমস্ত সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীই অসংগতিপূর্ণ সেকারণে কিছু অবাঞ্ছিত সম্ভাবনা থেকেই যায়, তাই এই বিষয়টি মনে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। একদিকে, যে কোন সভ্য দেশেই দীর্ঘস্থায়ী ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ শিল্পক্ষেত্রের পতন ডেকে আনতে পারে,যার ফলশ্রুতিতে ক্ষুদ্রশিল্পের নৈরাজ্যবাদী উত্থান ঘটতে পারে–রোমের পতনের পরে পশ্চিম ইউরোপে সেরকমটি ঘটেছিল। এর ফলে ঘটতে পারে ব্যাপক জনসংখ্যা হ্রাসের ঘটনা, এবং অন্তত কিছু দিনের জন্যও, সভ্য জীবনযাপনের বৈশিষ্ট্য রূপে যেসব কার্যাবলিকে আমরা গণ্য করি, তার অধিকাংশই অদৃশ্য হয়ে যাবে। কিন্তু, এরকম আশা করাটাই সম্ভবত যুক্তিযুক্ত–যা ঘটেছিল মধ্যযুগে–পর্যাপ্ত অথচ ন্যূনতম সামাজিক আসঞ্জন-প্রক্রিয়ার যথাসময়ে প্রত্যাবর্তন ঘটবে এবং হারানো জমি ক্রমশ উদ্ধার করা যাবে।

তবে আরও একটি বিপদ রয়েছে, যা সম্ভবত উপলব্ধি করা প্রয়োজন। আধুনিক প্রযুক্তি সরকারি নিয়ন্ত্রণের আরও কাঠোরতা সম্ভব করে তুলেছে এবং চরম শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এই সম্ভাবনার পরিপূর্ণ অপব্যবহার করা হয়েছে। এরকম হতে পারে–যুদ্ধের চাপে অথবা ভয়ে, অথবা কোন চরম শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্র কর্তৃক বিজয়-অভিযানের ফলে, পৃথিবীর যেসব অংশে ব্যক্তিস্বাধীনতার ছিটেফোঁটাও টিকে আছে, সেইসব অঞ্চলের সংখ্যা আরও কমে যেতে পারে, এবং এমনকী এই সব এলাকায় স্বাধীনতা ক্রমশ আরও সংকুচিত হয়ে যেতে পারে। এরকম মনে করার বিশেষ কারণ নেই–এর ফলে ব্যবস্থা অস্থায়ী হবে, কিন্তু তা প্রায় নিশ্চল ও প্রগতিবিমুখ হবেই এবং এর সঙ্গে প্রাচীন অশুভ উপসর্গাদির প্রাদুর্ভাব ঘটবেঃ দাসপ্রথা, গোঁড়ামি, অসহিষ্ণুতা, অধিকাংশ মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের অবস্থা। আমার মতে, এটা এক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা এবং এর বিরুদ্ধে সর্তক থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে, পূর্বের তুলনায় বর্তমান সময়ে ব্যক্তির মূল্যের ওপর গুরুত্বদান অনেক বেশি জরুরি।

আরও একটি ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে, যা পরিহার করা উচিত। যে বিষয়ের স্বপক্ষে আমি ওকালতি করে চলেছি তার ভিত্তিতে আমি মনে করি এটা সত্য যে, মানুষের যা সহজাত, বিগত শত-সহস্র বৎসর ধরে তার বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি, কিন্তু যা সহজাত তা আধুনিক মানুষের মানসিক কাঠামোর এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র। আমি তা বলতে চাইছি–আমি কাউকে এমন সিদ্ধান্তে আসতে বলছি না যে, যুদ্ধহীন পৃথিবীতে আবশ্যিকভাবেই এসে যাবে প্রবৃত্তিজাত হতাশা। ১৮১৪ সাল থেকে সুইডেন কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, যা বলা যায় প্রায় চার প্রজন্মের মোট সময়সীমা। কিন্তু আমি মনে করি না, কেউ বলবে যে, এই অনাক্রম্যতার ফলস্বরূপ সুইডেনের মানুষেরা তাদের

প্রবৃত্তিগত জীবনে খুবই কষ্টভোগ করেছে। মানবজাতি যদি যুদ্ধবিলোপে সফল হয়, তাহলে রোমাঞ্চ সুখ ও ঝুঁকি গ্রহণের আরও নির্গম–পথ খুঁজে বার করা কঠিন হবে না। পুরনো নির্গম-পথগুলো, এক সময় যা জৈব উদ্দেশ্যেই সাধন করতো, সেগুলো আর কার্যকরী নয়, এবং সে কারণে নতুন নির্গম–পথ খুবই জরুরি। কিন্তু মানব-প্রকৃতিতে এমন কিছু নেই যা ধারাবাহিক আঙ্গিকতার স্বপক্ষে মৌনসম্মতিদানে তাকে বাধ্য করতে পারে। শুধুমাত্র প্রত্যাঘাত অথবা ভুল–বোঝাবুঝি হলে আমাদের স্বল্প-সুশৃঙ্খল প্রবৃত্তিগুলো বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। যখন এই ভ্রান্তিকে এড়িয়ে যাওয়া যায়, তখন একটি ভাল সামাজিক ব্যবস্থায় সংযোগ স্থাপনের সমস্যাটির সমাধান হতে পারে বুদ্ধি ও সদিচ্ছার সাহায্যে।

বক্তৃতা : তিন
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভূমিকা

এই বক্তৃতায় আমি, কোন একটি সমাজের সকলের নয়, বরং কিছু সদস্যের মঙ্গলা-মঙ্গলের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রেরণা ও অভিলাষের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করতে চাই। প্রত্যন্ত আদিম সমাজে এসব প্রেরণা ও ইচ্ছাসমূহ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ভূমিকা পালন করে। শিকার ও যুদ্ধবিগ্রহে একজন মানুষ অন্যজনের চেয়ে অধিকতর সফল হতে পারে, কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সকলেরই একটি সাধারণ উদ্দেশ্যে থাকে। যতদিন পর্যন্ত সম্প্রাদায়ভুক্ত সমস্ত মানুষের অনুমোদন ও অংশগ্রহণ সাপেক্ষে একজন মানুষের কর্মধারা স্বতঃস্ফূর্ত থাকে, ততদিন সেই সম্প্রদায়ের অন্য কারও দ্বারা তার কর্মোদ্যোগ কদাচিৎ বাধাপ্রাপ্ত হয়, এবং এমনকী তার সর্বাধিক স্বতঃস্ফূর্ত কার্যবলীও সমাজ-স্বীকৃত আচরণবিধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে থাকে। কিন্তু মানুষ যখন ক্রমশ আরও সভ্য হয়ে উঠতে থাকে, তখন একজন মানুষের কর্মধারার সঙ্গে অন্যজনের কর্মধারার পার্থক্য বাড়তেই থাকে, এবং সমৃদ্ধিকামী কোন সমাজে এমন একগুচ্ছ মানুষের প্রয়োজন রয়েছে, যারা সর্বাংশে সাধারণ ধারার অন্তর্ভুক্ত নয়। বস্তুত, শৈল্পিক, নৈতিক এবং বৌদ্ধিক-সব ধরনের প্রগতিই নির্ভর করেছিল এই বিশেষ ধরনের ব্যক্তি-মানুষের ওপর, যাঁরা বর্বরতা থেকে সভ্যতার যুগে পর্বান্তর-প্রক্রিয়ায় অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। যদি কোন সমাজ অগ্রগতি-অভিলাষী হয়, তার এমন সব ব্যতিক্রমী ব্যক্তির প্রয়োজন, যাঁদের কর্মধারা আবশ্যকীয় হলেও এমন ধারার হওয়া উচিত নয়, যা সাধারণ বলে গণ্য হতে পারে। কোন সুসংগঠিত সমাজব্যবস্থায় সর্বদাই এই ধরনের মানুষের কর্মোদ্যোগকে অযথা বাধা দেওয়ার প্রবণতা থাকে, আবার অন্যদিকে, সমাজ যদি কোন নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ না করে, তাহলে ওই একই ধরনের ব্যক্তি-উদ্যোগ যেমন মূল্যবান আবিষ্কারের উদ্গাতা হতে পারে, তা-ই আবার কোন অপরাধীরও জন্ম দিতে পারে। আমাদের সংশ্লিষ্ট অন্য সব কিছুর মতোই আসল সমস্যা হল ভারসাম্যের সমস্যা। মাত্রাতিরিক্ত কম স্বাধীনতা নিয়ে আসে স্থবিরতা, আর মাত্রাতিরিক্ত বেশি স্বাধীনতা থেকে জন্ম নেয় বিশৃঙ্খলা।

নিজ দলের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে থেকে ও ব্যক্তিবিশেষের নিজেকে স্বতন্ত্র রাখার অনেক পদ্ধতি রয়েছে। সে ব্যতিক্রমীভাবে হতে পারে নৈরাজ্যবাদী অথবা সমাজবিরোধী: সে বিরল শিল্প-প্রতিভার অধিকারী হতে পারে: ধর্ম ও নৈতিকতার

ক্ষেত্রে কালের প্রবাহে আগত নতুন 'জ্ঞান' রূপে স্বীকৃতিযোগ্য বস্তুর অধিকারী হতে পারে সে এবং তার থাকতে পারে অসাধারণ বৌদ্ধিক ক্ষমতা। এটা মনে হতে পারে–মানব-ইতিহাসের একেবারে ঊষালগ্ন থেকে ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রেও নিশ্চিতভাবে ছিল কম-বেশি ভিন্নধর্মিতা। প্রত্নপ্রস্তর যুগীয় মানুষের আঁকা পিরেনিজের গুহাচিত্রের মধ্যে খুবই উঁচু স্তরের শিল্পোৎকর্ষের ছাপ রয়েছে এবং এই ঘটনা থেকে এরকম কেউ ভাবে না যে, সেই যুগের সব মানুষই এ ধরনের প্রশংসনীয় কাজে সমর্থ ছিল বরং মনে হয়, এরকম সম্ভাবনাই অনেক বেশি ছিল যে, যাদের মধ্যে শিল্পপ্রতিভা ছিল তাদের এসব শিল্পবস্তু তৈরি করার জন্য মাঝে মাঝে বাড়িতে থাকার অনুমতি দেওয়া হতো, সেই সময়ে গোষ্ঠীর বাকি সদস্যরা শিকারে ব্যস্ত থাকতো। প্রকৃতি অথবা কল্পিত মহত্ত্বের জন্য, সেই প্রাচীন আমলের একেবারে গোড়ার দিক থেকেই, প্রধান অথবা পুরোহিতকে মনোনীত করা হতো। ভেষজ-সম্পর্কিত মানুষেরা ভোজবাজির মতো ক্রিয়াকলাপ দেখাতে পারতো এবং গোষ্ঠী-প্রধানের মধ্যে গোষ্ঠীসত্তা যেন অনেকাংশে রক্তমাংসের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। সেই প্রাচীনতম যুগ থেকে এই ধরনের ক্রিয়াকলাপের প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে যাওয়ার প্রবণতা ছিল। গোষ্ঠীপাতিত্ব বংশানুক্রমিক হল, ভেষজসংক্রান্ত ব্যক্তিরা স্বতন্ত্র গোষ্ঠীতে পরিণত হলেন এবং স্বীকৃত চারণ কবিরা কবিশ্রেষ্ঠ রূপে পরিচিত হলেন। ব্যতিক্রমী অবদান যাঁদের কাছ থেকে আসতে পারে, সেই রকম ব্যক্তিমানুষের প্রয়োজনের ধরন–ধারণ চিহ্নিত করা সমাজের পক্ষে বরাবরই একটা কঠিন কাজ: দৃষ্টান্তস্বরূপ যা আমার মনে আসছে, তা হল–বন্যতা, গোষ্ঠী থেকে স্বাতন্ত্র্য, সকলের কাছে সর্বদা অপরিহার্য নয়, এমন ধরনের বিরলপ্রবৃত্তির দ্বারা প্রভুত্ব–এসবেরই বিবিধ উপকরণ।

এই বক্তৃতায় আমি অতীতে ও বর্তমানে সমাজের সঙ্গে ব্যতিক্রমী মানুষের সম্পর্ক, এবং তার অ-প্রথাগত মেধার সামাজিকভাবে ফলদায়ী হওয়ার শর্তাবলি সম্পর্কে আলোচনা করতে ইচ্ছুক। প্রথমে আমি শিল্পের প্রেক্ষিতে সমস্যাটিকে নিয়ে বিশ্লেষণ করবো, তারপর ধর্ম ও নৈতিকতায়, এবং অবশেষে বিজ্ঞানে।

অতীতে বিভিন্ন যুগে শিল্পীরা যতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন, আমাদের আমলের শিল্পীদের ভূমিকা তার কাছাকাছি নয়। আমাদের আমলে সভাকবিকে অবজ্ঞার চোখে দেখার প্রবণতা রয়েছে, এবং এরকম ভাবারও প্রবণতা রয়েছে যে, একজন কবির নিঃসঙ্গ থাকা উচিত, কারণ ব্যস্ত বৈষয়িক মানুষেরা কবির কথা শুনতে চায় না। ঐতিহাসিকভাবে কিন্তু ব্যাপারটা ছিল পুরোপুরি অন্যরকম; হোমর, ভার্জিল এবং সেক্সপিয়র সভাকবি ছিলেন, তাঁরা নিজেদের গোষ্ঠীর গৌরবগাথা ও মহান ঐতিহ্যের প্রচার করতেন (সেক্সপিয়র সম্পর্কে আমি অবশ্যই স্বীকার করবো, এই ঘটনা আংশিকভাবে সত্য, কিন্তু তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলোর ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য)। ছন্নছাড়া চারণকবিরা রাজা আর্থারের গরিমাকে সজীব রেখেছিল: এবং ইংরেজ ও ফরাসি কবিরা এই গৌরবগাথাকে আরও মহিমান্বিত করে তুলেছিলেন, রাজা দ্বিতীয়

হেনরি সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যে তাঁদের উৎসাহিত করতেন। পার্থেনন ও মধ্যযুগীয় চার্চের গৌরব জনসাধারণের লক্ষ্যের সঙ্গে অন্বিত ছিল। সঙ্গীত, যদিও তা প্রণয়-কর্মে ভূমিকা পালন করতে পারতো, তা যুদ্ধে সাহস ও উদ্দীপনা সঞ্চারিত করার জন্য প্রাথমিক অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল—এটা এমন একটা উদ্দেশ্যে, যা প্লেটোর মতে আইনবন্দী থাকা উচিত। শিল্পীদের এসব প্রাচীন গৌরবগাথার মধ্যে পার্বত্য সেনাবাহিনীর প্রতি বংশীবাদন ছাড়া বর্তমান পৃথিবীতে অতি সামান্যই অবশিষ্ট রয়েছে। আজও আমরা শিল্পীকে সম্মান করি, তবে তাকে বিচ্ছিন্ন রাখি; আমরা শিল্পকে স্বতন্ত্র কিছু বলে মনে করি, যা সমাজের মানুষদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়। শুধু স্থপতি তাঁর উপযোগিতাপূর্ণ কাজের জন্য শিল্পীর প্রাচীন সম্মানের সামান্য কিছু ধরে রাখতে পেরেছেন।

আমাদের যুগে শিল্পের অবক্ষয়ের একমাত্র কারণ এই নয় যে, শিল্পীর সামাজিক কাজকর্ম প্রাচীন দিনগুলোর মতো আজ আর ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং অন্যতর কারণটি হল—উপভোগ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ রূপে আর তা স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের অনুভূতি নয়। তুলনামূলকভাবে বলা যায়—অমার্জিত জনসাধারণের মধ্যে লোকনৃত্য ও জনপ্রিয় সঙ্গীত ধারার স্ফূরণ আজও অব্যাহত রয়েছে, এবং অনেক মানুষের মধ্যে কবিসুলভ উপাদানের অস্তিত্বও রয়েছে। কিন্তু শিল্পোৎপাদনে মানুষের মতো অগ্রগতি ও সংঘবদ্ধতা ঘটলো, শিশুদের মধ্যে যে ধরনের আনন্দের স্ফূরণ দেখা যায়, তা বয়স্কদের ক্ষেত্রে অবাস্তব হয়ে দাঁড়ালো, কারণ বয়স্কদের সর্বদা পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য চিন্তামগ্ন থাকতে হয় এবং সেই মূহূর্তে অন্য কিছুতে মনোযোগ দেওয়ার সময় তাদের নেই। আমাদের কল্পনাময় মনোজগতের অন্য যে কোন অভ্যাসের চেয়ে 'পরবর্তী কার্যক্রম'-সক্রান্ত চিন্তার এই অভ্যাস যে কোন নান্দনিক উৎকর্ষের ক্ষেত্রে অনেক বেশি বিপজ্জনক, এবং গুরুত্বপূর্ণ অর্থে, শিল্পকে যদি টিকে থাকতে হয়, তাহলে প্রথাগত শিক্ষানুরাগীদের দ্বারা তা সম্ভব নয়, বরং সর্বাত্মক আনন্দ-বেদনার ধারণক্ষমতাকে পুনরধিকার করেই তা সম্ভব, যা বিচক্ষণতা ও দুরদর্শিতার পথ ধরে ইতোমধ্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

মানবজাতির মধ্যে প্রথাগতভাবে শ্রেষ্ঠ মানুষ রূপে যাঁরা স্বীকৃতি লাভ করেছেন, তাঁরা ছিলেন ধর্ম ও নৈতিকতার প্রবর্তক। পরবর্তী যুগ তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেও জীবিত কালে তাঁদের অধিকাংশের সঙ্গেই নিজ নিজ সমাজের ছিল কম-বেশি সংঘাতের সম্পর্ক। মূলত, নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও মানবিক সহানুভূতির সীমানা-সম্প্রসারণ—এই দুটি উপকরণ নিয়ে গঠিত হয়েছে নৈতিক প্রগতি। পূর্ণ ঐতিহাসিক নবযুগারম্ভে গ্রিকদের মধ্যে মানবিক বলিপ্রথার বিলুপ্তি ঘটেছিল। সুখে-দুঃখে নির্বিকার আদর্শবাদীরা শিখিয়েছিলেন, শুধু স্বাধীন গ্রিকদের জন্যই নয়, বরং বর্বর ও দাসদের জন্যেও সহানুভূতি থাকা উচিত, এবং প্রকৃতপক্ষে তা সমগ্র মানবজাতির জন্যই থাকা প্রয়োজন। বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিস্টধর্মও কাছে-দূরে একই ধরনের মতবাদ প্রচার

করেছিল। ধর্ম মূলত ছিল গোষ্ঠীগত আবঞ্জন-প্রক্রিয়ার অংশ, যা সমপরিমাণ [illegible] কঃসহযোগিতার তুলনায় সংঘাতই বাড়িয়ে তুলেছিল, কালক্রমে এই ধর্ম আপাত সর্বজনীন চরিত্র অর্জন করলো এবং এভাবে তা আদিম নৈতিকতা-নির্ধারিত [illegible] সীমানা অতিক্রম করার চেষ্টা করেছিল। এ ঘটনাও আশ্চর্যের নয় যে, তাঁদের নিজেদের আমলেই ধর্মপ্রবর্তকদের অভিশাপ কুড়োতে হয়েছিল, কারণ তাঁরা মানুষের [illegible] আনন্দও প্রতিশোধের বীভৎস পুলক লুণ্ঠন করার চেষ্টা করেছিলেন। আদিম হিংস্রতা [illegible] এতকাল গুণ হিসেবে বিবেচিত হতো, তা এখন থেকে পাপ রূপে অভিহিত হতে লাগলো এবং নীতিবোধও মানবিকতার দৃঢ় আবেগসম্পন্ন মানুষদের শেখানো নৈতিকতার সঙ্গে নিজস্ব গোষ্ঠীবহির্ভূত সহানুভূতিহীন মানুষদের পছন্দসই নীতিবোধের দ্বন্দ্ব।

ধর্ম ও নৈতিকতার প্রবর্তকদের বিশাল প্রভাব ছিল মানুষের জীবনের ওপর, [illegible] স্বীকার করা প্রয়োজন সর্বদা বাঞ্ছিত প্রভাব নয়, বরং সামগ্রিকভাবে ইতিবাচক প্রভাব। এটা সত্য–বর্তমান শতাব্দীতে পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে আমরা দেখেছি নৈতিক মূল্যবোধের ক্ষয়, যে মূল্যবোধগুলোকে আমরা নিরাপদ বলেই মনে করতাম, [illegible] আমরা নৈতিকতার প্রবর্তকদের কাছে ঋণী, যাঁরা সর্বপ্রথম চেষ্টা করেছিলেন নীতিবোধকে নিছক গোষ্ঠীগত বিষয় হিসেবে নয়, বরং একটি সর্বজনীন বিষয়রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন এই সত্যকেও যে, দাসপ্রথা বাতিলের সময় এসেছে, যুদ্ধবন্দীদের প্রতি কর্তব্যবোধ, পতি ও পিতাদের ক্ষমতার সীমিতকরণ এবং বিজেতাদের উপকারের জন্য বিজিত জাতির উপর নিছক নির্যাতন অনুচিত–যত অসম্পূর্ণতাই থাক, এই মতের স্বীকৃতি। স্বীকার করতেই হবে, প্রাচীন হিংস্রতার পুনরাগমনের ফলে এসব নৈতিকলাভ বিপন্ন হয়ে পড়েছে, কিন্তু আমি মনে করি না–যে নৈতিক প্রগতির প্রতিনিধিত্ব তাঁরা করেছেন, মানবজাতির কাছে তা হারিয়ে যাবে।

যেসব ধর্মগুরু ঋষিরা এসব নৈতিক প্রগতির সূচনা করেছিলেন–তাঁদের আমলের অধিকাংশ সময় জুড়ে সম্মানলাভ না করলেও তাঁদের নিজেদের কাজ করতে বাধা দেওয়া হয়নি। বর্তমান সময়ের কোন চরম মতবাদসম্পন্ন রাষ্ট্র খ্রিস্ট বা সক্রেটিসের আমলের চেয়েও খারাপ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। কোন চরমমতবাদী রাষ্ট্রে সরকার যে প্রচারকের মতবাদ পছন্দ করে না, তাঁকে শুধুমাত্র হত্যা করাই হয় না, কারণ মৃত্যুর সামনে যে কোন সাহসী মানুষই নির্বিকার থাকেন–কিন্তু তাঁর মতবাদ প্রকাশের পথে সর্বাত্মকভাবে বাধা সৃষ্টি করা হয়। এ রকম সমাজে নবমতবাদ-প্রবর্তন শুধুমাত্র সরকারের মাধ্যমেই ঘটতে পারে এবং অতীতের মতোই বর্তমান কালের কোন সরকারের তরফে নিজের তাৎক্ষণিক স্বার্থবিরোধী কোনকিছু অনুমোদনের সম্ভাবনা থাকে না। এরকম চরম মতাবলম্বী রাষ্ট্রে বৌদ্ধধর্ম বা খ্রিস্টধর্মের উত্থানের মতো ঘটনা কদাচিৎ সম্ভব, এবং এমনকী সর্বাধিক বীরত্বের সুবাদেও একজন নীতিবাদী সংস্কারক

কোন প্রভাব অর্জন করতে পারেন না। মানুষের ইতিহাসে এটা একটা নতুন ঘটনা, এবং এটা সম্ভব হয়েছে ব্যক্তিমানুষের ওপর বহুগুণবর্ধিত নিয়ন্ত্রণের কারণেই এবং এই নিয়ন্ত্রণ আবার সম্ভবপর হয়েছে ব্যক্তিমানুষের ওপর বহুগুণবর্ধিত নিয়ন্ত্রণের কারণেই এবং এই নিয়ন্ত্রণ আবার সম্ভবপর হয়েছে সরকারের আধুনিক কৌশলের কল্যাণে। এটা গভীর উদ্বেগের বিষয় কিভাবে চরম মতাবলম্বী রাজত্ব যে কোন ধরনের নৈতিক প্রগতির পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

শিল্পে অথবা ধর্মীয় ও নৈতিক সংস্কারবাদে নিবেদিত প্রাণ কোন ব্যক্তি আমাদের নিজেদের যুগে পূর্বতন আমলের মতো ততটা বিরাট অগ্রগতি অথবা সামাজিক প্রভাব কদাচিৎ আশা করতে পারে। অবশ্য, এখনও তাঁর সামনে চারটি পথ খোলা আছে–তিনি লেনিনের মতো একজন বড়োসড়ো রাজনৈতিক নেতা হতে পারেন; তিনি রকফেলারের মতো সুবিশাল শিল্পপতির ক্ষমতা অর্জন করতে পারেন; পরমাণু বিজ্ঞানীরা যেমন করে চলেছেন, তেমনি তিনি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে পৃথিবীকে বদলে ফেলতে পারেন; অথবা সবশেষে এই তিনটি পথের কোনটির উপযোগী দক্ষতা যদি তাঁর না থাকে, অথবা যদি সুযোগ–বঞ্চিত হন, তাহলে অন্যান্য নির্গম-পথের অভাবে তাঁর উদ্যোগে তাঁকে অপরাধজগতে টেনে আনতে পারে। আইনী অর্থে, ইতিহাসের গতিচক্রের উপর অপরাধীদের কদাচিৎ প্রভূত প্রভাব থাকে, এবং সে কারণে অতি মাত্রায় উচ্চাশার মানুষকে তার সামনে উন্মুক্ত অন্য কোন পথকেই বেছে নিতে হবে।

রাষ্ট্রপরিধির মধ্যে, দারুণ উল্লেখযোগ্যভাবে বিজ্ঞান–সংশ্লিষ্ট মানুষদের উত্থান একটি আধুনিক প্রবণতা, অন্যান্য প্রবর্তকদের মতোই বিজ্ঞানীদেরও স্বীকৃতির জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছিল। অনেক বিজ্ঞানীই বিতাড়িত হয়েছিলেন। অনেককেই পুড়িয়ে মারা হয়েছিল; কাউকে কাউকে অন্ধকার কারাকক্ষে বন্দী রাখা হয়েছিল; আর অন্যান্যরা শুধুমাত্র তাঁদের বইগুলোই পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু, কালক্রমে এই উপলব্ধি ঘটলো যে, তাঁরাও রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা যোগান দিতে পারে। ল্যাভোয়েশিয়কে গিলোটিনে ভুলক্রমে হত্যা করার পরে ফরাসি বিপ্লবীরা তাঁর জীবিত সতীর্থদের বিস্ফোরক দ্রব্য উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করেছিল। বর্তমান যুগের যুদ্ধ–বিগ্রহে সমস্ত সভ্য সরকারই বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় নাগরিকের স্বীকৃতি দেন, অবশ্য এই শর্তসাপেক্ষ যে, তাঁদের এমনভাবে বশে রাখা যাবে ও প্রণোদিত করা যাবে যে, তাঁদের পরিষেবা যেন সমগ্র মানবজাতির পরিবর্তে মাত্র একটি সরকারের সম্পূর্ণ পরিষেবায় নিয়োজিত হয়।

ভাল ও মন্দ যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই পূর্বসূরীদের থেকে আমাদের যুগকে পৃথক করেছে বিজ্ঞান। দৈনন্দিন জীবনে আমাদের রয়েছে বৈদ্যুতিক আলো এবং রেডিও ও চলচ্চিত্র। শিল্পক্ষেত্রে আমরা যন্ত্র ও শক্তিকে কাজে লাগিয়েছি, যার জন্য আমরা বিজ্ঞানের কাছে ঋণী, শ্রমের বর্ধিত উৎপাদন শক্তির কল্যাণে, পূর্বে যা সম্ভব ছিল, তার তুলনায় বর্তমানে আমাদের অনেক বেশি উদ্যমকে যুদ্ধ এবং যুদ্ধপ্রস্তুতির কাজে নিয়োগ

করতে সমর্থ এবং পূর্বের তুলনায় বর্তমানে দীর্ঘতর সময় ধরে তারুণ্যকে বিদ্যালয়-বন্দী রাখতেও সমর্থ। বিজ্ঞানের সুবাদে আমরা সংবাদমাধ্যম ও বেতারের মাধ্যমে বস্তুত সকলের কাছেই তথ্য ও ভুলতথ্য সম্প্রচারে সক্ষম হয়েছি। সরকারের অপছন্দের লোকজনের পক্ষে পালিয়ে যাওয়া যথেষ্ট কঠিনতর কাজ হয়ে উঠেছে বিজ্ঞানের প্রভাবেই। আমাদের দৈনন্দিন জীবন ও সামাজিক সংগঠনের সামগ্রিকতার মূলে রয়েছে এই বিজ্ঞান। এই সুবিশাল অগ্রগতির সমগ্র প্রক্রিয়াটিকেই আজকাল মদত দেয় সরকার, কিন্তু প্রাথমিকভাবে এই বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেছিল রাষ্ট্রের সঙ্গে বিরোধিতার ফলশ্রুতিতেই, এবং কোথাও কোথাও, যেমন রাশিয়ায় রাষ্ট্র-পুনঃ অবস্থাতেই প্রত্যাবর্তন করেছে, পুরনো বিরোধিতার চিত্র আবার ফিরে আসতে পারে, যদি না পূর্বতন যুগে স্বৈরাচারীদের কল্পনাবহির্ভূত মাত্রায় রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান রূপ ধারণ করে।

অতীতে বিজ্ঞানের বিরোধিতা কোনভাবেই বিস্ময়ের বিষয় ছিল না। সকলেই যা বিশ্বাস করতো, বিজ্ঞানীরা তার বিরোধী তত্ত্ব-বিষয়াদিকে প্রমাণসিদ্ধ করতেন। পূর্বকল্পিত ধ্যানধারণার ওলটপালট ঘটিয়ে দিতেন তাঁরা এবং সেকারণে তাঁদের অবিশ্বাসী ও ভক্তিহীন বলে মনে করা হতো। অ্যানাক্সাগোরাস শিখিয়েছিলেন যে, সূর্য একটি লোহিত তপ্ত প্রস্তর এবং চাঁদ তৈরি হয়েছে মাটি দিয়ে। এহেন অধার্মিকতার জন্য তাঁকে এথেন্স থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল, কারণ একথা কে না জানে যে, সূর্য একজন দেবতা এবং চাঁদ একজন দেবী? প্রাকৃতিক শক্তির উপর বিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণ-শক্তির সুবাদে বৈজ্ঞানিকদের ধীরে ধীরে সহ্য করে নেওয়া হচ্ছিল, এবং এমনকী এই প্রক্রিয়াও ছিল খুবই মন্থর, কারণ সর্বপ্রথম তাঁদের ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটেছিল ইন্দ্রজালে।

এটা আদৌ বিস্ময়কর হবে না, যদি বর্তমান সময়ে পরমাণু বোমা থেকে উদ্ভূত এবং জীবাণু যুদ্ধের সম্ভাব্য বিপদের প্রতিবাদস্বরূপ একটি শক্তিশালী বিজ্ঞানী-বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু, এসব ভয়াবহতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ যা-ই ভাবুক না কেন, যতদিন পর্যন্ত যুদ্ধের সম্ভাবনা রয়েছে, ততদিন তারা বিজ্ঞানের মানুষদের বিরুদ্ধে যাবে না, কারণ যদি একপক্ষ বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা সুসজ্জিত থাকে আর অন্যপক্ষ যদি বৈজ্ঞানিকহীন হয়, তাহলে বৈজ্ঞানিকপক্ষের জয় প্রায় সুনিশ্চিত।

বিজ্ঞান, যতক্ষণ পর্যন্ত তা জ্ঞান-প্রভাবিত, ততক্ষণ পর্যন্ত তা মূল্যবান, কিন্তু যখনই বিজ্ঞান প্রযুক্তিসম্পন্ন হয়ে ওঠে, তখন তা প্রশংসিত বা নিন্দিত হবে কিনা, তা নির্ভর করে প্রযুক্তিগত ব্যবহারের উপর। নিজস্বতায় বিজ্ঞানের চরিত্র নিরপেক্ষ, ভালও নয়, মন্দও নয়, কিন্তু তার সম্পর্কে কোন চরম অভিমত প্রকাশ হলে, তার উৎস হবে বিজ্ঞানের বাইরে অন্য কোন বিষয়।

আধুনিক জীবনের ওপর গভীর প্রভাব সত্ত্বেও বিজ্ঞানের মানুষেরা কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদদের চেয়ে কম শক্তিশালী। মানুষের ইতিহাসে যে কোন পূর্ববর্তী পর্বের রাজনীতিবিদদের তুলনায় বর্তমান সময়ের রাজনীতিবিদেরা অনেক বেশি প্রভাবশালী। বিজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট মানুষদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ধরনটা আরব্যরজনীর জাদুকরের সঙ্গে তার সহচরের মতো, যে তার হুকুম তামিল করে। জাদু-সহচর অত্যাশ্চর্য সব ভেলকি দেখায় তার সাহায্য ছাড়া জাদুকর কিছুই করতে সক্ষম নয়, কিন্তু এটি তার নিজস্ব পেরণা নয় বরং ওইরকম করতে বলা হয়েছে বলেই সে হুবহু তাই করে। আমাদের সময়কার পরমাণু-বিজ্ঞানীদের অবস্থাটাও ঠিক এইরকম; কোন কোন সরকার তাদের স্বগৃহে অথবা দূরবর্তী সমুদ্রে বন্দী রাখে। তারপর, তাদের বন্দীত্বের ভাগ্য অনুসারে, তাদের কাজকর্ম শুরু হয়-একপক্ষ বা অন্যপক্ষের ক্রীতদাসত্বের বিনিময়ে। রাজনীতিবিদ, যদি সে সফল হয়, তাহলে সে এ ধরনের দমনে লিপ্ত হয় না। আমাদের সময়ে সবচেয়ে চমকপ্রদ অগ্রগতির দৃষ্টান্ত রেখেছেন লেনিন। জার সরকার কর্তৃক তাঁর ভাই নিহত হওয়ার পরে, তিনি বছরের পর বছর কাটিয়েছিলেন দারিদ্র্যে ও নির্বাসনে, এবং তারপর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে তাঁর উত্থান ঘটেছিল পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্রের অধিনায়করূপে এবং এই অধিনায়কত্ব জারক্সেস বা সিজারের মতো ছিল না, যারা শুধুমাত্র বিলাস ও চাটুকারিতার কারবারি ছিলেন, কিন্তু লেনিনের ক্ষেত্রে অন্য কোন ব্যক্তি হয়তো উপভোক্তা ছিল। এটা এমনই একটা ক্ষমতা যার উদ্দেশ্য ছিল নিজস্ব মানসিকতা-প্রসূত এক বিশেষ আঙ্গিকে একটা সুবিশাল দেশের ছাঁচ বদলে দেওয়া-প্রতিটি শ্রমিক, প্রতিটি কৃষক ও প্রত্যেক মধ্যবিত্তের জীবনধারার পরিবর্তন ঘটানো: এক নতুন ধরনের সংগঠনের প্রবর্তন এবং সমগ্র পৃথিবীতে এক নতুন বিন্যাসের প্রতীকস্বরূপ আত্মপরিচয়-ঘোষণা, যা কারও কারও মুখে প্রশংসিত হয়েছিল, আবার অনেকের কাছ থেকে অভিশাপও কুড়িয়েছিল, কিন্তু কেউ উপেক্ষা করতে পারেনি। কোন মাত্রাছাড়া আত্মম্ভরীর স্বপ্নও এরচেয়ে ভয়ঙ্কর হতে পারে না। নেপোলিয়ন দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন-তুমি বন্দুক দিয়ে সবকিছুই করতে পারো, শুধু তার ওপর চেপে বসতে পারোনা; লেনিন এই ব্যতিক্রমকেও অসার প্রতিপন্ন করেছিলেন।

যেসব মহান পুরুষ ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছেন, তাঁরা আংশিকভাবে মানবজাতির উপকার এবং আংশিকভাবে ঠিক এর উল্টো। বিখ্যাত ধর্মীয় ও নীতিবোধের প্রবর্তকদের মতো কেউ কেউ তাঁদের অন্তর্লীন ক্ষমতার সাহায্যে মানুষে মানুষে পারস্পরিক হিংসা কমানো ও সহানুভূতির সীমিতকরণের কাজ করেছেন; বিজ্ঞানসংশ্লিষ্ট মানুষদের মতো অনেকেই আমাদের দিয়েছে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া সম্পর্কিত জ্ঞান ও উপলব্ধি, যা বিভিন্ন অপব্যবহার সত্ত্বেও তার নিজস্ব সত্তায় একটি অত্যুজ্জ্বল জিনিস হিসেবেই বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে। মহান কবি এবং সরকার ও চিত্রকরের মতো অনেকেই এই পৃথিবীকে দিয়েছেন সৌন্দর্য ও অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি, যা উৎসাহহীনতার সময়ে মানবিক নিয়তির প্রতিচ্ছবিকে সহজসাধ্য করে তোলে। কিন্তু, তাদের নিজ নিজ

পথে সমানভাবে সমর্থ, সমানভাবে কার্যকরী অন্যেরা সম্পূর্ণ উল্টোটাই করে চলেছে। আমি ভাবতে পারি না চেঙ্গিজ খানের অস্তিত্বের সূত্রে মানবজাতির কোন্ উপকার হয়েছে! আমি জানি না রোবস্‌পিয়ের আমাদের কী মঙ্গল করেছেন, এবং আমার কোন থেকে লেনিনের কাছে কৃতজ্ঞ থাকারও কোন কারণ খুঁজে পাই না। কিন্তু, ভাল ও মন্দ এসব মানুষের একটা গুণ ছিল, আমি চাই না যে গুণ পৃথিবী থেকে অন্তর্হিত হোক। যাক–উৎসাহ এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ, মনের স্বাধীনতা এবং কল্পনাপ্রবণ দৃষ্টিশক্তি সম্পর্কিত গুণ। এসব গুণের অধিকারী মানুষ খুব ভাল অথবা ক্ষতিকর কাজ করতে সমর্থ এবং মানবজাতি যদি স্থবিরতার মধ্যে নিমজ্জিত হতে না চায়, তাহলে এসব ব্যতিক্রমী মানুষ নিশ্চিতভাবে সুযোগ খুঁজে নেবে, যদি যে কেউ এই আশা করতে পারে যে, যে সুযোগ তাঁরা অনুসন্ধান করবেন, তা যেন মানবজাতির কল্যাণমুখী হয়। মাঝে মাঝে আমরা যা মনে করি, তার তুলনায় অনেক কম পার্থক্য থাকতে পারে একজন জাঁদরেল অপরাধী ও একজন মহান প্রবক্তার মধ্যে। এরকমটাও হতে পারে–যদি কোন জাদুকর জন্মলগ্নেই ক্যাপ্টেন কিড ও মহামতি আলেকজান্ডারকে পারস্পরিক স্থান বদলে দিতেন, তাহলেও এই দুইজনের পারস্পরিক কৃতিত্ব সমানভাবেই পরিলক্ষিত হতো। কয়েকজন শিল্পী সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। বেনভেনুতে সেলিনির স্মৃতিকথা থেকে আমরা এমন একজন মানুষেরও প্রতিচ্ছবি পাই না, যার আইনের প্রতি কোন নিরপেক্ষ শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। আধুনিক পৃথিবীতে, একজন ব্যক্তির পক্ষে গুরুত্ববাহী কীর্তি সম্ভব নয় বা সম্ভবপর হবে না, যদি না তিনি কোন বিশাল সংগঠনের প্রভুত্ব করতে পারেন। যদি তিনি নিজেকে লেনিনের মতো রাষ্ট্রপ্রধান, অথবা রকফেলারের মতো এক বিশাল শিল্পের একচেটিয়া সম্রাট, অথবা জৌষ্ঠতর পিয়েরপন্ট মর্গ্যানের মতো ঋণ–নিয়ন্ত্রকরূপে গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে তিনি পৃথিবীতে প্রভাব রাখতে পারবেন। ঠিক সেভাবেই, যদি তিনি বিজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট মানুষ হন, তাহলে তিনি কোন সরকারকে বিশ্বাস করাতে পারেন যে, তাঁর কাজ যুদ্ধের পক্ষে প্রয়োজনীয় হতে পারে। কিন্তু কোন হিব্রু ধর্মগুরু, একজন কবি, অথবা স্পিনোজার মতো একজন নিঃসঙ্গ দার্শনিক যদি সংগঠনের সাহায্য ব্যতিরেকেই কাজ করেন, তাহলে তিনি খৃষ্টের দিনগুলোতে যে ধরনের গুরুত্ব পেতেন, সেরকম গুরুত্ব আর আশা করতে পারেন না। এই পরিবর্তনের বিষয়টি যেমন বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রে খাটে, তেমনি অন্য ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও খাটে। অতীতের বিজ্ঞানীরা ব্যক্তি হিসেবেই ব্যাপকভাবে তাঁদের কাজ করতেন, কিন্তু আমাদের আমলের বিজ্ঞানীর প্রচুরসংখ্যক ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতি ও অনেক সহকারীসহ এক গবেষণাগারের প্রয়োজন হয়। তিনি এসব সরকারি আনুকূল্যে, অথবা আমেরিকায় ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে করতে পারেন। এভাবে তিনি আর স্বাধীন হয়ে থাকতে পারেন না, বরং অবশিষ্টভাবে কোন বিশাল সংগঠনের অংশের সাথে পরিচিত হন। এই পরিবর্তন খুবই দুর্ভাগ্যজনক, কারণ একজন বিখ্যাত মানুষ তাঁর ক্ষমতার সাহায্যে যা করতে পারেন, তার তুলনায় তিনি একক ও স্বতন্ত্রভাবে যা

পারেন, তা অধিকতর মঙ্গলদায়ী হওয়াটাই স্বাভাবিক। একজন ক্রীতদাস বা একজন স্বৈরাচারীর ভূমিকা ছাড়া, মানবিক বিষয়াদি প্রভাবিত করতে ইচ্ছুক কোন মানুষের সফল হওয়া খুবই দুরূহ একজন রাজনীতিবিদরূপে তিনি নিজেকে একটি রাষ্ট্রের প্রধানরূপে তৈরি করতে পারেন, অথবা একজন বিজ্ঞানীরূপে তিনি সরকারের কাছে তাঁর শ্রম বিক্রয় করতেও পারেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁকে তাঁর নিজের নয়, সরকারের উদ্দেশ্যেই পূরণ করতে হবে।

এবং, শুধুমাত্র বিরল ও ব্যতিক্রমী খ্যাতিসম্পন্ন মানুষদের ক্ষেত্রেই নয়, বরং বিস্তৃততর পরিসরের প্রতিভার ক্ষেত্রেও এটা খাটে। যেসব আমলে বিখ্যাত কবিরা ছিলেন, সেই একই আমলে বহুসংখ্যক ছোটখাটো কবিও ছিলেন এবং যখন খ্যাতিমান চিত্রকররা ছিলেন, তখনও ছোটমাপের শিল্পীরাও ছিলেন। বিখ্যাত সব জার্মান সরকারদের এমন একটা লোকবৃত্তে উত্থান ঘটেছিল, যেখানে সঙ্গীতের মর্যাদা ছিল, এবং যেখানে কমসংখ্যক মানুষ সুযোগ খুঁজে নিতেন। সেই সব দিনগুলোতে কবিতা, চিত্রকলা এবং সঙ্গীত ছিল সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ—এখন যেমন খেলাধুলা। কোন বড় মাপের ধর্মগুরুর উত্থান ঘটতো একদল ছোটখাটো ধর্মগুরুদের মধ্যে থেকে। এসবক্ষেত্রে আমাদের যুগের হীনতাভাব ছিল এই ঘটনার অনিবার্য ফল যে, সমাজ আজ এতটাই কেন্দ্রীভূত ও সংগঠিত যে, ব্যক্তি-উদ্যোগের অবনমন ঘটেছে, একেবারে ন্যূনতম স্তরে। অতীতে যেখানে শিল্পকলা পল্লবিত হয়েছে, তখন তা ছোটখাটো গোষ্ঠীর মধ্যে নিয়মমাফিক ঘটেছে এবং যেসব গোষ্ঠীর মধ্যে ছিল প্রতিবেশীসুলভ প্রতিদ্বন্দ্বিতা—যেমন, গ্রিসের নগররাষ্ট্র, ইতালীয় নবজাগরণের অতিক্ষুদ্র রাজত্ব এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মান শাসকদের ক্ষুদ্র রাজসভা। এসব শাসকদের তরফে একজন সঙ্গীতবিদকে রাখতেই হতো, এবং একবার এইভাবে ছিলেন সেবাস্টিয়ান বাখ, কিন্তু এমনকী তিনি যদি নাও থাকতেন, শ্রেষ্ঠ দক্ষতা প্রদর্শনে তাঁর অবাধ স্বাধীনতা ছিল। এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়, স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কে এমন কিছুও রয়েছে। এমনকী গির্জার প্রাসাদেও এমন ধরনের রেষারেষির অস্তিত্ব ছিল, কারণ প্রত্যেক খ্রিস্ট যাজক চাইতেন, প্রতিবেশী গির্জার চেয়ে একটি সুন্দরতর গির্জার অধিকারী হতে। ব্যাপারটা খুব ভাল হতো, যদি নগরগুলোর মাধ্যমে কোন শিল্পগত গরিমা প্রস্ফুটিত হতো, যার ফলশ্রুতিতে অনিবার্য ছিল পারস্পরিক প্রতিযোগিতা, এবং যদি প্রত্যেকের থাকতো তার নিজের সঙ্গীত ও শিল্পকলার স্কুল, অবশ্যই তার মধ্যে থাকা জরুরি ছিল পরবর্তী নগরের স্কুলের প্রতি তীব্র অবজ্ঞা। তবে, সাম্রাজ্যশাসিত ও অবাধ গতিশীলতার জগতে এই ধরনের স্থানীয় পৃষ্ঠপোষকতার সুবাদে তাৎক্ষণিক সমৃদ্ধি ঘটতো না। একজন কোরিনথিয়ার মানুষের প্রতি একজন এথেনীয়, অথবা একজন ভেনিসবাসীর প্রতি একজন ফ্লোরেন্সের মানুষের যে অনুভূতি রয়েছে, একজন ম্যানচেস্টারবাসীর সেরকম কোন তাৎক্ষণিক অনুভূতি থাকতে পারে না শেফিল্ডের কোন মানুষের প্রতি। কিন্তু, এসব অসুবিধা সত্ত্বেও, আমি মনে করি—স্থানিকতার প্রতি এ

ধরনের গুরুত্বদানের বিষয়টির মোকাবিলা করতে হবে, যদি মানুষের জীবন ... নীরস ও একঘেঁয়ে না হয়ে উঠতে চায়।

একটি ক্ষুদ্রগোষ্ঠীর সদস্যভুক্তি সত্ত্বেও আদিম মানুষ এমন জীবন অতিবাহি... করতো সেখানে গোষ্ঠী কর্তৃক তার উদ্যোগ খুব বেশি বাধাপ্রাপ্ত হতো না। শিকার ... যুদ্ধের মতো প্রায়শই যেসব বিষয়ে সে আত্মনিয়োজিত হয়ে থাকতে চাইত, ... প্রতিবেশীও ওই একই ধরনের কর্মব্যস্ততা চাইত, এবং যদি সে ভেষজ-ব্যক্তিত্বের ... ঝোঁক অনুভব করতো, তাহলে তাকে শুধুমাত্র নিজেকে এমন কোন ... অনুগ্রহভাজন হতে হতো, যিনি ইতোমধ্যেই ওই পেশায় খ্যাতিঅর্জন করেছেন, ... এভাবে যথাসময়ে তাঁর জাদুশক্তির সাহায্যে সাফল্য ঘটতো। যদি তার থাকতো ... জাতের প্রতিভা, তাহলে সে অস্ত্রশৈলীতে কোন উন্নতি অথবা শিকারকর্মে ... দক্ষতা উদ্ভাবনে সক্ষম হতো। এসবের ফলে তাকে গোষ্ঠীর কোন বিরোধিতার ... পড়তে হতো না, বরং তাকে স্বাগতই জানানো হতো। আধুনিক মানুষকে খুবই ... ধরনের জীবনযাপন করতে হয়। যদি সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গান করে, তাহলে ... নেওয়া হবে, সে একজন মাতাল; যদি সে নাচে, তাহলে কোন পুলিশ যান-চলাচলে ... বিঘ্ন ঘটানোর দায়ে তাকে ভর্ৎসনা করবে। যদি না সে ব্যতিক্রমীভাবে ভাগ্যবান হয়, ... তার কাজের দিনগুলো হয় সম্পূর্ণ একঘেঁয়ে, এই একঘেঁয়েমির কারণ হল–সে যে কাজ ... করে থাকে, তা অ্যাকিলিসের ঢালের মতো সুন্দর কর্মসৌষ্ঠবের নির্দশন রূপে মূল্যবান ... নয়, বরং তার উৎপাদিত পণ্যের মূল বৈশিষ্ট্য হল এর উপযোগিতা। যখন, তার কাজ ... শেষ হয়, সে মিল্টনের মেষপালকের মতো 'উপত্যকার কাঁটাগাছের তলদেশে তার ... বলতে পারে না,' কারণ সে যেখানে বসবাস করে, প্রায়শই তার ধারে কাছে ... উপত্যকা থাকে না, আর যদিও বা থাকে, তা শুধু রাংতায় মোড়া এবং আমাদের ... নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনে সে সর্বদা মানসিকভাবে আচ্ছন্ন থাকে আগামী দিনের চিন্তায়। খ্রিস্টের উপদেশাবলির তাবৎ নীতি-নির্দেশের মধ্যে খ্রিস্টানরা সর্বাধিক অবহেলা করেছেন যেটি, তা হল–আগামী দিনের জন্য কোন চিন্তাকে প্রশয় না দেওয়ার বাইবেল-নির্দেশিত বিধান। যদি সে দূরদর্শী হয়ে থাকে, তাহলে আগামী দিনের চিন্তা তাকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করবে; যদি সে অদূরদর্শী হয়, তাহলে সে সহজেই বুঝতে পারবে যে, ঋণপরিশোধে যে সক্ষম নয়। দুটি ক্ষেত্রের প্রত্যেকটিতেই, প্রতিটি মুহূর্ত তার স্বাদ হারায়।

প্রতিটি ঘটনাই সংগঠিত, কোন কিছুই স্বতঃস্ফূর্ত নয়। নাৎসীরা সংগঠিত করেছিল 'আনন্দের মধ্যে দিয়ে শক্তি,' কিন্তু সরকার-নির্ধারিত আনন্দের খুব বেশি আনন্দদায়ক না হওয়ারই সম্ভাবনা। আর, যাদের মধ্যে সারগর্ভ উচ্চাশা রয়েছে, সেখানে কেন্দ্রীভবনের প্রভাব হল–অত্যধিক সংখ্যক প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ... টেনে আনা, এবং অন্যান্য সমরুচির বলয়ে থাকতে বাধ্য করা। আপনি যদি একজন চিত্রশিল্পী হতে ইচ্ছা করেন, তাহলে আপনি কখনই আপনার নিজের শহরের ...

ইচ্ছাসম্পন্ন মানুষদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে পারবেন না। আপনি কোন মহানগরীর কোন চিত্রকলার স্কুলে যাবেন এবং সেখানে আপনি সম্ভবত এই সিদ্ধান্তে পৌছাবেন যে, আপনি খূবই গড়পড়তা ধরনের, এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে আপনি এতটাই নিরুৎসাহিত হয়ে পড়তে পারেন যে আপনি আপনার আঁকার ব্রাশ ইত্যাদি ছুঁড়ে ফেলতে চাইবেন এবং তারপর, আপনি টাকা কামানোর ধান্দায় বা মদ্যপানেও নেমে পড়তে পারেন, কারণ কোন কাজে সাফল্যের জন্য এক নির্দিষ্ট মাত্রার আত্মবিশ্বাস খুবই জরুরি। নবজাগরণের ইতালিতে আপনি সিয়েনার সেরা চিত্রশিল্পী হওয়ার বাসনা লালন করে থাকতে পারেন, এবং এই অবস্থান নিশ্চিতভাবেই যথেষ্ট মর্যাদাপূর্ণ। কিন্তু, এখন আপনি একটি ছোট্ট শহরে সমস্ত প্রশিক্ষণ অর্জন করে আপনার প্রতিবেশীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মধ্যেই সন্তুষ্ট থাকতে পারবেন না। আমরা অনেক বেশি জানি এবং অনেক কম অনুভব করি। অন্ততপক্ষে, আমরা সেসব সৃজনমূলক আবেগকে কদাচিৎ অনুভব করি, যেগুলো থেকে একটা উত্তম জীবন উৎসারিত হয়। যা গুরুত্বপূর্ণ, সে সম্পর্কে আমরা নিষ্ক্রিয়; যেখানে আমরা সক্রিয়, সেই ক্ষেত্রটি হল–তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়াদি শুধুমাত্র বিপর্যয়ের সূত্রে প্রাপ্ত একঘেঁয়েমি থেকে যদি জীবনকে বাঁচাতে হয়, তাহলে ব্যক্তি-উদ্যোগের পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমেই উপায় খুঁজে বের করতে হবে, কেবলমাত্র তুচ্ছ বিষয়–ঘটনার মধ্য দিয়ে নয়, বরং কার্যকারিতাসম্পন্ন জিনিসের মধ্য দিয়েও তা করতে হবে। বিশাল জনসংখ্যার বাস্তব অস্তিত্ব যার ওপর নির্ভর করছে, সেরকম আধুনিক সংগঠনের সংশ্লিষ্ট প্রত্যঙ্গগুলোকে ধ্বংস করা উচিত–আমি তা মনে করি না। কিন্তু আমি বলতে চাই আমাদের চিন্তা ও অনুভূতির তাল রাখতে অক্ষম, এরকম অসহনীয় দ্রুত বৃদ্ধি ও কেন্দ্রীভবনের তুলনায় ওই ধরনের সংগঠনের আরও নমনীয় হওয়া প্রয়োজন, তার নৈর্ব্যক্তিক বিশালতার মাধ্যমে মানবিক উদ্দীপনার প্রতি কম নিপীড়ক হওয়াও একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়।

বক্তৃতা : চার
কৌশল ও মানবিক প্রকৃতির সংঘাত

নানা দিক দিয়েই মানুষ অন্যান্য প্রাণীর থেকে পৃথক। এর মধ্যে একটি হল–নিজস্ব সত্তায় বিরস এরকম কাজকর্মে সে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে রাজি থাকে, কারণ এগুলো হল তার অভীপ্সা পরিপূরণের মাধ্যমে। জীববিদের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়–প্রাণীরা সেই সব কাজ করে, যেখানে তাদের উদ্দেশ্যপূরণের জন্য শ্রমের প্রাসঙ্গিকতা থাকে: পাখিরা বাসা বানায়, এবং ধীবর বাঁধ তৈরি করে। কিন্তু, তারা এসব কাজ করে প্রবৃত্তি থেকে, কারণ এগুলো করার জন্য তাদের মধ্যে এক ধরনের আবেগ কাজ করে, এবং এটা কারণ নয় যে, তারা উপলব্ধির মাধ্যমে জানতে পারে, এগুলো দরকারি। তারা ইচ্ছামাফিক আত্ম-নিয়ন্ত্রণ, অথবা বিচক্ষণতা অথবা দূরদর্শিতা অথবা আবেগ–নিয়ন্ত্রণের অনুশীলন করে না। মনুষ্যজীবেরা এসব অনুশীলন করে। মানুষ যতটা সহ্য করতে পারে, তার চেয়েও বেশি মাত্রায় যখন তারা এসব করে, তখন তারা একটা মনস্তাত্ত্বিক শাস্তির শিকার হয়। সুসভ্য ধারায় জীবনযাপনে এই শাস্তির অংশবিশেষ অপরিহার্য, কিন্তু এর বেশিটাই অপ্রয়োজনীয়, এবং ভিন্ন জাতের সামাজিক সংগঠনের সাহায্যে তার অপসারণ সম্ভব।

মাধ্যম ও প্রেরণার এই সংঘাতের কদাচিৎ অভিজ্ঞতা ছিল আদিম মানুষের। শিকার, সংগ্রাম এবং বংশবিস্তারের প্রয়োজন ছিল অস্তিত্বরক্ষা ও বিবর্তনমূলক প্রগতির জন্য, কিন্তু এসব কাজে নিয়োজিত থাকার কারণ এটা নয় ঃ সে এসবের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখতো কারণ এসব তাকে আনন্দ দিত। শিকার যথাসময়ে অলস ধনী মানুষের বিনোদনে হয়ে দাঁড়ালো। এটা তার জৈব উপযোগিতা হারিয়েছিল, কিন্তু উপভোগ্যতার বিষয়রূপে টিকে রইলো। আবেগ দ্বারা অনুপ্রাণিত সরল আঙ্গিকের যুদ্ধ এখন থেকে শুধুমাত্র স্কুলের ছেলেদের জন্য অনুমোদিত হল, কিন্তু সংগ্রামী মানসিকতা টিকে রইলো, এবং আরও ভাল নির্গমপথ নিষিদ্ধ হলে, যুদ্ধের মধ্যে দিয়েই তার অতি গুরুত্বপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটতো।

অবশ্য পুরনো যুগের মানুষ সম্পূর্ণত সেসব কাজকর্ম ছাড়া থাকত না, যেসব কাজকর্ম স্বাভাবিক আর্কষণের তুলনায় সে মনে করতো প্রকৃতই প্রয়োজনীয়। মানুষের বিবর্তনের একেবারে গোড়ার দিকে, পাথরের জিনিস তৈরির জাক শুরু হয়েছিল, এভাবে সূচিত হয়েছিল দীর্ঘ অগ্রগতি, যা আমাদের বর্তমান বিস্তৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু, প্রাচীন প্রস্তরযুগে, সম্ভবত শৈল্পিক সৃজনের আনন্দ এবং লক্ষ্যপূরণের যাত্রাপথ খুব দীর্ঘ নয়, তখন মাধ্যমগুলো নিজেরাই খুব উপভোগ্য হয়ে থাকে যদি গন্তব্যে পৌছানোর বিষয়টি খুব উৎসাহজনক হয়। অবরোহণকালীন মাত্র কয়েক মুহূর্তের স্বর্গসুখের জন্য কোন বালক একটি স্লেজগাড়িসহ পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার পরিশ্রম মেনে নেবে। পরিশ্রমী হওয়ার জন্য তাকে চাপ দেওয়ার প্রয়োজন নেই, এবং যতই সে হাঁফিয়ে যাক বা দম ফুরিয়ে যাক, তবুও সে সুখী। কিন্তু, তাৎক্ষণিক পুরস্কারের পরিবর্তে, যদি সত্তর বছর বয়সে তাকে একটা বার্ধক্য পেনশনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তাহলে তার সব উৎসাহই খুব তাড়াতাড়ি নিস্তেজ হয়ে যাবে।

স্লেজগাড়ির ওই বালকটির প্রচেষ্টার তুলনায় অনেক দীর্ঘতর উদ্যোগকে এক ধরনের সৃজনমূলক আবেগ দিয়ে অনুপ্রাণিত করা যায় এবং তখনও তা স্বতঃস্ফূর্ত থাকতে পারে। একজন মানুষ এভারেস্ট আরোহণ অথবা দক্ষিণ মেরু পৌছানো অথবা কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় দুঃখকষ্ট, বিপদ এবং দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে বেশ কয়েক বছর কাটাতে পারে, এবং একই সঙ্গে, ওই স্লেজগাড়ির বালকটির মতো নিজের আবেগের সঙ্গে নিজেকে সুবিন্যস্ত রাখতে পারে, যদি তার লক্ষ্যপূরণের ইচ্ছাটা থাকে তীব্র এবং বাধাবিঘ্ন অতিক্রমের সঙ্গে তার গর্বকে যদি সমাপতিত করতে পারে। রেড ইন্ডিয়ানরা যেমন বলেছিল, 'এর মধ্যে রয়েছে গৌরব।'

দাসপ্রথার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছিল কাজের উদ্দেশ্য ও কর্মীর উদ্দেশ্যসমূহের বিচ্ছিন্নতা-প্রক্রিয়া। ফারাওদের গৌরব বৃদ্ধির জন্য পিরামিড নির্মিত হয়েছিল; যেসব ক্রীতদাস এই কাজ সম্পন্ন করেছিল, ওই গৌরবে তাদের কোন অংশ ছিল না, তারা শুধুমাত্র তত্ত্বাবধায়কের কশাঘাতের ভয়ে কাজ করতো। কৃষিতেও, যখন তা ক্রীতদাস বা ভূমিদাসদের মাধ্যমে পরিচালিত হতো, একই ভাবে–যারা সেখানে কাজ করতো, তাদের কাছে কোন সন্তুষ্টি নিয়ে আসতো না; তাদের সন্তুষ্টির বিষয় ছিল একটাই–বেঁচে থাকা ও (ভাগ্য ভাল হলে) দৈহিক নির্যাতন থেকে মুক্ত থাকা।

বর্তমান সময়ে–শিল্পবিপ্লবের আগে–ভূমিদাসত্বপ্রথার ক্রমাবলুপ্তি ও হস্তশিল্পের সমৃদ্ধির ফলে কাজের লোকের সংখ্যা বাড়লো, যারা নিজেরাই নিজেদের প্রভু ছিল, এবং সেকারণে তাদের উৎপাদিত পণ্যের মধ্য থেকে তারা সামান্য গৌরবও উপভোগ করতে পারতো। এই ধরনের অবস্থা থেকেই উত্থান ঘটলো জেফারসন ও ফরাসি বিপ্লব–অনুপ্রাণিত গণতন্ত্রের, যে গণতন্ত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্তি ঘটেছিল এক বিশাল সংখ্যক কম-বেশি স্বাধীন উৎপাদকের এবং এই অবস্থাটির বিকাশ ঘটেছিল আধুনিক কলাকৌশল-সৃষ্ট বিশালায়তন অর্থনৈতিক সংগঠনের বিপরীত প্রক্রিয়ায়।

ধরা যাক–এমন একটি সুবৃহৎ কারখানা, যেখানে মোটরগাড়ি তৈরি হয়। সংস্থাটির উদ্দেশ্যে হল মোটরগাড়ি তৈরি করা, কিন্তু কর্মীদের উদ্দেশ্যে হল–বেতন উপার্জন করা। বিষয়গত ভাবে, এখানে কোন সাধারণ উদ্দেশ্য নেই। শুধুমাত্র মালিক ও পরিচালকের মধ্যে উদ্দেশ্যের ঐক্য রয়েছে, এবং যারা কাজ করে, তাদের মধ্যে এই

ঐক্য সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকতে পারে। কেউ কেউ হয়তো উৎপাদিত গাড়ির গুণ-মান সম্পর্কে গর্ববোধ করতে পারে, কিন্তু, অধিকাংশেরাই, তাদের ইউনিয়নের মারফৎ, মূলত বেতন ও কাজের ঘন্টা সম্পর্কেই আগ্রহী থাকে।

অন্তত, কিছুদূর পর্যন্ত, এই ক্ষতিকর উপসর্গকে বৃহৎ আয়তনবিশিষ্ট যান্ত্রিকীকরণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। প্রথমোক্ত কারণে কোন মানুষই একটি গাড়ির কোন বৃহৎ অংশ তৈরি করে না, শুধুমাত্র কোন একটি অংশের একটি ক্ষুদ্রাংশই তৈরি করে; কাজের একটা বড় অংশের জন্য অতিসামান্য মাত্রার দক্ষতার প্রয়োজন হয়, এবং পুরো কাজটাই একঘেঁয়ে। দ্বিতীয়োক্ত কারণে (সংস্থার আয়তনের বিশালতা) যৌথভাবে যে দলটি একটি গাড়ি তৈরি করে, তাদের মধ্যে, কর্তৃপক্ষ বনাম কর্মীবাহিনী–সুলভ কোন ঐক্য এবং সংহতির মনোভাব থাকে না। বেতনভুক কর্মীদের মধ্যে সংহতি থাকে, কর্তৃপক্ষ-পরিচালক তরফেও সংহতি থাকতে পারে। কিন্তু, বেতনভুকদের সংহতির সঙ্গে উৎপন্ন পণ্যের কোন সম্পর্ক নেই; এই সংহতি বেতনবৃদ্ধি ও কাজের ঘন্টা হ্রাসের সঙ্গেই সম্পর্কিত। উৎপাদিত পণ্য সম্পর্কে পরিচালন–কর্তৃপক্ষের এক ধরনের গৌরববোধ থাকতে পারে, কিন্তু যখন কোন শিল্পের আগাপাশতলা বাণিজ্যিকীকরণ ঘটে, তখন শুধুমাত্র মুনাফা সম্পর্কে ভাবনার প্রবণতা গড়ে ওঠে, উন্নত কর্মসম্পর্কের পরিবর্তে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যা সহজেই অর্জিত হতে পারে।

কর্মগঠনপ্রণালীর হ্রাসপ্রাপ্ত গৌরবের পিছনে দুটি বিষয় রয়েছে। প্রথম বিষয়টি হল–মুদ্রাব্যবস্থার আবিষ্কার; দ্বিতীয়টি–গণ-উৎপাদন। মুদ্রাব্যবস্থার ফলে দামের মাধ্যমে কোন বস্তুর মূল্যায়ন প্রচলিত হল, যা ঠিকসহজাত নয়, বরং যা অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে অংশীভূত এক ধরনের আবেশন। বিনিময়ের জন্য তৈরি হয়নি, এমন জিনিসের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যেই মূল্যায়ন হতে পারে–তাদের ক্রয়ক্ষমতার জন্য নয়। গ্রামাঞ্চলে আবাসন বাগিচাগুলো প্রায়শই খুব সুন্দর হয়ে থাকে, এবং হয়তো তা অনেক শ্রমের বিনিময়েই গড়ে উঠেছে, কিন্তু তা কোন আর্থিক পুরস্কার এনে দেওয়ার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়নি। কৃষকদের পোশাক-আশাক, যা এখন পর্যটকদের চিত্তবিনোদন ছাড়া দেখা যায় না, তৈরি করতো ওই পোশাক-ব্যবহারকারীদের পরিবারগুলো, যার কোন দাম ছিল না। গ্রিসের নগরদুর্গের মন্দির এবং মধ্যযুগের চার্চগুলো কোন আর্থিক উদ্দেশ্যে নিয়ে নির্মিত হয়নি, এবং সেগুলো বিনিময়ের উপযোগীও ছিল না। খুবই ধীরলয়ে, উৎপাদকের নিজস্ব ব্যবহারের উৎপাদনভিত্তিক অর্থনীতিকে সরিয়ে এল আর্থিক মুদ্রা–ভিত্তিক অর্থনীতি, এবং এই পরিবর্তনের সুবাদে পণ্যসম্ভার আনন্দদায়ক হওয়ার পরিবর্তে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

গণ-উৎপাদন এই প্রক্রিয়াকে এক নতুন দৈর্ঘ্যে প্রসারিত করেছে। ধরা যাক–আপনি একজন বোতাম-উৎপাদক ঃ আপনার তৈরি বোতাম যত সুন্দরই হোক না কেন, আপনার নিজের ব্যবহারের জন্য সামান্য কয়েকটি বোতামের বেশি আপনার প্রয়োজন নেই। অবশিষ্ট বোতামের বিনিময়ে আপনি খাদ্য ও আশ্রয়, একটি মোটরগাড়ি

এবং আপনার ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ, এ রকম আরও অনেক কিছু পেতে ইচ্ছুক। এসব বিভিন্ন জিনিসের সঙ্গে বোতামের অর্থমূল্য ছাড়া অন্য কোন সম্পর্ক নেই এবং এমনকী বোতামের অর্থমূল্যের বিষয়টিও আপনার কাছে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়; যেটা গুরুত্বপূর্ণ, তা হল মুনাফা, অর্থাৎ উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে তার বিক্রয়মূল্যের উদ্বৃত্ত, যা বৃদ্ধি করা সম্ভব উৎপাদিত পণ্যের স্বাভাবিক উৎকর্ষের অবনমন ঘটিয়ে। বস্তুত, সাধারণত স্বাভাবিক উৎকর্ষের অবক্ষয় ঘটে, যখন গণ-উৎপাদনের অধিকতর আদিম প্রক্রিয়ার জন্য বিকল্পের মাধ্যমে অপসারণ ঘটানো হয়।

ইতিপূর্বেই উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও, আধুনিক উৎপাদন-সংস্থায় পণ্য-উৎপাদকের স্বার্থ-হ্রাস সংক্রান্ত দু-ধরনের প্রক্রিয়া ঘটে থাকে। একটি হল-উৎপাদনকর্মটি থেকে মুনাফা-প্রাপ্তির সম্ভাবনার দূরত্ব; অন্যটি হল-পরিচালন-কর্তৃপক্ষ ও কর্মীর পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা।

মুনাফা-দূরত্ব ব্যাপারটা এইরকম ঃ ধরা যাক-রপ্তানির জন্য কোন পণ্য-উৎপাদনের কোন একটি গৌণ স্তরে আপনি নিযুক্ত রয়েছেন এই মহূর্তে- আবার ধরা যাক, সেই পণ্যটি হল মোটরগাড়ি। বেশ জোর দিয়ে আপনাকে বলা হল- রপ্তানিবৃদ্ধির অভিযান খুবই জরুরি, যাতে আমরা খাদ্য কিনতে সক্ষম হই। আপনার শ্রমের বিনিময়ে যে বাড়তি খাদ্য কেনা হল, তা আপনার কাছে ব্যক্তিগতভাবে পৌছায় না, কিন্তু তা ব্রিটেনে বসবাস করে এরকম চল্লিশ মিলিয়ন মানুষের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হল। আপনি যদি একদিন কাজে অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে জাতীয় অর্থনীতির দৃশ্যত কোন ক্ষতি হয় না। শুধুমাত্র বৌদ্ধিক প্রচেষ্টার দ্বারাই আপনি নিজেকে অবহিত করতে পারেন-কাজ না করার জন্য কী ক্ষতি হয়েছে, এবং একমাত্র নৈতিক প্রচেষ্টা দ্বারাই নিজেকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন আপনার চাকরির স্বার্থেই পূর্বের তুলনায় বেশি কাজ করার জন্য। গোটা ব্যাপারটাই পুরোপুরি অন্যরকম, যখন প্রয়োজনের ধরন খুবই স্পষ্ট ও জোরালো, উদাহরণস্বরূপ-জাহাজ ধ্বংসের ঘটনা। পোতধ্বংসের সময়ে নাবিকদল নিজেদের যুক্তি-ভাবনার প্রয়োজনীয়তা ব্যতিরেকেই আদেশ পালন করেন, কারণ তাদের এমন একটি সাধারণ উদ্দেশ্য রয়েছে, যা খুব দূরবর্তী নয়, এবং তা চরিতার্থ করার উপায়গুলো বোঝাও দুরূহ নয়। কিন্তু, যদি ক্যাপ্টেন সরকারের মতো, তাঁর আদেশের সারবত্তা বোঝানোর জন্য মুদ্রাব্যবস্থার নিয়মনীতি ব্যাখ্যা করতে বাধিত বোধ করেন, তাহলে তাঁর বক্তৃতা শেষ হওয়ার আগেই জাহাজ ডুববে।

পরিচালন-কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার দুটি দিক রয়েছে, যার একটি হল-মূলধন ও শ্রমের পরিচিত সংঘাত, যেখানে অন্যটি সমস্ত বৃহৎ সংগঠনের পক্ষে যন্ত্রণাদায়ী অধিকতর সাধারণ অসুবিধা। আমি শ্রম ও মূলধনের সংঘাত সম্পর্কে কিছুই বলতে চাই না, কিন্তু, কি রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক সংস্থার ক্ষেত্রে, কি ধনতন্ত্র অথবা সমাজতন্ত্রের অধীনে, সরকারের দূরবর্তিতা কমবেশি সেই একই গতানুগতিক বিষয়, যা সম্যকভাবে পর্যালোচনার দাবি রাখে।

সমাজ যতই সংগঠিত হোক না কেন, সেখানে অনিবার্যভাবেই থাকবে সাধারণ স্বার্থ ও এই-ওই বিভাগীয় স্বার্থ সংঘাতের প্রশস্ত এলাকা। কয়লার দামবৃদ্ধি কয়লাশিল্পের পক্ষে সুবিধাজনক হতে পারে এবং কয়লাখনির শ্রমিকদের বেতনবৃদ্ধিতেও সহায়তা করতে পারে, কিন্তু এছাড়া অন্যসকলের কাছেই কিন্তু এই দামবৃদ্ধি অসুবিধাজনক। যখন সরকার দাম ও বেতন বেঁধে দেন, তখন প্রতিটি সিদ্ধান্তই কিছু মানুষকে অসন্তুষ্ট করবেই। সরকারের সঙ্গে পরিমাপযোগ্য বিষয়গুলো এতটাই সাধারণ ধরনের, এবং শ্রমিকদের প্রাত্যহিক জীবন থেকে তার অপসারণ এতটাই আপাতধর্মী যে, দৃঢ়প্রত্যয়োৎপাদক রূপে তাদের আবির্ভাব খুবই কঠিন। বিস্তৃত অসুবিধার চেয়ে নিবিড় সুবিধা সর্বদাই প্রশংসিত হয়ে থাকে। এই ধরনের কারণের জন্য সরকারের পক্ষে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করা খুবই কঠিন, এবং, যখন তারা এরকম করে, তখন তারা জনসাধারণের অপ্রিয় হয়ে উঠতে বাধ্য, সাধারণ জনস্বার্থে প্রকৃতই আত্মনিয়োজিত কোন সরকার এই ঝুঁকি বহন করে যে, সমাজের প্রতিটি অংশ মনে করে সরকার স্বেচ্ছাচারীভাবে তাদের স্বার্থকে উপেক্ষা করছে। এটা একটা অসুবিধা, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারি নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে অসুবিধারও মাত্রাবৃদ্ধির প্রবণতা থাকে।

তাছাড়া, এটাও অযথা আশা করা ঠিক নয় যে, সমস্ত সরকার, এমনকী তা গণতান্ত্রিক হলেও, সর্বদাই যা করবে, তা সবই জনসাধারণের স্বার্থে। আমি আগেই আমলাতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত কিছু খারাপ দিক সম্পর্কে বলেছি; জনসাধারণের সঙ্গে আধিকারিকদের সম্পর্কের বিষয়ে এবার আমি কিছু আলোচনা করতে ইচ্ছুক। কোন সুসংগঠিত সমাজে যাঁরা সরকারি কাজকর্ম পরিচালনা করেন মন্ত্রী থেকে শুরু করে স্থানীয় অফিসের একেবারে নিম্নপদস্থ কর্মচারী, সকলেরই রয়েছে তাঁদের নিজেদের স্বার্থ, যা কোনভাবেই সমাজের স্বার্থের সঙ্গে সমাপতিত হয় না। এগুলোর মধ্যে, ক্ষমতার প্রতি লোভ ও কাজে অনীহা–এদুটিই হল প্রধান। যে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী কোন প্রকল্পকে 'না' বলেছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর কর্তৃত্ব প্রয়োগ ও অনীহা প্রদর্শনের মাধ্যমে নিজস্ব সন্তুষ্টি চরিতার্থ করে থাকেন এবং এভাবে তখন তাঁকে দেখে মনে হয়, এবং আংশিকভাবে যা সত্য, তা হল– তিনি যেন তাদেরই শত্রু হয়ে উঠেছেন, যাদের সেবা করার কথা তাঁর।

দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যাক–খাদ্যভাব মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসংক্রান্ত বিষয়। যদি কোন আবন্টন আপনার অনুকূলে মঞ্জুর হয়ে থাকে, তাহলে খাদ্য সংগ্রহের জন্য অসুবিধা আপনাকে কঠোর পরিশ্রমের দিকে চালিত করতে পারে, যদি আপনার রেশনকে ভর্তুকি দেওয়ার জন্য আপনার উৎপন্ন ফসল ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষকেই তাদের সব খাদ্যদ্রব্য কিনতে হয় যদি না তারা কৃষিতে নিয়োজিত থাকে। সরকারি হস্তক্ষেপমুক্ত অবাধ ব্যবস্থায় দাম বাড়বেই এবং ধনীরা ছাড়া সকলেই গুরুতরভাবে অপুষ্টির শিকার হয়ে দাঁড়াবে। যাদের

এই ঘটনা সত্য, আমাদের মধ্যে খুবই অল্পসংখ্যক মানুষ খাদ্য অফিসের মহিলাদের পরিষেবার জন্য কৃতজ্ঞ বোধ করেন, এবং তাই তাঁদের মধ্যে আরও অল্পসংখ্যক হতাশা ও উদ্বেগের মধ্য দিয়ে, পুরোপুরি জনদরদি ভূমিকাকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়ে থাকে। যতই অন্যায় ধারণা হোক না কেন, ওই মহিলাদের সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণা হল–ওরা নির্বোধ, স্বেচ্ছাচারী; আর, ওই মহিলাদের কাছে জনসাধারণ হল–বিরক্তিকর, ব্যস্তবাগীশ ও মূর্খ, যারা সবসময়েই এটা-সেটা হারিয়ে ফেলে ও তাদের ঠিকানা বদলায়। এরকম একটা অবস্থায়, এটা দেখা সহজ নয়, কিভাবে সরকার ও শাসিতদের মধ্যে প্রকৃত সমন্বয় গড়ে ওঠা সম্ভব।

ব্যক্তিগত অনুভূতি ও সমষ্টিগত অনুভূতির আংশিক সমন্বয় গড়ে ওঠার যেসব পদ্ধতি এতদিন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, সে সম্পর্কে বহুবিধ আপত্তির অবকাশ রয়েছে।

সবচেয়ে সহজ ও সুস্পষ্ট সমন্বয়সাধক হল যুদ্ধ। কোন কঠিন যুদ্ধের, যখন জাতীয় আত্মমর্যাদা বিপন্ন হয়ে ওঠে, তখন সকলকেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে কাজে উদ্বুদ্ধ করা সহজ, এবং জনসাধারণ যদি সরকারকে যোগ্য বলে মনে করে, তাহলে তার আদেশ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপালিত হয়। এই অবস্থাটা সেই পোত ধ্বংসের মতোই। কিন্তু, নৌ-শৃঙ্খলা উন্নয়নের জন্য কেউ-ই জাহাজ ধ্বংসের মতো উপায়ের অনুকূলে ওকালতি করবে না, এবং আমরা এই যুক্তিতেও যুদ্ধের স্বপক্ষে ওকালতি করতে পারব না যে, যুদ্ধের ফলে জাতীয় ঐক্য অর্জিত হয়। সন্দেহ নেই–যুদ্ধের ভয়ে ওই ধরনের ফলদায়ী ঘটনা ঘটানো সম্ভব কিছু যুদ্ধভীতি যদি দীর্ঘকাল ধরে অব্যাহত থাকে, তার ফলশ্রুতিতে আসল যুদ্ধও ঘটে যেতে পারে, একদিকে যেমন তা জাতীয় ঐক্যের অগ্রগতি ঘটাবে, অন্যদিকে তা দৌর্বল্য ও হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মনোভাবের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

প্রতিযোগিতা, যেখানে তার অস্তিত্ব রয়েছে, তা এক দারুণ শক্তিশালী উদ্দীপক বিষয়। সাধারণভাবে, এটা সমাজতান্ত্রিকদের দ্বারা নিন্দিত হয়ে থাকে পুঁজিবাদী সমাজের অন্যতম মন্দ দিক হিসেবে, কিন্তু সোভিয়েত সরকার শিল্পসংগঠনের খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এই প্রতিযোগিতার প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছেন। এরকমই একটা দৃষ্টান্ত হল–স্টাকানভীয় পদ্ধতি, যেখানে ব্যতিক্রমী দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য নির্দিষ্ট কিছু শ্রমিককে পুরস্কৃত করা হয়, যখন অন্যদের খামতির জন্য শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে এবং এটা হল সময় আনুপাতিক পারিশ্রমিক প্রথার পুনরুজ্জীবন যার বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়নগুলো তীব্রভাবে ও সাফল্যের সঙ্গে প্রচার করেছে। আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ যে, রাশিয়ায় এই ব্যবস্থার উৎকর্ষ পুঁজিবাদীরা দাবি করতো, এবং সেগুলোই খারাপ দিক বলে ট্রেড ইউনিয়নগুলো প্রচার করতো। মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার সমাধান হিসাবে এগুলো নিশ্চিতভাবেই নিতান্ত অযোগ্য।

যদিও বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রতিযোগিতার বিষয়টি গভীরভাবে আপত্তিকর, কিন্তু, আমি মনে করি–প্রয়োজনীয় উদ্যোগের বিকাশে এবং কোন ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে নির্দোষ

প্রবৃত্তিজাত নির্গমের ব্যবস্থাপক, অন্যথায় যা যুদ্ধের কারণও হয়ে উঠতে পারতো—এসব ক্ষেত্রে এই প্রতিযোগিতা একটা প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে পারে। ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার অবলুপ্তির স্বপক্ষে কেউ ওকালতি করবে না। চিরকালের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ফুটবল দল যদি, হঠাৎ ভ্রাতৃত্বের ভালবাসায় প্রভাবিত হয়ে সহযোগিতামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, তারা প্রথমে একদিকের গোলপোস্টের বাইরে বল মারবে, তারপর বিপরীত দিকের পোস্টের বাইরে, তাহলে কারও সুখ বাড়বে না। এরকমও কোন কারণ নেই যে, প্রতিযোগিতাসূত্রে প্রাপ্ত উৎসাহ শুধুমাত্র অ্যাথলেটিকসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। বিভিন্ন দল অথবা লোকালয় অথবা সংগঠনের মধ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা একটা দরকারি উদ্দীপনা হতে পারে। কিন্তু, প্রতিযোগিতা যদি নির্মম ও ক্ষতিকর না হয়ে উঠতে চায়, তাহলে ব্যর্থতার শাস্তি যেন যুদ্ধ বা অনাহারের মতো অনিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতাজনিত বিপর্যয় না ডেকে এনে শুধুমাত্র গৌরবহানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ফুটবল নিশ্চিতভাবে একটা কাঙ্ক্ষিত খেলা হিসাবে গণ্য হবে না, যদি পরাজিত দলকে হত্যাদেশ বা অনাহারের আদেশ দেওয়া হয়।

ব্রিটেনে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, কর্তব্যবোধের প্রতি আবেদনের জন্য একটি মহৎ প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। বর্তমান সময়ে কৃচ্ছ্রসাধন অপরিহার্য, এবং উৎপাদনবৃদ্ধিই হল একমাত্র সমাধান এটা অস্বীকার করা যায় না, সংকটের সময়ে এ ধরনের আবেদন নিঃসন্দেহে খুবই জরুরি। কিন্তু, কর্তব্যবোধ, মাঝে মাঝে তা যতই মূল্যবান ও অপরিহার্য বলে মনে হোক না কেন, কোন স্থায়ী সমাধান হতে পারে না, এবং দীর্ঘসময় জুড়ে তার সফল হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না। এটার মধ্যে থাকে এক ধরনের মানসিক চাপ এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রতি অবিরাম প্রতিকূল মনোভাব, যা অব্যাহত থাকলে ক্রমবিলীয়মান ও স্বাভাবিক উদ্যমের ক্রমাবলুপ্তিকে টেনে আনে। যদি এটার ওপর জোর দেওয়া হয়, তাহলে দশটি নীতিনির্দেশের মতো কিছু সরল ঐতিহ্যপূর্ণ নীতিবোধের ভিত্তিতে নয়, বরং জটিল আর্থ-রাজনৈতিক কারণেই সংশ্লিষ্ট যুক্তিবাদের প্রেক্ষিতে আসতে পারে সংশয়বাদ, এবং অনেক মানুষ হয় ভেবে যে, সমৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌঁছানোর হয়তো কোন সংক্ষিপ্ত রাস্তা আছে। মানুষ আশাবাদের মাধ্যমে উদ্দীপ্ত হতে পারে অথবা ভয়তাড়িত হতেও পারে, কিন্তু আশা ও ভীতি সুস্পষ্ট ও তাৎক্ষণিক হওয়া প্রয়োজন যদি ক্লান্তি-উৎপাদন ব্যতিরেকেই সেগুলোকে কার্যকরী করে তুলতে হয়।

আংশিকভাবে এই কারণেও হিস্টিরিয়াধর্মী প্রচার, অথবা অন্তত হিস্টিরিয়া ছড়ানোর উদ্দেশ্যেমুখী প্রচার সারা বিশ্বে এ ধরনের বিস্তৃত প্রভাব ফেলেছে। সাধারণভাবে সব মানুষই জানে—পৃথিবীর দূর দূর অংশে সংঘটিত ঘটনার সুবাদে তাদের দৈনন্দিন জীবনও প্রভাবিত হয়, কিন্তু মুষ্টিমেয় সংখ্যক বিশেষজ্ঞ ছাড়া, অন্যদের সে ধরনের জ্ঞান নেই যাতে তারা বুঝতে পারে, কিভাবে এগুলো ঘটে। কেন চালের আকাল? কেন কলা এত দুষ্প্রাপ্য? কেন আপাতভাবে ষাঁড়েরা ক্রমশ লেজহীন হয়ে যাচ্ছে? যদি আপনি ভারত, অথবা লাল ফিতে, বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রতি দোষারোপ

করেন, তাহলে মানুষের মনে এমন একটা রূপকথাসদৃশ শয়তানের মন্ত্রমুগ্ধ ধারণার বীজ বুনে দেবেন, যাকে ঘৃণা করা সহজ। প্রতিটি দুর্ভাগ্যের ঘটনায় এটা একটা স্বাভাবিক প্রবণতা এমন একটা শত্রুকে খুঁজে বের করার চেষ্টা হয়, যার ওপর দোষটা চাপিয়ে দেওয়া যায়; আদিমতা সব দুর্দশার দায়ভার আরোপ করতো শত্রুতাপূর্ণ জাদুশক্তির ওপর। যখন আমাদের কষ্টের কারণগুলো বুঝে ওঠা খুবই কঠিন হয়ে ওঠে, আমরা তখন এই আদিম ধরনের ব্যাখ্যাকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করি। যে সংবাদপত্র ডলার ঘাটতির খবর পরিবেশন করে, তার তুলনায় যে আমাদের কাছে ঘৃণাযোগ্য কোন খলনায়কের সংবাদ দেয়, তা পাঠকের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ হয়ে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে, যখন জার্মানরা দুঃখকষ্টের মধ্যে পড়লো, তখন তাদের অনেককেই বোঝানো হয়েছিল যে, ইহুদিরাই দোষী।

আমাদের জীবনের যা কিছু যন্ত্রণাদায়ক, তার ব্যাখ্যা হিসেবে কোন কল্পিত শত্রুর প্রতি ঘৃণার আবেদন সাধারণত ধ্বংসাত্মক ও সর্বনাশা হয়ে থাকে; এটা আদিম প্রবৃত্তিজাত উৎসাহকে উত্তেজিত করে, কিন্তু বিভিন্নভাবে এর পরিণতি ঘটে দুঃখময়। ঘৃণার প্রতি আবেদনের গভীরতা কমানোর বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। স্পষ্টতই, সর্বশ্রেষ্ট পদ্ধতি হল–যেখানে সম্ভব, সেসব ক্ষেত্রে কোন শত্রুকে খুঁজে বার করার চেষ্টার মন্দ উপসর্গটিকে নিরাময় করা। এটা যদি করা না-ও যায়, তাহলেও আমাদের দুর্ভাগ্য-সৃষ্টিকারী প্রকৃত কারণগুলো প্রচার করা মাঝে মাঝে সম্ভব হতে পারে। যতদিন হিস্টিরিয়াসুলভ উৎসাহে সমৃদ্ধ রাজনীতি ও সংবাদ জগতের সুদৃঢ় চালিকাশক্তির অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন এটা করা কঠিন।

আমি মনে করি না যে, দুর্ভাগ্য নিজেই এক ধরনের ঘৃণা উৎপাদন করে, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যার ফলশ্রুতিতে ঘটেছিল নাৎসি উত্থান। হতাশা ও দুর্ভাগ্যের একটা পরিবেশ থাকতে হবে। রবিনসন নামে সুইজারল্যান্ডের একটি পরিবার, নিজেদের দ্বীপভূমিতে প্রচুর কাজের সন্ধান যারা পেয়েছে, তারা ঘৃণা নিয়ে সময় অপচয় করবে না। কিন্তু, জটিলতর কোন পরিস্থিতিতে প্রকৃতই প্রয়োজনীয় কাজকর্ম ব্যক্তি মানুষদের কাজে আবেদন রাখতে অনেক কম সমর্থ হয়ে থাকে। ব্রিটিশদের জাতীয় অর্থনীতির বর্তমান কঠিন পরিস্থিতিতে আমরা জানি–সমষ্টিগতভাবে কী প্রয়োজন: বর্ধিত উৎপাদন, ভোগহ্রাস এবং রপ্তানিতে উৎসাহ। কিন্তু এগুলো বড় ধরনের সাধারণ বিষয়, দৃশ্যত সেগুলো সুনির্দিষ্ট পুরুষ ও নারীদের কল্যাণের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। যদি আপাতভাবে এ ধরনের দূরবর্তী ভিত্তির কাজকর্মকে উদ্দীপনা ও আনন্দের সঙ্গে পরিচালিত করতে হয়, তাহলে জাতীয় অর্থনীতির প্রয়োজনভিত্তিক অধিকতর তাৎক্ষণিক কারণসমূহ উদ্ভাবনের পদ্ধতি বিন্যস্ত করতে হবে। আমি মনে করি, এর জন্য প্রয়োজন নিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা-হস্তান্তর এবং নাতিবৃহৎ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বাঞ্ছনীয় কম-বেশি স্বাধীন কর্মধারার সুযোগ।

বর্তমান যুগের বৃহৎ রাষ্ট্রে যে গণতন্ত্র রয়েছে, তা অতি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উদ্যোগের অনুকূলে উপযুক্ত সুযোগ দেয় না। আমরা এটা বলতে

প্রায়শই অভ্যস্ত যে, গ্রিকরা যাকে 'গণতন্ত্র' বলতো, মহিলা ও ক্রীতদাসদের অন্তর্ভুক্ত না থাকার কারণে তাতে ঘাটতি ছিল, কিন্তু আমরা সর্বদা বুঝি না–কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে, যখন সরকারি ক্ষেত্র সুবিস্তৃত, তখন সম্ভাব্য সব কিছুর চেয়ে গ্রিসের গণতন্ত্র অনেক বেশি গণতান্ত্রিক ছিল। প্রতিটি ইস্যুতে প্রত্যেক নাগরিক ভোটদান করতে পারতো; সে কোন প্রতিনিধিকে এই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারত না। সে জেনারেল সহ প্রশাসনিক উচ্চপদস্থদের নির্বাচিত করতে পারতো, এবং তাদের নিন্দিত করতে পারতো, যদি তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের বিরাগভাজন হতো। নাগরিকদের সংখ্যা ছিল স্বল্প; ফলে প্রতিটি মানুষ তার গুরুত্ব অনুভব করতো এবং তার নিজস্ব পরিচিতির জোরেই সে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রাখতে সক্ষম ছিল। আমি এরকম মন্তব্য করছি না যে, সামগ্রিকভাবে এই ব্যবস্থা ভাল ছিল; আসলে, এর খুব গভীর অসুবিধাও ছিল। কিন্তু ব্যক্তি-উদ্যোগকে মঞ্জুর করার মতো একটি ক্ষেত্রে, এই ব্যবস্থা আধুনিক পৃথিবীর বর্তমান যে কোন ব্যবস্থার চেয়ে উৎকৃষ্টতর ছিল।

দৃষ্টান্তের জন্যই ধরা যাক–একজন সাধারণ করদাতার সঙ্গে অ্যাডমিরালের সম্পর্কে বিষয়টি। সমস্ত করদাতাই সমষ্টিগতভাবে অ্যাডমিরালেরই কর্মচারী। পার্লামেন্টে তাদের প্রতিনিধিরা তার বেতনের স্বপক্ষে ভোট দেয়, এবং সরকারকে বেছে নেয়, এই সরকার আবার বিভাগীয় দপ্তর মনোনীত করে, যারা অ্যাডমিরালকে নিয়োগ করে। কিন্তু, যদি ব্যক্তিগত করদাতা অ্যাডমিরালের অনুকূলে কর্তৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, যা মালিক থেকে কর্মচারী স্তরে প্রথাগত, তাহলে খুব শীঘ্রই তাকে তার স্থানে বহাল করা হবে। অ্যাডমিরাল হলেন একজন মহান মানুষ, যিনি কর্তৃত্ব-চালনায় অভ্যস্ত; সাধারণ করদাতা তা নয়। সমগ্র গণ-পরিষেবার ক্ষেত্রে তুলনামূলক কম মাত্রায় এই একই ধরনের ঘটনা সত্য। এমনকী, আপনি যদি ডাকঘরে শুধুমাত্র একটা চিঠি রেজিস্ট্রি করতে চান, তাহলে পদস্থ কর্মচারীটিও তাৎক্ষণিক ক্ষমতা-প্রদর্শনের অবস্থানে থাকেন; তিনি অন্তত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীন যে কখন আপনার মনোযোগ আকর্ষণকে তিনি লক্ষ্য করবেন। আপনি যদি জটিলতর আরও কিছু চান, তাহলে তিনি বদমেজাজি হলে আপনার যথেষ্ট বিরক্তি ঘটাতে পারেন; তিনি আপনাকে অন্য একজনের কাছে পাঠাতে পারেন, যিনি আবার প্রথম জনের কাছেই আপনাকে ফেরৎ পাঠাতে পারেন; এবং এসব সত্ত্বেও ওই দুইজনই জনগণের 'ভৃত্য' রূপেই গণ্য হয়ে থাকেন। সাধারণ ভোটদাতা, এতদিন পর্যন্ত নিজেকে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, পুলিশ, এবং অসামরিক প্রশাসনের সমস্ত ক্ষমতার উৎসরূপে বিবেচনা করে অবশেষে নিজেকে তাদের অনুগত প্রজা হিসাবেই অনুভব করে, চীনারা একসময়ে যেমন বলতো 'কাঁপো এবং মান্য করো।' যতদিন পর্যন্ত গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ সুদূর ও বিরল ছিল, যখন সরকারি প্রশাসন ছিল কেন্দ্রীভূত এবং নেতৃত্ব কেন্দ্রবিন্দু থেকে পরিধি পর্যন্ত হস্তান্তরিত হতে, ততদিন ক্ষমতার সামনে এই ধরনের ব্যক্তিগত অক্ষমতার মনোভাব পরিহার করা কঠিন এবং তা সত্ত্বেও, এটা পরিহার করতেই হবে, যদি গণতন্ত্রকে নিছক সরকারি যান্ত্রিকতায় নয়, বরং অনুভূতিতে বাস্তব রূপগ্রাহ্য করে তুলতে হয়।

এই বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্ত মন্দ উপসর্গের অধিকাংশ কোন নতুন জিনিস নয়। সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই সভ্য সমাজের বেশির ভাগ মানুষই পরিপূর্ণ দুঃখকষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করেছে; গৌরব, রোমাঞ্চ, উদ্যোগ এ সবকিছুই ছিল কিছু সুবিধাভোগী মানুষদের জন্য, যেখানে সিংহভাগের জন্য বরাদ্দ ছিল সাময়িক তীব্র নিষ্ঠুরতাযুক্ত এক কঠোর শ্রমসম্পৃক্ত জীবন। কিন্তু, প্রথমে পাশ্চাত্য জাতিগুলো, পরে ক্রমশ সমগ্র পৃথিবী এক নতুন আদর্শের স্পর্শে জেগে উঠেছে। আমরা আর এই ঘটনায় সন্তুষ্ট নই যে, সামান্য কিছু মানুষ সব ভাল জিনিস উপভোগ করবে, যেখানে অসংখ্য মানুষ থাকবে হতভাগ্য। প্রাথমিক শিল্পায়নের মন্দ দিকগুলো থেকে জন্মেছে এক ভীতিজনিত রোমাঞ্চ, যা রোমক সাম্রাজ্যের সময়ে তারা ঘটাতে পারতো। দাসপ্রথার অবলুপ্তি ঘটেছিল, কারণ এটা অনুভূত হয়েছিল যে, নিছক অন্যের সমৃদ্ধির স্বার্থে মানুষকে যান্ত্রিক মাধ্যমে হিসেবে ব্যবহার করা ঠিক নয়। আমরা এখন আর অন্তত তত্ত্বগতভাবেও, সাদা চামড়া বিজয়ীদের দ্বারা ভিন্ন বর্ণের জাতির শোষণকে সমর্থন করি না। ধনী ও দরিদ্রের ফারাক কমানোর ইচ্ছা নিয়েই সমাজতন্ত্রকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছিল। অন্যায় অসাম্য এবং কষ্ট ও অবক্ষয়ের ভিত্তির ওপরে একটি চমৎকার উপরি-কাঠামো-গঠনে অনিচ্ছার বিরুদ্ধে, সর্বস্তরেই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়ে এসেছে।

বর্তমানে সাধারণভাবে এই নতুন বিশ্বাসকে এতটাই স্বতঃসিদ্ধের মতো ধরে নেওয়া হয়েছে যে, মানবজাতির দীর্ঘ ইতিহাসে এটা কতটা বিপ্লবী হতে পারে, সে সম্পর্কে পর্যাপ্ত অনুধাবন করা হয়নি। এই পটভূমিতে, বিগত এক শত ষাট বছরের পথপরিক্রমা যেন এই ভাবধারা-অনুপ্রাণিত এক ধারাবাহিক বিপ্লবের ইতিহাস। সমস্ত নতুন অথচ প্রভাববিস্তারী বিশ্বাসের মতোই এটাও অস্বস্তিকর এবং কঠিন সমঝোতার দাবি রাখে। এক্ষেত্রে একটা বিপদ রয়েছে–অন্যান্য দৈব নির্দেশেরও যেমন রয়েছে–পাছে মাধ্যমকেই যেন লক্ষ্য হিসেবে ভুল না করা হয়, ফলাফল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লভ্য ভুলে যায়। এখানে এমন একটা ঝুঁকি রয়েছে–সমতার নামে সুষম বণ্টন সহজসাধ্য নয়, ভাল জিনিস রূপে স্বীকৃত না-ও হতে পারে। অতীতের কিছু অবিচারসমৃদ্ধ সমাজ এমন কিছু স্বল্পসংখ্যক সুযোগ উপহার দিয়েছিল, আমরা মনোযোগী না হলে, আমরা যে নতুন সমাজ গড়ে তুলতে চাই, সেই সমাজ উপরোক্ত সুযোগ কাউকেই দিতে না-ও পারে। যখন আমি বর্তমান সময়ের খারাপ দিকের কথা বলি, তা আমি বলি এই কারণে নয় যে, সেগুলো অতীতের তুলনায় বৃহত্তর, বরং আমি এটাই নিশ্চিত করতে চাই যে–অতীতের যা ভাল, তা ভবিষ্যতেও বহন করে নিয়ে যাওয়া উচিত, এবং পরিবৃত্তিকালে যতদূর সম্ভব অক্ষত অবস্থাতেই। কিন্তু, এই লক্ষ্য যদি পূরণ করতে হয়, কয়েকটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে, যেগুলো স্বপ্নরাষ্ট্রের নীল নকশায় ভুলে যাওয়ার প্রবণতা থাকে।

গণতান্ত্রিক সাম্যের কাছে যে কয়েকটি জিনিসের অনাবশ্যকভাবে বলিপ্রদত্ত হওয়ার বিপদ রয়েছে, সম্ভবত তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল আত্মসম্মান। আত্মসম্মানের মাধ্যমে, আমি বোঝাতে চাই গর্বের অর্ধাংশ–যাকে বলা হয়ে থাকে 'প্রকৃত গর্ব।' মন্দ

অর্ধাংশ হল উৎকর্ষের মনোভাব। আত্মসম্মান একজন মানুষকে শোচনীয় দুর্দশার অবস্থা থেকে রক্ষা করে, যখন সে শত্রুদের ক্ষমতার মধ্যে থাকে এবং তা তাকে এই অনুভূতি এনে দেবে যে, যখন সমগ্র পৃথিবী তার বিরুদ্ধে, তখনও সে সঠিক পথে থাকতে পারে। যদি কোন মানুষের এই গুণ না থাকে, তার মনে হবে, সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত, অথবা সরকারি মতকেই অভ্রান্ত বলে মেনে নেওয়া উচিত এবং ওই ধরনের অনুভব, যদি তা সাধারণভাবে অভ্রান্ত হয়ে থাকে, নৈতিক ও বৌদ্ধিক—দুই অগ্রগতিকে অসম্ভব করে তোলে।

এতদিন পর্যন্ত, আত্মসম্মান প্রয়োজনীয়ভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠের বৈশিষ্ট্য রূপেই দেখা এসেছে। যেখানে ক্ষমতার বৈষম্য রয়েছে, সেখানে অন্যের শাসনাধীন প্রজাদের মধ্যে এর দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। স্বৈরতন্ত্রের চরম বিদ্রোহমূলক বৈশিষ্ট্যের একটা হল—অবিচারের শিকারদের এমনভাবে তারা চালনা করে, যাতে তারা তাদেরই তোষামোদ করে, যারা তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে।

রোমের গ্লাডিয়েটররা সম্রাটদের সেলাম ঠুকতো, যে সম্রাটরা তাঁদের বিনোদনের জন্য গ্লাডিয়েটরদের প্রায় অর্ধাংশকে বলি দিত। জেলবন্দী ডস্টয়েভস্কিও নিকোলাস প্রতি নিকোলাসের শুভকামনার ভান করতেন। সোভিয়েত সরকার কর্তৃক প্রায়শই কোতল হওয়া ব্যক্তিরা পাপবোধের একটা শোচনীয় স্বীকারোক্তি করে তাকে, যখন যারা অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়ে পালিয়ে ঘৃণা উদ্রেককর চাটুকারিতায় নেমে পড়ে এবং প্রায়শই সহকর্মীদের দোষারোপ করার চেষ্টায় একটি গণতান্ত্রিক শাসনের পক্ষে এরকম বড় ধরনের আত্মহীনমন্যতা পরিহার করার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আত্মমর্যাদা সংরক্ষণের সমান সুযোগও দিতে পারে। কিন্তু তা আবার সম্পূর্ণ বিপরীতটাও করতে পারে।

যেহেতু অতীতে আত্মসম্মান মূলত সুবিধাভোগী সংখ্যালঘিষ্ঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সেকারণে প্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠীবিরোধী ব্যক্তিরা তার অবমূল্যায়ন করতো এবং যারা বিশ্বাস করে যে, মানুষের কণ্ঠস্বরই হল ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর, তারা হয়তো এরকম সিদ্ধান্তে আসতে পারে যে, কোন অস্বাভাবিক অভিমত বা রুচি প্রায় এক ধরনের এবং তা দৈব কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে নিন্দনীয় বিদ্রোহরূপেই প্রতিভাত হবে। এটা পরিহার করা যায় শুধুমাত্র যদি স্বাধীনতাকে গণতন্ত্রের মতোই মূল্যবান মনে করা হয় এবং যদি এই উপলব্ধি করা হয় যে সমাজে প্রত্যেকেই সকলের ক্রীতদাস, তা অপর একটি সমাজের চেয়ে সামান্য ভাল, যেখানে প্রত্যেকেই একজন স্বেচ্ছাচারীর ক্রীতদাস। যেখানে সকলেই ক্রীতদাস অথবা সকলেই স্বাধীন, সেখানে সাম্য বিরাজ করে। এই দৃষ্টান্ত নির্দেশ করে যে, সাম্য তার নিজস্ব সত্তায় একটা উত্তম সমাজ গঠনের যথেষ্ট শর্ত নয়।

সম্ভবত, একটি শিল্পসমৃদ্ধ সমাজে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এবং নিশ্চিতভাবেই কঠিনতম জিনিসের একটি, তা হল—কাজকে উপভোগ্য করে তোলা। এই অর্থে কাজ যখন আর নিছক বেতন উপার্জনের মাধ্যমমাত্র নয়। বিশেষত আধুনিক শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এ ধরনের সমস্যা দেখা যায়। যে কাজ কঠিন, তা সেই সব মানুষের

কাছে আকর্ষণীয় হওয়ার সম্ভাবনা, যারা তা করতে সক্ষম। শব্দছক ও দাবাখেলা কয়েক ধরনের দক্ষ কাজের কাছাকাছি প্রায় সদৃশ, তা সত্ত্বেও নিছক আনন্দের জন্য অনেক মানুষ এই দুটি বিষয়ে যথেষ্ট প্রয়াস ব্যয় করে থাকে। কিন্তু যন্ত্রের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বেতনভোগীদের আনুপাতিক সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বেড়েই চলেছে, যাদের কাজ পুরোপুরি একঘেঁয়ে এবং পুরোপুরি সহজ। অধ্যাপক অ্যাবারক্রোম্বাই তার 'গ্রেটার লন্ডন প্ল্যান, ১৯৪৪' শীর্ষক রচনায় ঘটনাক্রমে ও বিনা গুরুত্বে চিহ্নিত করেছেন যে, অধিকাংশ আধুনিক শিল্পের প্রয়োজন নেই বিশেষ ধরনের তীক্ষ্ণতা এবং সে কারণে ঐতিহ্যবাহী দক্ষতাসম্পন্ন জেলাঞ্চলে সেগুলো স্থাপনের প্রয়োজন নেই। তিনি বলেছেন: 'আধুনিক কর্মপ্রকৃতি কোন বিশেষ শ্রমশক্তির ওপর আর নির্ভর করে না, এই কর্মপ্রকৃতি আপেক্ষিকভাবে দাবি করে অত্যল্প দক্ষতা, কিন্তু উঁচু মাত্রার স্থায়িত্ব ও বিশ্বাসযোগ্যতা; বর্তমান সময়ের শ্রমিক-বাহিনীর মধ্যে প্রায় সর্বত্রই এই গুণগুলো দেখতে পাওয়া যায়।'

'স্থায়িত্ব ও বিশ্বাসযোগ্যতা' নিঃসন্দেহে খুবই প্রয়োজনীয় গুণ, কিন্তু এগুলোই যদি সব হয় একজন কাজের লোকের কাছে, তাহলে এরকম সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তার কাজে সে কোন আকর্ষণ খুঁজে পাচ্ছে না এবং এটাও নিশ্চিত–তার জীবন চায়, ওরকম সন্তুষ্টি সে কাজের ঘণ্টার বাইরে থেকে খুঁজে নেবে। আমি বিশ্বাস করি না–এটা পুরোপুরি অপরিহার্য, এমনকী যখন কাজ তার নিজস্ব সত্তাতেই একঘেঁয়ে ও আকর্ষণহীন।

প্রথমেই প্রয়োজন–অতীতে মালিকানার সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু অনুভূতি শ্রমিকের কাছে প্রত্যর্পণ করা। যন্ত্র যখন জড়িত থাকে, তখন একজন ব্যক্তিগত শ্রমিকের প্রকৃত মালিকানা সম্ভব নয়, কিন্তু এক ধরনের গর্ববোধ অর্জন করার অনেক পথ থাকতে পারে, যে গর্ববোধের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকতে পারে এরকম অনুভূতি–এটা 'আমার' কাজ, অথবা যে কোন অর্থে 'আমাদের' কাজ, যেখানে এই 'আমাদের'-এর অর্থ হল–এমন একটা ছোট গোষ্ঠী, যেখানে প্রত্যেকে প্রত্যেককেই চেনে এবং নিজেদের মধ্যে রয়েছে সংহতির সক্রিয় মনোভাব। জাতীয়করণের দ্বারা এটা অর্জন করা সম্ভব নয়, জাতীয়করণের সূত্রে পরিচালক ও পদস্থ স্তরের ব্যক্তিদের সাধারণ কর্মচারীদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, যে ধরনের পারস্পরিক ব্যবধান দেখা যায় কোন পুঁজিবাদী শাসনে। যা জরুরি, তা হল সব ধরনের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্থানীয় ক্ষুদ্র স্তরের গণতন্ত্র; যাদের ওপর কর্তৃত্ব করতে হবে, তাদের দ্বারাই ফোরম্যান ও ম্যানেজারের নির্বাচন হওয়া উচিত।

একজন সাধারণ কর্মচারীর তরফে, কোন শিল্পসংস্থার কর্তৃত্বের নৈর্ব্যক্তিক ও দূরবর্তী বৈশিষ্ট্য যে কোন মালিকানাভিত্তিক স্বার্থের পক্ষে বিপজ্জনক। মিঃ বার্নহামের 'ম্যানেজারিয়েল রিভলিউশন'-এ প্রতিফলিত হয়ে রয়েছে, নিকট ভবিষ্যৎকালীন সম্ভাবনার আনন্দদায়ক ছবির অনেক দূরবর্তী প্রতিচ্ছবি, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারী নীরস পৃথিবীকে যদি আমরা পরিহার করতে চাই, প্রথম গুরুত্বের বিষয়টি হল–পরিচালন-কর্তৃপক্ষের গণতন্ত্রীকরণ। এই বিষয়টি প্রশংসনীয়ভাবে আলোচিত হয়েছে মিঃ জেমন গিলেসপির 'ফ্রি এক্সপ্রেশন ইন ইন্ডাস্ট্রি' শীর্ষক রচনায় এবং আমি তাঁকে উদ্ধৃত করা

ছাড়া অন্য কিছু করতে পারি না। তিনি বলেছেন, "যখন কোন ব্যক্তি মানুষ অথবা একটি গোষ্ঠী কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং সেই ভার নিয়ে শীর্ষে উঠতে অক্ষম, তখন দেখা দেয় একটা হতাশার মনোভাব। অসামরিক ও শিল্পগত আমলাতন্ত্রে যেমন দেখা যায়–একই ধরনের বিলম্ব দেখা যায়, এক্স অথবা ওয়াইয়ের দৃষ্টান্তক্রমে নিয়মের বর্ণনা এবং অসহায়তাও হতাশার অভিন্ন অনুভূতি। 'যদি আমি শুধু প্রধানের কাছে পৌছাতে পারতাম, তিনি তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারতেন, নিশ্চিতভাবেই দেখতেন...।"

শীর্ষে পৌছাবার এই ইচ্ছাটা খুবই বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ। কর্মীগোষ্ঠীগুলোর প্রতিনিধিদের মাসিক সভা মূল্যহীন নয়, কিন্তু এটা মালিক ও কর্মচারীর মুখোমুখি সম্পর্কের কার্যকরী বিকল্প নয়। পরিস্থিতিটা খুব সুবিধাজনক হয়ে ওঠে না, যখন বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক অথবা একজন অপারেটর কোন সমস্যা নিয়ে ফোরম্যানের কাছে যান এবং কর্তৃত্বে দায়বদ্ধ ফোরম্যান, নিয়ন্ত্রণ-হস্তান্তরের মাধ্যমে, সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে পাঠানো ছাড়া অন্য কিছু করতে পারেন না। পর্যায়ক্রমে তিনি এটা পাঠিয়ে দেন কর্মপরিচালকের কাছে, যিনি তা পরবর্তী সভার কর্মসূচিতে তালিকাভুক্ত করেন। অথবা বিষয়টি জনকল্যাণ বিভাগেও পাঠানো হতে পারে, বড় কোম্পানিতে থাকে বড় কল্যাণ বিভাগ এবং কল্যাণবিভাগীয় কোন বিকল্প ব্যক্তি অথবা ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা মালিকের বিকল্প স্বরূপ পার্সোনাল ম্যানেজার নিজে বিষয়টি পর্যালোচনা করতে পারেন অথবা তা স্থানান্তরে পাঠিয়ে দিতেও পারেন।

'খুব বড় কোম্পানিতে হতাশার মনোভাবের চেয়েও বেশি কিছুর অস্তিত্ব দেখা যায়। নিচুতলার কর্মীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মপ্রক্রিয়ায় একটা অদ্ভুত অর্থহীনতা দেখা যায়। সামগ্রিকভাবে কোম্পানিতে তার কাজের প্রকৃত গুরুত্ব সম্পর্কে সে খুব কমই জানে। সে জানে না, কে তার প্রকৃত ঊর্ধ্বতন প্রশাসক, প্রায়শই সে জানে না, কে-ই বা জেনারেল ম্যানেজার, এবং অধিকাংশ সময়েই প্রধান কর্মপরিচালক তার সঙ্গে কথাই বলেন না। বিভাগীয় পরিচালক, ব্যয়-বিভাগীয় পরিচালক, পরিকল্পনা-বিভাগীয় পরিচালক, মুখ্য কল্যাণ বিভাগীয় পরিচালক, এবং অন্যান্য আরও অনেকেই হলেন ভাল চাকরি ও সংক্ষিপ্ত কর্মসময়ের মানুষ। তাঁদের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই, তাঁরা তার গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়।'

কি রাজনীতিতে অথবা কি শিল্পক্ষেত্রে–গণতন্ত্র কোন মনস্তত্ত্বমূলক বাস্তবতা নয়। যত দিন পর্যন্ত সরকার বা পরিচালনা কর্তৃপক্ষকে 'তারা' বলে মনে করা হয়, যা একটা দূরবর্তী সংস্থা, যাদের চালচলন রাজসিক এবং যাকে বৈরিতাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা করাটাই স্বাভাবিক–যে বৈরিতা অসার যদি না তা বিদ্রোহের রূপ নেয়। মিঃ গিলেসপি নির্দেশিত অভিমত অনুসারে, শিল্পে এই প্রবণতার অনুকূলে যৎকিঞ্চিৎ অগ্রগতি হয়েছে এবং কিছু বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া পরিচালন-কর্তৃপক্ষ খুব স্পষ্টভাবেই রাজতান্ত্রিক অথবা স্বেচ্ছাচারী গোষ্ঠীতান্ত্রিক। এটা এমন একটা মন্দ দিক, নিয়ন্ত্রণহীনভাবে যদি তা বেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে তা সংগঠনের ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বাড়তে থাকবে।

ইতিহাসের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতির সিংহভাগ অতিবাহিত করেছে দারিদ্র্য এবং ক্লেশ ও নিষ্ঠুরতার ভারবাহী ছাতার তলায়, এবং প্রতিকূল অথবা নৈর্ব্যক্তিক ক্ষমতার প্রভাবে নিজেদের অক্ষমতা অনুভব করেছে। সভ্যতার অস্তিত্বের জন্য এসব অশুভ প্রবণতা আর প্রয়োজনীয় নয়, আধুনিক বিজ্ঞান ও আধুনিক কৃৎকৌশলের সাহায্যে এগুলোর অপসারণ সম্ভব, যদি অবশ্য মানবিক উদ্দীপনা এবং জীবন ও সুখের ঝর্ণাধারার উপলব্ধি সহকারে এগুলো ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের উপলব্ধি ব্যতিরেকে আমরা অস্বস্তিজনকভাবে একটা নতুন বন্দিশালা তৈরি করে ফেলতে পারি, এবং সম্ভবত কেউই তার বাইরে থাকতে পারবে না, অবশিষ্ট হিসাবে শুধু থাকবে বিষাদ এবং আনন্দহীনতা এবং মৃতবৎ উৎসাহহীনতা। এই বিপর্যয়কে এড়ানো যায়, তা আমি আলোচনা করবো আমার শেষ দুটি বক্তৃতায়।

পুনশ্চ

উৎকর্ষসংক্রান্ত অবক্ষয়ের একটি কৌতূহলোদ্দীপক ও বেদনাদায়ক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে স্টকল্যান্ডের পশম শিল্পের সূত্রে। সর্বোৎকৃষ্ট গুণমানসম্পন্নরূপে সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত হাতে বোনা দীর্ঘকাল ধরে হেব্রিডস এবং ওর্কনে এবং শেটল্যান্ড দ্বীপের মতো, উচ্চভূমিতে উৎপাদিত হয়ে এসেছে, কিন্তু যন্ত্রে বোনা পশম-শিল্প প্রতিযোগিতা হস্ত শিল্পী-তন্তুবায়দের দারুণভাবে আঘাত করেছে, পার্লামেন্টের উভয়কক্ষে বিতর্কের সূত্রে, ক্রয়করের সুবাদে কিছু দাক্ষিণ্য মিলেছে। এর ফল দাঁড়ালো—হস্তশিল্পের মাধ্যমে যারা আর জীবিকানির্বাহ করতে সক্ষম হচ্ছিল না, তারা শহরে বাস করার জন্য দ্বীপভূমি ও উচ্চভূমি ছাড়তে লাগলো, এমনকী দেশান্তরীও হতে লাগলো।

বার্ষিক ১০,০০,০০০ পাউন্ড থেকে ১৫,০০,০০০ পাউন্ডে ক্রয়করের বৃদ্ধির মতো স্বল্পকালীন লাভের বিনিময়ে যে দীর্ঘকালীন ক্ষতির বোঝা নেমে এল, যা পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

প্রথমত, শিল্পবিপ্লবের অন্ধ ও লোভী স্বর্ণময় দিনগুলোতে প্রাপ্ত ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে যুক্ত হল আরও একটি স্থানিক ও ঐতিহ্যবাহী দক্ষতার ক্ষয়, যে দক্ষতা সংশ্লিষ্ট শিল্পীকে দিত সৃজনের আনন্দ এবং এমন একটা কঠোর জীবনধারা, যা কষ্টকর ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতেও, উদ্ভাবনী দক্ষতা ও উদ্যমের মাধ্যমে তাদের কাছে এনে দিত গর্ব, আত্মমর্যাদা ও কৃতিত্বের আনন্দ।

দ্বিতীয়ত, নান্দনিকতা ও উপযোগিতা—উভয়দিক থেকেই দেখা গেল উৎপন্ন বস্তুতে সহজাত উৎকর্ষের ক্রমাবনতি।

তৃতীয়ত, স্থানীয় শিল্পের এই বিনাশের ফলে দেখা গেল এক ধরনের অনিয়ন্ত্রিত নগরায়নের প্রবণতা, যা আমরা আমাদের নগর-পরিকল্পনায় পরিহার করতে সচেষ্ট হয়েছি। একসময়ের স্বনির্ভর তন্তুবায়েরা পরিণত হল সুবিশাল, বীভৎস এবং

রুগ্নতালাঞ্ছিত মনুষ্যস্তূপে। তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা আর তাদের নিজস্ব দক্ষতা প্রাকৃতিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল রইলো না। এটা মুষ্টিমেয় বৃহৎ সংস্থার মধ্যে তলিয়ে গেছে, যেখানে একটি বা একজনের ব্যর্থতা ডেকে আনে সকলের ব্যর্থতা, এবং ব্যর্থতার কারণগুলোও বোঝা যায় না।

এই প্রক্রিয়ার পেছনে রয়েছে দুটি বিষয়–এই সময়ে–শিল্পবিপ্লবের উপস্থিতি। একদিকে, গোড়ার যুগের শিল্পপতিদের মতো নয়, যারা তাদের কৃতকর্মের ফলাফল দেখতে পায়নি, আমরা ফলাফলজনিত মন্দ দিকগুলো সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। অন্যদিকে, উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য, বা কর্মীদের জীবনধারণের মানোন্নয়নের জন্য এই ক্ষতিকর দিকগুলো আর ততটা জরুরি নয়। বৈদ্যুতিক শক্তি ও মোটর-পরিবহন ক্ষুদ্র শিল্পগুলোকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিকভাবেই বৈধতা নয়, এমনকী বাঞ্ছনীয় করেও তুলেছে, কারণ তারা পরিবহন ও সাংগঠনিকতার খাতে বিপুল ব্যয়কে নিয়ন্ত্রিত রাখে। যেখানে একটি গ্রামীণশিল্প এখনও সমৃদ্ধ, ক্রমশ তার যান্ত্রিকীকরণ করা উচিত। কিন্তু তাকে স্থিতাবস্থায় ও ক্ষুদ্র আকারেই রেখে দেওয়া প্রয়োজন। পৃথিবীর যেসব অঞ্চলে শিল্পায়ন এখনও প্রাথমিক অবস্থায়, সেখানে আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ আতঙ্ক পরিহার করার সম্ভাবনা এখনও রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতের কথা বলা যায়, যে দেশটি ঐতিহ্যগতভাবেই গ্রামীণসমাজে সমৃদ্ধ। এটা খুবই বেদনাদায়ক হবে, যদি সমস্ত কিছু মন্দ দিক নিয়েও ঐতিহ্যবাহী জীবনধারার বিনিময়ে নাগরিক শিল্পায়নের আরও খারাপ উপসর্গসহ আকস্মিকভাবে ও হিংসাত্মকভাবে পরিবর্তন ঘটানো হয়–কারণ এর ফলাফল ভুগতে হবে সেইসব মানুষদের যাদের জীবনধারণের মান ইতোমধ্যেই বেদনাদায়কভাবে নিচু। এসব বিপদের আশঙ্কা করেই গান্ধী উপমহাদেশে হস্তনির্মাণ বয়নের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে ঘড়ির কাঁটাকে উল্টো দিকে ঘোরাতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি অর্ধাংশ সঠিক ছিলেন, কিন্তু বিজ্ঞান-প্রদত্ত সুবিধাকে প্রত্যাখ্যান করাও মস্ত ভুল। পরিবর্তে বরং এগুলোকে সাগ্রহে গ্রহণ করা উচিত এবং বৈষয়িক সম্পদ বাড়ানোর ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগ করা দরকার, এবং একই সঙ্গে ক্ষুদ্র জনপদের বিশুদ্ধ বাতাস স্থিতাবস্থা, দায়িত্ববোধ ও কর্ম সুসম্পন্ন হওয়ার গৌরব, যা বৃহৎ শিল্পসমৃদ্ধ শহরের কর্মীর ক্ষেত্রে কদাচিৎ সম্ভব–এসবের সংরক্ষণেও তার প্রয়োগ ঘটানো বাঞ্ছনীয়। ভারতের গ্রামীণ শিল্পের ক্রমশ যান্ত্রিকীকরণ ও বাস্তবে ভাল থাকার ক্ষেত্রে অপরিসীম অগ্রগতির স্বার্থে হিমালয় প্রসূত সব নদনদীর সামগ্রিক জলবিদ্যুতের ব্যবস্থা করা উচিত এবং এসব হওয়া প্রয়োজন শিল্পমন্দাজনিত বিপর্যয় ও সূক্ষ্মতর অবক্ষয় ব্যতিরেকেই, কারণ এসব ফলশ্রুতি অনিবার্য হয়ে থাকে যখন শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্যকে নির্দয়ভাবে ভাঙচুর করা হয়।

বক্তৃতা : পাঁচ

নিয়ন্ত্রণ ও উদ্যোগ : তাদের যথানির্দিষ্ট ক্ষেত্র

একটি সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল সমাজের প্রয়োজন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠী-উদ্যোগ : নিয়ন্ত্রণ না থাকলে নৈরাজ্য অবশ্যম্ভাবী, এবং উদ্যোগ ব্যতিরেকে নিশ্চলতা অনিবার্য। কোন্ কোন্ বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন এবং কোনগুলোকে বেসরকারি অথবা আধা-বেরসরকারি উদ্যোগকে ছেড়ে দেওয়া উচিত–সে সম্পর্কে এই বক্তৃতায় আমি কিছু সাধারণ সূত্রে পৌছাতে চাই। কোন সমাজে যেসব গুণাবলির সন্ধান আমরা চাই, তার কিছু কিছু তাদের নিজস্ব সত্তায় গতিহীন, অন্যগুলো তাদের বৈশিষ্ট্যের সুবাদেই গতিশীল। খুবই সাদামাটাভাবে বলা যায়–আমরা আশা করতে পারি–নিশ্চল গুণগুলো সরকারি নিয়ন্ত্রণের উপযোগী, অন্যদিকে গতিশীল গুণগুলোকে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উদ্যোগে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। কিন্তু, যদি এসব উদ্যোগকে সম্ভব করে তুলতে হয়, এবং যদি এগুলোকে ধ্বংসাত্মকের পরিবর্তে ফলদায়ী করে তুলতে হয়, তাহলে উপযুক্ত সংস্থার দ্বারা তার পোষিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, এবং সরকারের অন্যতম কাজ হবে এসব সংস্থার সুরক্ষা। এটা স্পষ্ট যে, নৈরাজ্যের পরিস্থিতিতে, বিশ্ববিদ্যালয় অথবা বিজ্ঞান-গবেষণা অথবা পুস্তক-প্রকাশনা, বা এমনকী সমুদ্রতীরবর্তী অবকাশ যাপনের মতো অতিসাধারণ বিষয়েরও অস্তিত্ব থাকে না। আমাদের জটিল পৃথিবীতে সরকার ছাড়া ফলদায়ী উদ্যোগ সম্ভব নয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে উদ্যোগ ব্যতিরেকে সরকারের অস্তিত্ব সম্ভবপর।

আমি মনে করি–সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য থাকা উচিত তিনটি–নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও সংরক্ষণ। মানবিক সুখের স্বার্থে এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং এগুলো এমন বিষয়, যা একমাত্র সরকারই সংঘটিত করতে পারে। একই সঙ্গে, এগুলোর কোনটিই চরম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নয়। কোন কোন পরিস্থিতিতে, এদের কোন একটির স্বার্থ, সামান্য মাত্রাতেও হয়তো অন্যতর মঙ্গলের স্বার্থে বিসর্জিত হতে পারে। আমি পর্যায়ক্রমে এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কিছু বলবো। জীবন ও সম্পদের সুরক্ষার অর্থে নিরাপত্তা, রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক লক্ষ্যরূপে বিবেচিত হয়ে এসেছে। কিন্তু অন্য নাগরিকদের বিরুদ্ধে আইন মান্যকারী নাগরিকদের সুরক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক রাষ্ট্র এটা প্রয়োজনীয় বলে ভাবেনি, যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও এসব মানুষদের সুরক্ষা দেওয়া উচিত। প্রশাসনিক শক্তির জোরে গ্রেপ্তারির ব্যবস্থা এবং যথাযথ আইনীপদ্ধতি বাতি-

শান্তির ব্যবস্থা যেখানে রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যত দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক না কেন, বেসরকারি মানুষদের কোন নিরাপত্তা থাকে না এবং এমনকী, আইনের যথাযথ পদ্ধতিকরণের ওপর জোর দেওয়াও যথেষ্ট নয়, যদি না বিচারকেরা প্রশাসনের প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীন থাকতে পারেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে, 'প্রজাদের স্বাধীনতা' অথবা 'মানুষের অধিকার' এই ধরনের শ্লোগানের ছত্রচ্ছায়ায় উপরোক্ত ধ্যানধারণার বিন্যাস প্রকাশ্যে এসেছিল। কিন্তু বাঞ্ছিত 'স্বাধীনতা' এবং 'অধিকার' একমাত্র রাষ্ট্রের উদ্যোগেই অর্জিত হতে পারে, এবং একমাত্র তখনই রাষ্ট্রকে 'স্বাধীন' বলে আখ্যাত করা যেতে পারে। একমাত্র পশ্চিমী দেশেই, এ ধরনের স্বাধীনতা ও অধিকার অর্জিত হয়েছে।

বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য দেশসমূহের বাসিন্দার কাছে আর এক ধরনের অধিকতর কৌতূহলোদ্দীপক নিরাপত্তার বিষয়টি হল, উদ্ধত রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা। এটা একারণেই অধিকতর কৌতূহলোদ্দীপক যে, এটা এখনও অর্জিত হয়নি, এবং বছরের পর বছর যুদ্ধপদ্ধতির ক্রমোন্নতির ফলে এটা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ ধরনের নিরাপত্তা তখনই সম্ভব হয়ে উঠতে পারে, যখন সব প্রধান যুদ্ধাস্ত্রের একচেটিয়া অধিকারসহ এক অখণ্ড বিশ্বজনীন সরকার গড়ে উঠবে। আমি এই বিষয়টির ওপর বিস্তারিত আলোচনায় যাব না, যেহেতু এটা আমার মূল আলোচ্য থেকে কোন না কোনভাবে অনেকটাই দূরবর্তী। আমি সমস্ত গুরুত্ব দিয়ে শুধু এটাই বলতে চাই—যদি এবং যতদিন পর্যন্ত না মানবজাতি পৃথিবীর একক সরকার নিরাপত্তা অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে, ততদিন যে কোন মূল্যের, অথবা যে কোন ধরনের ঘটনাই বিপজ্জনক এবং যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধের দ্বারা তা ধ্বংস হতে পারে।

আধুনিক ব্রিটিশ বিধানিকতায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যের মধ্যে একটি হল—অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। কর্মহীনতা, রুগ্নতা, বার্ধক্যের দুরবস্থার বিরুদ্ধে বীমাব্যবস্থা বেতনভোগীদের জীবন থেকে তাদের ভবিষ্যতের বেদনাদায়ক অনিশ্চয়তা বহুলাংশে অপসারিত করেছে। ধাপে ধাপে চিকিৎসাসংক্রান্ত নিরাপত্তার উন্নতি ঘটানো হয়েছে, যার ফলে জীবনের গড়ে দৈর্ঘ্য বেড়েছে এবং রোগের প্রকোপ কমেছে, সবমিলিয়ে, পশ্চিমী দেশগুলোতে, যুদ্ধকে বাদ দিলে, অষ্টদশ শতাব্দীর তুলনায় জীবন এখন অত্যন্ত কমমাত্রায় বিপজ্জনক, এবং পরিবর্তন প্রধানত ঘটেছে বিভিন্ন ধরনের সরকারি নিয়ন্ত্রণের সুবাদে।

নিরাপত্তা সন্দেহাতীতভাবে উত্তম জিনিস হলেও, অতিরিক্ত মাত্রায় চাওয়া হতে পারে, এবং তা ক্রমশ অন্ধ আশাবাদে পরিণত হতে পারে। নিরাপদ জীবনমাত্রই সুখী জীবন নয়: গতানুগতিকতা ও একঘেয়েমির ফলে গুমোটপূর্ণও হয়ে উঠতে পারে। অনেক মানুষই যুবক অবস্থায় বিপজ্জনক রোমাঞ্চের বৈচিত্র্যকে স্বাগত জানায়, এবং এমনকী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে নীরস নিরাপত্তা থেকে স্বস্তি খোঁজে। নিরাপত্তা, তার

নিজস্বতায়, ভয়তাড়িত একটি নেতিবাচক লক্ষ্য; একটি সন্তোষবাদী জীবনের থাকবে আশাবাদে উদ্বুদ্ধ একটি ইতিবাচক লক্ষ্য। এ ধরনের রোমাঞ্চকর আশাবাদের মধ্যে থেকে ঝুঁকি এবং সে কারণেই ভীতি। কিন্তু বাইরে থেকে কোন মানুষের ওপর আরোপিত ভয়ের তুলনায় ইচ্ছাকৃতভাবে মেনে নেওয়া ভয় এরকম কিছু মন্দ জিনিস নয়। সে কারণে, আমরা শুধুমাত্র নিরাপত্তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারি না, অথবা কল্পনা করতে পারি না যে, একমাত্র এটাই নিয়ে আসতে পারে নতুন শতাব্দী এবং এখন ন্যায়বিচারের সম্পর্কে :

ন্যায়বিচার, বিশেষত আর্থিক ন্যায়, খুব সম্প্রতি হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি সরকারি লক্ষ্য। ন্যায়বিচারকে সাম্যের সমীকরণে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা দেখা যায়। একমাত্র সেসব ক্ষেত্র ছাড়া, যেখানে ব্যতিক্রমী ধরনের মেধাকে মনে করা হয় ব্যতিক্রমী অথচ মাঝারি মানের পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। আমেরিকার বিপ্লব ও ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকে লক্ষ্য হিসাবে বিবেচিত হয়ে এসেছে রাজনৈতিক সমদর্শিতা অর্থাৎ গণতন্ত্র, কিন্তু অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার একটা নতুনতর লক্ষ্য, এবং তা অনেক বেশি সরকারি নিয়ন্ত্রণের ওপর নির্ভরশীল। আমার মতে, সমাজতন্ত্রীরা সঙ্গত কারণেই এই অভিমত পোষণ করে যে, মূল শিল্পের রাষ্ট্র মালিকানার অন্তর্ভুক্তি ও বৈদেশিক বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। সমাজবাদের বিরোধীরা তর্ক করতে পারেন–অর্থনৈতিক সমদর্শিতা খুব মহার্ঘভাবেই ক্রয় করা যায়, কিন্তু অস্বীকার করতেও পারে না–যদি এই লক্ষ্য পূরণ করতে হয়, তাহলে শিল্প ও অর্থের ওপর বেশ বড় ধরনের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক।

তবে এমনকী অত্যুৎসাহী পশ্চিমী প্রবক্তরাও অন্তত নীরবেও স্বীকার করেন–অর্থনৈতিক সমদর্শিতার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়–পৃথিবীর কম সৌভাগ্যবান অংশের উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সাম্যের পথ খুঁজে বের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এর একমাত্র কারণ এই নয় যে, নিরসনের জন্য বিপুল পরিমাণ সুখহীনতা মজুত রয়েছে, বরং আরও কারণ হল–জ্বলন্ত বৈষম্য অব্যাহত থাকলে পৃথিবী সুস্থির ও নিরাপদ হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু ধীরগতিতে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক সমতা আনার যে কোন প্রচেষ্টাই সমৃদ্ধতর জাতিগুলোকে কম সমৃদ্ধতর জাতির স্তরে টেনে নামাবে–অথচ শেষোক্ত জাতির ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সুবিধা যুক্ত হবে না।

নিরাপত্তার মতোই, ন্যায়বিচারও–এমনকী বৃহত্তর মাত্রাসহ এমনই একটা আদর্শ যা সীমাবদ্ধতার শর্তে বন্দী। সমদর্শিতা সেখানেও রয়েছে, যেখানে সকলেই সমানভাবে গরিব বা সকলেই সমান ধনী, কিন্তু ধনীকে দরিদ্রতর অবস্থায় পরিণত করা নিষ্ফল মনে হবে, যদি না তার পরিবর্তে গরিবকে কিছুটা ধনী করে তোলা যায়। সমদর্শিতার যুক্তি এমনকী আরও জোরালো হয়ে ওঠে, যদি সমতার নামে, তা দরিদ্রকে পূর্বের তুলনায়

আরও দরিদ্র করে তোলার চেষ্টা করে এবং এটা ঘটতে পারে যদি সাধারণভাবে শিক্ষার অবনমন ও ফলদায়ী গবেষণার ক্রমাবনতির ঘটনা ঘটেই চলে। যদি ইজিপ্টে ও ব্যাবিলনে অর্থনৈতিক অবিচারের অবস্থা থাকতো, তাহলে লিখনশৈলীর কখনই আবিষ্কার হতো না। তবে শিল্পোন্নত জাতিদের ক্ষেত্রে সভ্যতার শিল্পকলায় অগ্রগতি ঘটানোর জন্য উৎপাদনের আধুনিক পদ্ধতিসহ অর্থনৈতিক অবিচারের ধারা বহমান রাখার কোন প্রয়োজন নেই। অতীতের মতো নয়–শুধুমাত্র যে আশঙ্কার কথা মনে রাখতে হবে, তা হল–একটি পদ্ধতিতে অসম্ভাব্যতা।

এখন আমি আসি আমার তৃতীয় বিষয়ে–সংরক্ষণ। নিরাপত্তা এবং ন্যায়বিচারের মতোই সংরক্ষণও রাষ্ট্রের তরফ থেকে সক্রিয়তা দাবি করে। 'সংরক্ষণ' বলতে আমি বোঝাতে চাইছি না শুধুমাত্র প্রাচীন মিনার এবং সৌন্দর্য স্থান, রাস্তাঘাট ও জনসাধারণের ব্যবহার্য বিভিন্ন অনুষঙ্গের ঠাটবাট রক্ষণাবেক্ষণ। যুদ্ধের সময়ে ছাড়া, বর্তমানে এসব কাজ করা হয়ে থাকে। যা প্রধানত আমার মনে আছে, তা হল–পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ। এটা একটা দারুণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার প্রতি খুব সামান্যই মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। বিগত একশো পঞ্চাশ বছরে মানবজাতি শিল্পের কাঁচামাল এবং ভূমিকে ব্যবহার করেছে, যার ওপরে কৃষি নির্ভরশীল, এবং প্রাকৃতিক মূলধনের এই অমিত ব্যয় ক্রমবর্ধমান গতিবেগ নিয়ে অব্যাহত থেকেছে। শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল তেল। পৃথিবীতে উত্তোলনযোগ্য তেলের পরিমাণ অজানা, তবে নিশ্চিতভাবেই তা অসীম নয়; ইতোমধ্যেই তার চাহিদা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে রয়েছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনামূলক ঝুঁকি। যখন তেল আর বিশাল পরিমাণে প্রাপ্তিযোগ্য নয়, সে কারণে আমাদের জীবনধারার অনেক কিছুই পরিবর্তন করা প্রয়োজন। আমরা যদি আণবিক শক্তিকে বিকল্প রূপে গ্রহণ করার চেষ্টা করি, তার ফলস্বরূপ, শুধুমাত্র ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের প্রাপ্তিযোগ্য সরবরাহই নিঃশেষিত হবে। বর্তমানে শিল্পের যে অবস্থায় অস্তিত্ব রয়েছে, তা আবশ্যিকভাবে প্রাকৃতিক মূলধনের ব্যয়ের ওপর নির্ভরশীল, এবং বর্তমান অমিতব্যয়ী আঙ্গিকে দীর্ঘকাল তা চলতে পারে না।

কোন কোন কর্তৃত্বস্থানীয়দের মতে, আরও গুরুত্বপূর্ণ যা, তা হল কৃষি সম্পর্কিত পরিস্থিতি যা দারুণভাবে চিত্রিত হয়ে রয়েছে। মিঃ ভোগটের 'রোড টু সারভাইভ্যাল' শীর্ষক রচনায়। কয়েকটি সুবিধাপ্রাপ্ত এলাকা ছাড়া (যার মধ্যে একটি হল পশ্চিম ইউরোপ), জমিকে চাষ করার বর্তমান পদ্ধতির সূত্রে তার উর্বরতা অতি দ্রুতগতিতে নিঃশেষিত হয়ে যায়। আমেরিকায় 'ডাস্ট বাওলে'র অগ্রগতি পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলে বহমান ধ্বংসাত্মক পদ্ধতির সর্বাধিক জ্ঞাত দৃষ্টান্ত। ইতিবসরে যেহেতু জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে, সেকারণে যদি না চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাহলে পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নিদারুণ খাদ্যসংকট অবশ্যম্ভাবী। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো কৃষির ছাত্রদের

জানা, কিন্তু একমাত্র সরকারের তরফেই এগুলো গৃহীত হতে পারে, এবং কেবল তখনই যদি তারা জনপ্রিয়তা হ্রাসের মুখোমুখি হতে ইচ্ছুক ও সমর্থ হয়। এটা এমন একটা সমস্যা, যা খুব সামান্যই মনোযোগ আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। এটার সম্মুখীন হতেই হবে তাকে, যে মারাত্মক যুদ্ধবর্জিত একটি স্থিতিশীল পৃথিবীর প্রত্যাশা করে–যুদ্ধের মাধ্যমে খাদ্যাভাবের সংকট সমাধান করতে হলে ইতিপূর্বে যে যুদ্ধগুলো আমরা সহ্য করেছি, তার চেয়ে অনেক বেশি ধ্বংসাত্মক হতে হবে, কারণ দুটি বিশ্বযুদ্ধের সময়েই পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কৃষিতে একটি সংস্কারের এই প্রশ্ন সম্ভবত এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রতিষেধক ছাড়া, অদূর ভবিষ্যতের সরকারগুলোকে তার সম্মুখীন হতে হবে।

আমি সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে নিরাপত্তা, সমদর্শিতা এবং সংরক্ষণের কথা বলেছি, কারণ এগুলো হল এমনই বিষয়, যা একমাত্র সরকারই রূপায়িত করতে পারে। আমি বলতে চাইছি না যে, সরকারের আর অন্য কাজ নেই। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের কাজ হওয়া উচিত বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করা এবং সদর্থক পদ্ধতিতে তার অনুশীলনের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা। সভ্য সমাজের অসহনীয় এরকম নৈরাজ্যবাদীও অপরাধমূলক ধরনের উদ্যোগের অস্তিত্ব দেখা যায়। সকলের কাছে প্রয়োজনীয় রূপে স্বীকৃতিযোগ্য–এরকম সুপ্রতিষ্ঠিত আবিষ্কারকে উদ্যোগের মতো অন্যান্য ধরনের উদ্যোগেরও অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু এক বিশালসংখ্যক মধ্যবর্তী প্রবর্তকের বাস্তবতা রয়েছে, যাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আগাম আঁচ করা যায় না যে, সেগুলোর ফলাফল ভাল অথবা মন্দ হবে। বিশেষত এই নির্দিষ্ট শ্রেণীর প্রেক্ষিতেই পরীক্ষামূলকভাবে স্বাধীনতার অভীপ্সার ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। কারণ এই শ্রেণীর মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয়ে রয়েছে মানবিক কৃতিত্বের যাবতীয় সর্বোত্তম বিষয়াদি।

একরূপত্ব হল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের স্বাভাবিক ফলাফল, এবং এই একরূপত্ব কোন কোন ক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয়, আবার অন্যান্য ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত। মুসোলিনির আগের দিনগুলোতে, শহরের রাস্তাঘাটের নিয়মবিধি ছিল একরকম এবং পারিপার্শ্বিক গ্রামাঞ্চলে এই নিয়ম ছিল বিপরীত। এই ধরনের বৈচিত্র্য ছিল অসুবিধাজনক, কিন্তু সেখানে এমন কোন বিষয় ছিল, যেসব ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদ অবদমিত করে রাখতো এক বাঞ্ছনীয় ধরনের বৈচিত্র্য। মতামতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পন্থার চিন্তাদর্শনের মধ্যে যদি তীব্র আলোচনার রেওয়াজ থাকে, তবে তা একটি ভাল জিনিস। মানসিকতার জগতে, অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামের অনুকূলে সব কিছুই বলা যায়, যা সৌভাগ্যবাহিত হয়ে, সর্বাপেক্ষা যোগ্যদের টিকে থাকার বিষয়ে উপনীত হয়। কিন্তু যদি মানসিক প্রতিযোগিতার কথা ওঠে, তাহলে প্রয়োগযোগ্য মাধ্যমসমূহের সীমিতকরণের পন্থাও থাকা প্রয়োজন। যুদ্ধের দ্বারা, অথবা হত্যাকাণ্ডের দ্বারা, অথবা নির্দিষ্ট মতবাদ-পোষণকারী ব্যক্তিদের কারাদণ্ডের দ্বারা, অথবা অপ্রিয় মতবলম্বীদের জীবিকানির্বাহ নিষিদ্ধকরণের দ্বারা এটা বলবৎ হওয়া উচিত নয়।

যেখানে বেসরকারি উদ্যোগের অস্তিত্ব রয়েছে, অথবা নবজাগরণের ইতালিও অষ্টাদশ শতাব্দীর মতো যেখানে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রয়েছে, সেখানে বিভিন্ন সম্ভাব্য পৃষ্ঠপোষকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে অন্তত কিছুটা এই শর্তগুলো পূরণ হতো। কিন্তু সমগ্র ইউরোপ জুড়ে যে ঘটনার প্রবণতা ছিল, সে রকম এক সময়ে যখন রাষ্ট্রগুলো বৃহত্তর হয়ে উঠেছিল এবং বেসরকারি উদ্যোগগুলো ক্ষুদ্রতর, তখন বৌদ্ধিক বৈচিত্র্য অর্জনের প্রথাগত পদ্ধতিগুলো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। একমাত্র যে পদ্ধতিটি অবশিষ্ট থাকে, তা হল–রাষ্ট্রের তরফে আংটাটি ধরে রাখতে এবং কুইন্সবেরি নিয়মনীতি ধরনের কিছু প্রতিষ্ঠিত করা, যার দ্বারা প্রতিযোগিতা পরিচালনা করা সম্ভব হয়।

বর্তমান সময়ে, শিল্পী ও লেখকরা হলেন প্রায় একমাত্র শ্রেণী, যাঁরা অন্যান্য গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না থেকেও, ভাগ্যের সহায়তায় ব্যক্তি হিসেবে একটি শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ পরিচালনা করতে পারেন। আমি যখন ক্যালিফোর্নিয়ায় বাস করতাম, তখন সেখানে দুইজন পুরুষমানুষ ছিলেন, যাঁরা সেই দেশে বহিরাগত শ্রমিকদের অবস্থা সমগ্র পৃথিবীকে জানাবার উদ্দেশ্যে কাজ করতেন। তাঁদের মধ্যে একজন, যিনি একজন ঔপন্যাসিক, একটি উপন্যাসে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন; অন্যজন যিনি ছিলেন একটি রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, একটি সযত্ন শিক্ষামূলক গবেষণা পর্যালোচনা করেছিলেন। ঔপন্যাসিকের কপাল খুলে গিয়েছিল: শিক্ষককে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল, এবং আসন্ন দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার ঝুঁকি বহন করতে হয়েছিল।

কিন্তু লেখকের উদ্যোগ, যা এখনও পর্যন্ত যে অবস্থায় টিকে রয়েছে, তা নানা ধরনের আশঙ্কায় জর্জরিত। যেমনটি রাশিয়ায় রয়েছে, যদি সেই রকমভাবে পুস্তক উৎপাদনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে থাকে, তাহলে রাষ্ট্রই সিদ্ধান্ত নিতে পারে–কি প্রকাশ করা হবে, এবং যদি না কোন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার প্রত্যর্পণ ঘটে, তাহলে এরকম সম্ভাবনাও রয়েছে যে, প্রধান রাজনীতিবিদদের সন্তুষ্টিকরণ ছাড়া অন্য কোন ধরনের বই প্রকাশিত হবে না। অবশ্য, সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। এরকম ক্ষেত্রে, একরূপত্ব হয়ে দাঁড়াবে বিপর্যয়কর, কিন্তু তা অনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় সমাজবাদের একটি অতিসম্ভাব্য ফলাফল হিসেবেই গণ্য হবে।

আমার তৃতীয় বক্তৃতায় যেখানে আমি চিহ্নিত করেছি–বিজ্ঞানের মানুষরা, পূর্বে বিচ্ছিন্নতার মধ্যে কাজ করতে পারতেন, যা এখনও লেখকরা পারেন, ক্যাভেন্ডিস ও ফ্যারাডে এবং মেন্ডেল কদাচিৎ প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন এবং ডারইউন সরকারের ওপর শুধুমাত্র বিগল্-এ সমুদ্রযাত্রার অংশীদারত্বের ব্যাপারে নির্ভর করেছিলেন। কিন্তু, এই বিচ্ছিন্নতা এখন অতীতের বিষয়। অধিকাংশ গবেষণার জন্য প্রয়োজন হয় খুব দামী যন্ত্রপাতি; কয়েক ধরনের গবেষণার জন্য প্রয়োজন হয়–দুর্গম স্থানে অভিযানের জন্য অর্থসংস্থান। সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফের প্রদত্ত সুযোগ

সুবিধা ব্যতিরেকে খুবই স্বল্পসংখ্যক মানুষ আধুনিক বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেন। এই ধরনের সুযোগ-সুবিধা করায়ত্ত হতে পারে সেই সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করার শর্তাবলি সেকারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি একমাত্র সেইসব মানুষদের যোগ্যতার ছাড়পত্র দেওয়া হয়, যারা বর্তমান বিতর্কে গোঁড়া হিসেবে পরিচিত, তাহলে অচিরেই বৈজ্ঞানিক প্রগতি স্তব্ধ হয়ে যাবে এবং এর ফলশ্রুতিতে মধ্যযুগীয় শ্বাসরুদ্ধ বিজ্ঞানের মতো পণ্ডিতাভিমানী কর্তৃত্ববাদের পথ প্রশস্ত করবে।

রাজনীতিতে কোন গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যক্তিউদ্যোগের সমন্বয় অবধারিত ও জরুরি। সাধারণত দুটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি ঘটে: দল এবং নির্বাচকমণ্ডলী। আপনি যদি কোন সংস্কার সাধন করতে চান আপনাকে প্রথমেই দলকে রাজি করাতে হবে সংস্কারের অনুকূলে এবং তারপর নির্বাচকমণ্ডলীকে সম্মত করতে হবে আপনার দলকে গ্রহণ করার জন্য। অবশ্য, আপনি সরাসরি সরকারের ওপর আপনার পরিচালনা আরো করতে পারেন। কিন্তু ব্যাপক জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে এটা কদাচিৎ সম্ভব হয়ে থাকে। যখন এটা সম্ভব হয়ে ওঠে না, তখন উদ্যোগটির মধ্যে এত বেশি উৎসাহ ও সময় জড়িত থাকার ফলে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল, যার ফলে সংস্কারের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কিছু প্রার্থীকে পাঁচ বছরের একবার ভোটদান ছাড়া বেশিরভাগ মানুষ স্থিতাবস্থার অনুকূলে মৌন সম্মতিদানই পছন্দ করে।

সুসংগঠিত এই পৃথিবীতে একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তি-উদ্যোগ মাত্র কয়েকটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, যদি না সেই গোষ্ঠীর আকার ছোট হয়। আপনি যদি কোন ছোট কমিটির সদস্য হন, আপনি সঙ্গত কারণেই তার সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করার আশা করতে পারেন। জাতীয় রাজনীতিতে, সেখানে আপনি কুড়ি মিলিয়ন ভোটারদের মধ্যে একজনমাত্র, সেখানে আপনার প্রভাব তুচ্ছাতিতুচ্ছ, যদি না আপনি ব্যতিক্রমী হন অথবা কোন ব্যতিক্রমী অবস্থানে থাকেন। এটা সত্য যে, সামগ্রিক সরকারের কুড়ি মিলিয়নের এক ভাগের আপনি অংশীদার, কিন্তু আপনার তরফে শুধুই ওই কুড়ি মিলিয়নের এক ভাগ মাত্র। সে কারণে, আপনি শাসন করার চেয়ে শাসিত হওয়ার ব্যাপারেই অনেক বেশি সম্পর্কিত। আপনার ভাবনায় সরকারের ভাবমূর্তি হয়ে দাঁড়ায় এক দূরবর্তী ও অত্যধিক মাত্রায় পরশ্রীকাতর 'তাহারা', যারা একগুচ্ছ মানুষ নয়, অন্যান্য সমমনোভাবাপন্নদের আপনিও যাদের পছন্দ করে নিয়েছেন আপনার ইচ্ছা রূপায়ণের জন্য। এরকম পরিস্থিতিতে, আপনার রাজনৈতিক অনুভূতি রূপায়ণের জন্য গণতন্ত্রের প্রয়োজন নেই, বরং একনায়কতন্ত্রের অনেক কাছাকাছি কিছু একটা প্রয়োজন।

গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়, এরকম ফলদায়ক সক্ষমতা ও সাহসী রোমাঞ্চময় উদ্দীপনা তখনই পুনরুজ্জীবিত হতে পারে, যদি ছোট ছোট গোষ্ঠীতে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটানো যায়, সেখানে শুধুমাত্র সদস্য সংখ্যার জোরে ব্যক্তি আচ্ছন্ন না হয়ে যায়।

উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য, যদি শুধুমাত্র যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে তা হয়–যে যুক্তির প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে এই বক্তৃতার গোড়াতে।

নির্দিষ্ট কর্মসূচিভিত্তিক বিভিন্ন সংস্থায় ক্ষমতার হস্তান্তর প্রয়োজন–ভৌগোলিক, শিল্পগত, সাংস্কৃতিক। নিজেদের আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা এবং উদ্যমী মানুষদের মধ্যে প্রভাববিস্তারী সন্তোষ-সঞ্চারণে যথেষ্ট ক্ষমতা থাকার প্রয়োজন এসব সংস্থার। তাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তাদের প্রয়োজন হতে পারে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় অর্থনৈতিক স্ব-শাসন। সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও সহানুভূতিহীন–এমন কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ যখন কোন সযত্নচিন্তিত প্রকল্পকে খারিজ করে দেয়, তখন উদ্যোগের প্রতি এতটা হতাশজনক ও মর্মান্তিক আর কিছুই হতে পারে না। তা সত্ত্বেও, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাধীন ব্রিটেনে এরকম ঘটনা অবিরাম ঘটে চলেছে। যদি সর্বশ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কগুলোকে পক্ষপাতদুষ্ট না হতে দিতে চাই, তাহলে আরও কিছুটা স্থিতিস্থাপক অথচ কম কঠোর কিছু একটা প্রয়োজন এবং যে কোন পরিপুষ্ট ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত– কর্মোৎসাহী মানুষের হাতে যত বেশি সম্ভব ক্ষমতা থাকার ব্যবস্থা।

অবশ্য, বিভিন্ন সংস্থার ক্ষমতা বি-সীমিতকরণের ফলে দেখা দিতে পারে অনেক অসুবিধা। সাধারণ নিয়মটি এমন হওয়া উচিত–যাতে বৃহৎ সংস্থাগুলোর উদ্দেশ্য পরিপূরণে বাধা দেয় না, এমন ছোট সংস্থাগুলোর হাতে সব কর্মসূচি ছেড়ে দেওয়া যায়। এই মুহূর্তের জন্যে নিজেদের ভৌগোলিক সংস্থায় আবদ্ধ রেখে বিশ্ব সরকার থেকে শুরু করে যাজক পরিষদ পর্যন্ত উচ্চ শ্রেণীবিন্যাস থাকা বাঞ্ছনীয়।

বিশ্বভিত্তিক সরকারের কাজ হবে যুদ্ধ নিবৃত্তি এবং এই উদ্দেশ্য সফল করার মতো প্রয়োজনীয় ক্ষমতাটুকুই তার থাকা উচিত। এসবের জন্য যা যা প্রয়োজন, তা হল–সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী পালনের একচেটিয়া অধিকার, চুক্তি-মঞ্জুর ও পুনর্বিবেচনা করার ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রবিরোধে সিদ্ধান্ত দানের অধিকার। চুক্তিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধান ছাড়া এই বিশ্বরাষ্ট্রের সদস্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা বাঞ্ছনীয় নয়। ঠিক একই পদ্ধতিতে, জাতীয় সরকারের তরফ থেকেও মফস্বল কাউন্সিলে, এবং সেখান থেকে পর্যায়ক্রমে আবার নগর-পৌরসভা ও যাজক পল্লী-স্তরে সর্বাধিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়া প্রয়োজন। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো দক্ষতার স্বল্পমেয়াদি লোকসান দেখা যেতে পারে, কিন্তু যদি সহায়ক সংস্থাগুলোর কর্মক্ষমতাকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা হয়, তাহলে দক্ষ ব্যক্তিরাও তাদের অধীনে থেকেও সন্তুষ্টি খুঁজে নিতে পারবে এবং দক্ষতার অস্থায়ী খামতির অনেক বেশি ক্ষতিপূরণ সম্ভব হবে অল্প সময়ের মধ্যে।

বর্তমানে সাধারণত স্থানীয় সরকারগুলোকে মনে করা হয় সম্পন্ন ও অবসরপ্রাপ্তদের সংস্থা হিসেবে, কারণ যেন শুধু প্রথামাফিক তাদের অবসর সময়টুকু তাঁরা এখানে দিয়ে থাকেন। যেহেতু, তারা অংশগ্রহণ করতে পারে না, সে কারণে মুষ্টিমেয় যুবক এবং সমর্থ ব্যক্তি এবং মহিলা তাদের স্থানীয় সমাজের কাজকর্মে যথেষ্ট উৎসাহ থাকে। যদি এর সমাধান করতে হয়, তাহলে স্থানীয় সরকারকে হতে হবে

একটি বেতনভোগী সংস্থা, এবং এই কারণের সূত্রেই সংসদ সদস্যদের বেতনদানের ব্যবস্থারপ্রচলন ঘটেছে।

একটি সংস্থা ভৌগোলিক অথবা সাংস্কৃতিক অথবা আদর্শবাদী যাই হোক না কেন, তার সর্বদা থাকবে দুই ধরনের সম্পর্ক, তার নিজের সদস্যদের প্রতি, দ্বিতীয়ত বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক। কোন সংস্থার তার নিজস্ব সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক যথারীতি সদস্যদের স্বাধীন ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিতে হবে, যতদিন পর্যন্ত না আইন লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে। যদিও সদস্যদের সঙ্গে সংস্থার সম্পর্কের বিষয়টি সদস্যদের দ্বারাই নির্ধারিত হওয়ার কথা, গণতন্ত্রের বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে, এটা আশা করা যায় যে, সদস্যরা কিছু নিয়মনীতি মনে রাখবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি বৃহৎ ব্যবসার কথা ধরা যেতে পারে। ধনতন্ত্রের ওপর সমাজতন্ত্রের আক্রমণের বিষয়টির সঙ্গে ক্ষমতার প্রশ্নের তুলনায় বস্তুবত সর্বাত্মকভাবে যুক্ত থেকেছে আয়ের প্রশ্নটি। যখন, জাতীয়করণের মাধ্যমে একটি শিল্পসংস্থা রাষ্ট্রের হাতে যায়, তখন এরকমও হতে পারে–বেসরকারি পুঁজিবাদের দিনগুলোর মতো তখনও সমান পরিমাণে ক্ষমতার বৈষম্য বিরাজ করছে–একমাত্র যে পরিবর্তনটা ঘটেছে, তা হল–ক্ষমতার অধিকারীরা এখন আর মালিক নয়–এখন তারা পদস্থ কর্মচারী। অবশ্য, এটা অপরিহার্য–যে কোন বৃহৎ সংস্থায় প্রশাসনিক আমলাবৃন্দের থাকা বাঞ্ছনীয়, সাধারণ কর্মচারীদের তুলনায় যারা অনেক বেশি ক্ষমতার অধিকারী হবে, কিন্তু এটাও বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয় যে, ক্ষমতার এই অসমতা চরম প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি হওয়া উচিত নয় এবং সম্ভাব্য সর্বাধিক উদ্যোগ সংস্থার সব সদস্যদের মধ্যে বণ্টিত হওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে একটি কৌতূহলোদ্দীপক বই হল–জন স্পেডেন লিউসের 'পার্টনারশিপ ফর অল–এ ৩৪-ইয়ার ওল্ড এক্সপেরিমেন্ট ইন ইন্ডাস্ট্রিয়্যাল ডেমোক্রেসি।' বইটির মূল আকর্ষণের দিক হল–এই কাহিনী এমন এক ব্যক্তির দীর্ঘ ও বিস্তৃত বস্তুগত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে রচিত, যিনি পরীক্ষামূলক সাহসিকতার সঙ্গে গণউদ্দীপনার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। আর্থিক ক্ষেত্রে, তাঁর সংস্থার সমস্ত শ্রমিককে অংশীদার করেছিলেন, লাভেও যাদের অংশীদারিত্ব থাকতো, কিন্তু এ ধরনের আর্থিক উদ্ভাবন ছাড়াও, তিনি প্রত্যেক কর্মচারীকে এই অনুভূতি প্রদানে সমর্থ হয়েছিলেন যে, সে সামগ্রিক কর্মোদ্যোগ পরিচালনেরও অংশীদার, যদিও আমি সন্দিগ্ধ যে, তাঁর এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিল্পগত গণতন্ত্রের অভিমুখে যতদূর যাওয়া উচিত, ততদূর যাওয়া আদৌ সম্ভব কিনা। সংশ্লিষ্ট কাজকে সবচেয়ে ভালভাবে চালিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানোর জন্য তিনি একটি কৌশলেরও উদ্ভাবন করেছিলেন। এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে, বেতন-সমতার বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তির ভিত্তি শুধু এই ছিল না যে, যারা শক্ত কাজ করে, তারাই ভাল বেতন পাওয়ার অধিকারী, বরং যুক্তির ভিত্তিটা ছিল এরকম বিপরীতধর্মী যে, ভাল কাজের কারণ হল ভাল বেতন। তিনি বলেছেন, "এরকম কল্পনা করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যে, সামর্থ্য ও তা ব্যবহার করার উপযোগী ইচ্ছা–এ দুই ই হল–

আমার অভিমতে, গণিতজ্ঞরা যাকে বলে থাকেন 'ধ্রুবক' এবং যা পরিবর্তনশীল, তা হ
আয়, শ্রমের বিনিময়ে যা পেয়ে থাকে কর্মচারীরা। কেবল আপনার ইচ্ছাই আপনাকে
সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মদক্ষতা প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না, বরং আপনি যা বেতন পান, তার
ওপরেই নির্ভর করে আপনার প্রকৃত কর্ম-সার্মথ্য। যারা দক্ষ শুধু সেকারণেই তাদের
ভাল বেতন দেওয়া হয়–এটা ঠিক নয়: তাদের ভাল বেতন দেওয়া হয় বলেই তারা
দক্ষ।"

মিঃ লিউস-প্রদত্ত এই অভিমতের চেয়ে বিস্তৃততর প্রয়োগ রয়েছে এই নীতির, এবং
তার প্রয়োগ শুধুমাত্র বেতনের ক্ষেত্রেই ঘটে না, বরং সম্মান ও পদমর্যাদার ক্ষেত্রেও
তার প্রয়োগ ঘটে থাকে। আমি মনে করি–প্রকৃতপক্ষে বেতনবৃদ্ধির প্রধান তাৎপর্য
নিহিত থাকে পদমর্যাদার বৃদ্ধির মধ্যে। একজন বিজ্ঞান–কর্মী যাঁর কাজ গুরুত্বপূর্ণ
হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে, তিনি অন্য কোন ক্ষেত্রে কর্মরত একজন ব্যক্তির
বেতনবৃদ্ধি মারফৎ প্রাপ্ত স্বীকৃতিসূত্রে যে উৎসাহ, সেই একই ধরনের উৎসাহ পেতে
পারেন। আসলে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল–আশাবাদও এক ধরনের সজীবতা, যে
বিষয়টির ঘাটতি রয়েছে ইউরোপে দুটি বিশ্বযুদ্ধের ফলশ্রুতি হিসাবে। পুরনো অবাধ
নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্যোগের স্বাধীনতার অনুকূলে আর ওকালতি করার প্রয়োজন
নেই, কিন্তু এটা এখনও সর্বাধিক গুরুত্ববাহী যে, এখনও উদ্যোগের স্বাধীনতা থাকা
উচিত এবং সক্ষম মানুষরা যাতে তাঁদের সামর্থ্য দেখাতে পারেন, সেরকম সুযোগ থাকা
প্রয়োজন।

অবশ্যই, বৃহৎ সংস্থায় কী বাঞ্ছনীয়, এটা হল তার শুধু একটা দিক। অন্য দিকটি
আরও গুরুত্বপূর্ণ এবং তা হল–যাদের হাতে নিয়ন্ত্রণ–ক্ষমতা রয়েছে, অন্যদের তুলনায়
তাদের অত্যধিক চরম ক্ষমতাধিকার থাকা উচিত নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে
সংস্কারকরা রাজাদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন, এবং তারপর তাঁরা
পুঁজিবাদীদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। এই দ্বিতীয় প্রতিযোগিতা
নিষ্ফলা হবে, যদি তা হয়ে দাঁড়ায়, ধনতন্ত্রীদের ক্ষমতার পরিবর্তে পদস্থ আমলাদের
ক্ষমতাপ্রাপ্তি। অবশ্য, এসব ক্ষেত্রে বাস্তব অসতুবিধাও রয়েছে, কারণ পদস্থ ব্যক্তিরা
গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ফলাফলের জন্য অপেক্ষা না করেই, প্রায়ই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
কিন্তু এরকম সম্ভাবনা থাকাও প্রয়োজন– একদিকে গণতান্ত্রিকভাবে নীতি–নির্ধারণের
সাধারণ নিয়ম, এবং অন্যদিকে শাস্তিপ্রাপ্তির ভয়বর্জিত প্রেক্ষিতে পদস্থ আমলাদের
কার্যকলাপের সমালোচনার অধিকার। যেহেতু, উদ্যমী মানুষদের ক্ষেত্রে ক্ষমতালিপ্সা
স্বাভাবিক ঘটনা, সেকারণে এটা ধরেই নেওয়া যায়–বহু ক্ষেত্রেই পদস্থ আমলার তাদের
প্রাপ্যের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষমতা করায়ত্ত করতে চাইতেন। এসব কারণে, যে
কোন বৃহৎ সংস্থার রাজনৈতিক বলয়ে লক্ষণীয় সর্তকতার মতোই, বৃহৎ সংস্থাতে
গণতান্ত্রিক সতর্কতা পালনের একই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বহির্জগতের সঙ্গে কোন সংস্থার সম্পর্কের বিষয়টি আবার অন্যরকম ঘটনা। এসব ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র ক্ষমতার পটভূমিতেই তা নির্ধারিত হওয়া উচিত নয়, অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট সংস্থাটির দরকষাকষির ক্ষমতার ভিত্তিতে নয়, বরং সেখানে বন্ধুত্বমূলক সমঝোতার মাধ্যমে মীমাংসা সম্ভব নয়, সেসব ক্ষেত্রে পাঠানো উচিত কোন নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষের কাছে। এই নিয়মনীতির প্রাসঙ্গিকতার কোন ব্যতিক্রম থাকা উচিত নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের পৃথিবীর সামগ্রিকতায় আসতে হয়, যে পৃথিবীর এখনও পর্যন্ত নেই কোন বাহ্যিক রাজনৈতিক সম্পর্ক। যদি কোনদিন আন্তঃবিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা থাকে, তখন আমাদের প্রয়োজন হতে পারে একটি আন্তঃগ্রহ কর্তৃপক্ষের।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক মতভেদ, যতদিন পর্যন্ত না তা বৈরিতার জন্ম দেয়, কোনভাবেই দুঃখদায়ক নয়। কোন ভিন্ন দেশে, কিছুদিনের বসবাসের সূত্রে আমরা অবহিত হতে পারি–কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আমাদের দেশের ঘাটতি রয়েছে, এবং যে দেশই আমাদের স্বদেশ হোক না কেন, সবক্ষেত্রেই এ ঘটনা সত্য। একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে মতভেদের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন পেশার সূত্রে জাত ভিন্নধর্মিতার ক্ষেত্রেও, এই একই ঘটনা প্রযোজ্য। চারিত্র্যধর্মের একরূপত্ব ও সংস্কৃতির অভিন্নতা অবশ্যই দুঃখজনক। জৈব বিবর্তন নির্ভরশীল ছিল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সহজাত পার্থক্যের ওপর, এবং সাংস্কৃতিক বির্বতন নির্ভর করে থাকে অর্জিত ভিন্নধর্মিতার ওপর। যখন এগুলো অন্তর্হিত হয়, তখন আর নির্বাচনের জন্য অন্য কোন বস্তু অবশিষ্ট থাকে না। আধুনিক পৃথিবীর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের অত্যধিক সদৃশতার প্রকৃত বিপদ বিদ্যমান। এই অশুভ প্রবণতার হ্রাসকরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় হল–বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্বশাসনের মাত্রাবৃদ্ধি।

মানসিক পণ্যের তুলনায় বস্তুগত পণ্য অনেক বেশি অধিকারের জিনিস। যে মানুষ একখন্ড খাদ্যদ্রব্য খাচ্ছে, সে অন্যান্য প্রত্যেককেই সেটিতে কামড় বসানোর ক্ষেত্রে বাধা দেবে, কিন্তু যে মানুষ একটি কবিতা লেখে বা তার স্বাদ অনুভব করে, সে ভাল হোক বা মন্দ হোক–অন্য আর একজনকে কবিতা লিখতে বা অনুভব করতে নিষেধ করে না। সে কারণে, বস্তুগত পণ্যের প্রেক্ষিতে ন্যায়বিচার খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু মানসিক পণ্যের ক্ষেত্রে যা প্রয়োজন, তা হল–সুযোগ এবং এমন এক পরিবেশ, যা কৃতিত্ব সম্পর্কিত আশাবাদের যুক্তিগ্রাহ্য হয়। বিশাল ধরনের বস্তুগত পুরস্কার সৃজনক্ষম মানুষকে উৎসাহিত করে না; খুবই অল্পসংখ্যক কবি বা বিজ্ঞানীর অদৃষ্ট খোলে বা তাঁরা সেরকম ইচ্ছা পোষণ করেন। সক্রেটিসকে মৃত্যুবরণে বাধ্য করেছিল কর্তৃপক্ষ, কিন্তু তিনি তাঁর শেষ মুহূর্তেও পুরোপুরি অবিচল ছিলেন, কারণ তিনি তাঁর কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু তার ওপর যদি সম্মান-পুরস্কারের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হতো এবং তাঁর কাজ থেকে তাঁকে বিরত করা হতো, তাহলে সেটা তাঁর কাছে অনেক বড় শাস্তি বলেই মনে হতো। কোন প্রাচীন রাষ্ট্রে, যেখানে কর্তৃত্ববাদ প্রচারের সব পদ্ধতিকেই নিয়ন্ত্রণ করে, যেখানে মৌলিকতায় চিহ্নিত ব্যক্তিকে মন্দ ভাগ্যের শিকার হতে হয়;

আইনী শাস্তির প্রকাশ তাকে মানতে হোক বা না হোক, তিনি তাঁর ভাবনাচিন্তা প্রকাশে আনতে ব্যর্থ হন। কোন সমাজে যখন এরকমটা ঘটে, তখন তা মানুষের যৌথজীবনে মূল্যবাহী আর কোন অবদান রাখতে পারে না।

লোভী ও হিংসাজীবী প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ একান্ত জরুরি এবং সে কারণে, রাষ্ট্রসমূহ ও এমনকী বিশ্বরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও অস্তিত্বরক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু আমরা মৃত্যুর চেয়ে নিছক বেঁচে থাকা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারি না; আমরা সুখে, তীব্রভাবে, সৃজনাত্মকভাবে বেঁচে থাকতে চাই। এর জন্য, রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় শর্তের একটি অংশমাত্রের ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু যদি না করে, তাহলে নিরাপত্তার নামে সুপ্রসারিত ও অনিয়ন্ত্রিত আবেগের শ্বাসরোধ করে যে আবেগ থেকে উৎসারিত হয় জীবনের স্বাদ ও তার মূল্য—ব্যক্তিজীবনে এখনও যেগুলোর সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে, এবং যা বিশাল সংগঠনের নিয়ন্ত্রণের থাবায় সর্বাত্মকভাবে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। আধুনিক প্রয়োগ-কৌশলে সৃষ্ট এই পৃথিবীতে উপরোক্ত বিপদের বিরুদ্ধে সতর্ক প্রহরা খুবই প্রয়োজনীয়।

বক্তৃতা : ছয়

ব্যক্তিভিত্তিক ও সামাজিক নীতিবোধ

এই শেষ বক্তৃতায় আমি দুটি জিনিস করতে চাই। প্রথমত, পূর্ববর্তী বক্তৃতাসমূহে উপনীত সিদ্ধান্তগুলোর পুনরালোচনা; দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত নীতিবোধের সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদের সম্পর্ক স্থাপন, যার দ্বারা কোন ব্যক্তি তার জীবনকে পরিচালিত করতে পারে এবং অশুভ দিকগুলোকে চিহ্নিতকরণ এবং আমাদের স্বীকৃত আশঙ্কার পরেও সমীক্ষাসূত্রে প্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট আশাবাদকে তুলে ধরা, যে আশাবাদ মানবজাতির খুব দূরবর্তী ভবিষ্যতের জন্য নয়, যা আমার তরফ থেকে, সংযত সমীক্ষামূলক সম্ভাবনার ভিত্তিতে ন্যায়সংগত বলে আমি বিশ্বাস করি।

সংক্ষিপ্তভাবেই শুরু করা যাক। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে আমরা সামাজিক কাজকর্মের দুটি প্রধান উদ্দেশ্যকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করেছি ঃ একদিকে নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের জন্য প্রয়োজন কেন্দ্রীভূত সরকারি নিয়ন্ত্রণ, যা বিশ্বভিত্তিক সরকারি গঠন পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে, অবশ্য যদি তাকে কার্যকরী করে তুলতে হয়। অন্যদিকে, প্রগতির জন্য আবশ্যক–সামাজিক বিন্যাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, ব্যক্তিউদোগ স্ফূরণের সর্বোত্তম সুযোগ।

যতদূর সম্ভব এই লক্ষ্যগুলো পূরণের পদ্ধতি হল–ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণ। যুদ্ধ প্রতিরোধের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়–এমন সব কিছুতেই নিখিল-বিশ্ব সরকার জাতীয় সরকারগুলোকে অবাধ স্বাধীনতা দেবে; জাতীয় সরকারগুলো, পর্যায়ক্রমে, যতদূর সম্ভব সুযোগ ছেড়ে দেবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে। শিল্পে, এরকম ধরে নেওয়ার কোন কারণ নেই যে, জাতীয়করণ করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। একটি সুবৃহৎ শিল্পসংস্থার, যেমন রেলওয়ের যথেষ্ট পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন থাকা দরকার; কোন রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পে রাষ্ট্রের সঙ্গে কর্মচারীদের সম্পর্ক তাদের পূর্বতন বেসরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পর্কেরই যেন পুনরাবৃত্তি না হয়। সংবাদপত্র, বইপত্র এবং রাজনৈতিক প্রচারপত্রের মতো মতপ্রকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুকেই প্রকৃত প্রতিযোগিতার মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য যে কোন একচেটিয়ার বিরুদ্ধে সযত্ন রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু, এই প্রতিযোগিতা হবে সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক, এবং অবশ্যই অর্থনৈতিক নয় এবং এসব সত্ত্বেও তা হওয়া উচিত ফৌজদারি আইন মোতাবেক অপেক্ষাকৃত কম সামরিক ঘরানার।

সাংস্কৃতিক বিষয়ে বৈচিত্র্যময়তা হল অগ্রগতির শর্ত। বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষিত সমাজের মতো যেসব সংস্থার রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ অবস্থায় কিছু নির্দিষ্ট স্বাধীনতা রয়েছে, এক্ষেত্রে তাদের রয়েছে মূল্যবান ভূমিকা। বর্তমান রাশিয়ায় যা দেখা যায়, ত খুবই পরিতাপের বিষয় যে, অর্থনৈতিক ও পুলিশী ক্ষমতার সহায়তায় বিজ্ঞান বিষয়ে অভ রাজনীতিবিদরা হাস্যকর সিদ্ধান্তের সূত্রে বিজ্ঞানের মানুষকে কুসংস্কারপূর্ণ আজেবাজে জায়গায় লিখতে বাধ্য করে। এরকম করুণ ঘটনা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে যদি রাজনীতিবিদদের ক্ষমতা সীমিত রাখা যায় সেই সব কর্মবলয়ে, যেখানে তারা দক্ষরূপে বিবেচিত হতে পারে। তাদের এই বিচারে নামা উচিত নয়–উত্তম জাতের সংগীত কী অথবা উৎকৃষ্ট মানের জীববিজ্ঞান বা ভাল দর্শনশাস্ত্রই ব কী? আমি চাই না প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত রুচিবোধ–তা অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, যে সময়েই হোক না কেন, এমনকী যদি বরাত জোরেও তার রুচিবোধ হয় নিষ্পাপ।

সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসংক্রান্ত প্রশ্নের বিপরীতে ব্যক্তিগত নীতিবাদের প্রশ্নে এখন আসা যাক। কোন মানুষই পুরোপুরি স্বাধীন নয়, আবার সে পুরোপুরি ক্রীতদাসও নয়। একজন মানুষের যতদূর স্বাধীনতা থাকে, আচারব্যবহার পরিচালিত করার জন্য তার প্রয়োজন হয় এক ধরনের ব্যক্তিগত নৈতিকতা। কেউ কেউ আছে, যারা বলবে–একজন মানুষ শুধু তার সমাজের স্বীকৃত নীতিবিধি মেনে চলবে। কিন্তু আমি মনে করি না–নৃতত্ত্বের কোন ছাত্র এই উত্তরে সন্তুষ্ট হবে। প্রথাগত নৈতিক মতবাদের বিরুদ্ধ নৈতিক প্রতিবাদের ফলে স্বগোত্রভোজন, নরবলি ও নরমুন্ড শিকারের মতো অভ্যাসের অবলুপ্তি ঘটেছে। যদি কোন মানুষ প্রকৃতই তার সামনে উন্মুক্ত শ্রেষ্ঠ আঙ্গিকের জীবনযাপন করতে চায়, তাহলে তাকে তার প্রতিবেশীদের মধ্যে সাধারণভাবে স্বীকৃত উপজাতীয় সংস্কার ও বিশ্বাসের সমালোচক হতে হবে।

কিন্তু ভিন্নতর প্রসঙ্গে–যে সমাজে কোন মানুষ বাস করে, সেই সমাজ সঠিক বলে মনে করে–এরকম পরিস্থিতিতে, বিবেকের তাড়নাতেই, আমাদের প্রথাগত কর্তৃত্ব ও আইনী কর্তৃত্বের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতেই হবে। শুধুমাত্র প্রথাগত নীতিবোধকে লঙ্ঘন করে, এমন কোন পদক্ষেপের চেয়ে অনেক জোরালো অজুহাতের প্রয়োজন হয় কোন বে-আইনি কাজকে বৈধ প্রতিপন্ন করতে। এর কারণ হল–যে কোন সহনশীল সমাজ-বিন্যাসের অস্তিত্বের জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত হল–আইনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। যখন কোন মানুষ কোন একটি নির্দিষ্ট আইনকে খারাপ বলে মনে করে, তখন তার একটা অধিকার আছে এবং তার কর্তব্যও হতে পারে, সেই আইনের পরিবর্তন ঘটানো, কিন্তু খুব বিরল ক্ষেত্রেই তা ভঙ্গ করার জন্য সঠিক কাজ করে। আমি অস্বীকার করি না যে, এমনও পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, যখন আইন ভাঙাও একটা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়ঃ এটা তখনই কর্তব্য হিসাবে দেখা দেয়, যখন একজন মানুষ গভীরভাবে বিশ্বাস করে, যে মান্য করাটাই হল একটা পাপ কাজ। এটা হল একজন বিবেকতাড়িত প্রতিবাদীর দৃষ্টান্ত। এমনকী, আপনি যদি নিশ্চিন্তও হন যে, সে ভুল করছে, আপনি

বলতেও পারবেন না যে, তার বিবেক আদেশ দিলেও সেই কাজ তার করা উচিত নয়। যখন আইন-প্রণেতারা বিজ্ঞ হন, যতদূর সম্ভব তাঁরা এমন সব আইন প্রণয়ন পরিহার করেন, যা বিবেকতাড়িত মানুষকে পাপ ও আইন-নির্ধারিত অপরাধের মধ্যে পছন্দ করে নিতে বাধ্য করে।

আমি মনে করি, এটাও স্বীকার করে নেওয়া দরকার যে, এমন অনেক ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে বিপ্লব ন্যায়সংগত। এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে–যেখানে বৈধ সরকার এতটাই খারাপ যে, নৈরাজ্যের ঝুঁকিপূর্ণ সম্ভাবনা থাকলেও সেখানে সরকারকে বলপ্রয়োগে ক্ষমতাচ্যুত করাই যুক্তিযুক্ত। ঝুঁকিটা সত্যই খুব বাস্তব। এটা লক্ষ্য করার বিষয়–দুটি সফলতম বিপ্লব–১৬৮৮ সালের ইংল্যান্ডে ও ১৭৭৬ সালে আমেরিকায়–এমন মানুষদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল, যাঁরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। এই পটভূমি যেখানে অনুপস্থিত থাকে সেখানে বিপ্লবের সূত্রে হয় নৈরাজ্যবাদ, অথবা একনায়কতন্ত্রের পথ প্রশস্ত হওয়ার প্রবণতা থাকে। সে কারণে আইনের প্রতি মান্যতা, যদিও তা একটা চরম আদর্শ নয়, তবুও তা এমন একট জিনিস যার ওপর গভীর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন এবং কিছু বিরল ক্ষেত্রে পরিপক্ক বিবেচনার পরেই ব্যতিক্রমকে অনুমোদন করা যেতে পারে।

নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে, এরকম সমস্যা থেকে উদ্ভূত হতে পারে এক গভীর দ্বিত্ব, যা যতই হতবুদ্ধিকর হোক না কেন–স্বীকৃতির দাবি রাখে।

নথিবদ্ধ ইতিহাস জুড়ে নৈতিক বিশ্বাসসমূহের দেখা যায় দুটি খুব পৃথক উৎস। একটি রাজনৈতিক, অন্যটি সংশ্লিষ্ট থাকে ব্যক্তিগত ধর্মীয় ও নৈতিক প্রত্যয়ের সঙ্গে। ওল্ড-টেস্টামেন্টে দেখা যায় এ দুটির সম্পূর্ণ পৃথক উপস্থিতি, একটি–'আইন' রূপে, অন্যটি–'ধর্মগুরু' রূপে। মধ্যযুগে যাজকতন্ত্র কর্তৃক পাখিপড়ানো নীতিবোধের সঙ্গে বিখ্যাত অতীন্দ্রিয়বাদীদের অভ্যস্তও শেখানো ব্যক্তিগত পবিত্রতার একই ধরনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হতো। ব্যক্তিগত ও নাগরিক নীতিবাদের দ্বৈত স্বাতন্ত্র্য আজও অব্যাহত এবং তাকে যে কোন উপযুক্ত নৈতিক তত্ত্বের মধ্যে গণ্য করা উচিত। নাগরিক নৈতিকতার অভাবে সমাজ ধ্বংস হয়ে যায়; ব্যক্তিগত নীতিবোধ ছাড়া তাদের অস্তিত্ব মূল্যহীন হয়ে পড়ে। সে কারণে, নাগরিক ও ব্যক্তিগত নীতিবোধ–এ দুটি উত্তম বিশ্বের জন্য সমানভাবে জরুরি।

নীতিশাস্ত্র শুধুই সর্বাত্মকভাবে আমার প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্যবোধের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, যতই সঠিকভাবে এই কর্তব্যের উপলব্ধি থাক না কেন। জনমুখী কর্তব্যের কৃতিত্ব একটা উত্তম জীবন গঠনের মধ্যেই সামগ্রিকভাবে সীমাবদ্ধ নয়; ব্যক্তিগত দক্ষতাও সেখানে অন্যতম অভীষ্ট বিষয়। মানুষের ক্ষেত্রে, যদিও আংশিকভাবে সামাজিক, পুরোটাই তা নয়। তার চিন্তা, অনুভূতি ও আবেগ আছে, যা জ্ঞানসমৃদ্ধ বা বোধহীন, মহৎ অথবা নিকৃষ্ট, ভালোবাসায় পূর্ণ অথবা ঘৃণায় অনুপ্রাণিত, হতে পারে। এসব চিন্তা ও অনুভূতি, আবেগের মহত্তর উদ্দেশ্য, যদি তার জীবনকে

সহনীয় করে তুলতে হয়, তাহলে সেখানে সুযোগের অস্তিত্ব থাকতেই হবে। যদিও অল্প কিছু মানুষ নিঃসঙ্গতায় সুখী হতে পারে, তা সত্ত্বেও আরও অল্পসংখ্যক মানুষ সেই সমাজে সুখী হয়, যেখানে ব্যক্তিগত কার্যকলাপের কোন স্বাধীনতা নেই।

ব্যক্তিগত উৎকর্ষ, যদিও অন্যের প্রতি সঠিক আচার-ব্যবহারের বিষয়টি নিয়ে গঠিত হয়েছে তার এক উল্লেখযোগ্য অংশ, তবুও তার রয়েছে অন্য একটি দিক। যদি আপনি তুচ্ছ বিনোদনের কারণে আপনার কর্তব্যে অবহেলা করেন, তাহলে আপনার বিবেকদংশন হতে পারে; কিন্তু আপনি যদি কোন বিখ্যাত সংগীত অথবা চমৎকার সূর্যাস্তের আকর্ষণে নিজেকে কিছু সময়ের জন্য সরিয়ে নেন, তাহলে আপনার কোন সলজ্জ প্রত্যাবর্তন ঘটাবে না এবং এমন কোন অনুভূতিও জাগবে না যে, আপনি বাজে সময় নষ্ট করেছেন। ব্যক্তিগত পরমোৎকর্ষ বলতে আমরা যা বুঝি তার ওপর সর্বাত্মকভাবে রাজনীতি ও সামাজিক কর্তব্যবোধকে প্রভুত্ব করতে দেওয়ার ছাড়পত্র খুবই বিপজ্জনক। আমি যা বলতে চাই যদিও তা কোন অলৌকিক বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল নয়–আসলে খ্রিস্টীয় নৈতিকতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সক্রেটিস ও অ্যাপস্টলস বলেছিলেন, মানুষকে মান্য করার চেয়ে আমাদের ভগবানকে মান্য করা উচিত, এবং খ্রিস্টীয় উপদেশাবলিতে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার বিষয়টিকে প্রতিবেশীর ভালবাসার মতোই গুরুত্ব দেওয়া হয়। সমস্ত মহান ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, এবং সমস্ত বিখ্যাত শিল্পী ও বৌদ্ধিক আবিষ্কারকবৃন্দ তাঁদের সৃজনমূলক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য এক ধরনের নৈতিক বাধ্যবাধকতা ও মহিমান্বয়ন প্রদর্শন করেছেন। খ্রিস্টীয় উপদেশের মতে যাকে ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য বলা হয়ে থাকে, তারই ভিত্তি হল এই আবেগ এবং (আমি পুনরুক্তি করছি) অলৌকিক বিশ্বাস থেকে তা পৃথক। আমার প্রতিবেশীর যে কোন ধরনের উপলব্ধি অনুসারে, প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য আমার কর্তব্যবোধের সবটুকু হতে পারে না। যদি আমার এই গভীর বিবেকচালিত বিশ্বাস থাকে, সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিন্দিত পন্থায় আমার কাজ করা উচিত, তাহলে সেই বিশ্বাসকেই আমার অনুসরণ করা উচিত এবং বিপরীতভাবে বলা যায়–আমাকে নিয়ন্ত্রিত করার জোরালো কারণ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে আমার বিশ্বাসকে অনুসরণ করার স্বাধীনতা সমাজের তরফ থেকে আমাকে দেওয়া আবশ্যক।

কিন্তু শুধুমাত্র কর্তব্যবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত কাজকর্মেরই অত্যধিক সামাজিক চাপ থেকে মুক্ত থাকা প্রয়োজন–এমন নয়। একজন শিল্পী অথবা একজন বিজ্ঞানী আবিষ্কারক সর্বাধিক সামাজিক উপযোগিতাসম্পন্ন কাজ করতে পারেন, কিন্তু তিনি শুধুমাত্র কর্তব্যবোধ দ্বারা চালিত হয়েই তাঁর কাজ ঠিকঠাক করতে পারেন না। যদি না তাঁর শিল্পকলা অর্থহীন এবং তাঁর আবিষ্কারকে গুরুত্বহীন অভিধায় চিহ্নিত হতে হয় তাহলে চিত্রকর্ম বা আবিষ্কারের জন্য তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ থাকতেই হবে।

ব্যক্তিগত কর্মবৃত্তকে নৈতিকভাবে সামাজিক কর্তব্যবোধের চেয়ে নিকৃষ্টতর হিসেবে গণ্য করা ঠিক নয়, বরং মানবিক কর্মকাণ্ডের শ্রেষ্ঠ কিয়দংশ, অন্তত অনুভূতির

সামাজিকের চেয়ে বরং ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যবাহী। আমি যেমন বক্তৃতা-তিনে উল্লেখ করেছি–ধর্মগুরু, অতীন্দ্রিয়বাদী, কবি, বিজ্ঞান-আবিষ্কারক– এঁরা হলেন এমনই মানুষ, যাঁদের জীবন দার্শনিক অনুভূতি প্রভাবিত হয়ে থাকে; তাঁরা আবশ্যিকভাবেই নিঃসঙ্গ মানুষ। তাঁদের প্রভাবশালী প্রবৃত্তি যখন জেরালো থাকে, তখন তাঁরা মনে করেন–তাঁরা কর্তৃপক্ষকে মেনে নিতে পারেন না যদি তারা সেটা ভাল বলে গভীরভাবে বিশ্বাস করেন–কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধাচারী হয়। যদিও, এক্ষেত্রে নিজেদের সময়ে তাঁরা প্রায়শই নির্যাতিত হয়ে থাকেন, তবুও সমস্ত মানুষের মধ্যে তাঁদের প্রতিই পরবর্তী বংশধরেরা সর্বোচ্চ সম্মান নিবেদন করে। এরাই হলেন সেই মানুষ, যাঁরা পৃথিবীকে দিয়েছেন সেইসব জিনিস, যেগুলোকে আমরা সবচেয়ে মূল্যবান বলে মনে করি–তা শুধুমাত্র ধর্মে, শিল্পে এবং বিজ্ঞানেই নয়, বরং প্রতিবেশীদের প্রতি আমাদের অনুভূতিজাত সম্পর্কের ক্ষেত্রে, অন্য সব কিছুর মতোই সামাজিক দায়বদ্ধতার মনোভাবের উন্নয়নেও–এবং এসবেরই পিছনে রয়েছে মূলত সেইসব নিঃসঙ্গ মানুষদের অবদান, যাঁদের চিন্তাভাবনা ও আবেগ যূথবদ্ধতার প্রভাবাধীন ছিল না।

যদি মানুষের জীবনকে আমরা ধূলিময় ও নীরস করতে না চাই, তাহলে এটা উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ যে, এমন জিনিস রয়েছে, যাদের মূল্যও আছে, কিন্তু তা উপযোগিতা-নিরপেক্ষ। যা প্রয়োজনীয়, তা প্রয়োজনীয়, কারণ সেটা অন্য কিছুর উপায় বা মাধ্যম, এবং এই অন্য কিছুর, পরবর্তী পর্যায়ে যদি নিছক মাধ্যমে গোত্রান্তর না ঘটে, তাহলে তার মূল্যমান নির্ধারিত করতে হবে নিজস্ব স্বার্থ ও সত্তার গুণে, কারণ তা না হলে 'প্রয়োজনীয়তা' হয়ে দাঁড়াবে অলীক।

লক্ষ্য ও উপায়ের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য স্থাপন একই সঙ্গে কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি উপায় বা মাধ্যমের ওপর জোর দিতে চান, তাহলে আপনি একথা বলতে পারেন যে, একজন সুসভ্য মানুষ ও একজন আদিম বন্য মানুষের মধ্যে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক ও একজন শিশুর মধ্যে, একজন মানুষ ও একজন পশুর মধ্যে–পারস্পরিক যে পার্থক্য, তা গড়ে উঠেছে লক্ষ্য সম্পর্কিত ওজন ও মাধ্যম সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যের উপকরণ দিয়ে। একজন সভ্য মানুষ তার জীবনকে বীমার মাধ্যমে সুরক্ষিত করে, কিন্তু আদিম মানুষ তা করত না। একজন প্রাপ্তবয়স্ক দাঁতের ক্ষয়প্রতিরোধ করার জন্য ব্রাশ করে, কিন্তু একজন শিশুকে বাধ্য করা না হলে–ব্রাশ করে না; মানুষ শীতে খাদ্যসংগ্রহের ব্যবস্থা করার জন্য মাঠে পরিশ্রম করে, পশুরা তা করে না। দূরদর্শিতা–যা হল ভবিষ্যতের আনন্দদায়ক জিনিসের জন্য বর্তমানের অপ্রীতিকর কর্মব্যস্ততা, তা মানসিক সমৃদ্ধির অন্যতম অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য। যেহেতু ভবিষ্যৎ চিন্তা খুবই কঠিন বিষয় এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় আবেগের নিয়ন্ত্রণ, নীতিবাদীরা তার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন, এবং পরবর্তী প্রাপ্তির চমৎকারিত্বের চেয়ে বর্তমান আত্মত্যাগের পুণ্যের ওপর অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। আপনি সঠিক কাজ করবেন, যেহেতু সেটাই সঠিক, কারণটা এরকম নয় যে তা স্বর্গে পৌঁছানোর একটা

রাস্তা। আপনি সঞ্চয় করবেন, কারণ যে কোন সুস্থমানসিকতাসম্পন্ন মানুষ তা করেন এবং তার কারণটা এরকম নয় যে, সঞ্চয়ের সুবাদে আপনার এত বিপুল অর্থ উপার্জিত হবে, যে আপনি তা দিয়ে জীবনকে উপভোগ করবেন। এরকম রয়েছে আরও অনেক দৃষ্টান্ত।

কিন্তু যে মানুষ উপায়ের তুলনায় লক্ষ্যের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে ইচ্ছুক, তিনি সমান সত্যসমর্থিত পাল্টা যুক্তি দিতে পারেন। এরকম একটা দৃশ্য খুবই করুণ, যখন দেখা যায় কোন বলিষ্ঠ ধনী ব্যবসায়ী, যিনি তাঁর যৌবনকালে কাজের বোঝা ও উদ্বেগের চাপে ক্রমশ অজীর্ণ রোগগ্রস্তে পরিণত হয়েছেন এবং তিনি এখন শুধুই শুকনো টোস্ট খেতে পারেন ও শুধু জল পান করতে পারেন, পাশাপাশি দেখা যায়, তাঁর বেপরোয়া অতিথিরা ভুরিভোজনে ব্যস্ত: তাঁর সুদীর্ঘ পরিশ্রমী বছরগুলো জুড়ে তাঁর প্রত্যাশিত বিত্তানন্দ তাঁর কাছ থেকে সুকৌশলে পলায়নপর এবং তখন তাঁর একমাত্র আনন্দ হয়ে দাঁড়ায়–পুত্রকে, তার পর্যায়ক্রমে, বশীভূত করে আর্থিক ক্ষমতার ব্যবহার এবং এভাবে পুত্রও তার ভাগ্য সঁপে দেয় একই ধরনের উঞ্ছবৃত্তিতে। মাধ্যমের মধ্যে কৃপণদের স্বনিযুক্তির বৈশিষ্ট্য হল–বিকারতত্ত্বীয় এবং তা সাধারণত অবিজ্ঞোচিত বলেই স্বীকৃত হয়ে থাকে, কিন্তু ওই একই ব্যাধির গৌণ উপসর্গগুলোর অহেতুক সুপারিশমূলক গুরুত্ব পাওয়ার প্রবণতা থাকে। লক্ষ্যসম্পর্কিত কিছুটা সচেতনতা না থাকলে জীবন নিরানন্দ ও বিবর্ণ হয়ে ওঠে: চূড়ান্তভাবে, উত্তেজনা-প্রশমনের জন্য যুদ্ধ অথবা নিষ্ঠুরতা বা ষড়যন্ত্র অথবা অন্য কোন ধ্বংসাত্মক কাজের মধ্য দিয়ে প্রায়শই পথ খুঁজে নেয়–যা হয়তো অন্যভাবেও চরিতার্থ হতে পারতো।

যেসব মানুষ নিজেদের 'বাস্তববাদী' রূপে গর্ব করে, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামগ্রিকভাবে লক্ষ্য সম্পর্কে স্বেচ্ছাবিষ্ট থাকে: কিন্তু তাদের এই বিষয়টি বিজ্ঞতার অর্ধাংশমাত্র। আমরা যখন অন্য অর্ধাংশের হিসাব নিই–যে অংশটা সম্পর্কিত থাকে লক্ষ্যের সঙ্গে–তখন আমরা অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া ও মানবজীবনের সামগ্রিকতার একটা সম্পূর্ণ নতুন দিক দেখতে পাব। আমরা আর জিজ্ঞাসা করবো না: উৎপাদকরা কী উৎপাদন করেছে এবং এই ভোগ, পরবর্তী পর্যায়ে, তার উপভোক্তাকে কতদূর সমর্থ করেছ? তার পরিবর্তে আমরা জিজ্ঞাসা করি: ভোগী ও উৎপাদকদের জীবনে কী এমন আছে, যা তাঁদের বেঁচে থাকার মধ্যে আনন্দ সঞ্চার করে বা তাদের সৃজন হিসেবে গণ্য হতে পারে, সেরকম কীইবা তারা অনুভব করছে বা জেনেছে বা করেছে? তারা কি নতুন জ্ঞানের গৌরব সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে? তারা কি ভালাবাসা ও বন্ধুত্বের স্বরূপ জেনেছে? তারা কি সূর্যালোকে ও ঝর্ণাধারায় ও পুষ্পসৌরভে আনন্দস্নাত হয়েছে? সরল, সাদামাটা সমাজের নৃত্যগীতের আনন্দ কি তারা অনুভব করেছে? তারা কি নতুন জ্ঞানের গৌরব সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে? একবার, আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল লস এঞ্জেলসের মেক্সিকো-কলোনি দেখার জন্য–আমাকে বলা হয়েছিল, তার অলস ভবঘুরে, কিন্তু আমার উদ্বিগ্ন পরিশ্রমী নিমন্ত্রণকর্তাদের কবলে

পড়ার চেয়ে, ওই ভবঘুরেদের খুবই ফূর্তিবাজ বলে মনে হয়েছিল. অভিশাপের পরিবর্তে জীবন যেন তাদের আশীর্বাদধন্য. আমি যখন এই অনুভূতি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলাম, তখন কিন্তু আমার জুটেছিল শূন্যগর্ভ ও উপলব্ধিহীন অভিজ্ঞতা।

জনসাধারণ সর্বদা মনে রাখে না–রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সামাজিক সাংগঠনিকতা সাধারণত মাধ্যমের বিন্যাসে অবস্থান করে. এবং সেগুলো লক্ষ্যমাত্র নয়। আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবনার অভিমুখ এমন দিকে নির্দিষ্ট থাকে. যাকে বলা যায় 'প্রশাসকের হেত্বাভাস' যার দ্বারা আমি বোঝাতে চাইছি–সুসংগঠিত সামগ্রিকতারূপে কোন সমাজকে ভাল মনে করে দেখার অভ্যাস. যদি তা শৃঙ্খলার একটা নমুনারূপে বিবেচনা করা প্রীতিদায়ী হয়–পরস্পরের সঙ্গে সুচারুভাবে জোড়া লাগানো একটি পরিকল্পিত অঙ্গবিন্যাস।

কিন্তু কোন সমাজ বাইরের কোন সমীক্ষাকে তুষ্ট করার জন্য অস্তিত্ব রক্ষা করে না. বা অন্তত তার সেটা করা বাঞ্ছনীয়ও নয়, বরং সেই সমাজ চেষ্টা করে সেসব ব্যক্তিদের সদর্থক জীবন উপহার দিতে. যারা গড়ে তুলেছে সেই আধার। সমষ্টির মধ্যে নয় ব্যক্তির মধ্যেই খুঁজে নিতে হবে চরম মূল্যবোধ। একটি উত্তম সমাজ হল সেসব মানুষদের জন্য একটি উত্তম জীবনকে ছোঁয়ার মাধ্যম. যাঁরা তা তৈরি করেছে–সেটা এমন নয় যে. নিজস্ব খাতে তার স্বতন্ত্র ধরনের কোন উৎকর্ষ থাকতে হবে।

যখন বলা হয়ে থাকে–একটি জাতি হল একটি অবয়ব. তখন এমন একটা উপমা ব্যবহার করা হচ্ছে. যা বিপজ্জনক হতে পারে. যদি না তার সীমাবদ্ধতাগুলোকে চিহ্নিত করা যায়। মানুষ এবং উচ্চতর প্রাণীরা, আক্ষরিক অর্থেই. অবয়ববিশেষই: ভাল অথবা মন্দ. যখন একজন মানুষের ওপর ঘটে, তখন তা ঘটে থাকে একজন একক ব্যক্তি মানুষের ওপরেই–এমন নয় যে. তার এই বা ওই অংশ ধরে ঘটে। যদি আমার দাঁতে অথবা পায়ের আঙুলে কোন ব্যথা হয়, তাহলে সেটা 'আমি' নামক ব্যক্তিটিকে ব্যথিত করে. এবং সেই ব্যথারও অস্তিত্ব থাকত না. যদি ওই উপাঙ্গের স্নায়ুর সঙ্গে মস্তিষ্কের কোন যোগ না থাকত। কিন্তু. হিয়ারফোর্ডশায়ারে কৃষক যদি হিমঝঞ্ঝায় আক্রান্ত হয়. তাহলে লন্ডনস্থিত সরকার কোনরূপ ঠাণ্ডাই অনুভব করবে না। সে কারণে, ব্যক্তি মানুষই ভাল ও মন্দের বাহক. একদিকে মানুষের কোন পৃথক অঙ্গও তা নয়. আবার অন্যদিকে মানুষের কোন সমষ্টিও তা নয়। যদি সমষ্টিগত মানুষের ভাল বা মন্দের সমতুল্য অর্থ. মোটের ওপর. বিভিন্ন ব্যক্তি মানুষের ভাল বা মন্দ–এটা বিশ্বাস করা একটা ভ্রান্তি: তাছাড়া এটা এরকম একটা ভ্রান্তি. যার থেকে জন্ম নিতে পারে চরমতন্ত্র. এবং সেকারণেই তা বিপজ্জনক।

এমন কিছু দার্শনিক ও প্রবক্তা রয়েছেন. যাঁরা মনে করেন. নাগরিকদের কল্যাণের স্বার্থে নিছক মাধ্যম হিসাবে নয়. রাষ্ট্র তার নিজস্ব সত্তার জোরেই এক ধরনের পরমোৎকর্ষের অধিকারী হতে পারে। এই অভিমতের সঙ্গে একমত হওয়ার কোন কারণ আমি দেখতে পাই না 'রাষ্ট্র' হল এক বিমূর্ত সত্তা: সে আনন্দ বা যন্ত্রণা কিছুই অনুভব

করে না, সে কোন আশাবাদ লালন করে না বা তার কোন ভয়ও নেই এবং আমরা তার উদ্দেশ্য বলে যেসব বিষয়কে মনে করি, তা আসলে রাষ্ট্র-পরিচালক ব্যক্তিবর্গেরই উদ্দেশ্য। আমরা যখন বিমূর্তভাবে নয়, চিন্তা করি, আমরা দেখি 'রাষ্ট্রে'-র জায়গায়, মুষ্টিমেয় নির্দিষ্ট ব্যক্তি অধিকাংশ মানুষের প্রাপ্য অংশের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষমতা ভোগ করে এবং এভাবে, 'রাষ্ট্রে'-র মহিমায়ন বস্তুত একটি বিশেষ শাসক সংখ্যালঘুর অনুকূলে যশোদায়ক পরিণতিতে পর্যবসিত হয়। কোন গণতন্ত্রই এ ধরনের মৌলিকভাবে অসঙ্গত তত্ত্বকে মেনে নিতে পারে না।

এছাড়াও, আর একটি নীতিবাদী তত্ত্ব রয়েছে, যা আমার মতে অনুপযুক্ত; এটা হল সেরকমই যাকে অভিহিত করা যায়–'জৈব তত্ত্ব', যদিও আমি সুনিশ্চিত নই যে, জীবতাত্ত্বিকেরা এই তত্ত্ব সমর্থন করেন কিনা। বিবর্তন সম্পর্কিত ভাবনাচিন্তার সূত্রেই এই অভিমতটি উঠে এসেছে। অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের সূত্র ধরে, ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর জৈব আঙ্গিকতায় রূপ নিয়ে মানুষের মধ্যে (এতদূর পর্যন্ত) ক্রিয়াশীল হয়েছে। এই মত অনুসারে–ঊর্ধ্বতন–বরং বলা উচিত, নিজ প্রজাতির অস্তিত্বরক্ষাই হল চরম লক্ষ্য। এই তত্ত্বকে যদি সঠিক বলে মেনে নিতে হয়, এই পৃথিবীর জনসংখ্যা যে কারণের সুবাদে বৃদ্ধি পায়, তাকে 'ভাল' বলে গণ্য করতে হবে, আর জনসংখ্যা হ্রাসকারক যে কোন কারণই হল 'মন্দ'।

এরকম এক যান্ত্রিক ও গাণিতিক দৃষ্টিভঙ্গির কোন যৌক্তিকতা আমি খুঁজে পাই না। সমগ্র পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার চেয়ে মাত্র এক একর পরিসরে অবস্থানরত পিপীলিকার সংখ্যা বেশি–এরকম ক্ষেত্রে খুঁজে বার করা সহজ–কিন্তু এরকম একটা দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে আমরা পিপীলিকার অধিকতর উৎকর্ষের স্বীকৃতি দিই না এবং মানবিক সত্তা কোনটা বেশি পছন্দ করবে–দারিদ্র্য ও জীর্ণতায় বসবাসরত এক সুবিশাল জনসংখ্যা, না মাত্রাধিক স্বাচ্ছন্দ্যে ও সুখে বসবাসকারী এক ক্ষুদ্রতর জনসংখ্যা?

অবশ্য এটা সত্য যে, যে কোন ক্ষেত্রে অস্তিত্বরক্ষা হল একটি প্রয়োজনীয় শর্ত, কিন্তু মূল্যবাহী বিষয়ের ক্ষেত্রেই এটি একটি শর্তমাত্র। কিন্তু তার নিজস্বখাতে কোন মূল্য না থাকতেও পারে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দ্বারা সৃষ্ট পৃথিবীতে অস্তিত্বরক্ষা দাবি করে পর্যাপ্ত প্রশাসন। এই দুই বিপরীত প্রয়োজনীয়তার সমন্বয়সাধন আমাদের এই আলোচনাগুচ্ছে সমস্যা স্বরূপ।

এবং এখন, আমাদের সামগ্রিক আলোচনার সব সূত্রগুলো সংকলিত করে এবং আমাদের সময়ের সব বিপদকে মনে রেখে আমি কিছু নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ইচ্ছুক, এবং আরও নির্দিষ্টভাবে, আমি এই আশার বীজ লালন করতে চাই যে, আমাদের সন্তোষের জন্য রয়েছে যুক্তিবাদী ভিত্তি।

যারা সামাজিক আসঞ্জনকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়, এবং যারা ব্যক্তি উদ্যোগকে প্রাথমিকভাবে মূল্য দেয়–এই দুই পক্ষের মধ্যে অব্যাহত রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন লড়াই–সেই প্রাচীন গ্রিসের আমল থেকে। এ ধরনের যে কোন চলমান বিতর্কে দুই পক্ষের অনুকূলে সত্যের অবস্থান সুনিশ্চিত; এসব ক্ষেত্রে কোন সুস্পষ্ট সমাধান

থাকার সম্ভাবনা নেই, কিন্তু বড়জোর যে কোন ব্যক্তিকেই বিভিন্ন ধরনের আপোষ ও সমঝোতার মধ্যে দিয়ে চলতে হয়।

আমার দ্বিতীয় বক্তৃতায় দেখিয়েছি–সমগ্র ইতিহাস জুড়েই অব্যাহত ছিল বিভিন্ন পর্বের নৈরাজ্য ও বিভিন্ন পর্বভিত্তিক মাত্রাধিক সরকারি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পারস্পরিক টানাপড়েন। আমাদের সময়ে, বিশ্বভিত্তিক ক্ষেত্র ছাড়া (অদ্যাবধি), দেখা গেছে কর্তৃত্ববাদ-অভিমুখী অত্যধিক প্রবণতা, এবং উদ্যোগ সংরক্ষণের জন্য তুচ্ছ পরিমাণ যত্ন-প্রয়োগ। সুবিশাল সংস্থার নিয়ন্ত্রক ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টিভঙ্গি প্রায়শই হয়ে থাকে অবাস্তব, তাঁরা ভুলে যান, মানুষ নামক প্রজাতির অবয়ব ঠিক কি রকম এবং যন্ত্রকে মানুষের সঙ্গে অন্বিত করার পরিবর্তে মানুষকে যন্ত্রের সঙ্গে বিন্যস্ত করতে চান।

আমাদের সুসংগঠিত সমাজসমূহ স্ফূর্তিহীনতার যে উপসর্গে আক্রান্ত, তা সম্পর্কযুক্ত রয়েছে–দূরবর্তী কর্তৃত্বের দ্বারা সুবিশাল এলাকার ওপর অত্যধিক নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি।

বিকেন্দ্রীকরণসূত্রে লভ্য সুবিধাবলির একটি হল–তা আশাবাদ ও আশার প্রতীকী ব্যক্তি-উদ্যোগের অনুকূলে নতুন সুযোগের সংস্থান করে। যদি আমাদের সামগ্রিক চিন্তামণ্ডল বিশাল সমস্যা ও বিশ্বজনীন বিপর্যয়ের আশঙ্কায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তাহলে হতাশার মেঘ নেমে আসা খুবই সহজ। যুদ্ধভীতি, বিপ্লবের আশঙ্কা, প্রতিক্রিয়ার ভয়–এসব আপনার মানসিকতা ও দলীয় আনুগত্যের সৌজন্যে প্রভাবিত হতে পারে। যদি আপনি শক্তিশালী ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি অতিক্ষুদ্র গোষ্ঠীর একজন না হন, তাহলে আপনার তরফে এরকম অনুভূতিরও সম্ভাবনা রয়েছে যে, এসব বড়সড়ো বিষয়গুলো নিয়ে আপনি বিশেষ কিছু করতে পারবেন না। কিন্তু, ছোটখাটো সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে–ধরা যাক, আপনার শহরের বা আপনার ট্রেড ইউনিয়নের অথবা আপনার রাজনৈতিক দলের সমস্যার ক্ষেত্রে আপনার কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করার আশা করা যায়। এর ফলে, একটা আশাবাদী উদ্দীপনার উদ্ভব হতে পারে এবং এই উদ্দীপনা হল এমন একটা জিনিস, যার প্রয়োজন ঘটে কোন বৃহত্তর সমস্যার সফল মোকাবিলার তাগিদে একটা পথ খুঁজে বার করার জন্য। যুদ্ধ এবং আকাল ও আর্থিক দুরবস্থা প্রায় বিশ্বজনীন হতাশার জন্ম দিয়েছে এবং আশাবাদ নামক বিষয়টিকে অগভীর ও অবিশ্বস্ত করে তুলেছে। সাফল্য যদি তা গেড়ার দিকে ক্ষুদ্র পর্যায়েরও হয়–তাহলেও তা হতাশাজনিত উদ্বিগ্ন মানসিকতার শ্রেষ্ঠ নিদান হতে পারে এবং অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই, সাফল্যের অর্থ হল আমাদের সমস্যাবলির বিভাজন, এবং তার মধ্যে যেগুলো দারুণভাবে বড়সড়ো নয়, সেই জাতীয় সমস্যার ওপর মনোযোগ অবাধে কেন্দ্রীভূত করা।

পৃথিবী হয়ে দাঁড়িয়েছে গোঁড়া রাজনৈতিক ধর্মবিশ্বাসীদের শিকার, যার মধ্যে, আমাদের আমলে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী হল পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদ। আমি বিশ্বাস করি না–কোন গোঁড়া অথবা চরম আঙ্গিকের মধ্যে আছে প্রতিরোধযোগ্য রোগের দাওয়াই। ধনতন্ত্র মুষ্টিমেয় সংখ্যক মানুষকে দিতে পারে উদ্যোগের সুযোগ; সাম্যবাদ দিতে পারে (প্রকৃতপক্ষে যদিও তা করে না) সকলের জন্য এক ধরনের ক্রীতদাসসুলভ নিরাপত্তা। কিন্তু জনসাধারণ যদি নিরর্থক সরল তত্ত্বকথা ও স্বসৃষ্ট বিবাদ বিতর্কের প্রভাব থেকে

নিজেদের মুক্ত করতে পারে, তাহলে বিজ্ঞানসম্মত কলাকৌশলের বিচক্ষণ প্রয়োগের মাধ্যমে সকলের জন্য সুযোগ ও নিরাপত্তা এ দুইয়েরই ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়ে উঠবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল–আমাদের রাজনৈতিক তত্ত্বগুলো আমাদের বিজ্ঞানের চেয়ে তুলনামূলক কম বোধশক্তিধর, এবং আমরা অদ্যাবধি শিখতে পারিনি–জীবনকে সুখী করা, এমনকী গৌরবময় করে তুলতে পারে, সেরকম পদ্ধতিতে কিভাবে আমাদের জ্ঞান ও আমাদের দক্ষতাকে ব্যবহার করা যায়। মানবজাতির প্রতি উৎপীড়ন-প্রবণ শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা ও যুদ্ধভীতি থেকেই যে এরকমটা হচ্ছে, তা নয়–যদিও সম্ভবত এটাই হল আমাদের সময়ের সবচেয়ে ভয়াবহ অশুভ দিক। আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে, সেরকম সুবিশাল নৈর্ব্যক্তিক শক্তিসমূহেরও নিপীড়নের শিকার আমরা, যা আমাদের এখনও পরিস্থিতির ক্রীতদাসে পরিণত করে, যদিও-ক্রীতদাসপ্রথার বৈধতা এখন আর নেই। এরকম প্রবণতার প্রয়োজন নেই। মেকি দেবতাদের পূজা-ভজনার ফলেই এরকম ঘটেছে। উদ্যোগী মানুষেরা সহজ সুখ ও বন্ধুতার তুলনায় অধিকতর পূজা করেছে শক্তিকে; হীনোদ্যম মানুষেরা হয় মৌন সম্মতিদান করেছে অথবা দুঃখের উৎস সম্পর্কে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রতারিত হয়ে থাকে।

যেদিন থেকে মানবজাতি ক্রীতদাসপ্রথা আবিষ্কার করেছে, সেই সময় থেকেই ক্ষমতাবানেরা এরকম বিশ্বাস করতো যে, অন্যের ওপর দুঃখকষ্ট আরোপের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে তাদের সুখ। কালক্রমে, গণতন্ত্রের অগ্রগতি এবং রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে খ্রিস্ট-নীতিবাদের সম্পূর্ণ আধুনিক প্রয়োগবিধির সঙ্গে সঙ্গে, ক্রীতদাস প্রথার চেয়ে একটা অধিকতর ভাল আদর্শের সূত্রপাত ঘটেছে, এবং পূর্বে কখনই যা হয়নি–এখন থেকে ন্যায়বিচারের দাবিরও স্বীকৃতি মিলছে। কিন্তু, বিস্তৃত ব্যবস্থার মাধ্যমে ন্যায়ের অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা এই বিস্মৃতিকর আশঙ্কার মুখোমুখি হয়েছি যে, শুধুই ন্যায়বিচার যথেষ্ট নয়। দৈনন্দিন আনন্দ-বিনোদন, সাবধানতা থেকে মুক্তির অবকাশ, রোমাঞ্চ এবং সৃজনশীল কাজের সুযোগ–অন্তত এসব বিষয়ও ন্যায়বিচারের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং এসবের ফলে জীবনের এমন রূপান্তর ঘটে, যাতে মানুষ বেঁচে থাকার সার্থকতা খুঁজে পায়। আনন্দ ও যন্ত্রণার বিকল্পতার চেয়ে একঘেঁয়েমি আরও মারাত্মক হতে পারে। যেসব মানুষ প্রশাসনিক সংস্কার ও সামাজিক উন্নয়ন-প্রকল্পের বিষয়াদি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেন, তাঁরা মূলত সেসব উদ্যোগী মানুষ যাঁরা আর যুবক নয়। প্রায়শই তাঁরা ভুলে যান–অধিকাংশ মানুষের কাছে সেই শুধুই স্বতঃস্ফূর্ততা নয়, সুখের জন্য কোন না কোন ধরনের ব্যক্তিগত গৌরবেরও প্রয়োজন। একজন বিখ্যাত বিজেতার অহংকার এমন হতে পারে না, যা কোন সুনিয়ন্ত্রিত পৃথিবীর অনুমোদন করবে কিন্তু একজন শিল্পীর, কোন আবিষ্কারকের, বন্যতার রূপান্তর ঘটিয়েছেন বাগানে এমন কোন মানুষের অথবা তার জন্য সংরক্ষিত দুঃখের বলয় থেকে সুখের আগমন–এরকম গৌরববোধ অবশ্যই ভাল এবং মুষ্টিমেয় সংখ্যকের জন্য নয়, বরং অনেকের জন্যই আমাদের সমাজের এরকম ব্যবস্থা করা উচিত।

বহুকাল পূর্বে, যে প্রবৃত্তি আমাদের আদিম পূর্বপুরুষদের শিকার ও লড়াইয়ের মনোভাবকে উৎসাহিত করতো–তার একটা নির্গম পথের প্রয়োজন রয়েছে; তারা যদি

এরকম কিছু খুঁজে না পায়, তাহলে তারা ঘৃণা ও চরম বিদ্বেষের দিকেই ঝুঁকবে। কিন্তু এসব প্রবৃত্তির জন্য এমন কিছু নির্গম পথ রয়েছে, যেগুলো মন্দ নয়। যুদ্ধের জন্য সমকক্ষতা ও সক্রিয় খেলাধুলা বিকল্প হতে পারে; শিকারের বিকল্পে রোমাঞ্চ ও আবিষ্কার ও সৃজন। অবশ্যই আমরা এসব প্রবৃত্তিকে উপেক্ষা করব না, এবং এগুলোর জন্য অনুতাপ করারও প্রয়োজন নেই; এগুলো হল উৎস–যা খারাপ, শুধু তারই নয়, বরং মানবিক কৃতিত্ব বলয়ে যা শ্রেষ্ঠ, তারও। যখন একবার নিরাপত্তা অর্জিত হয়েছে, তখন মানবকল্যাণ-আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে–নিছক নিয়ন্ত্রক ধ্বংসবিরোধী বা নির্গম পথ হিসেবেই নয়, বরং মানবিক জীবনের আনন্দ ও গৌরব-উৎকর্ষের চমক জাগানো সর্বাধিক সংখ্যক নির্গম পথের অনুসন্ধান করা।

মানবসভ্যতার অগ্রগতির সুদীর্ঘ কাল ধরে মানুষ দুই ধরনের দুর্দশার শিকার হয়ে এসেছে ঃ প্রথমত বাইরের প্রকৃতির আরোপিত যন্ত্রণা এবং দ্বিতীয়ত বিভ্রান্ত মানুষদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক আরোপিত দুর্দশা। শুরুতে তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে খারাপ দিকগুলোর উৎস ছিল পরিবেশ। মানুষ ছিল এক বিরল প্রজাতি, যার ঊর্ধ্বতনের বিয়ষটি ছিল দৈবাধীন। বানরের তৎপরতা ও লোমশ পশুচর্ম ছাড়া তার পক্ষে বন্য পশুর হাত থেকে নিস্তার পাওয়া কঠিন ছিল, এবং পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলেই শীতের ঠাণ্ডাও সে সহ্য করতে পারত না। তার মাত্র দুটি জৈব সুবিধা ছিলঃ তার ঋজু ভঙ্গি হাত দুটিকে মুক্ত করেছিল এবং মেধা তাকে অভিজ্ঞতা সঞ্চালনে সমর্থ করেছিল। কালক্রমে এই দুটি সুবিধার সুবাদে সে অর্জন করেছিল শ্রেষ্ঠত্ব। মানবপ্রজাতির সংখ্যা অতিক্রম করেছিল অন্য যে কোন স্তন্যপায়ী জন্তুর সংখ্যাকে। কিন্তু বন্যা এবং দুর্ভিক্ষ ও মহামারির মাধ্যমে, বিপুলসংখ্যক মানবজাতির অবিরাম শ্রমের বিনিময়ে প্রাত্যহিক রুজি আদায়ের মাধ্যমে প্রকৃতি তখনও তার ক্ষমতা জাহির করতে সক্ষম ছিল।

আমাদের আমলে বিজ্ঞান-মেধার অগ্রগতির ফলে বাইরের প্রকৃতির কাছে আমাদের দাসত্ব অতিদ্রুত হ্রাসমান। দুর্ভিক্ষ ও মহামারির ঘটনা এখনও ঘটে, কিন্তু আমরা বছরের পর বছর ধরে জানি, এসবের প্রতিরোধে কি ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। কঠোর শ্রম এখনও জরুরি, কিন্তু তা আমাদের অজ্ঞতার কারণে; শান্তি ও সহযোগিতা সাপেক্ষে আমরা খুব মামুলি ধরনের শ্রমের ওপর নির্ভর করতে পারি। বর্তমান প্রয়োগকৌশলকে নিয়েই, আমরা যদি প্রজ্ঞার অনুশীলনকে বেছে নিই, তাহলে আমরা বাইরের প্রকৃতির প্রভাবিত দাসত্ববন্ধনের অনেক প্রাচীন ধরন-ধারণ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারি।

কিন্তু মানুষের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক লিপ্ত বদ অনুষঙ্গগুলোর সমপরিমাণে হ্রাস ঘটেনি। এখনও যুদ্ধ, নিপীড়ন এবং বীভৎস নিষ্ঠুরতার অস্তিত্ব রয়েছে এবং এখনও লোভী মানুষরা তাদের তুলনায় কম দক্ষ কম নিষ্ঠুর মানুষদের সম্পদ লুণ্ঠন করে। এখনও ক্ষমতালিপ্সা থেকে জন্ম নেয় বিকট স্বৈরতন্ত্র, অথবা নিছক অবরোধ, যখন তার বড় ধরনের প্রকরণের কোন সম্ভাবনা থাকে না এবং ভীতি–গভীর, কদাচিৎ যা সচেতন ভয়–তা এখনও অনেক মানুষের জীবনেই প্রভাববিস্তারী প্রবণতা।

এসব নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়; মানুষের প্রকৃতিতে এমন কিছু নেই যা এই সবমন্দ উপসর্গগুলোকে অনিবার্য করে তোলে। আমি সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের গুরুত্ব দিয়ে আবার বলতে চাই যে, আমি তাঁদের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করি, যাঁরা আমাদের লড়াকু প্রবৃত্তি দেখে এই মন্তব্য করে থাকেন–মানুষের প্রকৃতি যুদ্ধ ও সংঘর্ষের অন্যান্য ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম দাবি করে। আমি দৃঢ়ভাবে এর বিপরীত অভিমতে বিশ্বাস রাখি। আমি মনে করি, সংগ্রামী প্রবৃত্তিসমূহেরও এক অতিপ্রয়োজনীয় ভূমিকা রয়েছে এবং এগুলোর ক্ষতিকর প্রবণতাকে ব্যাপকভাবে কমিয়ে আনা যেতে পারে।

যখন চরম দুরবস্থার ভয় থাকে না, তখন অধিকারলিপ্সা তুলনামূলক কম তীব্র হয়ে থাকে। অপরের কোন ক্ষতি না করে ও ক্ষমতার প্রতি ভালবাসার বিষয়টি চরিতার্থ করা যায়ঃ আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের সূত্রে প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে, প্রশংসাযোগ্য পুস্তক বা শিল্পকলা উৎপাদনের মাধ্যমে এবং সফল প্রত্যয় উৎপাদনের মাধ্যমে। কার্যকরী হওয়ার অনুকূলে উৎসাহ ও ইচ্ছা খুবই উপকারী যদি সেগুলো সঠিক নির্গম-পথ খুঁজে বার করতে সক্ষম হয়, এবং তখনই ক্ষতিকর–যেমন বাষ্প, যা রেলগাড়িকে চালনাও করতে পারে অথবা বয়লারে বিস্ফোরণও ঘটাতে পারে।

বহির্প্রকৃতি থেকে আমাদের মুক্তি এতকালের প্রাপ্ত মানবিক মাঙ্গলিকতার তুলনায় অধিকতর মঙ্গল সম্ভব করে তুলেছে। কিন্তু এই সম্ভাবনাকে যদি উপলব্ধি করতে হয়, তাহলে সর্বপথে উদ্যোগের স্বাধীনতা থাকতেই হবে, যা সুনিশ্চিতভাবে ইতিবাচক নয় এবং মানবজীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারে, সেই ধরনের উদ্যোগের প্রতি উৎসাহদান বাঞ্ছনীয়। মানুষকে নিস্তেজ ও ভীরু করে রাখার চেষ্টা দিয়ে আমরা কোন সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলতে পারব না, নিজের পরিজনদের ওপর আঘাত না চাপিয়ে, মানুষকে সাহসী ও রোমাঞ্চপ্রিয় ও ভয়হীন করে তোলার মাধ্যমে তা গড়ে তুলতে হবে। যে পৃথিবীতে আমরা নিজেদের খুঁজে পাই, সেখানে মঙ্গল–সম্ভাবনা প্রায় অসীম এবং অমঙ্গলের সম্ভাবনা ঠিক ততটা নয়। আমাদের বর্তমান পীড়াদায়ক অবস্থার পিছনে অন্যান্য কারণের মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ হল–আমরা আমাদের সীমানার বাইরের প্রকৃতির শক্তিকে বুঝতে ও একটা দারুণ পর্যায় পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছি, কিন্তু আমাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত অনেক কিছুর নিয়ন্ত্রণ করতে আমরা শিখিনি। আত্মনিয়ন্ত্রণ সর্বদাই নীতিবাদীদের একটি সতর্কবাণী, কিন্তু অতীতে এটা ছিল এক ধরনের উপলব্ধিহীন নিয়ন্ত্রণ। এই বক্তৃতাগুচ্ছে, অধিকাংশ রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদদের তাত্ত্বিকতার চেয়ে মানবিক প্রয়োজনের বিস্তৃততর উপলব্ধি অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি, কারণ শুধুমাত্র এরকম উপলব্ধির মাধ্যমেই আমরা সেসব আশাবাদের বাস্তবায়ন ঘটাতে পারি, যদি আজও সেগুলো আমাদের দোষেই ব্যাপকভাবে হতাশার শিকার এবং আমাদের দক্ষতা যে আশাবাদকে আমাদের নাগালের মধ্যে এনে দিয়েছে।